কুমার সমগ্র

সুকুমার রায়

সুকুমার সমগ্র

সুকুমার সমগ্র

সুকুমার রায়

সম্পাদনা □ অনীশ দেব
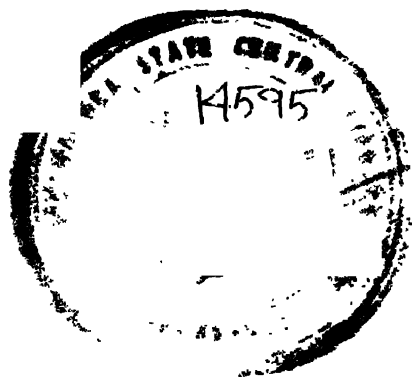
সুপ্রিম পাবলিশার্স
১০এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

SUKUMAR SAMAGRA
by Sukumar Roy
Edited by **ANISH DEB**

প্রকাশক
শতদল জানা
১০এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রণ :
নবলোক প্রেস
৩২/২, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৬

অক্ষর বিন্যাস
লেজার বাইট
কলকাতা ৭০০ ০৪৬

অলঙ্করণ
সুকুমার রায়
দেবাশীষ দেব
ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ চিত্র
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

গ্রাফিক্স
রিপ্রোস্ক্যান

সুকুমার রায়ের রঙিন প্রতিকৃতি
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

নামপত্র প্রতিকৃতি
বিজন কর্মকার

একশো চল্লিশ টাকা

সুকুমারের লেখনী থেকে যে অবিমিশ্র হাস্যরসের উৎসধারা বাংলা সাহিত্যকে অভিষিক্ত করেছে তা অতুলনীয়। তাঁর সুনিপুণ ছন্দের বিচিত্র ও স্বচ্ছন্দ গতি, তাঁর ভাবসমাবেশের অভাবনীয় অসংলগ্নতা পদে পদে চমৎকৃতি আনে। তাঁর স্বভাবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য ছিল সেইজন্যেই তিনি তার বৈপরীত্য এমন খেলাচ্ছলে দেখাতে পেরেছিলেন। এই সাহিত্যে তার দৃষ্টান্ত উৎকৃষ্ট আরো কয়েকটি দেখা গিয়েছে কিন্তু সুকুমারের অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাসের বিশেষত্ব তাঁর প্রতিভার যে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছে তার ঠিক সমশ্রেণীর রচনা দেখা যায় না। তাঁর এই বিশুদ্ধ হাসির দানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অকাল মৃত্যুর সকরুণতা পাঠকদের মনে চিরকালের জন্য জড়িত হয়ে রইল।

[illegible]
কালিম্পঙ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই বই সম্পর্কে কয়েকটি কথা

এই বই হাতে নিয়ে পাঠকের প্রথম প্রতিক্রিয়া এইরকম হতে পারে : 'আবার আর-একটা সুকুমার সমগ্র!'

সেই প্রতিক্রিয়ার উত্তরে জানাই, বর্তমান বইটি অন্যান্য প্রচলিত 'সুকুমার সমগ্র' কিংবা 'সুকুমার রচনা সমগ্র' বইয়ের তুলনায় 'উন্নত'। উন্নত এই কারণে যে, এই বইতে রয়েছে সুকুমার রায়ের আঁকা দুটি রঙিন আর্টপ্লেট। আর রয়েছে মূল 'আবোল তাবোল'-এর অনেকগুলো সাদা-কালো ছবি—যা এর আগে অন্য কোনও 'সুকুমার সমগ্র' বইতে গ্রন্থিত হয়নি। এই ছবিগুলো সংগ্রহের জন্য বাবুই প্রকাশনের 'আবোল তাবোল' সংস্করণ (সাল) ও সুবর্ণরেখা প্রকাশিত 'আবোল তাবোল' (সাল) এবং 'হ য ব র ল' বই দুটির সাহায্য নিয়েছি। এই বইতে আছে এ পর্যন্ত অগ্রন্থিত সুকুমারের আটটি রচনা। এই রচনাগুলো 'আবিষ্কার' করেছেন বন্ধু-গবেষক দেবাশিস মুখোপাধ্যায় ('কোরক সাহিত্য পত্রিকা', সুকুমার সংখ্যা, জানুয়ারি-এপ্রিল,   সাল)। ফলে সুকুমার-অনুরাগীরা অবশ্যই তাঁকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাবেন। এ ছাড়া   সালে প্রকাশিত 'প্রস্তুতি পর্ব' পত্রিকার 'বিশেষ সংখ্যা : সুকুমার রায়' থেকে কয়েকটি ছবি পুনরুদ্ধার করে এই বইয়ে গ্রন্থিত হয়েছে।

এইখানে জানিয়ে রাখা দরকার যে, যতই দিন যাবে ততই সুকুমারের নতুন-নতুন রচনা ও ছবি 'আবিষ্কৃত' হবে এবং আগামীদিনের 'সুকুমার সমগ্র' আরও 'উন্নত' হবে। এর কারণ, ক্ষণজন্মা এই সাহিত্যিক মাত্র ৩৬ বছরের জীবনে, মোটামুটি ১৫-২০ বছরের সাহিত্যজীবনে, এত সৃষ্টি করেছিলেন, এত রকমের সৃষ্টি করেছিলেন যে, তাঁর সত্যিকারের 'সৃষ্টিসমগ্র' প্রকাশ করা রীতিমতো দুরূহ ব্যাপার। সুকুমারের বহুমুখী প্রতিভার সঙ্গে একজনইমাত্র লেখকের মিল খুঁজে পাই—লুইস ক্যারল। 'অ্যালিস'স অ্যাডভেঞ্চার্স ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড', 'থ্রু দ্য লুকিং গ্লাস' ইত্যাদি বইয়ের রচয়িতা লুইস ক্যারল (আসল নাম, চার্লস লুটউইজ ডজসন। জন্ম : ১৮৩২ সাল, মৃত্যু : ১৮৯৮ সাল।) সুকুমারের ওপরে প্রভাব ফেলেছিলেন। কিন্তু সুকুমার (জন্ম : ১৮৮৭ সাল—মৃত্যু : ১৯২৩ সাল) সেই প্রভাবে আচ্ছন্ন হননি—তিনি একের পর এক যা সৃষ্টি করে চললেন তা সত্যিই তুলনাহীন। বাংলা সাহিত্যে তাবড়-তাবড় সাহিত্যিক অনেক আছেন, কিন্তু সুকুমার রায় একজন।

মাত্র সাড়ে আট বছর বয়েসে সুকুমারের প্রথম কবিতা 'নদী' 'মুকুল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। সেই যে সুকুমার 'শুরু' করলেন, 'শেষ' করলেন গিয়ে 'আবোল তাবোল'-এর শেষ কবিতায়। 'আবোল তাবোল' নামে প্রকাশিত এই শেষ কবিতাটির শেষ আটটি লাইন হল :

হ্যাংলা হাতী চ্যাং-দোলা,
শূন্যে তাদের ঠ্যাং তোলা।
মক্ষিরাণী পক্ষিরাজ—
দস্যি ছেলে লক্ষ্মী আজ।
আদিম কালের চাঁদিম হিম
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।

ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর
গানের পালা সাঙ্গ মোর।

এই কবিতার শেষ দুটি লাইনে যেমন সুকুমার 'শেষের' ইঙ্গিত দিয়েছেন, তেমনই তার দু-লাইন আগে বলেছেন, 'দস্যি ছেলে লক্ষ্মী আজ।' বাংলা ভাষা নিয়ে সুকুমার যে-ধরনের তোলপাড় করেছেন তাতে মানতেই হয়, তিনি ছিলেন 'দস্যি' সাহিত্যিক। শব্দ নিয়ে অর্থ নিয়ে অভিনব ভাঙচুর করেছেন তিনি। তিনি লিখেছিলেন : '...শব্দমার্গের সন্ধান পেয়েছে কিন্তু তার সংকেতটুকু ধরতে পারেনি। ওরা যে ধরেছে যে-সব শব্দের অর্থ নেই এবং ছিল না—ঢোঁড়া শব্দ। তা করলে তো চলবে না। জ্যান্ত জ্যান্ত শব্দ, যাদের চলৎশক্তি চাপা রয়েছে, ধরে ধরে মটমট করে তাদের বিষদাঁত ভাঙতে হবে। অর্থের বিষ জমে জমে উঠতে থাকবে—আর ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে তাকে কেটে ফেলব।' ['শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম'] সুকুমার ওঁর লেখায় বলেছেন, শব্দের ঘাড়ে চিন্তাকে চাপানো ঠিক নয়। শব্দের অর্থই হল অনর্থের গোড়া। শব্দের সঙ্গে অর্থ জুড়লে শব্দের নিজস্ব ক্ষমতা ক্ষয়ে যায়।

১৯২২ সালে সুকুমার 'আকাশবাণীর কল' নামে একটি রচনা লিখে প্রথম 'আকাশবাণী' শব্দটি তৈরি করেন। তার বেশ কিছু পরে রবীন্দ্রনাথ বেতার কেন্দ্রের নামকরণ করেছিলেন 'আকাশবাণী'। সেই সুকুমার ননসেন্স লিখেছেন :

'মিশিমাখা শিখিপাখা আকাশের কানে কানে
শিশিবোতল ছিপি-ঢাকা সরু সরু গানে গানে,' ['হ য ব র ল']

আবার ব্যবহার করেছেন কাব্যসুষমা ও হাস্যরসের অদ্ভুত মিশ্রণ :

'পূবদিকে মাঝ রাতে ছোপ্ দিয়ে রাঙা;
রাতকাণা চাঁদ ওঠে আধখানা ভাঙা।
চট ক'রে মনে পড়ে মট্‌কার কাছে
মালপোয়া আধখানা কাল থেকে আছে।'

['ছলোর গান'—'আবোল তাবোল']

সুকুমার কী করে এইভাবে ভাবতে পারতেন, লিখতে পারতেন, তা সুকুমারই জানেন! ওঁর লেখা বারবার পড়তে গিয়ে এটুকু বুঝি যে, ওঁর মনের নাগাল পাওয়া অধমের মতো বালখিল্যের পক্ষে অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। তার চেয়ে, সে-চেষ্টা না করে, ওঁর লেখা বারবার পড়ে বারবার অবাক হওয়াই ভালো। সুতরাং এই 'সুকুমার সমগ্র'টিকে একজন অবাক ভক্তের সম্পাদনার চেষ্টা হিসেবে গণ্য করলে খুশি হব।

এই বই প্রযোজনায় অক্লান্ত সহযোগিতা করেছেন কানাইলাল জানা, প্রদ্যুৎ সাহা, ভোলানাথ দাস ও পলাশ জানা। ওঁরা আমার এত কাছের মানুষ যে, 'ধন্যবাদ' দিলে দূরে সরে যেতে পারে। তাই সে-চেষ্টা করলাম না।

অনীশ দেব

ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৯২ এ পি সি রোড,
কলকাতা ৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

আবোল তাবোল

আবোল তাবোল ১৭
খিচুড়ি ১৮
কাঠ-বুড়ো ১৯
গোঁফ চুরি ২০
সৎ-পাত্র ২১
বাবুরাম সাপুড়ে ২১
প্যাঁচা আর প্যাঁচানি ২১
কাতুকুতু বুড়ো ২২
গানের গুঁতো ২৩
খুড়োর কল ২৪
লড়াই-খ্যাপা ২৫
ছায়াবাজি ২৬
কুমড়োপটাশ ২৭
সাবধান! ২৮
হাতুড়ে ২৯
অবাক কাণ্ড ২৯
চোর ধরা ৩০
কিম্ভূত ৩১
ভাল রে ভাল ৩২
নেড়া বেলতলায় যায় ক'বার? ৩৩
শব্দ কল্প দ্রুম! ৩৪
বুঝিয়ে বলা ৩৫
বুড়ির বাড়ি ৩৭
বোম্বাগড়ের রাজা ৩৮
একুশে আইন ৩৯
হুঁকোমুখো হ্যাংলা ৪০
দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম ৪১
ডানপিটে ৪২
গল্প বলা ৪২
নারদ! নারদ! ৪৩
ভূতুড়ে খেলা ৪৪
রামগরুড়ের ছানা ৪৫
কি মুশকিল! ৪৬
আহ্লাদী ৪৬
হাত গণনা ৪৭
গন্ধ বিচার ৪৮
কাঁদুনে ৪৯
হুলোর গান ৫০
ঠিকানা ৫১
নোট্ বই ৫২
ভয় পেয়ো না ৫৩
বিজ্ঞান শিক্ষা ৫৪
ট্যাঁশ গরু ৫৫
ফস্‌কে গেল ৫৬
পালোয়ান ৫৭
আবোল তাবোল ৫৮.

খাই খাই

নামহীন কবিতা ৬১
খাই খাই ৬২
দাঁড়ের কবিতা ৬৪
পাকাপাকি ৬৫
আড়ি ৬৫
পড়ার হিসাব ৬৬
বিষম চিন্তা ৬৬
পরিবেষণ ৬৭
অবুঝ ৬৮
নাচের বাতিক ৬৯
হিংসুটিদের গান ৭০
অসম্ভব নয়! ৭১
কাজের লোক ৭২
সাধে কি বলে গাধা? ৭৪
তেজিয়ান্ ৭৭
জালা-কুঁজো সংবাদ ৭৭

হরিষে বিষাদ ৭৮
আশ্চর্য! ৭৮
হিতে বিপরীত ৭৯
নিঃস্বার্থ ৭৯
হারিয়ে পাওয়া ৮০
সঙ্গীহারা ৮১
মূর্খ মাছি ৮২
জীবনের হিসাব ৮৬
নিরুপায় ৮৭
নন্দগুপি ৮৮
বর্ষ গেল, বর্ষ এল ৮৯
গ্রীষ্ম ৯০
বর্ষার কবিতা ৯১
শ্রাবণে ৯১
বর্ষ শেষ ৯২

অতীতের ছবি ৯৩

অন্যান্য ছড়া, কবিতা ও গান

মেঘ ১০৫
লোভী ছেলে ১০৫
নূতন বৎসর ১০৬
আয়রে আলো আয় ১০৭
আবোলতাবোল ১০৭
কানে খাটো বংশীধর ১০৮
অন্ধ মেয়ে ১০৮
সাহস! ১০৯
ছুটি ১০৯
ও বাবা! ১১০
আজব খেলা ১১১
আনন্দ ১১১
মনের মতন ১১২
বেজায় খুসি ১১২
দিনের হিসাব ১১২
লক্ষ্মী ১১৩
আলোছায়া ১১৩
কত বড় ১১৩
মেঘের খেয়াল ১১৪
শিশুর দেহ ১১৪
নাচন ১১৫
ভারি মজা ১১৫
বিচার ১১৫
ছিটেফোঁটা ১১৬
খোকা ঘুমায় ১১৭
কন্দনা ১১৭
গ্রীষ্ম ১১৭
খোকার ভাবনা ১১৮
বড়াই ১১৮
বুঝবার ভুল ১১৯
'ভাল ছেলের' নালিশ ১২০
আদুরে পুতুল ১২০
ছবি ও গল্প ১২১
বেজায় রাগ ১২২
সন্দেশ ১২২
বাবু ১২৩
বিষম কাণ্ড ১২৪
ছুটি ১২৪
কিছু চাই? ১২৫
বিষম ভোজ ১২৫
সম্পাদকের দশা ১২৬
কানা-খোঁড়া সংবাদ ১২৭
গান ১৩০
শ্রীশ্রীবর্ণমালাতত্ত্ব ১৩১
কাব্য-সমালোচনা ১৩৭
গিরিধি ১৩৮
নদী ১৪০

টিক্-টিক্-টিক্ ১৪০
শ্রীগোবিন্দ-কথা ১৪১
মহাভারত (আদি পর্ব) ১৪২
কয়েকটি কবিতা ১৪৫
মণ্ডা ক্লাবের আমন্ত্রণপত্র ১৪৮

হযবরল ১৪৯

পাগলা দাশু

পাগলা দাশু ১৭১
দাশুর খ্যাপামি ১৭৪
চীনেপট্‌কা ১৭৭
দাশুর কীর্তি ১৮০
চালিয়াৎ ১৮৩
সবজান্তা ১৮৬
ভোলানাথের সর্দ্দারি ১৮৯
আশ্চর্য কবিতা ১৯২
নন্দলালের মন্দ কপাল ১৯৫
নতুন পণ্ডিত ১৯৮
সবজান্তা দাদা ২০০
যতীনের জুতো ২০১
ডিটেক্‌টিভ ২০৪
ব্যোমকেশের মাঞ্জা ২০৭
জগ্যিদাসের মামা ২১০
আজব সাজা ২১২
কালাচাঁদের ছবি ২১৪
গোপালের পড়া ২১৬
পেটুক ২১৮
ভুল গল্প ২২০

বহুরূপী

গল্প ২২৭
ড্রিঘাঞ্চু ২২৯
এক বছরের রাজা ২৩২
হিংসুটি ২৩৪
দুই বন্ধু ২৩৫
গরুর বুদ্ধি ২৩৭
ছাতার মালিক ২৩৮
অসিলক্ষণ পণ্ডিত ২৪১
ব্যাঙের রাজা ২৪২
ডাকাত নাকি? ২৪৫
পুতুলের ভোজ ২৪৭
উকিলের বুদ্ধি ২৪৮
বুদ্ধিমান শিষ্য ২৪৯
ছিটেফোঁটা ২৫১

আরও গল্প

বোকা বুড়ী ২৫৫
রাগের ওষুধ ২৫৬
পালোয়ান ২৫৭
হাসির গল্প ২৬০
সত্যি ২৬১
ঠুকে-মারি আর মুখে-মারি ২৬৩
বিষ্ণুবাহনের দিগ্বিজয় ২৬৪
বাজে গল্প ২৬৭
বাজে গল্প ২৬৭
বাজে গল্প ২৬৯
কুকুরের মালিক ২৭০
টাকার আপদ ২৭২
রাজার অসুখ ২৭৩
দানের হিসাব ২৭৫
হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরী ২৭৮
ওয়াসিলিসা ২৮৫
দেবতার সাজা ২৮৮
পাজি পিটার ২৯০
টিয়াপাখীর বুদ্ধি ২৯৩
খুকির লড়াই দেখা ২৯৪

ছয় বীর ২৯৫
ভাঙা তারা ২৯৭
খৃষ্টবাহন ২৯৯
নাপিত পণ্ডিত ৩০২
বুদ্ধিমানের সাজা ৩০৫
হারকিউলিস ৩০৬
আশ্চর্য ছবি ৩১৪
অর্ফিয়ুস্ ৩১৬
দেবতার দুর্বুদ্ধি ৩১৮
বুদ্ধিমান শিষ্য ৩২১
সূদন ওঝা ৩২২
লোলির পাহারা ৩২৪
গল্পস্বল্প ৩২৭
অগ্নি পরীক্ষা ৩২৯
বাঘের মন্ত্র ৩৩০
ঊষা ও সূর্য ৩৩১

নাটক

ঝালাপালা ৩৩৫
লক্ষ্মণের শক্তিশেল ৩৫৬
অবাক জলপান ৩৭১
হিংসুটি ৩৭৭
মামা গো ৩৮১
ভাবুক-সভা ৩৮৩
চলচিত্ত-চঞ্চরি ৩৮৬
শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম ৪০৮

জীবজন্তু

গরিলা ৪২৩
গরিলার লড়াই ৪২৪
বেবুন ৪২৫
আলিপুরের বাগানে ৪২৬
মানুষ মুখো ৪২৮
পেকারি ৪২৯
জানোয়ার এঞ্জিনিয়ার ৪৩১
গ্নাটন ৪৩৪
ঘোড়ার জন্ম ৪৩৫
সেকালের বাঘ ৪৩৭
সেকালের বাদুড় ৪৩৮
তিমির খেয়াল ৪৪০
তিমির ব্যবসা ৪৪১
রাক্ষুসে মাছ ৪৪৪
অদ্ভুত মাছ ৪৪৫
বিদ্যুৎ মৎস্য ৪৪৮
সমুদ্রের ঘোড়া ৪৪৯
কুমিরের জাতভাই ৪৫০
অদ্ভুত কাঁকড়া ৪৫৩
শামুক ঝিনুক ৪৫৪
সিন্ধু ঈগল ৪৫৬
ধনঞ্জয় ৪৫৮
পাখির বাসা ৪৬০
মাছি ৪৬১
ফড়িং ৪৬৪
বর্মধারী জীব ৪৬৫
লড়াইবাজ জানোয়ার ৪৬৭
নিশাচর ৪৬৯
নাকের বাহার ৪৭১
জানোয়ারের প্রবাস যাত্রা ৪৭২
জানোয়ারের ঘুম ৪৭৫
গোখুরা শিকার ৪৭৭
সিংহ শিকার ৪৭৯
সেকালের লড়াই ৪৮২
খাঁচার বাইরে খাঁচার জন্তু ৪৮৩
জানোয়ারওয়ালা ৪৮৫
প্রাচীনকালের শিকার ৪৮৭
অদ্ভুত জীব ৪৮৯

জীবনী

অজানা দেশ ৪৯৩
ডেভিড লিভিংস্টোন ৪৯৬
কলম্বস ৪৯৮
জোয়ান ৪৯৯
পিপাসার জল ৫০৩
ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল ৫০৪
খোঁড়া মুচির পাঠশালা ৫০৭
সক্রেটিস ৫০৯
দানবীর কার্নেগী ৫১১
নোবেলের দান ৫১৩
আর্কিমিডিস ৫১৫
গ্যালিলিও ৫১৭
ডারুইন ৫২০
পাস্তুর ৫২৩
পণ্ডিতের খেলা ৫২৫
সামান্য ঘটনা ৫২৭

বিবিধ

সূক্ষ্ম হিসাব ৫৩১
শিকারী গাছ ৫৩২
কাগজ ৫৩৩
লুপ্ত সহর ৫৩৫
ডুবুরি জাহাজ ৫৩৭
পাতালপুরী ৫৩৯
উঁচু বাড়ি ৫৪১
রাবণের চিতা ৫৪২
ডুবুরী ৫৪৩
পার্লামেন্টের ঘড়ি ৫৪৫
রেলগাড়ির কথা ৫৪৬
সূর্যের কথা ৫৪৮
ডাকঘরের কথা ৫৪৯
অসুরের দেশ ৫৫১
নীহারিকা ৫৫৪
মাটির বাসন ৫৫৬
ঘুড়ি ও ফানুষ ৫৫৮
ক্লোরোফর্ম ৫৬০
মরুর দেশে ৫৬২
যুদ্ধের আলো ৫৬৪
প্রলয়ের ভয় ৫৬৫
ধূলার কথা ৫৬৭
আকাশ আলেয়া ৫৬৯
আষাঢ়ে জ্যোতিষ ৫৭০
অলংকারের কথা ৫৭২
গাছের ডাকাতি ৫৭৫
কয়লার কথা ৫৭৭
জাহাজ ডুবি ৫৭৯
আশ্চর্য আলো ৫৮০
পিরামিড ৫৮১
দক্ষিণ দেশ ৫৮৪
ভূমিকম্প ৫৮৮
মানুষের কথা ৫৯১
মেঘবৃষ্টি ৫৯৩
বেগের কথা ৫৯৫
আগুন ৫৯৭
লাইব্রেরী ৫৯৯
নৌকা ৬০১
ব্যস্ত মানুষ ৬০২
সমুদ্র বন্ধন ৬০৪
শনির দেশে ৬০৮
লোহা ৬১০
পৃথিবীর শেষ দশা ৬১২
কাঁচ ৬১৫
শরীরের মালমশলা ৬১৮
অতিকায় জাহাজ ৬১৯
আকাশপথের বিপদ ৬১৯
সেকালের কীর্তি ৬২১
চীনের পাঁচিল ৬২২

চাঁদমারি ৬২৪
বায়োস্কোপ ৬২৬
ভুঁইফোঁড় ৬২৭
মামার খেলা ৬২৯
ডাকের কথা ৬৩১
কাঠের কথা ৬৩২
হাওয়ার ডাক ৬৩৪
হেঁয়ালি নাট্য ৬৩৬
আহ্লাদী মিনার ৬৩৭
আদ্যিকালের গাড়ি ৬৩৯
নকল আওয়াজ ৬৪১
আশ্চর্য প্রহরী ৬৪২
আকাশবাণীর কল ৬৪৪
যদি অন্যরকম হত ৬৪৬
জলস্তম্ভ ৬৪৮
বুমেরাং ৬৪৯
ছাপাখানার কথা ৬৫০
কাপড়ের কথা ৬৫১
মজার খেলা ৬৫৩
আজব জীব ৬৫৫
সূর্যের রাজ্য ৬৫৬
একটি বর ৬৫৮
ব্যাঙের সমুদ্র দেখা ৬৫৮
মানুষের বাসা ৬৫৯
অদৃশ্য শত্রু ৬৬১
চীনে মাটির বাসন ৬৬৩

প্রবন্ধ

ভাষার অত্যাচার ৬৬৭
ক্যাবলের পত্র ৬৭৩
চিরন্তন প্রশ্ন ৬৭৬
জীবনের হিসাব ৬৮৪
যুবকের জগৎ ৬৯২
দৈবেন দেয়ম্ ৬৯৭
উপেন্দ্রকিশোর রায় ৭০৫
মুলুর নিজস্ব রূপ ৭১০
শিল্পে অত্যুক্তি ৭১১
ফটোগ্রাফি ৭২০
ভারতীয় চিত্রশিল্প ৭২২
'ব্রাহ্ম ও হিন্দু' প্রবন্ধের প্রতিবাদ ৭২৭
ব্রাহ্মহিন্দু সমস্যা : ১ ৭৩০
ব্রাহ্মহিন্দু সমস্যা : ২ ৭৩৪
The Spirit of Rabindranath Tagore ৭৩৭
The Burden of the Common Man ৭৪৭

কৈফিয়ৎ

যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব, তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার। ইহা খেয়াল রসের বই। সুতরাং, সে রস যাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন না, এ পুস্তক তাঁহাদের জন্য নহে।

পুস্তকের অধিকাংশ ছবি ও কবিতা নানা সময়ের "সন্দেশ" পত্রিকা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে আবশ্যকমত সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া এবং নানা স্থলে নূতন মালমশলা যোগ করিয়া সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইল।

গ্রন্থকার

আয়রে ভোলা খেয়াল-খোলা
স্বপনদোলা নাচিয়ে আয়,
আয়রে পাগল আবোল তাবোল
মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়।
আয় যেখানে খ্যাপার গানে
নাইকো মানে নাইকো সুর।
আয়রে যেথায় উধাও হাওয়ায়
মন ভেসে যায় কোন্ সুদূর।
আয় খ্যাপা-মন ঘুচিয়ে বাঁধন
জাগিয়ে নাচন তাধিন্ ধিন্,
আয় বেয়াড়া সৃষ্টিছাড়া
নিয়মহারা হিসাব্‌হীন।
আজ্‌গুবি চাল্ বেঠিক বেতাল
মাত্‌বি মাতাল রঙ্গেতে—
আয়রে তবে ভুলের ভবে
অসম্ভবের ছন্দেতে॥
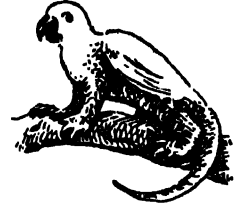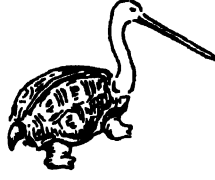
খিচুড়ি

হাঁস ছিল, সজারু, (ব্যাকরণ মানি না),
হয়ে গেল "হাঁসজারু" কেমনে তা জানি না।
বক কহে কচ্ছপে—"বাহবা কি ফূর্তি!
অতি খাসা আমাদের 'বকচ্ছপ মূর্তি'।"
টিয়ামুখো গিরগিটি মনে ভারি শঙ্কা—
পোকা ছেড়ে শেষে কিগো খাবে কাঁচা লঙ্কা?
ছাগলের পেটে ছিল না জানি কি ফন্দি,
চাপিল বিছার ঘাড়ে, ধড়ে মুড়ো সন্ধি!
জিরাফের সাধ নাই মাঠে ঘাটে ঘুরিতে,
ফড়িঙের ঢং ধরি' সেও চায় উড়িতে।
গরু বলে, "আমারেও ধরিল কি ও রোগে?
মোর পিছে লাগে কেন হতভাগা মোরগে?"
"হাতিমি"র দশা দেখ,—তিমি ভাবে জলে যাই,
হাতি বলে, "এই বেলা জঙ্গলে চল ভাই।"
সিংহের শিং নেই, এই তার কষ্ট—
হরিণের সাথে মিলে শিং হল পষ্ট।
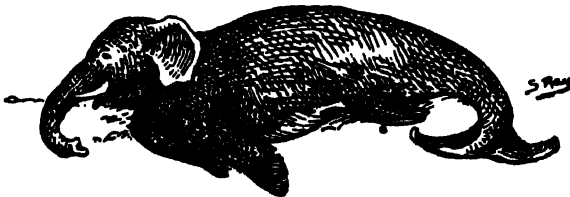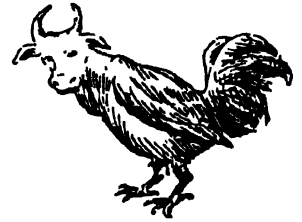
কাঠ-বুড়ো

হাঁড়ি নিয়ে দাড়িমুখো কে যেন কে বৃদ্ধ,
রোদে বসে চেটে খায় ভিজে কাঠ সিদ্ধ।
মাথা নেড়ে গান করে গুন্ গুন্ সঙ্গীত—
ভাব দেখে মনে হয় না জানি কি পণ্ডিত!
বিড়্ বিড়্ কি যে বকে নাহি তার অর্থ—
"আকাশেতে ঝুল ঝোলে, কাঠে তাই গর্ত।
টেকো মাথা তেতে ওঠে গায়ে ছোটে ঘর্ম,
রেগে বলে, "কেবা বোঝে এ সবের মর্ম?
আরে মোলো, গাধাগুলো একেবারে অন্ধ,
বোঝেনাকো কোন কিছু খালি করে দ্বন্দ্ব।
কোন্ কাঠে কত রস জানে নাকো তত্ত্ব-
একাদশী রাতে কেন কাঠে হয় গর্ত?"

আশে পাশে হিজি বিজি আঁকে কত অঙ্ক—
ফাটা কাঠ ফুটো কাঠ হিসাব অসংখ্য;
কোন্ ফুটো খেতে ভাল, কোন্‌টা বা মন্দ,
কোন্ কোন্ ফাটলের কি রকম গন্ধ।
কাঠে কাঠে ঠুকে করে ঠকাঠক্ শব্দ,
বলে, "জানি কোন্ কাঠ কিসে হয় জব্দ।
কাঠকুটো ঘেঁটেঘুঁটে জানি আমি পষ্ট,
এ কাঠের বজ্জাতি কিসে হয় নষ্ট।
কোন্ কাঠ পোষ মানে, কোন্ কাঠ শান্ত,
কোন্ কাঠ টিম্ টিমে, কোন্‌টা বা জ্যান্ত।
কোন্ কাঠে জ্ঞান নাই মিথ্যা কি সত্য,
আমি জানি কোন্ কাঠে কেন থাকে গর্ত।"

গোঁফ চুরি

হেড্ আফিসের বড় বাবু লোকটি বড় শান্ত,
তার যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখন জান্ত?
দিব্যি ছিলেন খোশ্‌মেজাজে চেয়ারখানি চেপে,
একলা ব'সে ঝিম্‌ঝিমিয়ে হঠাৎ গেলেন খেপে!
আঁতকে উঠে হাত পা ছুঁড়ে চোখ্‌টি করে গোল,
হঠাৎ বলেন, "গেলুম গেলুম, আমায় ধরে তোল!"
তাই শুনে কেউ বদ্যি ডাকে, কেউ বা হাঁকে পুলিশ,
কেউ বা বলে, "কাম্‌ড়ে দেবে সাবধানেতে তুলিস্।"
ব্যস্ত সবাই এদিক ওদিক কর্‌ছে ঘোরাঘুরি—
বাবু হাঁকেন, "ওরে আমার গোঁফ গিয়েছে চুরি!"
গোঁফ হারান! আজব কথা! তাও কি হয় সত্যি?
গোঁফ জোড়া তো তেমনি আছে, কমেনি এক রত্তি।
সবাই তাঁরে বুঝিয়ে বলে, সাম্‌নে ধরে আয়না,
মোটেও গোঁফ হয়নি চুরি, কক্ষনো তা হয় না।
রেগে আগুন তেলে বেগুন, তেড়ে বলেন তিনি,
"কারো কথার ধার ধারিনে, সব ব্যাটাকেই চিনি।
"নোংরা ছাঁটা খ্যাংরা ঝাঁটা বিচ্ছিরি আর ময়লা,
"এমন গোঁফ তো রাখ্‌ত জানি শ্যাম বাবুদের গয়লা।
"এ গোঁফ যদি আমার বলিস কর্‌ব তোদের জবাই"—
এই না ব'লে জরিমানা কল্লেন তিনি সবায়।
ভীষণ রেগে বিষম খেয়ে দিলেন লিখে খাতায়—
"কাউকে বেশি লাই দিতে নেই, সবাই চড়ে মাথায়।
"আফিসের এই বাঁদরগুলো, মাথায় খালি গোবর,
"গোঁফ জোড়া যে কোথায় গেল কেউ রাখে না খবর।
"ইচ্ছে করে এই ব্যাটাদের গোঁফ ধরে খুব নাচি,
"মুখ্যুগুলোর মুণ্ডু ধ'রে কোদাল দিয়ে চাঁচি।
"গোঁফকে বলে তোমার আমার—গোঁফ কি কারো কেনা?
"গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।"
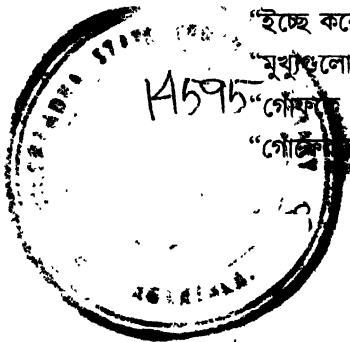
সৎ-পাত্র

শুনতে পেলুম পোস্তা গিয়ে—
তোমার নাকি মেয়ের বিয়ে?
গঙ্গারামকে পাত্র পেলে?
জানতে চাও সে কেমন ছেলে?—
মন্দ নয়, সে পাত্র ভাল—
রং যদিও বেজায় কালো;
তার উপরে মুখের গঠন
অনেকটা ঠিক প্যাঁচার মতন।
বিদ্যে বুদ্ধি? বলছি মশাই—
ধন্যি ছেলের অধ্যবসায়!
উনিশটি বার ম্যাট্রিকে সে
ঘায়েল হ'য়ে থামল শেষে।
বিষয় আশয়? গরীব বেজায়—
কষ্টে-সৃষ্টে দিন চলে যায়।

মানুষ তো নয় ভাইগুলো তার—
একটা পাগল একটা গোঁয়ার;
আরেকটি সে তৈরি ছেলে,
জাল ক'রে নোট্ গেছেন জেলে।
কনিষ্ঠটি তব্‌লা বাজায়
যাত্রাদলে পাঁচ টাকা পায়।
গঙ্গারাম তো কেবল ভোগে
পিলের জ্বর আর পাণ্ডু রোগে।
কিন্তু তারা উচ্চ ঘর,
কংসরাজের বংশধর!
শ্যাম লাহিড়ী বনগ্রামের
কি যেন হয় গঙ্গারামের।—
যাহোক্, এবার পাত্র পেলে,
এমন কি আর মন্দ ছেলে?

বাবুরাম সাপুড়ে

বাবুরাম সাপুড়ে,
কোথা যাস্ বাপু রে?
আয় বাবা দেখে যা,
দুটো সাপ রেখে যা!
যে সাপের চোখ্ নেই,
শিং নেই নোখ্ নেই,
ছোটে না কি হাঁটে না,
কাউকে যে কাটে না,
করে নাকো ফোঁস্ ফাঁস্,
মারে নাকো ঢুঁশ্ ঢাঁশ,
নেই কোন উৎপাত,
খায় শুধু দুধ ভাত—
সেই সাপ জ্যান্ত
গোটা দুই আন তো!
তেড়ে মেড়ে ডাণ্ডা
ক'রে দিই ঠাণ্ডা!

প্যাঁচা আর প্যাঁচানি

প্যাঁচা কয় প্যাঁচানি,
খাসা তোর চ্যাঁচানি!
শুনে শুনে আন্‌মন
নাচে মোর প্রাণমন!
মাজা-গলা চাঁচা সুর
আহ্লাদে ভরপুর!
গলা-চেরা ধমকে
গাছ পালা চমকে,
সুরে সুরে কত প্যাঁচ
গিট্‌কিরি ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্!
যত ভয় যত দুখ
দুরু দুরু ধুক্ ধুক্,
তোর গানে পেঁচি রে
সব ভুলে গেছি রে—
চাঁদমুখে মিঠে গান
শুনে ঝরে দু'নয়ান।

কাতুকুতু বুড়ো

আর যেখানে যাও না রে ভাই সপ্তসাগর পার,
কাতুকুতু বুড়োর কাছে যেও না খবরদার!
সর্বনেশে বৃদ্ধ সে ভাই যেও না তার বাড়ি—
কাতুকুতুর কুল্‌পি খেয়ে ছিঁড়বে পেটের নাড়ি।
কোথায় বাড়ী কেউ জানে না, কোন্ সড়কের মোড়ে,
একলা পেলে জোর ক'রে ভাই গল্প শোনায় প'ড়ে।
বিদ্‌ঘুটে তার গল্পগুলো না জানি কোন্ দেশি,
শুনলে পরে হাসির চেয়ে কান্না আসে বেশি!
না আছে তার মুণ্ডু মাথা, না আছে তার মানে,
তবুও তোমায় হাস্‌তে হবে তাকিয়ে বুড়োর পানে।
কেবল যদি গল্প বলে তাও থাকা যায় সয়ে,
গায়ের উপর সুড়সুড়ি দেয় লম্বা পালক লয়ে।
কেবল বলে, "হোঃ হোঃ হোঃ, কেষ্টদাসের পিসি—
বেচ্‌ত খালি কুম্‌ড়ো কচু হাঁসের ডিম আর তিসি।
ডিমগুলো সব লম্বা মতন, কুমড়োগুলো বাঁকা,
কচুর গায়ে রং-বেরঙের আল্‌পনা সব আঁকা।
অষ্ট প্রহর গাইত পিসি আওয়াজ ক'রে মিহি,
ম্যাও ম্যাও ম্যাও বাকুম্ বাকুম্ ভৌ ভৌ ভৌ চীঁহি।"
এই না বলে কুটুৎ ক'রে চিম্‌টি কাটে ঘাড়ে,
খ্যাংরা মতন আঙুল দিয়ে খোঁচায় পাঁজর হাড়ে।
তোমায় দিয়ে সুড়সুড়ি সে আপনি লুটোপুটি—
যতক্ষণ না হাস্‌বে তোমার কিচ্ছুতে নাই ছুটি।

শূন্য মাঝে ঘূর্ণা লেগে ডিগবাজি খায় পক্ষী,
সবাই হাঁকে, "আর না দাদা, গানটা থামাও লক্ষ্মী।"

গানের দাপে আকাশ কাঁপে দালান ফাটে বিলকুল,
ভীষ্মলোচন গাইছে ভীষণ খোশমেজাজে দিল খুল।

গানের গুঁতো

গান জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে ভীষ্মলোচন শর্মা—
আওয়াজখানা দিচ্ছে হানা দিল্লি থেকে বর্মা!
গাইছে ছেড়ে প্রাণের মায়া, গাইছে তেড়ে প্রাণপণ,
ছুট্‌ছে লোকে চারদিকেতে ঘুরছে মাথা ভন্ ভন্।

মর্‌ছে কত জখম হয়ে কর্‌ছে কত ছট্‌ ফট্—
বলছে হেঁকে. "প্রাণটা গেল, গানটা থামাও ঝট্ পট্।"
বাঁধন-ছেঁড়া মহিষ ঘোড়া পথের ধারে চিৎপাত;
ভীষ্মলোচন গাইছে তেড়ে নাইকো তাহে দৃক্‌পাত।

চার পা তুলি জন্তুগুলি পড়্‌ছে বেগে মূর্চ্ছায়,
লাঙ্গুল খাড়া পাগল পারা বল্‌ছে রেগে, "দূর ছাই।"
জলের প্রাণী অবাক মানি গভীর জলে চুপ চাপ,
গাছের বংশ হচ্ছে ধ্বংস পড়্‌ছে দেদার ঝুপ ঝাপ্।

শূন্য মাঝে ঘূর্ণা লেগে ডিগবাজি খায় পক্ষী,
সবাই হাঁকে, "আর না দাদা, গানটা থামাও লক্ষ্মী।"
গানের দাপে আকাশ কাঁপে দালান ফাটে বিল্‌কুল্,
ভীষ্মলোচন গাইছে ভীষণ খোশ্‌মেজাজে দিল্ খুল্।

এক যে ছিল পাগ্‌লা ছাগল, এম্‌নি সেটা ওস্তাদ,
গানের তালে শিং বাগিয়ে মারলে গুঁতো পশ্চাৎ।
আর কোথা যায় একটি কথায় গানের মাথায় ডাণ্ডা,
"বাপরে" ব'লে ভীষ্মলোচন এক্কেবারে ঠাণ্ডা।
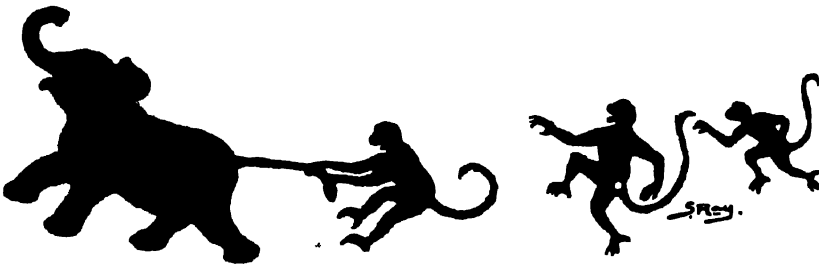
খুড়োর কল

কল করেছেন আজব রকম চণ্ডীদাসের খুড়ো—
সবাই শুনে সাবাস্ বলে পাড়ার ছেলে বুড়ো।
খুড়োর যখন অল্প বয়স—বছর খানেক হবে—
উঠ্‌ল কেঁদে "গুংগা" ব'লে ভীষণ অট্টরবে।
আর তো সবাই "মামা" "গাগা" আবোল তাবোল বকে
খুড়োর মুখে "গুংগা" শুনে চম্‌কে গেল লোকে।
বল্‌লে সবাই, "এই ছেলেটা বাঁচলে পরে তবে,
বুদ্ধি জোরে এ সংসারে একটা কিছু হবে।"
সেই খুড়ো আজ কল করেছেন আপন বুদ্ধি বলে,
পাঁচ ঘণ্টার রাস্তা যাবে দেড় ঘণ্টায় চ'লে।

দেখে এলাম কলটি অতি সহজ এবং সোজা,
ঘণ্টা পাঁচেক ঘাঁট্‌লে পরে আপনি যাবে বোঝা।
বল্‌ব কি আর কলের ফিকির, বল্‌তে না পাই ভাষা,
ঘাড়ের সঙ্গে যন্ত্র জুড়ে এক্কেবারে খাসা।
সামনে তাহার খাদ্য ঝোলে যার যে রকম রুচি—
মণ্ডা মিঠাই চপ্ কাট্‌লেট্ খাজা কিংবা লুচি।
মন বলে তায় "খাব খাব", মুখ চলে তায় খেতে,
মুখের সঙ্গে খাবার ছোটে পাল্লা দিয়ে মেতে।
এমনি ক'রে লোভের টানে খাবার পানে চেয়ে,
উৎসাহেতে হুঁস্ রবে না চলবে্ কেবল ধেয়ে।
হেসে খেলে দু'দশ যোজন চল্‌বে বিনা ক্লেশে,
খাবার গন্ধে পাগল হ'য়ে জিভের জলে ভেসে।
সবাই বলে সমস্বরে ছেলে জোয়ান বুড়ো,
অতুল কীর্তি রাখল ভবে চণ্ডীদাসের খুড়ো।

লড়াই-খ্যাপা

ওই আমাদের পাগ্‌লা জগাই, নিত্যি হেথায় আসে;
আপন মনে গুন্‌গুনিয়ে মুচ্‌কি হাসি হাসে।
চলতে গিয়ে হঠাৎ যেন থমক লেগে থামে,
তড়াক্ ক'রে লাফ দিয়ে যায় ডাইনে থেকে বামে।
ভীষণ রোখে হাত গুটিয়ে সামলে নিয়ে কোঁচা,
"এইয়ো" ব'লে খ্যাপার মতো শূন্যে মারে খোঁচা।
চেঁচিয়ে বলে, "ফাঁদ পেতেছ? জগাই কি তায় পড়ে?
সাত জার্মান, জগাই একা, তবুও জগাই লড়ে।"
উৎসাহেতে গরম হ'য়ে তিড়িং বিড়িং নাচে,
কখনও যায় সামনে তেড়ে, কখনও যায় পাছে।
এলোপাতাড়ি ছাতার বাড়ি ধুপুস্‌ধাপুস্ কত!
চক্ষু বুজে কায়দা খেলায় চর্‌কিবাজির মতো।
লাফের চোটে হাঁপিয়ে ওঠে গায়েতে ঘাম ঝরে,
দুড়ুম ক'রে মাটির পরে লম্বা হয়ে পড়ে।
হাত পা ছুঁড়ে চেঁচায় খালি চোখ্‌টি ক'রে ঘোলা,
"জগাই মোলো হঠাৎ খেয়ে কামানের এক গোলা।"
এই না ব'লে মিনিট খানেক ছট্‌ফটিয়ে খুব,
মড়ার মতো শক্ত হয়ে এক্কেবারে চুপ!
তারপরেতে সটান্ ব'সে চুল্‌কে খানিক মাথা,
পকেট থেকে বার করে তার হিসেব লেখার খাতা।
লিখ্‌ল তাতে—"শোন্‌রে জগাই, ভীষণ লড়াই হলো,
পাঁচ ব্যাটাকে খতম ক'রে জগাই দাদা মোলো।"

ছায়াবাজি

আজগুবি নয়, আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা—
ছায়ার সাথে কুস্তি ক'রে গাত্রে হল ব্যথা!
ছায়া ধরার ব্যবসা করি তাও জাননা বুঝি?
রোদের ছায়া, চাঁদের ছায়া, হরেক রকম পুঁজি!
শিশির ভেজা সদ্য ছায়া, সকাল বেলায় তাজা,
গ্রীষ্মকালের শুক্‌নো ছায়া ভীষণ রোদে ভাজা।
চিলগুলো যায় দুপুর বেলায় আকাশ পথে ঘুরে,
ফাঁদ ফেলে তার ছায়ার উপর খাঁচায় রাখি পুরে।
কাগের ছায়া বগের ছায়া দেখ্‌ছি কত ঘেঁটে—
হালকা মেঘের পান্‌সে ছায়া তাও দেখেছি চেটে।
কেউ জানে না এসব কথা কেউ বোঝে না কিছু,
কেউ ঘোরে না আমার মতো ছায়ার পিছু পিছু।
তোমরা ভাব গাছের ছায়া অম্‌নি লুটায় ভুঁয়ে,
অম্‌নি শুধু ঘুমায় বুঝি শান্ত মতন শুয়ে;
আসল ব্যাপার জান্‌বে যদি আমার কথা শোনো,
বল্‌ছি যা তা সত্যি কথা, সন্দেহ নাই কোন।
কেউ যবে তার রয়না কাছে, দেখ্‌তে নাহি পায়,
গাছের ছায়া ছট্‌ফটিয়ে এদিক ওদিক চায়।
সেই সময়ে গুড়গুড়িয়ে পিছন হ'তে এসে
ধামায় চেপে ধপাস্‌ করে ধর্‌বে তারে ঠেসে।
পাতলা ছায়া, ফোক্‌লা ছায়া, ছায়া গভীর কালো—
গাছের চেয়ে গাছের ছায়া সব রকমেই ভাল।
গাছ গাছালি শেকড় বাকল মিথ্যে সবাই গেলে,
বাপ্‌রে ব'লে পালায় ব্যামো ছায়ার ওষুধ খেলে।
নিমের ছায়া ঝিঙের ছায়া তিক্ত ছায়ার পাক,
যেই খাবে ভাই অঘোর ঘুমে ডাক্‌বে তাহার নাক্‌।
চাঁদের আলোয় পেঁপের ছায়া ধরতে যদি পারো,
শুঁক্‌লে পরে সর্দিকাশি থাকবে না আর কারো।
আম্‌ড়া গাছের নোংরা ছায়া কাম্‌ড়ে যদি খায়,
ল্যাংড়া লোকের ঠ্যাং গজাবে সন্দেহ নাই তায়।
আষাঢ় মাসের বাদ্‌লা দিনে বাঁচ্‌তে যদি চাও,
তেঁতুল তলার তপ্ত ছায়া হপ্তা তিনেক খাও।
মৌয়া গাছের মিষ্টি ছায়া 'ব্লটিং' দিয়ে শুষে,
ধুয়ে মুছে সাবধানেতে রাখ্‌ছি ঘরে পুষে!
পাক্কা নতুন টাট্‌কা ওষুধ এক্কেবারে দিশি—
দাম করেছি সস্তা বড়, চোদ্দ আনা শিশি।

কুম্‌ড়োপটাশ

(যদি) কুম্‌ড়োপটাশ নাচে—
খবরদার এসো না কেউ আস্তাবলের কাছে;
চাইবে নাকো ডাইনে বাঁয়ে চাইবে নাকো পাছে;
চার পা তুলে থাক্‌বে ঝুলে হট্টমূলার গাছে!

(যদি) কুম্‌ড়োপটাশ কাঁদে—
খবরদার! খবরদার! বস্‌বে না কেউ ছাদে;
উপুড় হয়ে মাচায় শুয়ে লেপ কম্বল কাঁধে,
বেহাগ সুরে গাইবে খালি 'রাধে কৃষ্ণ রাধে'!

(যদি) কুম্‌ড়োপটাশ হাসে—
থাক্‌বে খাড়া একটি ঠ্যাঙে রান্নাঘরের পাশে;
ঝাপ্‌সা গলায় ফারসি কবে নিঃশ্বাসে ফিস্‌ফাসে;
তিনটি বেলা উপোস্‌ ক'রে থাকবে শুয়ে ঘাসে!

(যদি) কুম্‌ড়োপটাশ ছোটে—
সবাই যেন তড়্‌বড়িয়ে জানলা বেয়ে ওঠে,
হুঁকোর জলে আলতা গুলে লাগায় গালে ঠোঁটে,
ভুলেও যেন আকাশ পানে তাকায় না কেউ মোটে!

(যদি) কুম্‌ড়োপটাশ ডাকে—
সবাই যেন শাম্‌লা এঁটে গামলা চ'ড়ে থাকে;
ছেঁচ্‌কি শাকের ঘণ্ট বেটে মাথায় মলম মাখে;
শক্ত ইঁটের তপ্ত ঝামা ঘষ্‌তে থাকে নাকে।

তুচ্ছ ভেবে এসব কথা করছে যারা হেলা,
কুম্‌ড়োপটাশ জান্‌তে পেলে বুঝ্‌বে তখন ঠেলা।
দেখবে তখন কোন্‌ কথাটি কেমন ক'রে ফলে,
আমায় তখন দোষ দিও না, আগেই রাখি ব'লে।

সাবধান!

আরে আরে, ওকি করো প্যালারাম বিশ্বাস?
ফোঁস্ ফোঁস্ অত জোরে ফেলোনাকো নিশ্বাস!
জানোনা কি সে বছর ওপাড়ার ভুতোনাথ,
নিশ্বাস নিতে গিয়ে হয়েছিল কুপোকাত?
হাঁপ ছাড়ো হ্যাঁস্‌ফ্যাঁস্ ও রকম হাঁ ক'রে—
মুখে যদি ঢুকে বসে পোকা মাছি মাকড়ে?
বিপিনের খুড়ো হয় বুড়ো সেই হল'রায়,
মাছি খেয়ে পাঁচমাস ভুগেছিল কলেরায়।
তাই বলি—সাবধান! ক'রোনাকো ধুপ্‌ধাপ্,
টিপি টিপি পায় পায় চ'লে যাও চুপ্ চাপ্।
চেয়োনাকো আগে পিছে, যেয়োনাকো ডাইনে—
সাবধানে বাঁচে লোকে,—এই লেখে আইনে।
পড়েছ তো কথামালা? কে যেন সে কি ক'রে
পথে যেতে প'ড়ে গেল পাতকোর ভিতরে?
ভাল কথা—আর যেন সকালে কি দুপুরে,
নেয়োনাকো কোন দিন ঘোষেদের পুকুরে;
এরকম মোটা দেহে কি যে হবে কোন্ দিন,
কথাটাকে ভেবে দেখ কি রকম সঙ্গিন!
চটো কেন? হয় নয় কেবা জানে পষ্ট,
যদি কিছু হ'য়ে পড়ে পাবে শেষে কষ্ট।
মিছিমিছি ঘ্যান্‌ঘ্যান্ কেন করো তক্ক?
শিখেছ জ্যাঠামো খালি, ইঁচড়েতে পক্ক;
মান্‌বে না কোন কথা চলা ফেরা আহারে,
একদিন টের পাবে ঠেলা কয় কাহারে।
রমেশের মেজ মামা সেও ছিল সেয়না,
যত বলি, ভাল কথা কানে কিছু নেয় না;—
শেষকালে একদিন চান্নির বাজারে
প'ড়ে গেল গাড়ি চাপা রাস্তার মাঝারে!

হাতুড়ে

একবার দেখে যাও ডাক্তারি কেরামত—
কাটা ছেঁড়া ভাঙা চেরা চট্ পট্ মেরামত।
কয়েছেন গুরু মোর, "শোন শোন বৎস,
কাগজের রোগী কেটে আগে করো মক্‌শো।"
উৎসাহে কি না হয়? কি না হয় চেষ্টায়?
অভ্যাসে চট্‌পট্ হাত পাকে শেষটায়।
খেটে খুটে জল হ'ল শরীরের রক্ত,—
শিখে দেখি বিদ্যেটা নয় কিছু শক্ত।
কাটা ছেঁড়া ঠুক্ ঠাক্, কত দেখ যন্ত্র,
ভেঙে চুরে জুড়ে দেই তারও জানি মন্ত্র।
চোখ বুজে চট্‌পট্ বড় বড় মূর্তি,
যত কাটি ঘ্যাঁস্ ঘ্যাঁস্ তত বাড়ে ফূর্তি।
ঠ্যাং-কাটা গলাকাটা কত কাটা হস্ত,
শিরীষের আঠা দিয়ে জুড়ে দেই চোস্ত।
এইবারে বলি তাই, রোগী চাই জ্যান্ত--
ওরে ভোলা, গোটাছয় রোগী ধ'রে আন তো!

গেঁটে বাতে ভুগে মরে ও পাড়ার নন্দী,
কিছুতেই সারাবে না এই তার ফন্দি,—
এক দিন এনে তারে এইখানে ভুলিয়ে,
গেঁটেবাত ঘেঁটে-ঘুঁটে সব দেব ঘুলিয়ে।
কার কানে কট্ কট্ কার নাকে সর্দি?
এসো, এসো, ভয় কিসে? আমি আছি বদ্যি।
শুয়ে কেরে? ঠ্যাং-ভাঙা? ধ'রে আন্ এখেনে,—
স্ক্রুপ্ দিয়ে এঁটে দিব কি রকম দেখে নে।
গাল ফোলা কাঁদো কেন? দাঁতে বুঝি বেদনা?
এসো এসো ঠুকে দেই—আর মিছে কেঁদো না
এই পাশে গোটাদুই, ওই পাশে তিনটে—
দাঁতগুলো টেনে দেখি—কোথা গেল চিম্‌টে?
ছেলে হও, বুড়ো হও, অন্ধ কি পঙ্গু,
মোর কাছে ভেদ নাই, কলেরা কি ডেঙ্গু—
কালাজ্বর, পালাজ্বর, পুরানো কি টাট্‌কা,
হাতুড়ির এক ঘায়ে একেবারে আট্‌কা!

অবাক কাণ্ড!

শুন্‌ছ দাদা! ওই যে হোথায় বদ্যি বুড়ো থাকে,
সে নাকি রোজ খাবার সময় হাত দিয়ে ভাত মাখে?
শুন্‌ছি নাকি খিদেও পায় সারাদিন না খেলে?
চক্ষু নাকি আপনি বোজে ঘুমটি তেমন পেলে?
চল্‌তে গেলে ঠ্যাং নাকি তার ভুঁয়ের 'পরে ঠেকে?
কান দিয়ে সব শোনে নাকি? চোখ দিয়ে সব দেখে?
শোয় নাকি সে মুণ্ডুটাকে শিয়র পানে দিয়ে?
হয় না কি হয় সত্যি মিথ্যা চল্ না দেখি গিয়ে!

চোরধরা

আরে ছি ছি! রাম রাম! ব'লো না হে ব'লো না—
চল্‌ছে যা জুয়াচুরি, নাহি তার তুলনা।
যেই আমি দেই ঘুম টিফিনের আগেতে,
ভয়ানক ক'মে যায় খাবারের ভাগেতে!
রোজ দেখি খেয়ে গেছে, জানিনেকো কারা সে—
কাল্‌কে যা হ'য়ে গেল ডাকাতির বাড়া সে!
পাঁচখানা কাট্‌লেট্‌, লুচি তিন গণ্ডা,
গোটা দুই জিবে গজা, গুটি দুই মণ্ডা,
আরো কত ছিল পাতে আলুভাজা ঘুঙ্‌নি—
ঘুম থেকে উঠে দেখি পাতখানা শূন্যি!
তাই আজ খেপে গেছি—কত আর পার্‌ব?
এতদিন স'য়ে স'য়ে এইবারে মার্‌ব।
খাড়া আছি সারাদিন হুঁশিয়ার পাহারা,
দেখে নেব রোজ রোজ খেয়ে যায় কাহারা।
রামু হও, দামু হও, ওপাড়ার ঘোষ বোস—
যেই হও এইবারে থেমে যাবে ফোঁস্‌ ফোঁস্‌।
খাট্‌বে না জারি জুরি আঁট্‌বে না মার্‌প্যাঁচ্‌,
যারে পাব ঘাড়ে ধ'রে কেটে দেব ঘ্যাঁচ্‌ ঘ্যাঁচ্‌।
এই দেখ ঢাল নিয়ে খাড়া আছি আড়ালে,
এইবারে টের পাবে মুণ্ডুটা বাড়ালে।
রোজ বলি 'সাবধান!' কানে তবু যায় না?
ঠেলাখানা বুঝ্‌বি তো এইবারে আয় না!

কিম্ভূত!

বিদ্‌ঘুটে জানোয়ার কিমাকার কিম্ভূত,
সারাদিন ধ'রে তার শুনি শুধু খুঁত খুঁত।
মাঠপারে ঘাটপারে কেঁদে মরে খালি সে,
ঘ্যান্ ঘ্যান্ আব্‌দারে ঘন ঘন নালিশে।
এটা চাই সেটা চাই কত তার বায়না—
কি যে চায় তাও ছাই বোঝা কিছু যায় না।
কোকিলের মতো তার কণ্ঠেতে সুর চাই,
গলা শুনে আপনার বলে, "উহুঁ, দূর ছাই!"
আকাশেতে উড়ে যেতে পাখিদের মানা নেই—
তাই দেখে মরে কেঁদে— তার কেন ডানা নেই!
হাতিটার কি বাহার দাঁতে আর শুণ্ডে—
ও রকম জুড়ে তার দিতে হবে মুণ্ডে!
কাঙ্গারুর লাফ দেখে ভারি তার হিংসে—
ঠ্যাং চাই আজ থেকে ঢ্যাংঢেঙে চিম্‌সে!
সিংহের কেশরের মত তার তেজ কই?
পিছে খাসা গোসাপের খাঁজকাটা লেজ কই?
একলা সে সব হ'লে মেটে তার প্যাখ্‌না;
যারে পায় তারে বলে, "মোর দশা দেখ্‌না!"
কেঁদে কেঁদে শেষটায়— আষাঢ়ের বাইশে,
হ'ল বিনা চেষ্টায় যা চেয়েছে তাই সে।

ভুলে গিয়ে কাঁদাকাটি
চুপি চুপি একলাটি
লাফ দিয়ে হুশ্ ক'রে
কলাগাছ খেলে পরে
ভোঁতামুখে কুহুডাক
এই দেহে শুঁড়ো নাক
"বুড়ো হাতি ওড়ে" ব'লে
কান টেনে ল্যাজ ম'লে
কেউ যদি তেড়ে মেড়ে
"কোথাকার তুই কেরে,
জবাব কি দেবে ছাই,
কাঁচুমাচু ব'সে তাই,
"নই ঘোড়া, নই হাতি,
মৌমাছি প্রজাপতি
মাছ ব্যাং গাছপাতা
নই জুতা নই ছাতা

আহ্লাদে আবেশে
ব'সে ব'সে ভাবে সে—
হাতি কভু নাচে কি?
কাঙ্গারুটা বাঁচে কি?
শুনে লোকে কবে কি?
খাপছাড়া হবে কি?
কেউ যদি গালি দেয়?
"দুয়ো" ব'লে তালি দেয়?
বলে তার সাম্‌নেই—
নাম নেই ধাম নেই?"
আছে কিছু বল্‌বার?
মনে শুধু তোল্‌পাড়—
নই সাপ বিচ্ছু,
নই আমি কিচ্ছু।
জল মাটি ঢেউ নই,
আমি তবে কেউ নই!"

ভাল রে ভাল!

দাদা গো! দেখ্‌ছি ভেবে অনেক দূর—
এই দুনিয়ার সকল ভাল,
আসল ভাল নকল ভাল,
সস্তা ভাল দামিও ভাল,
তুমিও ভাল আমিও ভাল,
হেথায় গানের ছন্দ ভাল,
হোথায় ফুলের গন্ধ ভাল,
মেঘ-মাখানো আকাশ ভাল,
ঢেউ-জাগানো বাতাস ভাল,
গ্রীষ্ম ভাল বর্ষা ভাল,
ময়লা ভাল ফর্‌সা ভাল,
পোলাও ভাল কোর্মা ভাল,

মাছপটোলের দোল্‌মা ভাল,
কাঁচাও ভাল পাকাও ভাল,
সোজাও ভাল বাঁকাও ভাল,
কাঁসিও ভাল ঢাক্‌ও ভাল,
টিকিও ভাল টাক্‌ও ভাল,
ঠেলার গাড়ি ঠেল্‌তে ভাল,
খাস্তা লুচি বেল্‌তে ভাল,
গিট্‌কিরি গান শুন্‌তে ভাল,
শিমুল তুলো ধুন্‌তে ভাল,
ঠাণ্ডা জলে নাইতে ভাল,
কিন্তু সবার চাইতে ভাল—
—পাউরুটি আর ঝোলা গুড়।

নেড়া বেলতলায় যায় ক'বার?

রোদে রাঙা ইঁটের পাঁজা
তার উপরে বস্‌ল রাজা—
ঠোঙাভরা বাদাম ভাজা
খাচ্ছে কিন্তু গিল্‌ছে না।
গায়ে আঁটা গরম জামা
পুড়ে পিঠ হচ্ছে ঝামা;
রাজা বলে, "বৃষ্টি নামা—
নইলে কিচ্ছু মিল্‌ছে না।"
থাকে সারা দুপুর ধ'রে
ব'সে ব'সে চুপটি ক'রে,
হাঁড়িপানা মুখটি ক'রে
আঁক্‌ড়ে ধ'রে শ্লেটটুকু;
ঘেমে ঘেমে উঠছে ভিজে
ভ্যাবাচ্যাকা একলা নিজে,
হিজিবিজি লিখ্‌ছে কি যে
বুঝ্‌ছে না কেউ একটুকু।
ঝাঁ-ঝাঁ রোদ আকাশ জুড়ে,
মাথাটার ঝাঁঝ্‌রা ফুঁড়ে,
মগজেতে নাচ্‌ছে ঘুরে
রক্তগুলো ঝনর্ ঝন্;
ঠাঠা-পড়া দুপুর দিনে,
রাজা বলে, "আর বাঁচিনে,
ছুটে আন্ বরফ কিনে—
ক'চ্ছে কেমন গা ছন্‌ছন্।"
সবে বলে, "হায় কি হল!
রাজা বুঝি ভেবেই মোলো!
ওগো রাজা মুখটি খোল—
কওনা ইহার কারণ কি?
রাঙামুখ পান্‌সে যেন
তেলে ভাজা আম্‌সি হেন,
রাজা এত ঘাম্‌ছে কেন—
শুনতে মোদের বারণ কি?"
রাজা বলে, "কেইবা শোনে
যে কথাটা ঘুর্‌ছে মনে,
মগজের নানান্ কোণে—
আন্‌ছি টেনে বাইরে তায়,

সে কথাটা বলছি শোন,
নাহি তার জবাব কোন
লেখা আছে পুঁথির পাতে,
নাহি কোন সন্ধ' তাতে—
এ কথাটা অ্যাদ্দিনেও
লেখে নিকো পুস্তকেও,
লাখোবার যায় যদি সে
ভেবে তাই পাইনে দিশে
একথাটা যেম্নি বলা
টিপ্ ক'রে বাড়িয়ে গলা
হেসে বলে, "আজ্ঞে সে কি?
নেড়াকে তো নিত্যি দেখি
আমাদেরি বেলতলা সে
হরে দরে হয়তো মাসে

যতই ভাব যতই গোন,
কূলকিনারা নাই রে হায়!
'নেড়া যায় বেলতলাতে',
কিন্তু প্রশ্ন 'ক'বার যায়?'
পারে নিকো বুঝ্তে কেও,
দিচ্ছে না কেউ জবাব তায়।
যাওয়া তার ঠেকায় কিসে?
নাই কি কিচ্ছু উপায় তার?"
রোগা এক ভিস্তিও'লা
প্রণাম কর্‌ল দু'পায় তাঁর।
এতে আর গোল হবে কি?
আপন চোখে পরিষ্কার—
নেড়া সেথা খেল্‌তে আসে
নিদেন পক্ষে পাঁচিশ বার।"

শব্দ কল্প দ্রুম্!

ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম্ দ্রাম্ শুনে লাগে খট্‌কা—
ফুল ফোটে? তাই বল! আমি ভাবি পট্‌কা!
শাঁই শাঁই পন্‌পন্, ভয়ে কান্ বন্ধ—
ওই বুঝি ছুটে যায় সে-ফুলের গন্ধ?
হুড়মুড় ধুপ্‌ধাপ্—ওকি শুনি ভাই রে!
দেখ্‌ছ না হিম পড়ে—যেওনাকো বাইরে।
চুপ্ চুপ্ ওই শোন্! ঝুপ্ ঝাপ্ ঝপা—স্!
চাঁদ বুঝি ডুবে গেল?—গব্ গব্ গবা—স্!

খ্যাঁশ্ খ্যাঁশ্ ঘ্যাঁচ্ ঘ্যাঁচ্, রাত কাটে ওইরে!
দুড়্ দাড়্ চুরমার—ঘুম ভাঙে কই রে!
ঘর্ঘর ভন্‌ভন্ ঘোরে কত চিন্তা!
কত মন নাচে শোন্—ধেই ধেই ধিন্‌তা!
ঠুং ঠাং ঢং ঢং, কত ব্যথা বাজে রে—
ফট্ ফট্ বুক ফাটে তাই মাঝে মাঝে রে!
হই হই মার্ মার্, 'বাপ্ বাপ্' চিৎকার—
মাল কোঁচা মারে বুঝি? সরে পড়্ এইবার।

বুঝিয়ে বলা

ও শ্যামাদাস! আয়তো দেখি, বোস তো দেখি এখেনে,
সেই কথাটা বুঝিয়ে দেব পাঁচ মিনিটে, দেখেনে।
জ্বর হয়েছে? মিথ্যে কথা! ওসব তোদের চালাকি—
এই যে বাবা চেঁচাচ্ছিলে, শুনতে পাইনি? কালা কি?
মামার ব্যামো? বদ্যি ডাক্‌বি? ডাকিস্‌ না হয় বিকেলে;
না হয় আমি বাৎলে দেব বাঁচ্‌বে মামা কি খেলে।
আজকে তোকে সেই কথাটা বোঝাবই বোঝাব,—
না বুঝ্‌বি ত মগজে তোর গজাল মেরে গোঁজাব।
কোন্‌ কথাটা? তাও ভুলেছিস্‌? ছেড়ে দিছিস্‌ হাওয়াতে?
কি বলছিলেম পরশু রাতে বিষ্টু বোসের দাওয়াতে?
ভুলিস্‌নিত বেশ করেছিস্‌, আবার শুনলে ক্ষেতি কি?
বড় যে তুই পালিয়ে বেড়াস্‌, মাড়াস্‌নে যে এদিক্‌ই!
বলছি দাঁড়া, ব্যস্ত কেন? বোস্‌ তাহলে নীচুতেই—
আজকালের এই ছোক্‌রাগুলোর তর্‌ সয়না কিছুতেই।
আবার দেখ! বসলি কেন? বইগুলো আন্‌ নামিয়ে—
তুই থাকতে মুটের বোঝা বইতে যাব আমি এ?
সাবধানে আন্‌, ধরছি দাঁড়া—সেই আমাকেই ঘামালি,—
এই খেয়েছে! কোন্‌ আক্কেলে শব্দকোষটা নামালি?
ঢের হয়েছে! আয় দেখি তুই বোস্‌ তো দেখি এদিকে—
ওরে গোপাল গোটাকয়েক পান দিতে বল্‌ খেঁদিকে।—

বলছিলাম কি, বস্তুপিণ্ড সূক্ষ্ম হতে স্থূলেতে,
অর্থাৎ কিনা লাগ্‌ছে ঠেলা পঞ্চভূতের মূলেতে,—
গোড়ায় তবে দেখ্‌তে হবে কোত্থেকে আর কি ক'রে,
রস জমে এই 'প্রপঞ্চময় বিশ্বতরুর শিকড়ে।
অর্থাৎ কিনা, এই মনে কর্ রোদ পড়েছে ঘাসেতে,
এই মনে কর্, চাঁদের আলো পড়লো তারি পাশেতে—
আবার দেখ! এরই মধ্যে হাই তোলবার মানে কি?
আকাশপানে তাকাস্ খালি, যাচ্ছে কথা কানে কি?
কি বল্লি তুই? এ সব শুধু আবোল তাবোল বকুনি?
বুঝতে হলে মগজ লাগে, ব'লেছিলাম তখুনি।
মগজভরা গোবর তোদের হচ্ছে ঘুঁটে শুকিয়ে,
যায় কি দেওয়া কোন কথা তার ভিতরে ঢুকিয়ে?—
ও শ্যামাদাস! উঠলি কেন? কেবল যে চাস্ পালাতে!
না শুনবি ত মিথ্যে সবাই আসিস্ কেন জ্বালাতে?
তত্ত্বকথা যায় না কানে যতই মরি চেঁচিয়ে—
ইচ্ছে করে ডানপিটেদের কান ম'লে দি পেঁচিয়ে।
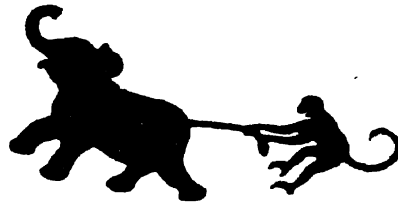
কহ ভাই কহ রে, অ্যাঁকা চোরা শহরে,
বদ্যিরা কেন কেউ আলুভাতে খায় না!
লেখা আছে কাগজে, আলু খেলে মগজে,
ঘিলু যায় ভেস্তিয়ে বুদ্ধি গজায় না।

শুনেছ কি ব'লে গেল সীতানাথ বন্দ্যো?
আকাশের গায়ে নাকি টকটক গন্ধ?
টকটক থাকে নাকো হ'লে পরে বৃষ্টি—
তখন দেখেছি চেটে একেবারে মিষ্টি।

বুড়ির বাড়ি

গালভরা হাসিমুখে চালভাজা মুড়ি,
ঝুরঝুরে প'ড়ো ঘরে থুর্‌থুরে বুড়ী।
কাঁথাভরা ঝুল্‌কালি, মাথাভরা ধুলো,
মিট্‌মিটে ঘোলা চোখ, পিঠখানা কুলো।
কাঁটা দিয়ে আঁটা ঘর—আঠা দিয়ে সেঁটে,
সুতো দিয়ে বেঁধে রাখে থুতু দিয়ে চেটে।
ভর দিতে ভয় হয় ঘর বুঝি পড়ে,
খক্‌খক্ কাশি দিলে ঠক্‌ঠক্ নড়ে।

ডাকে যদি ফিরিওয়ালা, হাঁকে যদি গাড়ি,
খসে পড়ে কড়িকাঠ ধসে পড়ে বাড়ী।
বাঁকাচোরা ঘরদোর ফাঁকা ফাঁকা কত,
ঝাঁট্ দিলে ঝ'রে পড়ে কাঠকুটো যত।
ছাদগুলো ঝুলে পড়ে বাদ্‌লায় ভিজে,
একা বুড়ি কাঠি গুঁজে ঠেকা দেয় নিজে।
মেরামত দিনরাত কেরামত ভারি,
থুর্‌থুরে বুড়ি তার ঝুর্‌ঝুরে বাড়ী।
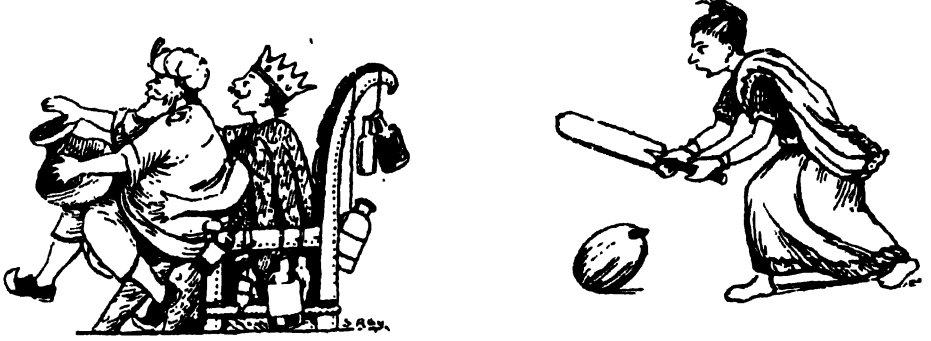
বোম্বাগড়ের রাজা

কেউ কি জান সদাই কেন বোম্বাগড়ের রাজা—
ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ত্ব ভাজা?
রানীর মাথায় অষ্টপ্রহর কেন বালিশ বাঁধা?
পাঁউরুটিতে পেরেক ঠোকে কেন রানীর দাদা?
কেন সেথায় সর্দি হ'লে ডিগ্‌বাজি খায় লোকে?
জোছ্‌না রাতে সবাই কেন আলতা মাখায় চোখে?
ওস্তাদেরা লেপ মুড়ি দেয় কেন মাথায় ঘাড়ে?
টাকের 'পরে পণ্ডিতেরা ডাকের টিকিট মারে?
রাত্রে কেন ট্যাক্‌ঘড়িটা ডুবিয়ে রাখে ঘিয়ে?
কেন রাজার বিছ্‌না পাতে শিরীশ কাগজ দিয়ে?
সভায় কেন চেঁচায় রাজা "হুক্কা হুয়া" ব'লে?
মন্ত্রী কেন কল্‌সি বাজায় ব'সে রাজার কোলে?
সিংহাসনে ঝোলায় কেন ভাঙা বোতল শিশি?
কুমড়ো দিয়ে ক্রিকেট খেলে কেন রাজার পিসী?
রাজার খুড়ো নাচেন কেন হুঁকোর মালা প'রে?
এমন কেন ঘট্‌ছে তা কেউ বলতে পার মোরে?

একুশে আইন
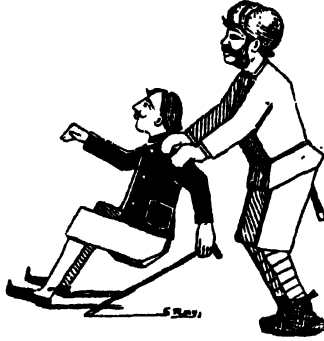
শিবঠাকুরের আপন দেশে,
আইন কানুন সর্বনেশে!
কেউ যদি যায় পিছ্‌লে প'ড়ে,
প্যায়দা এসে পাক্‌ড়ে ধরে,
কাজির কাছে হয় বিচার—
একুশ টাকা দণ্ড তার॥

সেথায় সন্ধ্যে ছ'টার আগে,
হাঁচতে হ'লে টিকিট লাগে—
হাঁচ্‌লে পরে বিন্‌ টিকিটে—
দম্‌দমাদম্‌ লাগায় পিঠে,
কোটাল এসে নস্যি ঝাড়ে—
একুশ দফা হাঁচিয়ে মারে॥

কারুর যদি দাঁতটি নড়ে,
চার্‌টি টাকা মাশুল ধরে,
কারুর যদি গোঁফ গজায়,
একশো আনা ট্যাক্‌স চায়,—
খুঁচিয়ে পিঠে গুঁজিয়ে ঘাড়,
সেলাম ঠোকায় একুশ বার॥

চল্‌তে গিয়ে কেউ যদি চায়,
এদিক্‌ ওদিক্‌ ডাইনে বাঁয়,
রাজার কাছে খবর ছোটে,
পল্টনেরা লাফিয়ে ওঠে,
দুপুর রোদে ঘামিয়ে তায়,
একুশ হাতা জল গেলায়॥

যে সব লোকে পদ্য লেখে,
তাদের ধ'রে খাঁচায় রেখে,
কানের কাছে নানান্‌ সুরে,
নামতা শোনায় একশো উড়ে,
সামনে রেখে মুদির খাতা,
হিসেব কষায় একুশ পাতা॥

হঠাৎ সেথায় রাত দুপুরে,
নাক ডাকালে ঘুমের ঘোরে,
অম্‌নি তেড়ে মাথায় ঘষে
গোবর গুলে বেলের কষে,
একুশটি পাক ঘুরিয়ে তাকে,
একুশ ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখে॥

শোন শোন গল্প শোন, এক যে ছিল গুরু,
এই আমার গল্প হল শুরু।
যদু আর বংশীধর যমজ ভাই তারা,
এই আমার গল্প হল সারা।

হুঁকোমুখো হ্যাংলা

হুঁকোমুখো হ্যাংলা বাড়ি তার বাংলা
মুখে তার হাসি নাই, দেখেছ?
নাই তার মানে কি? কেউ তাহা জানে কি?
কেউ কভু তার কাছে থেকেছ?
শ্যামাদাস মামা তার আফিঙের থানাদার,
আর তার কেহ নাই এছাড়া—
তাই বুঝি একা সে মুখখানা ফ্যাকাশে,
ব'সে আছে কাঁদ কাঁদ বেচারা?
থপ্ থপ্ পায়ে সে নাচ্‌ত যে আয়েসে,
গালভরা ছিল তার ফূর্তি,
গাইত সে সারাদিন 'সারে গামা টিম্‌টিম্',
আহ্লাদে গদ-গদ মূর্তি!
এই ত সে দুপ'রে ব'সে ওই উপরে,
খাচ্ছিল কাঁচকলা চট্‌কে—
এর মাঝে হল কি? মামা তার মোলো কি?
অথবা কি ঠ্যাং গেল মটকে?
হুঁকোমুখো হেঁকে কয়, "আরে দূর, তা তো নয়,
দেখ্‌ছ না কি রকম চিন্তা?
মাছি মারা ফন্দি এ যত ভাবি মন দিয়ে—
ভেবে ভেবে কেটে যায় দিনটা।
বসে যদি ডাইনে,— লেখে মোর আইনে—
এই ল্যাজে মাছি মারি ত্রস্ত;
বামে যদি বসে তাও নহি আমি পিছপাও,
এই ল্যাজে আছে তার অস্ত্র!
যদি দেখি কোন পাজি বসে ঠিক মাঝামাঝি,
কি যে করি ভেবে নাহি পাই রে—
ভেবে দেখ্ একি দায়, কোন্ ল্যাজে মারি তায়,
দুটি বই ল্যাজ মোর নাই রে!"

দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্

ছুট্‌ছে মোটর্ ঘটর্ ঘটর্ ছুট্‌ছে গাড়ি জুড়ি;
ছুট্‌ছে লোকে নানান্ ঝোঁকে কর্‌ছে হুড়োহুড়ি;
ছুট্‌ছে কত খ্যাপার মতো পড়্‌ছে কত চাপা—
সাহেব মেমে থম্‌কে থেমে বল্‌ছে, "মামা! পাপা!"
—আমরা তবু তবলা ঠুকে গাচ্ছি কেমন তেড়ে,
"দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্! দেড়ে দেড়ে দেড়ে!"

বর্ষাকালের বৃষ্টিবাদল রাস্তা জুড়ে কাদা,
ঠাণ্ডা রাতে সর্দিবাতে মরবি কেন দাদা?
হোক্ না সকাল হোক্ না বিকাল হোক্ না দুপুর বেলা,
থাক্ না তোমার আপিস যাওয়া থাক্ না কাজের ঠেলা!
এই দেখ না চাঁদ্‌নি রাতের গান এনেছি কেড়ে,
"দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্! দেড়ে দেড়ে দেড়ে!"

মুখ্যু যারা হচ্ছে সারা পড়ছে ব'সে একা,
কেউ বা দেখ কাঁচুর মাচুর কেউ বা ভ্যাবাচ্যাকা:
কেউ বা ভেবে হদ্দ হল, মুখটি যেন কালি;
কেউ বা ব'সে বোকার মতো মুণ্ডু নাড়ে খালি।
তার চেয়ে ভাই, ভাবনা ভুলে গাও না গলা ছেড়ে,
"দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্! দেড়ে দেড়ে দেড়ে!"

বেজার হয়ে যে যার মতো করছ সময় নষ্ট—
হাঁটছ কত খাটছ কত পাচ্ছ কত কষ্ট!
আসল কথা বুঝছ না যে, করছ না যে চিন্তা,
শুনছ না যে গানের মাঝে তব্‌লা বাজে ধিন্‌তা?
পাল্লা ধ'রে গায়ের জোরে গিট্‌কিরি দাও ঝেড়ে,
"দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্! দেড়ে দেড়ে দেড়ে!"

ডানপিটে

বাপরে কি ডানপিটে ছেলে!—
শিলনোড়া খেতে চায় দুধভাত ফেলে!
একটার দাঁত নেই, জিভ দিয়ে ঘ'ষে,
এক মনে মোমবাতি দেশলাই চোষে!
আরজন ঘরময় নীল কালি গুলে,
কপ্ কপ্ মাছি ধ'রে মুখে দেয় তুলে!

বাপ্‌রে কি ডানপিটে ছেলে!—
কোন্ দিন ফাঁসি যাবে নয় যাবে জেলে।
একটা সে ভূত সেজে আঠা মেখে মুখে,
ঠাঁই ঠাঁই শিশি ভাঙে শ্লেট দিয়ে ঠুকে!
অন্যটা হামা দিয়ে আলমারি চড়ে,
খাট থেকে রাগ ক'রে দুম্‌দাম্ পড়ে!

বাপরে কি ডানপিটে ছেলে!—
খুন হ'ত টম্ চাচা ওই রুটি খেলে!
সন্দেহে শুঁকে বুড়ো মুখে নাহি তোলে,
রেগে তাই দুই ভাই ফোঁস্ ফোঁস্ ফোলে!
নেড়াচুল খাড়া হয়ে রাঙা হয় রাগে,
বাপ্ বাপ্ ব'লে চাচা লাফ দিয়ে ভাগে।

গল্প বলা

"এক যে রাজা"—"থাম্ না দাদা,
রাজা নয় সে, রাজ পেয়াদা।"
"তার যে মাতুল"—"মাতুল কি সে?
সবাই জানে সে তার পিসে।"
"তার ছিল এক ছাগল ছানা"—
"ছাগলের কি গজায় ডানা?"
"একদিন তার ছাতের 'পরে"—
"ছাত কোথা হে টিনের ঘরে?"
"বাগানের এক উড়ে মালি"—
"মালি নয় তো! মেহের আলি"—
"মনের সাধে গাইছে বেহাগ"—
"বেহাগ তো নয়? বসন্ত রাগ।"

"থও না বাপু ঘ্যাঁচা ঘেঁচি"—
"আচ্ছা বল চুপ্ করেছি।"
"এমন সময় বিছ্‌না ছেড়ে,
হঠাৎ মামা আস্‌ল তেড়ে,
ধরল সে তার ঝুঁটির গোড়া"—
"কোথায় ঝুঁটি? টাক যে ভরা।"
"হোক না টেকো তোর তাতে কি?
লক্ষ্মীছাড়া মুখ্যু ঢেঁকি!
ধর্‌ব ঠেসে টুঁটির 'পরে,
পিট্‌ব তোমার মুণ্ডু ধ'রে—
কথার উপর কেবল কথা,
এখন বাপু পালাও কোথা?"

নারদ! নারদ!

'হ্যাঁরে হ্যাঁরে তুই নাকি কাল সাদাকে বল্‌ছিলি লাল?
(আর) সেদিন নাকি রাত্রি জুড়ে নাক ডেকেছিস্‌ বিশ্রী সুরে?
(আর) তোদের পোষা বেড়ালগুলো শুনছি নাকি বেজায় হুলো?
(আর) এই যে শুনি তোদের বাড়ি কেউ নাকি রাখে না দাড়ি?
'ক্যান্‌ রে ব্যাটা ইস্টুপিড? ঠেঙিয়ে তোরে কর্‌ব ঢিট্‌!"
"চোপরাও তুম্‌ স্পিক্‌টি নট্‌, মার্‌ব রেগে পটাপট্‌—
ফের যদি ট্যারাবি চোখ কিম্বা আবার কর্‌বি রোখ,
কিম্বা যদি অম্‌নি ক'রে মিথ্যেমিথ্যি চ্যাঁচাস্‌ জোরে—
আই ডোন্ট কেয়ার্‌ কানাকড়ি— জানিস্‌ আমি স্যাণ্ডো করি?"
"ফের লাফাচ্ছিস্‌! অল্‌রাইট্‌ কামেন্‌ ফাইট্‌! কামেন্‌ ফাইট্‌!"
'ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি, টেরটা পাবে আজ এখনি!
আজকে যদি থাক্‌ত মামা পিটিয়ে তোমায় কর্‌ত ঝামা।
—আরে! আরে! মার্‌বি নাকি? দাঁড়া একটা পুলিশ ডাকি!
হাঁহাঁহাঁহাঁ! রাগ ক'রো না, কর্‌তে চাও কি তাই বল না?"
'হ্যাঁ হ্যাঁ তাতো সত্যি বটেই আমি তো চটিনি মোটেই!
মিথ্যে কেন লড়তে যাবি? ভেরি-ভেরি সরি, মশলা খাবি?
'শেক্‌হ্যান্ড' আর 'দাদা' বল সব শোধ বোধ ঘরে চল।
ডোন্ট পরোয়া অল্‌রাইট্‌ হাউ ডুয়ুডু গুড্‌ নাইট্‌।"

ভূতুড়ে খেলা

পরশু রাতে পষ্ট চোখে দেখ্‌নু বিনা চশমাতে,
পান্তভূতের জ্যান্ত ছানা করছে খেলা জোছ্‌নাতে।
কচ্ছে খেলা মায়ের কোলে হাত পা নেড়ে উল্লাসে,
আহ্লাদেতে ধুপ্‌ধুপিয়ে কচ্ছে কেমন হল্লা সে।
শুন্‌তে পেলাম ভূতের মায়ের মুচ্‌কি হাসি কট্‌কটে—
দেখছে নেড়ে ঝুন্টি ধ'রে বাচ্চা কেমন চট্‌পটে।
উঠছে তাদের হাসির হানা কাষ্ঠ সুরে ডাক্‌ ছেড়ে,
খ্যাঁশ্‌ খ্যাঁশানি শব্দে যেমন করাত দিয়ে কাঠ চেরে।
যেমন খুশি মার্‌ছে ঘুঁষি, দিচ্ছে ক'ষে কানমলা,
আদর ক'রে আছাড় মেরে শূন্যে ঝোলে চ্যাং দোলা।
বল্‌ছে আবার, "আয়রে আমার নোংরামুখো সুঁট্‌কো রে,
দেখ্‌না ফিরে প্যাখ্‌না ধরে হুতোম-হাসি মুখ ক'রে!
ওরে আমার বাঁদর-নাচন আদর-গেলা কোঁতকা রে,
অন্ধবনের গন্ধ-গোকুল, ওরে আমার হোঁতকা রে!
ওরে আমার বাদলা রোদে জষ্ঠি মাসের বিষ্টি রে,
ওরে আমার হামান ছেঁচা যষ্টিমধুর মিষ্টি রে।
ওরে আমার রান্না হাঁড়ির কান্না হাসির ফোড়নদার,
ওরে আমার জোছ্‌না হাওয়ার স্বপ্নঘোড়ার চড়নদার।
ওরে আমার গোব্‌রাগণেশ ময়দাঠাসা নাদুস্‌ রে,
ছিঁচকাঁদুনে ফোক্‌লা মানিক, ফের যদি তুই কাঁদিস্‌ রে—"
এই না ব'লে যেই মেরেছে কাদার চাপ্‌টি ফট ক'রে,
কোথায় বা কি, ভূতের ফাঁকি—মিলিয়ে গেল চট্‌ ক'রে!

রামগরুড়ের ছানা

রামগরুড়ের ছানা হাসতে তাদের মানা,
হাসির কথা শুনলে বলে,
"হাস্‌ব না-না, না-না!"
সদাই মরে ত্রাসে— ঐ বুঝি কেউ হাসে!
এক চোখে তাই মিট্‌মিটিয়ে
তাকায় আশে পাশে।
ঘুম নাহি তার চোখে আপনি ব'কে ব'কে
আপনারে কয়, "হাসিস্‌ যদি
মারব কিন্তু তোকে।"
যায় না বনের কাছে, কিম্বা গাছে গাছে,
দখিন হাওয়ার সুড়্‌সুড়িতে
হাসিয়ে ফেলে পাছে!
সোয়াস্তি নেই মনে— মেঘের কোণে কোণে
হাসির বাষ্প উঠ্‌ছে ফেঁপে,
কান পেতে তাই শোনে।
ঝোপের ধারে ধারে রাতের অন্ধকারে
জোনাক্‌ জ্বলে আলোর তালে
হাসির ঠারে ঠারে।
হাসতে হাসতে যারা হচ্ছে কেবল সারা,
রামগরুড়ের লাগ্‌ছে ব্যথা
বুঝছে না কি তারা?
রামগরুড়ের বাসা ধমক দিয়ে ঠাসা,
হাসির হাওয়া বন্ধ সেথায়,
নিষেধ সেথায় হাসা।

কি মুশকিল!

সব লিখেছে এই কেতাবে দুনিয়ার সব খবর যত,
সরকারি সব আফিসখানার কোন্ সাহেবের কদর কত।
কেমন ক'রে চাটনি বানায়, কেমন ক'রে পোলাও করে,
হরেক্ রকম মুষ্টিযোগের বিধান লিখ্ছে ফলাও ক'রে।
সাবান কালি দাঁতের মাজন বানাবার সব কায়দাকেতা,
পূজা পার্বণ তিথির হিসাব শ্রাদ্ধবিধি লিখ্ছে হেথা।
সব লিখেছে, কেবল দেখ পাচ্ছিনেকো লেখা কোথায়—
পাগ্লা ষাঁড়ে কর্লে তাড়া কেমন ক'রে ঠেকাব তায়!

আহ্লাদী
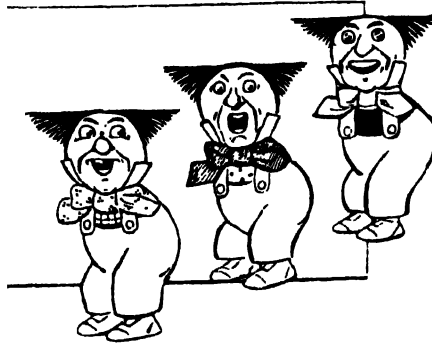
হাসছি মোরা হাসছি দেখ, হাসছি মোরা আহ্লাদী,
তিন জনেতে জট্লা ক'রে ফোক্লা হাসির পাল্লা দি'।
হাসতে হাসতে আসছে দাদা আসছি আমি আসছে ভাই,
হাসছি কেন কেউ জানে না, পাচ্ছে হাসি হাসছি তাই।
ভাবছি মনে, হাসছি কেন? থাকব হাসি ত্যাগ ক'রে,
ভাবতে গিয়ে ফিকফিকিয়ে ফেল্‌ছি হেসে ফ্যাক্ ক'রে।
পাচ্ছে হাসি চাইতে গিয়ে, পাচ্ছে হাসি চোখ বুজে,
পাচ্ছে হাসি চিম্‌টি কেটে নাকের ভিতর নোখ্ গুঁজে।
হাসছি দেখে চাঁদের কলা জোলার মাকু জেলের দাঁড়
নৌকা ফানুস পিঁপড়ে মানুষ রেলের গাড়ি তেলের ভাঁড়।
পড়্‌তে গিয়ে ফেলছি হেসে 'কখগ' আর শ্লেট দেখে—
উঠ্‌ছে হাসি ভস্‌ভসিয়ে সোডার মতন পেট থেকে।

হাত গণনা

ও পাড়ার নন্দ গোঁসাই, আমাদের নন্দ খুড়ো,
স্বভাবেতে সরল সোজা অমায়িক শান্ত বুড়ো।
ছিল না তার অসুখ বিসুখ, ছিল সে যে মনের সুখে,
দেখা যেত সদাই তারে হুঁকো হাতে হাস্যমুখে।
হঠাৎ কি তার খেয়াল হ'ল, চল্‌ল সে তার হাত দেখাতে—
ফিরে এল শুক্‌নো সরু, ঠকাঠক্ কাঁপছে দাঁতে!
শুধালে সে কয় না কথা, আকাশেতে রয় সে চেয়ে,
মাঝে মাঝে শিউরে ওঠে, পড়ে জল চক্ষু বেয়ে।
শুনে লোকে দৌড়ে এল, ছুটে এলেন বদ্যিমশাই,
সবাই বলে, "কাঁদছ কেন? কি হয়েছে নন্দ গোঁসাই?"
খুড়ো বলে, "বল্‌ব কি আর, হাতে আমার পষ্ট লেখা,
আমার ঘাড়ে আছেন শনি, ফাঁড়ায় ভরা আয়ুর রেখা।
এতদিন যায়নি জানা ফির্‌ছি কত গ্রহের ফেরে—
হঠাৎ আমার প্রাণটা গেলে তখন আমায় রাখ্‌বে কে রে?
ষাট্‌টা বছর পার হয়েছি বাপদাদাদের পুণ্যফলে—
ওরে তোদের নন্দ খুড়ো এবার বুঝি পটোল তোলে।
কবে যে কি ঘট্‌বে বিপদ কিছু হায় যায় না বলা"—
এই ব'লে সে উঠ্‌ল কেঁদে ছেড়ে ভীষণ উচ্চ গলা।
দেখে এলাম আজ সকালে গিয়ে ওদের পাড়ার মুখো,
বুড়ো আছে নেইকো হাসি, হাতে তার নেইকো হুঁকো।

গন্ধ বিচার

সিংহাসনে বস্‌ল রাজা বাজ্‌ল কাঁসর ঘণ্টা,
ছট্ ফটিয়ে উঠ্‌ল কেঁপে মন্ত্রীবুড়োর মনটা।
বল্‌লে রাজা, "মন্ত্রী তোমার জামায় কেন গন্ধ?"
মন্ত্রী বলে, "এসেন্স দিছি—গন্ধ তো নয় মন্দ!"
রাজা বলেন, "মন্দ ভাল দেখুক শুঁকে বদ্যি",
বদ্যি বলে, "আমার নাকে বেজায় হল সর্দি।"
রাজা হাঁকেন, "বোলাও তবে—রাম নারায়ণ পাত্র।"
পাত্র বলে, "নস্যি নিলাম এক্ষনি এইমাত্র—
নস্যি দিয়ে বন্ধ যে নাক গন্ধ কোথায় ঢুকবে?"
রাজা বলেন, "কোটাল তবে এগিয়ে এস, শুঁক্‌বে।"
কোটাল বলে, "পান খেয়েছি মশলা তাতে কর্পূর,
গন্ধে তারি মুণ্ড আমার এক্কেবারে ভরপুর।"
রাজা বলেন, "আসুক তবে শের পালোয়ান ভীমসিং",
ভীম বলে, "আজ কচ্ছে আমার সমস্ত গা ঝিম্‌ঝিম্।
রাত্রে আমার বোখার হল বল্‌ছি হুজুর ঠিক বাত"—
ব'লেই শুল রাজসভাতে চক্ষু বুঝে চিৎপাত।
রাজার শালা চন্দ্রকেতু তারেই ধ'রে শেষটা,
বল্‌ল রাজা, "তুমিই না হয় কর না ভাই চেষ্টা।"
চন্দ্র বলেন, "মার্‌তে চাও তো ডাকাও নাকো জল্লাদ,
গন্ধ শুঁকে মর্‌তে হবে এ আবার কি আহ্লাদ?"
ছিল হাজির বৃদ্ধ নাজির বয়সটি তার নব্বই,
ভাব্‌ল মনে, "ভয় কেন আর একদিন তো মরবই,—"
সাহস ক'রে বল্‌লে বুড়ো, "মিথ্যে সবাই বক্‌ছিস,
শুঁকতে পারি হুকুম পেলে এবং পেলে বক্‌শিস্।"
রাজা বলেন, "হাজার টাকা ইনাম পাবে সদ্য";
তাই না শুনে উৎসাহেতে উঠ্‌ল বুড়ো মদ্দ।
জামার পরে নাক ঠেকিয়ে—শুঁক্‌ল কত গন্ধ,
রইল অটল দেখ্‌ল লোকে বিস্ময়ে বাক্ বন্ধ।
রাজ্যে হল জয় জয়কার বাজ্‌ল কাঁসর ঢক্কা,
বাপ্‌রে কি তেজ বুড়োর হাড়ে পায়না সে যে অক্কা?

কাঁদুনে

ছিঁচ্ কাঁদুনে মিচ্‌কে যারা শস্তা কেঁদে নাম কেনে,
ঘ্যাঙায় শুধু ঘ্যানর্ ঘ্যানর্ ঘ্যান্‌ঘেনে আর প্যান্‌পেনে—
কুঁকিয়ে কাঁদে খিদের সময়, ফুঁফিয়ে কাঁদে ধম্‌কালে,
কিম্বা হঠাৎ লাগলে ব্যথা, কিম্বা ভয়ে চম্‌কালে;
অল্পে হাসে অল্পে কাঁদে, কান্না থামায় অল্পেতেই,
মায়ের আদর দুধের বোতল কিম্বা দিদির গল্পেতেই—
তারেই বলি মিথ্যে কাঁদন; আসল কান্না শুন্‌বে কে?
অবাক্ হবে থম্‌কে রবে সেই কাঁদনের গুণ দেখে!
নন্দঘোষেব পাশের বাড়ি বুথ্ সাহেবের বাচ্চাটার
কান্না খনা শুনলে বলি কান্না বটে সাচ্চা তার।
কাঁদ্‌বে না সে যখন তখন, রাখ্‌বে কেবল রাগ পুষে,
কাঁদবে যখন খেয়াল হবে খুন-কাঁদুনে রাক্ষুসে!
নাইকো কারণ নাইকো বিচার মাঝ-রাতে কি ভোরবেলা,
হঠাৎ শুনি অর্থবিহীন আকাশ-ফাটন জোর গলা।
হাঁক্‌ড়ে ছোটে কান্না যেমন জোয়ার বেগে নদীর বান,
বাপ মা বসেন হতাশ হয়ে শব্দ শুনে বধির কান।
বাস্‌রে সে কি লোহার গলা? এক মিনিটও শান্তি নেই?
কাঁদন ঝরে শ্রাবণ ধারে, ক্ষান্ত দেবার নামটি নেই!
ঝুম্‌ঝুমি দাও, পুতুল নাচাও, মিষ্টি খাওয়াও একশোবার,
বাতাস কর, চাপ্‌ড়ে ধর, ফুটবে নাকো হাস্য তার।
কান্নাভরে উল্‌টে পড়ে কান্না ঝরে নাক দিয়ে,
গিল্‌তে চাহে দালানবাড়ি হাঁ'খানি তার হাঁক্ দিয়ে।
ভূত-ভাগানো শব্দে লোকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক্ ছাড়ে—
কান্না শুনে ধন্যি বলি বুথ্ সাহেবের বাচ্চারে।

হুলোর গান
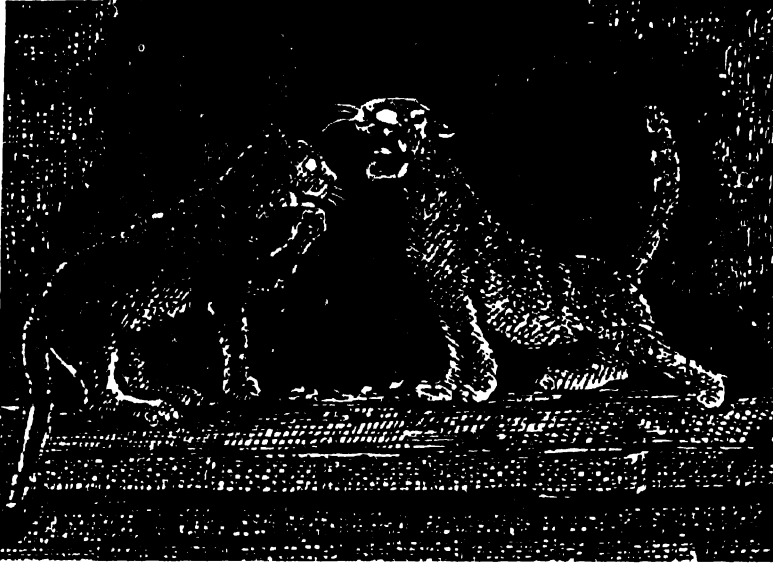
বিদ্‌ঘুটে রাত্তিরে ঘুট্‌ঘুটে ফাঁকা,
গাছপালা মিশ্‌মিশে মখ্‌মলে ঢাকা।
জট্‌বাঁধা ঝুল্ কালো বটগাছতলে,
ধক্‌ধক্ জোনাকির চক্‌মকি জ্বলে,
চুপ্‌চাপ্ চারিদিকে ঝোপঝাড়গুলো—
আয় ভাই গান গাই আয় ভাই হুলো।
গীত গাই কানে কানে চিৎকার ক'রে,
কোন্ গানে মন ভেজে শোন্ বলি তোরে—
পুবদিকে মাঝ রাতে ছোপ্ দিয়ে রাঙা
রাতকানা চাঁদ ওঠে আধখানা ভাঙা।
চট্ ক'রে মনে পড়ে মট্‌কার কাছে
মাল্‌পোয়া আধখানা কাল থেকে আছে।

দুড়্ দুড়্ ছুটে যাই, দূর থেকে দেখি
প্রাণপণে ঠোঁট চাটে কানকাটা নেকী!
গালফোলা মুখে তার মালপোয়া ঠাসা,
ধুক্ ক'রে নিভে গেল বুকভরা আশা।
মন বলে আর কেন সংসারে থাকি,
বিল্‌কুল্ সব দেখি ভেল্কির ফাঁকি।
সব যেন বিচ্ছিরি সব যেন খালি,
গিন্নির মুখ যেন চিম্‌নির কালি।
মন-ভাঙা দুখ্ মোর কণ্ঠেতে পুরে
গান গাই আয় ভাই প্রাণফাটা সুরে।

ঠিকানা

আরে আরে জগমোহন—এসো, এসো, এসো—
বল্‌তে পার কোথায় থাকে আদ্যানাথের মেশো?
আদ্যানাথের নাম শোননি? খগেনকে তো চেন?
শ্যাম বাগ্‌চি খগেনেরই মামাশ্বশুর জেনো।
শ্যামের জামাই কেষ্টমোহন, তার যে বাড়িওয়ালা—
(কি যেন নাম ভুলে গেছি), তারই মামার শালা;
তারই পিসের খুড়্‌তুতো ভাই আদ্যানাথের মেসো—
লক্ষ্মী দাদা, ঠিকানা তার একটু জেনে এসো।
ঠিকানা চাও? বল্‌ছি শোন ;—আমড়াতলার মোড়ে,
তিন-মুখো তিন রাস্তা গেছে, তারি একটা ধ'রে
চল্‌বে সিধে নাকবরাবর, ডানদিকে চোখ রেখে,
চল্‌তে চল্‌তে দেখ্‌বে শেষে রাস্তা গেছে বেঁকে;
দেখ্‌বে সেথায় ডাইনে বাঁয়ে পথ গিয়েছে কত,
তারি ভিতর ঘুর্‌বে খানিক গোলক ধাঁধার মত।
তার পরেতে হঠাৎ বেঁকে ডাইনে মোচড় মেরে,
ফির্‌বে আবার বাঁয়ের দিকে তিন্‌টে গলি ছেড়ে।
তবেই আবার পড়্‌বে এসে আমড়াতলার মোড়ে—
তারপরে যাও যেথায় খুশি—জ্বালিয়োনাকো মোরে।

আকাশের গায়ে কিবা রামধনু খেলে,
দেখে চেয়ে কত লোক সব কাজ ফেলে।
তাই দেখে খুঁতধরা বুড়ো কয় চটে,
দেখ্‌ছ কি, এই রং পাকা নয় মোটে॥

ঢপ্ ঢপ্ ঢাক্ ঢোল ভঁপ্ ভঁপ্ বাঁশি,
ঝন ঝন্ করতাল্ ঠন্ ঠন্ কাঁসি।
ধুমধাম বাপ্ বাপ্ ভয়ে ভ্যাবা চ্যাকা,
বাবুদের ছেলেটার দাঁত গেছে দেখা॥

নোট্ বই

এই দেখ্ পেনসিল, নোট্‌বুক এ হাতে,
এই দেখ ভরা সব কিল্‌বিল লেখাতে।
ভাল কথা শুনি যেই চট্‌পট্ লিখি তায়—
ফড়িঙের ক'টা ঠ্যাং, আরশুলা কি কি খায়;
আঙুলেতে আঠা দিলে কেন লাগে চট্‌চট্,
কাতুকুতু দিলে গরু কেন করে ছট্‌ফট্।
দেখে শিখে প'ড়ে শুনে ব'সে মাথা ঘামিয়ে
নিজে নিজে আগাগোড়া লিখে গেছি আমি এ।
কান করে কট্ কট্ ফোড়া করে টন্ টন্—
ওরে রামা ছুটে আয়, নিয়ে আয় লণ্ঠন।
কাল থেকে মনে মোর লেগে আছে খট্‌কা,
ঝোলাগুড় কিসে দেয়? সাবান না পট্‌কা?
এই বেলা প্রশ্নটা লিখে রাখি গুছিয়ে,
জবাবটা জেনে নেব মেজদাকে খুঁচিয়ে।
পেট কেন কাম্‌ড়ায়, বল দেখি পার কে?
বল দেখি ঝাঁজ কেন জোয়ানের আরকে?
তেজপাতে তেজ কেন? ঝাল কেন লঙ্কায়?
নাক কেন ডাকে আর পিলে কেন চমকায়?
কার নাম দুন্দুভি? কাকে বলে অরণি?
বল্‌বে কি, তোমরা তো নোট্‌বই পড়নি!

ভয় পেয়ো না

ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না, তোমায় আমি মার্‌ব না-
সত্যি বল্‌ছি কুস্তি ক'রে তোমার সঙ্গে পার্‌ব না।
মনটা আমার বড্ড নরম, হাড়ে আমার রাগ্‌টি নেই,
তোমায় আমি চিবিয়ে খাব এমন আমার সাধ্যি নেই!
মাথায় আমার শিং দেখে ভাই ভয় পেয়েছ কতই না—
জানোনা মোর মাথার ব্যারাম, কাউকে আমি গুঁতোই না?
এসো এসো গর্তে এসো, বাস ক'রে যাও চারটি দিন,
আদর ক'রে শিকেয় তুলে রাখ্‌ব তোমায় রাত্রি দিন।
হাতে আমার মুগুর আছে তাই কি হেথায় থাক্‌বে না?
মুগুর আমার হাল্‌কা এমন মারলে তোমায় লাগ্‌বে না।
অভয় দিচ্ছি, শুন্‌ছ না যে? ধরব নাকি ঠ্যাং দুটা?
বস্‌লে তোমার মুণ্ডু চেপে বুঝবে তখন কাণ্ডটা!
আমি আছি, গিন্নি আছেন, আছেন আমার নয় ছেলে—
সবাই মিলে কাম্‌ড়ে দেব মিথ্যে অমন ভয় পেলে।

বিজ্ঞান শিক্ষা

আয় তোর মুণ্ডুটা দেখি, আয় দেখি 'ফুটোস্কোপ' দিয়ে,
দেখি কত ভেজালের মেকি আছে তোর মগজের ঘিয়ে।
কোন্ দিকে বুদ্ধিটা খোলে, কোন্ দিকে থেকে যায় চাপা;
কতখানি ভস্ ভস্ ঘিলু, কতখানি ঠক্ ঠকে ফাঁপা।
মন তোর কোন্ দেশে থাকে, কেন তুই ভুলে যাস্ কথা,—
আয় দেখি কোন্ ফাঁক দিয়ে, মগজেতে ফুটো তোর কোথা।
টোল-খাওয়া ছাতাপড়া মাথা, ফাটা-মতো মনে হয় যেন,
আয় দেখি বিশ্লেষ ক'রে—চোপ্‌রও ভয় পাস্ কেন?
কাত হয়ে কান ধ'রে দাঁড়া, জিভ্‌খানা উল্‌টিয়ে দেখা,
ভাল ক'রে বুঝে শুনে দেখি—বিজ্ঞানে যে রকম লেখা।
মুণ্ডুতে 'ম্যাগ্‌নেট্' ফেলে, বাঁশ দিয়ে 'রিফ্লেক্‌ট্' ক'রে,
ইঁট্ দিয়ে 'ভেলসিটি' ক'ষে দেখি মাথা ঘোরে কি না ঘোরে।

ট্যাঁশ্ গরু

ট্যাঁশ্ গরু গরু নয়, আসলেতে পাখি সে
যার খুশি দেখে এস হারুদের আফিসে।
চোখ দুটি ঢুলু ঢুলু, মুখখানা মস্ত,
ফিট্‌ফাট্ কালোচুলে টেরিকাটা চোস্ত।
তিন-বাঁকা শিং তার, ল্যাজখানি প্যাঁচান—
একটুকু ছোঁও যদি, বাপ্‌রে কি চ্যাঁচান!
লট্‌খটে হাড়গোড় খট্‌খট্ ন'ড়ে যায়,
ধম্‌কালে ল্যাগ্‌ব্যাগ্ চমকিয়ে প'ড়ে যায়।
বর্ণিতে রূপ গুণ সাধ্য কি কবিতার,
চেহারার কি বাহার—ওই দেখ ছবি তার।
ট্যাঁশ্ গরু খাবি খায় ঠ্যাস্ দিয়ে দেয়ালে,
মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলে না জানি কি খেয়ালে
মাঝে মাঝে তেড়ে ওঠে, মাঝে মাঝে রেগে যায়,
মাঝে মাঝে কুপোকাত দাঁতে দাঁত লেগে যায়।
খায় না সে দানাপানি—ঘাস পাতা বিচালি,
খায় না সে ছোলা ছাতু ময়দা কি পিঠালি
রুচি নাই আমিষেতে, রুচি নাই পায়সে,
সাবানের সুপ আর মোমবাতি খায় সে।
আর কিছু খেলে তার কাশি ওঠে খক্‌খক্,
সারা গায়ে ঘিন্ ঘিন্, ঠ্যাং কাঁপে ঠক্‌ঠক্।
একদিন খেয়েছিল ন্যাক্‌ড়ার ফালি সে—
তিন মাস আধমরা শুয়ে ছিল বালিশে।
কারো যদি শখ্ থাকে ট্যাঁশ্ গরু কিন্‌তে,
সস্তায় দিতে পারি, দেখ ভেবে চিন্তে।

ফস্‌কে গেল

দেখ্ বাবাজি দেখ্‌বি নাকি
ভোজের বাজি ভেলকি ফাঁকি
লাফ দিয়ে তাই তালটি ঠুকে
ছাড়্‌ব সটান্ ঊর্ধমুখে

দেখ্‌রে খেলা দেখ্ চালাকি,
পড়্ পড়্ পড়্ পড়্‌বি পাখি—ধপ্!
তাক ক'রে যাই তীর ধনুকে,
হুশ্ ক'রে তোর লাগ্‌বে বুকে—খপ্!

গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়িয়ে হামা
এগিয়ে আছেন বাগিয়ে ধামা,
ঐ যা! গেল ফস্‌কে ফেঁসে—
ঘ্যাচ্ ক'রে তোর পাঁজর ঘেঁষে

খাপ্ পেতেছেন গোষ্ঠমামা,
এইবারে বাণ চিড়িয়া নামা—চট্!
হেঁই মামা তুই খেপ্‌লি শেষে?
লাগ্‌ল কি বাণ ছট্‌কে এসে—ফট্?

মাসি গো মাসি, পাচ্ছে হাসি
নিম গাছেতে হচ্ছে শিম্—
হাতির মাথায় ব্যাঙের ছাতা
কাগের বাসায় বগের ডিম॥

বল্‌ব কি ভাই হুগ্‌লি গেলুম,
বল্‌ছি তোমায় চুপি চুপি—
দেখ্‌তে পেলাম তিনটে শুয়োর
মাথায় তাদের নেইকো টুপি॥

পালোয়ান

খেলার ছলে ষষ্ঠিচরণ হাতি লোফেন যখন তখন,
দেহের ওজন উনিশটি মণ, শক্ত যেন লোহার গঠন।
একদিন এক গুণ্ডা তাকে বাঁশ বাগিয়ে মার্‌ল বেগে—
ভাঙল সে বাঁশ শোলার মতো মট্‌ ক'রে তার কনুই লেগে
এই তো সেদিন রাস্তা দিয়ে চল্‌তে গিয়ে দৈব বশে,
উপর থেকে প্রকাণ্ড ইট পড়্‌ল তাহার মাথায় খ'সে।
মুণ্ডুতে তার যেম্‌নি ঠেকা অম্‌নি সে ইট্‌ এক নিমেষে,
গুঁড়িয়ে হ'ল ধুলোর মতো, ষষ্ঠি চলেন মুচ্‌কি হেসে।
ষষ্ঠি যখন ধমক হাঁকে কাঁপ্‌তে থাকে দালান বাড়ি,
ফুঁয়ের জোরে পথের মোড়ে উল্‌টে পড়ে গরুর গাড়ি।
ধুম্‌সো কাঠের তক্তা ছেঁড়ে মোচড় মেরে মুহূর্তেকে,
একশো জালা জল ঢালে রোজ স্নানের সময় পুকুর থেকে।
সকাল বেলার জলপানি তার তিনটি ধামা পেস্তা মেওয়া,
সঙ্গেতে তার চোদ্দ হাঁড়ি দই কি মালাই মুড়্‌কি দেওয়া।
দুপুর হলে খাবার আসে কাতার দিয়ে ডেক্‌চি ভ'রে,
বরফ দেওয়া উনিশ কুঁজো সরবতে তার তৃষ্ণা হরে।
বিকাল বেলা খায় না কিছু গণ্ডা দশেক মণ্ডা ছাড়া,
সন্ধ্যা হ'লে লাগায় তেড়ে দিস্তা দিস্তা লুচির তাড়া।
রাত্রে সে তার হাত-পা টেপায় দশটি চেলা মজুত থাকে,
দুম্‌দুমাদুম্‌ সবাই মিলে মুগুর দিয়ে পেটায় তাকে।
বল্‌লে বেশি ভাব্‌বে শেষে এসব কথা ফেনিয়ে বলা--
দেখবে যদি আপন চোখে যাও না কেন বেনিয়াটোলা।

আবোল তাবোল

মেঘ মুলুকে ঝাপ্‌সা রাতে,
রামধনুকের আব্‌ছায়াতে,
তাল বেতালে খেয়াল সুরে,
তান ধরেছি কণ্ঠ পুরে।
হেথায় নিষেধ নাই রে দাদা,
নাই রে বাঁধন নাই রে বাধা।
হেথায় রঙিন্‌ আকাশতলে
স্বপন দোলা হাওয়ায় দোলে,
সুরের নেশায় ঝরনা ছোটে,
আকাশ কুসুম আপ্‌নি ফোটে,
রঙিয়ে আকাশ, রঙিয়ে মন
চমক জাগে ক্ষণে ক্ষণ।
আজকে দাদা যাবার আগে
বল্‌ব যা মোর চিত্তে লাগে—
নাইবা তাহার অর্থ হোক্‌,
নাইবা বুঝুক বেবাক্‌ লোক।
আপনাকে আজ আপন হতে
ভাসিয়ে দিলাম খেয়াল স্রোতে।
ছুট্‌লে কথা থামায় কে?
আজকে ঠেকায় আমায় কে?
আজকে আমার মনের মাঝে
ধাঁই ধপাধপ্‌ তব্‌লা বাজে—
রাম-খটাখট্‌ ঘ্যাচাং ঘ্যাঁচ্‌
কথায় কাটে কথার প্যাঁচ্‌।
আলোয় ঢাকা অন্ধকার,
ঘণ্টা বাজে গন্ধে তার।
গোপন প্রাণে স্বপন দূত,
মঞ্চে নাচেন পঞ্চ ভূত!
হ্যাংলা হাতি চ্যাং-দোলা,
শূন্যে তাদের ঠ্যাং তোলা।
মক্ষিরানি পক্ষিরাজ—
দস্যি ছেলে লক্ষ্মী আজ।
আদিম কালের চাঁদিম হিম,
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।
ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর,
গানের পালা সাঙ্গ মোর।

খাই খাই

'মণ্ডা' (Monday) ক্লাবের চিঠিপত্র, অধিবেশনের কার্যবিবরণী ইত্যাদির খসড়ার মধ্যে দু-পাতা জুড়ে 'খাই খাই'-এর এই খসড়া।
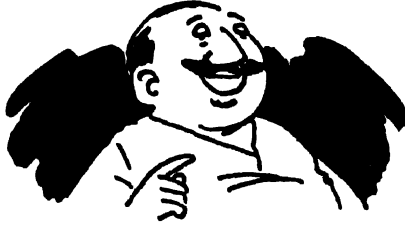
এসব কথা শুন্‌লে তোদের লাগবে মনে ধাঁধা,
কেউ বা বুঝে পুরোপুরি কেউ বা বুঝে আধা।

কারে বা কই কিসের কথা, কই যে দফে দফে,
গাছের 'পরে কাঁঠাল দেখে তেল মেখ না গোঁফে

একটি একটি কথায় যেন সদ্য দাগে কামান,
মন বসনের ময়লা ধুতে তত্ত্বকথাই সাবান।

বেশ বলেছ, ঢের বলেছ, ঐখেনে দাও দাঁড়ি
হাটের মাঝে ভাঙ্‌বে কেন বিদ্যে বোঝাই হাঁড়ি!
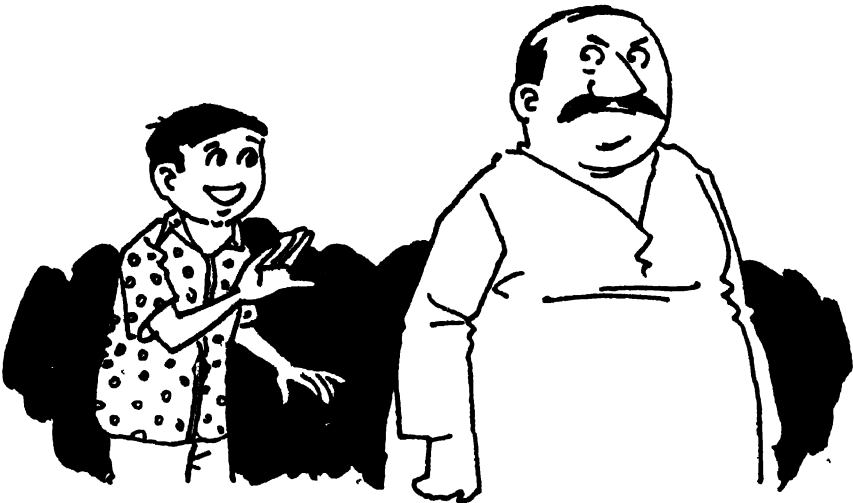
খাই খাই

খাইখাই কর কেন, এস বস আহারে—
খাওয়ার আজব খাওয়া, ভোজ কয় যাহারে।
যত কিছু খাওয়া লেখে বাঙালির ভাষাতে,
জড় করে আনি সব,—থাক সেই আশাতে।
ডাল ভাত তরকারি ফলমূল শস্য,
আমিষ ও নিরামিষ, চর্ব্য ও চোষ্য,
রুটি লুচি, ভাজাভুজি, টক ঝাল মিষ্টি,
ময়রা ও পাচকের যত কিছু সৃষ্টি,
আর যাহা খায় লোকে স্বদেশে ও বিদেশে—
খুঁজে পেতে আনি খেতে—নয় বড় সিধে সে!
জল খায়, দুধ খায়, খায় যত পানীয়,
জ্যাঠাছেলে বিড়ি খায়, কান ধরে টানিও।
ফল বিনা চিঁড়ে দৈ, ফলাহার হয় তা,
জলযোগে জল খাওয়া শুধু জল নয় তা।
ব্যাঙ খায় ফরাসিরা (খেতে নয় মন্দ),
বার্মার 'ঙাপ্পি'তে বাপরে কি গন্ধ!
মান্দ্রাজী ঝাল খেলে জ্বলে যায় কণ্ঠ,
জাপানেতে খায় নাকি ফড়িঙের ঘণ্ট!
আরশুলা মুখে দিয়ে সুখে খায় চীনারা,
কত কি যে খায় লোকে নাহি তার কিনারা।
দেখে শুনে চেখে খাও, যেটা চায় রসনা;
তা না হলে কলা খাও—চটো কেন? বস না -
সবে হল খাওয়া শুরু, শোন শোন আরো খায়—
সুদ খায় মহাজনে, ঘুষ খায় দারোগায়।
বাবু যান হাওয়া খেতে চড়ে জুড়ি-গাড়িতে,
খাসা দেখ 'খাপ্ খায়' চাপকানে দাড়িতে।
তেলে জলে 'মিশ খায়', শুনেছ তা কেও কি?
যুদ্ধে যে গুলি খায় গুলিখোর সেও কি?
ডিঙি চড়ে স্রোতে প'ড়ে পাক খায় জেলেরা,
ভয় খেয়ে খাবি খায় পাঠশালে ছেলেরা;

বেত খেয়ে কাঁদে কেউ, কেউ শুধু গালি খায়,
কেউ খায় থতমত—তাও লিখি তালিকায়।
ভিখারিটা তাড়া খায়, ভিখ্ নাহি পায়রে—
'দিন আনে দিন খায়' কত লোকে হায়রে।
হোঁচটের চোট খেয়ে খোকা ধরে কান্না
মা বলেন চুমু খেয়ে, 'সেরে গেছে, আর না।'
ধমক বকুনি খেয়ে নয় যারা বাধ্য
কিলচড় লাথি ঘুঁষি হয় তার খাদ্য।
জুতো খায় গুঁতো খায়, চাবুক যে খায়রে,
তবু যদি নুন খায় সেও গুণ গায়রে।
গরমে বাতাস খাই, শীতে খাই হিমসিম,
পিছ্‌লে আছাড় খেয়ে মাথা করে ঝিমঝিম।
কত যে মোচড় খায় বেহালার কানটা,
কানমলা খেলে তবে খোলে তার গানটা।
টোল খায় ঘটি বাটি, দোল খায় খোকারা,
ঘাব্‌ড়িয়ে ঘোল খায় পদে পদে বোকারা।
আকাশেতে কাৎ হ'য়ে গোঁৎ খায় ঘুড়িটা,
পালোয়ান খায় দেখ ডিগ্‌বাজি কুড়িটা।
ফুটবলে ঠেলা খাই, ভিড়ে খাই ধাক্কা,
কাশীতে প্রসাদ খেয়ে সাধু হই পাক্কা!
কথা শোন, মাথা খাও, রোদ্দুরে যেয়ো না—
আর যাহা খাও বাপু বিষমটি খেও না।
'ফেল' ক'রে মুখ খেয়ে কেঁদেছিলে সেবারে,
আদা-নুন খেয়ে লাগো পাশ কর এবারে।
ভ্যাবাচ্যাকা খেও নাকো, যেয়ো নাকো ভড়্‌কে,
খাওয়াদাওয়া শেষ হলে বসে খাও খড়্‌কে।
এত খেয়ে তবু যদি নাহি ওঠে মনটা—
খাও তবে কচু পোড়া, খাও তবে ঘন্টা।

দাঁড়ের কবিতা

চুপ কর্, শোন্ শোন্, বেয়াকুল হোস্‌নে
ঠেকে গেছি বাপ্‌রে কি ভয়ানক প্রশ্নে!
ভেবে ভেবে লিখে লিখে বসে বসে দাঁড়েতে
ঝিম্‌ঝিম্ টন্‌টন্ ব্যথা করে হাড়েতে।
এক ছিল দাঁড়ি মাঝি—দাড়ি তার মস্ত,
দাড়ি দিয়ে দাঁড়ি তার দাঁড়ে খালি ঘষ্‌ত।
সেই দাঁড়ে একদিন দাঁড়কাক দাঁড়াল,
কাঁকড়ার দাঁড়া দিয়ে দাঁড়ি তারে তাড়াল।
কাক বলে রেগেমেগে, "বাড়াবাড়ি ঐ ত!
না দাঁড়াই দাঁড়ে তবু দাঁড়কাক হই ত?
ভারি তোর দাঁড়িগিরি, শোন্ বলি তবে রে—
দাঁড় বিনা তুই ব্যাটা দাঁড়ি হোস্ কবে রে?
পাখা হলে 'পাখি' হয় ব্যাকরণ বিশেষে—
কাঁকড়ার 'দাঁড়া' আছে, দাঁড়ি নয় কিসে সে?
দ্বারে বসে দারোয়ান, তারে যদি 'দ্বারী' কয়,
দাঁড়ে-বসা যত পাখি সব তবে দাঁড়ি হয়!
দূর দূর! ছাই দাঁড়ি! দাড়ি নিয়ে পাড়ি দে!"
দাঁড়ি বলে, "বাস্ বাস্! ঐখেনে দাঁড়ি দে।"

আড়ি
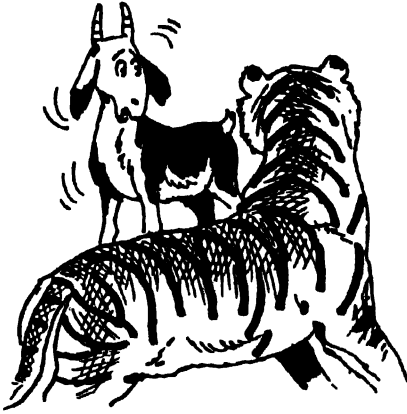
কিসে কিসে ভাব নেই? ভক্ষক ও ভক্ষ্যে—
বাঘে ছাগে মিল হলে আর নেই রক্ষে।

শেয়ালের সাড়া পেলে কুকুরেরা তৈরি,
সাপে আর নেউলে ত চিরকাল বৈরী!

আদা আর কাঁচকলা মেলে কোনোদিন্ সে?
কোকিলের ডাক শুনে কাক জ্বলে হিংসেয়।

তেলে দেওয়া বেগুনের ঝগড়াটা দেখনি?
ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ রাগ যেন খেতে আসে এখনি।

তার চেয়ে বেশি আড়ি আমি পারি কহিতে—
তোমাদের কারো কারো, কেতাবের সহিতে।

পাকাপাকি

আম পাকে বৈশাখে কুল পাকে ফাগুনে,
কাঁচা ইট পাকা হয় পোড়ালে তা আগুনে।
রোদে জলে টিকে রঙ, পাকা কই তাহারে;
ফলারটি পাকা হয় লুচি দই আহারে।
হাত পাকে লিখে লিখে, চুল পাকে বয়সে,
জ্যাঠামিতে পাকা ছেলে বেশি কথা কয় সে।
লোকে কয় কাঁঠাল সে পাকে নাকি কিলিয়ে?
বুদ্ধি পাকিয়ে তোলে লেখাপড়া গিলিয়ে!
কান পাকে ফোড়া পাকে, পেকে করে টন্‌টন্—
কথা যার পাকা নয়, কাজে তার ঠন্‌ঠন্।
রাঁধুনী বসিয়া পাকে পাক দেয় হাঁড়িতে,
সজোরে পাকালে চোখ ছেলে কাঁদে বাড়িতে।
পাকায়ে পাকায়ে দড়ি টান হয়ে থাকে সে।
দুহাতে পাকালে গোঁফ তবু নাহি পাকে সে॥

পড়ার হিসাব

ফির্‌ল সবাই ইস্কুলেতে সাঙ্গ হল ছুটি—
আবার চলে বই-বগলে সবাই গুটি গুটি।
পড়ার পরে কার কি রকম মনটি ছিল এবার,
সময় এল এখন তারই হিসেবখানা দেবার।
কেউ পড়েছেন পড়ার পুঁথি, কেউ পড়েছেন গল্প,
কেউ পড়েছেন হদ্দমতন, কেউ পড়েছেন অল্প।
কেউ বা তেড়ে গড়গড়িয়ে মুখস্থ কয় ঝাড়া,
কেউ বা কেবল কাঁচুমাঁচু মোটে না দেয় সাড়া।
গুরুমশাই এসেই ক্লাসে বলেন, "ওরে গদাই
এবার কিছু পড়্‌লি? নাকি খেল্‌তি কেবল সদাই?"
গদাই ভয়ে চোক পাকিয়ে ঘাবড়ে গিয়ে শেষে
বললে, "এবার পড়ার ঠেলা বেজায় সর্বনেশে—
মামার বাড়ি যেম্নি যাওয়া অম্নি গাছে চড়া,
এক্কেবারে অম্নি ধপাস পড়ার মত পড়া!"

বিষম চিন্তা

মাথায় কত প্রশ্ন আসে, দিচ্ছে না কেউ জবাব তার—
সবাই বলে, "মিথ্যে বাজে বকিস্‌নে আর খবরদার!"
অমন ধারা ধমক দিলে কেমন করে শিখব সব?
বললে সবাই "মুখ্যু ছেলে", বলবে আমায় "গো গর্দভ!"
কেউ কি জানে দিনের বেলায় কোথায় পালায় ঘুমের ঘোর?
বর্ষা হলেই ব্যাঙের গলায় কোত্থেকে হয় এমন জোর?
গাধার কেন শিং থাকে না, হাতির কেন পালক নেই?
গরম তেলে ফোড়ন দিলে লাফায় কেন তাধেই ধেই?
সোডার বোতল খুললে কেন ফঁসফঁসিয়ে রাগ করে?
কেমন করে রাখবে টিকি মাথায় যাদের টাক পড়ে?
ভূত যদি না থাকবে তবে কোত্থেকে হয় ভূতের ভয়?
মাথায় যাদের গোল বেধেছে তাদের কেন "পাগোল" কয়?
কতই ভাবি এসব কথা, জবাব দেবার মানুষ কই?
বয়স হলে কেতাব খুলে জানতে পাব সমস্তই।

পরিবেশন

'পরি'পূর্বক 'বিষ'ধাতু তাহে 'অনট্' ব'সে
তবে ঘটায় পরিবেষণ, লেখে অমরকোষে।
—অর্থাৎ ভোজের ভাণ্ড হাতে লয়ে মেলা
ডেলা ডেলা ভাগ করি পাতে পাতে ফেলা।
এই দিকে এস তবে লয়ে ভোজভাণ্ড
সমুখে চাহিয়া দেখ কি ভীষণ কাণ্ড।
কেহ কহে "দৈ আন" কেহ হাঁকে "লুচি"
কেহ কাঁদে শূন্য মুখে পাতখানি মুছি।
হোথা দেখি দুই প্রভু পাত্র লয়ে হাতে
হাতাহাতি গুঁতাগুঁতি দ্বন্দ্বরণে মাতে।
কেবা শোনে কার কথা সকলেই কর্তা—
অনাহারে কতধারে হল প্রাণ হত্যা।
কোন প্রভু হস্তিদেহ ভুঁড়িখানা ভারি
উর্দ্ধ হতে থপ্ করি খাদ্য দেন্ ছাড়ি।
কোন চাচা অন্ধপ্রায় ('মাইনাস কুড়ি')
ছড়ায় ছোলার ডাল পথঘাট জুড়ি।
মাতব্বর বৃদ্ধ যায় মুদি চক্ষু দুটি,
"কারো কিছু চাই" বলি তড়বড় ছুটি—
সহসা ডালের পাঁকে পদার্পণ মাত্রে
হুড়মুড় পড়ে কার নিরামিষ পাত্রে।
বীরোচিত ধীর পদে এস দেখি ত্রস্তে--
ওই দিকে খালি পাত, চল হাঁড়ি হস্তে।
তবে দেখ, খাদ্য দিতে অতিথির থালে
দৈবাৎ না ঢোকে কভু যেন নিজ গালে।
ছুটোনাকো ওরকম মিছে খালি হাতে
দিও না মাছের মুড়া নিরামিষ পাতে।
অযথা আক্রোশে কিবা অন্যায় আদরে
ঢেলো না অম্বল কারো নূতন চাদরে।
বোকাবৎ দন্তপাটি করিয়া বাহির
করোনাকো অকারণে কৃতিত্ব জাহির।

অবুঝ

চুপ করে থাক্, তর্ক করার বদভ্যাসটি ভাল না,
এক্কেবারেই হয় না ওতে বুদ্ধিশক্তির চালনা।
দেখ্ ত দেখি আজও আমার মনের তেজটি নেভেনি—
এইবার শোন্ বল্‌ছি এখন—কি বলছিলেম ভেবেনি!
বলছিলাম কি, আমি একটা বই লিখেছি কবিতার
উঁচু রকম পদ্যে লেখা আগা গোড়াই সবি তার।
তাইতে আছে "দশমুখে চায়, হজম করে দশোদর,
শ্মশানঘাটে শষ্পানি খায় শশব্যস্ত শশধর।"
এই কথাটার অর্থ যে কি, ভাবছে না কেউ মোটেও-
বুঝ্‌ছে না কেউ লাভ হবে কি, অর্থ যদি জোটেও।
এরই মধ্যে হাই তুলিস্ যে? পুঁতে ফেল্‌ব এখনি,
ঘুঘু দেখেই নাচ্‌তে শুরু, ফাঁদ ত বাবা দেখ্‌নি!
কি বললি তুই? সাতান্নবার শুনেছিস্ ঐ কথাটা?
এমন মিথ্যে কইতে পারিস্ লক্ষ্মীছাড়া বখাটা!
আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাধ্যি নেই্ কো পেরোবার
হিসেব দেব, বলেছি এই চোদ্দবার কি তেরোবার।
সাতান্ন তুই গুনতে পারিস্? মিথ্যেবাদী! গুনে যা—
ও শ্যামাদাস! পালাস্ কেন? রাগ করিনি, শুনে যা।

নাচের বাতিক

বয়স হল অষ্টআশি, চিম্‌সে গায়ে ঠুন্‌কো হাড়,
নাচ্‌ছে বুড়ো উল্টোমাথায়—ভাঙ্‌লে বুঝি মুণ্ডু ঘাড়!
হেঁইয়ো ব'লে হাত পা ছেড়ে পড়ছে তেড়ে চিৎপটাং,
উঠ্‌ছে আবার ঝট্‌পটিয়ে এক্কেবারে পিঠ সটান্।
বুঝিয়ে বলি, "বৃদ্ধ তুমি এই বয়েসে কর্‌ছ কি?
খাও না খানিক মশ্‌লা গুলে হুঁকোর জল আর হর্‌তকী।
ঠাণ্ডা হবে মাথার আগুন, শান্ত হবে ছট্‌ফটি—"
বৃদ্ধ বলে 'থাম্ না বাপু, সব তাতে তোর পট্‌পটি!
ঢের খেয়েছি মশ্‌লা পাঁচন, ঢের মেখেছি চর্বি তেল;
তুই ভেবেছিস আমায় এখন চাল্ মেরে তুই করবি ফেল?"
এই না ব'লে ডাইনে বাঁয়ে লম্ফ দিয়ে হুশ্ ক'রে
হঠাৎ খেয়ে উল্টোবাজি ফেল্‌লে আমায় 'পুশ্' ক'রে।

"নাচ্‌লে অমন উল্টো রকম," আবার বলি বুঝিয়ে তায়,
"রক্তগুলো হুড়্‌হুড়িয়ে মগজ পানে উজিয়ে যায়।"
বললে বুড়ো, "কিন্তু বাবা, আসল কথা সহজ এই—
ঢের দেখেছি পরখ্ করে, কোথাও আমার মগজ নেই।
তাইতে আমার হয় না কিছু—মাথায় যে সব ফক্কিফাঁক—
যতটা নাচি উল্টো নাচন, যতই না খাই চর্কিপাক।"
বলতে গেলাম "তাও কি হয়"—অম্নি হঠাৎ ঠ্যাং নেড়ে
আবার বুড়ো হুড়্‌মুড়িয়ে ফেললে আমায় ল্যাং মেরে।
ভাবছি সবে মারব ঘুঁষি এবার বুড়োর রগ্ ঘেঁষে,
বললে বুড়ো, "করব কি বল্? করায় এ সব অভ্যেসে।

ছিলাম যখন রেল-দারোগা চড়্‌তে হত ট্রেইনেতে
চলতে গিয়ে ট্রেনগুলো সব পড়ত প্রায়ই ড্রেইনেতে।
তুব্‌ড়ে যেত রেলের গাড়ি লাগত গুঁতো চাক্কাতে,
ছিট্‌কে যেতাম যখন তখন হঠাৎ এক এক ধাক্কাতে।
নিত্যি ঘুমাই এক চোখে তাই, নড়লে গাড়ি—অম্নি 'বাপ'-
এম্—নি ক'রে ডিগ্‌বাজিতে এক্কেবারে শূন্য লাফ।
তাইতে হল নাচের নেশা, হঠাৎ হঠাৎ নাচন পায়,
বসতে শুতে আপ্‌নি ভুলে ডিগ্‌বাজি খাই আচম্‌কায়!
নাচতে গিয়ে দৈবে যদি ঠ্যাং লাগে তোর পাঁজ্‌রাতে,
তাই ব'লে কি চটতে হবে? কিম্বা রাগে গজ্‌রাতে?"
আমিও বলি, "ঘাট হয়েছে, তোমার খুরে ডণ্ডবৎ!
লাফাও তুমি যেমন খুশি, আমরা দেখি অন্য পথ।"

হিংসুটিদের গান

আমরা ভালো লক্ষ্মী সবাই তোমরা ভারি বিশ্রী,
তোমরা খাবে নিমের পাঁচন, আমরা খাব মিশ্রী।
আমরা পাব খেলনা পুতুল, আমরা পাব চম্‌চম্‌,
তোমরা ত তা পাচ্ছ না কেউ পেলেও পাবে কম্‌কম্‌।
আমরা শোব খাট্‌ পালঙে মায়ের কাছে ঘেঁষ্‌টে,
তোমরা শোবে অন্ধকারে একলা ভয়ে ভেস্তে।
আমরা যাব জাম্‌তাড়াতে চড়ব কেমন ট্রেইনে,
চেঁচাও যদি "সঙ্গে নে যাও" বল্‌ব "কলা এই নে"!
আমরা ফিরি বুক ফুলিয়ে রঙিন্‌ জুতোয় মচ্‌মচ্‌,
তোমরা হাঁদা নোংরা ছিছি হ্যাংলা নাকে ফঁচ্‌ফঁচ্‌।
আমরা পরি রেশ্‌মি জরি, আমরা পরি গয়না,
তোমরা সেসব পাও না ব'লে তাও তোমাদের সয় না।
আমরা হব লাটমেজাজী, তোমরা হবে কিপ্‌টে,
চাইবে যদি কিচ্ছু তখন ধর্‌ব গলা চিপ্‌টে।
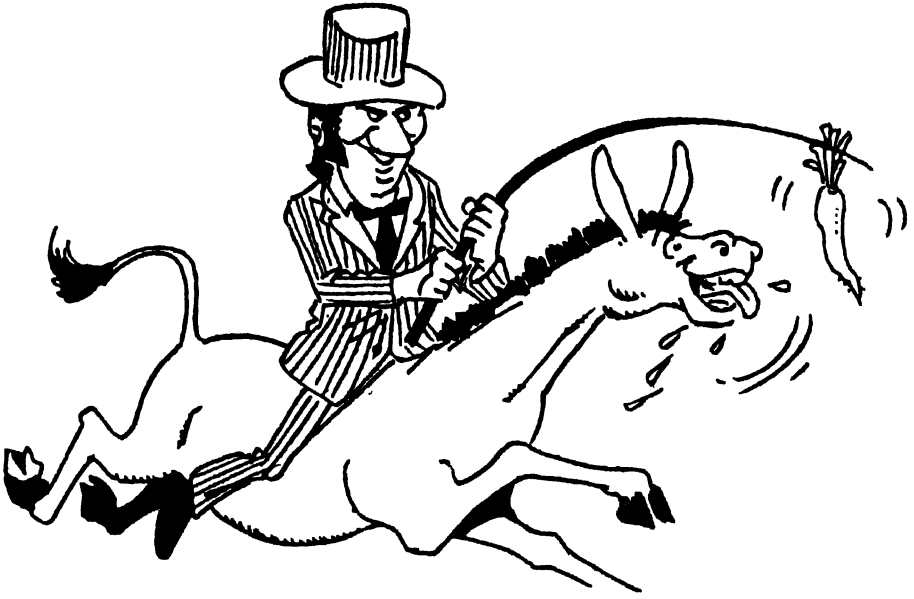
অসম্ভব নয়!

এক যে ছিল সাহেব, তাহার
গুণের মধ্যে নাকের বাহার।
তার যে গাধা বাহন, সেটা
যেমন পেটুক তেমনি ট্যাঁটা।
ডাইনে বল্‌লে যায় সে বামে
তিনপা যেতে দুবার থামে।
চল্‌তে চল্‌তে থেকে থেকে
খানায় খন্দে পড়ে বেঁকে।
ব্যাপার দেখে পণ্ডিতরো
সাহেব বললে "সবুর করো—
মাম্‌দোবাজি আমার কাছে?
এ রোগেরও ওষুধ আছে।"

এই না ব'লে ভীষণ ক্ষেপে
গাধার পিঠে বস্‌ল চেপে
মুলোর ঝুঁটি ঝুলিয়ে নাকে।
—আর কি গাধা ঝিমিয়ে থাকে?
মুলোর গন্ধে টগবগিয়ে
দৌড়ে চলে লম্ফ দিয়ে—
যতই ছোটে 'ধরব' ব'লে
ততই মুলো এগিয়ে চলে!
খাবার লোভে উদাস প্রাণে
কেবল ছোটে মুলোর টানে—
ডাইনে বাঁয়ে মুলোর তালে
ফেরেন গাধা নাকের চালে।

কাজের লোক

প্রথম। বাঃ—আমার নাম 'বাঃ'!
বসে থাকি তোফা তুলে পায়ের উপর পা!
লেখাপড়ার ধার ধারিনে, বছর ভরে ছুটি,
হেসে খেলে আরাম ক'রে দুশো মজা লুটি।
কারে কবে কেয়ার করি, কিসের করি ডর?
কাজের নামে কম্প দিয়ে গায়ে আসে জ্বর।
গাধার মতন খাটিস্ তোরা মুখটা করে চুন—
আহাম্মুকি কাণ্ড দেখে হেসেই আমি খুন।

সকলে। আস্ত একটি গাধা তুমি স্পষ্ট গেল দেখা,
হাস্‌ছ যত, কান্না তত কপালেতে লেখা।

দ্বিতীয়। 'যদি' বলে ডাকে আমায় নামটি আমার 'যদি'–
আশায় আশায় বসে থাকি হেলান দিয়ে গদি।
সব কাজেতে থাকত যদি খেলার মত মজা,
লেখাপড়া হত যদি জলের মত সোজা—
স্যাণ্ডো সমান ষণ্ডা হতাম যদি গায়ের জোরে,
প্রশংসাতে আকাশ পাতাল যদি যেত ভরে—
উঠে পড়ে লেগে যেতাম বাজে তর্ক ফেলে।
করতে পারি সবি—যদি সহজ উপায় মেলে।

সকলে। হাতের কাছে সুযোগ, তবু 'যদি'র আশায় বসে
নিজের মাথা খাচ্ছ বাপু নিজের বুদ্ধি দোষে।

তৃতীয়। আমার নাম 'বটে'! আমি সদাই আছি চটে—
কট্‌মটিয়ে তাকাই যখন, সবাই পালায় ছুটে।
চশমা পরে বিচার ক'রে, চিরে দেখাই চুল—
উঠ্‌তে বস্‌তে কচ্ছে সবাই হাজার গণ্ডা ভুল।
আমার চোখে ধুলো দেবে সাধ্যি আছে কার?
ধমক শুনে ভূতের বাবা হ'চ্ছে পগার পার!
হাসছ? বটে! ভাবছ বুঝি মস্ত তুমি লোক,
একটি আমার ভেংচি খেলে উল্টে যাবে চোখ।

সকলে। দিচ্ছ গালি লোকের তাতে কিবা এল গেল?
আকাশেতে থুতু ছুঁড়ে—নিজের গায়েই ফেল।

চতুর্থ। আমার নাম 'কিন্তু', আমায় 'কিন্তু' বলে ডাকে,
সকল কাজে একটা কিছু গলদ লেগে থাকে।
দশটা কাজে লাগি কিন্তু আটটা করি মাটি,
ষোল আনা কথায় কিন্তু সিকি মাত্র খাঁটি।
লম্ফঝম্ফ বহুৎ কিন্তু কাজের নাইকো ছিরি—
ফোঁস্ ক'রে যাই তেড়ে—আবার ল্যাজ গুটিয়ে ফিরি।
পাঁচটা জিনিস গড়তে গেলে, দশটা ভেঙে চুর—
বল্ দেখি ভাই কেমন আমি সাবাস বাহাদুর!

সকলে। উচিত তোমায় বেঁধে রাখা নাকে দিয়ে দড়ি,
বেগারখাটা পণ্ডকাজের মূল্য কানাকড়ি।

পঞ্চম। আমার নাম 'তবু', তোমরা কেউ কি আমায় চেনো?
দেখতে ছোট তবু আমার সাহস আছে জেনো।
এতটুকু মানুষ তবু দ্বিধা নাইকো মনে,
যে কাজেতেই লাগি আমি খাটি প্রাণপণে।
এম্নি আমার জেদ, যখন অঙ্ক নিয়ে বসি,
একুশ বারে না হয় যদি, বাইশ বারে কষি।
হাজার আসুক বাধা তবু উৎসাহ না কমে,
হাজার লোকে চোখ রাঙালে তবু না যাই দ'মে।

সকলে। নিষ্কর্মারা গেল কোথা, পালাল কোন দেশে?
কাজের মানুষ কারে বলে দেখুক এখন এসে।
হেসে খেলে, শুয়ে বসে কত সময় যায়,
সময়টা যে কাজে লাগায়, চালাক বলে তায়।
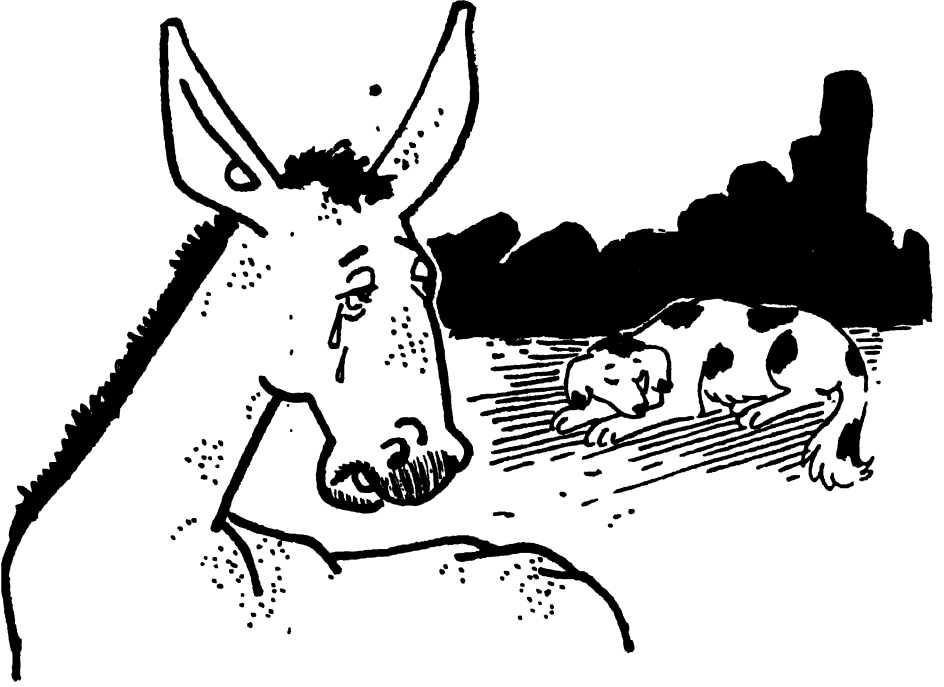
সাধে কি বলে গাধা?

বললে গাধা মনের দুঃখে অনেকখানি ভেবে—
"বয়েস গেল খাটতে খাটতে, বৃদ্ধ হলাম এবে,
কেউ করে না তোয়াজ তবু, সংসারের কি রীতি!
ইচ্ছে করে এক্ষুনি দিই কাজে কর্মে ইতি।
কোথাকার ঐ নোংরা কুকুর, আদর যে তার কত—
যখন তখন ঘুমোচ্ছে সে লাটসাহেবের মত!
ল্যাজ নেড়ে যেই, ঘেউ ঘেউ ঘেউ, লাফিয়ে দাঁড়ায় কোলে,
মনিব আমার বোক্‌চন্দর্‌, আহ্লাদে যান গলে।
আমিও যদি সেয়ানা হতুম, আরামে চোখ মুদে
রোজ মনিবের মন ভোলাতুম অম্নি নেচে কুঁদে।
ঠ্যাং নাচাতুম, ল্যাজ দোলাতুম, গান শোনাতুম সাধা—
এ বুদ্ধিটা হয়নি আমার—সাধে কি বলে গাধা!"

বুদ্ধি এঁটে বসল গাধা আহ্লাদে ল্যাজ নেড়ে,
নাচ্‌ল কত, গাইল কত, প্রাণের মায়া ছেড়ে।
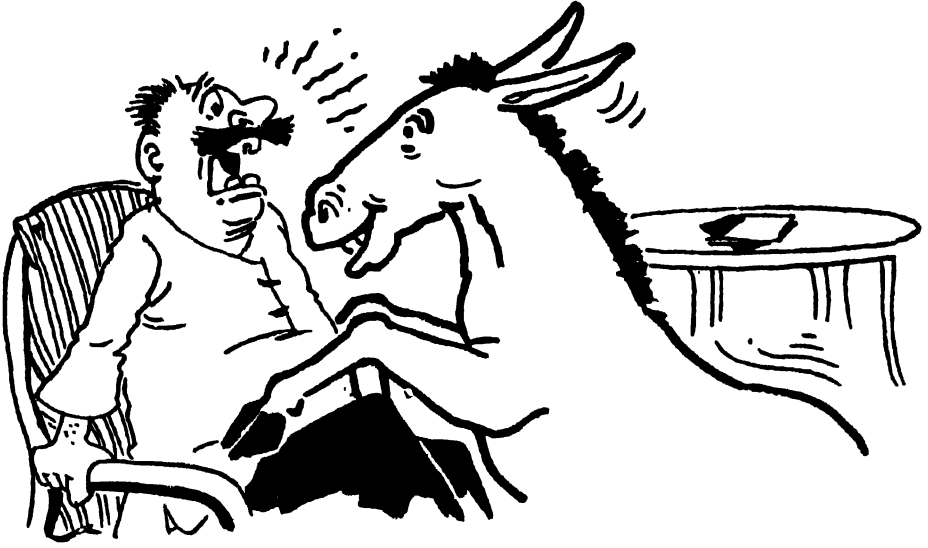
তারপরেতে শেষটা ক্রমে স্ফূর্তি এল প্রাণে
চলল গাধা খোদ্ মনিবের ড্রয়িংরুমের পানে।

মনিবসাহেব ঝিমুচ্ছিলেন চেয়ারখানি জুড়ে,
গাধার গলার শব্দে হঠাৎ তন্দ্রা গেল উড়ে।
চম্‌কে উঠে গাধার নাচন যেমনি দেখেন চেয়ে,
হাসির চোটে সাহেব বুঝি মরেন বিষম খেয়ে।

ভাবলে গাধা—এই তো মনিব জল হয়েছেন হেসে
এইবারে যাই আদর নিতে কোলের কাছে ঘেঁষে।
এই না ভেবে এক্কেবারে আহ্লাদেতে ক্ষেপে
চড়্ল সে তার হাঁটুর উপর দুই পা তুলে চেপে।
সাহেব ডাকেন 'ত্রাহি ত্রাহি' গাধাও ডাকে 'ঘ্যাঁকো'
(অর্থাৎ কিনা 'কোলে চড়েছি, এখন আমায় দ্যাখো!')
ডাক শুনে সব দৌড়ে এল ব্যস্ত হয়ে ছুটে,
দৌড়ে এল চাকর বাকর মিস্ত্রী মজুর মুটে,
দৌড়ে এল পাড়ার লোকে, দৌড়ে এল মালী—
কারুর হাতে ডাণ্ডা লাঠি, কারু বা হাত খালি।
ব্যাপার দেখে অবাক সবাই, চক্ষু ছানাবড়া—
সাহেব বললে, "উচিত মতন শাসনটি চাই কড়া।"
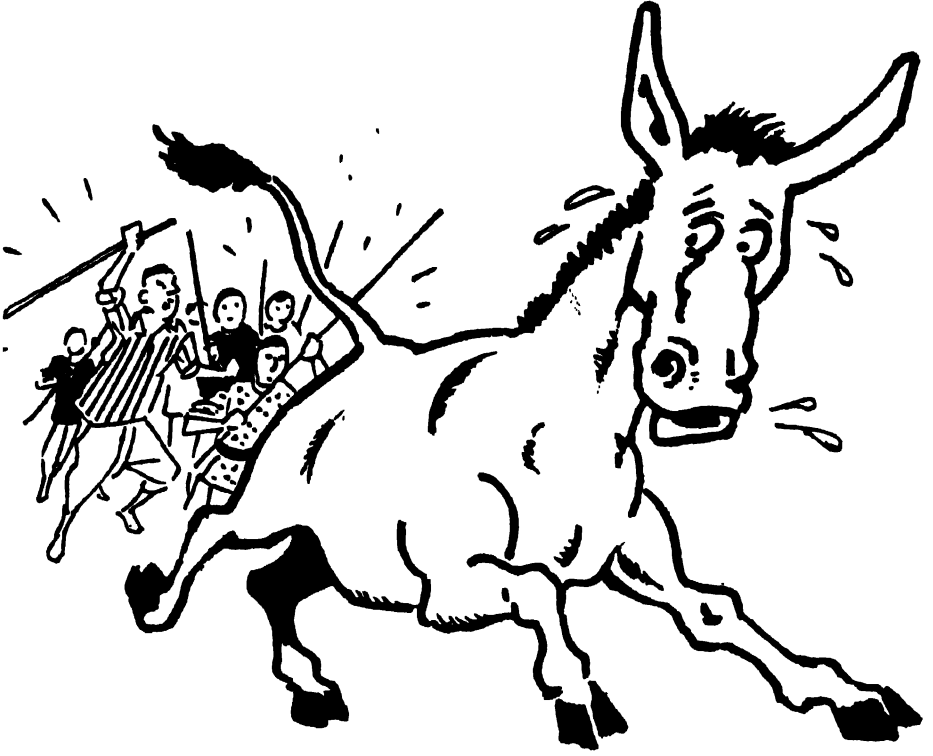
হাঁ হাঁ ব'লে ভীষণ রকম উঠ্‌ল সবাই চটে
দে দমাদম্ মারের চোটে গাধার চমক্ ছোটে।
ছুটল গাধা প্রাণের ভয়ে গানের তালিম ছেড়ে,
ছুটল পিছে একশো লোকে হুড়মুড়িয়ে তেড়ে।
তিন পা যেতে দশ ঘা পড়ে, রক্ত ওঠে মুখে—
কষ্টে শেষে রক্ষা পেল কাঁটার ঝোপে ঢুকে।
কাঁটার ঘায়ে চামড়া গেল, সার হল তার কাঁদা;
ব্যাপার শুনে বললে সবাই, "সাধে কি বলে গাধা?"

জালা-কুঁজো সংবাদ
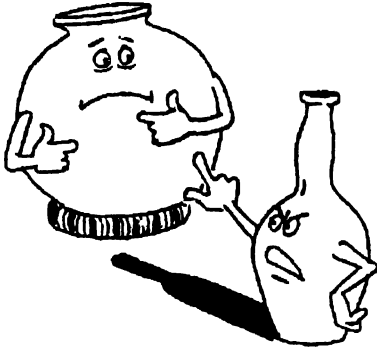
পেটমোটা জালা কয়, "হেসে আমি মরিরে
কুঁজো তোর হেন গলা এতটুকু শরীরে!"
কুঁজো কয়, "কথা কস্ আপনাকে না চিনে,
ভুঁড়িখানা দেখে তোর কেঁদে আর বাঁচিনে।"
জালা কয়, "সাগরের মাপে গড়া বপুখান,
ডুবুরিরা কত তোলে তবু জল অফুরান।"
কুঁজো কয়, "ভালো কথা! তবে যদি দৈবে,
ভুঁড়ি যায় ভেস্তিয়ে, জল কোথা রইবে?"
"নিজ কথা ভুলে যাস্?" জালা কয় গর্জে,
"ঘাড়ে ধরে হেঁট ক'রে জল নেয় তোর যে!"
কুঁজো কয়, "নিজ পায়ে তবু খাড়া রই তো—
বিঁড়ে বিনা কুপোকাৎ তেজ তোর ঐতো!"

তেজিয়ান্

চলে খচ্‌খচ্ রাগে গজ্‌গজ্ জুতা মচ্‌মচ্ তানে,
ভুরু কট্‌মট্ ছড়ি ফট্‌ফট্ লাথি চট্‌পট্ হানে।

দেখে বাঘ-রাগ লোকে 'ভাগ্‌ভাগ্' ক'রে আগভাগ থেকে,
ভয়ে লাফ ঝাঁপ বলে 'বাপ্ বাপ্' সবে হাবভাব দেখে।

লাথি চার চার খেয়ে মার্জার ছোটে যার যার ঘরে,
মহা উৎপাত ক'রে হুট্‌পাট্ চলে ফুট্‌পাথ্ পরে।

ঝাড়ুবর্দার হারুসর্দার ফেরে ঘরদ্বার ঝেড়ে,
তারি বাল্‌তি এ—দেখে ফাল্ দিয়ে আসে পাল্‌টিয়ে তেড়ে।

রেগে লালমুখে হেঁকে গাল রুখে মারে তাল ঠুকে দাপে,
মারে ঠন্ ঠন্ হাড়ে টন্ টন্ মাথা ঝন্ ঝন্ কাঁপে!

পায়ে কাল্‌সিটে! কেন বাল্‌তিতে মেরে চাল্ দিতে গেলে?
বুঝি ঠ্যাং যায় খোঁড়া ল্যাংচায় দেখে ভ্যাংচায় ছেলে।

হরিষে বিষাদ

দেখছে খোকা পঞ্জিকাতে এই বছরে কখন কবে
ছুটির কত খবর লেখে, কিসের ছুটি কদিন হবে।

ঈদ্ মহরম দোল্ দেওয়ালি বড়দিন আর বর্ষশেষে—
ভাবছে যত ফুল্লমুখে ফুর্তিভরে ফেলছে হেসে।

এমনকালে নীল আকাশে হঠাৎ-খ্যাপা মেঘের মত,
উথ্‌লে ছোটে কান্নাধারা ডুবিয়ে তাহার হর্ষ যত।

"কি হল তোর?" সবাই বলে, "কলমটা কি বিধঁল হাতে?"
"জিবে কি তোর দাঁত বসালি? কামড়াল কি ছারপোকাতে?"

প্রশ্ন শুনে কান্না চড়ে অশ্রু ঝরে দ্বিগুণ বেগে,
পঞ্জিকাটি আছড়ে ফেলে বললে কেঁদে আগুন রেগে;

"ঈদ্ পড়েছে জষ্ঠি মাসে গ্রীষ্মে যখন থাকেই ছুটি,
বর্ষশেষ আর দোল্ ত দেখি রোব্‌বারেতেই পড়ল দুটি।

দিনগুলোকে করলে মাটি মিথ্যে পাজি পঞ্জিকাতে—
মুখ ধোবনা ভাত খাবনা ঘুম যাবনা আজকে রাতে।"

আশ্চর্য!

নিরীহ কলম, নিরীহ কালি,
নিরীহ কাগজে লিখিল গালি—
"বাঁদর বেকুব আজব হাঁদা
বকাট্ ফাজিল অকাট্ গাধা।"
আবার লিখিল কলম ধরি
বচন মিষ্টি, যতন করি—
"শান্ত মানিক শিষ্ট সাধু
বাছারে, ধনরে, লক্ষ্মী যাদু।"
মনের কথাটি ছিল যে মনে,
রটিয়া উঠিল খাতার কোণে,
আঁচড়ে আঁকিতে আখর ক'টি
কেহ খুশি, কেহ উঠিল চটি!
রকম রকম কালির টানে
কারো হাসি কারো অশ্রু আনে,
মারে না, ধরে না, হাঁকে না বুলি
লোকে হাসে কাঁদে কি দেখি ভুলি?
শাদায় কালোয় কি খেলা জানে?
ভাবিয়া ভাবিয়া না পাই মানে।

হিতে বিপরীত

ওরে ছাগল, বল্‌ত আগে
সুড়সুড়িটা কেমন লাগে?
কই গেল তোর জারিজুরি
লম্ফঝম্ফ বাহাদুরি।
নিত্যি যে তুই আসতি তেড়ে
শিং নেড়ে আর দাড়ি নেড়ে।
ওরে ছাগল করবি রে কি?
গুঁতোবি তো আয়না দেখি।

হাঁ হাঁ হাঁ, এ কেমন কথা?
এমন ধারা অভদ্রতা!
শান্ত যারা ইতরপ্রাণী
তাদের পরে চোখরাঙানি!

ঠাণ্ডা মেজাজ কয় না কিছু
লাগতে গেছ তারই পিছু?
শিক্ষা তোদের এম্নিতর
ছি—ছি—ছি! লজ্জা বড়।

ছাগল ভাবে সামনে একি!
একটুখানি গুঁতিয়ে দেখি।
গুঁতোর চোটে ধড়াদ্ধড়
হুড়মুড়িয়ে ধুলোয় পড়।
তবে রে পাজি লক্ষ্মীছাড়া
আমার 'পরেই বিদ্যেঝাড়া,
পাত্রাপাত্র নাই কিরে হুঁশ্‌
দে দমাদম্ ধুপুস ধাপুস।

নিঃস্বার্থ

গোপ্‌লাটা কি হিংসুটে মা! খাবার দিলেম ভাগ করে,
বল্লে নাকো মুখেও কিছু, ফেল্লে ছুঁড়ে রাগ করে।
জ্যাঠাইমা যে মেঠাই দিলেন "দুই ভায়েতে খাও" ব'লে—
দশটি ছিল, একটি তাহার চাখতে নিলেম ফাও বলে।
আর যে ন'টি, ভাগ করে তায়, তিন্‌টে দিলেম গোপ্‌লাকে—
তবুও কেবল হ্যাংলা ছেলে আমার ভাগেই চোখ রাখে।
বুঝিয়ে বলি, "কাঁদিস্ কেন? তুই যে নেহাত কনিষ্ঠ—
বয়েস বুঝে সাম্‌লে খাবি—তা নৈলে হয় অনিষ্ট।
তিনটি বছর তফাৎ মোদের, জ্যায়দা হিসাব গুন্‌তি তাই,
মোদ্দা আমার ছয়খানি হয়, তিন বছরের তিন্‌টি পাই।"
তাও মানে না, কেবল কাঁদে—স্বার্থপরের শয়তানী—
শেষটা আমায় মেঠাইগুলো খেতেই হল সবখানি।

হারিয়ে পাওয়া

ঠাকুরদাদার চশমা কোথা?
ওরে গন্‌শা, হাবুল, ভোঁতা,
দেখ্‌না হেথা, দেখ্‌না হোথা—খোঁজ্‌ না নিচে গিয়ে।
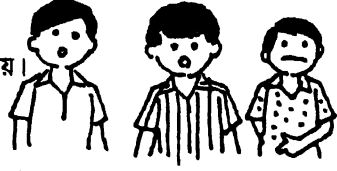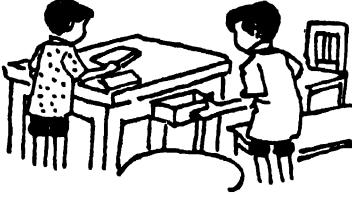
কই কই কই? কোথায় গেল?
টেবিল টানো, ডেস্কো ঠেল,
ঘরদোর সব উল্‌টে ফেল—খোঁচাও লাঠি দিয়ে।

খুঁজছে মিছে কুঁজোর পিছে,
জুতোর ফাঁকে, খাটের নিচে,
কেউ বা জোরে পর্দা খিঁচে—বিছ্‌না দেখে ঝেড়ে—
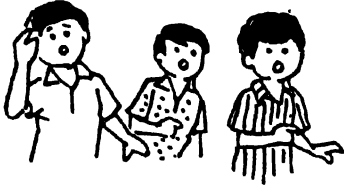
লাফিয়ে ঘুরে হাঁপিয়ে ঘেমে
ক্লান্ত সবে পড়্‌ল থেমে,
ঠাকুরদাদা আপনি নেমে আসেন তেড়েমেড়ে।

বলেন রেগে, "চশমাটা কি
ঠ্যাং গজিয়ে ভাগ্‌ল নাকি?
খোঁজার নামে কেবল ফাঁকি—দেখ্‌ছি আমি এসে!"
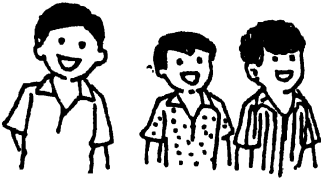
যেমন বলা দারুণ রোষে,
কপাল থেকে অম্নি খ'সে
চশমা পড়ে তক্তপোশে—সবাই ওঠে হেসে!

সঙ্গীহারা

সবাই নাচে ফূর্তি করে সবাই গাহে গান,
একলা বসে হাঁড়িচাঁচার মুখটি কেন ম্লান?
দেখ্‌ছ নাকি আমার সাথে সবাই করে আড়ি—
তাইতো আমার মেজাজ খ্যাপা মুখটি এমন হাঁড়ি।

তাও কি হয়! ঐ যে মাঠে শালিখ পাখি ডাকে
তার কাছে কৈ যাওনিতো ভাই শুধাওনিতো তাকে!
শালিখ পাখি বেজায় ঠ্যাঁটা চেঁচায় মিছিমিছি,
হল্লা শুনে হাড় জ্বলে যায় কেবল কিচিমিচি।

মিষ্টি সুরে দোয়েল পাখি জুড়িয়ে দিল প্রাণ
তার কাছে কৈ বসলে নাতো শুনলে না তার গান!
দোয়েল পাখির ঘ্যান্‌ঘ্যানানি আর কি লাগে ভালো?
যেমন রূপে তেমন গুণে তেমনি আবার কালো।

রূপ যদি চাও যাও না কেন মাছরাঙার কাছে,
অমন খাসা রঙের বাহার আর কি কারো আছে?
মাছরাঙা! তারেও কি আর পাখির মধ্যে ধরি
রকম সকম সঙের মতন, দেমাক দেখে মরি।

পায়রা ঘুঘু কোকিল চড়াই চন্দনা টুনটুনি
কারে তোমার পছন্দ হয়, সেই কথাটি শুনি!
এইগুলো সব ছ্যাবলা পাখি নেহাৎ ছোট জাত—
দেখলে আমি তফাৎ হঠি অমনি পাঁচিশ হাত!

এতক্ষণে বুঝতে পারি ব্যাপারখানা কি যে—
সবার তুমি খুঁৎ পেয়েছ নিখুঁৎ কেবল নিজে!
মনের মতন সঙ্গী তোমার কপালে নাই লেখা
তাইতে তোমায় কেউ পোঁছে না তাইতে থাক একা।
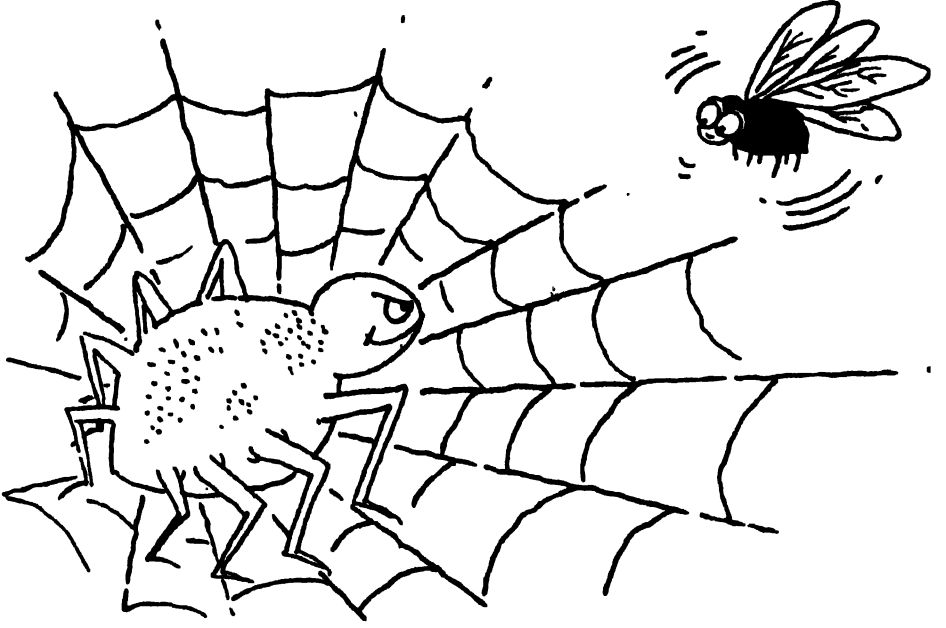
মূর্খ মাছি

মাকড়সা। সান্‌-বাঁধা মোর আঙিনাতে
জাল্‌ বুনেছি কাল্‌কে রাতে,
ঝুল ঝেড়ে সব সাফ করেছি বাসা।
আয় না মাছি আমার ঘরে,
আরাম পাবি বসলে পরে,
ফরাশ্‌ পাতা দেখবি কেমন খাসা!

মাছি। থাক্‌ থাক্‌ থাক্‌ আর বলে না,
আন্‌কথাতে মন গলে না—
ব্যবসা তোমার সবার আছে জানা।
ঢুক্‌লে তোমার জালের ঘেরে
কেউ কোনদিন আর কি ফেরে?
বাপ্‌রে! সেথায় ঢুক্‌তে মোদের মানা।
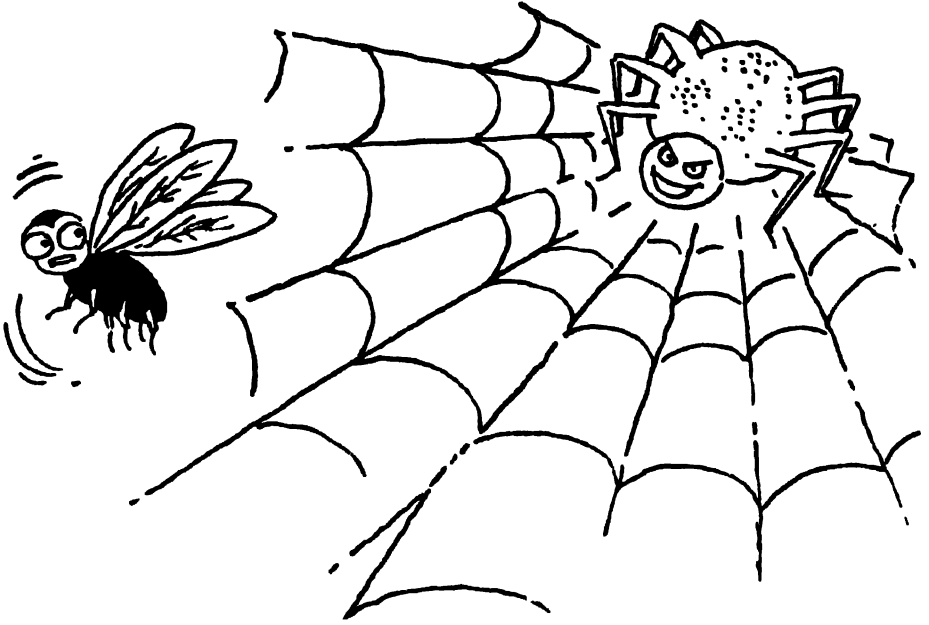
মাকড়সা। হাওয়ায় দোলে জালের দোলা
চারদিকে তার জালনা খোলা
আপ্‌নি ঘুমে চোখ যে আসে জুড়ে!
আয় না হেথা হাত পা ধুয়ে
পাখ্‌না মুড়ে থাক্ না শুয়ে—
ভন্ ভন্ ভন্ মরবি কেন উড়ে?

মাছি। কাজ নেই মোর দোলায় দুলে,
কোথায় তোমার কথায় ভুলে
প্রাণটা নিয়ে টান্ পড়ে ভাই শেষে।
তোমার ঘরে ঘুম যদি পায়
সে ঘুম কভু ভাঙবে না হায়—
সে ঘুম নাকি এমন সর্বনেশে!
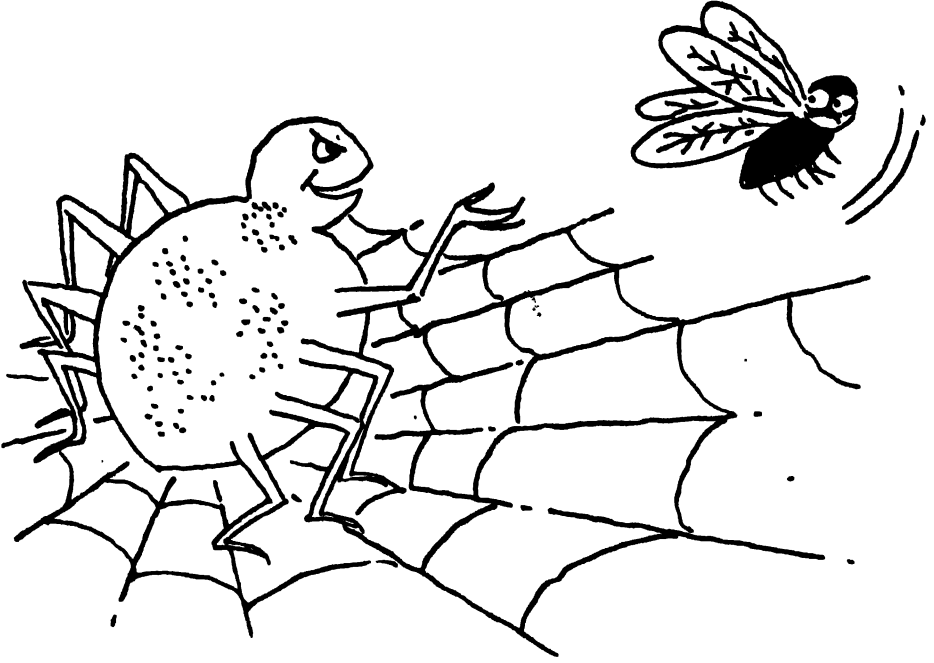
মাকড়সা। মিথ্যে কেন ভাবিস্ মনে?
দেখ্‌না এসে ঘরের কোণে,
ভাঁড়ার ভরা খাবার আছে কত!
দে-টপাটপ্ ফেল্‌বি মুখে
নাচ্‌বি গাবি থাক্‌বি সুখে
ভাবনা ভুলে বাদ্‌শা-রাজার মতো।

মাছি। লোভ দেখালেই ভুলবে ভবি,
ভাব্‌ছ আমায় তেম্‌নি লোভী!
মিথ্যে দাদা ভোলাও কেন খালি?
কর্‌ব কি ছাই ভাঁড়ার দেখে?
প্রণাম করি আড়াল থেকে—
আজকে তোমার সেই গুড়ে ভাই বালি।
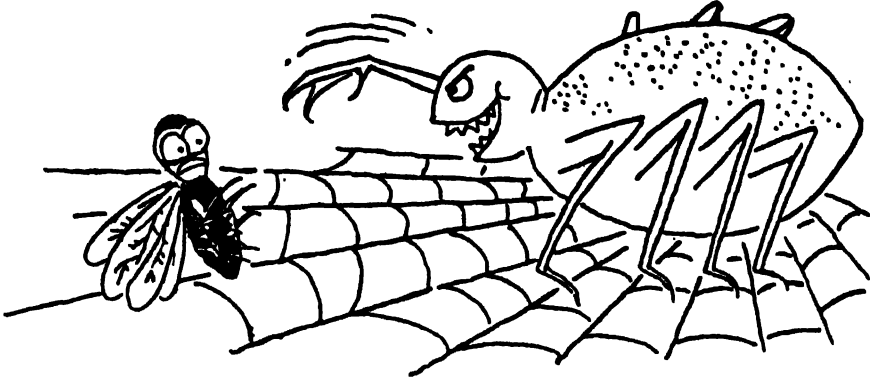
মাকড়সা। নধর কালো বদন ভ'রে
রূপ যে কত উপ্‌চে পড়ে!
অবাক দেখি মুকুটমালা শিরে!
হাজার চোখে মাণিক জ্বলে!
ইন্দ্রধনু পাখার তলে!—
ছয় পা ফেলে আয় না দেখি ধীরে।

মাছি। মন ফুর্‌ফুর্‌ ফুর্তি নাচে—
একটুখানিক যাই না কাছে!
যাই যাই যাই—বাপ্‌রে একি ধাঁধা!
—ও দাদা ভাই রক্ষে কর!
ফাঁদ পাতা এ কেমনতরো!
আট্‌কা পড়ে হাত পা হল বাঁধা।

দুষ্টুলোকের মিষ্টি কথায়
নাগলে লোকের স্বস্তি কোথায়?
এম্নি দশাই তার কপালে লেখে।
কথার পাকে মানুষ মেরে
মাকড়জীবী ওই যে ফেরে
গড় করি তায় অনেক তফাত থেকে॥*

একটি বিখ্যাত ইংরেজি কবিতার অনুকরণে

জীবনের হিসাব

বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই চড়ি সখের বোটে
মাঝিরে কন, "বল্‌তে পারিস্‌ সূর্যি কেন ওঠে?
চাঁদটা কেন বাড়ে কমে? জোয়ার কেন আসে?"
বৃদ্ধ মাঝি অবাক হয়ে ফ্যাল্‌ফেলিয়ে হাসে।
বাবু বলেন, "সারা জনম মর্‌লিরে তুই খাটি,
জ্ঞান বিনা তোর জীবনটা যে চারি আনাই মাটি!"

খানিক বাদে কহেন বাবু "বল্‌ত দেখি ভেবে
নদীর ধারা কেম্‌নে আসে পাহাড় হতে নেবে?
বল্‌ত কেন লবণপোরা সাগরভরা পানি?"
মাঝি সে কয়, "আরে মশাই অত কি আর জানি?"
বাবু বলেন, "এই বয়সে জানিসনেও তাকি?
জীবনটা তোর নেহাৎ খেলো, অষ্ট আনাই ফাঁকি।"

আবার ভেবে কহেন বাবু "বল্‌তো ওরে বুড়ো,
কেন এমন নীল দেখা যায় আকাশের ঐ চুড়ো?
বল্‌ত দেখি সূর্য চাঁদে গ্রহণ লাগে কেন?"
বৃদ্ধ বলে, "আমায় কেন লজ্জা দেছেন হেন?"
বাবু বলেন, "বল্‌ব কি আর, বল্‌ব তোরে কি তা,—
দেখ্‌ছি এখন জীবনটা তোর বারো আনাই বৃথা।"

খানিক বাদে ঝড় উঠেছে ঢেউ উঠেছে ফুলে,
বাবু দেখেন নৌকোখানি ডুব্‌ল বুঝি দুলে।
মাঝিরে কন, "একি আপদ! ওরে ও ভাই মাঝি,
ডুব্‌ল নাকি নৌকো এবার? মরব নাকি আজি?"
মাঝি শুধায়, "সাঁতার জানো?" মাথা নাড়েন বাবু,
মূর্খ মাঝি বলে, "মশাই, এখন কেন কাবু?
বাঁচলে শেষে আমার কথা হিসেব করো পিছে,
তোমার দেখি জীবনখানা ষোল আনাই মিছে।"

নিরুপায়

বসি বছরের পয়লা তারিখে
মনের খাতায় রাখিলাম লিখে—
"সহজ উদরে ধরিবে যেটুক,
সেইটুকু খাব হব না পেটুক।"
মাস দুই যেতে খাতা খুলে দেখি
এরি মাঝে মন লিখিয়াছে একি!
লিখিয়াছে "যদি নেমন্তন্নে
কেঁদে ওঠে প্রাণ লুচির জন্যে,
উচিত হবে কি কাঁদান তাহারে?
কিম্বা যখন বিপুল আহারে,
তেড়ে দেয় পাতে পোলাও কালিয়া
পায়েস অথবা রাবড়ি ঢালিয়া—
তখন কি করি, আমি নিরুপায়!
তাড়াতে না পারি, বলি আয় আয়,
ঢুকে আয় মুখে দুয়ার ঠেলিয়া
উদার রয়েছি উদর মেলিয়া!"

●

চলে হন্ হন্ ছোটে পন্ পন্
ঘোরে বন্ বন্ কাজে ঠন্ ঠন্
বায়ু শন্ শন্ শীতে কন্ কন্
কাশি খন্ খন্ ফোঁড়া টন্ টন্
মাছি ভন্ ভন্ থালা ঝন্ ঝন্

●

দাদা গো দাদা, সত্যি তোমার সুরগুলো খুব খেলে!
এম্নি মিঠে—ঠিক যেন কেউ গুড় দিয়েছে ঢেলে!
দাদা গো দাদা, এমন খাসা কণ্ঠ কোথায় পেলে?—
এই খেলে যা! গান শোনাতে আমার কাছেই এলে?
দাদা গো দাদা, পায় পড়ি তোর, ভয় পেয়ে যায় ছেলে—
গাইবে যদি ঐখেনে গাও, ঐ দিকে মুখ মেলে।

●

কেন সব কুকুরগুলো খামখা চ্যাঁচায় রাতে?
কেন বল্ দাঁতের পোকা থাকে না ফোক্লা দাঁতে?
পৃথিবীর চ্যাপ্টা মাথা, কেন সে কাদের দোষে?—
এস ভাই চিন্তা করি দুজনে ছায়ায় বসে।

নন্দগুপি

হঠাৎ কেন দুপুর রোদে চাদর দিয়ে মুড়ি,
চোরের মত নন্দগোপাল চল্‌ছে গুড়ি গুড়ি?
লুকিয়ে বুঝি মুখোশখানা রাখছে চুপি চুপি?
আজকে রাতে অন্ধকারে টেরটা পাবেন গুপি!

আয়না হাতে দাঁড়িয়ে গুপি হাসছে কেন খালি?
বিকট রকম পোশাক করে মাখ্‌ছে মুখে কালি!
এম্নি করে লম্ফ দিয়ে ভেংচি যখন দেবে
নন্দ কেমন আঁৎকে যাবে—হাস্‌ছে সে তাই ভেবে।

আঁধার রাতে পাতার ফাঁকে ভূতের মতন কেরে?
ফন্দি এঁটে নন্দগোপাল মুখোশ মুখে ফেরে!
কোথায় গুপি, আসুক না সে ইদিক্‌ পানে ঘুরে—
নন্দদাদার হুঙ্কারে তার প্রাণটি যাবে উড়ে।

হেথায় কেরে মূর্তি ভীষণ মুখটি ভরা গোঁফে?
চিমটে হাতে জংলা গুপি বেড়ায় ঝাড়ে ঝোপে!
নন্দ যখন বাড়ির পথে আস্‌বে গাছের আড়ে,
"মার্‌ মার্‌ মার্‌ কাট্‌রে" বলে পড়্‌বে তাহার ঘাড়ে!

নন্দ চলেন এক পা দু পা আস্তে ধীরে গতি,
টিপিটিপি চলেন গুপি সাবধানেতে অতি—
মোড়ের মুখে ঝোপের কাছে মার্‌তে গিয়ে উঁকি
দুই সেয়ানে এক্কেবারে হঠাৎ মুখোমুখি!

নন্দ তখন ফন্দি ফাঁদন কোথায় গেল ভুলি
কোথায় গেল গুপির মুখে মার্‌ মার্‌ মার্‌ বুলি!
নন্দ পড়েন দাঁতকপাটি মুখোশ্‌ টুখোশ্‌ ছেড়ে
গুপির গায়ে জ্বরটি এল কম্প দিয়ে তেড়ে।

গ্রামের লোকে দৌড়ে তখন বদ্যি আনে ডেকে
কেউ বা নাচে কেউ বা কাঁদে রকম সকম দেখে।
নন্দগুপির মন্দ কপাল এম্‌নি হল শেষে
দেখ্‌লে তাদের লুটোপুটি সবাই মরে হেসে!

বর্ষ গেল, বর্ষ এল

বর্ষ গেল বর্ষ এল, গ্রীষ্ম এলেন বাড়ি—
পৃথ্বী এলেন চক্র দিয়ে এক বছরের পাড়ি।
সত্যিকারের এই পৃথিবী বয়স কেবা জানে,
লক্ষ হাজার বছর ধরে চল্‌ছে একই টানে।
আপন তালে আকাশ পথে আপনি চলে বেগে,
গ্রীষ্মকালের তপ্তরোদে বর্ষাকালের মেঘে,
শরৎকালের কান্নাহাসি হাল্কা বাদল হাওয়া,
কুয়াশা-ঘেরা পর্দা ফেলে হিমের আসা যাওয়া—
শীতের শেষে রিক্ত বেশে শূন্য করে ঝুলি,
তার প্রতিশোধ ফুলে ফলে বসন্তে লয় তুলি।
না জানি কোন নেশার ঝোঁকে যুগযুগান্ত ধরে,
ছয়টি ঋতুর দ্বারে দ্বারে পাগল হয়ে ঘোরে!
না জানি কোন ঘূর্ণীপাকে দিনের পরে দিন,
এমন ক'রে ঘোরায় তারে নিদ্রাবিরামহীন!
কাঁটায় কাঁটায় নিয়ম রাখে লক্ষযুগের প্রথা,
না জানি তার চাল চলনের হিসাব রাখে কোথা!
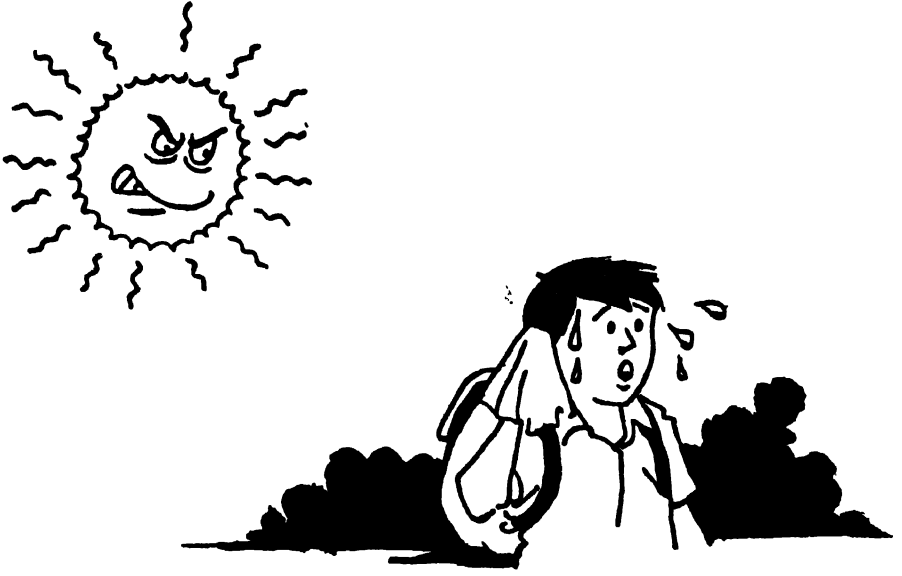
গ্রীষ্ম

ঐ এল বৈশাখ ঐ নামে গ্রীষ্ম,
খাইখাই রবে যেন ভয়ে কাঁপে বিশ্ব!
চোখে যেন দেখি তার ধুলিমাখা অঙ্গ,
বিকট কুটিলজটে ভ্রূকুটির ভঙ্গ,
রোদে রাঙা দুই আঁখি শুকায়েছে কোটরে,
ক্ষুধার আগুন যেন জ্বলে তার জঠরে!
মনে হয় বুঝি তার নিঃশ্বাস মাত্রে
তেড়ে আসে পালাজ্বর পৃথিবীর গাত্রে:
ভয় লাগে হয় বুঝি ত্রিভুবন ভস্ম—
ওরে ভাই ভয় নাই পাকে ফল শস্য!
তপ্ত ভীষণ চুলা জ্বালি নিজ বক্ষে
পৃথিবী বসেছে পাকে, চেয়ে দেখ চক্ষে,—
আম পাকে, জাম পাকে, ফল পাকে কত যে,
বুদ্ধি যে পাকে কত ছেলেদের মগজে!

বর্ষার কবিতা

কাগজ কলম লয়ে বসিয়াছি সদ্য,
আষাঢ়ে লিখিতে হবে বরষার পদ্য।
কি যে লিখি কি যে লিখি ভাবিয়া না পাই রে,
হতাশে বসিয়া তাই চেয়ে থাকি বাইরে।
সারাদিন ঘনঘটা কালো মেঘ আকাশে,
ভিজে ভিজে পৃথিবীর মুখখানা ফ্যাকাশে।
বিনা কাজে ঘরে বাঁধা কেটে যায় বেলাটা,
মাটি হল ছেলেদের ফুটবল খেলাটা।
আপিসের বাবুদের মুখে নাই ফুর্তি,
ছাতা কাঁধে জুতা হাতে ভ্যাবাচ্যাকা মূর্তি।
কোনখানে হাঁটু জল, কোথা ঘন কর্দম—
চলিতে পিছল পথে পড়ে লোকে হর্‌দম।
ব্যাঙেদের মহাসভা আহ্লাদে গদ্‌গদ্‌,
গান করে সারারাত অতিশয় বদ্‌খদ্‌।

শ্রাবণে

জল ঝরে জল ঝরে সারাদিন সারারাত—
অফুরান নাম্‌তায় বাদলের ধারাপাত।
আকাশের মুখ ঢাকা, ধোঁয়ামাখা চারিধার,
পৃথিবীর ছাত পিটে ঝমাঝম্‌ বারিধাব।
স্নান করে গাছপালা প্রাণখোলা বরষায়,
নদীনালা ঘোলাজল ভরে ওঠে ভরসায়।
উৎসব ঘনঘোর উন্মাদ শ্রাবণের
শেষ নাই শেষ নাই বরষার প্লাবনের।
জলেজলে জলময় দশদিক্‌ টলমল্‌,
অবিরাম একই গান, ঢালো জল, ঢালো জল।
ধুয়ে যায় যত তাপ জর্জর গ্রীষ্মের,
ধুয়ে যায় রৌদ্রের স্মৃতিটুকু বিশ্বের।
শুধু যেন বাজে কোথা নিঃঝুম ধুক্‌ধুক্‌,
ধরণীর আশাভয় ধরণীর সুখদুখ।
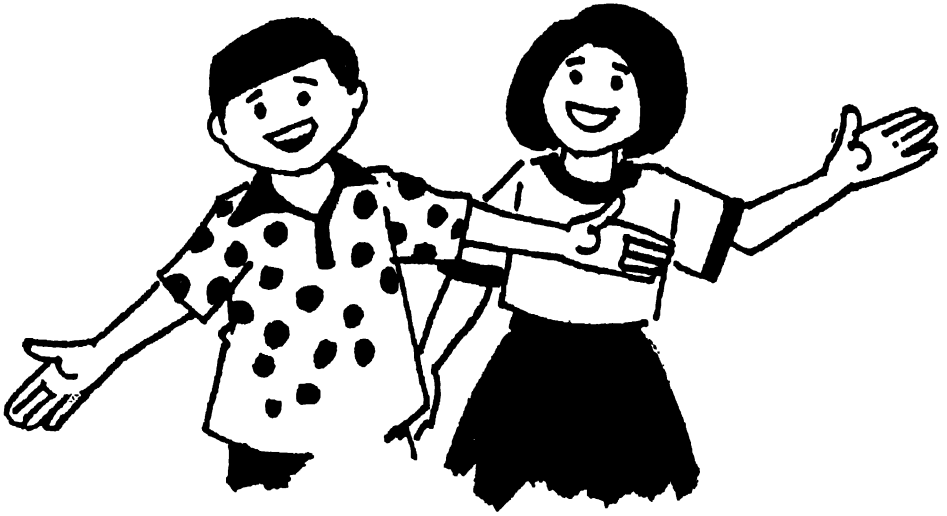
বর্ষ শেষ

শুন রে আজব কথা, শুন বলি ভাই রে—
বছরের আয়ু দেখ আর বেশি নাই রে।
ফেলে দিয়ে পুরাতন জীর্ণ এ খোলসে
নূতন বরষ আসে, কোথা হতে বল সে!
কবে যে দিয়েছে চাবি জগতের যন্ত্রে,
সেই দমে আজও চলে না জানি কি মন্ত্রে!
পাকে পাকে দিনরাত ফিরে আসে বার বার,
ফিরে আসে মাস ঋতু—এ কেমন কারবার।
কোথা আসে কোথা যায় নাহি কোনো উদ্দেশ,
হেসে খেলে ভেসে যায় কত দূর দূর দেশ।
রবি যায় শশী যায় গ্রহ তারা সব যায়,
বিনা কাঁটা কম্পাসে বিনা কল কব্জায়।
ঘুরপাকে ঘুরে চলে, চলে কত ছন্দে,
তালে তালে হেলে দুলে চলেরে আনন্দে।

অতীতের ছবি

১

ছিল এ-ভারতে এমন দিন
মানুষের মন ছিল স্বাধীন;
সহজ উদার সরল প্রাণে
বিস্ময়ে চাহিত জগত পানে।
আকাশে তপন তারকা চলে,
নদী যায় ভেসে, সাগর টলে,
বাতাস ছুটিছে আপন কাজে,
পৃথিবী সাজিছে নানান্ সাজে;
ফুলে ফলে ছয় ঋতুর খেলা,
কত রূপ কত রঙের মেলা;
মুখরিত বন পাখির গানে,
অটল পাহাড় মগন ধ্যানে;
নীলাকাশে ঘন মেঘের ঘটা,
তাহে ইন্দ্রধনু বিজলী ছটা,
তাহে বারিধারা পড়িছে ঝরি—
দেখিত মানুষ নয়ন ভরি।
কোথায় চলেছে কিসের টানে
কোথা হতে আসে, কেহ না জানে।
ভাবিত মানব দিবস-যামী,
ইহারি মাঝারে জাগিয়া আমি,
কিছু নাহি বুঝি কিছু না জানি,
দেখি দেখি আর অবাক মানি।
কেন চলি ফিরি কিসের লাগি
কখন ঘুমাই কখন জাগি,
কত কান্না হাসি দুখে ও সুখে
ক্ষুধা তৃষ্ণা কত বাজিছে বুকে।
জন্ম লভি জীব জীবন ধরে,
কোথায় মিলায় মরণ পরে?
ভাবিতে ভাবিতে আকুল প্রাণে
ডুবিত মানব গভীর ধ্যানে।
অকূল রহস্য-তিমির তলে,
জ্ঞানজ্যোতির্ময় প্রদীপ জ্বলে,
সমাহিত চিতে যতন করি
অচঞ্চল শিখা সে আলো ধরি
দিব্য জ্ঞানময় নয়ন লভি,
হেরিল নূতন জগত ছবি।
অনাদি নিয়মে অনাদি স্রোতে
ভাসিয়া চলেছে অকূল পথে
প্রতি ধূলিকণা নিখিল টানে
এক হতে ধায় একেরি পানে,
চলেছে একেরি শাসন মানি,
লোকে লোকান্তরে একেরি বাণী।
এক সে অমৃতে হয়েছে হারা
নিখিল জীবন-মরণ ধারা।
সে অমৃতজ্যোতি আকাশ ঘেরি,
অন্তরে বাহিরে অমৃত হেরি।
যাঁহা হতে জীব জনম লভে,
যাঁহা হতে ধরে জীবন সবে,
যাঁহার মাঝারে মরণ পরে
ফিরি পুন সবে প্রবেশ করে,
তাঁহারে জানিবে যতন ধরি
তিনি ব্রহ্ম তাঁরে প্রণাম করি।
আনন্দেতে জীব জনম লভে
আনন্দে জীবিত রয়েছে সবে;
আনন্দে বিরাম লভিয়া প্রাণ
আনন্দের মাঝে করে প্রয়াণ।
শুন বিশ্বলোক, শুনহ বাণী
অমৃতের পুত্র সকল প্রাণী,
দিব্যধামবাসী শুনহ সবে—
জেনেছি তাঁহারে, যিনি এ ভবে
মহান পুরুষ, নিখিল গতি,
তমসার পরে পরম জ্যোতি।
তেজোময় রূপ হেরিয়া তাঁরে
স্তব্ধ হয় মন, বচন হারে।
বামে ও দখিনে উপরে নীচে,
ভিতরে বাহিরে, সমুখে পিছে,

কিবা জলেস্থলে আকাশ পরে,
আঁধারে আলোকে চেতনে জড়ে;
আমার মাঝারে, আমারে ঘেরি
এক ব্রহ্মময় প্রকাশ হেরি।
সে আলোকে চাহি আপন পানে
আপনারে মন স্বরূপ জানে।
আমি আমি করি দিবস-যামী,
না জানি কেমন কোথা সে 'আমি'।
অজয় অমর অরূপ রূপ
নহি আমি এই জড়ের স্তূপ,
দেহ নহে মোর চির-নিবাস
দেহের বিনাশে নাহি বিনাশ।
বিশ্ব আত্মা মাঝে হয়ে মগন
আপন স্বরূপ হেরিলে মন
না থাকে সন্দেহ না থাকে ভয়
শোক তাপ মোহ নিমেষে লয়,
জীবনে মরণে না রহে ছেদ,
ইহ-পরলোকে না রহে ভেদ।
ব্রহ্মানন্দময় পরম ধাম,
হেথা আসি সবে লভে বিরাম;
পরম সম্পদ পরম গতি,
লভ তাঁরে জীব যতনে অতি।

২

কালচক্রে হায় এমন দেশে
ঘোর দুঃখদিন আসিল শেষে।
দশদিক হতে আঁধার আসি
ভারত আকাশ ফেলিল গ্রাসি।
কোথা সে প্রাচীন জ্ঞানের জ্যোতি,
সত্য অন্বেষণে গভীর মতি;
কোথা ব্রহ্মজ্ঞান সাধন ধন,
কোথা ঋষিগণ ধ্যানে মগন;
কোথা ব্রহ্মচারী তাপস যত,
কোথা সে ব্রাহ্মণ সাধনা রত?

একে একে সবে মিলাল কোথা,
আর নাহি শুনি প্রাচীন কথা।
মহামূল্য নিধি ঠেলিয়া পায়
হেলায় মানুষ হারাল তায়।
আপন স্বরূপ ভুলিয়া মন
ক্ষুদ্রের সাধনে হল মগন।
ক্ষুদ্র চিন্তা মাঝে নিয়ত মজি,
ক্ষুদ্র স্বার্থ-সুখ জীবনে ভজি;
ক্ষুদ্র তৃপ্তি লয়ে মূঢ়ের মত
ক্ষুদ্রের সেবায় হইল রত।
রচি নব নব বিধি-বিধান
নিগড়ে বাঁধিল মানব প্রাণ;
সহস্র নিয়ম নিষেধ শত,
তাহে বদ্ধ নর জড়ের মত;
লিখি দাসখত ললাটে তার
রুদ্ধ করি দিল মনের দ্বার।
জ্বলন্ত যাঁহার প্রকাশ ভবে
হায়রে তাঁহারে ভুলিল সবে;
কল্পনার পিছে ধাইল মন,
কল্পিত দেবতা হল সৃজন,
কল্পিত রূপের মূরতি গড়ি,
মিথ্যা পূজাচার রচন করি,
ব্যাখ্যা করি তার মহিমা শত,
মিথ্যা শাস্ত্রবাণী রচিল কত।
তাহে তৃপ্ত হয়ে অবোধ নরে
রহে উদাসীন মোহের ভরে
না জাগে জিজ্ঞাসা অলস মনে,
দেখিয়া না দেখে পরম ধনে।
ব্রাহ্মণেরে লোকে দেবতা মানি
নির্বিচারে শুনে তাহারি বাণী।
পিতৃপুরুষের প্রসাদ বরে
বসি উচ্চাসনে গরব ভরে
পূজা-উপচার নিয়ত লভি
ভুলিল ব্রাহ্মণ নিজ পদবী।

কিসে নিত্যকাল এ ভারতভবে
আপন শাসন অটুট রবে
এই চিন্তা সদা করি বিচার
হল স্বার্থপর হৃদয় তার।
ভেদবুদ্ধিময় মানব মন
নব নব ভেদ করে সৃজন।
জাতিরে ভাঙিয়া শতধা করে,
তাহার উপরে সমাজ গড়ে;
নানা বর্ণ নানা শ্রেণীবিচার,
নানা কূটবিধি হল প্রচার।
ভেদ বুদ্ধি কত জীবন মাঝে
অশনে বসনে সকল কাজে.
ধর্ম অধিকারে বিচার ভেদ
মানুষে মানুষে করে প্রভেদ।
ভেদ জনে জনে, নারী ও নরে,
জাতিতে জাতিতে বিচার ঘরে।
মিথ্যা অহংকারে মোহের বশে
জাতির একতা বাঁধন খসে;
হয়ে আত্মঘাতী ভারতভবে
আপন কল্যাণ ভুলিল সবে।

৩

এখনও গভীর তমসা রাতি,
ভারত ভবনে নিভিছে বাতি—
মানুষ না দেখি ভারতভূমে,
সবাই মগন গভীর ঘুমে।
কত জাতি আজ হেলার ভরে
হেথায় আসিয়া বসতি করে।
ভারতের বুকে নিশান গাঁথি
বসেছে সবলে আসন পাতি।
নিজ ধনবান নিজ বিভব
বিদেশীর হাতে সঁপিয়া সব,
ভারতের মুখে না ফুটে বাণী,
মৌন রহে দেশ শরম মানি।

—হেন কালে শুন ভেদি আঁধার
সুগম্ভীর বাণী উঠিল কার—
"ভাব সেই একে ভাবহ তাঁরে,
জলে স্থলে শূন্যে হেরিছ যাঁরে;
নিয়ত যাঁহার স্বরূপ ধ্যানে
দিব্য জ্ঞান জাগে মানব প্রাণে।
ছাড় তুচ্ছ পূজা জড় সাধন,
মিথ্যা দেবসেবা ছাড় এখন;
বেদান্তের বাণী স্মরণ কর,
ব্রহ্মজ্ঞান-শিখা হৃদয়ে ধর।
সত্য মিথ্যা দেখ করি বিচার
খুলি দাও যত মনের দ্বার।
মানুষের মত স্বাধীন প্রাণে
নির্ভয়ে তাকাও জগত পানে—
দিকে দিকে দেখ ঘুচিছে রাতি,
দিকে দিকে জাগে কত না জাতি
দিকে দিকে লোক সাধনারত
জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলেছে কত।
নাহি কি তোমার জ্ঞানের খনি!
বেদান্ত-রতন মুকুটমণি?
অসারে মজে কি ভুলেছ তুমি
ধর্মে গরীয়ান ভারতভূমি?"
—শুনি মৃতদেশ পরান পায়,
বিস্ময়ে মানুষ ফিরিয়া চায়।
দেখে দিব্যরূপ পুরুষবরে
কান্তি তেজোময় নয়ন হরে,
সবল শরীর সুঠাম অতি,
ললাট প্রসর, নয়নে জ্যোতি,
গম্ভীর স্বভাব, বচন ধীর,
সত্যের সংগ্রামে অজেয় বীর;
অতুল প্রখর প্রতিভাবরে
নানা শাস্ত্র ভাষা বিচার করে।
রামমোহনের[১] জীবন স্মরি,
কৃতজ্ঞতা ভরে প্রণাম করি।

দেশের দুর্গতি সকলখানে
হেরিয়া বাজিল রাজার প্রাণে।
কত অসহায় অবোধ নারী
সতীত্বের নামে সকল ছাড়ি,
কেহ স্ব-ইচ্ছায়, কেহবা ভয়ে,
শাসনে-তাড়নে পিষিত হয়ে,
পতির চিতায় পুড়িয়া মরে—
শুনি কাঁদে প্রাণ তাদের তরে।
নারীদুঃখ নাশ করিল পণ,
ঘুচিল নারীর সহমরণ।
নিষ্কাম করম-যোগীর মত
দেশের কল্যাণ সাধনে রত,
নানা শাস্ত্রবাণী করে চয়ন,
দেশ দেশান্তের ঋষিবচন;
পশ্চিমের নব জ্ঞানের বাণী
দেশের সমুখে ধরিল আনি।
কিরূপেতে পুন এ ভারতভবে
ব্রহ্মজ্ঞান কথা প্রচার হবে,
নিয়ত যতন তাহারি তরে,
কত শ্রম কত প্রয়াস করে;
তর্ক আলোচনা কত বিচার
কত গ্রন্থ রচি' করে প্রচার;
—ক্রমে বিনাশিতে জড় ধরম
'ব্রহ্ম সমাজে'র হল জনম।
শুনে দেশবাসী নূতন কথা,
মূরতিবিহীন পূজার প্রথা;
উপাসনা-গৃহ দেখে নূতন
যেথায় স্বদেশী-বিদেশী জন
শূদ্র দ্বিজ আদি মিলিয়া সবে
নির্বিচারে সদা আসন লভে।
মহাপুরুষের বিপুল শ্রমে
দেশে যুগান্তর আসিল ক্রমে।
স্বদেশের তরে আকুল প্রাণ
প্রবাসেতে রাজা করে প্রয়াণ;
সেথায় সুদূর বিলাতে হায়
অকালেতে রাজা ত্যজিল কায়।
অসমাপ্ত কাজ রহিল পড়ে,
ফিরে যায় লোকে নিরাশা ভরে;
একে একে সব যেতেছে চলে—
ভাসে রামচন্দ্র' নয়নজলে।
রাজার জীবন নিয়ত স্মরি'
উপাসনা-গৃহে রহে সে পড়ি,
নিয়ম ধরিয়া পূজার কালে
নিষ্ঠাভরে সেথা প্রদীপ জ্বালে।
একা বসি ভাবে, রাজার কাজ
এমন দুর্দিনে কে লবে আজ?

৪

ধনী যুবা এক শ্মশান ঘাটে
একা বসি তার রজনী কাটে।
অদূরে অন্তিম শয়নোপরি
দিদিমা তাহার আছেন পড়ি,
সমুখে পূর্ণিমা গগনতলে,
পিছনে শ্মশানে আগুন জ্বলে,
তাহারি মাঝারে নদীর তীরে
হরিনাম ধ্বনি উঠিছে ধীরে।
একাকী যুবক বসিয়া কূলে
সহসা কি ভাবি আপনা ভুলে।
প্রসন্ন আকাশ চাঁদিম রাতি
ধরিল অপূর্ব নূতন ভাতি,
তুচ্ছ বোধ হল ধন-বিভব
বিলাস বাসনা অসার সব,
অজানা কি যেন সহসা স্মরি
পলকে পরান উঠিল ভরি।
আর কি সে মন বিরাম মানে?
গভীর পিপাসা জাগিল প্রাণে।
কোথা শান্তি পাবে ব্যাকুল তৃষা
শুধায় সবারে না পায় দিশা।

—সহসা একদা তাহার ঘরে
ছিন্নপত্র এক উড়িয়া পড়ে;
কি যেন বচন লিখিত তায়
অর্থ তার যুবা ভাবি না পায়।
বিদ্যাবাগীশের নিকটে তবে
যুবা সে বাণীর মরম লভে—
"যাহা কিছু এই জগততলে
অনিত্যের স্রোতে ভাসিয়া চলে
ব্রহ্মে আচ্ছাদিত জানিবে তায়"—
শুনিয়া যুবক প্রবোধ পায়।
শুনি মহাবাণী চমক লাগে,
আরো জানিবারে বাসনা জাগে;
ব্রহ্মজ্ঞান লাভে পিপাসু মন
গভীর সাধনে হল মগন;
যত ডোবে আরো ডুবিতে চায়—
ডুবি নব নব রতন পায়।
হেনকালে হল অশনিপাত—
যুবকের পিতা দ্বারকানাথ,
অতুল সম্পদ ধন বিভব
ঋণের পাথারে ডুবায়ে সব
কিছু না বুঝিতে জানিতে কেহ
অকালে সহসা ত্যজিল দেহ।
আত্মীয়-স্বজন কহিল সবে,
"যে উপায়ে হোক্ বাঁচিতে হবে—
কর অস্বীকার ঋণের দায়
নহিলে তোমার সকলি যায়।"
নাহি টলে তায় যুবার মন,
পিতৃঋণ শোধ করিল পণ,
হয়ে সর্বত্যাগী ফকির দীন
ছাড়ি দিল সব শোধিতে ঋণ।
উত্তমর্ণজনে অবাক মানি
কহে শ্রদ্ধাভরে অভয় বাণী,
"বিষয় বিভব থাকুক তব,
মোরা তাহা হতে কিছু না লব।
সাধুতা তোমার তুলনাহীন;
সাধ্যমত তুমি শোধিও ঋণ।"
বরষের পরে বরষ যায়,
যুবক এখন প্রবীণ-প্রায়।
সংসারে বাসনা-বিগত মন,
ঋষিকল্পরূপ ধ্যানে মগন,
ব্রহ্ম-ধ্যান-জ্ঞানে পূরিত প্রাণ,
ব্রহ্মানন্দ রস করিছে পান;
বচনেতে যেন অমৃত ঝরে—
নমি নমি তাঁরে ভকতি ভরে।
ব্রাহ্মসমাজের আসন হতে
দীপ্ত অগ্নিময় বচন স্রোতে
ব্রহ্মজ্ঞান ধারা বহিয়া যায়,
কত শত লোকে শুনিতে ধায়।
"ব্রহ্মে কর প্রীতি নিয়ত সবে,
প্রিয়কার্য তাঁর সাধহ ভবে।
হের তাঁরে নিজ হৃদয় মাঝে,
সেথা ব্রহ্মজ্যোতি নিয়ত রাজে।
জ্ঞানসমুজ্জ্বল বিমল প্রাণে,
যে জানে তাঁহারে ধ্রুব সে জানে।
জানিবার পথ নাহিক আর,
নহে শাস্ত্রবাণী প্রমাণ তাঁর।
বহু তর্ক বহু বিচার বলে
বহু জপ তপ সাধন ফলে
বহু তত্ত্বকথা আলোড়ি চিতে
নাহি পায় সেই বচনাতীতে।"
ব্রাহ্মসমাজের অসাড় প্রাণে,
মহর্ষির[২] বাণী চেতনা আনে।
দলে দলে লোক সেথায় ছোটে
উৎসাহের স্রোতে আসিয়া জোটে।
মত্ত অনুরাগে কেশব[৩] ধায়,
প্রতিভার জ্যোতি নয়নে ভায়;
আকুল আগ্রহে পরান খুলি
ঝাঁপ দিল স্রোতে আপনা ভুলি।

হেরি মহর্ষির পুলক বাড়ে,
"ব্রহ্মানন্দ" নাম দিলেন তাঁরে।
লভি নব প্রাণ সমাজ-কায়
নব নব ভাবে বিকাশ পায়;
ধর্মগ্রন্থ নব, নব সাধন,
ব্রহ্ম উপাসনা বিধি নূতন,
ধর্মপ্রাণ কত নারী ও নরে
তাহে নিমগন পুলক ভরে।

৫

সমাজে সুদিন এল আবার,
ক্রমে প্রসারিল জীবন তার।
কেশব আপন প্রতিভা বলে
যতনে গঠিল যুবকদলে।
নগরে নগরে হল প্রচার—
"ধর্মরাজ্যে নাহি জাতিবিচার;
নাহি ভেদ হেথা নারী ও নরে,
ভক্তি আছে যার সে যায় ত'রে।
জাতিবর্ণ-ভেদ কুরীতি যত
ভাঙি দাও চিরদিনের মত।
দেশ দেশান্তরে ধাউক মন,
সর্বধর্মবাণী কর চয়ন;
ধর্মে ধর্মে নাহি বিরোধ রবে,
মহা সমন্বয় গঠিত হবে।"
পশিল সে বাণী দেশের প্রাণে,
মুগ্ধ নরনারী অবাক মানে।
নগরে নগরে তুফান উঠে,
ঘরে ঘরে কত বাঁধন টুটে;
ব্রহ্ম নামে সবে ছুটিয়া চলে,
প্রাণ হতে প্রাণে আগুন জ্বলে।
আসিল গোঁসাই[৫] ব্যাকুল হয়ে
প্রেমে ভরপুর ভকতি লয়ে।
আসিল প্রতাপ[৬] স্বভাব ধীর,
গম্ভীর বচন জ্ঞানে গভীর।

স্বল্পভাষী সাধু অঘোরনাথ[৭]
যোগমগ্ন মন দিবসরাত।
গৌরগোবিন্দের[৮] সাধক প্রাণ
হিন্দুশাস্ত্রে তাঁর অতুল জ্ঞান।
কান্তিচন্দ্র[৯] সদা সেবায় রত
সেবাধর্ম তাঁর জীবন-ব্রত।
ত্রৈলোক্যনাথের[১০] সরস গান
নব নব ভাবে মাতায় প্রাণ।
আরো কত সাধু ধরমমতি
বঙ্গচন্দ্র[১১] আদি প্রচার-ব্রতী
একসাথে মিলি প্রেমের ভরে
প্রেমপরিবার গঠন করে।
কাল কিবা খাবে কেহ না জানে,
আকুল উৎসাহ সবার প্রাণে।
নূতন মন্দির নব সমাজ
নব ভাবে কত নূতন কাজ।
দিনে দিনে নব প্রেরণা পায়,
উৎসাহের স্রোত বাড়িয়া যায়।
সমাজ-চালনা বিধি-বিচার
কেশবের হাতে সকল ভার;
কেশবপ্রেরণা সবার মূলে
তাঁর নামে সবে আপনা ভুলে।
ধন্য ব্রহ্মানন্দ যাঁহার বাণী
শিরে ধরে লোকে প্রমাণ মানি।
যাঁহার সাধনা আজিও হেরি
রয়েছে সমাজ জীবন ঘেরি;
যাঁহার মূরতি স্মরণ করি,
যাঁহার জীবন হৃদয়ে ধরি,
শত শত লোক প্রেরণা পায়—
আজি ভক্তিভরে প্রণমি তাঁয়।
আবার বহিল নূতন ধারা,
সমাজের প্রাণে বাজিল সাড়া;
ভাসি বহুজনে সে নব স্রোতে
বাহির হইল নূতন পথে।

মিলি অনুরাগে যতন ভরে
এই "সাধারণ" সমাজ গড়ে।
ওদিকে কেশব নূতন বলে
বাঁধিল আবার আপন দলে।
নব ভাবে "নববিধান" গড়ি,
নূতন সংহিতা রচনা করি,
ভগ্নদেহ লয়ে অবশপ্রায়,
খাটিতে খাটিতে ত্যজিল কায়।

৬

ধরি নব পথ নূতন ধারা
নবীন প্রেরণে আসিল যারা
আজি তাঁহাদের চরণ ধরি
ভক্তিভরে সবে স্মরণ করি।
শাস্ত্রী শিবনাথ সকল ফেলি
বিষয় বাসনা চরণে ঠেলি
বহু নির্যাতন বহিয়া শিরে,
অনুরাগে ভাসি নয়ন নীরে,
সর্বত্যাগী হয়ে ব্যাকুল প্রাণে
ছুটে আসে ওই কিসের টানে?
দেখ ওই চলে পাগলমত
ভক্তশ্রেষ্ঠ বীর বিনয়ন[?],
বিজয় গোঁসাই সরল প্রাণ—
হেরি আজি তাঁর প্রেম বয়ান।
সাধু রামতনু[১১] জ্ঞানে প্রবীণ,
শিশুর মতন চির নবীন।
শিবচন্দ্র দেব সুধীর মন,
কর্মনিষ্ঠাময় সাধু জীবন।
নগেন্দ্রনাথের[১৩] যুকতি বাণে
কূট তর্ক যত নিমেষে হানে।
আনন্দমোহন[১৪] প্রেমে উদার
আনন্দ মোহন মূরতি যার।
উমেশচন্দ্রের[১৫] জীবন মন,
নীরব সাধনে সদা মগন।

দুর্গামোহনের[১৬] জীবনগত
সমাজের সেবা দানের ব্রত।
দ্বারকানাথেরে[১৭] স্মরণ হয়
ন্যায়ধর্মে বীর অকুতোভয়।
পূর্ববঙ্গে হেথা সাধক কত
নবধর্মবাণী প্রচারে রত।
সংসারে নির্লিপ্ত ভাবুক প্রাণ
সার্থক প্রচারে কালীনারা'ণ[১৮]—
কত নাম কব, কত যে জ্ঞানী,
কত ভক্ত সাধু যোগী ও ধ্যানী;
কত মধুময় প্রেমিক মন,
আড়ম্বরহীন সেবকজন;
আসিল হেথায় আকাশ ভরে
সম্ভব যতনে সমাজ গড়ে।
এই যে মন্দির, হেরিছ যার
ইঁটকাঠময় স্থূল আকার;
ইহারি মাঝারে কত যে স্মৃতি,
কত আকিঞ্চন সমাজপ্রীতি,
ব্যাকুল ভাবনা দিবসরাত
বিনিদ্র সাধনে জীবনপাত।
বহু কর্মময় এই সমাজ,
সে সব কাহিনী না কব আজ,—
আজিকে কেবল স্মরণে আনি
ব্রাহ্মসমাজের মহান্ বাণী।
যে বাণী শুনিনু রাজার মুখে,
মহর্ষি যাহারে ধরিল বুকে,
কেশব যে বাণী প্রচার করে—
স্মরি আজ তাহা ভকতি ভরে।
রক্তাক্ষরে লিখা যে-বাণী রটে
এই সমাজের জীবনপটে—
"স্বাধীন মানবহৃদয়তলে
বিবেকের শিখা নিয়ত জ্বলে।
গুরুর আদেশ সাধুর বাণী
ইহার উপরে কারে না মানি।"

স্বাধীন মনের এই সমাজ
মুক্ত ধর্মলাভ ইহার কাজ।
হেথায় সকল বিরোধ ঘুচি
রবে নানা মত নানান্ রুচি,
কাহারো রচিত বিধি বিধান
রুধিবে না হেথা কাহারো প্রাণ।
প্রতি জীবনের বিবেক ভাতি
সবার জীবনে জ্বলিবে বাতি।
নরনারী হেথা মিলিয়া সবে
সম অধিকারে আসন লভে।
'প্রেমেতে বিশাল, জ্ঞানে গভীর,
চরিত্রে সংযত, করমে বীর;
ঈশ্বরে ভকতি, মানবে প্রীতি,'—
হেথা মানুষের জীবন নীতি।
ফুরাল কি সব হেথায় আসি?
আসিবে না প্রেম জড়তা নাশি?
জাগিবে না প্রাণ ব্যাকুল হয়ে,
নব নব বাণী জীবনে লয়ে?
জ্বলিবে না নব সাধন শিখা?
নব ইতিহাস হবে না লিখা?
চিররুদ্ধ রবে পূজার দ্বার?
আসিবে না নব পূজারী আর?
কোথাও আশার আলো কি নাহি?
শুধাই সবার বদন চাহি।

---

১. রামমোহন রায় ২. রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ৩. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪. কেশবচন্দ্র সেন ৫. বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ৬. প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ৭. অঘোরনাথ গুপ্ত ৮. গৌরগোবিন্দ রায় ৯. কান্তিচন্দ্র মিত্র ১০. ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ১১. বঙ্গচন্দ্র রায় ১২. রামতনু লাহিড়ী ১৩. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৪. আনন্দমোহন বসু ১৫. উমেশচন্দ্র দত্ত ১৬. দুর্গামোহন দাস ১৭. দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৮. কালীনারায়ণ গুপ্ত

অন্যান্য ছড়া, কবিতা ও গান

'মণ্ডা' ক্লাবের তৃতীয় জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে 'আমাদের শান্তিনিকেতন'-এর সুরে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত আটাশ লাইনের গান বেঁধেছিলেন : 'আমাদের মণ্ডা সম্মেলন!' নিমন্ত্রণপত্রটি সম্পাদক শিশিরকুমার দত্তদাস স্বাক্ষরিত হলেও তার খসড়াটি সুকুমারই তৈরি করেছিলেন।

সাগর যেথা লুটিয়ে পড়ে নতুন মেঘের দেশে—
আকাশ-ধোয়া নীল যেখানে সাগর জলে মেশে।
মেঘের শিশু ঘুমায় সেথা আকাশ-দোলায় শুয়ে—
ভোরের রবি জাগায় তারে সোনার কাঠি ছুঁয়ে।
সন্ধ্যা সকাল মেঘের মেলা—কূলকিনারা ছাড়ি,
রং বেরঙের পাল তুলে দেয় দেশবিদেশে পাড়ি।
মাথায় জটা, মেঘের ঘটা আকাশ বেয়ে ওঠে,
জোছ্না রাতে চাঁদের সাথে পাল্লা দিয়ে ছোটে।
কোন্ অকূলের সন্ধানেতে কোন্ পথে যায় ভেসে—
পথহারা কোন্ গ্রামের পরে নাম-জানা-নেই-দেশে।
ঘূর্ণীপথের ঘোরের নেশা দিক্‌বিদিকে লাগে,
আগল ভাঙা পাগল হাওয়া বাদল রাতে জাগে;
ঝড়ের মুখে স্বপন টুটে আঁধার আসে ঘিরে!
মেঘের প্রাণে চমক হানে আকাশ চিরে চিরে!
বুকের মাঝে শঙ্খ বাজে—দুন্দুভি দেয় সাড়া!
মেঘের মরণ ঘনিয়ে নামে মত্ত বাদল ধারা।

এই নামহীন কবিতাটিকে সূচিপত্রে 'মেঘ' নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

লোভী ছেলে

কি ভেবে যে আপন মনে
হাসি আসে ঠোঁটের কোণে,—

আধ আধ ঝাপ্‌সা বুলি
কোন কথা কয়না খুলি।

বসে বসে একলা নিজে
লোভী ছেলে ভাবেন কি যে—

শুধু শুধু চামচ চেটে
মনে মনে সাধ কি মেটে?

একটুখানি মিষ্টি দিয়ে
রাখ আমায় চুপ করিয়ে,

নৈলে পরে চেঁচিয়ে জোরে
তুলব বাড়ি মাথায় ক'রে।

নূতন বৎসর

'নূতন বছর! নূতন বছর!' সবাই হাঁকে সকাল সাঁঝে,
আজকে আমার সূর্যি মামার মুখটি জাগে মনের মাঝে।
মুস্কিলাসান্ করলে মামা, উস্কিয়ে তার আগুনখানি,
ইস্কুলেতে লাগ্‌ল তালা, থাম্‌ল সাধের পড়ার ঘানি।

একজামিনের বিষম্ ঠেলা চুক্‌ল রে ভাই, ঘুচ্‌ল জ্বালা,
নূতন সালের নূতন তালে হোক্ তবে আজ 'হকির' পালা।
কোন্‌খানে কোন্ মেজের কোণে, কলম কানে, চশমা নাকে,
বিরামহারা কোন্ বেচারা দেখেন কাগজ, ভয় কি তাঁকে?

অঙ্কে দিবেন হকির গোলা, শঙ্কা ত নাই তাহার তরে,
তঙ্কা হাজার মিলুক তাঁহার, ডঙ্কা মেরে চলুন ঘরে।
দিনেক যদি জোটেন খেলায় সাঁঝের বেলায় মাঠের মাঝে,
'গোল্লা' পেয়ে ঝোল্লা ভরে আবার না হয় যাবেন কাজে!

আয় তবে আয়, নবীন বরষ! মলয় বায়ের দোলায় দুলে,
আয় সঘনে গগন বেয়ে, পাগলা ঝড়ের পালটি তুলে।
আয় বাংলার বিপুল মাঠে শ্যামল ধানের ঢেউ খেলিয়ে,
আয়রে সুখের ছুটির দিনে আম-কাঁটালের খবর নিয়ে!

আয় দুলিয়ে তালের পাখা, আয় বিছিয়ে শীতল ছায়া,
পাখির নীড়ে চাঁদের হাটে আয় জাগিয়ে মায়ের মায়া।
তাতুক না মাঠ, ফাটুক না কাঠ, ছুটুক না ঘাম নদীর মত,
জয় হে তোমার, নূতন বছর! তোমার যে গুণ, গাইব কত?

পুরান বছর মলিন মুখে যায় সকলের বালাই নিয়ে,
ঘুচ্‌ল কি ভাই মনের কালি সেই বুড়োকে বিদায় দিয়ে?
নূতন সালে নূতন বলে, নূতন আশায়, নূতন সাজে,
আয় দয়ালের নাম লয়ে ভাই, যাই সকলে যে যার কাজে!

আয়রে আলো আয়

পুব গগনে রাত পোহাল,
ভোরের কোণে লাজুক আলো নয়ন মেলে চায়।
আকাশতলে ঝলক জ্বলে,
মেঘের শিশু খেলার ছলে আলোক মাখে গায়॥
সোনার আলো, রঙিন্ আলো,
স্বপ্নে আঁকা নবীন আলো— আয়রে আলো আয়।
আয়রে নেমে আঁধার পরে,
পাষাণ কালো ধৌত ক'রে আলোর ঝরণায়॥
ঘুম ভাঙান পাখির তানে
জাগ্‌রে আলো আকুল গানে অকূল নীলিমায়।
আলসভরা আঁখির কোণে,
দুঃখ ভয়ে আঁধার মনে, আয়রে আলো আয়॥

আবোলতাবোল

এক যে ছিল রাজা—(থুড়ি,
রাজা নয় সে ডাইনি বুড়ি)!
তার যে ছিল ময়ূর—(না না,
ময়ূর কিসের? ছাগল ছানা)।
উঠানে তার থাক্‌ত পোঁতা—
—(বাড়িই নেই, তার উঠান কোথা)?
শুনেছি তার পিশ্‌তুতো ভাই—
—(ভাই নয়ত, মামা-গোঁসাই)।
বল্‌ত সে তার শিষ্যটিরে—
—(জন্ম-বোবা, বল্‌বে কিরে)।
যা হোক, তারা তিনটি প্রাণী—
—(পাঁচটি তারা, সবাই জানি)!
থও না বাপু খ্যাঁচাখেঁচি
—(আচ্ছা বল, চুপ করেছি)॥
তারপরে সেই সন্ধ্যাবেলা,
যেম্নি না তার ওষুধ গেলা,
অম্‌নি তেড়ে জটায় ধরা—
—(কোথায় জটা? টাক যে ভরা!)
হোক্ না টেকো তোর তাতে কি?
গোম্‌রামুখো মুখ্যু ঢেঁকি!
ধরব ঠেসে টুঁটির পরে
পিট্‌ব তোমার মুণ্ডু ধরে।
এখন বাছা পালাও কোথা?
গল্প বলা সহজ কথা?

কানে খাটো বংশীধর

কানে খাটো বংশীধর যায় মামাবাড়ি,
গুনগুনে গান গায় আর নাড়ে দাড়ি॥
চলেছে সে একমনে ভাবে ভরপূর,
সহসা বাজিল কানে সুমধুর সুর॥
বংশীধর বলে, "আহা, না জানি কি পাখি
সুদূরে মধুর গায় আড়ালেতে থাকি॥
দেখ, দেখ সুরে তার কত বাহাদুরি,
কালোয়াতি গলা যেন খেলে কারিকুরি॥"
এদিকে বেড়াল ভাবে, "এযে বড় দায়,
প্রাণ যদি থাকে তবে ল্যাজখানি যায়॥
গলা ছেড়ে চেঁচামেচি এত করি হায়,
তবু যে ছাড়ে না বেটা, কি করি উপায়॥
আর তো চলে না সহা এত বাড়াবাড়ি,
যা থাকে কপালে দেই এক থাবা মারি॥"
বংশীধর ভাবে, "একি! বেসুরা যে করে,
গলা গেছে ভেঙে তাই 'ফ্যাঁস্' সুর ধরে॥"
হেনকালে বেরসিক বেড়ালের চাঁটি,
একেবারে সব গান করে দিল মাটি।

অন্ধ মেয়ে

গভীর কালো মেঘের পরে রঙিন্ ধনু বাঁকা,
রঙের তুলি বুলিয়ে মেঘে খিলান যেন আঁকা!
সবুজ ঘাসে রোদের পাশে আলোর কেরামতি
রঙিন্ বেশে রঙিন্ ফুলে রঙিন্ প্রজাপতি!

অন্ধ মেয়ে দেখ্ছে না তা—নাইবা যদি দেখে—
শীতল মিঠা বাদল হাওয়া যায় যে তারে ডেকে!
শুনছে সে যে পাখির ডাকে হরষ কোলাকুলি
মিষ্টি ঘাসের গন্ধে তারও প্রাণ গিয়েছে ভুলি!

দুঃখ সুখের ছন্দে ভরা জগৎ তারও আছে,
তারও আঁধার জগৎখানি মধুর তারি কাছে॥

সাহস!

পুলিশ দেখে ডরাইনে আর, পালাইনে আর ভয়ে,
আরশুলা কি ফড়িং এলে থাক্‌তে পারি সয়ে।
আঁধার ঘরে ঢুক্‌তে পারি এই সাহসের গুণে,
আর করে না বুক দুর্‌ দুর্‌ জুজুর নামটি শুনে।
রাত্তিরেতে একলা শুয়ে তাও ত থাকি কত,
মেঘ ডাকলে চেঁচাইনেকো আহাম্মুকের মত।
মামার বাড়ির কুকুর দুটোর বাঘের মত চোখ,
তাদেব আমি খাবার খাওয়াই এম্‌নি আমার রোখ্‌!
এম্‌নি আরো নানান্‌ দিকে সাহস আমার খেলে
সবাই বলে "খুব বাহাদুর" কিংবা "সাবাস্‌ ছেলে"।
কিন্তু তবু শীতকালেতে সকালবেলায় হেন
ঠাণ্ডা জলে নাইতে হ'লে কান্না আসে কেন?
সাহস টাহস সব যে তখন কোন্‌খানে যায় উড়ে—
ষাঁড়ের মতন কণ্ঠ ছেড়ে চেঁচাই বিকট সুরে!

ছুটি

ঘুচবে জ্বালা পুঁথির পালা ভাবছি সারাক্ষণ—
পোড়া স্কুলেব পড়াব পবে আর কি বসে মন?
দশটা থেকেই নষ্ট খেলা, ঘণ্টা হতেই শুরু
প্রাণটা করে 'পালাই পালাই' মনটা উড়ু উড়ু—
পড়াব কথা খাতায় পাতায়, মাথয নাহি ঢোকে!
মন চলে না—মুখ চলে যায় আবোলতাবোল ব'কে!
মনটা ঘোরে কোন্‌ মুলুকে হুঁশ থাকে না তার,
এ কান দিয়ে ঢুকলে কথা, ও কান দিয়ে পার।
চোখ থাকে না আর কিছুতেই, কেবল দেখে ঘড়ি;
বোর্ডে আঁকা অঙ্ক ঠেকে আঁচড়কাটা খড়ি।
কল্পনাটা স্বপ্নে চ'ড়ে ছুটছে মাঠে ঘাটে—
আর কি রে মন বাঁধন মানে? ফিরতে কি চায় পাঠে?
পড়াব চাপে ছটফটিযে আর কিরে দিন চলে?
ঝুপ ক'রে মন ঝাঁপ দিয়ে পড় ছুটির বন্যাজলে।

ও বাবা!

পড়তে বসে মুখের পরে কাগজখানি থুয়ে
রমেশ ভায়া ঘুমোয় পড়ে আরাম ক'রে শুয়ে।
শুনছ নাকি ঘড়র্ ঘড়র্ নাক ডাকান ধুম?
সখ যে বড় বেজায় দেখি—দিনের বেলায় ঘুম!

বাতাস পোরা এই যে থলি দেখ্ছ আমার হাতে,
দুড়ুম ক'রে পিট্লে পরে শব্দ হবে তাতে।
রমেশ ভায়া আঁৎকে উঠে পড়্বে কুপোকাৎ
লাগাও তবে—ধুমধড়াক্কা! ক্যাবাৎ! ক্যাবাৎ!
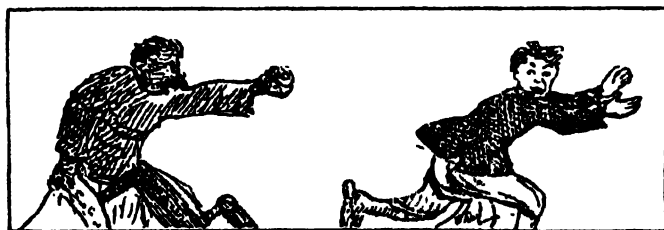
ও বাবারে! এ কেরে ভাই? মারবে নাকি চাঁটি?
আমি ভাবছি রমেশ বুঝি! সব করেছে মাটি!
আবার দেখ চোখ পাকিয়ে আস্ছে আমায় তেড়ে—
আর কেন ভাই? দৌড়ে পালাই, প্রাণের আশা ছেড়ে!

আজব খেলা

সোনার মেঘে আল্‌তা ঢেলে সিঁদুর মেখে গায়
সকাল সাঁঝে সূর্যি মামা নিত্যি আসে যায়।

নিত্যি খেলে রঙের খেলা আকাশ ভ'রে ভ'রে
আপন ছবি আপনি মুছে আঁকে নূতন ক'রে।

ভোরের ছবি মিলিয়ে দিল দিনের আলো জ্বেলে
সাঁঝের আঁকা রঙিন ছবি রাতের কালি ঢেলে।

আবার আঁকে আবার মোছে দিনের পরে দিন
আপন সাথে আপন খেলা চলে বিরামহীন।

ফুরায় না কি সোনার খেলা? রঙের নাহি পার?
কেউ কি জানে কাহার সাথে এমন খেলা তার?

সেই খেলা, যে ধরার বুকে আলোর গানে গানে
উঠছে জেগে—সেই কথা কি সূর্যি মামা জানে?

আনন্দ

যে আনন্দ ফুলের বাসে,
যে আনন্দ অরুণ আলোয়,
যে আনন্দে বাতাস বহে,
যে আনন্দ ধূলির কণায়,
যে আনন্দে আকাশ ভরা,
যে আনন্দ সকল সুখে,
সে আনন্দ মধুর হয়ে
সে আনন্দ আলোর মত

যে আনন্দ পাখির গানে,
যে আনন্দ শিশুর প্রাণে,
যে আনন্দ সাগরজলে,
যে আনন্দ তৃণের দলে,
যে আনন্দ তারায় তারায়,
যে আনন্দ রক্তধারায়,
তোমার প্রাণে পড়ুক ঝরি,
থাকুক তব জীবন ভরি।

মনের মতন

কান্না হাসির পোঁটলা বেঁধে, বর্ষভরা পুঁজি,
বৃদ্ধ বছর উধাও হ'ল ভুতের মুলুক খুঁজি।

নূতন বছর এগিয়ে এসে হাত পাতে ঐ দ্বারে,
বল্ দেখি মন, মনের মতন কি দিবি তুই তারে?

আর কি দিব?—মুখের হাসি, ভরসাভরা প্রাণ,
সুখের মাঝে দুখের মাঝে আনন্দময় গান।

বেজায় খুসি

বাহবা বাবুলাল! গেলে যে হেসে!
বগলে কাতুকুতু কে দিল এসে?
এদিকে মিটিমিটি দেখ কি চেয়ে?
হাসি যে ফেটে পড়ে দু'গাল বেয়ে!
হাসে যে রাঙা ঠোঁট দন্ত মেলে
চোখের কোণে কোণে বিজলী খেলে।
হাসির রসে গ'লে ঝরে যে লালা
কেন এ খি-খি-খি-খি হাসির পালা?
যে দেখে সেই হাসে হাহাহা হাহা
বাহবা বাবুলাল বাহবা বাহা!

দিনের হিসাব

ভোর না হতে পাখিরা জোটে গানের চোটে ঘুমটি ছোটে—
চোখ্‌টি খোলো, গাত্র তোলো, —আরে মোলো সকাল হলো।
হায় কি দশা পড়্‌তে বসা, অঙ্ক কষা, কলম ঘষা,—
দশটা হলে হট্টগোলে দৌড়ে চলে বই বগলে!
স্কুলের পড়া বিষম তাড়া, কানটি নাড়া বেঞ্চে দাঁড়া,
মরে কি বাঁচে! সমুখে পাছে বেত্র নাচে নাকের কাছে॥
খেল্‌তে যে চায় খেল্‌বে কি ছাই বৈকেলে হায় সময় কি পায়?
খেলাটি ক্রমে যেম্নি জমে দখিনে বামে সন্ধ্যা নামে;
ভাঙ্‌ল মেলা সাধের খেলা— আবার ঠেলা সন্ধ্যাবেলা—
মুখ্‌টি হাঁড়ি তাড়াতাড়ি দিচ্ছে পাড়ি যে যার বাড়ি।
ঘুমের ঝোঁকে ঝাপ্‌সা চোখে ক্ষীণ আলোকে অঙ্ক টোকে;
ছুটি পাবার সুযোগ আবার আয় রবিবার হপ্তা কাবার!

লক্ষ্মী

হাত-পা-ভাঙা নোংরা পুতুল মুখটি ধুলোয় মাখা,
গাল দুটি তার খাবলা-মতন চোখ দুটি তার ফাঁকা,—

কোথায় বা তার চুল বিনুনি কোথায় বা তার মাথা,
আধখানি তার ছিন্ন জামা, গায় দিয়েছে কাঁথা।

পুতুলের মা ব্যস্ত কেবল তার সেবাতেই রত
খাওয়ান শোয়ান আদর করেন ঘুম ডেকে দেন কত।

বলতে গেলাম "বিশ্রী পুতুল" অম্‌নি বলেন রেগে—
"লক্ষ্মী পুতুল, জ্বর হয়েছে তাইত এখন জেগে।"

দ্বিগুণ জোরে চাপড়ে দিল 'আয় আয় আয়' ব'লে—
নোংরা পুতুল লক্ষ্মী হ'য়ে পড়ল ঘুমে ঢুলে'

আলোছায়া

হোক্‌না কেন যতই কালো
এমন ছায়া নাইরে নাই—
লাগ্‌লে পরে রোদের আলো
পালায় না যে আপ্‌নি ভাই!

শুষ্কমুখে আঁধার ধোঁয়া
কঠিন হেন কোথায় বল্‌,
লাগ্‌তে যাতে হাসির ছোঁয়া
আপ্‌নি গলে হয় না জল॥

কত বড়

ছোট্ট সে একরতি ইঁদুরের ছানা,
ফোটে নাই চোখ তার, একেবারে কানা।
ভাঙা এক দেরাজের ঝুল্‌মাখা কোণে
মার বুকে শুয়ে শুয়ে মার কথা শোনে।

যেই তার চোখ ফোটে সেই দেখে চেয়ে—
দেরাজের ভারি কাঠ চারিদিক ছেয়ে।
চেয়ে বলে, মেলি তার গোল গোল আঁখি—
"ওরে বাবা! পৃথিবীটা এত বড় নাকি?"

মেঘের খেয়াল

আকাশের ময়দানে বাতাসের ভরে,
ছোট বড় সাদা কালো কত মেঘ চরে।
কচি কচি থোপা থোপা মেঘেদের ছানা
হেসে খেলে ভেসে যায় মেলে কচি ডানা।
কোথা হতে কোথা যায় কোন্ তালে চলে,
বাতাসের কানে কানে কত কথা বলে।

বুড়ো বুড়ো ধাড়ি মেঘ ঢিপি হয়ে উঠে—
শুয়ে ব'সে সভা করে সারাদিন জুটে।
কি যে ভাবে চুপ্‌চাপ্, কোন্ ধ্যানে থাকে
আকাশের গায়ে গায়ে কত ছবি আঁকে।
কত আঁকে কত মোছে, কত মায়া করে,
পলে পলে কত রং কত রূপ ধরে।

জটাধারী বুনো মেঘ ফোঁস ফোঁস ফোলে,
গুরুগুরু ডাক ছেড়ে কত ঝড় তোলে।
ঝিলিকের ঝিকিমিকি চোখ করে কানা,
হড়্ হড়্ কড়্ কড়্ দশদিকে হানা।
ঝুল্-কালো চারিধার, আলো যায় ঘুচে,
আকাশের যত নীল সব দেয় মুছে।

শিশুর দেহ

চশমা-আঁটা পণ্ডিতে কয়, শিশুর দেহ দেখে—
"হাড়ের পরে মাংস গেঁথে, চামড়া দিয়ে ঢেকে,
শিরার মাঝে রক্ত দিয়ে, ফুসফুসেতে বায়ু,
বাঁধল দেহ সুঠাম করে পেশী এবং স্নায়ু।"
কবি বলেন, "শিশুর মুখে হেরি তরুণ রবি,
উৎসারিত আনন্দে তার জাগে জগৎ ছবি।
হাসিতে তার চাঁদের আলো, পাখির কলকল,
অশ্রুকণা ফুলের দলে শিশির ঢলঢল।"
মা বলেন, "এই দুরুদুরু মোর বুকেরই বাণী,
তারি গভীর ছন্দে গড়া শিশুর দেহখানি।
শিশুর প্রাণে চঞ্চলতা আমার অশ্রুহাসি,
আমার মাঝে লুকিয়েছিল এই আনন্দরাশি।
গোপনে কোন্ স্বপ্নে ছিল অজানা কোন্ আশা,
শিশুর দেহে মূর্তি নিল আমার ভালবাসা।"

নাচন

নাচ্ছি মোরা মনের সাধে গাচ্ছি তেড়ে গান
হুলো মেনী যে যার গলার কালোয়াতীর তান।
নাচ্ছি দেখে চাঁদা মামা হাস্‌ছে ভরে গাল
চোখটি ঠেরে ঠাট্টা করে দেখ্‌না বুড়োর চাল।

ভারি মজা

এই নেয়েছ, ভাত খেয়েছ, ঘণ্টাখানেক হবে—
আবার কেন হঠাৎ হেন নামলে এখন টবে?
এক্‌লা ঘরে ফুর্তি ভরে লুকিয়ে দুপুরবেলা,
স্নানের ছলে শিশু জলে জল-ছপ্‌ছপ্‌ খেলা।
জল ছিটিয়ে, টব পিটিয়ে, ভাবছ, "আমোদ ভারি,—
কেউ কাছে নাই, যা খুশি তাই করতে এখন পারি।"
চুপ্‌ চুপ্‌ চুপ্‌—ঐ দুপ্‌ দুপ্‌! ঐ জেগেছে মাসি,
আসছে ধেয়ে, শুনতে পেয়ে দুষ্টু মেয়ের হাসি।

বিচার

ইঁদুর দেখে মাম্‌দো কুকুর বল্‌লে তেড়ে হেঁকে—
"বলব কি আর, বড়ই খুশি হলেম তোরে দেখে।
আজকে আমার কাজ কিছু নেই, সময় আছে মেলা,
আয় না খেলি দুইজনাতে মোকদ্দমা খেলা।
তুই হবি চোর, তোর নামেতে করব নালিশ, রুজু"—
"জজ্‌ কে হবে?" বল্‌লে ইঁদুর, বিষম ভয়ে জুজু,
"কোথায় উকিল প্যায়দা পুলিশ, বিচার কিসে হবে?"
মাম্‌দো বলে, "তাও জানিস্‌নে? শোন্‌ বলে দেই তবে।
আমিই হব উকিল হাকিম, আমিই হব জুরি,
কান ধ'রে তোর বল্‌ব, 'ব্যাটা, ফের করেছিস্‌ চুরি?'
সটান দেব ফাঁসির হুকুম অম্‌নি একেবারে—
বুঝ্‌বি তখন চোর বাছাধন বিচার বলে কারে।"

ছিটেফোঁটা

তিন বুড়ো পণ্ডিত টাকচুড়ো নগরে
চ'ড়ে এক গাম্‌লায় পাড়ি দেয় সাগরে।
গাম্‌লাতে ছেঁদা ছিল আগে কেউ দেখেনি,
গানখানি তাই মোর থেমে গেল এখনি॥

*

"ম্যাও ম্যাও হুলোদাদা, তোমার যে দেখা নাই?"
"গেছিলাম রাজপুরী রানীমার সাথে ভাই!"
"তাই নাকি? বেশ বেশ, কি দেখেছ সেখানে?"
"দেখেছি ইঁদুর এক রানীমার উঠানে॥"

*

গাধাটার বুদ্ধি দেখ!—চাঁটি মেরে সে নিজের গালে,
কে মেরেছে দেখবে ব'লে চড়্‌তে গেছে ঘরের চালে।

*

ছোট ছোট ছেলেগুলো কিসে হয় তৈরি,
—কিসে হয় তৈরি?
কাদা আর কয়লা, ধুলো মাটি ময়লা,
এই দিয়ে ছেলেগুলো তৈরি॥
ছোট ছোট মেয়েগুলি কিসে হয় তৈরি,
—কিসে হয় তৈরি?
ক্ষীর ননী চিনি আর ভাল যাহা দুনিয়ার
মেয়েগুলি তাই দিয়ে তৈরি॥

*

রং হল চিঁড়েতন, সব গেল ঘুলিয়ে,
গাধা যায় মামাবাড়ি টাকে হাত বুলিয়ে।
বেড়াল মরে বিষম খেয়ে, চাঁদের ধর্‌ল মাথা,
হঠাৎ দেখি ঘর বাড়ি সব ময়দা দিয়ে গাঁথা॥*

*ইংরেজি ছড়ার আভাসে রচিত

খোকা ঘুমায়

কোন্‌খানে কোন্ সুদূর দেশে, কোন্ মায়ের বুকে,
কাদের খোকা মিষ্টি এমন ঘুমায় মনের সুখে?
অজানা কোন্ দেশে সেথা কোন্‌খানে তার ঘর?
কোন্ সমুদ্র, কত নদী, কত দেশের পর?
কেমন সুরে, কি ব'লে মা ঘুমপাড়ানি গানে
খোকার চোখে নিত্যি সেথা ঘুমটি ডেকে আনে?
ঘুমপাড়ানি মাসীপিসী তাদেরও কি থাকে?
"ঘুম্‌টি দিয়ে যাওগো" ব'লে মা কি তাদের ডাকে?
শেয়াল আসে বেগুন খেতে, বর্গি আসে দেশে?
ঘুমের সাথে মিষ্টি মধুর মায়ের সুরটি মেশে?
খোকা জানে মায়ের মুখটি সবার চেয়ে ভালো,
সবার মিষ্টি মায়ের হাসি, মায়ের চোখের আলো।
স্বপন মাঝে ছায়ার মত মায়ের মুখটি ভাসে,
তাইতে খোকা ঘুমের ঘোরে আপন মনে হাসে।

বন্দনা

নমি সত্য সনাতন নিত্য ধনে,
নমি ভক্তিভরে নমি কায়মনে।
নমি বিশ্বচরাচর লোকপতে
নমি সর্বজনাশ্রয় সর্বগতে।
নমি সৃষ্টি-বিধারণ শক্তিধরে,
নমি প্রাণপ্রবাহিত জীব জড়ে।
তব জ্যোতিবিভাসিত বিশ্বপটে
মহাশূন্যতলে তব নাম রটে।
কত সিন্ধুতরঙ্গিত ছন্দ ভরে
কত স্তব্ধ হিমাচল ধ্যান করে।
কত সৌরভ সঞ্চিত পুষ্পদলে
কত সূর্য বিলুণ্ঠিত পাদতলে।
কত বন্দনঝঙ্কৃত ভক্তচিতে
নমি বিশ্ব বরাভয় মৃত্যুজিতে।

গ্রীষ্ম

সর্বনেশে
আপন ঝোঁকে
তাপিয়ে গগন
রৌদ্র ঝলে
ফেল্‌ছে আকাশ
ফুলের বিতান
দারুণ তৃষায়
তাপের চোটে
বৈশাখী ঝড়
দশ দিক হয়
করি তোলপাড়
শুনি নিয়তই

গ্রীষ্ম এসে
বিষম রোখে
কাঁপিয়ে ভুবন
আকাশতলে
তপ্ত নিশাস
শুক্‌নো শ্মশান
ফির্‌ছে সবায়
কথা না ফোটে
বাধায় রগড়
ঘোর ধূলিময়
বাগান বাদাড়
থাকি থাকি ওই

বর্ষশেষে
আগুন ফোঁকে
মাতল তপন
অগ্নি জ্বলে
ছুট্‌ছে বাতাস
যায় বুঝি প্রাণ
জল নাহি পায়
হাঁপিয়ে ওঠে
করে ধড়্‌ফড়্
জাগে মহাভয়
ওঠে বারবার
হাঁকে হৈ হৈ

রুদ্রবেশে
ধরার চোখে।
নাচল পবন।
জলেস্থলে।
ঝলসিয়ে ঘাস,
হায় ভগবান।
হায় কি উপায়,
ঘর্ম ছোটে।
ধরার পাঁজর,
হেরি সে প্রলয়,
ঘন হুঙ্কার,
মাভৈ মাভৈঃ।

খোকার ভাবনা

মোমের পুতুল লোমের পুতুল আগ্‌লে ধ'রে হাতে
তবুও কেন হাব্‌লা ছেলের মন ওঠে না তাতে?
একলা জেগে একমনেতে চুপ্‌টি ক'রে ব'সে,
আন্‌মনা সে কিসের তরে আঙ্গুলখানি চোষে?
নাইকো হাসি নাইকো খেলা নাইকো মুখে কথা,
আজ সকালে হাব্‌লাবাবুর মন গিয়েছে কোথা?
ভাব্‌ছে বুঝি দুধের বোতল আস্‌ছে নাকো কেন?
কিংবা ভাবে মায়ের কিসে হচ্ছে দেরী হেন।
ভাব্‌ছে এবার দুধ খাবে না কেবল খাবে মুড়ি,
দাদার সাথে কোমর বেঁধে করবে হুড়োহুড়ি,
ফেল্‌বে ছুঁড়ে চামচটাকে পাশের বাড়ির চালে,
না হয় তেড়ে কামড়ে দেবে দুষ্টু দাদুর গালে।
কিংবা ভাবে একটা কিছু ঠুক্‌তে যদি পেতো—
পুতুলটাকে করত ঠুকে এক্কেবারে থেঁতো।

বড়াই

গাছের গোড়ায় গর্ত ক'রে ব্যাং বেঁধেছেন বাসা,
মনের সুখে গাল ফুলিয়ে গান ধরেছেন খাসা।
রাজার হাতি হাওদা-পিঠে হেলে দুলে আসে—
"বাপ্‌রে" ব'লে ব্যাং বাবাজি গর্তে ঢোকেন ত্রাসে!
রাজার হাতি মেজাজ ভারি হাজার রকম চাল;
হঠাৎ রেগে মটাৎ ক'রে ভাঙ্‌ল গাছের ডাল।
গাছের মাথায় চড়াই পাখি অবাক হ'য়ে কয়—
"বাস্‌রে বাস্‌! হাতির গায়ে এমন জোরও হয়"!
মুখ বাড়িয়ে ব্যাং বলে, "ভাই, তাইত তোরে বলি—
আমরা, অর্থাৎ চার-পেয়েরা, এম্নিভাবেই চলি"॥

বুঝবার ভুল
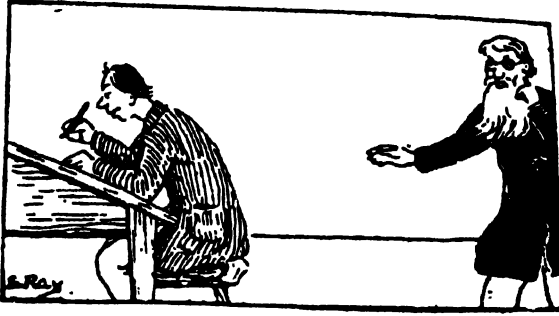
এমনি পড়ায় মন বসেছে, পড়ার নেশায় টিফিন ভোলে।
সাম্‌নে গিয়ে উৎসাহ দেই মিষ্টি দুটো বাক্য বলে।

পড়্‌ছ বুঝি: বেশ বেশ বেশ! এক মনেতে পড়্‌লে পরে
"লক্ষ্মীছেলে—সোনার ছেলে" বলে সবাই আদর করে।

এ আবার কি? চিত্র নাকি? বাঁদর পাজি লক্ষ্মীছাড়া—
আমায় নিয়ে রংতামাসা! পিটিয়ে তোমায় কর্‌ছি খাড়া।

'ভাল ছেলের' নালিশ

মাগো! প্রসন্নটা দুষ্টু এমন! খাচ্ছিল সে পরোটা
গুড় মাখিয়ে, আরাম ক'রে ব'সে—
আমায় দেখে একটা দিল, নয়কো তাও বড়টা,
দুইখানা সে আপনি খেল ক'ষে!
তাইতে আমি কান ধ'রে তার একটুখানি পেঁচিয়ে
কিল মেরেছি 'হ্যাংলা ছেলে' বলে—
অম্‌নি কিনা মিথ্যে করে ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে
গেল সে তার মায়ের কাছে চলে!

মাগো! এম্‌নিধারা শয়তানি তার, খেল্‌তে গেলাম দুপুরে,
বল্‌ল, 'এখন খেল্‌তে আমার মানা'—
ঘণ্টাখানেক পরেই দেখি দিব্যি ছাতের উপরে
ওড়াচ্ছে তার সবুজ ঘুড়িখানা।
তাইতে আমি দৌড়ে গিয়ে ঢিল মেরে আর খুঁচিয়ে
ঘুড়ির পেটে দিলাম ক'রে ফুটো—
আবার দেখ বুক ফুলিয়ে সটান্ মাথা উঁচিয়ে
আন্‌ছে কিনে নতুন ঘুড়ি দুটো!

আদুরে পুতুল

যাদুরে আমার আদুরে গোপাল, নাকটি নাদুস থোপ্‌না গাল,
ঝিক্‌মিকি চোখ মিট্‌মিটি চায়, ঠোঁট দুটি তায় টাট্‌কা লাল।
মোমের পুতুল ঘুমিয়ে থাকুক্ দাঁত মেলে আর চুল খুলে—
টিনের পুতুল চীনের পুতুল কেউ কি এমন তুলতুলে?
গোব্‌দা গড়ন এম্‌নি ধরন আব্‌দারে কেউ ঠোঁট ফুলোয়?
মখমলি রং মিষ্টি নরম—দেখ্‌ছ কেমন হাত বুলোয়!
বল্‌বি কি বল্ হাব্‌লা পাগল আবোল তাবোল কান ঘেঁষে
ফোক্‌লা গদাই যা বল্‌বি তাই ছাপিয়ে পাঠাই "সন্দেশে"।

ছবি ও গল্প

ছবির টানে গল্প লিখি নেইক এতে ফাঁকি যেমন ধারা কথায় শুনি হুবহু তাই আঁকি।
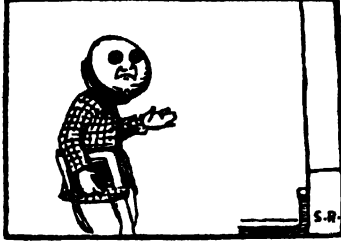
পরীক্ষায় গোল্লা পেয়ে হাবু ফেরেন বাড়ি চক্ষু দুটি ছানাবড়া মুখখানি তার হাঁড়ি

রাগে আগুন হলেন বাবা সকল কথা শুনে আচ্ছা ক'রে পিটিয়ে তারে দিলেন তুলো ধুনে

মারের চোটে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় ক'রে তোলে শুনে মায়ের বুক ফেটে যায় 'হায় কি হল' ব'লে
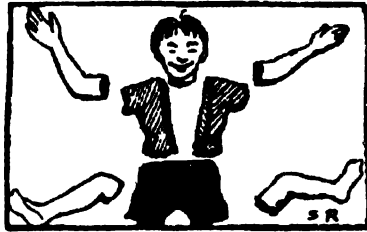
পিসী ভাসেন চোখের জলে কুট্‌নো কোটা ফেলে আহ্লাদেতে পাশের বাড়ি আটখানা হয় ছেলে।

বেজায় রাগ

ও হাড়্গিলে, হাড়্গিলে ভাই, খাপ্পা বড্ড আজ!
ঝগড়া কি আর সাজে তোমার? এই কি তোমার যোগ্য কাজ?
হোম্‌রা চোম্‌রা মান্য তোমরা বিদ্যেবুদ্ধি মর্যাদায়
ওদের সঙ্গে তর্ক করছ—নাই কি কোন লজ্জা তায়?
জান্‌ছ নাকি বল্‌ছে ওরা? "কিচির মিচির কিচ্চিরি,"
অর্থাৎ কিনা, তোমার নাকি চেহারাটা বিচ্ছিরি!
বল্‌ছে, আচ্ছা বলুক, তাতে ওদেরই ত মুখ ব্যথা,
ঠ্যাঁটা লোকের শাস্তি যত, ওরাই শেষে ভুগ্‌বে তা।
ওরা তোমায় খোঁড়া বলছে? বেয়াদব ত খুব দেখি!
তোমার পায়ে বাতের কষ্ট—ওরা সেসব বুঝবে কি?
তাই বলে কি নাচ্‌বে রাগে? উঠ্‌বে চ'টে চট্ ক'রে?
মিথ্যে আরো ত্যক্ত হবে ওদের সাথে টক্করে।
ঐ শোন কি বলছে আবার ক'চ্ছে কত বক্তৃতা—
বল্‌ছে তোমার নেড়া মাথায় ঘোল ঢালাবে—সত্যি তা?
চড়াই পাখির বড়াই দেখ তোমায় দিচ্ছে টিট্‌কিরি—
বল্‌ছে তোমার মিষ্টি গলায় গান ধরত গিট্‌কিরি।
বল্‌ছে, তোমার কাঁথাটাকে 'রিফুকর্ম' করবে কি?
খোঁড়া ঠ্যাঙে নামবে জলে? আর কোলা ব্যাং ধরবে কি?
আর চ'টো না, আর শুনো না, ঠ্যাঁটা মুখের টিপ্পনি,
ওদের কথায় কান দিতে নেই স'রে পড় এক্ষনি।

সন্দেশ

সন্দেশের গন্ধে বুঝি দৌড়ে এলে মাছি?
কেন ভন্‌ভন্ হাড় জ্বালাতন ছেড়ে দেওনা বাঁচি!
নাকের গোড়ায় সুড়্‌সুড়ি দাও শেষটা দিবে ফাঁকি?
সুযোগ বুঝে সুড়ুৎ ক'রে হুল ফোটাবে নাকি?

বাবু

অতি খাসা মিহি সুতি
ফিন্‌ফিনে জামা ধুতি,
চরণে লপেটা জুতি জরিদার।

এ হাতে সোনার ঘড়ি,
ও হাতে বাঁকান ছড়ি,
আতরের ছড়াছড়ি চারিধার।

চক্‌চকে চুল ছাঁটা
তায় তোফা টেরিকাটা—
সোনার চশমা আঁটা নাসিকায়।

ঠোঁট দুটি এঁকে বেঁকে
ধোঁয়া ছাড়ে থেকে থেকে,
হালচাল দেখে দেখে হাসি পায়।

ঘোষেদের ছোট মেয়ে
পিক্ ফেলে পান খেয়ে,
নিচু পানে নাহি চেয়ে, হায়রে।

সেই পিক থ্যাপ ক'রে
লেগেছে চাদর ভরে
দেখে বাবু কেঁদে মরে হায়রে।

ওদিকে ছ্যাকরাগাড়ি
ছুটে চলে তাড়াতাড়ি
ছিট্‌কিয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি ঘোলাজল

সহসা সে জল লাগে
জামার পিছন বাগে,
বাবু করে মহারাগে কোলাহল॥

বিষম কাণ্ড

কর্তা চলেন, গিন্নী চলেন, খোকাও চলেন সাথে,
তড়্‌বড়িয়ে বুক ফুলিয়ে শুতে যাচ্ছেন রাতে।
তেড়ে হন্‌হন্‌ চলে তিনজন যেন পল্টন চলে,
সিঁড়ি উঠ্‌তেই, একি কাণ্ড! এ আবার কি বলে!
ল্যাজ লম্বা, কান গোল্‌ গোল্‌, তিড়িং বিড়িং ছোটে,
চোখ্‌ মিট্‌মিট্‌, কুটুস্‌ কাটুস্‌—এটি কোন্‌জন বটে!
হেই! হুস্‌! হ্যাস্‌! ওরে বাস্‌রে মতলবখান কিরে,
করলে তাড়া যায় না তবু, দেখ্‌ছে আবার ফিরে।
ভাবছে বুড়ো, করবো গুঁড়ো ছাতার বাড়ি মেরে,
আবার ভাবে ফস্‌কে গেলে কাম্‌ড়ে দেবে তেড়ে।
আরে বাপ্‌রে! বস্‌ল দেখ দুই পায়ে ভর ক'রে,
বুক দুর্‌ দুর্‌ বুড়ো ভল্লুর, মোমবাতি যায় প'ড়ে।
ভীষণ ভয়ে দাঁত কপাটি তিন মহাবীর কাঁপে,
গড়িয়ে নামে হুড়্‌মুড়িয়ে সিঁড়ির ধাপে ধাপে।

ছুটি

ছুটি! ছুটি! ছুটি!
মনের খুশি রয়না মনে হেসেই লুটোপুটি।
ঘুচল এবার পড়ার তাড়া অঙ্ক কাটাকুটি
দেখ্‌ব না আর পণ্ডিতের ঐ রক্ত আঁখি দুটি।
আর যাব না স্কুলের পানে নিত্য গুটি গুটি
এখন থেকে কেবল খেলা কেবল ছুটোছুটি।
পাড়ার লোকের ঘুম ছুটিয়ে আয়রে সবাই জুটি
গ্রীষ্মকালের দুপুর রোদে গাছের ডালে উঠি।
আয়রে সবাই হল্লা ক'রে হরেক মজা লুটি
একদিন নয় দুইদিন নয় দুই দুই মাস ছুটি।

কিছু চাই?

কারোর কিছু চাই গো চাই?
এই যে খোকা, কি নেবে ভাই
জলছবি আর লাট্টু লাটাই
কেক বিস্কুট লাল দেশলাই
খেলনা বাঁশি কিংবা ঘুড়ি
লেড্ পেনসিল রবার ছুরি?
এসব আমার বাক্সে নাই
কারোর কিছু চাই গো চাই?

কারোর কিছু চাই গো চাই?
বৌমা কি চাও শুনতে পাই?
ছিটের কাপড় চিকন লেস্
ফ্যান্সি জিনিস ছুঁচের কেস্
আল্‌তা সিঁদুর কুন্তলীন
কাঁচের চুড়ি বোতাম পিন্?
আমার কাছে ওসব নাই
কারোর কিছু চাই গো চাই?

কারোর কিছু চাই গো চাই?
আপনি কি চান কর্তামশাই?
পকেট বই কি খেলার তাস
চুলের কলপ জুতোর ব্রাশ্
কলম কালি গঁদের তুলি
নস্যি চুরুট সূর্তি গুলি?
ওসব আমার কিছুই নাই
কারোর কিছু চাই গো চাই?

বিষম ভোজ

"অবাক কাণ্ড!" বল্‌লে পিসী, "এক চাঙাড়ি মেঠাই এল—
এই ছিল সব খাটের তলায়, এক নিমিষে কোথায় গেল?"
"সত্যি বটে" বল্‌লে খুড়ী, "আনল দু'সের মিঠাই কিনে—
হঠাৎ কোথায় উপ্‌সে গেল? ভেল্কিবাজি দুপুর দিনে?"
"দাঁড়াও দেখি" বল্‌লে দাদা, "কর্‌ছি আমি এর কিনারা
কোথায় গেল পট্‌লা ট্যাঁপা—পাচ্ছিনে যে তাদের সাড়া?"
পর্দাঘেরা আড়াল দেওয়া বারান্দাটার ঐ কোণেতে
চল্‌ছে কি সব ফিস্ ফিস্ ফিস্ শুনল দাদা কানটি পেতে।
পট্‌লা ট্যাঁপা ব্যস্ত দুজন টপ্‌টপাটপ্ মিঠাই ভোজে,
হঠাৎ দেখে কার দুটো হাত এগিয়ে তাদের কানটি খোঁজে।
কানের উপর প্যাঁচ্ ঘোরাতেই দুচোখ বেয়ে অশ্রু ছোটে,
গিল্‌বে কি ছাই মুখের মিঠাই, কান বুঝি যায় টানের চোটে।
পটলবাবুর হোম্‌রা গলা মিল্‌ল ট্যাঁপার চিকন সুরে
জাগ্‌ল করুণ রাগরাগিণী বিকট তানে আকাশ জুড়ে।

সম্পাদকের দশা

সম্পাদকীয়—

একদা নিশীথে এক সম্পাদক গোবেচোরা।
পোঁটলা পুঁটুলি বাঁধি হইলেন দেশছাড়া॥
অনাহারী সম্পাদকী হাড়ভাঙা খাটুনি সে।
জানে তাহা ভুক্তভোগী অপরে বুঝিবে কিসে?
লেখক পাঠক আদি সকলেরে দিয়া ফাঁকি।
বেচারি ভাবিল মনে—বিদেশে লুকায়ে থাকি॥
এদিকে ত ক্রমে ক্রমে বৎসরেক হল শেষ।
'নোটিশ' পড়িল কত 'সম্পাদক নিরুদ্দেশ'॥
লেখক পাঠকদল রুষিয়া কহিল তবে।
জ্যান্ত হোক মৃত হোক ব্যাটারে ধরিতে হবে॥
বাহির হইল সবে শব্দ করি 'মার মার'।
—দৈবের লিখন, হায়, খণ্ডাইতে সাধ্য কার॥
একদা কেমনে জানি সম্পাদক মহাশয়।
পড়িলেন ধরা—আহা দুরদৃষ্ট অতিশয়॥

তারপরে কি ঘটিল কি করিল সম্পাদক।
সে সকল বিবরণে নাহি তত আবশ্যক॥
মোট কথা হতভাগ্য সম্পাদক অবশেষে।
বসিলেন আপনার প্রাচীন গদিতে এসে॥
(অর্থাৎ লেখকদল লাঠ্যৌষধি শাসনেতে।
বসায়েছে তার পুনঃ সম্পাদকী আসনেতে॥)
ঘুচে গেছে বেচারীর ক্ষণিক সে শান্তি সুখ।
লেখকের তাড়া খেয়ে সদা তার শুষ্কমুখ॥
দিস্তা দিস্তা গদ্য পদ্য দর্শন সাহিত্য প'ড়ে।
পুনরায় বেচারির নিত্যি নিত্যি মাথা ধরে॥
লোলচর্ম অস্থি সার জীর্ণ বেশ রুক্ষ কেশ।
মুহূর্ত সোয়াস্তি নাই—লাঞ্ছনার নাহি শেষ॥

কানা-খোঁড়া সংবাদ
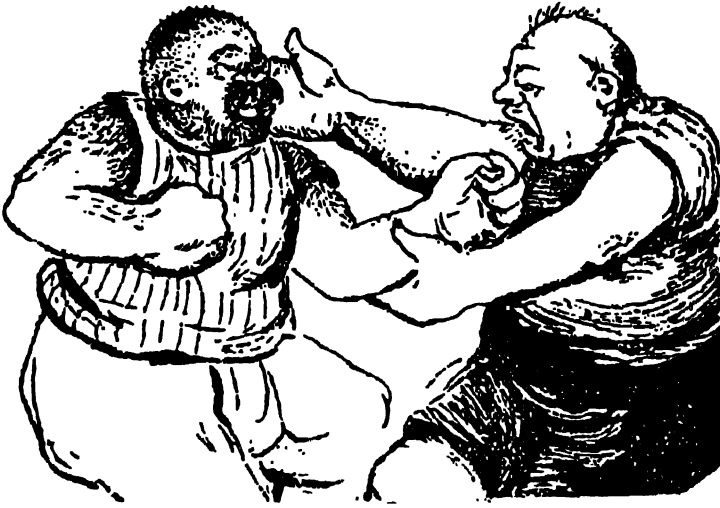
পুরাতন কালে ছিল দুই রাজা,
নামধাম নাহি জানা,
একজন তার খোঁড়া অতিশয়,
অপর ভূপতি কানা।

মন ছিল খোলা, অতি আলাভোলা.
ধরমেতে ছিল মতি,
পর ধনে সদা ছিল দোঁহাকার
বিরাগ বিকট অতি।

প্রতাপের কিছু নাহি ছিল ত্রুটি
মেজাজ রাজারি মত,
শুনেছি কেবল বুদ্ধিটা নাকি
নাহি ছিল সরু তত।

ভাই ভাই মত ছিল দুই রাজা,
না ছিল ঝগড়াঝাঁটি,
হেনকালে আসি তিন হাত জমি
সকল করিল মাটি।

তিন হাত জমি হেন ছিল তাহা
কেহ নাহি জানে কার,
কহে খোঁড়া রায় "এক চক্ষু যার
এ জমি হইবে তার।"

শুনি কানা রাজা ক্রোধ করি কয়,
"আরে অভাগার পুত্র!
এ জমি তোমারি— দেখ না এখনি
খুলিয়া কাগজ পত্র।"

নক্সা রেখেছে একশো বছর
বাক্সে বাঁধিয়া আঁটি,
কীট কূটমতি কাটিয়া কাটিয়া
করিয়াছে তারে মাটি;

কাজেই তর্ক না মিটিল হায়,
বিরোধ বাধিল ভারি,
হইল যুদ্ধ হদ্দ মতন
চৌদ্দ বছর ধরি।

মরিল সৈন্য, ভাঙিল অস্ত্র,
রক্ত চলিল বহি,
তিন হাত জমি তেমনি রহিল,
কারও হার জিত নাহি।

তবে খোঁড়া রাজা কহে, "হায়, হায়,
তর্ক বিষম বটে,
ঘোরতর রণে অতি অকারণে
মরণ সবার ঘটে।"
বলিতে বলিতে চটাৎ করিয়া
হঠাৎ মাথায় তার,
অদ্ভুত এক বুদ্ধি আসিল
অতীব চমৎকার।
কহিল তখন খোঁড়া মহারাজ,
"শুন মোর কানা ভাই,
তুচ্ছ কারণে রক্ত ঢালিয়া
কখনও সুযশ নাই।
তার চেয়ে জমি দান করে ফেল,
আপদ শান্তি হবে।"
কানা রাজা কহে, "খাসা কথা ভাই!
কারে দিই কহ তবে।"
কহেন খঞ্জ, "আমার রাজ্যে
আছে তিন মহাবীর—
একটি পেটুক, অপর অলস,
তৃতীয় কুস্তিগীর।
তোমার মুলুকে কে আছে এমন,
এদের হারাতে পারে?—
সবার সমুখে তিন হাত জমি
বক্‌শিস্ দিব তারে।"
কানা রাজা কহে, ভীমের দোসর
আছে ত মল্ল মম,
ফলাহারে পটু, পঁচাশি পেটুক,
অলস কুমড়া সম।
দেখা যাবে কার বাহাদুরি বেশি
আসুক তোমার লোক;
যে জিতিবে সেই পাবে এই জমি"—
খোঁড়া বলে, "তাই হোক।"
পড়িল নোটিস ময়দান মাঝে
আলিশান সভা হবে,

তামাসা দেখিতে চারিদিক হতে
ছুটিয়া আসিল সবে।
ভয়ানক ভিড়ে ভরে পথঘাট,
লোকে হল লোকাকার,
মহা কোলাহল দাঁড়াবার ঠাঁই
কোনোখানে নাহি আর।
তারপর ক্রমে রাজার হুকুমে
গোলমাল গেল থেমে,
দুই দিক হতে দুই পালোয়ান
আসরে আসিল নেমে।
লম্ফে ঝম্ফে যুঝিল মল্ল
গজ-কচ্ছপ হেন,
রুষিয়া মুষ্টি হানিল দোঁহায়—
বজ্র পড়িল যেন!
গুঁতাইল কত, ভোঁতাইল নাসা,
উপাড়িল গোঁফ দাড়ি,
যতেক দন্ত করিল অন্ত
ভীষণ চাপট মারি।
তারপরে দোঁহে দোঁহারে ধরিয়া
ছুঁড়িল এমনি জোরে,
গোলার মতন গেল গো উড়িয়া
দুই বীর বেগভরে।
কি হল তাদের কেহ নাহি জানে,
নানা কথা কয় লোকে,
আজও কেহ তার পায়নি খবর,
কেহই দেখেনি চোখে।
যাহোক এদিকে, কুস্তির শেষে
এল পেটুকের পালা,
যেন অতিকায় ফুটবল্ দুটি,
অথবা ঢাকাই জালা।
ওজনেতে তারা কেহ নহে কম,
ভোজনেতে ততোধিক,
বপু সুবিপুল, ভুঁড়ি বিভীষণ,—
ভারি সাতমণ ঠিক!

অবাক দেখিছে সভার সকলে,
আজব কাণ্ড ভারি—
ধামা ধামা লুচি নিমেষে ফুরায়,
দই ওঠে হাঁড়ি হাঁড়ি!
দাঁড়িপাল্লায় মাপিয়া সকলে
দেখে আহারের পরে,
দুজনেই ঠিক বেড়েছে ওজনে
সাড়ে তিন মণ ক'রে।
কানা রাজা বলে "একি হল জ্বালা,
আক্কেল নাই কারো,
কেহ কি বোঝে না সোজা কথা এই,—
হয় জেতো নয় হারো।"
তার পর এল কুঁড়ে দুইজন
ঝাঁকার উপর চড়ে,
সভামাঝে দোঁহে শুয়ে চিৎপাত
চুপচাপ রহে পড়ে।
হাত নাহি নাড়ে, চোখ নাহি মেলে,
কথা নাই কারো মুখে,
দিন দুই তিন রহিল পড়িয়া,
নাসা গীত গাহি সুখে।
জঠরে যখন জ্বলিল আগুন,
পরান কণ্ঠাগত,
তখন কেবল মেলিয়া আনন
থাকিল মড়ার মত।
দয়া করে তবে সহৃদয় কেহ
নিকটে আসিয়া ছুটি,
মুখের নিকটে ধরিল তাদের
চাটিম্ কদলী দুটি।
খঞ্জের লোকে কহিল কষ্টে,
"ছাড়িয়ে দেনারে ভাই,"
কানার ভৃত্য রহিল হাঁ ক'রে
মুখে তার কথা নাই!
তখন সকলে কাষ্ঠ আনিয়া
তায় কেরোসিন ঢালি,
কুঁড়েদের গায়ে চাপাইয়া রোষে
দেশলাই দিল জ্বালি।
খোঁড়ার প্রজাটি "বাপ্‌রে" বলিয়া
লাফ্ দিয়া তাড়াতাড়ি,
কম্পিত পদে চম্পট দিল
একেবারে সভা ছাড়ি।
"দুয়ো" বলি সবে দেয় করতালি
পিছু পিছু ডাকে "ফেউ"
কানার অলস বলে, "কি আপদ!
ঘুমুতে দিবিনা কেউ?"
শুনে সবে বলে "ধন্য ধন্য
কুঁড়ে-কুল-চূড়ামণি!"
ছুটিয়া তাহারে বাহির করিল
আগুন হইতে টানি।
কানার লোকের গুণপনা দেখে
কানা রাজা খুসি ভারি,
জমিত দিলই— আরও দিল কত,
টাকাকড়ি ঘরবাড়ি।

গান

১

টুটিল কি আজি ঘুমের ঘোর?
কত আর বল রবে বিভোর?
পরদ্বারে গিয়ে ভিখারীর সাজে
ফিরে এলি ঘৃণা অপমান লাজে,
পরের প্রত্যাশা অনুগ্রহ আশা
আর সে ভরসা কোথা রে তোর?
ঘরের সন্তান ফিরে আয় ঘরে
আয় ফিরে আয় মায়ের আদরে।
শোন্ রে শোন্ রে ডাকেন জননী
জন্মদুখিনী জননী তোর।

২

প্রেমের মন্দিরে তাঁর আরতি বাজে,
মিলন মধুর রাগে জীবন মাঝে।
নীরব গানে গানে পুলক প্রাণে প্রাণে,
চলেছে তাঁরি পানে অরূপ সাজে।
প্রেম তৃষিত সুন্দর অরুণ আলো
হৃদয় নিভৃত দীপে জ্বালো রে জ্বালো।
পুণ্য মধুর ভাতি পূর্ণ মধুর রাতি,
মধুর স্বপনে মাতি মধুর রাজে॥

৩

নিখিলের আনন্দ-গান এই প্রেমেরই যুগল বন্দনায়,
জীবনের আকুল স্রোতে অকূল প্রেমের কূল নাহি পায়।
যে বিপুল প্রেমের বাণী নিখিল প্রাণের পুলক মাঝে,
এ প্রাণের যুগল ধারায় সেই প্রেমেরই পরশ বাজে।
সে প্রেমের ঝরণা ঝরে এই প্রেমেরই রসের ধারায়,
নিখিলের আনন্দ-গান এই প্রেমেরই যুগল বন্দনায়।

আকাশের দিকে দিকে প্রেমের আলোর প্রদীপ জ্বলে,
সে প্রেমের উৎস জাগে এই জীবনের স্বপন-তলে।
সে প্রেমের ছন্দ উঠে প্রাণে প্রাণে আঘাত লেগে,
সে প্রেমের তরঙ্গেতে যায় ভেসে যায় ব্যাকুল বেগে।
না জানি কোন্ প্রেমিকের প্রেম জাগেরে এমন লীলায়!
নিখিলের আনন্দ-গান এই প্রেমেরই যুগল বন্দনায়।

শ্রীশ্রীবর্ণমালাতত্ত্ব

পড় বিজ্ঞান হবে দিকজ্ঞান ঘুচিবে পথের ধাঁধা
দেখিবে গুণিয়া এ দিন দুনিয়া নিয়ম-নিগড়ে বাঁধা।
কহে পণ্ডিতে জড়সন্ধিতে বস্তুপিণ্ড ফাঁকে
অনু-অবকাশে রন্ধ্রে-রন্ধ্রে আকাশ লুকায়ে থাকে।
হেথা হোথা সেথা জড়ের পিণ্ড আকাশ প্রলেপে ঢাকা
নয়কো কেবল নিরেট গাঁথন, নয়কো কেবলি ফাঁকা।
জড়ের বাঁধন বদ্ধ আকাশে, আকাশ-বাঁধন জড়ে—
পৃথিবী জুড়িয়া সাগর যেমন, প্রাণটি যেমন ধড়ে।
'ইথার' পাথারে তড়িত বিকারে জড়ের জীবন দোলে,
বিশ্ব-মোহের সুপ্তি ভাঙিছে সৃষ্টির কলরোলে॥

শুন শুন বার্তা নূতন, কে যেন স্বপন দিলা
ভাষা প্রাঙ্গণে স্বরে ব্যঞ্জনে ছন্দ করেন লীলা।
সৃষ্টি যেথায় জাগে নিরুপায় প্রলয় পয়োধি তীরে
তারি আশেপাশে অন্ধ হুতাশে আকাশ কাঁদিয়া ফিরে।
তাই ক্ষণে ক্ষণে জড়ে ব্যঞ্জনে স্বরের পরশ লাগে
তাই বারেবার মৃদু হাহাকার কলসংগীতে জাগে।
স্বরব্যঞ্জন যেন দেহমন জড়েতে চেতন বাণী,
একে বিনা আর থাকিতে না পারে, প্রাণ লয়ে টানাটানি।
দোঁহে ছাড়ি দোঁহে, মূক রহে মোহে ব্যঞ্জনে নাহি বুলি
স্বরের নিশাসে 'আহা' 'উহু' ভাষে ভাষার বারতা ভুলি।
ছিল অচেতন জগৎ যখন মগন আদিম ধুমে,
অরূপ তিমির অন্ধ বধির স্বপ্ন মদির ঘুমে;
আকুল গন্ধে আকাশ-কুসুম উদাসে সকল দিশি,
অন্ধ জড়ের বিজন আড়ালে কে যেন রয়েছে মিশি!
স্তিমিত-স্বপ্ন স্বরের বর্ণ জড়ের বাঁধন ছিঁড়ি
ফিরে দিশাহারা কোথা ধ্রুবতারা কোথা স্বর্গের সিঁড়ি!
অ আ ই ঈ উ ঊ, হা হা হি হি হু হু হাল্কা শীতের হাওয়া
অলখচরণ প্রেতের চলন, নিঃশ্বাসে আসা যাওয়া।

খেলে কি না খেলে ছায়ার আঙুলে বাতাসে বাজায় বীণা
আবেশ বিভোর আফিঙের ঘোর বস্তুতন্ত্রহীনা।
ভাবে কূল নাই একা আসি যাই যুগে যুগে চিরদিন,
কাল হতে কালে আপনার তালে অনাহত বাধাহীন॥

অকূল অতলে অন্ধ অচলে অস্ফুট অমানিশি,
অরূপ আঁধারে আঁখি-অগোচরে অণুতে অণুতে মিশি।

আসে যায় আসে অবশ আয়াসে আবেগ আকুল প্রাণে,
অতি আনমনা করে আনাগোনা অচেনা অজানা টানে,
আধো আধো ভাষা, আলেয়ার আসা, আপনি আপনহারা
আদিম আলোতে আবছায়া পথে আকাশগঙ্গা-ধারা।

ইচ্ছা-বিকল ইন্দ্রিয়দল, জড়িত ইন্দ্রজালে,
ঈশারা আভাসে ঈঙ্গিতে ভাষে রহ-রহ ইহকালে।

উড়ে ইতিউতি উতলা আকুতি উসখুস উঁকিঝুঁকি,
উড়ে উচাটন, উড়ু উড়ু মন, উদাসে উর্ধ্বমুখী।

এমন একেলা একা একা খেলা একূলে ওকূলে ফের
এপার ওপার এ যে একাকার একেরি একেলা হের।
হের একবার, সবি একাকার, একেরি এলাকা মাঝে
ঐ ওঠে শুনি, ওঙ্কার-ধ্বনি, একূলে ওকূলে বাজে॥

ওরে মিথ্যা এ আকাশ-চারণ মিথ্যা তোদের খোঁজা,
স্বর্গ তোদের বস্তু সাধনে বহিতে জড়ের বোঝা।
আকাশ বিহনে বস্তু অচল, চলে না জড়ের চাকা,
আদুল আকাশে ফোকলা বাতাস কেবলি আওয়াজ ফাঁকা।

সৃষ্টিতত্ত্ব বিচার করনি, শাস্ত্র পড়নি দাদা—
জড়ের পিণ্ড আকাশে গুলিয়া ঠাসিবে ভাষার কাদা।

শাস্ত্রবিধান কর প্রণিধান ওরে উদাসীন অন্ধ,
ব্যঞ্জনস্বরে যেন হরিহরে কোথাও রবে না দ্বন্দ্ব।
মরমে মরমে সরম পরশে বাতাস লাগিলে হাড়ে,
ভাষার প্রবাহে পুলক-কম্পে জড়ের জড়তা ছাড়ে।
(তবে) আয় নেমে আয়, জড়ের সভায়, জীবন-মরণ-দোলে,
আয় নেমে আয়, ধরণীধূলায় কীর্তন কলরোলে।
আয় নেমে আয় রূপের মায়ায় অরূপ ইন্দ্রজালে
উল্কা ঝলকে অনল পুলকে আয় রে অশনিতালে।
আয় নেমে আয় কণ্ঠ্য বর্ণে কাকুতি করিছে সবে
আয় নেমে আয় কর্কশ ডাকে প্রভাতে কাকের রবে॥

নমো নমো নমঃ সৃষ্টি প্রথম কারণ-জলধি জলে
স্তব্ধ তিমিরে প্রথম কাকলী প্রথম কৌতূহলে।
আদিম তমসে প্রথম বর্ণ, কনক কিরণ মালা
প্রথম ক্ষুধিত বিশ্ব জঠরে প্রথম প্রশ্ন জ্বালা।

অকূল আঁধারে কুহকপাথারে কে আমি একেলা কবি
হেরি একাকার সকল আকার সকলি আপন ছবি।
কহে কই, কে গো, কোথায় কবে গো, কেন বা কাহারে ডাকি?
কহে কহ-কহ, কেন অহরহ, কালের কবলে থাকি?
কহে কানে কানে করুণ কূজনে কলকল কত ভাষে,
কহে কোলাহলে কলহ-কুহরে কাষ্ঠ কঠোর হাসে।
কহে কটমট কথা কাটা-কাটা—কেওকেটা কহ কারে?
কাহার কদর কোকিল কণ্ঠে, কুন্দ কুসুম হারে?
কবি কল্পনে কাব্যে কলায় কাহারে করিছ সেবা
কুবের কেতন কুঞ্জকাননে, কাঙালি কুটিরে কেবা।
কায়দা-কানুনে, কার্যে-কারণে কীর্তিকলাপ মূলে,
কেতাবে কোরাণে কাগজে-কলমে কাঁদায়ে কেরানীকুলে।
কথা কাঁড়ি-কাঁড়ি কত কানাকড়ি কাজে কচু কাঁচকলা
কভু কাছাকোছা কোর্তা কলার কভু কৌপীন ঝোলা।
কুৎসা-কথনে কুটিলে কৃপণে কুলীন কন্যাদায়ে
কর্মক্লান্ত কালিম-কান্ত, ক্লিষ্ট কাতর কায়ে।

কলে কৌশলে, কপট কোঁদলে, কঠিনে কোমলে মিঠে
ক্লেদ কুৎসিত, কুষ্ঠ কলুষ কিলবিল কৃমি কীটে।
কহ সে কাহার কুহক পাথার "কে আমি একেলা কবি?
কেন একাকার সকল আকার সকলি আপন ছবি!"
'ক'-এর কাঁদনে, কাংস্য-ক্বণনে বর্ণ লভিল কায়া
গহন শূন্যে জড়ের ধাক্কা কালের করাল ছায়া।
সুপ্ত গগনে করুণ বেদনে বস্তুচেতন জাগে
অকাল ক্ষুধিত খাই খাই রবে বিশ্বে তরাস লাগে।
আকাশ অবধি ঠেকিল জলধি, খেয়াল জেগেছে খ্যাপা!
কারে খেতে চায় খুঁজে নাহি পায় দেখ কি বিষম হ্যাপা!
(খালি) কর্তালে কভু কীর্তন খোলে? খোলে দাও চাঁটিপেটা!
নামাও আসরে 'ক'-এর দোসরে, 'খেঁদেলো খেঁদেলো খেটা।'

কহ মহামুনি কহ খুড় শুনি 'খ'য়ের খবর খাঁটি
খামারে খোঁয়াড়ে খানায় খন্দে খুঁজিনু 'খ'য়ের ঘাঁটি।
কহেন বচন খুড়ো খন্‌খন্‌ পাখালি আঁখির দিঠি
খালি খ্যাঁচাখেঁচি খামচাখামচি খুঁৎখুঁতি খিটিমিটি।
এখনো খোলেনি মুখের খোলস? এখনো খোলেনি আঁখি?
ক্ষণিক খেয়ালে পেখম ধরিয়া, কি খেলা খেলিল পাখি!
এখনও রাখনা ক্ষুধার খবর এখনও শেখনি ভাষা
পঞ্চকোষের মুখের খোসাতে অন্ন দেখনি ঠাসা?
খোল খরতালে খোলসা খেয়ালে 'খোল খোল খোল' বলে,
শখের খাঁচার খিড়কী খুলিয়া খঞ্জ খেয়াল চলে।
সে ক্ষুধায় পাখি পেখম খুলিয়া খাঁচায় খেম্‌টা নাচে
আখেরী ক্ষুধায় সখের ভিখারী খাস্তা খাবার যাচে—
প্রখর-ক্ষুধিত তোখড় খেয়াল খেপিয়া রুখিল ত্বরা,
চাখিয়া দেখিল, খাসা এ অখিল খেয়াল-খচিত ধরা।
খুঁজে সুখে দুখে খেয়ালের ভুলে খেয়ালে নিরখি সবি,
খেলার খেয়ালে নিখিল-খেয়াল লিখিল খেয়াল-ছবি।
খেলার লীলা খদ্যোৎ-শিখা খেয়াল খধূপ-ধূপে,
শিখী পাখা পরে নিখুঁত আখরে খচিত খেয়ালরূপে।

খোদার উপরে খোদকারী করে ওরে ও ক্ষিপ্ত-মতি,
কীলিয়ে অকালে কাঁঠাল্ পাকালে আখেরে কি হবে গতি?
খেয়ে খুরো চাঁটি খোল কহে খাঁটি, 'খাবি খাব ক্ষতি নাই',
খেয়ালের বাণী করে কানাকানি—'গতি নাই, গতি নাই।'
নিখিল খেয়াল খসড়া খাতায় লিখিল খেয়াল ছবি
ক্ষণিকের সাথে খেয়ালের মুখে খতিয়া রাখিল সবি।

গতি কিসে হবে, চিন্তিয়া তবে, বচন শুনিনু খাসা,
পঞ্চ কোষের প্রথম খোসাতে, অন্ন রয়েছে ঠাসা!
আত্মার মুখে আদিম অন্ন, তাহে ব্যঞ্জনগুলি,
অনুরাগে লাগি, করে ভাগাভাগি, মুখে-মুখে দাও তুলি।
এত বলি ঠেলি আত্মারে তুলি, তত্ত্বের লগি ধরি,
খেয়ালের প্রাণী রহে চুপ মানি, বিস্ময়ে পেট ভরি।
কবে কেবা জানে, গতির গড়ানে, গোপন গোমুখী হতে
কোন ভগীরথে গলাল জগতে গতির গঙ্গা-স্রোতে।
দেখ আগাগোড়া গণিতের গড়া নিগূঢ় গণন সবি
গতির আবেগে আগুয়ান বেগে অগণিত গ্রহরবি।
গগনে গগনে গোধূলি লগনে মগন গভীর গানে,
করে গমগম আগম নিগম গুরুগম্ভীর ধ্যানে।
গিরি-গহ্বরে অগাধ সাগরে গঞ্জে নগরে-গ্রামে,
গাঁজার গাজনে গোষ্ঠে গহনে গোকুলে গোলকধামে॥

শুনি সাবধানে কহি কানে কানে শাস্ত্রবচন ধরি
কৌশলে ঋষি কহে কখগঘ কাহারে স্মরণ করি।
ক'য়ে দেখ জল খ'য়ে শূন্যতল গ'য়ে গতি অহরহ
কভু জলে ভাসে কভু সে আকাশে হংস যাহারে কহ।
আঘাতে যে মারে 'ঘ' কহি তারে হন্ ধাতু 'ড' করি
তেঁই কখগঘ কৃষ্ণে জানহ হংস-অসুর-অরি।

ব্যঙ্গে রঙ্গে ভ্রূকুটি-ভঙ্গে সঙ্গীত কলরবে
রণহুঙ্কারে ধনুটঙ্কারে শঙ্কিত কর সবে।

বিকল অঙ্গ ভগ্নজঙ্ঘ এ কোন্ পঙ্গু মুনি?
কেন ভাঙা ঠ্যাঙে ডাঙায় নামিল বাঙালা মুলুকে শুনি
রাঙা আঁখি জ্বলে চাঙা হয়ে বলে ডিঙ্গাব সাগর গিরি
কেন ঢঙ ধরি ব্যাঙাচির মতো লাঙুল জুড়িয়া ফিরি?

টলিল দুয়ার চিত্তগুহার চকিতে চিচিংফাঁক
শুনি কলকল ছুটে কোলাহল শুনি চল চল ডাক।
চলে চট্‌পট্ চকিত চরণ, চোঁচা চম্পট নৃত্যে
চলচিত্রিত চিরচিন্তন চলে চঞ্চল চিত্তে।
চলে চঞ্চলা চপল চমকে, চারু চৌচির বক্রে,
চলে, চন্দ্রমা চলে চরাচর চড়ি চড়কের চক্রে।
চলে চকমকি চোখের চাহনে, চঞ্চরী চল ছন্দ,
চলে চিৎকার চাবুক চালনে চপেট চাপড়ে চণ্ড।
চলে চুপি-চুপি চতুর চৌর চৌদিকে চাহে ত্রস্ত
চলে চূড়ামণি চর্বে চোষ্যে চটি চৈতনে চোস্ত।
চিকন চাদর চিকুর চাঁচর, চোখা চালিয়াৎ চ্যাংড়া,
চলে চ্যাংব্যাং চিতল কাতল চলে চুনোপুঁটি ট্যাংরা॥

ছোটে ছটফটি ছায়ার ছমক ছদ্মলীলার ছলে
ছায়ারঙে মিশি ছোটে ছয় দিশি ছায়ার ছাউনীতলে
ছোটে ছায়াবাহু পিছে পিছে পিছে ছন্দে ছুটেছে রবি
ছয় ঋতু ছোটে ছায়ার ছন্দে ছবির পিছনে ছবি
ছায়াপথ-ছায়ে জ্যোছনা বিছায়ে....

অসমাপ্ত

কাব্য-সমালোচনা

মাননীয় শ্রীযুক্ত

"নিরঙ্কুশ" পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

'গবদ্গীতা'র গ্রন্থকার 'মেঘমালতী'র কবি
আজ এসেছেন কল্‌কেতাতে, পাঠাচ্ছি তাঁর ছবি।
আস্‌ছে মাসে 'নিরঙ্কুশে' ছাপিয়ে দিতে হবে—
এই অনুরোধ নাছোড়বান্দা করছি মোরা সবে।
সঙ্গে দিলাম সংক্ষেপেতে জীবনী তাঁর লিখে।
সবাই হবেন উপকৃত নূতন কথা শিখে।
আরও দিলাম এক পুঁটুলি কাব্য তাঁরি লেখা
'কাকুতি' আর 'কৃষকাজল' 'কম্ন' 'ভস্মরেখা'।
'প্রপঞ্চ' আর 'আহ্লাদিকা' 'মুঞ্জী' 'মিহিদানা'
'ভৃঙ্গী' 'ভঙ্গী' ইত্যাদিতে মোদ্দা উনিশখানা।
করতে হবে সমালোচনা বিশেষ দরদ করে
ভিতরকার সব গভীর তত্ত্ব ফুটিয়ে লেখার জোরে।
আরেক কথা—ছবিখানার নীচের দিকের ফাঁকে
'কিশোরীচাঁদ কাব্যকুলিশ' নামটি যেন থাকে।

আপনারাই ত দেশের শক্তি এবং জ্ঞান দাতা
দেশের গতি দেশের কণ্ঠ, জিহ্বা ঘিলু মাথা।
অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন মহাশয়দের কাছে—
ফিরাবেন না নিরাশ করে এই ভরসা আছে।

শ্রীগৌরহরি আঢ্য

শ্রীযুক্ত গৌরহরি আঢ্য মহাশয় সমীপেষু

আজ্ঞা মশাই! হাড্ডি মোদের নয়কো তেমন শক্ত
এসব কাব্য হয় না হজম, মাথায় ওঠে রক্ত।
এমন রাবিশ গজায় কেন, মজায় কেন দেশটায়
শস্তা হাটে নামটি কিনে পস্তাতে হয় শেষটায়।
আপনারা সব ধন্যি বলুন কবির বাড়ুক পুণ্যি
মোদের কাছে এগ্‌জামিনে পেলেন তিনি শূন্যি!

নিবেদক

শ্রী 'নিরঙ্কুশ' সম্পাদক

গিরিধি

গিরিধি আরামপুরী, দেহ মন চিৎপাত,
খেয়ে শুয়ে হু হু করে কেটে যায় দিনরাত;
হৈ চৈ হাঙ্গামা হুড়োতাড়া হেথা নাই;
মাস বার তারিখের কোন কিছু ল্যাঠা নেই;
খিদে পেলে তেড়ে খাও, ঘুম পেলে ঘুমিও—
মোট কথা, কি আরাম, বুঝলে না তুমিও!
ভুলেই গেছিনু কোথা এই ধরা মাঝেতে
আছে যে শহর এক কলকাতা নামেতে—
হেন কালে চেয়ে দেখি চিঠি এক সমুখে,
চায়েতে অমুক দিন ভোজ দেয় অমুকে।
'কোথায়? কোথায়?' বলে মন ওঠে লাফিয়ে
তাড়াতাড়ি চিঠিখানা তেড়ে ধরি চাপিয়ে,
ঠিকানাটা চেয়ে দেখি নীচু পানে ওধারে
লেখা আছে 'কলিকাতা'—সে আবার কোথারে!
স্মৃতি কয় 'কলিকাতা? রোস্ দেখি; তাই ত,
কোথায় শুনেছি যেন, মনে ঠিক নাই ত!'
বেগতিক শুধালেম সাধুরাম ধোপারে;
সে কহিল, 'হলে হবে উশ্রীর ওপারে'।
ওপারের জেলেবুড়ো মাথা নেড়ে কয় সে,
'হেন নাম শুনি নাই আমার এ বয়সে।'
তারপরে পুছিলাম সরকারী মজুরে :
তামাম মুলুক সে ত বাৎলায় 'হুজুরে'
বেঙাবাদ বরাকর, ইদিকে পচম্বা,
উদিকে পরেশনাথ, পাড়ি দাও লম্বা;
সব তার সড়গড় নেই কোন ভুল তায়—
'কুলিকাতা কাঁহা' বলি সেও মাথা চুলকায়!
অবশেষে নিরুপায় মাথা যায় ঘুলিয়ে
'টাইম টেবিল' খুলি দেখি চোখ বুলিয়ে।

সেথায় পাটনা পুরী গয়া গোমো মাল্‌দ
বজবজ দমদম হাওড়া ও শ্যাল্‌দ'—
ইত্যাদি কত নাম চেয়ে দেখি সামনেই
তার মাঝে কোন খানে কলিকাতা নাম নেই!!
—সব ফাঁকি বুজ্‌রুকী রসিকতা-চেষ্টা!
উদ্দেশে 'শালা' বলি গাল দিনু শেষটা।।—
সহসা স্মৃতিতে যেন লাগিল কি ফুৎকার
উদিল কুম্‌ড়া হেন চাঁদপানা মুখ কা'র!
আশে পাশে টিপি ঢুপি পাহাড়ের পুঞ্জ,
মুখ চাঁচা ময়দান, মাঝে কিবা কুঞ্জ!
সে শোভা স্মরণে ঝরে নয়নের ঝরণা;
গৃহিণীরে কহি 'প্রিয়ে! মারা যাই ধর না।'
তারপরে দেখি ঘরে অতি ঘোর অনাচার—
রাখে না কো কেউ কোন তারিখের সমাচার!
তখনি আনিয়া পাঁজি দেখা গেল গণিয়া,
চায়ের সময় এল একেবারে ঘনিয়া!
হায়রে সময় নাই, মন কাঁদে হতাশে—
কোথায় চায়ের মেলা! মুখশশী কোথা সে!
স্বপন শুকায়ে যায় আঁধারিয়া নয়নে,
কবিতায় গলি তাই গাহি শোক শয়নে।

নদী

হে পর্বত, যত নদী করি নিরীক্ষণ,
তোমাতেই করে তারা জনম গ্রহণ।
ছোট বড় ঢেউ সব তাদের উপরে,
কল্‌কল্ শব্দ করি সদা ক্রীড়া করে,
সেই নদী বেঁকে চুরে যায় দেশে দেশে,
সাগরেতে পড়ে গিয়া সকলের শেষে।
পথে যেতে যেতে নদী দেখে কত শোভা,
কি সুন্দর সেই সব কিবা মনোলোভা।
কোথাও কোকিলে দেখে বসি সাথী সনে,
কি সুন্দর কুহু গান গায় নিজ মনে।
কোথাও ময়ূরে দেখে পাখা প্রসারিয়া
বনধারে দলে দলে আছে দাঁড়াইয়া!
নদীতীরে কত লোক শ্রান্তি নাশ করে,
কত শত পক্ষী আসি তথায় বিচরে।
দেখিতে দেখিতে নদী মহাবেগে ধায়,
কভুও সে পশ্চাতেতে ফিরে নাহি চায়।

টিক্-টিক্-টিক্

টিক্-টিক্ চলে ঘড়ি টিক্-টিক্-টিক্,
একটা ইঁদুর এল সে সময়ে ঠিক্!
ঘড়ি দেখে এক লাফে তাহাতে চড়িল,
টং করে অমনি ঘড়ি বাজিয়া উঠিল।
অমনি ইঁদুর ভায়া লেজ গুটাইয়া,
ঘড়ির উপর থেকে পড়ে লাফাইয়া!
ছুটিয়া পালায়ে গেল, আর না আসিল,
টিক্-টিক্-টিক্ ঘড়ি চলিতে লাগিল!

শ্রীগোবিন্দ-কথা

আমি অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ মানুষটি নই বাঁকা!
যা বলি তা ভেবেই বলি, কথায় নেইক ফাঁকা
এখানকার সব সাহেবসুবো, সবাই আমায় চেনে
দেখ্‌তে চাও ত দিতে পারি সাটিফিকেট এনে
ভাগ্য আমায় দেয়নি বটে করতে বি-এ পাশ
তাই বলে কি সময় কাটাই কেটে ঘোড়ার ঘাস?
লোকে যে কয় বিদ্যে আমার 'কথামালা'ই শেষ
এর মধ্যে সত্যি কথা নেইক বিন্দুলেশ।
ওদের পাড়ার লাইব্রেরিতে কেতাব আছে যত
কেউ পড়েছে তন্নতন্ন করে আমার মতো?
আমি অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ এমনি পড়ার যম
পড়াশুনো নয়ক আমার কারুর চেয়ে কম।
কতকটা এই দেখেশিখে কতক পড়েশুনে
(আর) কতক হয়ত স্বাভাবিকী প্রতিভারই গুণে
উন্নতিটা করছি যেমন আশ্চর্য তা ভারি
নিজের মুখে সব কথা তার বলতে কি আর পারি?
বলে গেছেন চণ্ডীপতি কিংবা অন্য কেউ
"আকাশ জুড়ে মেঘের বাসা সাগরভরা ঢেউ
জীবনটাও তেমনি ঠাসা কেবল বিনা কাজে
যেদিক দিয়ে খরচ করি সেই খরচই বাজে!"
আমি অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ চলতে ফিরতে শুতে
জীবনটাকে হাঁকাই নেক মনের রথে জুতে।

হাইড্রোজেনের দুই বাবাজি অক্সিজেনের এক
নৃত্য করেন গলাগলি কাণ্ডখানা দেখ্
আহ্লাদেতে একসা হয়ে গলে হলেন জল
এই সুযোগে সুবোধ শিশু "শ্রীগোবিন্দ" বল্।

অসমাপ্ত

মহাভারত

(আদিপর্ব)

কুরুকুলে পিতামহ ভীষ্মমহাশয়
ভুবন বিজয়ী বীর, শুন পরিচয়—
শান্তনু রাজার পুত্র নাম সত্যব্রত
জগতে সার্থক নাম সত্যে অনুরত।
স্বয়ং জননী গঙ্গা বর দিলা তাঁরে
নিজ ইচ্ছা বিনা বীর না মরে সংসারে।
বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে হায় শান্তনু রাজার
বিবাহের লাগি বুড়া করে আবদার।
মৎস্যরাজকন্যা আছে নামে সত্যবতী
তারে দেখি শান্তনুর লুপ্ত হল মতি।
মৎস্যরাজ কহে, 'রাজা, কর অবধান—
'কিসের আশায় কহ করি কন্যাদান?
সত্যব্রত জ্যেষ্ঠ সেই রাজ্য অধিকারী,
'আমার নাতিরা হবে তার আজ্ঞাচারী,
'রাজমাতা কভু নাহি হবে সত্যবতী,
'তেঁই এ বিবাহ-কথা অনুচিত অতি।'
ভগ্ন মনে হস্তিনায় ফিরিল শান্তনু
অনাহারে অনিদ্রায় জীর্ণ তার তনু।
মন্ত্রিমুখে সত্যব্রত শুনি সব কথা
মৎস্যরাজপুরে গিয়া কহিল বারতা—
'রাজ্যে মম সাধ নাহি, করি অঙ্গীকার
'জন্মিলে তোমার নাতি রাজ্য হবে তার।'
রাজা কহে, 'সাধু তুমি, সত্য তব বাণী,
'তোমার সন্তান হতে তবু ভয় মানি।
'কে জানে ভবিষ্যকথা, দৈবগতিধারা—
'প্রতিবাদী হয় যদি রাজ্যলাভে তারা?'
সত্যব্রত কহে, 'শুন প্রতিজ্ঞা আমার,
'বংশ না রহিবে মম পৃথিবী মাঝার।
'সাক্ষী রহ চন্দ্র সূর্য লোকে লোকান্তরে
'এই জন্মে সত্যব্রত বিবাহ না করে।'
শুনিয়া অদ্ভুত বাণী ধন্য কহে লোকে
স্বর্গ হতে পুষ্পধারা ঝরিল পলকে।
সেই হতে সত্যব্রত খ্যাত চরাচরে
ভীষণ প্রতিজ্ঞাবলে ভীষ্ম নাম ধরে।
ঘুচিল সকল বাধা, আনন্দিত চিতে
সত্যবতী রাণী হয় হস্তিনাপুরীতে।
ক্রমে হলে বর্ষ গত শান্তনুর ঘরে
জন্ম নিল নব শিশু, সবে সমাদরে।
রাখিল বিচিত্রবীর্য নামটি তাহার
শান্তনু মরিল তারে দিয়া রাজ্যভার।
অকালে বিচিত্রবীর্য মুদিলেন আঁখি
পাণ্ডু আর ধৃতরাষ্ট্র দুই পুত্র রাখি॥

হস্তিনায় চন্দ্রবংশ কুরুরাজকুল
রাজত্ব করেন সুখে বিক্রমে অতুল।
সেই কুলে জন্মি তবু দৈববশে হায়
অন্ধ বলি ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য নাহি পায়।
কনিষ্ঠ তাহার পাণ্ডু, রাজত্ব সে করে,
পাঁচটি সন্তান তার দেবতার বরে।
জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠির ধীর শান্ত মন
'সাক্ষাৎ ধর্মের পুত্র' কহে সর্বজন।
দ্বিতীয় সে মহাবলী ভীম নাম ধরে,
পবন সমান তেজ পবনের বরে।
তৃতীয় অর্জুন বীর, ইন্দ্রের কৃপায়
রূপেগুণে শৌর্যেবীর্যে অতুল ধরায়।

এই তিন সহোদর কুন্তীর কুমার,
বিমাতা আছেন মাদ্রী দুই পুত্র তাঁর—
নকুল ও সহদেব সুজন সুশীল
এক সাথে পাঁচজনে বাড়ে তিল তিল।
অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র শতপুত্র তার,
অভিমানী দুর্যোধন জ্যেষ্ঠ সবাকার।
পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই নষ্ট হয় কিসে,
এই চিন্তা করে দুষ্ট জ্বলি হিংসাবিষে।
হেনকালে সর্বজনে ভাসাইয়া শোকে
মাদ্রীসহ পাণ্ডুরাজা যায় পরলোকে।
'পাণ্ডু গেল,' মনে মনে ভাবে দুর্যোধন,
'এইবারে যুধিষ্ঠির পাবে সিংহাসন।
'ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে গিয়া তারে মারি—
'ভীমের ভয়েতে কিছু করিতে না পারি।
'আমার কৌশলপাকে ভীম যদি মরে।
'অনায়াসে যুধিষ্ঠিরে মারি তারপরে।'
কুচক্র করিয়া তবে দুষ্ট দুর্যোধন
নদীতীরে উৎসবের করে আয়োজন—
একশত পাঁচ ভাই মিলি একসাথে
আমোদ আহ্লাদে ভোজে মহানন্দে মাতে।
হেন ফাঁকে দুর্যোধন পরম যতনে
বিষের মিষ্টান্ন দেয় ভীমের বদনে।
অচেতন হল ভীম বিষের নেশায়
সুযোগ বুঝিয়া দুষ্ট ধরিল তাহায়।
গোপনে নদীর জলে দিল ভাসাইয়া
কেহ না জানিল কিছু উৎসবে মাতিয়া॥

এদিকে নদীর জলে
ডুবিয়া অতল তলে
ভীমের অবশ দেহ,
কেমনে জানে না কেহ,
কোথায় ঠেকিল শেষে
বাসুকী নাগের দেশে।
ভীমের বিপুল চাপে
নাগের বসতি কাঁপে
দেহভারে কত মরে,
কত পলাইল ডরে,
কত নাগ দলে বলে
ভীমেরে মারিতে চলে
দংশিয়া ভীমের গায়
মহাবিষ ঢালে তায়।
অদ্ভুত ঘটিল তাহে
ভীম চক্ষু মেলি চাহে
বিষে হয় বিষক্ষয়
মুহূর্তে চেতনা হয়,
দেখে ভীম চারিপাশে
নাগেরা ঘেরিয়া আসে।
দেখিয়া ভীষণ রাগে
ধরি শত শত নাগে
চূর্ণ করে বাহুবলে,
মহাভয়ে নাগ দলে
ছুটে যায় হাহাকারে
বাসুকী রাজার দ্বারে।
বাসুকী কহেন, 'শোন
আর ভয় নাহি কোন,
তুমি তারে সুবচনে
আন হেথা সযতনে।'
রাজার আদেশে তবে
আবার ফিরিয়া সবে
করে গিয়া নিবেদন
বাসুকীর নিমন্ত্রণ!

শুনি ভীম কুতূহলে রাজার পুরীতে চলে,
সেথায় ভরিয়া প্রাণ, করিয়া অমৃত পান,
বিষের যাতনা আর কিছু না রহিল তার,
মহাঘুমে ভরপুর সব ক্লান্তি হল দূর।
তখন বাসুকী তারে স্নেহভরে বারে বারে
আশিস করিয়া তায় পাঠাইল হস্তিনায়।
সেথা ভাই চারিজনে আছে শোকাকুল মনে,
কুন্তীর নয়নজল ঝরে সেথা অবিরল,
মগন গভীর দুখে ফিরে সবে ম্লান মুখে।
হেন কালে হারানিধি সহসা মিলাল বিধি,
বিষাদ হইল দূর জাগিল হস্তিনাপুর,
উল্লসিত কলরবে আনন্দে মাতিল সবে॥

কয়েকটি কবিতা

১

কবিতার নাহি বাঁধ,
নাহি ছিরিছাঁদ।
মোর কথা ছন্দ নাহি জানে
ছন্দরূপে জাগেনি সে প্রাণে।
সে বাণী জেগেছে প্রাণে
ছন্দহীন আঘাতের গানে,
অতি তীব্রতম
সত্যের আলোক সম
কলঙ্কিত আপন প্রকাশে,
ভাষাহীন ভাষে।
কোথা হতে জাগে বাণী
সেথায় প্রবেশপথ আমি নাহি জানি।
কোথা কোন্ লোকে
চকিতের অক্ষয় আলোকে
নিত্য মোরে দেখায় স্বপন,
বলে যায়, "এই দেশ তোমার আপন।"
সেথায় আনন্দ জাগে অচঞ্চল বেদনার মাঝে
দুঃখ সুখ এক সুরে বাজে।
সেথায় আলোক অনির্বাণ
সেথায় চেতনা পায় প্রাণ
সেথায় বিরহ নাহি জানি
সেথা নাই ব্যর্থতার গ্লানি।
সর্বলোক সেই লোক মাঝে
সর্বকাল সেথায় বিরাজে।
স্বপ্নস্রোতে যায় ভাসি
মানবের সুখ দুঃখ চিন্তা কর্মরাশি।
স্বপ্নে নিমগন
স্বপ্নে ভাসে জীবন মরণ।
স্বপ্ন মাঝে
প্রেমের আরতি বাজে।

২

করে তাড়াহুড়ো বিষম চোট্
কিনেছি হ্যাট্ পরেছি কোট্,
পেয়েছি passage এসেছে Boat,
বেঁধেছি তল্পি তুলেছি মোট্,
বলেছে সবাই, "তা হলে ওঠ্,
আসান্ এবার বিলেতে ছোট্।"
তাই সভা হবে, বিদায় ভোট্,
কাঁদ কাঁদ ভাবে ফুলিয়ে ঠোঁট্
হেথায় সকলে করিবে জোট্
(প্রোগ্রামটুকু করিও Note)।
প্রোগ্রাম—
শুক্র সন্ধ্যা সঠিক সাত—
আহার, আমোদ, উল্কাপাত।

৩

আসছে কাল, শনিবার
অপরাহ্ণ সাড়ে চার,
আসিয়া মোদের বাড়ি,
কৃতার্থ করিলে সবে
টুলুপুষু খুশি হবে।

৪

(হুবহু) নকল করি
লেখাটি আমার
সভায় (বাহবা) নিল
লজ্জা নাহি তার।
ধনীরা (খামখা) কেন
ধন লয়ে যায়।
যে ধন (বিলাবি) যেন
দুখী জনে পায়।

[বন্ধনীর ভিতরের শব্দগুলি যে-দিক থেকেই পড়া যাক অপরিবর্তিত থাকে।]

৫

আমরা দিশি পাগলার দল,
দেশের জন্য ভেবে ভেবে হয়েছি পাগল,
(যদিও) দেখতে খারাপ, টিকবে কম, দামটা একটু বেশি
(তাহোক) এতে দেশেরই মঙ্গল।

৬

লর্ড কার্জন অতি দুর্জন বঙ্গগগন শনি
কূট নিঠুর চক্রী চতুর উগ্র গরল ফণী।...

৭

আজকে আমার প্রদীপখানি ম্লান হয়েছে আঁধার মাঝে
আজকে আমার প্রাণের সুরে ক্ষণে ক্ষণে বেসুর বাজে
আজকে আমার আশার বাণী মৌন আছে সংশয়েতে

অসমাপ্ত

৮

বৃষ্টি বেগে ভরে রাস্তা গেল ডুবিয়ে
ছাতা কাঁধে, জুতা হাতে, নোংরা ঘোলা কালো,
হাঁটু জল ঠেলি চলে যত লোকে।
রাস্তাতে চলা দুষ্কর মুস্কিল বড়
অতি পিচ্ছিল, অতি পিচ্ছিল, অতি পিচ্ছিল, বিচ্ছিরি রাস্তা,
ধরণী মহা-দুর্দম কর্দম-গ্রস্তা
যাওয়া দুষ্কর মুস্কিল রে ইস্কুলে,
সর্দি জ্বর, বৃদ্ধি বড়, নিত্যি লোকে বদ্যি ডেকে
তিক্ত বড়ি খায়।

৯

সৃষ্টি যখন সদ্য কাঁচা, অনেকখানি ফাঁকা
বিশ্বকর্মা নিলেন ছুটি একটি বছর ছাঁকা।
ঘুম জমে না, পায় না ক্ষিদে, শরীর কেমন করে,
ডাক্তারেরা দিলেন হুকুম বিশ্রামেরি তরে।
আইন মাফিক নোটিশ দিয়ে অগ্রহায়ণ মাসে
গেলেন তিনি মর্তলোকে স্বাস্থ্য লাভের আশে।

মণ্ডা ক্লাবের আমন্ত্রণপত্র

১.

শনিবার ১৭ই
সাড়ে-পাঁচ বেলা,
গড়পারে হৈ হৈ
সরবতী মেলা।

অতএব ঘড়ি ধ'রে—
সাবকাশ হয়ে
আসিবেন দয়া ক'রে
হাসিমুখ ল'য়ে।

সরবৎ, সদালাপ
সঙ্গীত-ভীতি—
ফাঁকি দিলে নাহি মাপ,
জেনে রাখ—ইতি।

২.

কেউ বলেছে খাবো খাবো,
কেউ বলেছে খাই
সবাই মিলে গোল তুলেছে—
আমি ত আর নাই।

ছোট্‌কু বলে, "রইনু চুপে
ক'মাস ধরে কাহিল রূপে!"
জংলি বলে, "রামছাগলের
মাংস খেতে চাই।"

যতই বলি "সবুর কর"—
কেউ শোনে না কালা,
জীবন বলে কোমর বেঁধে,
"কোথায় লুচির থালা?"

খোদন বলে রেগে মেগে
ভীষণ রোষে বিষম লেগে—
"বিষ্যুতে কাল গড়পারেতে
হাজির যেন পাই।"*

* রবীন্দ্রনাথের 'মেঘ বলেছে' গানের প্যারডি।

৩.

সম্পাদক বেয়াকুব
কোথা যে দিয়েছে ডুব—
এদিকেতে হায় হায়
ক্লাবটি তো যায় যায়।

তাই বলি সোমবারে
মদ্‌গৃহে গড়পারে
দিলে সবে পদধূলি
ক্লাবটিরে ঠেলে তুলি।

রকমারি পুঁথি কত
নিজ নিজ রুচিমত
আনিবেন সাথে সবে,
কিছু কিছু পাঠ হবে।

করযোড়ে বারবার
নিবেদিছে সুকুমার।

৪.

আমি, অর্থাৎ সেক্রেটারি,
মাসতিনেক কল্‌কেতা ছাড়ি
যেই গিয়েছি অন্য দেশে—
অম্‌নি কি সব গেছে ফেঁসে॥

বদলে গেছে ক্লাবের হাওয়া,
কাজের মধ্যে কেবল খাওয়া!
চিন্তা নেইক গভীর বিষয়—
আমার প্রাণে এসব কি সয়?

এখন থেকে সম্‌ঝে রাখ
এ সমস্ত চল্‌বে নাকো,
আমি আবার এইছি ঘুরে,
তান ধরেছি সাবেক সুরে।—

শুন্‌বে এস সুপ্রবন্ধ
গিরিজার 'বিবেকানন্দ'
মঙ্গলবার আমার বাসায়।*
(আর থেক না ভোজের আশায়)।

* ১৪ই মে, ২৫ নং সুকিয়া স্ট্রীট

হযবরল

বেজায় গরম। গাছতলায় দিব্যি ছায়ার মধ্যে চুপচাপ শুয়ে আছি, তবু ঘেমে অস্থির। ঘাসের উপর রুমালটা ছিল; ঘাম মুছবার জন্য যেই সেটা তুলতে গিয়েছি অমনি রুমালটা বলল, 'ম্যাঁও!' কি আপদ! রুমালটা ম্যাও করে কেন?

চেয়ে দেখি রুমাল তো আর রুমাল নেই, দিব্যি মোটা-সোটা লাল টকটকে একটা বেড়াল গোঁফ ফুলিয়ে প্যাটপ্যাট করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি বললাম, 'কি মুশকিল! ছিল রুমাল, হয়ে গেল একটা বেড়াল।' অমনি বেড়ালটা বলে উঠল, 'মুশকিল আবার কি? ছিল একটা ডিম, হয়ে গেল দিব্যি একটা প্যাঁকপেঁকে হাঁস। এতো হামেশাই হচ্ছে।

আমি খানিক ভেবে বললাম, 'তাহলে তোমায় এখন কি বলে ডাকব? তুমি তো সত্যিকারের বেড়াল নও, আসলে তুমি হচ্ছ রুমাল।' বেড়াল বলল, 'বেড়ালও বলতে পার, রুমালও বলতে পার, চন্দ্রবিন্দুও বলতে পার।' আমি বললাম, 'চন্দ্রবিন্দু কেন?' শুনে বেড়ালটা 'তাও জানো না?' ব'লে এক চোখ বুজে ফ্যাচফ্যাচ করে বিশ্রী রকম হাসতে লাগল। আমি ভ... অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। মনে হল, ওই চন্দ্রবিন্দুর কথাটা নিশ্চয় আমার বোঝা উচিত ছিল। তাই থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি বলে ফেললাম, 'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।' বেড়ালটা খুশি হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এ তো বোঝাই যাচ্ছে—চন্দ্রবিন্দুর চ, বেড়ালের তালব্য শ, রুমালের মা—হল চশমা। কেমন, হল তো?' আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না, কিন্তু পাছে বেড়ালটা আবার সেই রকম বিশ্রী করে হেসে ওঠে, তাই সঙ্গে সঙ্গে হুঁ হুঁ করে গেলাম।

তারপর বেড়ালটা খানিকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠল, 'গরম লাগে তো তিব্বত গেলেই পার।' আমি বললাম, 'বলা ভারি সহজ, কিন্তু বললেই তো আর যাওয়া যায় না?' বেড়াল বলল, 'কেন? সে আর মুশকিল কি?' আমি বললাম, 'কি করে যেতে হয় তুমি জানো?' বেড়াল এক গাল হেসে বলল, 'তা আর জানিনে? কলকেতা, ডায়মন্ডহারবার, রানাঘাট, তিব্বত,—ব্যস্! সিধে রাস্তা, সওয়া ঘণ্টার পথ, গেলেই হল।' আমি বললাম, 'তাহলে রাস্তাটা আমায় বাতলে দিতে পার?' শুনে বেড়ালটা হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'উহুঁ, সে আমার কর্ম নয়। আমার গেছোদাদা যদি থাকত, তাহলে সে ঠিক ঠিক বলতে পারত।'

আমি বললাম, 'গেছোদাদা কে? তিনি থাকেন কোথায়?' বেড়াল বলল, 'গেছোদাদা আবার কোথায় থাকবে? গাছেই থাকে।' আমি বললাম, 'কোথায় গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়?' বেড়াল খুব জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, 'সেটি হচ্ছে না, সে হবার যো নেই'। আমি বললাম, 'কি রকম?' বেড়াল বলল, 'সে কি রকম জানো? মনে কর, তুমি যখন যাবে উলুবেড়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, তখন তিনি থাকবেন মতিহারি। যদি মতিহারি

যাও, তাহলে শুনবে তিনি আছেন রামকিষ্টপুর। আবার সেখানে গেলে দেখবে, তিনি গেছেন কাশিমবাজার। কিছুতেই দেখা হবার যো নেই।'

আমি বললাম, 'তাহলে তোমরা কি করে দেখা কর?'

বেড়াল বলল, 'সে অনেক হাঙ্গাম। আগে হিসেব করে দেখতে হবে, দাদা কোথায় কোথায় নেই; তারপর হিসেব করে দেখতে হবে, দাদা কোথায় কোথায় থাকতে পারে; তারপর দেখতে হবে, দাদা এখন কোথায় আছে। তারপর দেখতে হবে, সেই হিসেব মতো যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছবে, তখন দাদা কোথায় থাকবে। তারপর দেখতে হবে—'

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম, 'সে কি রকম হিসেব?' বেড়াল বলল, 'সে ভারি শক্ত। দেখবে কি রকম?' এই বলে সে একটা কাঠি দিয়ে ঘাসের উপর লম্বা আঁচড় কেটে বলল, 'এই মনে কর গেছোদাদা।' বলেই খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে চুপ করে বসে রইল। তারপর আবার ঠিক তেমনি একটা আঁচড় কেটে বলল, 'এই মনে কর তুমি,' বলে আবার ঘাড় বেঁকিয়ে চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ আবার একটা আঁচড় কেটে বলল, 'এই মনে কর চন্দ্রবিন্দু।' এমনি করে খানিকক্ষণ কি ভাবে আর একটা করে লম্বা আঁচড় কাটে, আর বলে, 'এই মনে কর তিব্বত'—'এই মনে কর গেছোবৌদি রান্না করছে'—'এই মনে কর গাছের গায়ে একটা ফুটো—।'

এই রকম শুনতে শুনতে শেষটায় আমার কেমন রাগ ধরে গেল। আমি বললাম, 'দুর ছাই! কি সব আবোল-তাবোল বকছ, একটুও ভালো লাগে না।' বেড়াল বলল, 'আচ্ছা, তাহলে আর একটু সহজ করে বলছি। চোখ বোজ—আমি যা বলব, মনে মনে তার হিসেব কর।' আমি চোখ বুজলাম।

চোখ বুজেই আছি, বুজেই আছি, বেড়ালের আর কোনও সাড়া-শব্দ নেই। হঠাৎ কেমন সন্দেহ হল, চোখ চেয়ে দেখি বেড়ালটা ল্যাজ খাড়া করে বাগানের বেড়া টপকিয়ে পালাচ্ছে আর ক্রমাগত ফ্যাচফ্যাচ করে হাসছে।

কি আর করি, গাছতলায় একটা পাথরের উপর বসে পড়লাম। বসতেই কে যেন ভাঙা ভাঙা মোটা গলায় বলে উঠল, 'সাত দুগুণে কত হয়?' আমি ভাবলাম, এ আবার কে রে? এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, এমন সময় আবার সেই আওয়াজ হল, 'কই, জবাব দিচ্ছ না যে? সাত দুগুণে কত হয়?' তখন উপর দিকে তাকিয়ে দেখি, একটা দাঁড়কাক শ্লেট পেনসিল দিয়ে কি যেন লিখছে, আর এক-একবার ঘাড় বাঁকিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমি বললাম, 'সাত দুগুণে চোদ্দ।' কাকটা অমনি দুলে দুলে মাথা নেড়ে বলল, 'হয়নি, হয়নি—ফেল্।'

আমার ভয়ানক রাগ হল। বললাম, 'নিশ্চয় হয়েছে। সাতেক্কে সাত, সাত দুগুণে চোদ্দ, তিন সাত্তে একুশ।' কাকটা কিছু জবাব দিল না, খালি পেনসিল মুখে দিয়ে খানিকক্ষণ কি যেন ভাবল। তারপর বলল, 'সাত দুগুণে চোদ্দর নামে চার, হাতে রইল পেনসিল।' আমি বললাম, 'তবে যে বলছিলে সাত দুগুণে চোদ্দ হয় না? এখন কেন?' কাক বলল, 'তুমি যখন বলছিলে, তখনও পুরো চোদ্দ হয়নি। তখন ছিল, তেরো টাকা চোদ্দ আনা তিন পাই। আমি যদি ঠিক সময়ে বুঝে ধাঁ করে "১৪" লিখে না ফেলতাম, তাহলে এতক্ষণে হয়ে যেত—চোদ্দ টাকা এক আনা নয় পাই।'

আমি বললাম, 'এমন আনাড়ি কথা তো কখনো শুনিনি। সাত দুগুণে যদি চোদ্দ হয়, তা সে সব সময়েই চোদ্দ। একঘণ্টা আগে হলেও যা, দশ দিন পরে হলেও তাই।' কাকটা ভারি অবাক হয়ে বলল, 'তোমাদের দেশে সময়ের দাম নেই বুঝি?' আমি বললাম, 'সময়ের দাম কি রকম?' কাক বলল, 'এখানে কদিন থাকতে, তাহলে বুঝতে। আমাদের বাজারে সময় এখন ভয়ানক মাগ্যি—এতটুকু বাজে খরচ করবার যো নেই। এইতো, কদিন খেটেখুটে চুরিচামারি করে খানিকটে সময় জমিয়েছিলাম, তাও তোমার সঙ্গে তর্ক করতে অর্ধেক খরচ হয়ে গেল।' বলে সে আবার হিসেব করতে লাগল। আমি অপ্রস্তুত হয়ে বসে রইলাম।

এমন সময়ে হঠাৎ গাছের একটা ফোকর থেকে কি যেন একটা সুড়ুৎ করে পিছলিয়ে মাটিতে নামল। চেয়ে দেখি, দেড় হাত লম্বা এক বুড়ো, তার পা পর্যন্ত সবুজ রঙের দাড়ি, হাতে একটা হুঁকো—তাতে কল্‌কে-টল্‌কে কিচ্ছু নেই—আর মাথা ভরা টাক। টাকের উপর খড়ি দিয়ে কে যেন কি সব লিখেছে।

বুড়ো এসেই খুব ব্যস্ত হয়ে হুঁকোতে দু-এক টান দিয়েই জিজ্ঞাসা করল, 'কই, হিসেবটা হল?' কাক খানিক এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, 'এই হল বলে।' বুড়ো বলল, 'কি আশ্চর্য! উনিশ দিন পার হয়ে গেল, এখনও হিসেবটা হয়ে উঠল না?' কাক দু-চার মিনিট খুব গম্ভীর হয়ে পেনসিল চুষলে, তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কতদিন বললে?' বুড়ো বলল, 'উনিশ।' কাক অমনি গলা উঁচিয়ে হেঁকে বলল, 'লাগ লাগ লাগ কুড়ি।' বুড়ো বলল, 'একুশ', কাক বলল, 'বাইশ', বুড়ো বলল, 'তেইশ', কাক বলল, 'সাড়ে তেইশ'; ঠিক যেন নিলেম ডাকছে। ডাকতে ডাকতে কাকটা হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি ডাকছ না যে?' আমি বললাম, 'খামখা ডাকতে যাব কেন?'

বুড়ো এতক্ষণ আমায় দেখেনি, হঠাৎ আমার আওয়াজ শুনেই সে বনবন করে আট দশ পাক ঘুরে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল। তারপর হুঁকোটাকে দূরবিনের মতো করে চোখের সামনে ধরে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর পকেট থেকে কয়েকখানা রঙিন কাচ বের করে তাই দিয়ে আমায় বারবার দেখতে লাগল। তারপর কোত্থেকে একটা পুরোনো দরজির ফিতে এনে সে আমার মাপ নিতে শুরু করল, আর হাঁকতে লাগল, 'খাড়াই ছাব্বিশ ইঞ্চি, হাতা ছাব্বিশ ইঞ্চি, আস্তিন ছাব্বিশ ইঞ্চি, ছাতি ছাব্বিশ ইঞ্চি, গলা ছাব্বিশ ইঞ্চি।'

আমি ভয়ানক আপত্তি করে বললাম, 'এ হতেই পারে না। বুকের মাপও ছাব্বিশ ইঞ্চি, গলাও ছাব্বিশ ইঞ্চি? আমি কি শুয়োর?' বুড়ো বলল, 'বিশ্বাস না হয়, দেখ।' দেখলাম ফিতের লেখা-টেখা সব উঠে গিয়েছে, খালি '২৬' লেখাটা একটু পড়া যাচ্ছে, তাই বুড়ো যা কিছু মাপে সবই ছাব্বিশ ইঞ্চি হয়ে যায়।

তারপর বুড়ো জিজ্ঞাসা করল, 'ওজন কত?' আমি বললাম, 'জানি না।' বুড়ো তার দুটো আঙুল দিয়ে আমায় একটুখানি টিপে টিপে বলল, 'আড়াই সের।' আমি বললাম, 'সেকি! পটলার ওজনই তো একুশ সের—সে আমার চাইতে দেড় বছরের ছোট।' কাকটা অমনি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'সে তোমাদের হিসেব অন্যরকম।' বুড়ো বলল, 'তাহলে লিখে নাও—ওজন আড়াই সের, বয়েস সাঁইত্রিশ।'

আমি বললাম, 'দুৎ! আমার বয়েস হল আট বছর তিনমাস, বলে কিনা সাঁইত্রিশ।'

বুড়ো খানিকক্ষণ কি যেন ভেবে জিজ্ঞাসা করল, 'বাড়তি না কমতি?' আমি বললাম, 'সে আবার কি?' বুড়ো বলল, 'বলি, বয়েসটা এখন বাড়ছে না কমছে?' আমি বললাম, 'বয়েস আবার কমবে কি?' বুড়ো বলল, 'তা নয় তো কেবলি বেড়ে চলবে নাকি? তাহলেই তো গেছি! কোনদিন দেখব বয়েস বাড়তে বাড়তে একেবারে ষাট সত্তর আশি পার হয়ে গেছে। শেষটায় বুড়ো হয়ে মরি আর কি?' আমি বললাম, 'তা তো হবেই। আশি বছর বয়েস হলে মানুষ বুড়ো হবে না?' বুড়ো বলল, 'তোমার যেমন বুদ্ধি! আশি বছর বয়েস হবে কেন? চল্লিশ বছর হলেই আমরা বয়েস ঘুরিয়ে দি। তখন আর একচল্লিশ বেয়াল্লিশ হয় না—উনচল্লিশ, আটত্রিশ, সাঁইত্রিশ করে বয়েস নামতে থাকে। এমনি করে যখন দশ পর্যন্ত নামে তখন আবার বয়েস বাড়তে দেওয়া হয়। আমার বয়েস তো কত উঠল নামল আবার উঠল—এখন আমার বয়েস হয়েছে তেরো।' শুনে আমার ভয়ানক হাসি পেয়ে গেল।

কাক বলল, 'তোমরা একটু আস্তে আস্তে কথা কও, আমার হিসেবটা চটপট সেরে নি।' বুড়ো অমনি চট করে আমার পাশে এসে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে ফিসফিস করে বলতে লাগল, 'একটা চমৎকার গল্প বলব। দাঁড়াও একটু ভেবে নি।' এই বলে তার হুঁকো দিয়ে টেকো মাথা চুলকাতে চুলকাতে চোখ বুজে ভাবতে লাগল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'হ্যাঁ, মনে হয়েছে, শোনো—

'তারপর এদিকে বড়মন্ত্রী তো রাজকন্যার গুলিসুতো খেয়ে ফেলেছে। কেউ কিচ্ছু জানে না। ওদিকে রাক্ষসটা করেছে কি, ঘুমুতে ঘুমুতে 'হাঁউ-মাঁউ-কাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ' বলে হুড়মুড় করে খাট থেকে পড়ে গিয়েছে। অমনি ঢাক ঢোল সানাই কাঁশি লোক লস্কর সেপাই পল্টন হৈ-হৈ রই-রই মার-মার কাট-কাট—। এর মধ্যে হঠাৎ রাজা বলে উঠলেন, "পক্ষীরাজ যদি হবে, তাহলে ন্যাজ নেই কেন?" শুনে পাত্র মিত্র ডাক্তার মোক্তার আক্কেল মক্কেল সবাই বললে, ভালো কথা! ন্যাজ কি হল?" কেউ তার জবাব দিতে পারে না, সব সুড়সুড় করে পালাতে লাগল।'

এমন সময় কাকটা আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বিজ্ঞাপন পেয়েছ? হ্যান্ডবিল?' আমি বললাম, 'কই না, কিসের বিজ্ঞাপন'? বলতেই কাকটা একটা কাগজের বান্ডিল থেকে

শ্রীশ্রীভূশণ্ডি কাগায় নমঃ

শ্রীকাক্কেশ্বর কুচকুচে

৪১নং গেছোবাজার, কাগেয়াপটি

আমরা হিসাবি ও বেহিসাবি, খুচরা ও পাইকারি, সকল প্রকার গণনার কার্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করিয়া থাকি। মূল্য এক ইঞ্চি ১।⁄ । Children Half Price, অর্থাৎ শিশুদের অর্ধমূল্য। আপনার জুতার মাপ, গায়ের রং, কান কটকট করে কি না, জীবিত কি মৃত, ইত্যাদি আবশ্যকীয় বিবরণ পাঠাইলেই ফেরত ডাকে ক্যাটালগ পাঠাইয়া থাকি।

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

আমরা সনাতন বায়সবংশীয় দাঁড়ি কুলীন, অর্থাৎ দাঁড়কাক। আজকাল নানাশ্রেণীর পাতিকাক, হেড়েকাক, রামকাক প্রভৃতি নীচশ্রেণীর কাকেরাও অর্থলোভে নানারূপ ব্যবসা চালাইতেছে। সাবধান! তাহাদের বিজ্ঞাপনের চটক দেখিয়া প্রতারিত হইবেন না।

শ্রীশ্রীভূশণ্ডি কাগায় নমঃ

শ্রীকাক্কেশ্বর কুচ্‌কুচে

৪১ নং গেছোবাজার, কাগেয়াপটি

আমরা হিসাবী ও বেহিসাবী খুচ্‌রা ও পাইকারী সকল প্রকার গণনার কার্য্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করিয়া থাকি। মূল্য এক ইঞ্চি ১।৵০। Children Half price, অর্থাৎ শিশুদের অর্দ্ধমূল্য। আপনার জুতার মাপ, গায়ের রং, কান কট্‌কট্‌ করে কিনা, জীবিত কি মৃত, ইত্যাদি আবশ্যকীয় বিবরণ পাঠাইলেই ফেরত ডাকে ক্যাটালগ্‌ পাঠাইয়া থাকি।

সাবধান ! সাবধান !! সাবধান !!!

আমরা সনাতন বায়স বংশীয় দাঁড়ি কুলীন, অর্থাৎ দাঁড়কাক। আজকাল নানাশ্রেণীর পাতি কাক, হেঁড়ে কাক, রাম কাক প্রভৃতি নীচশ্রেণীর কাকেরাও অর্থলোভে নানারূপ ব্যবসা চালাইতেছে। সাবধান! তাহাদের বিজ্ঞাপনের চটক দেখিয়া প্রতারিত হইবেন না।

'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হ্যান্ডবিল

একখানা ছাপানো কাগজ বের করে আমার হাতে দিল। আমি পড়ে দেখলাম, তাতে লেখা রয়েছে—

কাক বলল, 'কেমন হয়েছে?' আমি বললাম, 'সবটাতো ভালো করে বোঝা গেল না।' কাক গম্ভীর হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ভারি শক্ত, সকলে বুঝতে পারে না। একবার এক খদ্দের এয়েছিল, তার ছিল টেকো মাথা—'

এই কথা বলতেই বুড়ো মাৎ-মাৎ করে তেড়ে উঠে বলল, 'দেখ্‌! ফের যদি টেকো মাথা টেকো মাথা বলবি তো হুঁকো দিয়ে এক বাড়ি মেরে তোর শ্লেট ফাটিয়ে দেব।' কাক একটু থতমত খেয়ে কি যেন ভাবল, তারপর বলল, 'টেকো নয়, টেপো মাথা,—যে মাথা টিপে টিপে টোল খেয়ে গিয়েছে।'

বুড়ো তাতেও ঠাণ্ডা হল না, বসে বসে গজগজ করতে লাগল। তাই দেখে কাক বলল, 'হিসেবটা দেখবে নাকি?' বুড়ো একটু নরম হয়ে বলল, 'হয়ে গেছে? কই দেখি।' কাক অমনি 'এই দেখ' বলে তার শ্লেটখানা ঠকাস করে বুড়োর টাকের উপর ফেলে দিল। বুড়ো তৎক্ষণাৎ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল আর ছোট ছেলেদের মতো ঠোঁট ফুলিয়ে 'ও মা—ও পিসি—ও শিবুদা—' বলে হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদতে লাগল। কাকটা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, 'লাগল নাকি! ষাট ষাট।' বুড়ো অমনি কান্না থামিয়ে বলল, 'একষট্টি, বাষট্টি, চৌষট্টি—' কাক বলল, 'পঁয়ষট্টি।' আমি দেখলাম আবার বুঝি ডাকাডাকি শুরু হয় তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'কই হিসেবটা তো দেখলে না?' বুড়ো

বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ তাইতো! কি হিসেব হল পড় দেখি।'

আমি শ্লেটখানা তুলে দেখলাম খুদে খুদে অক্ষরে লেখা রয়েছে—'ইয়াদি কির্দ্দ অত্র কাকালতনামা লিখিতং শ্রীকাক্কেশ্বর কুচকুচে কার্যঞ্চাগে। ইমারত খেসারত দলিল দস্তাবেজ। তস্য ওয়ারিশানগণ মালিক দখলিকার স্বত্বে অত্র নায়েব সেরেস্তায় দস্ত বদস্ত কায়েম

মোকররী পত্তনী পাট্টা অথবা কাওলা কবুলিয়ত। সত্যতায় কি বিনা সত্যতায় মুনসেফী আদালতে কিম্বা দায়রায় সোপর্দ আসামী ফরিয়াদী সাক্ষী সাবুদ গয়রহ মোকর্দমা দায়ের কিম্বা আপোস মকমল ডিক্রিজারি নিলাম ইস্তাহার ইত্যাদি সর্বপ্রকার কর্তব্য বিধায়—'

আমার পড়া শেষ না হতেই বুড়ো বলে উঠল, 'এসব কি লিখেছ আবোল-তাবোল?' কাক বলল, 'ওসব লিখতে হয়। তা না হলে হিসেব টিকবে কেন? ঠিক চৌকস মতো কাজ করতে হলে গোড়ায় এসব বলে নিতে হয়।' বুড়ো বলল, 'তা বেশ করেছ, কিন্তু আসল হিসেবটা কি হল তা তো বললে না?' কাক বলল, 'হ্যাঁ, তাও তো বলা হয়েছে। ওহে! শেষ দিকটা পড় তো।'

আমি দেখলাম শেষের দিকে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে,—'সাত দুগুণে ১৪, বয়স ২৬ ইঞ্চি, জমা /২৷৷ সের, খরচ ৩৭ বৎসর।' কাক বলল, 'দেখেই বোঝা যাচ্ছে অঙ্কটা এল্-সি-এম্ও নয়, জি-সি-এম্ও নয়। সুতরাং হয় এটা ত্রৈরাশিকের অঙ্ক, না হয় ভগ্নাংশ। পরীক্ষা করে দেখলাম আড়াই সেরটা হচ্ছে ভগ্নাংশ। তাহলে বাকি তিনটে হল ত্রৈরাশিক। এখন আমার জানা দরকার, তোমরা ত্রৈরাশিক চাও, না ভগ্নাংশ চাও?'

বুড়ো বলল, 'আচ্ছা দাঁড়াও, তাহলে একবার জিজ্ঞাসা করে নি।' এই বলে সে নিচু হয়ে গাছের গোড়ায় মুখ ঠেকিয়ে ডাকতে লাগল, 'ওরে বুধো! বুধো রে!' খানিক পরে মনে হল কে যেন গাছের ভিতর থেকে রেগে বলে উঠল, 'কেন ডাকছিস?' বুড়ো বলল, 'কাক্কেশ্বর কি বলছে শোন্।' আবার সেই রকম আওয়াজ হল, 'কি বলছে?' বুড়ো বলল, 'বলছে, ত্রৈরাশিক না ভগ্নাংশ?' তেড়ে উত্তর হল, 'কাকে বলছে ভগ্নাংশ? তোকে না আমাকে?' বুড়ো বলল, 'তা নয়। বলছে, হিসেবটা ভগ্নাংশ চাস, না ত্রৈরাশিক?' একটুক্ষণ পরে জবাব শোনা গেল, 'আচ্ছা, ত্রৈরাশিক দিতে বল।'

বুড়ো গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ দাড়ি হাতড়াল, তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'বুধোটার যেমন বুদ্ধি! ত্রৈরাশিক দিতে বলব কেন? ভগ্নাংশটা খারাপ হল কিসে? না হে কাক্কেশ্বর, তুমি ভগ্নাংশই দাও।' কাক বলল, 'তাহলে আড়াই সেরের গোটা সের দুটো বাদ গেলে রইল ভগ্নাংশ আধ সের—তোমার হিসেব হল আধ সের। আধ সের হিসেবের দাম পড়ে—খাঁটি হলে দু টাকা চোদ্দ আনা, আর জল মেশানো থাকলে ছয় পয়সা।' বুড়ো বলল, 'আমি যখন কাঁদছিলাম, তখন তিন ফোঁটা জল হিসেবের মধ্যে পড়েছিল। এই নাও তোমার শ্লেট, আর এই নাও পয়সা ছটা।'

পয়সা পেয়ে কাকের মহা ফূর্তি! সে 'টাক-ডুমাডুম, টাক ডুমাডুম' বলে শ্লেট বাজিয়ে নাচতে লাগল। বুড়ো অমনি আবার তেড়ে উঠল, 'ফের টাক টাক বলছিস? দাঁড়া!—

ওরে বুধো, বুধো রে! শিগগির আয়। আবার টাক বলছে।' বলতে না বলতেই গাছের ফোকর থেকে মস্ত একটা পোঁটলা মতন কি যেন হুড়মুড় করে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। চেয়ে দেখলাম, একটা বুড়ো লোক একটা প্রকাণ্ড বোঁচকার নিচে চাপা পড়ে ব্যস্ত হয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে। বুড়োটা দেখতে অবিকল এই হুঁকোওয়ালা বুড়োর মতো।

হুঁকোওয়ালা কোথায় তাকে টেনে তুলবে, না সে নিজেই পোঁটলার উপর চড়ে বসে,

'ওঠ বলছি, শিগগির ওঠ্' ব'লে ধাঁই ধাঁই করে তাকে হুঁকো দিয়ে মারতে লাগল। কাক আমার দিকে চোখ মটকিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না? উধোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে। এর বোঝা ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে, এখন ও আর বোঝা ছাড়তে চাইবে কেন? এই নিয়ে রোজ মারামারি হয়।'

এই কথা বলতে বলতেই চেয়ে দেখি, বুধো তার পোঁটলাসুদ্ধ উঠে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েই সে পোঁটলা উঁচিয়ে দাঁত কড়মড় করে বলল, 'তবে রে ইস্টুপিড উধো!' উধোও আস্তিন গুটিয়ে হুঁকো বাগিয়ে হুংকার দিয়ে উঠল, 'তবে রে লক্ষ্মীছাড়া বুধো!' কাক বলল, 'লেগে যা, লেগে যা—নারদ, নারদ!' অমনি ঝটাপট, খটাখট, দমাদম, ধপাধপ! মুহূর্তের মধ্যে চেয়ে দেখি উধো চিৎপাত, শুয়ে হাঁপাচ্ছে, আর বুধো ছটফট করে টাকে হাত বুলোচ্ছে। বুধো কান্না শুরু করল, 'ওরে ভাই উধো রে, তুই এখন কোথায় গেলি রে?' উধো কাঁদতে লাগল, 'ওরে হায় হায়! আমাদের বুধোর কি হল রে!' তারপর দুজনে উঠে খুব খানিক গলা জড়িয়ে কেঁদে, আর খুব খানিক কোলাকুলি করে, দিব্যি খোশমেজাজে গাছের ফোকরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তাই দেখে কাকটাও তার দোকানপাট বন্ধ করে কোথায় যেন চলে গেল।

আমি ভাবছি এই বেলা পথ খুঁজে বাড়ি ফেরা যাক, এমন সময় শুনি পাশেই একটা ঝোপের মধ্যে কি রকম শব্দ হচ্ছে, যেন কেউ হাসতে হাসতে আর কিছুতেই হাসি সামলাতে পারছে না। উঁকি মেরে দেখি, একটা জন্তু—মানুষ না বাঁদর, প্যাঁচা না ভূত, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না—খালি হাত-পা ছুঁড়ে হাসছে, আর বলছে, 'এই গেল গেল—নাড়িভুঁড়ি সব ফেটে গেল!'

হঠাৎ আমায় দেখে সে একটু দম পেয়ে উঠে বলল, 'ভাগ্যিস তুমি এসে পড়লে, তা না হলে আর একটু হলেই হাসতে হাসতে পেট ফেটে যাচ্ছিল।' আমি বললাম, 'তুমি এমন সাংঘাতিক রকম হাসছ কেন?' জন্তুটা বলল, 'কেন হাসছি শুনবে? মনে কর, পৃথিবীটা যদি চ্যাপটা হত, আর সব জল গড়িয়ে ডাঙায় এসে পড়ত, আর ডাঙার মাটি সব ঘুলিয়ে প্যাচপ্যাচ কাদা হয়ে যেত, আর লোকগুলো সব তার মধ্যে ধপাধপ আছাড় খেয়ে পড়ত, তা হলে—হোঃ হোঃ হোঃ হো—' এই বলে সে আবার হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল। আমি বললাম, 'কি আশ্চর্য! এর জন্য তুমি এত ভয়ানক করে হাসছ?' সে আবার হাসি থামিয়ে বলল, 'না, না, শুধু এর জন্য নয়। মনে কর, একজন লোক আসছে, তার এক হাতে কুলপি বরফ, আর এক হাতে সাজিমাটি, আর লোকটা কুলপি খেতে গিয়ে ভুলে সাজিমাটি খেয়ে ফেলেছে—হোঃ হোঃ, হোঃ হো—হাঃ হাঃ হাঃ হা—' আবার হাসির পালা।

আমি বললাম, 'তুমি কেন এই সব অসম্ভব কথা ভেবে খামখা হেসে হেসে কষ্ট পাচ্ছ?' সে বলল, 'না, না, সব কি আর অসম্ভব? মনে কর, একজন লোক টিকটিকি পোষে—রোজ তাদের নাইয়ে খাইয়ে শুকোতে দেয়—একদিন একটা রামছাগল এসে সব টিকটিকি খেয়ে ফেলেছে।—হোঃ হোঃ হোঃ হো।'

জন্তুটার রকম-সকম দেখে আমার ভারি অদ্ভুত লাগল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি

মানহানির মোকদ্দমা

কে? তোমার নাম কি?' সে খানিকক্ষণ ভেবে বলল, 'আমার নাম হিজিবিজবিজ। আমার নাম হিজিবিজবিজ, আমার ভায়ের নাম হিজিবিজবিজ, আমার বাবার নাম হিজিবিজবিজ, আমার পিসের নাম হিজিবিজ্‌বিজ্‌—' আমি বললাম, 'তার চেয়ে সোজা বললেই হয় তোমার গুষ্টিসুদ্ধ সবাই হিজিবিজবিজ।' সে আবার খানিক ভেবে বলল, 'তা তো নয়, আমার নাম তকাই। আমার নাম তকাই, আমার খুড়োর নাম তকাই, আমার মেসোর নাম তকাই, আমার শ্বশুরের নাম তকাই—' আমি ধমক দিয়ে বললাম, 'সত্যি বলছ? না, বানিয়ে?' জন্তুটা কেমন থতমত খেয়ে বলল, 'না, না, আমার শ্বশুরের নাম বিস্কুট।' আমার ভয়ানক রাগ হল; তেড়ে বললাম, 'একটা কথাও বিশ্বাস করি না।'

অমনি, কথা নেই বার্তা নেই, ঝোপের আড়াল থেকে মস্ত একটা দাড়িওয়ালা ছাগল হঠাৎ উঁকি মেরে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার কথা হচ্ছে বুঝি?' আমি বলতে যাচ্ছিলাম 'না' কিন্তু কিছু না বলতেই সে তড়তড় করে বলে যেতে লাগল, 'তা তোমরা যতই তর্ক কর, এমন অনেক জিনিস আছে যা ছাগলে খায় না। তাই আমি একটা বক্তৃতা দিতে চাই, তার বিষয় হচ্ছে—"ছাগলে কি না খায়"।' এই বলে সে হঠাৎ এগিয়ে এসে বক্তৃতা আরম্ভ করল—

'হে বালকবৃন্দ এবং স্নেহের হিজিবিজবিজ আমার গলায় ঝুলানো সার্টিফিকেট দেখেই তোমরা বুঝতে পারছ যে, আমার নাম শ্রীব্যাকরণ শিং, বি. এ. খাদ্যবিশারদ। আমি খুব চমৎকার "ব্যা" করতে পারি, তাই আমার নাম ব্যাকরণ—আর শিং তো দেখতেই পাচ্ছ। ইংরিজিতে লিখবার সময় লিখি B.A. অর্থাৎ "ব্যা"। কোন্ কোন্ জিনিস খাওয়া যায় আর কোন্‌টা কোন্‌টা খাওয়া যায় না, তা আমি সব নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি—তাই আমার উপাধি হচ্ছে খাদ্যবিশারদ। তোমরা যে বল, "পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়," এটা অত্যন্ত অন্যায়। এই তো একটু আগে ওই হতভাগাটা বলছিল যে রামছাগল টিকটিকি খায়। এটা একেবারে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আমি অনেক রকম টিকটিকি চেটে দেখেছি, ওতে খাবার মতো কিচ্ছু নেই। অবশ্যি আমরা মাঝে মাঝে এমন অনেক জিনিস খাই, যা তোমরা খাও না, যেমন—খাবারের ঠোঙা, কিম্বা নারকেলের ছোবড়া, কিম্বা খবরের কাগজ, কিম্বা সন্দেশের মতো ভালো ভালো মাসিক পত্রিকা। কিন্তু তা বলে মজবুত বাঁধানো কোন বই আমরা কক্ষনো খাই না। আমরা কচিৎ কখনো লেপ কম্বল কিম্বা তোশক বালিশ এসব একটু আধটু খাই বটে, কিন্তু যারা বলে আমরা খাট পালং কিম্বা টেবিল চেয়ার খাই তারা ভয়ানক মিথ্যাবাদী। যখন আমাদের মনে খুব তেজ আসে, তখন শখ

করে অনেক রকম জিনিস আমরা চিবিয়ে কিম্বা চেখে দেখি,—যেমন, পেনসিল রবার কিম্বা বোতলের ছিপি কিম্বা শুকনো জুতো কিম্বা ক্যামবিসের ব্যাগ। শুনেছি আমার ঠাকুরদাদা একবার স্ফূর্তির চোটে এক সাহেবের আধখানা তাঁবু প্রায় খেয়ে শেষ করেছিলেন। কিন্তু তা বলে ছুরি কাঁচি কিম্বা শিশি বোতল, এ সব আমরা কোনদিন খাই না। কেউ কেউ সাবান খেতে ভালবাসে, কিন্তু সে সব নেহাত ছোটখাটো বাজে সাবান। আমার ছোটভাই একবার একটা আস্ত "বার-সোপ" খেয়ে ফেলেছিল—' বলেই ব্যাকরণ শিং আকাশের দিকে চোখ তুলে 'ব্যা ব্যা' করে ভয়ানক কাঁদতে লাগল। তাতে বুঝতে পারলাম যে, সাবান খেয়ে ভাইটির অকালমৃত্যু হয়েছে।

হিজিবিজবিজটা এতক্ষণ পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিল, হঠাৎ ছাগলটার বিকট কান্না শুনে সে হাঁউমাঁউ করে ধড়মড়িয়ে উঠে বিষম-টিষম খেয়ে একেবারে অস্থির! আমি ভাবলাম বোকাটা মরে বুঝি এবার। কিন্তু একটু পরেই দেখি, সে আবার তেমনি হাত-পা ছুঁড়ে ফ্যাকফ্যাক করে হাসতে লেগেছে। আমি বললাম, 'এর মধ্যে আবার হাসবার কি হল?' সে বলল, 'সেই একজন লোক ছিল, সে মাঝে মাঝে এমন ভয়ঙ্কর নাক ডাকাত যে সবাই তার উপর চটা ছিল। একদিন তাদের বাড়ি বাজ পড়েছে, আর অমনি সবাই দৌড়ে তাকে দমাদম মারতে লেগেছে—হোঃ হোঃ হোঃ হো—' আমি বললাম, 'যত সব বাজে কথা।' এই বলে যেই ফিরতে গেছি, অমনি চেয়ে দেখি একটা নেড়ামাথা কে যেন যাত্রার জুড়ির মতো চাপকান আর পায়জামা পরে হাসি হাসি মুখ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। দেখে আমার গা জ্বলে গেল। আমায় ফিরতে দেখেই সে আবদার করে আহ্লাদীর মতো ঘাড় বাঁকিয়ে দু-হাত নেড়ে বলতে লাগল, 'না ভাই, না ভাই, এখন আমায় গাইতে বলো না। সত্যি বলছি, আজকে আমার গলা তেমন খুলবে না।' আমি বললাম, 'কি আপদ! কে তোমায় গাইতে বলছে?' লোকটা এমন বেহায়া, সে তবুও আমার কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল, 'রাগ করলে? হ্যাঁ ভাই, রাগ করলে? আচ্ছা, না হয় কয়েকটা গান শুনিয়ে দিচ্ছি—রাগ করবার দরকার কি ভাই?' আমি কিছু বলবার আগেই ছাগলটা আর হিজিবিজবিজটা এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ—গান হোক, গান হোক।' অমনি নেড়াটা তার পকেট থেকে মস্ত দুই তাড়া গানের কাগজ বার করে, সেগুলো চোখের কাছে নিয়ে গুনগুন করতে করতে হঠাৎ সরু গলায় চিৎকার করে গান ধরল—'লাল গানে নীল সুর, হাসি-হাসি গন্ধ।'

ওই একটিমাত্র পদ সে একবার গাইল, দুবার গাইল, পাঁচবার, দশবার গাইল। আমি বললাম, 'এ তো ভারি উৎপাত দেখছি—গানের কি আর কোন পদ নেই?' নেড়া বলল, 'হ্যাঁ, আছে, কিন্তু সেটা অন্য একটা গান। সেটা হচ্ছে—"অলিগলি চলি রাম, ফুটপাথে ধুমধাম, কালি দিয়ে চুনকাম।" সে গান আজকাল আমি গাই না। আরেকটা গান আছে—"নাইনিতালের নতুন আলু"—সেটা খুব নরম সুরে গাইতে হয়। সেটাও আজকাল গাইতে পারি না। আজকাল যেটা গাই, সেটা হচ্ছে শিখিপাখার গান।' এই বলেই সে গান ধরল—

মিশিমাখা শিখিপাখা আকাশের কানে কানে
শিশিবোতল ছিপি-ঢাকা সরু সরু গানে গানে

আলোভোলা বাঁকা আলো আধো আধো কতদূরে
সরু মোটা সাদা কালো ছলছল ছায়াসুরে।

আমি বললাম, 'এ আবার গান হল নাকি? এর তো মাথামুণ্ডু কোন মানেই হয় না।' হিজিবিজবিজ বলল, 'হ্যাঁ, গানটা ভারি শক্ত।' ছাগল বলল, 'শক্ত আবার কোথায়? ওই শিশি বোতলের জায়গাটা একটু শক্ত ঠেকল, তাছাড়া তো শক্ত কিচ্ছু পেলাম না।' নেড়াটা খুব অভিমান করে বলল, 'তা, তোমরা সহজ গান শুনতে চাও তো সে কথা বললেই হয়। অত কথা শোনাবার দরকার কি? আমি কি আর সহজ গান গাইতে পারি না?' এই বলে সে গান ধরল—

বাদুড় বলে, 'ওরে ও ভাই শজারু,
আজকে রাতে দেখবে একটা মজারু'

আমি বললাম, 'মজারু বলে কোন কথা হয় না।' নেড়া বলল, 'কেন হবে না—আলবাত হয়। শজারু কাঙ্গারু দেবদারু সব হতে পারে, মজারু কেন হবে না?' ছাগল বলল, 'ততক্ষণ গানটা চলুক না—হয় কি না-হয় পরে দেখা যাবে।' অমনি আবার গান শুরু হল—

বাদুড় বলে, 'ওরে ও ভাই শজারু,
আজকে রাতে দেখবে একটা মজারু—

আজকে হেথায় চামচিকে আর পেঁচারা
আসবে সবাই, মরবে ইঁদুর বেচারা।
কাঁপবে ভয়ে ব্যাঙগুলো আর ব্যাঙাচি,
ঘামতে ঘামতে ফুটবে তাদের ঘামাচি,
ছুটবে ছুঁচো লাগবে দাঁতে কপাটি,
দেখবে তখন ছিপ্পি ছ্যাপ্তা চপাটি।'

আমি আবার আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সামলে গেলাম। গান চলতে লাগল—

শজারু কয়, ঝোপের মাঝে এখনি
গিন্নি আমার ঘুম দিয়েছেন দেখনি?
জেনে রাখুন প্যাঁচা এবং প্যাঁচানি,
ভাঙলে সে ঘুম শুনে তাদের চ্যাঁচানি,
খ্যাংরা-খোঁচা করব তাদের খুঁচিয়ে—
এই কথাটা বলবে তুমি বুঝিয়ে।'
বাদুড় বলে, 'পেঁচার কুটুম কুটুমী
মানবে না কেউ তোমার এসব ঘুঁতুমি।
ঘুমোয় কি কেউ এমন ভুসো আঁধারে?—
গিন্নি তোমার হোঁৎলা এবং হাঁদাড়ে।
তুমিও দাদা হচ্ছ ক্রমে খ্যাপাটে
চিমনি-চাটা ভোঁপসা-মুখো ভ্যাঁপাটে।

গানটা আরও চলত কিনা জানি না, কিন্তু এই পর্যন্ত হতেই একটা গোলমাল শোনা গেল। তাকিয়ে দেখি, আমার আশেপাশে চারিদিকে ভিড় জমে গিয়েছে। একটা শজারু এগিয়ে বসে ফোঁৎফোঁৎ করে কাঁদছে আর একটা শামলাপরা কুমির মস্ত একটা বই দিয়ে আস্তে আস্তে তার পিঠ থাবড়াচ্ছে আর ফিসফিস করে বলছে, 'কেঁদো না, কেঁদো না, সব ঠিক করে দিচ্ছি।' হঠাৎ একটা তকমা-আঁটা পাগড়ি-বাঁধা কোলা ব্যাং রুল উঁচিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল,—'মানহানির মোকদ্দমা।'

অমনি কোত্থেকে একটা কালো ঝোল্‌লা-পরা হুতোম প্যাঁচা এসে সকলের সামনে একটা উঁচু পাথরের উপর বসেই চোখ বুজে ঢুলতে লাগল, আর একটা মস্ত ছুঁচো একটা বিশ্রী নোংরা হাতপাখা দিয়ে তাকে বাতাস করতে লাগল। প্যাঁচা একবার ঘোলা ঘোলা চোখ করে চারিদিক তাকিয়েই তক্ষনি আবার চোখ বুজে বলল, 'নালিশ বাতলাও।' বলতেই কুমিরটা অনেক কষ্টে কাঁদো কাঁদো মুখ করে চোখের মধ্যে নখ দিয়ে খিমচিয়ে পাঁচ ছয় ফোঁটা জল বার করে ফেলল। তারপর সর্দিবসা মোটা গলায় বলতে লাগল, 'ধর্মাবতার হুজুর! এটা মানহানির মোকদ্দমা। সুতরাং প্রথমেই বুঝতে হবে "মান" কাকে বলে। মান মানে কচু। কচু অতি উপাদেয় জিনিস। কচু অনেক প্রকার, যথা—মানকচু, ওলকচু, কান্দাকচু,

মুখিকচু, পানিকচু, শঙ্খকচু ইত্যাদি। কচুগাছের মুলকে কচু বলে, সুতরাং বিষয়টার একেবারে মুল পর্যন্ত যাওয়া দরকার।'

এইটুকু বলতেই একটা শেয়াল শামলা মাথায় তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল, 'হুজুর, কচু অতি অসার জিনিস। কচু খেলে গলা কুটকুট করে, "কচুপোড়া খাও" বললে মানুষ চটে যায়। কচু খায় কারা? কচু খায় শুয়োর আর শজারু। ওয়াক থুঃ।' শজারুটা আবার ফ্যাঁৎফ্যাঁৎ করে কাঁদতে যাচ্ছিল, কিন্তু কুমির সেই প্রকাণ্ড বইটা দিয়ে তার মাথায় এক থাবড়া মেরে জিজ্ঞাসা করল, 'দলিলপত্র সাক্ষী-সাবুদ কিছু আছে?' শজারু ন্যাড়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই তো ওর হাতে সব দলিল রয়েছে।' বলতেই কুমিরটা ন্যাড়ার কাছ থেকে একতাড়া গানের কাগজ কেড়ে নিয়ে হঠাৎ এক জায়গা থেকে পড়তে লাগল—

একের পিঠে দুই
চৌকি চেপে শুই
পোঁটলা বেঁধে থুই
গোলাপ চাঁপা জুঁই
ইলিশ মাগুর রুই
হিঞ্চে পালং পুঁই
শান বাঁধানো ভুঁই
গোবর জলে ধুই
কাঁদিস কেন তুই?

শজারু বলল, 'আহা ওটা কেন? ওটা তো নয়।' কুমির বলল, 'তাই নাকি? আচ্ছা, দাঁড়াও।' এই বলে সে আবার একখানা কাগজ নিয়ে পড়তে লাগল—

চাঁদনি রাতের পেত্নীপিসি সজনেতলায় খোঁজ্না রে—
থ্যাঁৎলা মাথা হ্যাংলা সেথা হাড় কচাকচ ভোজ মারে।
চালতা গাছে আলতা পরা নাক ঝোলানো শাঁখচুনি
মাকড়ি নেড়ে হাঁকড়ে বলে, আমায় তো কেউ ডাঁকছনি!
মুণ্ডু ঝোলা উলটোবুড়ি ঝুলছে দেখ চুল খুলে,
বলছে দুলে, 'মিন্‌সেগুলোর মাংস খাব তুলতুলে।'

শজারু বলল, 'দুর ছাই! কি যে পড়ছে তার নাই ঠিক।' কুমির বলল, 'তাহলে কোন্‌টা?—এইটা?—"দই দম্বল, টোকো অম্বল, কাঁথা কম্বল করে সম্বল বোকা ভোম্বল"—এটাও নয়? আচ্ছা তাহলে—দাঁড়াও দেখছি—"নিঝুম নিশুত রাতে, একা শুয়ে তেতালাতে, খালিখালি খিদে পায় কেন রে?—কি বললে? ওসব নয়? তোমার গিন্নির নামে কবিতা?—তা, সে কথা আগে বললেই হত। এই তো—'রামভজনের গিন্নিটা, বাপরে যেন সিংহীটা! বাসন নাড়ে ঝনারঝন, কাপড় কাচে দমাদ্দম।"—এটাও মিলছে না? তাহলে নিশ্চয়ই এটা—

খুসখুসে কাশি ঘুষঘুষে জ্বর ফুসফুসে ছ্যাঁদা বুড়ো তুই মর্।
মাজরাতে ব্যথা পাঁজরাতে বাত, আজ রাতে বুড়ো হবি কুপোকাত!

শজারুটা ভয়ানক কাঁদতে লাগল, 'হায়, হায়! আমার পয়সাগুলো সব জলে গেল! কোথাকার এক আহাম্মক উকিল, দলিল দিলে খুঁজে পায় না!' ন্যাড়াটা এতক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল; সে হঠাৎ বলে উঠল, 'কোন্‌টা শুনতে চাও? সেই যে "বাদুড় বলে ওরে ও ভাই শজারু" সেইটা?' শজারু ব্যস্ত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেইটে, সেইটে।' অমনি শেয়াল আবার তেড়ে উঠল, 'বাদুড় কি বলে? হুজুর, তাহলে বাদুড়গোপালকে সাক্ষী মানতে আজ্ঞা হোক।' কোলা ব্যাং গাল গলা ফুলিয়ে হেঁকে বলল, 'বাদুড়গোপাল হাজির?' সবাই এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল কোথাও বাদুড় নেই। তখন শেয়াল বলল, 'তাহলে হুজুর, ওদের সক্কলের ফাঁসির হুকুম হোক।' কুমির বলল, 'তা কেন? এখন আমরা আপিল করব।' প্যাঁচা চোখ বুজে বলল, 'আপিল চলুক। সাক্ষী আনো।'

কুমির এদিক ওদিক তাকিয়ে হিজিবিজবিজকে জিজ্ঞাসা করল, 'সাক্ষী দিবি? চার আনা পয়সা পাবি।' পয়সার নামে হিজিবিজবিজ তড়াক করে সাক্ষী দিতে উঠেই ফ্যাকফ্যাক করে হেসে ফেলল। শেয়াল বলল, 'হাসছ কেন?' হিজিবিজবিজ বলল, 'একজনকে শিখিয়ে দিয়েছিল, তুই সাক্ষী দিবি যে, বইটার সবুজ রঙের মলাট, কানের কাছে নীল চামড়া আর মাথার উপর লাল কালির ছাপ। উকিল যেই তাকে জিজ্ঞাসা করেছে, "তুমি আসামীকে চেনো?" অমনি সে বলে উঠেছে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সবুজ রঙের মলাট, কানের কাছে নীল চামড়া, মাথার উপর লাল কালির ছাপ।"—হোঃ হোঃ হোঃ হো—।' শেয়াল জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি শজারুকে চেন?' হিজিবিজবিজ বলল, 'হ্যাঁ, শজারু চিনি, কুমির চিনি, সব চিনি। শজারু গর্তে থাকে, তার গায়ে লম্বা লম্বা কাঁটা; আর কুমিরের গায়ে চাকা চাকা টিপির মতো, তারা ছাগল-টাগল ধরে খায়।' বলতেই ব্যাকরণ শিং হঠাৎ ব্যা ব্যা করে ভয়ানক কেঁদে উঠল। আমি বললাম, 'আবার কি হল?' ছাগল বলল, 'আমার সেজোমামার আধখানা কুমিরে খেয়েছিল, তাই বাকি আধখানা মরে গেল।' আমি বললাম, 'গেল তো গেল, আপদ গেল। তুমি এখন চুপ কর।'

শেয়াল জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি মোকদ্দমার বিষয়ে কিছু জান?' হিজিবিজবিজ বলল, 'তা আর জানি নে? একজন নালিশ করে, তার একজন উকিল থাকে; আর একজনকে আসাম থেকে নিয়ে আসে, তাকে বলে আসামী, তারও একজন উকিল থাকে। এক-একদিকে দশজন করে সাক্ষী থাকে। আর একজন জজ থাকে, সে বসে বসে ঘুমোয়।' প্যাঁচা বলল, 'কক্ষনো আমি ঘুমোচ্ছি না—আমার চোখে ব্যারাম আছে তাই চোখ বুজে আছি।' হিজিবিজবিজ বলল, 'আরও অনেক জজ দেখেছি, তাদের সক্কলেরই চোখে ব্যারাম।' বলেই সে ফ্যাকফ্যাক করে ভয়ানক হাসতে লাগল।

শেয়াল বলল, 'আবার কি হল? হিজিবিজবিজ বলল, 'একজনের মাথার ব্যারাম ছিল, সে সব জিনিসের নামকরণ করত। তার জুতোর নাম ছিল "অবিমৃষ্যকারিতা", তার ছাতার নাম ছিল "প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব", তার গাড়ুর নাম ছিল "পরমকল্যাণবরেষু",—কিন্তু যেই তার বাড়ির নাম দিয়েছে "কিংকর্তব্যবিমূঢ়" অমনি ভূমিকম্প হয়ে বাড়িটাড়ি সব পড়ে গিয়েছে।

—হোঃ হোঃ হোঃ হো।' শেয়াল বলল, 'বটে? তোমার নাম কি শুনি?' সে বলল, 'এখন আমার নাম হিজিবিজবিজ।' শেয়াল বলল, 'নামের আবার এখন আর তখন কি? হিজিবিজবিজ বলল, 'তাও জানো না? সকালে আমার নাম থাকে "আলু-নারকোল", আবার একটু বিকেল হলেই আমার নাম হয়ে যাবে "রামতাড়ু"।' শেয়াল বলল, 'নিবাস কোথায়?' হিজিবিজবিজ বলল, 'কার কথা বলছ? শ্রীনিবাস? শ্রীনিবাস দেশে চলে গিয়েছে।' অমনি ভিড়ের মধ্যে থেকে উধো আর বুধো একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'তাহলে শ্রীনিবাস নিশ্চয়ই মরে গিয়েছে।' উধো বলল, 'দেশে গেলেই লোকেরা সব হুস হুস করে মরে যায়।' বুধো বলল, 'হাবুলের কাকা যেই দেশে গেল অমনি শুনি সে মরে গিয়েছে।' শেয়াল বলল, 'আঃ, সবাই মিলে কথা বোলো না, ভারি গোলমাল হয়।' শুনে উধো বুধোকে বলল, 'ফের সবাই মিলে কথা বলবি তো তোকে মারতে মারতে সাবাড় করে ফেলব।' বুধো বলল, 'আবার যদি গোলমাল করিস—তাহলে তোকে ধরে একেবারে পোঁটলা-পেটা করে দেব।'

শেয়াল বলল, 'হুজুর, এরা সব পাগল আর আহাম্মক, এদের সাক্ষীর কোন মূল্য নেই।' শুনে কুমির রেগে ল্যাজ আছড়িয়ে বলল, 'কে বলল মূল্য নেই? দস্তুরমতো চার আনা পয়সা খরচ করে সাক্ষী দেওয়ানো হচ্ছে।' বলেই সে তক্ষনি ঠকঠক করে ষোলটা পয়সা গুনে হিজিবিজবিজের হাতে দিয়ে দিল। অমনি কে যেন উপর থেকে বলে উঠল '১নং সাক্ষী, নগদ হিসাব, মূল্য চার আনা।' চেয়ে দেখলাম কাক্কেশ্বর বসে বসে হিসাব লিখছে।

শেয়াল আবার জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এ বিষয়ে আর কিছু জানো কি না?' হিজিবিজবিজ খানিক ভেবে বলল, 'শেয়ালের বিষয়ে একটা গান আছে, সেইটা জানি।' শেয়াল বলল, 'কি গান শুনি?' হিজিবিজবিজ সুর করে বলতে লাগল, 'আয় আয় আয়, শেয়ালে বেগুন খায়, তারা তেল আর নুন কোথায় পায়—' বলতেই শেয়াল ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'থাক থাক,—সে অন্য শেয়ালের কথা—তোমার সাক্ষী দেওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে।' এদিকে হয়েছে কি, সাক্ষীরা পয়সা পাচ্ছে দেখে সাক্ষী দেবার জন্য ভয়ানক হুড়োহুড়ি লেগে গিয়েছে। সবাই মিলে ঠেলাঠেলি করছে, এমন সময় হঠাৎ দেখি কাক্কেশ্বর ঝুপ করে গাছ থেকে নেমে এসে সাক্ষীর জায়গায় বসে সাক্ষী দিতে আরম্ভ করেছে।

কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই সে বলতে আরম্ভ করল, 'শ্রীশ্রীভূশণ্ডি কাগায় নমঃ—শ্রীকাক্কেশ্বর কুচকুচে, ৪১নং গেছোবাজার, কাগেয়াপটি। আমরা হিসাবি ও বেহিসাবি খুচরা পাইকারি সকল প্রকার গণনার কার্য—।'

শেয়াল বলল, 'বাজে কথা বোলো না—যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দাও। কি নাম তোমার?' কাক বলল, 'কি আপদ! তাই তো বলছিলাম—শ্রীকাক্কেশ্বর কুচকুচে।' শেয়াল বলল, 'নিবাস কোথায়?' কাক বলল, 'বললাম যে কাগেয়াপটি।' শেয়াল বলল, 'সে এখান থেকে কতদূর?' কাক বলল, 'তা বলা ভারি শক্ত। ঘণ্টা হিসাবে চার আনা, মাইল হিসাবে দশ পয়সা—নগদ দিলে দুই পয়সা কম। যোগ করলে দশ আনা, বিয়োগ করলে তিন আনা, ভাগ করলে সাত পয়সা, গুণ করলে একুশ টাকা।' শেয়াল বলল, 'আর বিদ্যে জাহির করতে হবে না। জিজ্ঞাসা করি, তোমার বাড়ি যাবার পথটা চেন তো?' কাক

বলল, 'তা আর চিনিনে? এইতো সামনেই সোজা পথ দেখা যাচ্ছে।' শেয়াল বলল, 'এ পথ কতদূর গিয়েছে?' কাক বলল, 'পথ আবার যাবে কোথায়?' যেখানকার পথ সেখানেই আছে। পথ কি আবার এদিক ওদিক চরে বেড়ায়? না, দার্জিলিঙে হাওয়া খেতে যায়?' শেয়াল বলল, 'তুমি তো ভারি বেয়াদব হে! বলি, সাক্ষী দিতে যে এয়েছ, মোকদ্দমার কথা কি জান?' কাক বলল, "খুব যা হোক! এতক্ষণ বসে বসে হিসাব করল কে? যা কিছু জানতে চাও আমার কাছে পাবে। এই তো, প্রথমেই, মান কাকে বলে? মান মানে কচুরি। কচুরি চার প্রকার—হিঙে কচুরি, খাস্তা কচুরি, নিমকি আর জিবেগজা! খেলে কি হয়? খেলে শেয়ালদের গলা কুটকুট করে, কিন্তু কাগেদের করে না। তারপর একজন সাক্ষী ছিল, নগদ মূল্য চার আনা, সে আসামে থাকত—তার কানের চামড়া নীল হয়ে গেল—তাকে বলে কালাজ্বর। তারপর একজন লোক ছিল, সে সকলের নামকরণ করত—শেয়ালকে বলত "তেলচোরা", কুমিরকে বলত "অষ্টাবক্র", প্যাঁচাকে বলত "বিভীষণ"।—

বলতেই বিচার সভায় একটা ভয়ানক গোলমাল বেধে গেল। কুমির হঠাৎ খেপে গিয়ে টপ করে কোলা ব্যাংকে খেয়ে ফেলল; তাই দেখে ছুঁচোটা কিচকিচ কিচকিচ করে ভয়ানক চ্যাঁচাতে লাগল; শেয়াল একটা ছাতা দিয়ে হুস হুস করে কাক্কেশ্বরকে তাড়াতে লাগল; প্যাঁচা গম্ভীর হয়ে বলল, 'সবাই এখন চুপ কর, আমি মোকদ্দমার রায় দেব।' এই বলেই সে একটা কানে-কলম-দেওয়া খরগোশকে হুকুম করল, 'যা বলছি লিখে নাও—"মানহানির মোকদ্দমা ২৪ নম্বর। ফরিয়াদি—শজারু। আসামী—" দাঁড়াও। আসামী কই?' তখন সবাই বলল, 'ওই যা! আসামী তো কেউ নেই।' তাড়াতাড়ি ভুলিয়ে-ভালিয়ে ন্যাড়াকে আসামী দাঁড় করনো হল। ন্যাড়াটা বোকা, সে ভাবল আসামীরাও বুঝি পয়সা পাবে, তাই সে কোন আপত্তি করল না।

হুকুম হল ন্যাড়ার তিনমাস জেল আর সাতদিনের ফাঁসি। আমি সবে ভাবছি এরকম অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে আপত্তি করা উচিত, এমন সময় ছাগলটা হঠাৎ 'ব্যা-করণ শিং' বলে পিছন থেকে তেড়ে এসে আমায় এক ঢুঁ মারল; তারপরেই আমার কান কামড়ে দিল। অমনি চারদিকে কি রকম সব ঘুলিয়ে যেতে লাগল; ছাগলটার মুখটা ক্রমে বদলিয়ে শেষটায় ঠিক মেজোমামার মতো হয়ে গেল। তখন ঠাওর করে দেখলাম, মেজোমামা আমার কান ধরে বলছেন, 'ব্যাকরণ শিখবার নাম করে বুঝি পড়ে পড়ে ঘুমানো হচ্ছে?'

আমি তো অবাক! প্রথমে ভাবলাম বুঝি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম—কিন্তু, তোমরা বললে বিশ্বাস করবে না, আমার রুমালটা খুঁজতে গিয়ে দেখি কোথাও রুমাল নেই, আর একটা বেড়াল বেড়ার উপর বসে বসে গোঁফে তা দিচ্ছিল, হঠাৎ আমায় দেখতে পেয়েই খচমচ করে নেমে পালিয়ে গেল। আর ঠিক সেই সময়ে বাগানের পিছন থেকে একটা ছাগল 'ব্যা' করে ডেকে উঠল।

আমি বড়মামার কাছে এসব কথা বলেছিলাম, কিন্তু বড়মামা বললেন, 'যা, যা, কতগুলো বাজে স্বপ্ন দেখে তাই নিয়ে গল্প করতে এসেছে।' মানুষের বয়স হলে এমন হোঁতকা হয়ে যায়, কিছুতেই কোন কথা বিশ্বাস করতে চায় না। তোমাদের কিনা এখনও বেশি বয়স হয়নি, তাই তোমাদের কাছে ভরসা করে এসব কথা বললাম।

পাগলা দাশু

পাগলা দাশু

আমাদের স্কুলের যত ছাত্র তাহাদের মধ্যে এমন কেহই ছিল না, যে পাগলা দাশুকে না চিনে। যে লোক আর কাহাকেও জানে না, সেও সকলের আগে পাগলা দাশুকে চিনিয়া ফেলে। সেবার এক নতুন দারোয়ান আসিল, একেবারে আন্‌কোরা পাড়াগেঁয়ে লোক, কিন্তু প্রথম যখন সে পাগলা দাশুর নাম শুনিল, তখনই আন্দাজে ঠিক ধরিয়া লইল যে, এই ব্যক্তিই পাগলা দাশু। কারণ মুখের চেহারায়, কথাবার্তায়, চাল-চলনে বোঝা যাইত যে তাহার মাথায় একটু 'ছিট' আছে।

তাহার চোখ দুটি গোল গোল, কান দুটি অনাবশ্যক রকমের বড়, মাথায় এক বস্তা ঝাঁক্‌ড়া চুল। চেহারাটা দেখিলেই মনে হয়—

ক্ষীণদেহ খর্বকায় মুণ্ড তাহে ভারি
যশোরেব কই যেন নরমূর্তিধারি।

সে যখন তাড়াতাড়ি চলে অথবা ব্যস্ত হইয়া কথা বলে, তখন তাহার হাত পা ছোঁড়ার ভঙ্গী দেখিয়া হঠাৎ কেন জানি চিংড়িমাছের কথা মনে পড়ে।

সে যে বোকা ছিল তাহা নয়। অঙ্ক কষিবার সময়, বিশেষত লম্বা লম্বা গুণ-ভাগের বেলায় তাহার আশ্চর্য মাথা খুলিত। আবার এক এক সময় সে আমাদের বোকা বানাইয়া তামাশা দেখিবার জন্য এমন সকল ফন্দি বাহির করিত যে, আমরা তাহার বুদ্ধি দেখিয়া অবাক হইয়া থাকিতাম।

'দাশু' অর্থাৎ দাশরথি, যখন প্রথম আমাদের স্কুলে ভরতি হয়, তখন জগবন্ধুকে আমাদের 'ক্লাসের ভালো ছেলে' বলিয়া সকলে জানিত। সে পড়াশুনায় ভালো হইলেও, তাহার মতো অমন একটি হিংসুটে ভিজেবেড়াল আমরা আর দেখি নাই। দাশু একদিন জগবন্ধুর কাছে কি একটা ইংরাজি কথার মানে জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিল। জগবন্ধু তাহাকে খামখা দুকথা শুনাইয়া বলিল, "আমার বুঝি আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই? আজ একে ইংরিজি বোঝাব, কাল ওঁর অঙ্ক কষে দেব, পরশু আর একজন আসবেন আব এক ফরমাইস নিয়ে—এই করি আর কি!" দাশু সাংঘাতিক চটিয়া বলিল, "তুমি তো ভারি ছ্যাঁচড়া ছোটলোক!" জগবন্ধু পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে নালিশ করিল, "ঐ নতুন ছেলেটা আমায় গালাগালি দিচ্ছে।" পণ্ডিত মহাশয় দাশুকে এমনি ধমক দিয়া দিলেন যে বেচারা একেবারে দমিয়া গেল।

আমাদের ইংরাজি পড়াইতেন বিষ্টুবাবু। জগবন্ধু তাঁহার প্রিয় ছাত্র। পড়াইতে পড়াইতে যখনই তাঁহার বই দরকার হয়, তিনি জগবন্ধুর কাছেই বই চাহিয়া লন। একদিন তিনি পড়াইবার সময় 'গ্রামার' চাহিলেন, জগবন্ধু তাড়াতাড়ি তাহার সবুজ কাপড়ের মলাট দেওয়া 'গ্রামার'খানা বাহির করিয়া দিল। মাস্টার মহাশয় বইখানি খুলিয়াই হঠাৎ গম্ভীর হইয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন, "বইখানা কার?" জগবন্ধু বুক ফুলাইয়া বলিল, "আমার।" মাস্টার মহাশয় বলিলেন, "হুঁ—নতুন সংস্করণ বুঝি? বইকে-বই একেবারে বদলে গেছে।" এই বলিয়া তিনি পড়িতে লাগিলেন—'যশোবন্ত দারোগা—লোমহর্ষক ডিটেকটিভ নাটক।' জগবন্ধু ব্যাপারখানা বুঝিতে না পারিয়া বোকার মতো তাকাইয়া রহিল। মাস্টার মহাশয় বিকট রকম চোখ পাকাইয়া বলিলেন, "এই সব জ্যাঠামি বিদ্যে শিখচ বুঝি?" জগবন্ধু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল কিন্তু মাস্টার মহাশয় এক ধমক দিয়া বলিলেন, "থাক্ থাক্, আর ভালমানুষি দেখিয়ে কাজ নেই—ঢের হয়েছে।" লজ্জায় অপমানে জগবন্ধুর দুই কান লাল হইয়া উঠিল—আমরা সকলেই আহ্লাদে বেশ খুশি হইলাম। পরে জানা গেল যে, এটি দাশু ভায়ার কীর্তি, সে মজা দেখিবার জন্য গ্রামারের জায়গায় ঠিক ঐরূপ মলাট দেওয়া একখানা বই রাখিয়া দিয়াছিল।

দাশুকে লইয়া আমরা সর্বদাই ঠাট্টাতামাশা করিতাম এবং তাহার সামনেই তাহার বুদ্ধি ও চেহারা সম্বন্ধে অপ্রীতিকর সমালোচনা করিতাম। তাহাতে একদিনও তাহাকে বিরক্ত হইতে দেখি নাই। এক এক সময়ে সে নিজেই আমাদের মন্তব্যের উপর রঙ চড়াইয়া নিজের সম্বন্ধে নানারকম অদ্ভুত গল্প বলিত। একদিন সে বলিল, "ভাই আমাদের পাড়ায় যখন কেউ আমসত্ত্ব বানায় তখনই আমার ডাক পড়ে। কেন জানিস?" আমরা বলিলাম, "খুব আমসত্ত্ব খাস বুঝি?" সে বলিল, "তা নয়। যখন আমসত্ত্ব শুকোতে দেয়, আমি সেইখানে ছাদের উপর বার দুয়েক চেহারাখানা দেখিয়ে আসি। তাতেই, ত্রিসীমানার যত কাক সব ত্রাহি ত্রাহি করে ছুটে পালায়। কাজেই আর আমসত্ত্ব পাহারা দিতে হয় না।"

একবার সে হঠাৎ পেন্টেলুন পরিয়া স্কুলে হাজির হইল। ঢল্‌ঢলে পায়জামার মতো পেন্টেলুন আর তাকিয়ার খোলের মতো কোট পরিয়া তাহাকে যে কিরূপ অদ্ভুত দেখাইতেছিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতেছিল এবং সেটা তাহার কাছে ভারি একটা আমোদের ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতেছিল। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "পেন্টেলুন পরেছিস্ কেন? দাশু এক গাল হাসিয়া বলিল, "ভালো করে ইংরিজি শিখব ব'লে।" আর একবার সে খামখা নেড়া মাথায় এক পট্টি বাঁধিয়া ক্লাসে আসিতে আরম্ভ করিল এবং আমরা সকলে তাহা লইয়া ঠাট্টা তামাশা করায় যারপরনাই খুশি হইয়া উঠিল। দাশু আদপেই গান গাহিতে পারে না, তাহার যে তালজ্ঞান বা সুরজ্ঞান একেবারে নাই, এ কথা সে বেশ জানে। তবু সেবার ইনস্পেক্টার সাহেব যখন ইস্কুল দেখিতে আসেন, তখন আমাদের খুশি করিবার জন্য চিৎকার করিয়া গান শুনাইয়াছিল। আমরা কেহ ওরূপ করিলে সেদিন রীতিমতো শাস্তি পাইতাম কিন্তু দাশু 'পাগলা' বলিয়া তাহার কোনো শাস্তি হইল না।

একবার ছুটির পরে দাশু অদ্ভুত এক বাক্স বগলে লইয়া ক্লাসে হাজির হইল। মাস্টার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দাশু, ও বাক্সের মধ্যে কি এনেছ?" দাশু বলিল, "আজ্ঞে, আমার জিনিসপত্র।" জিনিসপত্রটা কিরূপ হইতে পারে, এই লইয়া আমাদের মধ্যে বেশ একটু তর্ক হইয়া গেল। দাশুর সঙ্গে বই, খাতা, পেনসিল, ছুরি সবই তো আছে তবে আবার জিনিসপত্র কিরে বাপু? দাশুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে সোজাসুজি কোনো উত্তর না দিয়া বাক্সটিকে আঁকড়াইয়া ধরিল এবং বলিল, "খবরদার, আমার বাক্স তোমরা কেউ

ঘেঁটো না।" তাহার পর চাবি দিয়া বাক্সটাকে একটুখানি ফাঁক করিয়া, সে তাহার ভিতর কি যেন দেখিয়া লইল, এবং 'ঠিক আছে' বলিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বিড় বিড় করিয়া হিসাব করিতে লাগিল। আমি একটুখানি দেখিবার জন্য উঁকি মারিতে গিয়াছিলাম— অমনি পাগলা মহা ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি চাবি ঘুরাইয়া বাক্স বন্ধ করিয়া ফেলিল।

ক্রমে আমাদের মধ্যে তুমুল আলোচনা আরম্ভ হইল। কেহ বলিল, 'ওটা ওর টিফিনের বাক্স—ওর মধ্যে খাবার আছে।" কিন্তু একদিনও টিফিনের সময় তাহাকে বাক্স খুলিয়া কিছু খাইতে দেখিলাম না। কেহ বলিল, "ওটা বোধ হয় ওর মনি-ব্যাগ—ওর মধ্যে টাকা পয়সা আছে, তাই ও সর্বদা কাছে কাছে রাখতে চায়।" আর একজন বলিল, "টাকা পয়সার জন্য অত বড় বাক্স কেন? ও কি ইস্কুলে মহাজনী কারবার খুলবে নাকি?"

একদিন টিফিনের সময় দাশু হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া, বাক্সের চাবিটা আমার কাছে রাখিয়া গেল আর বলিল, "এটা এখন তোমার কাছে রাখো, দেখো হারায় না যেন। আর আমার আসতে যদি একটু দেরি হয়, তবে তোমরা ক্লাসে যাবার আগে ওটা দারোয়ানের কাছে দিও।" এই বলিয়া সে বাক্সটি দারোয়ানের জিম্মায় রাখিয়া বাহির হইয়া গেল। তখন আমাদের উৎসাহ দেখে কে! এতদিনে সুবিধা পাওয়া গিয়াছে, এখন দারোয়ানটা একটু তফাৎ গেলেই হয়। খানিক বাদে দারোয়ান তাহার রুটি পাকাইবার লোহার উনানটি ধরাইয়া, কতকগুলি বাসনপত্র লইয়া কলতলার দিকে গেল। আমরা এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম, দারোয়ান আড়াল হওয়া মাত্র, আমরা পাঁচ-সাতজনে তাহার ঘরের কাছে সেই বাক্সের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলাম। তাহার পর আমি চাবি দিয়া বাক্স খুলিয়া দেখি বাক্সের মধ্যে বেশ ভারি একটা কাগজের পোঁটলা ন্যাকড়ার ফালি দিয়া খুব করিয়া জড়ানো। তাড়াতাড়ি পোঁটলার প্যাঁচ খুলিয়া দেখা গেল, তাহার মধ্যে একখানা কাগজের বাক্স—তাহার ভিতরে আর একটি ছোট পোঁটলা। সেটি খুলিয়া একখানা কার্ড বাহির হইল, তাহার এক পিঠে লেখা 'কাঁচকলা খাও' আর একটি পিঠে লেখা 'অতিরিক্ত কৌতূহল ভালো নয়।' দেখিয়া আমরা এ-উহার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলাম। সকলের শেষে একজন বলিয়া উঠিল, "ছোকরা আচ্ছা যা হোক, আমাদের বেজায় ঠকিয়েছে।" আর একজন বলিল, "যেমন ভাবে বাঁধা ছিল তেমনি করে রেখে দাও, সে যেন টেরও না পায় যে আমরা খুলেছিলাম। তাহলে সে নিজেই জব্দ হবে।" আমি বলিলাম, "বেশ কথা। ও আস্‌লে পরে তোমরা খুব ভালোমানুষের মতো বাক্সটা দেখাতে বলো আর ওর মধ্যে কি আছে, সেটা বার বার করে জানতে চেয়ো।" তখন আমরা তাড়াতাড়ি কাগজপত্রগুলি বাঁধিয়া, আগেকার মতো পোঁটলা পাকাইয়া বাক্সে ভরিয়া ফেলিলাম।

বাক্সে চাবি দিতে যাইতেছি, এমন সময় হো হো করিয়া একটা হাসির শব্দ শোনা গেল—চাহিয়া দেখি পাঁচিলের উপরে বসিয়া পাগলা দাশু হাসিয়া কুটিকুটি। হতভাগা এতক্ষণ চুপি চুপি তামাশা দেখিতেছিল। তখন বুঝিলাম আমার কাছে চাবি দেওয়া, দারোয়ানের কাছে বাক্স রাখা, টিফিনের সময় বাহিরে যাওয়ার ভান করা, এ সমস্ত তাহার শয়তানি। খামখা আমাদের আহাম্মক বানাইবার জন্যই সে মিছামিছি এ কয়দিন ধরিয়া ক্রমাগত একটা বাক্স বহিয়া বেড়াইয়াছে।

সাধে কি বলি 'পাগলা দাশু?'

দাশুর খ্যাপামি

স্কুলের ছুটির দিন। স্কুলের পরেই ছাত্র-সমিতির অধিবেশন হবে, তাতে ছেলেরা মিলে অভিনয় করবে। দাশুর ভারি ইচ্ছে ছিল সে-ও একটা কিছু অভিনয় করে। একে-ওকে দিয়ে সে অনেক সুপারিশও করিয়েছিল, কিন্তু আমরা সবাই কোমর বেঁধে বললাম, সে কিছুতেই হবে না। সেইতো গতবার যখন আমাদের অভিনয় হয়েছিল তাতে দাশু সেনাপতি সেজেছিল; সেবার সে অভিনয়টা একেবারে মাটি করে দিয়েছিল। যখন ত্রিচূড়ের গুপ্তচর সেনাপতির সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে বলল, "সাহস থাকিলে তবে খোল তলোয়ার!" —দাশুর তখন "তবে আয় সম্মুখ সমরে" ব'লে তখনি তলোয়ার খুলবার কথা। কিন্তু দাশুটা আনাড়ির মতো টানাটানি করতে গিয়ে তলোয়ার তো খুলতে পারলই না, মাঝ থেকে ঘাবড়ে গিয়ে কথাগুলোও বলতে ভুলে গেল। তাই দেখে গুপ্তচর আবার "খোল তলোয়ার" বলে হুঙ্কার দিয়ে উঠল। দাশুটা এমনি বোকা, সে অমনি "দাঁড়া, দেখছিস না বক্‌লস্ আটকিয়ে গেছে" ব'লে চেঁচিয়ে তাকে এক ধমক দিয়ে উঠল। ভাগ্যিস আমি তাড়াতাড়ি তলোয়ারটা খুলে দিলাম তা না হলে ঐখানেই অভিনয় বন্ধ হয়ে যেত। তারপর শেষের দিকে রাজা যখন জিজ্ঞাসা করলেন, "কিবা চাহ পুরস্কার কহ সেনাপতি," তখন দাশুর বলবার কথা ছিল "নিত্যকাল থাকে যেন রাজপদে মতি," কিন্তু দাশুটা তা না ব'লে, তার পরের আর একটা লাইন আরম্ভ করেই, হঠাৎ জিভ কেটে "ঐ যাঃ! ভুলে গেছিলাম" ব'লে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। আমি কটমট করে তাকাতে, সে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে ঠিক লাইনটা আরম্ভ করল।

তাই এবারে তার নাম হতেই আমরা জোর করে ব'লে উঠলাম, "না, সে কিছুতেই হবে না।" বিশু বলল, "দাশু এক্‌টিং করবে? তাহলেই চিত্তির!" ট্যাঁপা বলল, "তার চাইতে ভজু মালিকে ডেকে আনলেই হয়!" দাশু বেচারা প্রথমে খুব মিনতি করল, তারপর চটে উঠল, তারপর কেমন মুষড়ে গিয়ে মুখ হাঁড়ি করে বসে রইল। যে কয়দিন আমাদের তালিম চলছিল, দাশু রোজ এসে চুপটি করে হলের এক কোনায় বসে বসে আমাদের অভিনয় শুনত। ছুটির কয়েকদিন আগে থেকে দেখি, ফোর্থ ক্লাসের ছোট গণশার সঙ্গে দাশুর ভারি ভাব হয়ে গেছে। গণশা ছেলেমানুষ, কিন্তু সে চমৎকার আবৃত্তি করতে পারে—তাই তাকে দেবদূতের 'পার্ট' দেওয়া হয়েছে। দাশু রোজ তাকে নানারকম খাবার এনে খাওয়ায়, রঙিন পেনসিল আর ছবির বই এনে দেয়, আর বলে যে ছুটির দিন তাকে একটা ফুটবল কিনে দেবে। হঠাৎ গণশার উপর দাশুর এতখানি টান হবার কোনো কারণ আমরা বুঝতে পারলাম না। কেবল দেখতে পেলাম, গণশাটা খেলনা আর খাবার পেয়ে ভুলে 'দাশুদা'র একজন পরম ভক্ত হয়ে উঠতে লাগল।

ছুটির দিনে আমরা যখন অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, তখন আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারা গেল। আড়াইটা বাজতে না বাজতেই দেখা গেল, দাশুভায়া সাজঘরে ঢুকে পোশাক পরতে আরম্ভ করেছে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, "কিরে? তুই এখানে কি করছিস?" দাশু

বলল, "বাঃ, পোশাক পরব না?" আমি বললাম, "পোশাক পরবি কিরে? তুই তো আর এক্‌টিং করবি না।" দাশু বলল, "বা, খুব তো খবর রাখ। আজকে দেবদূত সাজবে কে জানো না?" শুনে হঠাৎ আমাদের মনে কেমন একটা খটকা লাগল, আমি বললাম, "কেন গণ্‌শার কি হল?" দাশু বলল, "কি হয়েছে তা গণ্‌শাকে জিজ্ঞেস করলেই পার?" তখন চেয়ে দেখি সবাই এসেছে, কেবল গণ্‌শাই আসেনি। অমনি ধুচুনি, বিশু আর আমি ছুটে বেরোলাম গণ্‌শার খোঁজে।

সারাটি স্কুল খুঁজে, শেষটায় টিফিনঘরের পিছনে হতভাগাকে খুঁজে পাওয়া গেল। সে আমাদের দেখেই পালাবার চেষ্টা করছিল কিন্তু আমরা তাকে চটপট গ্রেপ্তার করে টেনে নিয়ে চললাম। গণ্‌শা কাঁদতে লাগল, "না আমি কক্ষনো এক্‌টিং করব না, তাহলে দাশুদা আমায় ফুটবল দেবে না।" আমরা তবু তাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় অঙ্কের মাস্টার হরিবাবু সেখানে এসে উপস্থিত। তিনি আমাদের দেখেই ভয়ঙ্কর চোখ লাল করে ধমক দিয়ে উঠলেন, "তিন-তিনটে ধাড়ি ছেলে মিলে ঐ কচি ছেলেটার পিছনে লেগেছিস? তোদের লজ্জাও করে না?" ব'লেই আমাকে আর বিশুকে এক একটি চড় মেরে আর রামপদর কান ম'লে দিয়ে হন্‌হন্ করে চলে গেলেন।

এই সুযোগে হাতছাড়া হয়ে গণেশচন্দ্র আবার চম্পট দিল। আমরাও অপমানটা হজম করে ফিরে এলাম। এসে দেখি, দাশুর সঙ্গে রাখালের মহা ঝগড়া লেগে গেছে। রাখাল বলছে, "তোকে আজ কিছুতেই দেবদূত সাজতে দেওয়া হবে না।" দাশু বলছে, "বেশ তো, তাহলে আর কেউ দেবদূত সাজুক, আমি রাজা কিম্বা মন্ত্রী সাজি। পাঁচ-ছটা পার্ট আমার মুখস্থ হয়ে আছে।" এমন সময় আমরা এসে খবর দিলাম যে, গণশাকে কিছুতেই রাজী করানো গেল না। তখন অনেক তর্কবিতর্ক আর ঝগড়াঝাঁটির পর স্থির হল যে, দাশুকে আর ঘাঁটিয়ে দরকার নেই, তাকেই দেবদূত সাজতে দেওয়া হোক। শুনে দাশু খুব খুশী হল আর আমাদের শাসিয়ে রাখল যে, "আবার যদি তোরা কেউ গোলমাল করিস, তাহলে কিন্তু গতবারের মতো সব ভণ্ডুল করে দেব।"

তারপর অভিনয় আরম্ভ হল। প্রথম দৃশ্যে দাশু বিশেষ কিছু গোলমাল করেনি, খালি স্টেজের সামনে একবার পানের পিক্ ফেলেছিল। কিন্তু তৃতীয় দৃশ্যে এসে সে একটু বাড়াবাড়ি আরম্ভ করল। এক জায়গায় তার খালি বলবার কথা—"দেবতা বিমুখ হলে মানুষে কি পারে?" কিন্তু সে এই কথাটুকুর আগে কোত্থেকে আরও চার-পাঁচ লাইন জুড়ে দিল! আমি তাই নিয়ে আপত্তি করেছিলাম, কিন্তু দাশু বলল, "তোমরা যে লম্বা বক্তৃতা কর সে বেলা দোষ হয় না, আমি দুটো কথা বেশি বললেই যত দোষ!" এও সহ্য করা যেত, কিন্তু শেষ দৃশ্যের সময় তার মোটেই আসবার কথা নয়, তা জেনেও সে স্টেজে আসবার জন্য জেদ ধরে বসল। আমরা অনেক কষ্টে অনেক তোয়াজ করে তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে, শেষ দৃশ্যে দেবদূত আসতেই পারে না, কারণ তার আগের দৃশ্যেই আছে যে দেবদূত বিদায় নিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। শেষ দৃশ্যেও আছে যে মন্ত্রী রাজাকে সংবাদ দিচ্ছেন যে, দেবদূত মহারাজকে আশীর্বাদ করে স্বর্গপুরীতে প্রস্থান করেছেন।

দাশু অগত্যা তার জেদ ছাড়ল বটে, কিন্তু বেশ বোঝা গেল সে মনে মনে একটুও খুশি হয়নি।

শেষ দৃশ্যের অভিনয় আরম্ভ হল। প্রথম খানিকটা অভিনয়ের পর মন্ত্রী এসে সভায় হাজির হলেন। এ কথা সে কথার পর তিনি রাজাকে সংবাদ দিলেন, "বারবার মহারাজে আশীষ করিয়া, দেবদূত গেল চলি স্বর্গ অভিমুখে।" বলতেই হঠাৎ কোত্থেকে "আবার সে এসেছে ফিরিয়া" ব'লে এক গাল হাসতে হাসতে দাশু একেবারে সামনে এসে উপস্থিত। হঠাৎ এ রকম বাধা পেয়ে মন্ত্রী তার বক্তৃতার খেই হারিয়ে ফেলল, আমরাও সকলে কি রকম যেন ঘাবড়িয়ে গেলাম—অভিনয় হঠাৎ বন্ধ হবার যোগাড় হয়ে এল। তাই দেখে দাশু খুব সর্দারি করে মন্ত্রীকে বলল, "বলে যাও কি বলিতেছিলে।" তাতে মন্ত্রী আরও কেমন ঘাবড়িয়ে গেল। রাখাল প্রতিহারী সেজেছিল, দাশুকে কি যেন বলবার জন্যে যেই একটু এগিয়ে গেছে, অমনি দাশু "চেয়েছিল জোর করে ঠেকাতে আমারে এই হতভাগা"—বলে এক চাঁটি মেরে তার মাথার পাগড়ি ফেলে দিল। ফেলে দিয়েই সে রাজার শেষ বক্তৃতাটা—"এ রাজ্যতে নাহি রবে হিংসা অত্যাচার, নাহি রবে দারিদ্র্য যাতনা" ইত্যাদি—নিজেই গড়গড় করে ব'লে গিয়ে, "যাও সবে নিজ নিজ কাজে" ব'লে অভিনয় শেষ করে দিল। আমরা কি করব বুঝতে না পেরে সব বোকার মতো হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। ওদিকে ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠল আর ঝুপ্ করে পর্দাও নেমে গেল।

আমরা সব রেগে-মেগে লাল হয়ে দাশুকে তেড়ে ধরে বললাম, "হতভাগা, দ্যাখ্ দেখি সব মাটি করলি, অর্ধেক কথাই বলা হল না।" দাশু বলল, "বা, তোমরা কেউ কিছু বলছ না দেখেই তো আমি তাড়াতাড়ি যা মনে ছিল সেইগুলো বলে দিলাম। তা না হলে তো আরো সব মাটি হয়ে যেত।" আমি বললাম, "তুই কেন মাঝখানে এসে গোল বাধিয়ে দিলি? তাইতো সব ঘুলিয়ে গেল।" দাশু বলল, "রাখাল কেন বলেছিল যে আমায় জোর করে আটকিয়ে রাখবে? তা ছাড়া তোমরা কেন আমায় গোড়া থেকে নিতে চাচ্ছিলে না আর ঠাট্টা করছিলে? আর রামপদ কেন বারবার আমার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছিল?" রামপদ বলল, "ওকে ধরে ঘা দুচার লাগিয়ে দে।" দাশু বলল, "লাগাও না, দেখবে আমি এক্ষুনি চেঁচিয়ে সকলকে হাজির করি কিনা?"

চীনেপট্‌কা

আমাদের রামপদ তার জন্মদিনে একহাঁড়ি মিহিদানা লইয়া স্কুলে আসিল। টিফিনের ছুটি হওয়া মাত্র আমরা সকলেই মহা উৎসাহে সেগুলি ভাগ করিয়া খাইলাম। খাইল না কেবল পাগলা দাশু।

পাগলা দাশু যে মিহিদানা খাইতে ভালোবাসে না, তা নয়। কিন্তু রামপদকে সে একেবারেই পছন্দ করিত না, দুজনের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া চলিত। আমরা রামপদকে বলিলাম, "দাশুকে কিছু দে।" রামপদ বলিল, "কি রে দাশু, খাবি নাকি? দেখিস, খাবার লোভ হয়ে থাকে তো বল্‌ আর আমার সঙ্গে কোনোদিন লাগতে আসবিনে—তা হলে মিহিদানা পাবি।" এমন করিয়া বলিলে তো রাগ হইবারই কথা, কিন্তু দাশু কিছু না বলিয়া গম্ভীরভাবে হাত পাতিয়া মিহিদানা লইল, তারপর দারোয়ানের ছাগলটাকে ডাকিয়া সকলের সামনে তাহাকে সেই মিহিদানা খাওয়াইল। তারপর খানিকক্ষণ হাঁড়িটার দিকে তাকাইয়া, কি যেন ভাবিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে হাসিতে স্কুলের বাহিরে চলিয়া গেল। এদিকে হাঁড়িটাকে শেষ করিয়া আমরা সকলে খেলায় মাতিয়া গেলাম—দাশুর কথা কেউ আর ভাবিবার সময় পাই নাই।

টিফিনের পর ক্লাসে আসিয়া দাশু অত্যন্ত শান্তশিষ্ট ভাবে এক কোণে বসিয়া আপন মনে অঙ্ক কষিতেছে। তখনই আমার কেমন সন্দেহ হইয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিরে দাশু, কিছু করেছিস নাকি?" দাশু নিতান্ত ভালোমানুষের মতো বলিল, "হ্যাঁ, দুটো জি-সি-এম করে ফেলেছি।" আমি বলিলাম, "দুৎ! সে কথা কে বলছে? কিছু দুষ্টুমির মতলব করিসনি তো?" এ কথায় দাশু ভয়ানক চটিয়া গেল। তখন পণ্ডিত মহাশয় ক্লাশে আসিতেছিলেন, দাশু তাঁহার কাছে নালিশ করে আর কি! আমরা অনেক কষ্টে তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া বসাইয়া রাখিলাম।

পণ্ডিত মহাশয় মানুষটি মন্দ নহেন। পড়ার জন্য প্রায়ই কোনো তাড়াহুড়ো করেন না। কেবল মাঝে মাঝে একটু বেশি গোল করিলে হঠাৎ সাংঘাতিক রকম চটিয়া যান। সে সময়ে তাঁর মেজাজটি আশ্চর্য রকম ধারাল হইয়া উঠে। পণ্ডিত মহাশয় চেয়ারে বসিয়াই "নদী শব্দের রূপ কর" বলিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। আমরা বই খুলিয়া হড়বড় করিয়া যা-তা খানিকটা বলিয়া গেলাম এবং তাহার উত্তরে, পণ্ডিত মহাশয়ের নাকের ভিতর হইতে অতি সুন্দর ঘড়্ঘড়্ শব্দ শুনিয়া বুঝিলাম, নিদ্রা বেশ গভীর হইয়াছে। কাজেই আমরাও শ্লেট লইয়া 'টুকটাক' আর 'দশপঁচিশ' খেলা শুরু করিলাম। কেবল মাঝে মাঝে যখন ঘড়ঘড়ানি কমিয়া আসিত তখন সবাই মিলিয়া সুর করিয়া 'নদী নদ্যৌ নদ্যঃ' ইত্যাদি আওড়াইতাম। দেখিতাম, তাহাতে ঘুমপাড়ানি গানের মতো খুব আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়।

সকলে খেলায় মত্ত, কেবল দাশু এক কোনায় বসিয়া কি যেন করিতেছে সেদিকে আমাদের কোনো খেয়াল নাই। একটু বাদে পণ্ডিত মহাশয়ের চেয়ারের তলায় তক্তার নিচ হইতে ফট্ করিয়া কি একটা আওয়াজ হইল। পণ্ডিত মহাশয় ঘুমের ঘোরে ভ্রূকুটি করিয়া সবেমাত্র 'উঃ' বলিয়া কি যেন একটা ধমক দিতে যাইবেন, এমন সময় ফুট্ফাট্ দুম্দাম্ ধুপ্ধাপ্ শব্দে তাণ্ডব কোলাহল উঠিয়া সমস্ত স্কুলটিকে একেবারে কাঁপাইয়া তুলিল। মনে হইল যেন, যত রাজ্যের মিস্ত্রী মজুর সবাই এক জোটে বিকট তালে ছাত পিটাইতে লাগিয়াছে—দুনিয়ার যত কাঁসারি আর লাঠিয়াল সবাই যেন পাল্লা দিয়া হাতুড়ি আর লাঠি ঠুকিতেছে। খানিকক্ষণ পর্যন্ত আমরা, যাকে পড়ার বইয়ে 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' বলে, তেমনি হইয়া হাঁ করিয়া রহিলাম। পণ্ডিত মহাশয় একবার মাত্র বিকট শব্দ করিয়া, তার পর হঠাৎ হাত পা ছুঁড়িয়া একলাফে টেবিল ডিঙ্গাইয়া, একেবারে ক্লাশের মাঝখানে ধড়্ফড়্ করিয়া পড়িয়া গেলেন। সরকারী কলেজের নবীন পাল বরাবরই হাই জাম্পে ফার্স্ট প্রাইজ পায়, তাহাকেও আমরা এরকম সাংঘাতিক লাফাইতে দেখি নাই। পাশের ঘরে নিচের ক্লাশের ছেলেরা চিৎকার করিয়া 'কড়াকিয়া' নামতা আওড়াইতেছিল—তারাও হঠাৎ ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া থামিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে ইস্কুলময় হুলুস্থূল পড়িয়া গেল—দারোয়ানের কুকুরটা পর্যন্ত যারপরনাই ব্যস্ত হইয়া বিকট কেঁউ কেঁউ শব্দে গোলমালের মাত্রা ভীষণ রকম বাড়াইয়া তুলিল।

মিনিট পাঁচেক ভয়ানক আওয়াজের পর যখন সব ঠাণ্ডা হইয়া আসিল তখন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "কিসের শব্দ হইয়াছিল দেখ।" দারোয়ানজি একটা লম্বা বাঁশ দিয়া অতি সাবধানে আস্তে আস্তে, তক্তার নিচ হইতে একটা হাঁড়ি ঠেলিয়া বাহির করিল—রামপদর

সেই হাঁড়িটা, তখনও তাহার মুখের কাছে একটুখানি মিহিদানা লাগিয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় ভয়ানক ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "এ হাঁড়িটা কার?" রামপদ বলিল, "আজ্ঞে আমার।" আর কোথা যায়—অমনি দুই কানে দুই পাক! "হাঁড়িতে কি রেখেছিলি!" রামপদ তখন বুঝিতে পারিল যে, গোলমালের জন্য সমস্ত দোষ তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িতেছে। সে বেচারা তাড়াতাড়ি বুঝাইতে গেল, "আজ্ঞে ওর মধ্যে ক'রে মিহিদানা এনেছিলাম, তারপর—" মুখের কথা শেষ না হইতেই পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "তারপর মিহিদানাগুলো চীনে পট্‌কা হয়ে ফুটতে লাগল, না?" বলিয়াই ঠাস্ ঠাস্ করিয়া দুই চড়।

অন্যান্য মাস্টারেরাও ক্লাশে আসিয়া জড় হইয়াছিলেন; তাঁহারাও এক বাক্যে হাঁ-হাঁ করিয়া রুখিয়া আসিলেন। আমরা দেখিলাম বেগতিক। বিনা দোষে রামপদ বেচারা মার খায় বুঝি! এমন সময় দাশু আমার শ্লেটখানা লইয়া পণ্ডিত মহাশয়কে দেখাইয়া বলিল, "এই দেখুন, আপনি যখন ঘুমোচ্ছিলেন, তখন ওরা শ্লেট নিয়ে খেলা করছিল—এই দেখুন টুকটাকের ঘর কাটা!" শ্লেটের উপর আমার নাম লেখা, পণ্ডিত মশাই আমার উপর প্রচণ্ড এক চড় তুলিয়াই হঠাৎ কেমন থতমত খাইয়া গেলেন। তারপর দাশুর দিকে কটমট করিয়া তাকাইয়া বলিলেন, "চোপ্ রও, কে বলেছে আমি ঘুমোচ্ছিলাম?" দাশু খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া বলিল, "তবে যে আপনার নাক ডাকছিল?" পণ্ডিত মহাশয় তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরাইয়া বলিলেন, "বটে? ওরা সব খেলা কচ্ছিল? আর তুমি কি কচ্ছিলে?" দাশু অম্লানবদনে বলিল, "আমি পট্‌কায় আগুন দিচ্ছিলাম।" শুনিয়াই সকলের চক্ষুস্থির! ছোকরা বলে কি?

প্রায় আধ মিনিটখানেক কাহারও মুখে আর কথা নাই। তারপর পণ্ডিত মহাশয় হঠাৎ একেবারে হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, "কেন পট্‌কায় আগুন দিচ্ছিলে?" দাশু ভয় পাইবার ছেলেই নয়, সে রামপদকে দেখাইয়া বলিল, "ও কেন আমায় মিহিদানা দিতে চাচ্ছিল না?" এরূপ অদ্ভুত যুক্তি শুনিয়া রামপদ বলিল, "আমার মিহিদানা, আমি যা ইচ্ছা তাই করব।" দাশু তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "তা হলে আমার পট্‌কা আমিও যা ইচ্ছা তাই করব।" এরূপ পাগলের সঙ্গে আর তর্ক করা চলে না! কাজেই মাস্টারেরা সকলেই কিছু-কিছু ধমক-ধামক করিয়া যে যার ক্লাশে চলিয়া গেলেন। সে 'পাগলা' বলিয়া তাহার কোনো শাস্তি হইল না।

ছুটির পর আমরা সবাই মিলিয়া কত চেষ্টা করিয়াও তাহার দোষ বুঝাইতে পারিলাম না। সে বলিল, "আমার পট্‌কা, রামপদর হাঁড়ি। যদি আমার দোষ হয়, তা হলে রামপদরও দোষ হয়েছে। বাস্! ওর মার খাওয়াই উচিত।"

দাশুর কীর্তি

নবীনচাঁদ স্কুলে এসেই বলল, কাল তাকে ডাকাতে ধরেছিল। শুনে স্কুল সুদ্ধ সবাই হাঁ হাঁ করে ছুটে আসল। 'ডাকাতে ধরেছিল? বলিস কিরে!' ডাকাত না তো কি? বিকেল বেলায় সে জ্যোতিলালের বাড়িতে পড়তে গিয়েছিল, সেখান থেকে ফিরবার সময় ডাকাতরা তাকে ধরে তার মাথায় চাঁটি মেরে, তার নতুন কেনা শখের পিরানাটিতে কাদাজলের পিচ্‌কিরি দিয়ে গেল। আর যাবার সময় ব'লে গেল, "চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক—নইলে দড়াম্‌ করে তোর মাথা উড়িয়ে দেব।" তাই সে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে রাস্তার ধারে প্রায় বিশ মিনিট দাঁড়িয়েছিল, এমন সময় তার বড়মামা এসে তার কান ধরে বাড়িতে নিয়ে বললেন, "রাস্তায় সঙ্‌ সেজে এয়ার্কি করা হচ্ছিল?" নবীনচাঁদ কাঁদ-কাঁদ গলায় ব'লে উঠল, "আমি কি করব? আমায় ডাকাতে ধরেছিল—" শুনে তার মামা প্রকাণ্ড এক চড় তুলে বললেন, "ফের জ্যাঠামি!" নবীনচাঁদ দেখল মামার সঙ্গে তর্ক করাই বৃথা—কারণ, সত্যিসত্যিই তাকে যে ডাকতে ধরেছিল, একথা তার বাড়ির কাউকে বিশ্বাস করানো শক্ত। সুতরাং তার মনের দুঃখ এতক্ষণ মনের মধ্যেই চাপা ছিল।

যাহোক. স্কুলে এসে তার দুঃখ বোধ হয় অনেকটা দূর হতে পেরেছিল, কারণ স্কুলে অন্তত অর্ধেক ছেলে তার কথা শুনবার জন্য একেবারে ব্যস্ত হয়ে ঝুঁকে পড়েছিল, এবং তার প্রত্যেকটি ঘামাচি, ফুস্‌কুড়ি আর চুলকানির দাগটি পর্যন্ত তারা আগ্রহ করে ডাকাতির সুস্পষ্ট প্রমাণ ব'লে স্বীকার করেছিল। দু একজন যারা তার কনুয়ের আঁচড়টাকে পুরনো ব'লে সন্দেহ করেছিল তারাও বলল যে হাঁটুর কাছে যে ছড়ে গেছে সেটা একেবারে টাটকা নতুন। কিন্তু তার পায়ের গোড়ালিতে যে ঘায়ের মতো ছিল সেটাকে দেখে কেষ্টা যখন বললে, "ওটা তো জুতোর ফোস্কা", তখন নবীনচাঁদ ভয়ানক চটে বললে, "যাও

তোমাদের কাছে আর কিছুই বলব না।" কেষ্টাটার জন্য আমাদের আর কিছু শোনাই হল না

ততক্ষণে দশটা বেজে গেছে ঢং ঢং করে স্কুলের ঘণ্টা পড়ে গেল। সবাই যে যার ক্লাশে চলে গেলাম, এমন সময় দেখি পাগলা দাশু একগাল হাসি নিয়ে ক্লাশে ঢুকছে। আমরা বললাম, "শুনেছিস্? কাল নবুকে ডাকাতে ধরেছিল।" যেমন বলা অম্নি দাশরথী হঠাৎ হাত পা ছুঁড়ে বই-টই ফেলে, খ্যাঃ-খ্যাঃ-খ্যাঃ-খ্যাঃ করে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে একেবারে মেঝের উপর বসে পড়ল। পেটে হাত দিয়ে গড়াগড়ি করে, একবার চিৎ হয়ে, একবার উপুড় হয়ে, তার হাসি আর কিছুতেই থামে না। দেখে আমরা তো অবাক! পণ্ডিত মশাই ক্লাশে এসেছেন, তখনও পুরোদমে তার হাসি চলছে: সবাই ভাবলে, 'ছোঁড়াটা ক্ষেপে গেল নাকি?' যাহোক, খুব খানিকটা হুটোপাটির পর সে ঠাণ্ডা হয়ে, বই-টই গুটিয়ে বেঞ্চের উপর উঠে বসল। পণ্ডিতমশাই বললেন, "ওরকম হাসছিলে কেন?" দাশু নবীনচাঁদকে দেখিয়ে বললে, "ঐ ওকে দেখে।" পণ্ডিতমশাই খুব কড়া রকমের ধমক লাগিয়ে তাকে ক্লাশের কোনায় দাঁড় করিয়ে রাখলেন। কিন্তু পাগলার তাতেও লজ্জা নেই, সে সারাটি ঘণ্টা থেকে থেকে বই দিয়ে মুখ আড়াল করে ফিক্‌ফিক্ করে হাসতে লাগল।

টিফিনের ছুটির সময় নবু দাশুকে চেপে ধরল, "কিরে দেশো! বড় যে হাসতে শিখেছিস!" দাশু বললে, "হাসব না? তুমি কাল ধুচুনি মাথায় দিয়ে কি রকম নাচটা নেচেছিলে, সে তো আর তুমি নিজে দেখনি! দেখলে বুঝতে কেমন মজা!" আমরা সবাই বললাম, "সে কি রকম? ধুচুনি মাথায় নাচছিল মানে?" দাশু বললে, "তাও জান না? ওই কেষ্টা আর জগাই—ঐ যা! বলতে না বারণ করেছিল!" আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "কি বলছিস ভালো করেই বল্ না।" দাশু বললে, "কালকে শেঠেদের বাগানের পিছন দিয়ে নবু একলা একলা বাড়ি যাচ্ছিল, এমন সময় দুটো ছেলে—তাদের নাম বলতে বারণ—তারা দৌড়ে এসে নবুর মাথায় ধুচুনির মতো কি একটা চাপিয়ে, তার গায়ের উপর আচ্ছা করে পিচ্‌কিরি দিয়ে পালিয়ে গেল।" নবু ভয়ানক রেগে বললে, "তুই তখন কি করছিলি?" দাশু বললে, "তুমি তখন মাথার থলি খুলবার জন্য ব্যাঙের মতো হাত পা ছুঁড়ে লাফাচ্ছিলে দেখে আমি বললাম—ফের নড়বি তো দড়াম করে মাথা উড়িয়ে দেব। তাই শুনে তুমি রাস্তার মধ্যে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে, তাই আমি তোমার বড়মামাকে ডেকে আনলাম।" নবীনচাঁদের যেমন বাবুয়ানা তেমনি তার দেমাক—সেইজন্য কেউ তাকে পছন্দ করত না, তার লাঞ্ছনার বর্ণনা শুনে সবাই বেশ খুশি হলাম। ব্রজলাল ছেলেমানুষ, সে ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বললে, "তবে যে নবীনদা বলছিল, তাকে ডাকাতে ধরেছে?" দাশু বললে, "দূর বোকা! কেষ্ট কি ডাকাত?" বলতে না বলতেই কেষ্টা সেখানে এসে হাজির। কেষ্টা আমাদের উপরের ক্লাশে পড়ে, তার গায়েও বেশ জোর আছে। নবীনচাঁদ তাকে দেখবামাত্র শিকারী বেড়ালের মতো ফুলে উঠল। কিন্তু মারামারি করতে সাহস পেল না, খানিকক্ষণ কট্‌মট্ করে তাকিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ল। আমরা ভাবলাম গোলমাল মিটে গেল।

কিন্তু তার পরদিন ছুটির সময় দেখি, নবীন তার দাদা মোহনচাঁদকে নিয়ে হন্‌হন্ করে আমাদের দিকে আসছে। মোহনচাঁদ এন্ট্রান্স ক্লাশে পড়ে, সে আমাদের চাইতে অনেক

বড়, তাকে ওরকম ভাবে আসতে দেখেই আমরা বুঝলাম, এবার একটা কাণ্ড হবে। মোহন এসেই বলল, "কেষ্টা কই?" কেষ্টা দূর থেকে তাকে দেখেই কোথায় সরে পড়েছে, তাই তাকে আর পাওয়া গেল না। তখন নবীনচাঁদ বললে, "ওই দাশুটা সব জানে, ওকে জিজ্ঞাসা কর।" মোহন বললে, "কিহে ছোকরা, তুমি সব জানো নাকি?" দাশু বললে, "না, সব আর জানব কোত্থেকে—এইতো সবে ফোর্থ ক্লাশে পড়ি, একটু ইংরিজি জানি, ভূগোল বাংলা জিওমেটরি—" মোহনচাঁদ ধমক দিয়ে বললে, "সেদিন নবুকে যে কারা সব ঠেঙিয়েছিল, তুমি তার কিছু জানো কিনা?" দাশু বললে, "ঠ্যাঙায়নি তো—মেরেছিল, খুব অল্প মেরেছিল।" মোহন একটুখানি ভেংচিয়ে বললে, "খুব অল্প মেরেছে, না? তবু কতখানি শুনি?" দাশু বললে, "সে কিছুই না—ওরকম মারলে একটুও লাগে না।" মোহন আবার ব্যঙ্গ করে বললে, "তাই নাকি? কি রকম মারলে পরে লাগে?" দাশু খানিকটা মাথা চুলকিয়ে তারপর বললে, "ঐ সেবার হেডমাস্টার মশাই তোমায় যেমন বেত মেরেছিলেন, সেই রকম!" এ কথায় মোহন ভয়ানক চটে দাশুর কান ম'লে দিয়ে চিৎকার করে বলল, "দেখ্ বেয়াদব! ফের জ্যাঠামি করবি তো চাব্‌কিয়ে লাল করে দেব। কাল তুই সেখানে ছিলি কিনা, আর কি কি দেখেছিলি সব খুলে বলবি কিনা?" জানোই তো দাশুর মেজাজ কেমন পাগলাটে গোছের, সে একটুখানি কানে হাত বুলিয়ে তারপর হঠাৎ মোহনচাঁদকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে বসল। কিল, ঘুঁষি, চড়, আঁচড়, কামড় সে এম্নি চটপট চালিয়ে গেল যে আমরা সবাই হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। মোহন বোধহয় স্বপ্নেও ভাবেনি যে ফোর্থ ক্লাশের একটা রোগা ছেলে তাকে অমন ভাবে তেড়ে আসতে সাহস পাবে—তাই সে একেবারে থতমত খেয়ে কেমন যেন লড়তেই পারল না। দাশু তাকে পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে মাটিতে চিৎপাত করে ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "এর চাইতেও ঢের আস্তে মেরেছিল।" এন্ট্রান্স ক্লাশের কয়েকটি ছেলে সেখানে দাঁড়িয়েছিল, তারা যদি মোহনকে সামলে না ফেলত, তাহলে সেদিন তার হাত থেকে দাশুকে বাঁচানোই মুশকিল হত।

পরে একদিন কেষ্টাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "হ্যাঁরে, নবুকে সেদিন তোরা অমন করলি কেন?" কেষ্টা বললে, "ঐ দাশুটাই তো শিখিয়েছিল ওরকম করতে। আর বলেছিল তা হলে এক সের জিলিপি পাবি।" আমরা বললাম, "কৈ আমাদের তো ভাগ দিলিনে?" কেষ্টা বলল, "সে কথা আর বলিস কেন? জিলিপি চাইতে গেলুম, হতভাগা বলে কিনা আমার কাছে কেন? ময়রার দোকানে যা, পয়সা ফেলে দে, যত চাস জিলিপি পাবি।"

আচ্ছা, দাশু কি সত্যি সত্যি পাগল, না কেবল মিচ্‌কেমি করে?

চালিয়াৎ

শ্যামচাঁদের বাবা কোন একটা সাহেব-অফিসে মস্ত বড় কাজ করিতেন, তাই শ্যামচাঁদের পোশাক পরিচ্ছদে, রকম-সকমে কায়দার আর অন্ত ছিল না। সে যখন দেড় বিঘৎ চওড়া কলার আঁটিয়া, রঙিন ছাতা মাথায় দিয়া, নতুন জুতার মচ্‌মচ্‌ শব্দে গম্ভীর চালে ঘাড় উঁচাইয়া স্কুলে আসিত, তাহার সঙ্গে পাগড়িবাঁধা তক্‌মা-আঁটা চাপরাশি এক রাজ্যের বই ও টিফিনের বাক্স বহিয়া আনিত, তখন তাহাকে দেখাইত ঠিক যেন পেখমধরা ময়ূরটির মতো! স্কুলের ছোট ছোট ছেলেরা হাঁ করিয়া অবাক হইয়া থাকিত, কিন্তু আমরা সবাই একবাক্যে বলিতাম "চলিয়াৎ"।

বয়সের হিসাবে শ্যামচাঁদ একটু বেঁটে ছিল। পাছে কেহ তাকে ছেলেমানুষ ভাবে এবং যথোপযুক্ত খাতির না করে, এই জন্য সর্বদাই সে অত্যন্ত বেশি রকম গম্ভীর হইয়া থাকিত এবং কথাবার্তায় নানা রকম বোলচাল দিয়া এমন বিজ্ঞের মতো ভাব প্রকাশ করিত যে স্কুলের দারোয়ান হইতে নিচের ক্লাশের ছাত্র পর্যন্ত সকলেই ভাবিত, 'নাঃ, লোকটা কিছু জানে!' শ্যামচাঁদ প্রথমে যেবার ঘড়ি-চেইন আঁটিয়া স্কুলে আসিল, তখন তাহার কাণ্ড যদি দেখিতে! পাঁচ মিনিট অন্তর ঘড়িটাকে বাহির করিয়া সে কানে দিয়া শুনিত, ঘড়িটা চলে কিনা! স্কুলের যেখানে যত ঘড়ি আছে, সব কটার ভুল তাহার দেখানো চাই-ই চাই! পাঁড়েজি দারোয়ানকে সে রীতিমতো ধমক লাগাইয়া বসিল, "এইও! স্কুলের ক্লক্‌টাতে যখন চাবি দাও, তখন সেটাকে রেগুলেট কর না কেন? ওটাকে অয়েল করতে হবে— ক্রমাগতই শ্লো চলছে।" পাঁড়েজির চৌদ্দ পুরুষে কেউ কখনও ঘড়ি 'অয়েল' বা 'রেগুলেট' করে নাই। সে যে সপ্তাহে একদিন করিয়া চাবি ঘুরাইতে শিখিয়াছে, ইহাতেই তাহার দেশের লোকের বিস্ময়ের সীমা নাই। কিন্তু দেশভাইদের কাছে মানরক্ষা করিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "হাঁ, হাঁ, আভি হাম্ রেংলিট কর্‌বে।" পাঁড়েজির উপর একচাল চালিয়া শ্যামচাঁদ ক্লাশে ফিরিতেই একপাল ছোট ছেলে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। শ্যামচাঁদ তাহাদের কাছে মহা আড়ম্বর করিয়া শ্লো, ফাস্ট, মেইন স্প্রিং, রেগুলেট প্রভৃতি ঘড়ির সমস্ত রহস্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিল।

একবার আমাদের একটি নতুন মাস্টার ক্লাশে আসিয়াই শ্যামচাঁদকে 'খোকা' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। লজ্জায় ও অপমানে শ্যামচাঁদের মুখ কান একেবারে লাল হইয়া উঠিল— সে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, আমার নাম শ্যামচাঁদ ঘটক।" মাস্টার মহাশয় অত কি বুঝিবেন, বলিলেন, "শ্যামচাঁদ? আচ্ছা বেশ, খোকা বস।" তারপর কয়েকদিন ধরিয়া স্কুল সুদ্ধ ছেলে তাহাকে 'খোকা' 'খোকা' করিয়া অস্থির করিয়া তুলিল। কিন্তু কয়দিন পরেই শ্যামচাঁদ ইহার শোধ লইয়া ফেলিল। সেদিন সে ক্লাশে আসিয়াই পকেট হইতে কালো চোঙ্গার মতো কি একটা বাহির করিল। মাস্টার মহাশয়, শাদাসিধে ভালোমানুষ, তিনি বলিলেন, "কি হে খোকা, থার্‌মোমিটার এনেছ যে! জ্বর-টর হয় নাকি?" শ্যামচাঁদ বলিল, "আজ্ঞে, না—থার্‌মোমিটার নয়—ফাউন্টেন পেন!" শুনিয়া সকলের তো চক্ষু স্থির।

ফাউন্টেন পেন! মাস্টার এবং ছেলে সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিতে আসিলেন ব্যাপারখানা কি! শ্যামচাঁদ বলিল, "এই একটা ভাল্‌কেনাইট্ টিউব, তার মধ্যে কালি ভরা আছে।" একটা ছেলে উৎসাহে বলিয়া উঠিল, "ও বুঝেছি, পিচকিরি বুঝি?" শ্যামচাঁদ কিছু জবাব না দিয়া, খুব মাতব্বরের মতো একটুখানি মুচকি হাসিয়া, কলমটিকে খুলিয়া তাহার সোনালি নিবখানি দেখাইয়া বলিল, "ওতে ইরিডিয়াম আছে—সোনার চেয়েও বেশি দাম।" তারপর যখন সে একখানা খাতা লইয়া, সেই আশ্চর্য কলম দিয়া তর্‌তর্ করিয়া নিজের নাম লিখিতে লাগিল, তখন স্বয়ং মাস্টার মহাশয় পর্যন্ত বড় বড় চোখ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তারপর, শ্যামচাঁদ কলমটিকে তাঁর হাতে দিবামাত্র তিনি ভারি খুশি হইয়া সেটাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দুই ছত্র লিখিয়া বলিলেন, "কি কলই বানিয়েছে, বিলিতি কোম্পানি বুঝি?" শ্যামচাঁদ চট্‌পট্ বলিয়া ফেলিল, "আমেরিকান স্টাইলো এন্ড ফাউন্টেন পেন কোং। ফিলাডেল্‌ফিয়া।"

ক্রমে পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল। ছুটির দিন স্কুলের উঠানে প্রকাণ্ড শামিয়ানা খাটানো হইল, কলিকাতা হইতে কে এক বাজিওয়ালা আসিয়াছেন, তিনি 'ম্যাজিক' দেখাইবেন। যথাসময়ে সকলে আসিলেন, মাস্টার ছাত্র লোকজন নিমন্ত্রিত অভ্যাগত সকলে মিলিয়া উঠান সিঁড়ি রেলিং পাঁচিল একেবারে ভরিয়া ফেলিয়াছে। ম্যাজিক চলিতে লাগিল। একখানা শাদা রুমাল চোখের সামনেই লাল নীল সবুজের কারিকুরিতে রঙিন হইয়া উঠিল! একজন লোক একটা সিদ্ধ ডিম গিলিয়া মুখের মধ্য হইতে এগারোটা আস্ত ডিম বাহির করিল! ডেপুটিবাবুর কোচম্যানের দাড়ি নিংড়াইয়া প্রায় পঞ্চাশটি টাকা বাহির করা হইল। তারপর ম্যাজিকওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, "কারও কাছে ঘড়ি আছে?" শ্যামচাঁদ তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আমার ঘড়ি আছে।" ম্যাজিকওয়ালা তাহার ঘড়িটি লইয়া খুব গম্ভীরভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। ঘড়িটির খুব প্রশংসা করিয়া বলিল, "তোফা ঘড়ি তো!" তারপর চেনশুদ্ধ ঘড়িটাকে একটা কাগজে মুড়িয়া, একটা হামানদিস্তায় দমাদম্ ঠুকিতে লাগিল। তারপর কয়েক টুকরা ভাঙা লোহা আর কাঁচ দেখাইয়া শ্যামচাঁদকে বলিল, "এইটা কি তোমার ঘড়ি?" শ্যামচাঁদের অবস্থা বুঝিতেই পার! সে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল, দু-তিন বার কি যেন বলিতে গিয়া আবার থামিয়া গেল। শেষটায় অনেক কষ্টে একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া, রুমাল দিয়া ঘাম মুছিতে মুছিতে বসিয়া পড়িল। যাহা হউক, খানিক বাদে যখন একখানা পাঁউরুটির মধ্যে ঘড়িটাকে আস্ত অবস্থায় পাওয়া গেল, তখন 'চালিয়াৎ' খুব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, যেন তামাশাটা সে আগাগোড়াই বুঝিতে পারিয়াছে।

সব শেষে ম্যাজিকওয়ালা নানাজনের কাছে নানারকম জিনিস চাহিয়া লইল—চশমা, আংটি, মনিব্যাগ, রূপার পেনসিল প্রভৃতি আট-দশটি জিনিস সকলের সামনে এক সঙ্গে পোঁটলা বাঁধিয়া, শ্যামচাঁদকে ডাকিয়া তাহার হাতে পোঁটলাটি দেওয়া হইল। শ্যামচাঁদ বুক ফুলাইয়া পোঁটলা হাতে দাঁড়াইয়া রহিল আর ম্যাজিকওয়ালা লাঠি ঘুরাইয়া, চোখ-টোখ পাকাইয়া, বিড়-বিড় করিয়া কি সব বকিতে লাগিল। তারপর হঠাৎ শ্যামচাঁদের দিকে ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "জিনিসগুলো ফেললে কোথায়?" শ্যামচাঁদ পোঁটলা দেখাইয়া বলিল, "এই যে।" ম্যাজিকওয়ালা মহা খুশি হইয়া বলিল, "সাবাস ছেলে! দাও, পোঁটলা খুলে যার

যার জিনিস ফেরত দাও।" শ্যামচাঁদ তাড়াতাড়ি পোঁটলা খুলিয়া দেখে, তাহার মধ্যে খালি কয়েক টুকরো কয়লা আর ঢিল। তখন ম্যাজিকওয়ালার তম্বি দেখে কে? সে কপালে হাত ঠুকিয়া বলিতে লাগিল, "হায়, হায়, আমি ভদ্রলোকদের কাছে মুখ দেখাই কি করে? কেনই বা ওর কাছে দিতে গেছিলাম? ওহে, ওসব তামাশা এখন রাখ, আমার জিনিসগুলো এবার ফিরিয়ে দাও দেখি।" শ্যামচাঁদ হাসিবে কি কাঁদিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না—ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল। তখন ম্যাজিকওয়ালা তাহার কানের মধ্য হইতে আংটি, চুলের মধ্যে পেনসিল, আস্তিনের মধ্যে চশমা—এইরূপে একটি একটি জিনিস উদ্ধার করিতে লাগিল। আমরা হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলাম—শ্যামচাঁদও প্রাণপণে হাসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সমস্ত জিনিসের হিসাব মিলাইয়া ম্যাজিকওয়ালা যখন বলিল, "আর কি নিয়েছ?" তখন সে বাস্তবিকই ভয়ানক রাগিয়া বলিল, "ফের মিছে কথা! কখনো আমি কিচ্ছু নিইনি।" তখন ম্যাজিকওয়ালা তাহার কোটের পিছন হইতে জ্যান্ত একটা পায়রা বাহির করিয়া বলিল, "এটা বুঝি কিছু নয়?" এবার শ্যামচাঁদ একেবারে ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তারপর পাগলের মতো হাত পা ছুঁড়িয়া সভা হইতে ছুটিয়া বাহির হইল। আমরা সবাই আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া চেঁচাইতে লাগিলাম—চালিয়াৎ! চালিয়াৎ!

সবজান্তা

আমাদের 'সবজান্তা' দুলিরামের বাবা কোন একটা খবরের কাগজের সম্পাদক। সেই জন্য আমাদের মধ্যে অনেকেরই মনে তাহার সমস্ত কথার উপরে অগাধ বিশ্বাস দেখা যাইত। যে কোনো বিষয়েই হোক, জার্মানির লড়াইয়ের কথাই হোক আর মোহনবাগানের ফুটবলের ব্যাখ্যাই হোক, দেশের বড় লোকেদের ঘরোয়া গল্পই হোক, আর নানারকম উৎকট রোগের বর্ণনাই হোক, যে কোনো বিষয়ে সে মতামত প্রকাশ করিত। একদল ছাত্র অসাধারণ শ্রদ্ধার সঙ্গে সে সকল কথা শুনিত। মাস্টার মহাশয়দের মধ্যেও কেহ কেহ এ বিষয়ে তাহার ভারি পক্ষপাতী ছিলেন। দুনিয়ার সকল খবর লইয়া সে কারবার করে, সেইজন্য পণ্ডিত মহাশয় তাহার নাম দিয়াছিলেন 'সবজান্তা'।

আমার কিন্তু বরাবরই বিশ্বাস ছিল যে, সবজান্তা যতখানি পাণ্ডিত্য দেখায় আসলে তাহার অনেকখানি উপরচালাকি। দু-চারিটি বড় বড় শোনা কথা আর খবরের কাগজ পড়িয়া দু-দশটা খবর এইমাত্র তাহার পুঁজি, তারই উপর রঙচঙ দিয়া নানারকম বাজে গল্প জুড়িয়া সে তাহার বিদ্যা জাহির করিত। একদিন আমাদের ক্লাশে পণ্ডিতমহাশয়ের কাছে সে নায়েগ্রা জলপ্রপাতের গল্প করিয়াছিল। তাহাতে সে বলে যে, নায়েগ্রা দশ মাইল উঁচু ও একশত মাইল চওড়া! একজন ছাত্র বলিল, "সে কি করে হবে? এভারেষ্ট সবচেয়ে উঁচু পাহাড়, সে-ই মোটে পাঁচ মাইল—" সবজান্তা তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "তোমরা তো আজকালকার খবর রাখ না!" যখনই তাহার কোনো কথায় আমরা সন্দেহ বা আপত্তি করিতাম, সে একটা যা তা নাম করিয়া আমাদের ধমক দিয়া বলিত, "তোমরা কি অমুকের চাইতে বেশি জানো?" আমরা বাহিরে সব সহ্য করিয়া থাকিতাম, কিন্তু এক এক সময় রাগে গা জ্বলিয়া যাইত।

সবজান্তা যে আমাদের মনের ভাবটা বুঝিত না তাহা নয়। সে তাহা বিলক্ষণ বুঝিত এবং সর্বদাই এমন ভাব প্রকাশ করিত যে, আমরা তাহার কথাগুলি মানি বা না মানি, তাহাতে তাহার কিছুমাত্র আসে যায় না। নানারকম খবর ও গল্প জাহির করিবার সময় মাঝে মাঝে আমাদের শুনাইয়া বলিত, "অবিশ্যি কেউ কেউ আছেন, যাঁরা এসব কথা মানবেন না।" অথবা "যাঁরা না পড়েই খুব বুদ্ধিমান তাঁরা নিশ্চয়ই এ-সব উড়িয়ে দিতে চাইবেন"—ইত্যাদি। ছোকরা বাস্তবিক অনেক রকম খবর রাখিত, তার উপর তার বোলচালগুলিও ছিল বেশ ঝাঁঝালো রকমের; কাজেই আমরা বেশি তর্ক করিতে সাহস পাইতাম না।

তাহার পরে একদিন, কি কুক্ষণে, তাহার এক মামা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া আমাদেরই স্কুলের কাছে বাসা লইয়া বসিলেন। তখন আর সবজান্তাকে পায় কে! তাহার কথাবার্তার দৌড় এমন আশ্চর্য রকম বাড়িয়া চলিল যে, মনে হইত বুঝি বা তাহার পরামর্শ ছাড়া ম্যাজিস্ট্রেট হইতে পুলিসের পেয়াদা পর্যন্ত কাহারও কাজ চলিতে পারে না। স্কুলের ছাত্র মহলে তাহার খাতির ও প্রতিপত্তি এমন আশ্চর্য রকম জমিয়া গেল যে, আমরা কয়েক

বেচারা, যাহারা বরাবর তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া আসিয়াছি—একেবারে কোণঠাসা হইয়া রহিলাম। এমন কি আমাদের মধ্য হইতে দু-একজন তাহার দলে যোগ দিতেও আরম্ভ করিল।

অবস্থাটা শেষটায় এমন দাঁড়াইল যে, ইস্কুলে আমাদের টেকা দায়! দশটার সময় মুখ কাঁচুমাচু করিয়া ক্লাশে ঢুকিতাম আর ছুটি হইলেই, সকলের ঠাট্টা-বিদ্রূপ হাসি-তামাশার হাত এড়াইবার জন্য দৌড়িয়া বাড়ি আসিতাম। টিফিনের সময়টুকু হেডমাস্টার মহাশয়ের ঘরের সামনে একখানা বেঞ্চের উপর অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো বসিয়া থাকিতাম।

এইরকম ভাবে কতদিন চলিত জানি না, কিন্তু একদিনের একটি ঘটনায় হঠাৎ সবজান্তা মহাশয়ের জারিজুরি সব এমনই ফাঁস হইয়া গেল যে, তাহার অনেকদিনকার খ্যাতি ঐ একদিনেই লোপ পাইল—আর আমরাও সেইদিন হইতে একটু মাথা তুলিতে পারিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। সেই ঘটনারই গল্প বলিতেছি।

একদিন সবজান্তা আসিয়া খবর দিল, লোহারপুরের জমিদার রামলালবাবু আমাদের স্কুলে তিন হাজার টাকা দিয়াছেন—একটি 'ফুটবল গ্রাউন্ড' ও খেলার সরঞ্জামের জন্য। আরও শুনিলাম রামলালবাবুর ইচ্ছা সেই উপলক্ষে আমাদের একদিন ছুটি ও একদিন রীতিমতো ভোজের আয়োজন হয়! প্রথমে কথাটা আমি বিশ্বাস করি নাই, কিন্তু দু'দিন পরে হেডমাস্টার হরিবাবু যখন নিজে আসিয়া সে কথা ক্লাসে ক্লাসে জানাইলেন, তখন দুলিরামের খাতির দেখে কে! সে বলিল, যেবার সে দার্জিলিং গিয়াছিল, সেবার নাকি রামলালবাবুর সঙ্গে তাহার দেখা-সাক্ষাৎ এমন কি আলাপ-পরিচয় পর্যন্ত হইয়াছিল। রামলালবাবু তাহাকে কেমন খাতির করিতেন, তাহার কবিতা আবৃত্তি শুনিয়া কি কি প্রশংসা করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সে স্কুলের আগে এবং পরে, সারাটি টিফিনের সময় এবং সুযোগ পাইলে ক্লাশের পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকেও নানা অসম্ভব রকম গল্প চালাইতে লাগিল। 'অসম্ভব' বলিলাম বটে, কিন্তু তাহার চেলার দল সেসকল কথা নির্বিচারে বিশ্বাস করিতে একটুও বাধা বোধ করিত না।

একদিন টিফিনের সময়ে স্কুলের সামনে ওই বড় সিঁড়িটার উপর একদল ছেলের সঙ্গে বসিয়া সবজান্তা গল্প আরম্ভ করিল—"আমি একদিন দার্জিলিঙে লাটসাহেবের বাড়ির কাছেই ঐ রাস্তাটায় বেড়াচ্ছি, এমন সময় দেখি রামলালবাবু হাসতে হাসতে আমার দিকে আসছেন, তাঁর সঙ্গে আবার এক সাহেব। রামলালবাবু বললেন, 'দুলিরাম! তোমার সেই ইংরাজি কবিতাটা একবার এঁকে শোনাতে হচ্ছে। আমি এঁর কাছে তোমার সুখ্যাতি করছিলাম, তাই ইনি সেটা শুনবার জন্য আগ্রহ করছেন!' উনি নিজে থেকে বলছেন, তখন আমি আর কি করি? আমি সেই 'ক্যাসাবিয়াংকা' থেকে আবৃত্তি করলুম—তারপর দেখতে দেখতে যা ভিড় জমে গেল! সাহেব মেম সবাই শুনতে চায়, সবাই বলে 'আবার কর।' মহা মুশকিলে পড়ে গেলাম, নেহাত রামলালবাবু বললেন তাই আবার করতে হল। এমন সময় কে যেন পিছন হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "রামলালবাবু কে?" সকলে ফিরিয়া দেখি, একটি রোগা নিরীহ গোছের পাড়াগেঁয়ে ভদ্রলোক সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া আছেন। সবজান্তা বলিল,

"রামলালবাবু কে, তাও জানেন না? লোহারপুরের জমিদার রামলাল রায়।" ভদ্রলোকটি অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ তার নাম শুনেছি, সে তোমার কেউ হয় নাকি?" "না, কেউ হয় না, এমনি খুব ভাব আছে আমার সঙ্গে। প্রায়ই চিঠিপত্র চলে।" ভদ্রলোকটি আবার বলিলেন, "রামলালবাবু লোকটি কেমন?" সবজান্তা উৎসাহের সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "চমৎকার লোক। যেমন চেহারা তেমনি কথাবার্তা, তেমনি কায়দা-দুরস্ত। এই আপনার চেয়ে প্রায় আধ হাত খানেক লম্বা হবেন, আর সেইরকম তাঁর তেজ! আমাকে তিনি কুস্তি শেখাবেন বলেছিলেন, আর কিছুদিন থাকলেই ওটা বেশ রীতিমতো শিখে আসতাম।" ভদ্রলোকটি বলিলেন, "বল কি হে? তোমার বয়স কত?" "আজ্ঞে, এইবার তেরো পূর্ণ হবে।" "বটে! বয়সের পক্ষে খুব চালাক তো! বেশ তো কথাবার্তা বলতে পার! কি নাম হে তোমার?" সবজান্তা বলিল, "দুলিরাম ঘোষ। রণদাবাবু ডেপুটি আমার মামা হন।" শুনিয়া ভদ্রলোকটি ভারি খুশি হইয়া হেডমাস্টার মহাশয়ের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

ছুটির পর আমরা সকলেই বাহির হইলাম। স্কুলের সম্মুখেই ডেপুটিবাবুর বাড়ি, তার বাহিরের বারান্দায় দেখি, সেই ভদ্রলোকটি বসিয়া দুলিরামের ডেপুটিমামার সঙ্গে গল্প করিতেছেন। দুলিরামকে দেখিয়াই মামা ডাক দিয়া বলিলেন—"দুলি, এদিকে আয়, এঁকে প্রণাম কর।—এটি আমার ভাগনে দুলিরাম।" ভদ্রলোকটি হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, এর পরিচয় আমি আগেই পেয়েছি।" দুলিরাম আমাদের দেখাইয়া খুব আড়ম্বর করিয়া ভদ্রলোকটিকে প্রণাম করিল। ভদ্রলোকটি বলিলেন, "কেমন? আমায় তো তুমি জানোই?" দুলি বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ স্কুলে দেখেছিলাম।" ভদ্রলোকটি আবার বলিলেন, "আমার পরিচয় জানো না বুঝি?" সবজান্তা এবার আর 'জানি' বলিতে পারিল না, আম্‌তা আম্‌তা করিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। ভদ্রলোকটি তখন বেশ একটু মুচকি মুচকি হাসিয়া আমাদের শুনাইয়া বলিলেন, "আমার নাম রামলাল রায়, লোহারপুরের রামলাল রায়।"

দুলিরাম খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর মুখখানা লাল করিয়া হঠাৎ এক দৌড়ে বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া গেল। ব্যাপার দেখিয়া ছেলেরা রাস্তার উপর হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। তার পরের দিন আমরা স্কুলে আসিয়া দেখিলাম—সবজান্তা আসে নাই, তাহার নাকি মাথা ধরিয়াছে। নানা অজুহাতে সে দু-তিনদিন কামাই করিল, তারপর যেদিন স্কুলে আসিল, তখন তাহাকে দেখিবামাত্র তাহারই কয়েকজন চেলা "কিহে, রামলালবাবুর চিঠিপত্র পেলে?" বলিয়া তাহাকে একেবারে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তারপর যতদিন সে স্কুলে ছিল, ততদিন তাহাকে খেপাইতে হইলে বেশি কিছু করা দরকার হইত না, একটিবার রামলালবাবুর খবর জিজ্ঞাসা করিলেই বেশ তামাশা দেখা যাইত।

ভোলানাথের সর্দারি

সকল বিষয়েই সর্দারি করিতে যাওয়া ভোলানাথের ভারি একটা বদ অভ্যাস। যেখানে তাহার কিছু বলিবার দরকার নাই, সেখানে সে বিজ্ঞের মতো উপদেশ দিতে যায়, যে কাজের সে কিছুমাত্র বোঝে না সে কাজেও সে চট্‌পট্‌ হাত লাগাইতে ছাড়ে না। সেদিন তাহার তিন ক্লাশ উপরের বড় বড় ছেলেরা যখন নিজেদের পড়াশুনা লইয়া আলোচনা করিতেছিল, তখন ভোলানাথ মুরুব্বির মতো গম্ভীর হইয়া বলিল, "ওয়েবস্টারের ডিক্‌সনারি সব চাইতে ভালো। আমার বড়দা যে দু'ভলুম ওয়েস্টারের ডিক্‌সনারি কিনেছেন, তার এক-একখানা বই এত্তোখানি বড় আর এম্নি মোটা আর লাল চামড়া দিয়ে বাঁধানো।" উঁচু ক্লাশের একজন ছাত্র আচ্ছা করিয়া তাহার কান মলিয়া বলিল, "কি রকম লাল হে? তোমার এই কানের মতো?" তবু ভোলানাথ এমন বেহায়া, সে তার পরদিনই সেই তাহাদেরই কাছে ফুটবল সম্বন্ধে কি যেন মতামত দিতে গিয়া এক চড় খাইয়া আসিল।

বিশুদের একটা ইঁদুর ধরিবার কল ছিল। ভোলানাথ হঠাৎ একদিন "এটা কিসের কল ভাই?" বলিয়া সেটাকে নাড়িয়া চাড়িয়া কলকব্জা এমন বিগড়াইয়া দিল যে, কলটা একেবারেই নষ্ট হইয়া গেল। বিশু বলিল, "না জেনে শুনে কেন টানাটানি করতে গেলি?" ভোলানাথ কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া বলিল, "আমার দোষ হল বুঝি? দেখ্‌ তো হাতলটা কিরকম বিচ্ছিরি বানিয়েছে। ওটা আরও অনেক মজবুত করা উচিত ছিল। কলওয়ালা ভয়ানক ঠকিয়েছে।"

ভোলানাথ পড়াশুনায় যে খুব ভালো ছিল তাহা নয়, কিন্তু মাস্টার মহাশয় যখন কঠিন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, তখন সে জানুক আর না জানুক সাত তাড়াতাড়ি সকলের আগে জবাব দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিত। জবাবটা অনেক সময়েই বোকার মতো হইত, শুনিয়া মাস্টার মহাশয় ঠাট্টা করিতেন, ছেলেরা হাসিত; কিন্তু ভোলানাথের উৎসাহ তাহাতে কমিত না।

সেই যেবার ইস্কুলে বই চুরির হাঙ্গামা হয়, সেবারও সে এইরকম সর্দারি করিতে গিয়া খুব জব্দ হয়। হেডমাস্টার মহাশয় ক্রমাগত বই চুরির নালিশে বিরক্ত হইয়া, একদিন প্রত্যেক ক্লাশে গিয়া জিগ্‌গেস করিলেন, "কে চুরি করছে তোমরা কেউ কিছু জানো?" ভোলানাথের ক্লাশে এই প্রশ্ন করিবামাত্র ভোলানাথ তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "আজ্ঞে, আমার বোধ হয় হরিদাস চুরি করে।" জবাব শুনিয়া আমরা সবাই অবাক হইয়া গেলাম। হেডমাস্টার মহাশয় বলিলেন, "কি করে জানলে যে হরিদাস চুরি করে?" ভোলানাথ অম্লানবদনে বলিল, "তা জানিনে, কিন্তু আমার মনে হয়।" মাস্টার মহাশয় ধমক দিয়া বলিলেন, "জানো না, তবে অমন কথা বললে কেন? ও রকম মনে করবার তোমার কারণ আছে?" ভোলানাথ আবার বলিল, "আমার মনে হচ্ছিল, বোধহয় ও নেয়—তাই তো বললাম। আর তো কিছু আমি বলিনি।" মাস্টার মহাশয় গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "যাও, হরিদাসের কাছে ক্ষমা চাও।" তখনই তাহার কান ধরিয়া হরিদাসের কাছে ক্ষমা চাওয়ানো হইল। কিন্তু তবু কি তাহার চেতনা হয়?

ভোলানাথ সাঁতার জানে না, কিন্তু তবু সে বাহাদুরি করিয়া হরিশের ভাইকে সাঁতার শিখাইতে গেল। রামবাবু হঠাৎ ঘাটে আসিয়া পড়েন, তাই রক্ষা। তা না হইলে দুজনকেই সেদিন ঘোষপুকুরে ডুবিয়া মরিতে হইত। কলিকাতায় মামার নিষেধ না শুনিয়া চল্‌তি ট্রাম হইতে নামিতে গিয়া ভোলানাথ কাদার উপর যে আছাড় খাইয়াছিল, তিন মাস পর্যন্ত তাহার আঁচড়ের দাগ তাহার নাকের উপর ছিল। আর বেদেরা শেয়াল ধরিবার জন্য যেবার ফাঁদ পাতিয়া রাখে, সেবার সেই ফাঁদ ঘাঁটিতে গিয়া ভোলানাথ কি রকম আটকা পড়িয়াছিল, সেকথা ভাবলে আজও আমাদের হাসি পায়। কিন্তু সব চাইতে যেবার সে জব্দ হইয়াছিল সেবারের কথা বলি শোনো।

আমাদের ইস্কুলে আসিতে হইলে কলেজবাড়ির পাশ দিয়া আসিতে হয়। সেখানে একটা ঘর আছে, তাহাকে বলে ল্যাবরেটরি। সেই ঘরের নানারকম অদ্ভুত কলকারখানা থাকিত। ভোলানাথের সবটাতেই বাড়াবাড়ি, সে একদিন একেবারে কলেজের ভিতর গিয়া দেখিল, একটা কলের চাকা ঘুরানো হইতেছে, আর কলের একদিকে চড়াক্ চড়াক্ করিয়া বিদ্যুতের মতো ঝিলিক্ জ্বলিতেছে। দেখিয়া ভোলানাথের ভারি শখ হইল সেও একবার কল ঘুরাইয়া দেখে! কিন্তু কলের কাছে যাওয়া মাত্র, কে একজন তাহাকে এমন ধমক দিয়া উঠিল যে, ভয়ে এক দৌড়ে সে ইস্কুলে আসিয়া হাঁপাইতে লাগিল। কিন্তু কলটা একবার নাড়িয়া দেখিবার ইচ্ছা তাহার কিছুতেই গেল না। একদিন বিকালে যখন সকলে বাড়ি যাইতেছি তখন ভোলানাথ যে কোন সময়ে কলেজবাড়িতে ঢুকিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। সে চুপিচুপি কলেজবাড়ির ল্যাবরেটরি বা যন্ত্রখানায় ঢুকিয়া, অনেকক্ষণ এদিক ওদিক চাহিয়া দেখে, ঘরে কেউ নাই। তখনই ভরসা করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া সে কলকব্জা দেখিতে লাগিল। সেই দিনের সেই কলটা আলমারির আড়ালে উঁচু তাকের উপর তোলা রহিয়াছে, সেখানে তাহার হাত যায় না। অনেক কষ্টে সে টেবিলের পিছন হইতে একখানা বড় চৌকি লইয়া আসিল। এদিকে কখন যে কলেজের কর্মচারী চাবি দিয়া ঘরের তালা আঁটিয়া চলিয়া গেল, সেও ভোলানাথকে দেখে নাই, ভোলানাথেরও সেদিকে চোখ নাই। চৌকির উপর দাঁড়াইয়া ভোলানাথ দেখিল কলটার কাছে একটা অদ্ভুত বোতল। সেটা যে বিদ্যুতের বোতল, ভোলানাথ তাহা জানে না। সে বোতলটাকে ধরিয়া সরাইয়া রাখিতে গেল। অমনি বোতলের বিদ্যুৎ হঠাৎ তাহার শরীরের ভিতর দিয়া ছুটিয়া গেল, মনে হইল যেন তাহার হাড়ের ভিতর পর্যন্ত কিসের একটা ধাক্কা লাগিল, সে মাথা ঘুরিয়া চৌকি হইতে পড়িয়া গেল।

বিদ্যুতের ধাক্কা খাইয়া ভোলানাথ খানিকক্ষণ হতভম্ব হইয়া রহিল। তারপর ব্যস্ত হইয়া পলাইতে গিয়া দেখে দরজা বন্ধ! অনেকক্ষণ দরজায় ধাক্কা দিয়া, কিল ঘুঁষি লাথি মারিয়াও দরজা খুলিল না। জানালাগুলি অনেক উঁচুতে আর বাহির হইতে বন্ধ করা—চৌকিতে উঠিয়াও নাগাল পাওয়া গেল না। তাহার কপালে দরদর করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। সে ভাবিল প্রাণপণে চিৎকার করা যাক, যদি কেউ শুনিতে পায়। কিন্তু তাহার গলার স্বর এমন বিকৃত শোনাইল, আর মস্ত ঘরটাতে এমন অদ্ভুত প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল যে, নিজের আওয়াজে নিজেই সে ভয় পাইয়া গেল। ওদিকে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।

কলেজের বটগাছটির উপর হইতে একটা পেঁচা হঠাৎ 'ভূত-ভূতুম-ভূত' বলিয়া বিকট শব্দে ডাকিয়া উঠিল। সেই শব্দে একেবারে দাঁতে দাঁত লাগিয়া ভোলানাথ এক চিৎকারেই অজ্ঞান!

কলেজের দারোয়ান তখন আমাদের ইস্কুলের পাঁড়েজি আর দু-চারটি দেশ-ভাইয়ের সঙ্গে জুটিয়া মহা উৎসাহে 'হাঁ হাঁ রে কাঁহা গয়ো রাম' বলিয়া ঢোল কর্তাল পিটাইতেছিল, তাহারা কোনোরূপ চিৎকার শুনিতে পায় নাই। রাতদুপুর পর্যন্ত তাহাদের কীর্তনের হল্লা চলিল; সুতরাং জ্ঞান হইবার পর ভোলানাথ যখন দরজায় দুম্‌দুম্ লাথি মারিয়া চেঁচাইতেছিল, তখন সে শব্দ গানের ফাঁকে ফাঁকে তাহাদের কানে একটু-আধটু আসিলেও তাহারা গ্রাহ্য করে নাই। পাঁড়েজি একবার খালি বলিয়াছিল, কিসের শব্দ একবার খোঁজ লওয়া যাক, তখন অন্যেরা বাধা দিয়া বলিয়াছিল, "আরে চিল্লানে দেও।" এমনি করিয়া রাত বারোটার সময় যখন তাহাদের উৎসাহ ঝিমাইয়া আসিল, তখন ভোলানাথের বাড়ির লোকেরা লণ্ঠন হাতে হাজির হইল। তাহারা বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া কোথাও তাহাকে আর খুঁজিতে বাকি রাখে নাই। দারোয়ানদের জিজ্ঞাসা করায় তাহারা একবাক্যে বলিল, 'ইস্কুল বাবুদের' কাহাকেও তাহারা দেখে নাই। এমন সময় সেই দুম্‌দুম্ শব্দ আর চিৎকার আবার শোনা গেল।

তারপর ভোলানাথের সন্ধান পাইতে আর বেশি দেরি হইল না। কিন্তু তখনও উদ্ধার নাই—দরজা বন্ধ, চাবি গোপালবাবুর কাছে, গোপালবাবু বাসায় নাই, ভাইজির বিবাহে গিয়াছেন, সোমবার আসিবেন। তখন অগত্যা মই আনাইয়া, জানালা খুলিয়া, সার্সির কাঁচ ভাঙিয়া, অনেক হাঙ্গামার পর ভয়ে মৃতপ্রায় ভোলানাথকে বাহির করা হইল। সে ওখানে কি কবিতেছিল, কেন আসিয়াছিল, কেমন করিয়া আটকা পড়িল ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাহার বাবা প্রকাণ্ড এক চড় তুলিতেছিলেন, কিন্তু ভোলানাথের ফ্যাকাশে মুখখানা দেখিবার পর সে চড় আর তাহার গালে নামে নাই।

নানাজনে জেরা করিয়া তাহার কাছে যে সমস্ত কথা আদায় করিয়াছেন, তাহা শুনিয়াই আমরা তাহার আটকা পড়িবার বর্ণনাটা দিলাম। কিন্তু আমাদের কাছে এত কথা কবুল করে নাই। আমাদের সে আরও উল্টা বুঝাইতে চাহিয়াছিল যে, সে ইচ্ছা করিয়াই বাহাদুরির জন্যে কলেজবাড়িতে রাত কাটাইবার চেষ্টায় ছিল। যখন সে দেখিল যে, তাহার সে কথা কেহ বিশ্বাস করে না, বরং আসল কথাটা ক্রমেই ফাঁস হইয়া পড়িতেছে, তখন সে এমন মুষড়াইয়া গেল যে, অন্তত মাস তিনেকের জন্য তাহার সর্দারির অভ্যাসটা বেশ একটু দমিয়া পড়িয়াছিল।

আশ্চর্য কবিতা

আমাদের ক্লাসে একটি নূতন ছাত্র আসিয়াছে। সে আসিয়া প্রথম দিনই সকলকে জানাইল, "আমি পোইট্‌রি লিখতে পারি!" একথা শুনিয়া ক্লাসের অনেকেই অবাক হইয়া গেল; কেবল দুই-একজন হিংসা করিয়া বলিল, "আমরাও ছেলেবেলায় ঢের ঢের কবিতা লিখেছি।" নূতন ছাত্রটি বোধহয় ভাবিয়াছিল, সে কবিতা লিখিতে পারে শুনিয়া ক্লাসে খুব হুলুস্থূল পড়িয়া যাইবে এবং কবিতার নমুনা শুনিবার জন্য সকলে হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিবে। যখন সেরূপ কিছুরই লক্ষণ দেখা গেল না তখন বেচারা, যেন আপন মনে কি কথা বলিতেছে, এরূপভাবে, যাত্রার মতো সুর করিয়া একটা কবিতা আওড়াইতে লাগিল—

ওহে বিহঙ্গম তুমি কিসের আশায়
বসিয়াছ উচ্চ ডালে সুন্দর বাসায়?
নীল নভোমণ্ডলেতে উড়িয়া উড়িয়া
কত সুখ পাও, আহা ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
যদ্যপি থাকিত মম পুচ্ছ এবং ডানা
উড়ে যেতাম তব সনে নাহি শুনে মানা—

কবিতা শেষ হইতে না হইতে, ভবেশ তাহার মতো সুর করিয়া মুখভঙ্গী করিয়া বলিল—

আহা, যদি থাক্‌ত তোমার
ল্যাজের উপর ডানা
উড়ে গেলেই আপদ যেত—
করত না কেউ মানা!

নূতন ছাত্র তাহাতে রাগিয়া বলিল, "দেখ বাপু, নিজেরা যা পার না, তা ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেওয়া ভারি সহজ। শৃগাল ও দ্রাক্ষাফলের গল্প শোনোনি বুঝি?" একজন ছেলে অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো মুখ করিয়া বলিল, "শৃগাল এবং দ্রাক্ষাফল! সে আবার কি গল্প?" অমনি নূতন ছাত্রটি আবার সুর ধরিল—

বৃক্ষ হতে দ্রাক্ষাফল ভক্ষণ করিতে
লোভী শৃগাল প্রবেশিল এক দ্রাক্ষা ক্ষেতে
কিন্তু হায় দ্রাক্ষা যে অত্যন্ত উচ্চে থাকে
শৃগাল নাগাল পাবে কিরূপে তাহাকে,
বারম্বার চেষ্টায় হয়ে অকৃতকার্য
'দ্রাক্ষা টক' বলিয়া পালাল ছেড়ে রাজ্য।

সেই হইতে আমাদের হরেরাম একেবারে তাহার চেলা হইয়া গেল। হরেরামের কাছে আমরা শুনিলাম যে ছোকরার নাম শ্যামলাল। সে নাকি এত কবিতা লিখিয়াছে যে, একখানা

আস্ত খাতা প্রায় ভরতি হইয়াছে আর আট-দশটি কবিতা হইলেই তাহার একশোটা পুরো হয়; তখন সে নাকি বই ছাপাইবে।

ইহার মধ্যে একদিন এক কাণ্ড হইল। গোপাল বলিয়া একটি ছেলে স্কুল ছাড়িয়া যাইবে এই উপলক্ষে শ্যামলাল এক প্রকাণ্ড কবিতা লিখিয়া ফেলিল। তাহার মধ্যে 'বিদায় বিদায়' বলিয়া অনেক 'অশ্রুজল' 'দুঃখশোক' ইত্যাদি কথা ছিল। গোপাল কবিতার আধখানা শুনিয়াই একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, "ফের যদি আমার নামে পোইট্রি লিখবি তো মারব এক থাপ্পড়।" হরেরাম বলিল, "আহা, বুঝলে না? তুমি স্কুল ছেড়ে যাচ্ছ কিনা, তাই ও লিখেছে।" গোপাল বলিল, "ছেড়ে যাচ্ছি তো যাচ্ছি, তোর তাতে কি রে? ফের জ্যাঠামি করবি তো তোর কবিতার খাতা ছিঁড়ে দেব।"

দেখিতে দেখিতে শ্যামলালের কথা স্কুলময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তাহার দেখাদেখি আরও অনেকেই কবিতা লিখিতে শুরু করিল। ক্রমে কবিতা লেখার বাতিকটা ভয়ানক রকম ছোঁয়াচে হইয়া নিচের ক্লাশের প্রায় অর্ধেক ছেলেকে পাইয়া বসিল। ছোট ছোট ছেলেদের পকেটে ছোট ছোট কবিতার খাতা দেখা দিল। বড়দের মধ্যে কেহ কেহ শ্যামলালের চেয়েও ভালো কবিতা লিখিতে পারে বলিয়া শোনা যাইতে লাগিল। স্কুলের দেয়ালে, পড়ার কেতাবে, পরীক্ষার খাতায়, চারিদিকে কবিতা গজাইয়া উঠিল।

পাঁড়েজির বৃদ্ধ ছাগল যেদিন শিং নাড়িয়া দড়ি ছিঁড়িয়া স্কুলের উঠানে দাপাদাপি করিয়াছিল, আর শ্যামলালকে তাড়া করিয়া খানায় ফেলিয়াছিল, তাহার পরদিন ভারতবর্ষের বড় ম্যাপের উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা বাহির হইল—

পাঁড়েজির ছাগলের একহাত দাড়ি,
অপরূপ রূপ তার যাই বলিহারি!
উঠানে নৃপটি করি নেচেছিল কাল
তারপর কি হইল জানে শ্যামলাল।

শ্যামলালের রঙটি কালো কিন্তু কবিতা পড়িয়া সে যথার্থই চটিয়া লাল হইল, এবং তখনি তাহার নিচে একটা কড়া জবাব লিখিতে লাগিল। সে সবেমাত্র লিখিয়াছে—'রে অধম কাপুরুষ পাষণ্ড বর্বর—' এমন সময় গুরুগম্ভীর গলা শোনা গেল—"ম্যাপের উপর কি লেখা হচ্ছে?" ফিরিয়া দেখে হেডমাস্টার মহাশয়! শ্যামলাল একেবারে থতমত খাইয়া বলিল, "আজ্ঞে স্যার, আগে ওরা লিখেছিল।" "ওরা কারা?" শ্যামলাল বোকার মতো একবার আমাদের দিকে, একবার কড়িকাঠের দিকে তাকাইতে লাগিল, কাহার নাম করিবে বুঝিতে পারিল না। মাস্টার মহাশয় আবার বলিলেন, "ওরা যদি পরের বাড়ি সিঁদ কাটতে যায়, তুমিও কাটবে?" যাহা হউক সেদিন অল্পের উপর দিয়াই গেল, শ্যামলাল একটু ধমক-ধামক খাইয়াই খালাস পাইল।

ইহার মধ্যে একদিন আমাদের পণ্ডিতমহাশয় গল্প করিলেন যে, তাঁহার সঙ্গে যাহারা এক ক্লাসে পড়িত, তাহাদের মধ্যে একজন নাকি অতি সুন্দর কবিতা লিখিত। একবার ইন্স্পেকটার স্কুল দেখিতে আসিয়া, তাহার কবিতা শুনিয়া এমন খুশি হইয়াছিলেন যে,

তাহাকে একটা সুন্দর ছবিওয়ালা বই উপহার দিয়াছিলেন।

ইহার মাসখানেক পরেই ইন্‌স্পেকটার স্কুল দেখিতে আসিলেন। প্রায় বিশ-পঁচিশটি ছেলে সাবধানে পকেটের মধ্যে লুকাইয়া কবিতার কাগজ আনিয়াছে। বড় হলের মধ্যে সমস্ত স্কুলের ছেলেদের দাঁড় করানো হইয়াছে, হেডমাস্টার মহাশয় ইন্‌স্পেকটারকে লইয়া ঘরে ঢুকিতেছেন—এমন সময় শ্যামলাল আস্তে আস্তে পকেট হইতে একটি কাগজ বাহির করিল। আর যায় কোথা! পাছে শ্যামলাল আগেই তাহার কবিতা পড়িয়া ফেলে, এই ভয়ে ছোট বড় একদল কবিতাওয়ালা একসঙ্গে নানাসুরে চিৎকার করিয়া যে যার কবিতা হাঁকিয়া উঠিল। মনে হইল, সমস্ত বাড়িটা কর্তালের মতো ঝন্‌ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল, ইন্‌স্পেকটার মহাশয় মাথা ঘুরিয়া মাঝ পথেই মেঝের উপর বসিয়া পড়িলেন। ছাদের উপরে একটা বিড়াল ঘুমাইতেছিল, সেটা হঠাৎ হাত পা ছুঁড়িয়া তিনতলা হইতে পড়িয়া গেল, ইস্কুলের দারোয়ান হইতে আফিসের কেশিয়ার বাবু পর্যন্ত হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল। সকলে সুস্থ হইলে পর মাস্টার মহাশয় বলিলেন, "এত চেঁচালে কেন?" সকলে চুপ করিয়া রহিল। আবার জিজ্ঞাসা করা হইল, "কে কে চেঁচিয়েছিল?" পাঁচ-সাতটি ছেলে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—"শ্যামলাল।" শ্যামলাল যে একা অত মারাত্মক রকম চেঁচাইতে পারে, এ কথা কেহই বিশ্বাস করিল না। যতগুলি ছেলের পকেটে কবিতার খাতা পাওয়া গেল, স্কুলের পর তাহাদের দেড়ঘণ্টা আটকাইয়া রাখা হইল।

অনেক তম্বিতম্বার পর একে একে সমস্ত কথা বাহির হইয়া পড়িল। তখন হেড-মাস্টার মহাশয় বলিলেন, "কবিতা লেখার রোগ হয়েছে? ও রোগের ওষুধ কি?" বৃদ্ধ পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, "বিষস্য বিষমৌষধম্, বিষের ওষুধ বিষ। বসন্তের ওষুধ যেমন বসন্তের টিকা, কবিতার ওষুধ তস্য টিকা। তোমরা যে যে কবিতা লিখেছ তার টিকা করে দিচ্ছি। তোমরা এক মাস প্রতিদিন পঞ্চাশ বার করে এটা লিখে এনে স্কুলে আমায় দেখাবে।" এই বলিয়া তিনি টিকা দিলেন—

পদে পদে মিল খুঁজে, গুণে দেখি চোদ্দ
এই দেখ লিখে দিনু কি ভীষণ পদ্য!
এক চোটে এইবারে উড়ে গেল সবি তা,
কবিতার গুঁতো মেরে গিলে ফেলি কবিতা।

একমাস তিনি কবিদের কাছে এই লেখা প্রতিদিন পঞ্চাশবার আদায় না করিয়া ছাড়িলেন না। এ কবিতার কি আশ্চর্য গুণ—তারপর হইতে কবিতা লেখার ফ্যাশান স্কুল হইতে একেবারেই উঠিয়া গেল।

নন্দলালের মন্দ কপাল

নন্দলালের ভারি রাগ, অঙ্কের পরীক্ষায় মাস্টার তাহাকে গোল্লা দিয়াছেন। সে যে খুব ভালো লিখিয়াছিল তাহা নয়, কিন্তু তা বলিয়া একেবারে গোল্লা দেওয়া কি উচিত ছিল? হাজার হোক সে একখানা পুরা খাতা লিখিয়াছিল তো! তার পরিশ্রমের কি কোনো মূল্য নাই? ঐ যে ত্রৈরাশিকের অঙ্কটা, সেটা তো তার প্রায় ঠিকই হইয়াছিল, কেবল একটুখানি হিসেবের ভুল হওয়াতে উত্তরটা ঠিক মেলে নাই। আর ঐ যে একটা ডেসিমাল্-এর অঙ্ক ছিল, সেটাতে গুণ করিতে গিয়া সে ভাগ করিয়া বসিয়াছিল, তাই বলিয়া কি একটা নম্বরও দিতে নাই? আরও অন্যায় এই যে, এই কথাটা মাস্টার মহাশয় ক্লাসের ছেলেদের কাছে ফাঁস করিয়া ফেলিয়াছেন। কেন? আর একবার হরিদাস যখন গোল্লা পাইয়াছিল, তখন তো সে কথাটা রাষ্ট্র হয় নাই!

সে যে ইতিহাসে একশোর মধ্যে পঁচাশি পাইয়াছে, সেটা বুঝি কিছু নয়? খালি অঙ্ক ভালো পারে নাই বলিয়াই তাহাকে লজ্জিত হইতে হইবে? সব বিষয়ে যে সকলকে ভালো পারিতে হইবে, তাহারই বা অর্থ কি? স্বয়ং নেপোলিয়ান যে ছেলেবেলায় ব্যাকরণে একেবারে আনাড়ী ছিলেন, সে বেলা কি? তাহার এই যুক্তিতে ছেলেরা দমিল না, এবং মাস্টারদের কাছে এই তর্কটা তোলাতে তাঁহারাও যে যুক্তিটাকে খুব চমৎকার ভাবিলেন, এমন তো বোধ হইল না। তখন নন্দলাল বলিল, তাহার কপালই মন্দ--সে নাকি বরাবর তাহা দেখিয়া আসিতেছে।

সেই তো যেবার ছুটির আগে তাহাদের পাড়ায় হাম দেখা দিয়াছিল, তখন বাড়িসুদ্ধ সকলেই হামে ভুগিয়া দিব্যি মজা করিয়া স্কুল কামাই করিল, কেবল বেচারা নন্দলালকেই নিয়মমতো প্রতিদিন স্কুলে হাজিরা দিতে হইয়াছিল। তারপর যেমন ছুটি আরম্ভ হইল, অমনি তাহাকে জ্বরে আর হামে ধরিল—ছুটির অর্ধেকটাই মাটি! সেই যেবার সে মামার বাড়ি গিয়াছিল, সেবার তাহার মামাতো ভাইয়েরা কেহ বাড়ি ছিল না—ছিলেন কোথাকার এক বদমেজাজি মেশো, তিনি উঠিতে বসিতে কেবল ধমক আর শাসন ছাড়া আর কিছু জানিতেন না। তাহার উপর সেবার এমন বৃষ্টি হইয়াছিল, একদিনও ভালো করিয়া খেলা জমিল না, কোথাও বেড়ানো গেল না। সেই জন্য পরের বছর যখন আর সকলে মামার বাড়ি গেল তখন সে কিছুতেই যাইতে চাহিল না। পরে শুনিল সেবার নাকি সেখানে চমৎকার মেলা বসিয়াছিল, কোন রাজার দলের সঙ্গে পঁচিশটি হাতি আসিয়াছিল, আর বাজি যা পোড়ানো হইয়াছিল সে একেবারে আশ্চর্য রকম! নন্দলালের ছোট ভাই যখন বার বার উৎসাহ করিয়া তাহার কাছে এই সকলের বর্ণনা করিতে লাগিল তখন নন্দ তাহাকে এক চড় মারিয়া বলিল, "যা যা! মেলা বক্‌বক্ করিসনে!" তাহার কেবল মনে হইতে লাগিল, সেবার সে মামার বাড়ি গিয়াও ঠকিল, এবার না গিয়াও ঠকিল! তাহার মতো কপাল-মন্দ আর কেহ নাই।

স্কুলেও ঠিক তাই। সে অঙ্ক পারে না—অথচ অঙ্কের জন্য দুই-দুইটা প্রাইজ আছে—

এদিকে ভূগোল ইতিহাস তাহার কণ্ঠস্থ কিন্তু ঐ দুইটার একটাতেও প্রাইজ নাই। অবশ্য সংস্কৃতেও সে নেহাত কাঁচা নয়, ধাতু প্রত্যয় বিভক্তি সব চট্‌পট্ মুখস্থ করিয়া ফেলে—চেষ্টা করিলে কি পড়ার বই আর অর্থ-পুস্তকটাকে সড়গড় করিতে পারে না? ক্লাশের মধ্যে খুদিরাম একটু-আধটু সংস্কৃত জানে—কিন্তু তাহা তো বেশি নয়। নন্দলাল ইচ্ছা করিলে কি তাহাকে হারাইতে পারে না? নন্দ জেদ করিয়া স্থির করিল, 'একবার খুদিরামকে দেখে নেব। ছোকরা এ বছর সংস্কৃতের প্রাইজ পেয়ে ভারি দেমাক করছে—আবার অঙ্কের গোল্লার জন্য আমাকে খোঁটা দিতে এসেছিল। আচ্ছা, এবার দেখা যাবে।'

নন্দলাল কাহাকেও না জানাইয়া সেইদিন হইতেই বাড়িতে ভয়ানক ভাবে পড়িতে শুরু করিল। ভোরে উঠিয়াই সে 'হসতি হসত হসন্তি' শুরু করে, রাত্রেও 'অস্তি গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলীতরু' বলিয়া ঢুলিতে থাকে। কিন্তু ক্লাশের ছেলেরা এ কথার বিন্দুবিসর্গও জানে না। পণ্ডিত মহাশয় যখন ক্লাশে প্রশ্ন করেন, তখন মাঝে মাঝে উত্তর জানিয়াও সে চুপ করিয়া মাথা চুলকাইতে থাকে, এমন কি কখনো ইচ্ছা করিয়া দু-একটা ভুল বলে, পাছে খুদিরাম তার পড়ার খবর টের পাইয়া আরও বেশি করিয়া পড়ায় মন দিতে থাকে। তাহার ভুল উত্তর শুনিয়া খুদিরাম মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে, নন্দলাল তাহার কোনো জবাব দেয় না, কেবল খুদিরাম নিজে যখন এক-একটা ভুল করে, তখন সে মুচকি মুচকি হাসে, আর ভাবে, 'পরীক্ষার সময় অম্নি ভুল করলেই এবার আর ওঁকে সংস্কৃতের প্রাইজ পেতে হবে না।'

ওদিকে ইতিহাসের ক্লাশে নন্দলালের প্রতিপত্তি কমিতে লাগিল। কারণ, ইতিহাস আর ভূগোল নাকি এক রকম করিয়া শিখিলেই পাশ করা যায়—তাহার জন্য নন্দর কোনো ভাবনা নাই। তাহার সমস্ত মনটা রহিয়াছে ঐ সংস্কৃত পড়ার উপরে—অর্থাৎ সংস্কৃতের প্রাইজটার উপরে! একদিন মাস্টার মহাশয় বলিলেন, "কি হে নন্দলাল, আজকাল বুঝি বাড়িতে কিছু পড়াশুনা কর না? সব বিষয়েই যে তোমার এমন দুর্দশা হচ্ছে তার অর্থ কি?" নন্দ আর একটু হইলেই বলিয়া ফেলিত 'আজ্ঞে সংস্কৃত পড়ি', কিন্তু কথাটাকে হঠাৎ সামলাইয়া "আজ্ঞে সংস্কৃত—না সংস্কৃত নয়" বলিয়াই সে থতমত খাইয়া গেল। খুদিরাম তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "কৈ! সংস্কৃতও তো কিছু পারে না।" শুনিয়া ক্লাশসুদ্ধ ছেলে হাসিতে লাগিল। নন্দ একটু অপ্রস্তুত হইল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল—ভাগ্যিস্ তাহার সংস্কৃত পড়ার কথাটা ফাঁস হইয়া যায় নাই।

দেখিতে দেখিতে বছর কাটিয়া আসিল, পরীক্ষার সময় প্রায় উপস্থিত। সকলে পড়ার কথা, পরীক্ষার কথা আর প্রাইজের কথা বলাবলি করিতেছে, এমন সময় একজন জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে! নন্দ এবার কোন প্রাইজটা নিচ্ছ?" খুদিরাম নন্দর মতো গলা করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে সংস্কৃত, না সংস্কৃত নয়।" সকলে হাসিল, নন্দও খুব উৎসাহ করিয়া সেই হাসিতে যোগ দিল। মনে ভাবিল, 'বাছাধন, এ হাসি আর তোমার মুখে বেশি দিন থাকছে না।'

যথাসময়ে পরীক্ষা আরম্ভ হইল এবং যথাসময়ে শেষ হইল। পরীক্ষার ফল জানিবার

জন্য সকলে আগ্রহ করিয়া আছে, নন্দও রোজ নোটিশবোর্ডে গিয়া দেখে, তাহার নামে সংস্কৃত প্রাইজ পাওয়ার কোনো বিজ্ঞাপন আছে কিনা। তারপর একদিন হেডমাস্টার মহাশয় এক তাড়া কাগজ লইয়া ক্লাশে আসিলেন, আসিয়াই তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "এবার দু-একটা নতুন প্রাইজ হয়েছে আর অন্য অন্য বিষয়েও কোনো কোনো পরিবর্তন হয়েছে।" এই বলিয়া তিনি পরীক্ষার ফলাফল পড়িতে লাগিলেন। তাহাতে দেখা গেল, ইতিহাসের জন্য কে যেন একটা রূপার মেডেল দিয়াছেন। খুদিরাম ইতিহাসে প্রথম হইয়াছে, সে-ই ঐ মেডেলটা লইবে। সংস্কৃতে নন্দ প্রথম, খুদিরাম দ্বিতীয়—কিন্তু এবার সংস্কৃতে কোনো প্রাইজ নাই!

হায় হায়! নন্দর অবস্থা তখন শোচনীয়। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল সে ছুটিয়া গিয়া খুদিরামকে কয়েকটা ঘুঁষি লাগাইয়া দেয়। কে জানিত এবার ইতিহাসের জন্য প্রাইজ থাকিবে, আর সংস্কৃতের জন্য থাকিবে না। ইতিহাসের মেডেলটা তো সে অনায়াসেই পাইতে পারিত। কিন্তু তাহার মনের কষ্ট কেহ বুঝিল না—সবাই বলিল, "বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে—কেমন করে ফাঁকি দিয়ে নম্বর পেয়েছে।" নন্দ দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "কপাল মন্দ!"

নতুন পণ্ডিত

আগে যিনি আমাদের পণ্ডিত ছিলেন, তিনি লোক বড় ভালো। মাঝে মাঝে আমাদের যে ধমক-ধামক না করিতেন তাহা নয়, কিন্তু কখনও কাহাকেও অন্যায় শাস্তি দেন নাই। এমন কি ক্লাশে আমরা কত সময় গোল করিতাম, তিনি মাঝে মাঝে 'আঃ' বলিয়া ধমক দিতেন। তাঁর হাতে একটা ছড়ি থাকিত, খুব বেশি রাগ করিলেই সেই ছড়িটাকে টেবিলের উপর আছড়াইতেন—সেটাকে কোনো দিন কাহারও পিঠে পড়িতে দেখি নাই। তাই আমরা কেউ তাঁহাকে মানিতাম না।

আমাদের হেডমাস্টার মশাইটি দেখিতে তাঁর চাইতেও নিরীহ ভালোমানুষ। ছোট্ট বেঁটে মানুষটি, গোঁফ দাড়ি কামানো, গোলগাল মুখ, তাহাতে সর্বদাই যেন হাসি লাগিয়াই আছে। কিন্তু চেহারায় কি হয়? তিনি যদি 'শ্যামাচরণ কার নাম?' বলিয়া ক্লাশে আসিয়াই আমায় ডাক দিতেন, তবে তাঁর গলার আওয়াজেই আমার হাত পা যেন পেটের মধ্যে ঢুকিয়া যাইত। তাঁর হাতে কোনো দিন বেত দেখি নাই, কারণ বেতের কোনো দরকার হইত না—তাঁর হুঙ্কারটি যার উপর পড়িত সেই চক্ষে অন্ধকার দেখিত।

একদিন পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, "সোমবার থেকে আমি আর পড়াতে আসব না—কিছু দিনের ছুটি নিয়েছি। আমার জায়গায় আর একজন আসবেন। দেখিস তাঁর ক্লাশে তোরা যেন গোল করিস্‌নে।" শুনিয়া আমাদের ভারি উৎসাহ লাগিল; তারপর যে কয়দিন পণ্ডিতমহাশয় স্কুলে ছিলেন, আমরা ক্লাশে এক মিনিটও পড়ি নাই। একদিন বেহারীলাল পড়ার সময় পড়িয়াছিল, সেজন্য আমরা পরে চাঁদা করিয়া তাহার কান্‌ মলিয়া দিয়াছিলাম। যাহা হউক, পণ্ডিতমহাশয় সোমবার আর আসিলেন না—তাঁর বদলে যিনি আসিলেন তাঁর গোল কালো চশমা, মুখভরা গোঁফের জঙ্গল আর বাঘের মতো আওয়াজ শুনিয়া আমাদের উৎসাহ দমিয়া গেল। তিনি ক্লাশে আসিয়াই বলিলেন, "পড়ার সময় কথা বলবে না, হাসবে না, যা বলব তাই করবে। রোজকার পড়া রোজ করবে। আর যদি তা না কর, তা হলে তুলে আছাড় দেব।" শুনিয়া আমাদের তো চক্ষু স্থির!

ফকিরচাঁদের তখন অসুখ ছিল, সে বেচারা কদিন পরে ক্লাশে আসিতেই নূতন পণ্ডিতমহাশয় তাহাকে পড়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন। ফকির থতমত খাইয়া ভয়ে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে—আমি ইস্কুলে আসিনি—" পণ্ডিতমহাশয় রাগিয়া বলিলেন, "ইস্কুলে আসনি তো কোথায় এসেছ? তোমার মামার বাড়ি?" বেচারা কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, "সাতদিন ইস্কুলে আসিনি, কি করে পড়া বলব?" পণ্ডিতমহাশয় "চোপরাও বেয়াদব—মুখের উপর মুখ" বলিয়া এমন ভয়ানক গর্জন করিয়া উঠিলেন যে ভয়ে ক্লাশ সুদ্ধ ছেলের মুখের তালু শুকাইয়া গেল।

আমাদের হরিপ্রসন্ন অতি ভালো ছেলে। সে একদিন ইস্কুলের অফিসে গিয়া খবর পাইল—সে নাকি এবার কি একটা প্রাইজ পাইবে। খবরটা শুনিয়া বেচারা ভারি খুশি হইয়া ক্লাশে আসিতেছিল, এমন সময় নূতন পণ্ডিতমহাশয় "হাসছ কেন" বলিয়া হঠাৎ এমন ধমক দিয়া উঠিলেন যে মুখের হাসি এক মুহূর্তে আকাশে উড়িয়া গেল। তাহার পরদিন আমাদের ক্লাশের বাহিরে রাস্তার ধারে কে যেন হো হো করিয়া হাসিতেছিল,

শুনিয়া পণ্ডিতমহাশয় পাশের ঘর হইতে হাঁ হাঁ করিয়ে ছুটিয়া আসিলেন। আসিয়া আর কথাবার্তা নাই—"কেবল হাসি?" বলিয়া হরিপ্রসন্নর গালে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া কয়েক চড় লাগাইয়া, আবার হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন। সেই অবধি হরিপ্রসন্নর উপর তিনি বিনা কারণে যখন তখন খাপ্পা হইয়া উঠিতেন।

দেখিতে দেখিতে ইস্কুল সুদ্ধ ছেলে নূতন পণ্ডিতের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল। একদিন আমাদের অঙ্কের মাস্টার আসেন নাই, হেডমাস্টার রামবাবু বলিয়া গেলেন—তোমরা ক্লাশে বসিয়া পুরাতন পড়া পড়িতে থাক। আমরা পড়িতে লাগিলাম, কিন্তু খানিক বাদেই পণ্ডিতমহাশয় পাশের ঘর হইতে "পড়ছ না কেন?" বলিয়া টেবিলে প্রকাণ্ড এক ঘুঁষি মারিলেন। আমরা বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, পড়ছি তো।" তিনি আবার বলিলেন, "তবে শুনতে পাচ্ছি না কেন. চেঁচিয়ে পড়।" যেই বলা অমনি বোকা ফকিরচাঁদ

'অন্ধকারে চৌরাশিটা নরকের কুণ্ড

তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড—'

বলিয়া এমন চেঁচাইয়া উঠিল যে, পণ্ডিতমহাশয়ের চোখ হইতে চশমাটা পড়িয়া গেল। মাস্টার মহাশয় গম্ভীরভাবে ঘরের মধ্যে ঢুকিলেন, তারপর কেন জানি না হরিপ্রসন্নর কানে ধরিয়া তাহাকে সমস্ত স্কুল ঘুরাইয়া আনিলেন, তাহাকে তিনদিন ক্লাশে দাঁড়াইয়া থাকিতে হুকুম দিলেন, একটানা জরিমানা করিলেন, তাহার কালো কোটের পিঠে খড়ি দিয়া 'বাঁদর' লিখিয়া দিলেন, আর ইস্কুল হইতে তাড়াইয়া দিবেন বলিয়া শাসাইয়া রাখিলেন।

পরদিন রামবাবু হরিপ্রসন্নকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং তার কাছে সমস্ত কথা শুনিয়া আমাদের ক্লাশে খোঁজ করিতে আসিলেন। তখন ফকিরচাঁদ বলিল, "আজ্ঞে হরে চেঁচায়নি, আমি চেঁচিয়েছি।" রামবাবু বলিলেন, 'পণ্ডিতমশাইকে পাতকী বলিয়া কি গালাগালি করিয়াছিলে?" ফকির বলিল, "পণ্ডিতমশাইকে কিছুই বলিনি, আমি পড়ছিলাম—

'অন্ধকারে চৌরাশিটা নরকের কুণ্ড

তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড—'

এই সময় নূতন পণ্ডিতমহাশয় ক্লাশের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বোধ হয় শেষ কথাটুকু শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন তাঁহাকে লইয়া কিছু একটা ঠাট্টা করা হইয়াছে। তিনি রাগে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া হাঁ হাঁ করিয়া ক্লাশের মধ্যে আসিয়া রামবাবুর কালো কোট দেখিয়াই "তবে রে হরিপ্রসন্ন" বলিয়া হেডমাস্টার মহাশয়কে পিটাইতে লাগিলেন। আমরা ভয়ে কাঠ হইয়া রহিলাম। হেডমাস্টার মহাশয় অনেক কষ্টে পণ্ডিতের হাত ছাড়াইয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন যদি পণ্ডিতের মুখ দেখিতে! বেচারা ভয়ে একেবারে জুজু! তিন-চারবার হাঁ করিয়া আবার মুখ বুজিলেন, তারপর এদিক ওদিক চাহিয়া এক দৌড়ে সেই যে ইস্কুল হইতে পালাইয়া গেলেন, আর কোনো দিন তাঁকে ইস্কুলে আসিতে দেখি নাই।

দুইদিন পরে পুরাতন পণ্ডিতমহাশয় আবার ফিরিয়া আসিলেন। তাঁর মুখ দেখিয়া আমাদের যেন ধড়ে প্রাণ আসিল, আমরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। সকলে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর তাঁর ক্লাশে গোলমাল করিব না, যতই পড়া দিন না কেন, খুব ভালো করিয়া পড়িব।

সবজান্তা দাদা

"এই দ্যাখ্ টেঁপি, দ্যাখ্ কি রকম করে হাউই ছাড়তে হয়। বড় যে রাজুমামাকে ডাকতে চাচ্ছিলি? কেন, রাজুমামা না হলে বুঝি হাউই ছোটানো যায় না? এই দ্যাখ্।"

দাদার বয়স প্রায় বছর দশেক হবে, টেঁপির বয়স মোটে আট, অন্য অন্য ভাইবোনেরা আরও ছোট। সুতরাং দাদার দাদাগিরির আর অন্ত নেই! দাদাকে হাউই ছাড়তে দেখে টেঁপির বেশ একটু ভয় হয়েছিল, পাছে দাদা হাউইয়ের তেজে উড়ে যায়, কি পুড়ে যায়, কিম্বা সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটে যায়। কিন্তু দাদার ভরসা দেখে তারও একটু ভরসা হল।

দাদা হাউইটিকে হাতে নিয়ে, একটুখানি বাঁকিয়ে ধরে বিজ্ঞের মতো বলতে লাগল, "এই সল্‌তের মতো দেখছিস, এইখানে আগুন ধরাতে হয়। সল্‌তেটা জ্বলতে জ্বলতে যেই হাউই ভস্ ভস্ করে ওঠে অমনি ঠিক সময়টি বুঝে—এই এম্নি করে হাউইটিকে ছেড়ে দিতে হয়। এইখানেই হচ্ছে আসল বাহাদুরি। কাল দেখলি তো, প্রকাশটা কি রকম আনাড়ীর মতো করছিল। হাউই জ্বলতে না জ্বলতে ফস করে ছেড়ে দিচ্ছিল। সেইজন্যই হাউইগুলো আকাশের দিকে না উঠে নিচু হয়ে এদিক সেদিক বেঁকে যাচ্ছিল।"

এই বলে সবজান্তা দাদা একটি দেশলাইয়ের কাঠি ধরালেন। ভাইবোনেরা সব অবাক হয়ে হাঁ করে দেখতে লাগল। দেশলাইয়ের আগুনটি সল্‌তের কাছে নিয়ে দাদা ঘাড় বাঁকিয়ে, মুচকি হেসে আর একবার টেঁপিদের দিকে তাকালেন। ভাবখানা এই যে, আমি থাকতে রাজুমামা-ফাজুমামার দরকার কি?

—ফ্যাঁস্—ফোঁস্—ছর্‌র্‌র্—! এত শিগ্‌গির যে হাউইয়ে আগুন ধরে যায় সেটা দাদার খেয়ালেই ছিল না, দাদা তখনো ঘাড় বাঁকিয়ে হাসি হাসি মুখ করে নিজের বাহাদুরির কথা ভাবছেন। কিন্তু হাসিটি না ফুরাতেই হাউই যখন ফ্যাঁস্ করে উঠল তখন সেই সঙ্গে দাদার মুখ থেকেও হাঁউ-মাউ গোছের একটা বিকট শব্দ আপনা থেকেই বেরিয়ে এল! আর তার পরেই দাদা যে একটি লম্ফ দিলেন, তার ফলে দেখা গেল যে ছাতের মাঝখানে চিৎপাত হয়ে অত্যন্ত আনাড়ীর মতো তিনি হাত পা ছুঁড়ছেন। কিন্তু তা দেখবার অবসর টেঁপিদের হয়নি। কারণ দাদার চিৎকার আর লম্ফভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে তারাও কান্নার সুর চড়িয়ে বাড়ির ভিতরদিকে রওনা হয়েছিল।

কান্না-টান্না থামলে পর রাজুমামা যখন দাদার কান ধরে তাকে ভিতরে নিয়ে এলেন, তখন দেখা গেল যে, দাদার হাতের কাছে ফোস্‌কা পড়ে গেছে আর গায়ের দু-তিন জায়গায় পোড়ার দাগ লেগেছে। কিন্তু তার জন্য দাদার তত দুঃখ নেই, তার আসল দুঃখ এই যে, টেঁপির কাছে তার বিদ্যেটা এমন অন্যায়ভাবে ফাঁস হয়ে গেল। রাজুমামা চলে যেতেই সে হাতে মলম মাখতে মাখতে বলতে লাগল, কোথাকার কোন বাজে দোকান থেকে হাউই কিনে এনেছে—ভালো করে মশলা মেশাতেও জানে না। বিষ্টু পাঠকের দোকান থেকে হাউই আনলেই হত। বার বার বলছি—রাজুমামা হাউই চেনে না, তবু তাকেই দেবে হাউই কিনতে! তারপর সে টেঁপিকে আর ভোলা, ময়না আর খুক্‌নুকে বেশ করে বুঝিয়ে দিল যে, সে যে চেঁচিয়েছিল আর লাফ দিয়েছিল, সেটা ভয়ে নয়, হঠাৎ ফুর্তির চোটে!

যতীনের জুতো

যতীনের নতুন জুতো কিনে এনে তার বাবা বললেন, "এবার যদি অমন করে জুতো নষ্ট কর তবে ওই ছেঁড়া জুতোই পরে থাকবে।"

যতীনের চটি লাগে প্রতিমাসে একজোড়া। ধুতি তার দুদিন যেতে না যেতেই ছিঁড়ে যায়। কোনো জিনিসে তার যত্ন নেই। বইগুলো সব মলাট ছেঁড়া, কোণ দুম্‌ড়ান, শ্লেটটা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ফাটা। শ্লেটের পেন্‌সিলগুলি সর্বদাই তার হাত থেকে পড়ে যায়, কাজেই ছোট ছোট টুক্‌রো টুক্‌রো। আরেকটা তার মন্দ অভ্যাস ছিল, লেড্‌পেন্‌সিলের গোড়া চিবানো। চিবিয়ে চিবিয়ে তার পেন্‌সিলের কাঠটা বাদামের খোলার মতো খেয়ে গিয়েছিল। তাই দেখে ক্লাশের মাস্টার মশাই বলতেন, "তুমি কি বাড়িতে ভাত খেতে পাও না?"

নতুন চটি পায়ে দিয়ে প্রথম দিন যতীন খুব সাবধানে রইল, পাছে ছিঁড়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে নামে, চৌকাঠ ডিঙোবার সময় সাবধানে থাকে, যাতে না ঠোক্কর খায়। কিন্তু ওই পর্যন্তই। দুদিন পরে আবার যেই সেই। চটির মায়া ছেড়ে দুড়্ দুড়্ করে সিঁড়ি নামা, যেতে যেতে দশবার হোঁচট খাওয়া, সব আরম্ভ হল। কাজেই এক মাস যেতে না যেতে চটির একটা পাশ একটু হাঁ করল। মা বললেন, "ওরে, এই বেলা মুচি ডেকে সেলাই করা, না হলে একেবারে যাবে।" কিন্তু মুচি আর ডাকা হয় না। চটির হাঁ-ও বেড়ে চলে।

একটি জিনিসের যতীন খুব যত্ন করত। সেটি হচ্ছে তার ঘুড়ি। যে ঘুড়িটি তার মনে লাগত সেটিকে সে সযত্নে জোড়াতাড়া দিয়ে যতদিন সম্ভব টিকিয়ে রাখত। খেলার সময়টা সে প্রায় ঘুড়ি উড়িয়েই কাটিয়ে দিত। এই ঘুড়ির জন্য কত সময়ে তাকে তাড়া খেতে হত। ঘুড়ি ছিঁড়ে গেলে সে রান্নাঘরে গিয়ে উৎপাত করত তার আঠা চাই বলে। ঘুড়ির লেজ লাগাতে কিংবা সুতো কাটতে কাঁচি দরকার হলে সে মায়ের সেলাইয়ের বাক্স ঘেঁটে ঘণ্ট করে রেখে দিত। ঘুড়ি উড়াতে আরম্ভ করলে তার খাওয়া-দাওয়া মনে থাকত না। সেদিন যতীন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেছে ভয়ে ভয়ে। গাছে চড়তে গিয়ে তার নতুন কাপড়খানা অনেকখানি ছিঁড়ে গেছে। বই রেখে চটি পায়ে দিতে গিয়ে দেখে, চটিটা এত ছিঁড়ে গেছে যে আর পরাই মুশকিল। কিন্তু সিঁড়ি নামবার সময় তার সে কথা মনে রইল না, সে দু-তিন সিঁড়ি ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে নামতে লাগল। শেষে তাতে চটির হাঁ বেড়ে বেড়ে, সমস্ত দাঁত বের করে ভেংচাতে লাগল। যেমনি সে শেষ তিনটা সিঁড়ি ডিঙিয়ে লাফিয়ে পড়েছে, অমনি মাটিটা তার পায়ের নিচ থেকে সুড়ুৎ করে সরে গেল, আর ছেঁড়া চটি তাকে নিয়ে সাঁই সাঁই করে শূন্যের উপর দিয়ে কোথায় যে ছুটে চলল তার ঠিকঠিকানা নেই।

ছুটতে ছুটতে ছুটতে ছুটতে চটি যখন থামল, তখন যতীন দেখল সে কোন অচেনা দেশে এসে পড়েছে। সেখানে চারদিকে অনেক মুচি বসে আছে। তারা যতীনকে দেখে

কাছে এল, তারপর তার পা থেকে ছেঁড়া চটিজোড়া খুলে নিয়ে সেগুলোকে যত্ন করে ঝাড়তে লাগল। তাদের মধ্যে একজন মাতব্বর গোছের, সে যতীনকে বলল, "তুমি দেখছি ভারি দুষ্টু। জুতোজোড়ার এমন দশা করেছ? দেখ দেখি, আর একটু হলে বেচারিদের প্রাণ বেরিয়ে যেত!" যতীনের ততক্ষণে একটু সাহস হয়েছে। সে বলল, "জুতোর আবার প্রাণ থাকে নাকি?" মুচিরা বলল, "তা না তো কি? তোমরা বুঝি মনে কর, তোমরা যখন জুতো পায়ে দিয়ে জোরে জোরে হাঁটো তখন ওদের লাগে না? খুব লাগে। লাগে বলেই তো ওরা মচ্‌মচ্‌ করে। যখন তুমি চটি পায়ে দিয়ে দুড়্‌দুড়্‌ করে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করেছিলে আর তোমার পায়ের চাপে ওর পাশ কেটে গিয়েছিল, তখন কি ওর লাগেনি? খুব লেগেছিল। সেইজন্যই ও তোমাকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছে। যত রাজ্যের ছেলেদের জিনিসপত্রের ভার আমাদের উপর। তারা সে সবের অযত্ন করলে আমরা তাদের শিক্ষা দিই।" মুচি যতীনের হাতে ছেঁড়া চটি দিয়ে বলল, "নাও, সেলাই কর।" যতীন রেগে বলল, "আমি জুতো সেলাই করি না, মুচিরা করে।" মুচি একটু হেসে বলল, "একি তোমাদের দেশ পেয়েছ যে করব না বললেই হল? এই ছুঁচ সুতো নাও, সেলাই কর।" যতীনের রাগ তখন কমে এসেছে, তার মনে ভয় হয়েছে। সে বলল, "আমি জুতো সেলাই করতে জানি না।" মুচি বলল, "আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, সেলাই তোমাকে করতেই হবে।" যতীন ভয়ে ভয়ে জুতো সেলাই করতে বসল। তার হাতে ছুঁচ ফুটে গেল, ঘাড় নিচু করে থেকে থেকে ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেল, অনেক কষ্টে সারাদিনে একপাটি চটি সেলাই হল। তখন সে মুচিকে বলল, "কাল অন্যটা করব। এখন খিদে পেয়েছে।" মুচি বলল, "সে কি! সব কাজ শেষ না করে তুমি খেতেও পাবে না, ঘুমোতেও পাবে না। একপাটি চটি এখনও বাকি আছে। তারপর তোমাকে আস্তে আস্তে চলতে শিখতে হবে, যেন আর কোনো জুতোর উপর অত্যাচার না কর। তারপর দরজীর কাছে গিয়ে ছেঁড়া কাপড় সেলাই করতে হবে। তারপর আরো কি কি জিনিস নষ্ট করেছ দেখা যাবে।"

যতীনের তখন চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে। সে কাঁদতে কাঁদতে কোনো রকমে অন্য চটিটা সেলাই করল। ভাগ্যে এ পাটি বেশি ছেঁড়া ছিল না। তখন মুচিরা তাকে একটা পাঁচতলা উঁচু বাড়ির কাছে নিয়ে গেল। সে বাড়িতে একটা সিঁড়ি বরাবর একতলা থেকে পাঁচতলা পর্যন্ত উঠে গেছে। তারা যতীনকে সেই সিঁড়ির নিচে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, "যাও, একেবারে পাঁচতলা পর্যন্ত উঠে যাও, আবার নেমে এস। দেখো, আস্তে আস্তে একটি একটি সিঁড়ি করে উঠবে নামবে।" যতীন পাঁচতলা পর্যন্ত উঠে গিয়ে নেমে এল। সে নিচে আসলে মুচিরা বলল, "হয়নি। তুমি তিনবার দুটো সিঁড়ি এক সঙ্গে উঠেছ, পাঁচবার লাফিয়েছ, দুবার তিনটে করে সিঁড়ি ডিঙিয়েছ। আবার ওঠ। মনে থাকে যেন, একটুও লাফাবে না, একটাও সিঁড়ি ডিঙোবে না।" এতটা সিঁড়ি উঠে নেমে যতীন বেচারীর পা টনটন করছিল। সে এবার আস্তে আস্তে উপরে উঠল, আস্তে আস্তে নেমে এল। তারা বলল, "আচ্ছা, এবার মন্দ হয়নি। তাহলে চল দরজীর কাছে।"

এই বলে তারা তাকে আর একটা মাঠে নিয়ে গেল, সেখানে খালি দরজীরা বসে সেলাই করছে। যতীনকে দেখেই তারা কাছে এসে জিগ্‌গেস করল, "কি? কি ছিঁড়েছ?"

মুচিরা উত্তর দিল, "নতুন ধুতিটা, দেখ কতটা ছিঁড়ে ফেলেছে।" দরজীরা মাথা নেড়ে বলল, "বড় অন্যায়, বড় অন্যায়! শিগ্‌গির সেলাই কর।" যতীনের আর 'না' বলবার সাহস হল না। সে ছুঁচ-সুতো নিয়ে ছেঁড়া কাপড় জুড়তে বসে গেল। সবে মাত্র দু-এক ফোঁড় দিয়েছে অমনি দরজীরা চেঁচিয়ে উঠল, "ওকে কি সেলাই বলে? খোল, খোল।" অমনি করে, বেচারি যতবার সেলাই করে, ততবার তারা বলে, "খোল, খোল!" শেষে সে একেবারে কেঁদে ফেলল, বলল "আমার বড্ড খিদে পেয়েছে। আমাকে বাড়ি পৌঁছে দাও, আমি আর কখ্‌খনো কাপড় ছিঁড়ব না, ছাতা ছিঁড়ব না।" তাতে দরজীরা হাসতে হাসতে বলল, "খিদে পেয়েছে? তা তোমার খাবার জিনিস তো আমাদের কাছে ঢের আছে।" এই বলে তারা তাদের কাপড়ে দাগ দেবার পেন্‌সিল কতগুলো এনে দিল। "তুমি তো পেন্‌সিল চিবোতে ভালোবাস, এইগুলো চিবিয়ে খাও, আর কিছু আমাদের কাছে নেই।"

এই বলে তারা যার যার কাজে চলে গেল। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে যতীন কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে শুয়ে পড়ল। এমন সময় আকাশে বোঁ বোঁ করে কিসের শব্দ হল, আর যতীনের তালি-দেওয়া সাধের ঘুড়িটা গোঁৎ খেয়ে এসে তার কোলের উপর পড়ল। ঘুড়িটা ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "তুমি আমাকে যত্ন করেছ, তাই আমি তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি। শিগ্‌গির আমার লেজটা ধর।" যতীন তাড়াতাড়ি ঘুড়ির লেজ ধরল। ঘুড়িটা অমনি তাকে নিয়ে সোঁ করে আকাশে উঠে গেল। সেই শব্দ শুনে দরজীরা বড় বড় কাঁচি নিয়ে ছুটে এল ঘুড়ির সুতোটা কেটে দিতে। হঠাৎ ঘুড়ি আর যতীন জড়াজড়ি করে নিচের দিকে পড়তে লাগল।

পড়তে পড়তে যেই মাটিটা ধাঁই করে যতীনের মাথায় লাগল, অমনি সে চমকে উঠল। ঘুড়িটা কি হল কে জানে। যতীন দেখল সে সিঁড়ির নিচে শুয়ে আছে, আর তার মাথায় ভয়ানক বেদনা হয়েছে।

কিছুদিন ভুগে যতীন সেরে উঠল। তার মা বলতেন, "আহা, সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে, এই ভোগানিতে বাছা আমার বড় দুর্বল হয়ে গেছে। সে স্ফূর্তি নেই, সে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চলা নেই, কিছুই নেই। তা নইলে এক জোড়া জুতো চার মাস যায়?"

আসল কথা—যতীন এখনও সেই মুচিদের আর দরজীদের কথা ভুলতে পারেনি।

ডিটেক্‌টিভ

জলধরের মামা পুলিশের চাকরি করেন, আর তার পিসেমশাই লেখেন ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। সেইজন্য জলধরের বিশ্বাস যে, চোর-ডাকাত জাল-জুয়াচোর জব্দ করবার সব রকম সঙ্কেত সে যেমন জানে এমনটি তার মামা আর পিসেমশাই ছাড়া কেউ জানে না। কারও বাড়িতে চুরি-টুরি হলে জলধর সকলের আগে সেখানে হাজির হয়। আর, কে চুরি করল, কি করে চুরি হল, সে থাকলে এমন অবস্থায় কি করত, এ-সব বিষয়ে খুব বিজ্ঞের মতো কথা বলতে থাকে। যোগেশবাবুর বাড়িতে যখন বাসন চুরি হল, তখন জলধর তাদের বললে, "আপনারা এইটুকু সাবধান হতে জানেন না, চুরি তো হবেই। দেখুন তো ভাঁড়ার ঘরের পাশেই অন্ধকার গলি। তার উপর জানলার গরাদ নেই। একটু সেয়ানা লোক হলে এখান দিয়ে বাসন নিয়ে পালাতে কতক্ষণ? আমাদের বাড়িতে ও-সব হবার জো নেই। আমি রামদিনকে ব'লে রেখেছি, জানলার গায়ে এমনভাবে বাসনগুলো ঠেকিয়ে রাখবে যে জানলা খুলতে গেলেই বাসনপত্র সব ঝন্‌ঝন্ করে মাটিতে পড়বে। চোর জব্দ করতে হলে এ-সব কায়দা জানতে হয়।" সে সময়ে আমরা সকলেই জলধরের বুদ্ধির খুব প্রশংসা করেছিলাম, কিন্তু পরের দিন যখন শুনলাম সেই রাত্রে জলধরের বাড়িতে মস্ত চুরি হয়ে গেছে, তখন মনে হল, আগের দিন অতটা প্রশংসা করা উচিত হয়নি। জলধর কিন্তু তাতেও কিছুমাত্র দমেনি। সে বলল, "ঐ আহাম্মক রামদিনটার বোকামিতে সব মাটি হয়ে গেল। যাক্, আমার জিনিস চুরি করে তাকে আর হজম করতে হবে না। দিন দুচার যেতে দাও না।" কিন্তু দু মাস গেল, চার মাস গেল, চোর কিন্তু আর ধরাই পড়ল না। চোরের উপদ্রবের কথা আমরা সবাই ভুলে গেছি, এমন সময় হঠাৎ আমাদের স্কুলে আবার চুরির হাঙ্গামা শুরু হল। ছেলেরা অনেকে টিফিন নিয়ে আসে, তা থেকে খাবার চুরি যেতে লাগল। প্রথম দিন রামপদর খাবার চুরি যায়। সে বেঞ্চির উপর খানিকটা রাবড়ি আর লুচি রেখে হাত ধুয়ে আসতে গেছে—এর মধ্যে কে এসে লুচিটুচি বেমালুম খেয়ে গিয়েছে। তারপর ক্রমে আরো দু-চারটি ছেলের খাবার চুরি হল। তখন আমরা জলধরকে বললাম, "কি হে ডিটেক্‌টিভ! এই বেলা যে তোমার চোর-ধরা বুদ্ধি খোলে না, তার মানেটা কি বল দেখি?" জলধর বলল, "আমি কি আর বুদ্ধি খাটাচ্ছি না? সবুর কর না।" তখন সে খুব সাবধানে আমাদের কানে কানে এ কথা জানিয়ে দিল যে, স্কুলের যে নতুন ছোকরা বেয়ারা এসেছে তাকেই সে চোর বলে সন্দেহ করে, কারণ, সে আসবার পর থেকে চুরি আরম্ভ হয়েছে। আমরা সবাই সেদিন থেকে তার উপর চোখ রাখতে শুরু করলাম। কিন্তু দুদিন না যেতেই আবার চুরি। পাগলা দাশু বেচারা বাড়ি থেকে মাংসের চপ এনে টিফিন ঘরের বেঞ্চের তলায় লুকিয়ে রেখেছিল, কে এসে তার আধখানা খেয়ে বাকিটুকু ধুলোয় ফেলে নষ্ট করে দিয়েছে। পাগলা তখন রাগের চোটে চিৎকার করে গাল দিয়ে ইস্কুল-বাড়ি মাথায় করে তুলল। আমরা সবাই বললাম, "আরে চুপ্ চুপ্, অত চেঁচাসনে। তা হলে চোর ধরা পড়বে কি করে?" কিন্তু

পাগলা কি সে-কথা শোনে? তখন জলধর তাকে বুঝিয়ে বলল, "আর দুদিন সবুর কর, ঐ নতুন ছোকরাটাকে আমি হাতে হাতে ধরিয়ে দিচ্ছি—এ সমস্ত ওরই কারসাজি।" শুনে দাশু বলল, "তোমার যেমন বুদ্ধি! ওরা হল পশ্চিমা ব্রাহ্মণ, ওরা আবার মাংস খায় নাকি? দারোয়ানজীকে জিগ্‌গেস কর তো?" সত্যিই আমাদের তো সে খেয়াল হয়নি! ও ছোকরা তো কতদিন রুটি পাকিয়ে খায়, কই একদিনও তো ওকে মাছ-মাংস খেতে দেখি না। দাশু পাগলা হোক আর যাই হোক, তার কথাটা সবাইকে মানতে হল।

জলধর কিন্তু অপ্রস্তুত হবার ছেলেই নয়। সে এক গাল হেসে বলল, "আমি ইচ্ছে করে তোদের ভুল বুঝিয়েছিলাম। আরে, চোরকে না ধরা পর্যন্ত কি কিছু বলতে আছে, কোনো পাকা ডিটেক্‌টিভ ও-রকম করে না। আমি মনে মনে যাকে চোর বলে ধরেছি, সে আমিই জানি।"

তারপর কদিন আমরা খুব হুঁশিয়ার ছিলাম; আট-দশদিন আর চুরি হয়নি। তখন জলধর বললে, "তোমরা গোলমাল করেই তো সব মাটি করলে। চোরটা টের পেয়ে গেল যে আমি তার পেছনে লেগেছি। আর কি সে চুরি করতে সাহস পায়? তবু ভাগ্যিস তোমাদের কাছে আসল নামটা ফাঁস করিনি।" কিন্তু সেই দিনই আবার শোনা গেল, স্বয়ং হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘর থেকে তার টিফিনের খাবার চুরি হয়ে গেছে। আমরা বললাম, "কই হে? চোর না তোমার ভয়ে চুরি করতে পারছিল না? তার ভয় যে ঘুচে গেল দেখছি।"

তারপর দুদিন ধরে জলধরের মুখে আর হাসি দেখা গেল না। চোরের ভাবনা ভেবে ভেবে তার পড়াশুনা সব এম্নি ঘুলিয়ে গেল যে পণ্ডিত মহাশয়ের ক্লাশে সে আরেকটু হলেই মার খেত আর কি! দুদিন পরে সে আমাদের সকলকে ডেকে একত্র করল, আর বলল, তার চোর ধরবার বন্দোবস্ত সব ঠিক হয়েছে। টিফিনের সময় সে একটা ঠোঙায় করে সরভাজা, লুচি আর আলুর দম রেখে চলে আসবে। তারপর কেউ যেন সেদিকে না যায়। স্কুলের বাইরে যে জিমন্যাস্টিকের ঘর আছে সেখান থেকে লুকিয়ে টিফিনের ঘরটা দেখা যায়। আমরা কয়েকজন বাড়ি যাবার ভান করে সেখানে থাকব। আর কয়েকজন থাকবে উঠোনের পশ্চিম কোণের ছোট ঘরটাতে। সুতরাং, চোর যেদিক থেকেই আসুক, টিফিন ঘরে ঢুকতে গেলেই তাকে দেখা যাবে।

সেদিন টিফিনের ছুটি পর্যন্ত কারও আর পড়ায় মন বসে না। সবাই ভাবছে কতক্ষণে ছুটি হবে, আর চোর কতক্ষণে ধরা পড়বে। চোর ধরা পড়লে তাকে নিয়ে কি করা যাবে, সে বিষয়েও কথাবার্তা হতে লাগল। মাস্টারমশাই বিরক্ত হয়ে ধমকাতে লাগলেন, পরেশ আর বিশ্বনাথকে বেঞ্চির উপর দাঁড়াতে হল—কিন্তু সময়টা যেন কাটতেই চায় না। টিফিনের ছুটি হতেই জলধর তার খাবারের ঠোঙাটা টিফিন-ঘরে রেখে এলো। জলধর, আমি আর দশ-বারোজন উঠোনের কোণের ঘরে রইলাম, আর একদল ছেলে বাইরে জিমনাস্টিকের ঘরে লুকিয়ে থাকল। জলধর বলল, "দেখ, চোরটা যে রকম সেয়ানা দেখছি, আর তার যে রকম সাহস, তাকে মারধব করা ঠিক হবে না। লোকটা নিশ্চয় খুব ষন্ডা হবে। আমি বলি, সে যদি এদিকে আসে তাহলে সবাই মিলে তার গায়ে কালি ছিটিয়ে দেব আর চেঁচিয়ে উঠব। তাহলে দারোয়ান-টারোয়ান সব ছুটে আসবে। আর, লোকটা

পালাতে গেলেও ঐ কালির চিহ্ন দেখে ঠিক ধরা যাবে।" আমাদের রামপদ ব'লে উঠল, "কেন? সে যে খুব ষণ্ডা হবে তার মানে কি? সে কিছু রাক্ষসের মতো খায় বলে তো মনে হয় না। যা চুরি করে নিচ্ছে সে তো কোনো দিনই খুব বেশি নয়।" জলধর বলল, "তুমিও যেমন পণ্ডিত। রাক্ষসের মতো খানিকটা খেলেই বুঝি ষণ্ডা হয়? তাহলে তো আমাদের শ্যামাদাসকেই সকলের চেয়ে ষণ্ডা বলতে হয়। সেদিন ঘোষেদের নেমন্তন্নে ওর খাওয়া দেখেছিলে তো! বাপু হে, আমি যা বলেছি তার উপর ফোড়ন দিতে যেও না। আর তোমার যদি নেহাৎ বেশি সাহস থাকে, তুমি গিয়ে চোরের সঙ্গে লড়াই ক'রো। আমরা কেউ তাতে আপত্তি করব না। আমি জানি, এ-সমস্ত নেহাৎ যেমন-তেমন চোরের সাধ্য নয়। আমার খুব বিশ্বাস, যে-লোকটা আমাদের বাড়িতে চুরি করেছিল—এ-সব তারই কাণ্ড!"

এমন সময় হঠাৎ টিফিন-ঘরের বাঁ দিকের জানলাটা খানিকটা ফাঁক হয়ে গেল, যেন কেউ ভিতর থেকে ঠেলছে। তার পরেই শাদা মতন কি একটা ঝুপ করে উঠোনের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। আমরা চেয়ে দেখলাম, একটা মোটা হুলো বেড়াল—তার মুখে জলধরের সরভাজা! তখন যদি জলধরের মুখখানা দেখতে, সে এক বিঘৎ উঁচু হাঁ করে উঠোনের দিকে তাকিয়ে রইল। আমরা জিগ্‌গেস করলাম, "কেমন হে ডিটেক্‌টিভ! ঐ ষণ্ডা চোরটাই তো তোমার বাড়িতে চুরি করেছিল? তাহলে এখন ওকেই পুলিশে দিই?"

ব্যোমকেশের মাঞ্জা

'টোকিয়ো—কিয়োটো—নাগাসাকি—য়োকোহামা'—বোর্ডের উপর প্রকাণ্ড ম্যাপ ঝুলিয়ে হারাণচন্দ্র জাপানের প্রধান নগরগুলি দেখিয়ে যাচ্ছে। এর পরেই ব্যোমকেশের পালা কিন্তু ব্যোমকেশের সে খেয়ালই নেই। কাল বিকেলে ডাক্তারবাবুর ছোট্ট ছেলেটার সঙ্গে প্যাঁচ খেলতে গিয়ে তার দুটো-দুটো ঘুড়ি কাটা গিয়েছিল, সে-কথাটা ব্যোমকেশ কিছুতেই আর ভুলতে পারছে না। তাই সে বসে বসে সুতোর জন্যে কড়া রকমের একটা মাঞ্জা তৈরির উপায় চিন্তা করছে। চীনে শিরিস গালিয়ে, তার মধ্যে বোতলচুর আর কড়্‌কড়ে এমেরি পাউডার মিশিয়ে সুতোয় মাখালে পর কি রকম চমৎকার মাঞ্জা হবে, সেই কথা ভাবতে ভাবতে উৎসাহে তার দুই চোখ কড়িকাঠের দিকে গোল হয়ে উঠছে। মনে মনে মাঞ্জা দেওয়া ঘুড়ির সুতোটা সবে তালগাছের আগা পর্যন্ত উঠে, আশ্চর্য কায়দায় ডাক্তারের ছেলের ঘুড়িটাকে কাটতে যাচ্ছে এমন সময়ে গম্ভীর গলায় ডাক পড়ল—"তারপর, ব্যোমকেশ এস দেখি।"

ঐ রকম ভীষণ উত্তেজনার মধ্যে, সুতো-মাঞ্জা, ঘুড়ির প্যাঁচ সব ফেলে আকাশের উপর থেকে ব্যোমকেশকে হঠাৎ নেমে আসতে হল একেবারে চীন দেশের মধ্যিখানে। একে তো ও দেশটার সঙ্গে তার পরিচয় খুব বেশি ছিল না, তার উপর যা-ও দু-একটা চীনদেশী নাম সে জানত, ওরকম হঠাৎ নেমে আসবার দরুন, সেগুলোও তার মাথার মধ্যে কেমন বিচ্ছিরি রকম ঘণ্ট পাকিয়ে গেল। পাহাড়, নদী, দেশ, উপদেশের মধ্যে ঢুকতে না ঢুকতে বেচারা বেমালুম পথ হারিয়ে ফেলল। তার কেবলই মনে হতে লাগল যে চীনদেশের চীনে শিরীষ তাই দিয়ে হয় মাঞ্জা। মাস্টারমশাই দু-দুবার তাড়া দিয়ে যখন তৃতীয়বার চড়া গলায় বললেন, "চীন দেশের নদী দেখাও" তখন বেচারা একেবারে দিশেহারা আর মরিয়া মতন হয়ে বললে—"সাংহাই।" সাংহাই বলবার আর কোনো কারণ ছিল না, বোধ হয় তার সেজমামার যে স্ট্যাম্প সংগ্রহের খাতা আছে তার মধ্যে ঐ নামটাকে সে পেয়ে থাকবে—বিপদের ধাক্কায় হঠাৎ কেমন করে ঐটেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

গোটা দুই চড়-চাপড়ের পর ব্যোমকেশবাবু তাঁর কানের উপর মাস্টারমশায়ের প্রবল আকর্ষণ অনুভব ক'রে, বিনা আপত্তিতে বেঞ্চের উপর আরোহণ করলেন। কিন্তু কানদুটো জুড়োতে না জুড়োতেই মনটা তার খেই-হারানো ঘুড়ির পিছনে উধাও হয়ে আবার সুতোর মাঞ্জা তৈরি করতে বসল। সারাটা দিন বকুনি খেয়েই তার সময় কাটল, কিন্তু এর মধ্যে কত উঁচুদরের মাঞ্জা-দেওয়া সুতো তৈরি হল আর কত যে ঘুড়ি গণ্ডায় গণ্ডায় কাটা পড়ল সে কেবল ব্যোমকেশই জানে।

বিকেলবেলায় সবাই যখন বাড়ি ফিরছে, তখন ব্যোমকেশ দেখল, ডাক্তারের ছেলেটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মস্ত একটা লাল রঙের ঘুড়ি কিনছে। দেখে ব্যোমকেশ তার বন্ধু পাঁচকড়িকে বলল, "দেখেছিস, পাঁচু, আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে আবার ঘুড়ি কেনা

হচ্ছে! এ-সব কিন্তু নেহাত বাড়াবাড়ি। না হয় দুটো ঘুড়িই কেটেছিস বাপু, তার জন্যে এত কি গিরিস্বাড়ি!" এই ব'লে সে পাঁচুর কাছে তার মাঞ্জা তৈরির মতলবটা খুলে বলল।

শুনে পাঁচু গম্ভীর হয়ে বলল, "তা যদি বলিস, তুই কি আর মাঞ্জা তৈরি করে ওদের সঙ্গে পারবি ভেবেছিস? ওরা হল ডাক্তারের ছেলে, নানা রকম ওষুধ-মশলা জানে। এই তো সেদিন ওর দাদাকে দেখলুম, শানের উপর কি একটা আরক ঢেলে দিলে, আর ভস্‌ভস্‌ করে গ্যাঁজালের মতো তেজ বেরুতে লাগল। ওরা যদি মাঞ্জা বানায়, তা হলে কারু মাঞ্জার বাপের সাধ্যি নেই যে তার সঙ্গে পেরে ওঠে।" শুনে ব্যোমকেশের মনটা কেমন দমে গেল। তার ধ্রুব রকম বিশ্বাস হল যে, ডাক্তারের ছেলেটা নিশ্চয় কোনো আশ্চর্য রকম মাঞ্জার খবর জানে। তা নইলে ব্যোমকেশের চাইতেও চার বছরের ছোট হয়ে, সে কেমন করে তার ঘুড়ি কাটল? ব্যোমকেশ স্থির করল, যেমন করে হোক ওদের বাড়ির মাঞ্জা খানিকটা যোগাড় করতেই হবে। সেটা একবার আদায় করতে পারলে, তারপর সে ডাক্তারের ছেলেকে দেখে নেবে।

বাড়ি গিয়ে তাড়াতাড়ি জলখাবার সেরে নিয়ে ব্যোমকেশ দৌড়ে গেল ডাক্তারবাবুর ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করতে। সেখানে গিয়ে সে দেখে কি, কোণের বারান্দায় বসে সেই ছোট্ট ছেলেটা একটা ডাক্তারি খলের মধ্যে কি যেন মশলা ঘুঁটছে। ব্যোমকেশকে দেখেই সে একটা চৌকির তলায় সব লুকিয়ে ফেলে সেখান থেকে সরে পড়ল। ব্যোমকেশ মনে মনে বললে, 'বাপু হে! এখন আর লুকিয়ে করবে কি? তোমার আসল খবর আমি টের পেয়েছি'—এই ব'লে সে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলে, কোথাও কেউ নেই। একবার সে ভাবল, কেউ আস্‌লে পর একটুখানি চেয়ে নেব। আবার মনে হল, কি জানি চাইলে যদি না দেয়? তারপর ভাবলে, দূর! ভারি তো জিনিস তা আবার চাইবার দরকার কি? এই একটুকুন মাঞ্জা হলেই প্রায় দুশো গজ সুতোয় শান দেওয়া হবে। এই ভেবে সে চৌকির তলা থেকে এক খাবল মশলা তুলে নিয়েই এক দৌড়ে বাড়ি এসে হাজির!

আর কি তখন দেরি সয়? দেখতে দেখতে দক্ষিণের বারান্দা জুড়ে সুতো খাটিয়ে, মহা উৎসাহে তার মাঞ্জা দেওয়া শুরু হল। যাই বল, মাঞ্জাটা কিন্তু ভারি অদ্ভুত—কই, তেমন কড়্‌কড়্‌ করছে না তো! বোধ হয়, খুব মিহি গুঁড়োর তৈরি—আর কালো কাচের গুঁড়ো। দুঃখের বিষয়, বেচারার কাজটা শেষ না হতেই সন্ধ্যা হয়ে এল, আর তার বড়দা এসে বললে, "যা, যা! আর সুতো পাকাতে হবে না, এখন পড়্‌গে যা।"

সে রাত্তিরে ব্যোমকেশের ভালো করে ঘুমই হল না। সে স্বপ্ন দেখলে যে, ডাক্তারের ছেলেটা হিংসে করে তার চমৎকার সুতোয় জল ফেলে সব নষ্ট করে দিয়েছে। সকাল হতে না হতেই ব্যোমকেশ দৌড়ে গেল তার সুতোর খবর নিতে। কিন্তু গিয়েই দেখে, কে এক বুড়ো ভদ্রলোক ঠিক বারান্দার দরজার সামনে বসে তার দাদার সঙ্গে গল্প করছেন, তামাক খাচ্ছেন। ব্যোমকেশ ভাবলে, দেখ তো কি অন্যায়! এর মধ্যে থেকে এখন সুতোটা আনি কেমন করে? যাহোক, খানিকক্ষণ ইতস্তত করে সে খুব সাহসের সঙ্গে গিয়ে, চট করে তার সুতো খুলে নিয়ে চলে আসছে—এমন সময়, হঠাৎ কাশতে গিয়ে বুড়ো লোকটির কল্‌কে থেকে খানিকটা টিকে গেল মাটিতে পড়ে। বৃদ্ধ তখন ব্যস্ত হয়ে হাতের কাছে

কিছু না পেয়ে, ব্যোমকেশের সেই মাঞ্জা মাখানো কাগজটা দিয়ে টিকেটাকে তুলতে গেলেন।

সর্বনাশ! যেমন টিকের উপর কাগজ ছোঁয়ানো, অমনি কিনা ভস্‌ভস্‌ করে কাগজ জ্বলে উঠে ভদ্রলোকের আঙুল-টাঙুল পুড়ে, বারান্দার বেড়ায় আগুন-টাগুন লেগে এক হুলুস্থূল কাণ্ড! অনেক চেঁচামেচি ছুটোছুটি আর জল ঢালাঢালির পর যখন আগুনটুকু নিভে এল, আর ভদ্রলোকের আঙুলের ফোস্কায় মলম দেওয়া হলে, তার দাদা এসে তার কান ধরে বললেন, "হতভাগা! কি রেখেছিলি কাগজের মধ্যে বল্‌ তো?" ব্যোমকেশ কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে, "কিচ্ছু তো রাখিনি, খালি সুতোর মাঞ্জা রেখেছিলাম।" দাদা তার কৈফিয়ৎটাকে নিতান্তই আজগুবি মনে করে, "আবার এয়ার্কি হচ্ছে?" ব'লে বেশ দু-চার ঘা কষিয়ে দিলেন।

বেচারা ব্যোমকেশ এই ব'লে তার মনকে খুব খানিক সান্ত্বনা দিল যে, আর যাই হোক, তার সুতোটুকু রক্ষা পেয়েছে। ভাগ্যিস সে সময়মতো খুলে এনেছিল, নইলে তার সুতোও যেত, পরিশ্রমও নষ্ট হত। বিকেল বেলায় সে বাড়ি এসেই চটপট ঘুড়ি আর লাটাই নিয়ে ছাতের উপর উঠল। মনে মনে বলল 'ডাক্তারের পো আজ একবার আসুক না, দেখিয়ে দেব প্যাঁচ খেলাটা কাকে বলে।' এমন সময়ে পাঁচকড়ি এসে বড় বড় চোখ করে বললে, "শুনেছিস?" ব্যোমকেশ বললে, "না—কি হয়েছে?" পাঁচু বললে, "ওদের সেই ছেলেটাকে দেখে এলুম, সে নিজে নিজে দেশলাইয়ের মশলা বানিয়েছে, আর চমৎকার লাল নীল দেশলাই তৈরি করেছে।" ব্যোমকেশ হঠাৎ লাটাই-টাটাই রেখে, এত বড় হাঁ করে জিগ্‌গেস করলে, "দেশলাই কিরে! মাঞ্জা বল?" শুনে পাঁচু বেজায় চটে গেল, "বলছি লাল নীল আলো জ্বলছে, তবু বলবে মাঞ্জা, আচ্ছা গাধা যা হোক!"

ব্যোমকেশ কোনো জবাব না দিয়ে, দেশলাইয়ের মশলা-মাখানো সুতোটার দিকে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে রইল। সেই সময় ডাক্তারদের বাড়ি থেকে লাল রঙের ঘুড়ি উড়ে এসে, ঠিক ব্যোমকেশের মাথার উপরে ফর্‌ফর্‌ করে তাকে যেন ঠাট্টা করতে লাগল। তখন সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। বলল, "আমার অসুখ করেছে।"

জগ্যিদাসের মামা

তার আসল নামটি যজ্ঞদাস। সে প্রথম যেদিন আমাদের ক্লাশে এল পণ্ডিতমশাই তার নাম শুনেই ভ্রূকুটি করে বললেন, "যজ্ঞের আবার দাস কি? যজ্ঞেশ্বর বললে তবু না হয় বুঝি।" ছেলেটি বলল, "আজ্ঞে, আমি তো নাম রাখিনি, নাম রেখেছেন খুড়োমশাই।"

এই শুনে আমি একটু ফিক করে হেসে ফেলেছিলাম তাই পণ্ডিতমশাই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বানান কর যজ্ঞদাস।" আমি থতমত খেয়ে বললাম, "বর্গীয় জ"— পণ্ডিতমশাই বললেন, "দাঁড়িয়ে থাক।" তারপর একটি ছেলে ঠিক বানান বললে পর তিনি আরেকজনকে বললেন, "সমাস কর।" সে তার সংস্কৃত বিদ্যা জাহির করে বললে, "যোগ্য শ্চেতি দাসশ্চাসৌ।" পণ্ডিতমশাই তার কান ধরে বললেন, "বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে থাক।"

দুদিন না যেতেই বোঝা গেল যে, জগ্যিদাসের আর কোনো বিদ্যে থাকুক আর নাই থাকুক আজগুবি গল্প বলবার ক্ষমতাটি তার অসাধারণ। একদিন সে ইস্কুলে দেরি করে এসেছিল, কারণ জিগ্‌গেস করাতে সে বলল, "রাস্তায় আসতে পঁচিশটা কুকুর হাঁ হাঁ করে আমায় তেড়ে এসেছিল। ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে সেই কুণ্ডুদের বাড়ি পর্যন্ত চলে গেছিলাম।" পঁচিশটা দূরের কথা, দশটা কুকুরও আমরা এক সঙ্গে চোখে দেখিনি, কাজেই কথাটা মাস্টারমশাইও বিশ্বাস করেননি। তিনি জিগ্‌গেস করলেন, "এত মিছে কথা বলতে শিখলে কার কাছে?" জগ্যিদাস বলল, "আজ্ঞে, মামার কাছে।" সেদিন হেডমাস্টারের ঘরে জগ্যিদাসের ডাক পড়েছিল, সেখানে কি হয়েছিল আমরা জানি না, কিন্তু জগ্যিদাস যে খুশি হয়নি সেটা বেশ বোঝা গেল।

কিন্তু সত্যি হোক আর মিথ্যে হোক, তার গল্প বলার বাহাদুরি ছিল। সে যখন বড় বড় চোখ করে গম্ভীর গলায় তার মামাবাড়ির ডাকাত ধরার গল্প বলত, তখন বিশ্বাস করি আর না করি শুনতে শুনতে আমাদের মুখ আপনা হতেই হাঁ হয়ে আসত। জগ্যিদাসের মামার কথা আমাদের ভারি আশ্চর্য ঠেকত! তাঁর গায়ে নাকি যেমন জোর তেমনি অসাধারণ বুদ্ধি! তিনি যখন 'রামভজন' ব'লে চাকরকে ডাক দিতেন, তখন ঘর বাড়ি সব থর্‌থর্ করে কেঁপে উঠত। কুস্তি বল, লাঠি বল, ক্রিকেট বল, সবটাতেই তাঁর সমান দখল। প্রথমটা আমরা বিশ্বাস করিনি, কিন্তু একদিন সে তার মামার ফটো এনে দেখাল। দেখলাম পালোয়ানের মতো চেহারা বটে! এক-একবার ছুটি হত আর জগ্যিদাস তার মামার বাড়ি যেত, আর এসে যে সব গল্প বলত তা কাগজে ছাপবার মতো। একদিন স্টেশনে আমার সঙ্গে জগ্যিদাসের দেখা, একটা গাড়ির মধ্যে মাথায় পাগড়ি বাঁধা চমৎকার জাঁদরেল চেহারার একটি কোন দেশী ভদ্রলোক বসে। আমি ইস্কুলে ফিরতে ফিরতে জগ্যিদাসকে জিগ্‌গেস করলাম, "ঐ পাগড়ি বাঁধা জাঁদরেল লোকটাকে দেখেছিলি?" জগ্যিদাস বলল, "ঐ তো আমার মামা।" আমি বললাম, "ফটোতে তো কালো দেখেছিলাম।" জগ্যিদাস বলল, "এবার সিম্‌লে গিয়ে ফরসা হয়ে এসেছেন।" আমি ইস্কুলে গিয়ে গল্প করলাম, "আজ জগ্যিদাসের মামাকে দেখে এলুম।" জগ্যিদাসও খুব বুক ফুলিয়ে মুখখানা গম্ভীর করে বলল, "তোমরা তো ভাই আমার কথা বিশ্বাস কর না। আচ্ছা, না হয় মাঝে মাঝে দুটো একটা গল্প

ব'লে থাকি। তা ব'লে কি সবই আমার গল্প। আমার জলজ্যান্ত মামাকে সুদ্ধ তোমরা উড়িয়ে দিতে চাও?" এ-কথায় অনেকেই মনে মনে লজ্জা পেয়ে, ব্যস্ত হয়ে বারবার বলতে লাগল, "আমরা কিন্তু গোড়া থেকেই বিশ্বাস করেছিলাম।"

তারপর থেকে মামার প্রতিপত্তি ভয়ানক বেড়ে গেল। রোজই সব ব্যস্ত হয়ে থাকতাম মামার খবর শুনবার জন্য। কোনোদিন শুনতাম মামা গেছেন হাতি গণ্ডার বাঘ মারতে। কোনোদিন শুনতাম, একাই তিনি পাঁচটা কাবুলীকে ঠেঙিয়ে ঠিক করেছেন, এরকম প্রায়ই হত। তারপর একদিন সবাই আমরা টিফিনের সময় গল্প করছি, এমন সময় হেডমাস্টার মশাই ক্লাশে এসে বললেন, "যজ্ঞদাস, তোমার মামা এসেছেন।" হঠাৎ যজ্ঞদাসের মুখখানা আমসির মতো শুকিয়ে গেল—সে আম্‌তা আম্‌তা ক'রে কি যেন বলতে গিয়ে আর বলতে পারল না। তারপর লক্ষ্মী ছেলেটির মতো চুপচাপ মাস্টার মশায়ের সঙ্গে চলল। আমরা বললাম, "ভয় হবে না? জানো তো কি রকম মামা!" সবাই মিলে উৎসাহ আর আগ্রহে মামা দেখবার জন্য একেবারে ঝুঁকে পড়লাম। গিয়ে দেখি, একটি রোগা কালো ছোকরা গোছের ভদ্রলোক, চশমা চোখে গোবেচারার মতো বসে আছেন। জগ্যিদাস তাঁকেই গিয়ে প্রণাম করল।

সেদিন সত্যিসত্যিই আমাদের রাগ হয়েছিল। এম্নি করে ফাঁকি দেওয়া! মিথ্যে করে মামা তৈরি! সেদিন আমাদের ধমকের চোটে জগ্যিদাস্ কেঁদেই ফেলল। সে তখন স্বীকার করল যে, ফটোটা কোনো এক পশ্চিমা পালোয়ানের। আর সেই ট্রেনের লোকটাকে সে চেনেই না। তারপরে কোনো আজগুবি জিনিসের কথা বলতে হলেই আমরা বলতাম, 'জগ্যিদাসের মামার মতো।'

আজব সাজা

"পণ্ডিতমশাই, ভোলা আমায় ভ্যাংচাচ্ছে।" "না পণ্ডিতমশাই, আমি কান চুলকোচ্ছিলাম তাই মুখ বাঁকা মতো দেখাচ্ছিল!" পণ্ডিতমশাই চোখ না খুলিয়াই অত্যন্ত নিশ্চিন্ত ভাবে বলিলেন, "আঃ! কেবল বাঁদরামি! দাঁড়িয়ে থাক।"

আধমিনিট পর্যন্ত সব চুপচাপ। তারপর আবার শোনা গেল, "দাঁড়াচ্ছিস না যে?" "আমি দাঁড়াব কেন?" "তোকেই তো দাঁড়াতে বলল।" "যাঃ আমায় বলেছে না আর কিছু! গণশাকে জিগ্‌গেস কর? কিরে গণশা, ওকে দাঁড়াতে বলেছে না?"

গণেশের বুদ্ধি কিছু মোটা, সে আস্তে আস্তে উঠিয়া পণ্ডিতমশাইকে ডাকিতে লাগিল, "পণ্ডিতমশাই! ও পণ্ডিতমশাই!" পণ্ডিতমশাই বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি বলছিস বল্ না।" গণেশচন্দ্র অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে দাঁড়াতে বলেছেন, পণ্ডিতমশাই?" পণ্ডিতমশাই কট্‌মটে চোখ মেলিয়াই সাংঘাতিক ধমক দিয়া বলিলেন, "তোকে বলছি, দাঁড়া।" বলিয়াই আবার চোখ বুজিলেন।

গণেশচন্দ্র দাঁড়াইয়া রহিল। আবার মিনিট খানেক সব চুপচাপ। হঠাৎ ভোলা বলিল, "ওকে এক পায়ে দাঁড়াতে বলেছিল না ভাই?" গণেশ বলিল, "কক্ষনো না, খালি দাঁড়া বলেছে।" বিশু বলিল, "এক আঙুল তুলে দেখিয়েছিল, তার মানেই এক পায়ে দাঁড়া।" পণ্ডিতমশাই যে ধমক দিবার সময় তর্জনী তুলিয়াছিলেন, এ কথা গণেশ অস্বীকার করিতে পারিল না। বিশু আর ভোলা জেদ করিতে লাগিল, "শিগগির এক পায়ে দাঁড়া বলছি, তা না হলে এক্ষুনি বলে দিচ্ছি।"

গণেশ বেচারা ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি এক পা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অমনি ভোলা আর বিশুর মধ্যে তুমুল তর্ক বাঁধিয়া গেল। এ বলে ডান পায়ে দাঁড়ানো উচিত ; ও বলে, না, আগে বাঁ পা। গণেশ বেচারার মহা মুশকিল! সে আবার পণ্ডিতমশাইকে জিজ্ঞাসা করিতে গেল, "পণ্ডিতমশাই, কোন্ পা?"

পণ্ডিতমশাই তখন কি যেন একটা স্বপ্ন দেখিয়া অবাক হইয়া নাক ডাকাইতেছিলেন। গণেশের ডাকে হঠাৎ তন্দ্রা ছুটিয়া যাওয়ায় তিনি সাংঘাতিক রকম বিষম খাইয়া ফেলিলেন। গণেশ বেচারা তার প্রশ্নের এ রকম জবাব একেবারেই কল্পনা করে নাই, সে ভয় পাইয়া বলিল, "ঐ যা! কি হবে?" ভোলা বলিল, "দৌড়ে জল নিয়ে আয়।" বিশু বলিল, "শিগ্‌গির মাথায় জল দে।" গণেশ এক দৌড়ে কোথা হইতে একটা কুঁজা আনিয়া ঢক্‌ঢক্ করিয়া পণ্ডিতমশায়ের টাকের উপর জল ঢালিতে লাগিল। পণ্ডিতমশায়ের বিষম খাওয়া খুব চট্‌পট্ থামিয়া গেল, কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া গণেশের হাতে জলের কুঁজা ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

ভয়ে সকলেই খুব গম্ভীর হইয়া রহিল, খালি শ্যামলাল বেচারার মুখটাই কেমন যেন আহ্লাদী গোছের হাসি হাসি মতো, সে কিছুতেই গম্ভীর হইতে পারিল না। পণ্ডিতমশায়ের রাগ হঠাৎ তার উপরেই ঠিক্‌রাইয়া পড়িল। তিনি বাঘের মতো গুম্‌গুমে গলায় বলিলেন, "উঠে আয়!" শ্যামলাল ভয়ে কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "আমি কি করলাম? গণশা জল

ঢাল্‌ল, তা আমার দোষ কি?" পণ্ডিতমশাই মানুষ ভালো, তিনি শ্যামলালকে ছাড়িয়া গণশার দিকে তাকাইয়া দেখেন তাহার হাতে তখনও জলের কুঁজা। গণেশ কোনো প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়াই বলিয়া ফেলিল, "ভোলা আমাকে বলেছিল।" ভোলা বলিল, "আমি তো খালি জল আনতে বলেছিলাম। বিশু বলেছিল, মাথায় ঢেলে দে।" বিশু বলিল, "আমি কি পণ্ডিতমশায়ের মাথায় দিতে বলেছি? ওর নিজের মাথায় দেওয়া উচিত ছিল., তাহলে বুদ্ধিটা ঠাণ্ডা হত।"

পণ্ডিতমশাই খানিকক্ষণ কটমট করিয়া সকলের দিকে তাকাইয়া তারপর বলিলেন, "যা! তোরা ছেলেমানুষ তাই কিছু বললাম না। খবরদার আর অমন করিসনে।" সকলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, কিন্তু পণ্ডিতমশাই কেন যে হঠাৎ নরম হইয়া গেলেন কেহই তাহা বুঝিল না। পণ্ডিতমশায়ের মনে হঠাৎ যে তাঁর নিজের ছেলেবেলার কোন দুষ্টুমির কথা মনে পড়িয়া গেল, তাহা কেবল তিনিই জানেন।

কালাচাঁদের ছবি

কালাচাঁদ নিধিরামকে মারিয়াছে—তাই নিধিরাম হেডমাস্টার মশায়ের কাছে নালিশ করিয়াছে। হেডমাস্টার আসিয়া বলিলেন, "কি হে কালাচাঁদ, তুমি নিধিরামকে মেরেছ?" কালাচাঁদ বলিল, "আজ্ঞে না, মারব কেন? কান মলে দিয়েছিলাম, গালে খামচিয়ে দিয়েছিলাম, আর একটুখানি চুল ধরে ঝাঁকিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলাম।" হেডমাস্টার বলিলেন, "কেন ওরকম করেছিলে?" কালাচাঁদ খানিকটা আমতা আমতা করিয়া মাথা চুলকাইয়া বলিল, "আজ্ঞে, ও খালি খালি আমায় চটাচ্ছিল।" হেডমাস্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমায় মেরেছিল?" "না।" "তোমায় গাল দিয়েছিল?" "না। বারবার ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে বোকার মতো কথা বলছিল, তাই, আমার রাগ হয়ে গেল।" মাস্টার মহাশয় তাহার কান ধরিয়া বেশ ভালোরকম নাড়াচাড়া দিয়া বলিলেন, "মেজাজটা এখন হইতে একটু সংশোধন করিতে চেষ্টা কর।"

ছুটির পর আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাঁরে কালাচাঁদ, তুই খামকা ঐ নিধেটাকে মারতে গেলি কেন?" কালাচাঁদ বলিল, "খামকা মারব কেন? কেন মেরেছিলাম ওকেই জিজ্ঞেস কর না!" নিধেকে জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল, "খামকা নয় তো কি? তুই বাপু ছবি এঁকেছিস—তার কথা আমায় জিজ্ঞাসা করতে গেলি কেন? আর যদি জিগ্গেস করলি, তাহলে তাই নিয়ে আবার মারামারি করতে এলি কেন?" আমরা বলিলাম, "আরে কি হয়েছে খুলেই বল্ না কেন।"

নিধিরাম বলিল, "কালাচাঁদ একটা ছবি এঁকেছে—ছবির নাম 'খাণ্ডব দাহন'। সেই ছবিটা আমায় দেখিয়ে ও জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন হয়েছে?' আমি বললাম, 'এটা কি এঁকেছ? মন্দিরের সামনে শেয়াল ছুটছে?' কালাচাঁদ বলল, 'না, না, মন্দির কোথায়? ওটা হল রথ। আর এগুলো তো শেয়াল নয়—রথের ঘোড়া।' আমি বললাম, 'সূর্যটাকে কালো করে এঁকেছ কেন? আর তালগাছের উপর পদ্মফুল ফুটেছে কেন? আর ঐ চামচিকেটা লাঠি নিয়ে ডিগবাজি খাচ্ছে কেন?' কালাচাঁদ বলল 'আহা তা কেন? ওটা তো সূর্য নয়, সুদর্শন চক্র। দেখছ না কৃষ্ণের হাতে রয়েছে? আর তালগাছ কোথায় দেখলে? ওটা তো অর্জুনের পতাকা! আর ঐগুলোকে বুঝি পদ্মফুল বলছ? ওগুলো দেবতা—খুব দূরে আছেন কিনা তাই ওরকম ছোট ছোট দেখাচ্ছে। আর এইটা বুঝি চামচিকে হল, এটা তো গরুড়পাখি! একটা সাপকে তাড়া করছে।' আমি বললাম, 'তা হবে। আমি ও সব বুঝিটুঝি না। আচ্ছা, ঐ ঝাপসা কাপড় পড়া মেয়েমানুষটি যে ওদের মারতে আসছে, ওটি কে?' কালাচাঁদ বলল, 'তুমি তো আচ্ছা মুখ্যু হে! ওটা বনে আগুন লেগে ধোঁয়া বেরুচ্ছে বুঝতে পাচ্ছ না? অবাক করলে যে!'

"তখন আমি বললাম, 'আচ্ছা এক কাজ কর না কেন ভাই, ওটাকে খাণ্ডব দাহন না করে সীতার অগ্নিপরীক্ষা কর না কেন? ঐ গাছটাকে শাড়ি পরিয়ে সীতা করে দাও। ঐ রথটার মাথায় জটা-টটা দিয়ে ওকে অগ্নিদেব বানাও। কৃষ্ণ অর্জুন আছেন তাঁরা হবেন রাম লক্ষ্মণ। আর ঐ সুদর্শন চক্রে নাক হাত পা জুড়ে দিলেই ঠিক বিভীষণ হয়ে যাবে।

তারপর চামচিকের পিছনে একটা লম্বা ল্যাজ দিয়ে তার ডানা দুটো মুছে দাও—ওটা হনুমান হবে এখন।' কালাচাঁদ বলল, 'হনুমানও হতে পারে, নিধিরামও হতে পারে।'

"আমি বললাম, 'তাহলে ভাই, আর এক কাজ কর। ওটাকে শিশুপাল-বধ করে দাও। তাহলে কৃষ্ণকে বদলাতে হবে না। চক্র তুলে শিশুপালকে মারতে যাচ্ছে। অর্জুনের মুখে পাকা গোঁফ দাড়ি দিয়ে খুব সহজেই ভীষ্ম করে দেওয়া যাবে। আর রথটা হবে সিংহাসন, তার উপর যুধিষ্ঠিরকে বসিয়ে দিও। আর ঐ যে গরুড় আর সাপ, ঐটে একটু বদলিয়ে দিলেই গদা হাতে ভীম হয়ে যাবে। আর শিশুপাল তো আছেই—ঐ গাছটাতে একটু নাক-মুখ ফুটিয়ে দিলেই হবে। তারপর রাজসূয় যজ্ঞের কয়েকটা রাজাকে দেখালেই বাস্!' কথাটা কালাচাঁদের পছন্দ হল না, তাই আমি অনেক ভেবেচিন্তে আবার বললাম, 'তাহলে জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ কর না কেন? ঐ রথটা হবে জন্মেজয় আর কৃষ্ণকে জটা দাড়ি দিয়ে পুরুতঠাকুর বানিয়ে দাও। সুদর্শন চক্রটা হবে ঘিয়ের ভাঁড়। যজ্ঞের আগুনের মধ্যে তিনি ঘি ঢালছেন। ঐ ধোঁয়াগুলো মনে কর যজ্ঞেরই ধোঁয়া! একটা সাপ আছে, আরও কয়েকটা এঁকে দিও। আর অর্জুনকে কর আস্তীক, সে হাত তুলে তক্ষককে বলছে—তিষ্ঠ, তিষ্ঠ। আর ঐ চামচিকেটা—মানে গরুড়টা, ওটাকে মুনি-টুনি কিছু একটা বানিয়ে দিও।' পতাকাটাকে কি রকম করতে হবে সেইটা বলতে যাচ্ছি, এমন সময় কালাচাঁদ আমায় ধাক্কা দিয়ে বলল, 'থাক, থাক, আর তোমার বিদ্যে জাহির করে কাজ নেই! সর দেখি।'

"আমি বললাম, 'তা অত রাগ কর কেন ভাই? আমি তো আর বলছি না যে আমার পরামর্শ মতো তোমাকে চলতেই হবে। পছন্দ হয় কর, না হয়তো কোরো না, বাস্। এর মধ্যে আবার রাগারাগি কর কেন? আমার কথামতো না করে অন্য একটা কিছু কর না। মনে কর, ওটাকে সমুদ্র-মন্থন করে দিলেও তো হয়। ঐ ধোঁয়াওয়ালা বড় গাছটা মন্দার পর্বত, রথটা ধন্বন্তরী কিম্বা লক্ষ্মী—মন্থন থেকে উঠে এসেছেন। ওদিকে সুদর্শন চক্রটা চাঁদ হতে পারবে। অর্জুনের পিছনে কতগুলো দেবতা এঁকে দাও আর এদিকে কৃষ্ণ আর চামচিকের দিকে কতগুলো অসুর'—কথাটা ভালো করে বলতে না বলতেই কালাচাঁদ আমার কান ধরে টানতে লাগল। আচ্ছা, দেখ দেখি কি অন্যায়! আমি বন্ধুভাবে দুটো পরামর্শ দিতে গেলাম—তা তোমার পছন্দ হয়নি বলেই আমায় মারবে? যা বলেছি সব শুনলে তো, এর মধ্যে এত রাগ করবার কি হল বাপু?"

বাস্তবিক, কালাচাঁদের এ বড় অন্যায়! সে রাগ করিল কিসের জন্য? নিধিরাম তাহাকে মারে নাই, ধরে নাই, বকে নাই, গাল দেয় নাই, চোখ রাঙায় নাই, মুখ ভ্যাংচায় নাই—তবে রাগ করিবার কারণটা কি?

গোপালের পড়া

দুপুরের খাওয়া শেষ হইতেই গোপাল অত্যন্ত ভালোমানুষের মতন মুখ করিয়া দু-একখানা পড়ার বই হাতে লইয়া তিনতলায় চলিল। মামা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে গোপলা, এই দুপুর রোদে কোথায় যাচ্ছিস?" গোপাল বলিল, "তিনতলায় পড়তে যাচ্ছি।"

মামা—"পড়বি তো তিনতলায় কেন? এখানে বসে পড় না।"

গোপাল—"এখানে লোকজন যাওয়া-আসা করে, ভোলা গোলমাল করে, পড়বার সুবিধা হয় না।"

মামা—"আচ্ছা, যা মন দিয়ে পড়গে।"

গোপাল চলিয়া গেল, মামাও মনে মনে একটু খুশি হইয়া বলিলেন, "যাক, ছেলেটার পড়াশুনায় মন আছে।"

এমন সময় ভোলাবাবুর প্রবেশ—বয়স তিন কি চার, সকলের খুব আদুরে। সে আসিয়াই বলিল, "দাদা কই গেল?" মামা বলিলেন, "দাদা এখন তিনতলায় পড়াশুনা করছে, তুমি এইখানে বসে খেলা কর।"

ভোলা তৎক্ষণাৎ মেঝের উপর বসিয়া প্রশ্ন আরম্ভ করিল, 'দাদা কেন পড়াশুনা করছে, পড়াশুনা করলে কি হয়? কি করে পড়াশুনা করে?' ইত্যাদি। মামার তখন কাগজ পড়িবার ইচ্ছা, তিনি প্রশ্নের চোটে অস্থির হইয়া শেষটায় বলিলেন, "আচ্ছা ভোলাবাবু, তুমি ভোজিয়ার সঙ্গে খেলা কর গিয়ে, বিকেলে তোমায় লজেঞ্চুস এনে দেব।" ভোলা চলিয়া গেল।

আধঘণ্টা পরে ভোলাবাবুর পুনঃপ্রবেশ। সে আসিয়াই বলিল, "মামা, আমিও পড়াশুনা করব।"

মামা বলিলেন, "বেশ তো আর একটু বড় হও, তোমার রঙচঙে সব পড়ার বই কিনে এনে দেব।"

ভোলা—"না, সে রকম পড়াশুনা নয়, দাদা যে রকম পড়াশুনা করে সেইরকম।"

মামা—"সে আবার কি রে?"

ভোলা—"হ্যাঁ, সেই যে পাতলা-পাতলা রঙিন কাগজ থাকে আর কাঠি থাকে, আর কাগজে আঠা মাখায় আর তার মধ্যে কাঠি লাগায়, সেই রকম।"

দাদার পড়াশুনার বর্ণনা শুনিয়া মামার চক্ষু স্থির হইয়া গেল! তিনি আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া তিনতলায় উঠিলেন, চুপি চুপি ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, তাঁর ধনুর্ধর ভাগ্নেটি জানালার সামনে বসিয়া একমনে ঘুড়ি বানাইতেছে। বই দুটি ঠিক দরজার কাছে তক্তপোশের উপরে পড়িয়া আছে। মামা অতি সাবধানে বই দুখানা দখল করিয়া নিচে নামিয়া আসিলেন।

খানিক পরেই গোপালচন্দ্রের ডাক পড়িল। গোপাল আসিতেই মামা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর ছুটির আর কদিন বাকি আছে?"

গোপাল বলিল, "আঠারো দিন।"

মামা—"বেশ পড়াশুনা করছিস তো? না, কেবল ফাঁকি দিচ্ছিস?"

গোপাল—"না, এইতো এতক্ষণ পড়ছিলাম।"

মামা—"কি বই পড়ছিলি?"

গোপাল—"সংস্কৃত।"

মামা—"সংস্কৃত পড়তে বুঝি বই লাগে না? আর অনেকগুলো পাতলা কাগজ, আঠা আর কাঠি নিয়ে নানারকম কারিকুরি করার দরকার হয়?"

গোপালের চক্ষু তো স্থির! মামা বলে কি? সে একেবারে হতভম্ব হইয়া হাঁ করিয়া মামার দিকে তাকাইয়া রহিল। মামা বলিলেন, "বই কোথায়?"

গোপাল বলিল, "তিনতলায়।"

মামা বই বাহির করিয়া বলিলেন, "এগুলো কি?" তারপর তাহার কানে ধরিয়া ঘরের এক কোণে বসাইয়া দিলেন। গোপালের ঘুড়ি লাটাই সুতো ইত্যাদি সরঞ্জাম আঠারো দিনের জন্য মামার জিম্মায় বন্ধ রহিল।

পেটুক

'হরিপদ! ও হরিপদ!'

হরিপদর আর সাড়া নেই! সবাই মিলে এত চেঁচাচ্ছে, হরিপদ আর সাড়াই দেয় না। কেন, হরিপদ কালা নাকি? কানে কম শোনে বুঝি? না, কম শুনবে কেন—বেশ দিব্যি পরিষ্কার শুনতে পায়। তবে হরিপদ কি বাড়ি নেই? তা কেন? হরিপদর মুখ ভরা ক্ষীরের লাড়ু, ফেলতেও পারে না, গিলতেও পারে না। কথা বলবে কি করে? আবার ডাক শুনে ছুটে আসতেও পারে না—তাহলে যে ধরা পড়ে যাবে। তাই সে তাড়াতাড়ি লাড়ু গিলছে আর জল খাচ্ছে, আর যতই গিলতে চাচ্ছে ততই গলার মধ্যে লাড়ুগুলো আঠার মতো আটকে যাচ্ছে। বিষম খাবার যোগাড় আর কি!

এটা কিন্তু হরিপদর ভারি বদভ্যাস! এর জন্য কত ধমক, কত শাসন, কত শাস্তি, কত সাজাই যে সে পেয়েছে, তবু তার আক্কেল হল না। তবু সে লুকিয়ে চুরিয়ে পেটুকের মতো খাবেই। যেমন হরিপদ তেমনি তার ছোট ভাইটি। এদিকে পেটরোগা, দুদিন অন্তর অসুখ লেগেই আছে, তবু হ্যাংলামি তার আর যায় না। যেদিন শাস্তিটা একটু শক্ত রকমের হয় তারপর কয়েক দিন ধরে প্রতিজ্ঞা থাকে, 'এমন কাজ আর করব না।' যখন অসময়ে অখাদ্য খেয়ে, রাত্রে তার পেট কামড়ায়, তখন কাঁদে আর বলে, 'আর না, এইবারেই শেষ!' কিন্তু দুদিন না যেতেই আবার যেই সেই। এই তো কিছুদিন আগে পিসিমার ঘরে দই খেতে গিয়ে তারা জব্দ হয়েছিল, কিন্তু তবু তো লজ্জা নেই!

হরিপদর ছোট ভাই শ্যামাপদ এসে বলল, "দাদা, শিগ্‌গির এস। পিসিমা এই মাত্র এক হাঁড়ি দই নিয়ে তাঁর খাটের তলায় লুকিয়ে রাখলেন।" দাদাকে এত ব্যস্ত হয়ে এ-খবরটা দেবার অর্থ এই যে, পিসিমার ঘরে যে শিকল দেওয়া থাকে, শ্যামাপদ সেটা হাতে নাগাল পায় না—তাই দাদার সাহায্য দরকার হয়। দাদা এসে আস্তে আস্তে শিকলটা খুলে, আগেই তাড়াতাড়ি গিয়ে খাটের তলায় দইয়ের হাঁড়ি থেকে এক খাবল তুলে নিয়ে খপ করে মুখে দিয়েছে। মুখে দিয়েই চিৎকার! কথায় বলে 'ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে,' কিন্তু হরিপদর চেঁচানো তার চাইতেও সাংঘাতিক! চিৎকার শুনে মা-মাসি-দিদি-পিসি যে যেখানে ছিলেন সব 'কি হল' 'কি হল' বলে দৌড়ে এলেন। শ্যামাপদ বুদ্ধিমান ছেলে, সে দাদার চিৎকারের নমুনা শুনেই দৌড়ে ঘোষেদের পাড়ায় গিয়ে হাজির! সেখানে অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো তার বন্ধু শান্তি ঘোষের কাছে পড়া বুঝে নিচ্ছে। এদিকে হরিপদর অবস্থা দেখে পিসিমা বুঝেছেন যে, হরিপদ দই ভেবে তাঁর চুনের হাঁড়ি চেখে বসেছে! তারপর হরিপদর যা সাজা! এক সপ্তাহ ধরে সে না পারে চিবোতে, না পারে গিলতে! তার খাওয়া নিয়েই এক মহা হাঙ্গামা! কিন্তু তবু তো তার লজ্জা নেই—আজ আবার লুকিয়ে কোথায় লাড়ু খেতে গিয়েছে। ওদিকে মামা তো ডেকে ডেকে সারা!

খানিক বাদে মুখ ধুয়ে মুছে হরিপদ ভালোমানুষের মতো এসে হাজির। হরিপদর বড়মামা বললেন, "কিরে, এতক্ষণ কোথায় ছিলি?" হরিপদ বলল, "এইতো, উপরে ছিলাম।" "তবে, আমরা এত চেঁচাচ্ছিলাম, তুই জবাব দিচ্ছিলি না যে?" হরিপদ মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, "আজ্ঞে, জল খাচ্ছিলাম কিনা।" "শুধু জল? না, কিছু স্থলও ছিল?"

হরিপদ শুনে হাসতে লাগল যেন তার সঙ্গে ভারি একটা রসিকতা করা হয়েছে। এর মধ্যে তার মেজমামা মুখখানা গম্ভীর করে এসে হাজির। তিনি ভিতর থেকে খবর এনেছেন যে, হরিপদ একটু আগেই ভাঁড়ার ঘরে ঢুকেছিল, আর তারপর থেকেই প্রায় দশ-বারোখানা ক্ষীরের লাড়ু কম পড়ছে। তিনি এসেই হরিপদর বড়মামার সঙ্গে খানিকক্ষণ ইংরাজিতে ফিস্‌ফাস্ কি যেন বলাবলি করলেন, তারপর গম্ভীরভাবে বললেন "বাড়িতে ইঁদুরের যে রকম উৎপাত, ইঁদুর মারবার একটা কিছু বন্দোবস্ত না করলে আর চলছে না। চারদিকে যে রকম প্লেগ আর ব্যারাম—এই পাড়া সুদ্ধ ইঁদুর না মারলে আর রক্ষা নেই।" বড়মামা বললেন, "হ্যাঁ, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দিদিকে বলেছি, সেঁকো বিষ দিয়ে লাড়ু পাকাতে—সেইগুলো একবার ছড়িয়ে দিলেই ইঁদুর বংশ নির্বংশ হবে!" হরিপদ জিজ্ঞেস করল, "লাড়ু কবে পাকানো হবে?" বড়মামা বললেন, "সে এতক্ষণে হয়ে গেছে, সকালেই টেঁপিকে দেখছিলাম একতাল ক্ষীর নিয়ে দিদির সঙ্গে লাড়ু পাকাতে বসেছে।" হরিপদর মুখখানা আমসির মতো শুকিয়ে এল, সে খানিকটা ঢোঁক গিলে বলল, "সেঁকো বিষ খেলে কি হয় বড়মামা?" "হবে আবার কি? ইঁদুরগুলো মারা পড়ে, এই হয়।" "আর যদি মানুষে এই লাড়ু খেয়ে ফেলে?" "তা একটু আধটু যদি খেয়ে ফেলে তো নাও মরতে পারে—গলা জ্বলবে, মাথা ঘুরবে, বমি হবে, হয়তো হাত-পা খিঁচবে।" "আর যদি একেবারে এগারোটা লাড়ু খেয়ে ফেলে?" বলে হরিপদ ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। তখন বড়মামা হাসি চেপে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, "বলিস কিরে! তুই খেয়েছিস নাকি?" হরিপদ কাঁদতে কাঁদতে বলল, "হ্যাঁ বড়মামা, তার মধ্যে পাঁচটা খুব বড় ছিল। তুমি শিগ্‌গির ডাক্তার ডাক বড়মামা, আমার কি রকম গা ঝিম্‌ঝিম্ আর বমি বমি করছে।"

মেজমামা দৌড়ে গিয়ে তার বন্ধু রমেশ ডাক্তারকে পাশের বাড়ি থেকে ডেকে আনলেন। তিনি প্রথমেই খুব একটা কড়া রকমের তেতো ওষুধ হরিপদকে খাইয়ে দিলেন। তারপর তাকে কি একটা শুঁকতে দিলেন, তার এমন ঝাঁঝ যে, বেচারার দুই চোখ দিয়ে দর্‌দর্ করে জল পড়তে লাগল। তারপর তাঁরা সবাই মিলে লেপ কম্বল চাপা দিয়ে তাকে ঘামিয়ে অস্থির করে তুললেন। তারপর একটা ভয়ানক উৎকট ওষুধ খাওয়ানো হল। সে এমন বিস্বাদ আর এমন দুর্গন্ধ যে, খেয়েই হরিপদ ওয়াক ওয়াক করে বমি করতে লাগল।

তারপর ডাক্তার তার পথ্যের ব্যবস্থা করে গেলেন। তিনদিন সে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না, চিরেতার জল আর সাগু খেয়ে থাকবে। হরিপদ বলল, "আমি উপরে মা-র কাছে যাব।" ডাক্তার বললেন, "না। যতক্ষণ বাঁচবার আশা আছে ততক্ষণ নাড়াচাড়া করে কাজ নেই। ও আপনাদের এখানেই থাকবে।" বড়মামা বললেন, "হ্যাঁ, মা-র কাছে যাবে না আরো কিছু! মাকে এখন ভাবিয়ে তুলে তোমার লাভ কি? তাঁকে এখন খবর দেবার কিছু দরকার নেই।"

তিনদিন পরে যখন সে ছাড়া পেল তখন হরিপদ আর সেই হরিপদ নেই, সে একেবারে বদলে গেছে। তার বাড়ির লোকে সবাই জানে হরিপদর ভারি ব্যারাম হয়েছিল। তার মা জানেন যে বেশি পিঠে খেয়েছিল বলে হরিপদর পেটের অসুখ হয়েছিল। হরিপদ জানে সেঁকো বিষ খেয়ে সে আরেকটু হলেই মারা যাচ্ছিল। কিন্তু আসল ব্যাপারটা যে কি, তা জানেন কেবল হরিপদর বড়মামা আর মেজমামা, আর জানেন রমেশ ডাক্তার—আর এখন জানলে তোমরা, যারা এই গল্প পড়েছ।

ভুল গল্প

এই গল্পের মধ্যে ইচ্ছা করিয়া কতগুলি ভুল বর্ণনা করা হইয়াছে। কোথাও হয়ত এমন কথাও লেখা হইয়াছে যাহা একেবারেই অসম্ভব; অথবা এক জায়গায় যাহা লেখা হইয়াছে অন্য জায়গায় তাহারই উল্টা কথা বলা হইয়াছে—একটা ঠিক হইলে আর একটা ঠিক হইতেই পারে না। দেখ তো এই রকম ভুল কতগুলি বাহির করিতে পার।

রামবাবু লোকটি যেমন কৃপণ, তাঁর প্রতিবেশী বৃন্দাবনচন্দ্রের আবার তেমনি হাত খোলা। দুজনের বহুকালের বন্ধুতা, অথচ কি চেহারায়, কি স্বভাব-প্রকৃতিতে কোথাও দুজনের মিল নেই। বৃন্দাবন বেঁটেখাটো গোলগাল গোছের মানুষ, তাঁর মাথা ভরা টাক, গোঁফদাড়ি সব কামানো। ছাপ্পান্ন বছর অতি প্রশংসার সঙ্গে রেজেস্ট্রি অফিসে চাকরি করে শেষদিকে তাঁর খুব পদোন্নতি হয়েছিল ; এখন ষাট বছর বয়সে তিনি সবে মাত্র পেন্‌সন নিয়ে বিশ্রাম করছেন। তিনি, তাঁর গিন্নি, আর এক বুড়ো জ্যেঠামশাই, এ-ছাড়া ত্রিসংসারে তাঁর আর কেউ নেই। জ্যেঠামশাই বিয়েটিয়ে করেননি, বৃন্দাবনের সঙ্গেই থাকেন। রামপ্রসাদ সান্যাল লোকটি ছিপছিপে লম্বা ; পোস্টমাস্টার প্রাণশঙ্কর ঘোষ ছাড়া তেমন ঢ্যাঙা লোক সে পাড়াতে আর খুঁজে পাবে না। এক অক্ষর ইংরাজি জানেন না, কিন্তু মার্বেল পাথর আর পাটের তেলের ব্যবসা করে তিনি প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি করেছেন, দেশে জমিদারী কিনেছেন আর নানারকম কারখানার অংশীদার হয়ে বসেছেন। তাঁর আটটি ছেলে, কিন্তু মেয়ে একটিও হল না বলে তাঁর ভারি দুঃখ। প্রকাণ্ড কপাল, তার উপর একরাশ চুল, মুখে লম্বা লম্বা দাড়ি আর চোখে হাল-ফ্যাশানের ফ্রেম-ছাড়া চশমা, কানের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই, কেবল নাকের উপর স্প্রিং দিয়ে এঁটে বসানো। মোট কথা, দেখলেই বোঝা যায় যে মানুষটি কম কেউকেটা নন।

প্রতিদিন সন্ধ্যা হতেই পাড়ার মাতব্বর বাবুরা সবাই রামবাবুর বৈঠকখানা ঘরে এসে জোটেন, আর পান-তামাক-চা-বিস্কুট-সন্দেশ ইত্যাদির সঙ্গে খুব হাসি-তামাশা গল্পগুজব চলতে থাকে। বৈঠকখানা ঘরটি বেশ বড়, মেঝের উপর প্রকাণ্ড ফরাশ পাতা, তার উপর কতকগুলো মোটাসোটা তাকিয়া আর রঙচঙে হাত-পাখা এদিক ওদিক ছড়ানো। তাছাড়া ঘরের মধ্যে কোথাও চেয়ার-টেবিল বা কোনোরকম আসবাবপত্র একেবারেই নেই। পোস্টমাস্টার বাবু, হরিহর ডাক্তার, যতীশ রায় হেডমাস্টার, ইনস্পেকটার বাঁড়ুয্যে প্রভৃতি অনেকেই সেখানে প্রায় প্রতিদিন আসেন। বৃন্দাবন বসু বড়ো লাজুক লোক প্রথম প্রথম সেদিকে বড় একটা ঘেঁষতেন না। সে-পাড়ায় তিনি সবে নতুন এসেছেন কারও সঙ্গে আলাপ পরিচয় নেই, খালি পোস্টমাস্টারবাবুর সঙ্গে একটু জানাশোনা। যা হোক, পোস্টমাস্টারবাবু নাছোড়বান্দা লোক, তিনি বড়দিনের ছুটির মধ্যে এক রবিবার একরকম জোর করেই তাঁকে রামবাবুর বাড়ি নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন। প্রথমদিনের পরিচয়েই দুজনের আলাপ এমন জমে উঠল যে তারপর থেকে রামবাবুর বৈঠকে যাবার জন্য বৃন্দাবনচন্দ্রকে আর কোনো তাগিদ দেওয়ার দরকার হত না।

এই ঘটনার সাতদিন পরে একদিন রামবাবুর বৈঠক খুব জমেছে। মানুষকে চিনতে

না পারার দরুন কত সময়ে কত অদ্ভুত ভুল হয়, তাই নিয়ে বেশ কথাবার্তা চলছে। হরিহরবাবু বললেন, "আমি একবার যা ফ্যাসাদে পড়েছিলাম, সে বোধহয় আপনাদের বলিনি। সে প্রায় বিশ বছরের কথা। একদিন সন্ধ্যার সময় খাওয়া দাওয়া সেরে একটু শিগ্‌গির শিগ্‌গির ঘুমব ভাবছি, এমন সময়ে আমার ডিসপেনসারির চাকরটা এসে খবর দিল, প্রমথবাবু এসেছেন। প্রমথ মিত্তির তখন তার মাথার ব্যারামের জন্য আমাকে দিয়ে চিকিৎসা করাত। সেদিন কথা ছিল, আমি তার জন্য একটা মিকস্‌চার তৈরি করিয়ে রাখব, সে সন্ধ্যার সময় সেটা নিয়ে যাবে। তাই চাকর এসে খবর দিতেই আমি ওষুধের শিশিটা তার হাতে দিয়ে সেই সঙ্গে একটা কাগজে লিখে দিলাম, 'ওষুধটা এখুনি এক দাগ খাবেন। দুর্বল মস্তিষ্কের পক্ষে কোনোরকম মানসিক পরিশ্রম বা উত্তেজনা ভালো নয়, এ-কথা সর্বদা মনে রাখবেন। তাহলেই আপনার মাথার ব্যারাম শিগ্‌গির সারবে।' মিনিট খানেক যেতে না যেতেই চাকরটা ঘুরে এসে খবর দিল যে বাবুটি চিঠি পড়ে বেজায় খাপ্পা হয়েছেন এবং দাওয়াইয়ের শিশিটি ভেঙে আমায় গাল দিতে দিতে প্রস্থান করেছেন। শুনে তো আমার চক্ষুস্থির! যা হোক, ব্যাপারটা পরিষ্কার হতে বেশি দেরি হল না। একটু সন্ধান করতেই বোঝা গেল যে, লোকটি মোটেই প্রমথ মিত্তির নন, আমারই মামাশ্বশুর, বাঁশবেড়ের প্রমথ নন্দী। যেরকম বদমেজাজী লোক, সেই রাত্রেই আমায় ছুটতে হল বুড়োর তোয়াজ করবার জন্য। বুড়ো কি সহজে ঠাণ্ডা হয়! তাঁকে অপমান করা, বা তাঁর সঙ্গে ইয়ার্কি করা যে আমার মোটেই অভিপ্রায় ছিল না এবং ওষুধটা কিম্বা চিঠিটা যে তাঁর জন্য দেওয়া হয়নি, এই সহজ কথাটি তাঁর মাথায় ঢোকাতে প্রায় দুটি ঘণ্টা সময় লেগেছিল। এদিকে বাসায় ফিরে শুনি প্রমথ মিত্তির এসে তার ওষুধ তৈরি না পেয়ে খুব বিরক্ত হয়ে চলে গেছে। পরদিন সকালে আবার তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করি।"

এই গল্প শুনে ইনস্পেকটারবাবু বললেন, "আপনার তো, মশাই, অল্পের উপর দিয়ে গেল, আমার ঐ রকম একটা ভুলের দরুন চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়েছিল। সেও বহুদিনের কথা, তখন আমি সবেমাত্র পুলিসের চাকরি নিয়েছি। ঘোষপুরের বাজার নিয়ে সে সময়ে সুদাস মণ্ডলের সঙ্গে রায়বাবুদের খুব ঝগড়া চলছে। একদিন বিকেলে খবর পাওয়া গেল, আজ সন্ধ্যার পর সুদাস লাঠিয়াল নিয়ে বাজার দখল করতে আসবে। ইনস্পেকটার যোগীনবাবুর হুকুমে আমি ছয়জন কনস্টেবল নিয়ে সন্ধ্যার কাছাকাছি ঘোষপুরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না ; সন্ধ্যার একটু পরেই দেখলাম নদীর দিক থেকে কিসের আলো আসছে। মনে হচ্ছে কারা যেন কাঁঠালতলায় বসে বিশ্রাম করছে। ব্যাপার কি দেখবার জন্য আমি খুব সাবধানে একটা ঝোপের আড়াল পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি একটা মশালের ঝাপসা আলোয় লাঠি হাতে কয়েকটা লোক বসে আছে, আর এক পালকির আড়ালে দুজন লোক কথাবার্তা বলছে। কান পেতে শুনলাম একজন বলল, 'সুদাসদা, কতদূর এলাম?' উত্তর হল, 'এই তো ঘোষপুরের বাজার দেখা যাচ্ছে।' অম্নি আর কথা নেই! আমি জোরে শিস্ দিতেই সঙ্গের পুলিশগুলো মার-মার করে তেড়ে এসেছে। পুলিশের সাড়া পাবামাত্র সুদাসের লোকগুলো 'বাপরে মারে' করে কে যে কোথায় সরে পড়ল তা আর ধরতেই পারা গেল না। কিন্তু পালকির কাছে যে দুটো লোক ছিল,

তারা খুব সহজেই ধরা পড়ে গেল। তাদের একজনের বয়েস অল্প, চেহারাটা গোঁয়ারগোবিন্দ গোছের—বুঝলাম এই সুদাস মণ্ডল। সে আমায় তেড়ে কি যেন বলতে উঠেছিল, আমি এক ধমক লাগিয়ে বললাম, 'হাতে হাতে ধরা পড়েছ বাপু, এখন রোখ করে কোনো লাভ নেই, কিছু বলবার থাকে তো থানায় গিয়ে ব'লো।' শুনে তার সঙ্গের বুড়ো লোকটা ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে খানিকক্ষণ অনর্গল কি যে বকে গেল আমি তার কিছুই বুঝলাম না, খালি বুঝলাম যে সে আমাকে তার 'সুদাসদা'র পরিচয় বোঝাচ্ছে। আমি বললাম, 'অত পরিচয় শুনবার আমার দরকার নেই, আসল পরিচয়টা আজ ভালোরকমই পেয়েছি।' তারপর তাদের হাতকড়া পরিয়ে মহা ফুর্তিতে তো থানায় এনে হাজির করা গেল। তারপর মশাই যা কাণ্ড! হেড ইনস্পেকটার যতীনবাবু রাগে আগুনের মতো লাল হয়ে, টেবিল থাবড়িয়ে, দোয়াত উলটিয়ে, কাগজ কলম ছুঁড়ে আমায় খুব সহজেই বুঝিয়ে দিলেন যে আমি একটি আস্ত রকমের হস্তীমূর্খ ও অর্বাচীন পাঁঠা। যে লোকটিকে ধরে এনেছি সে মোটেই সুদাস মণ্ডল নয়, তার নাম সুবাসচন্দ্র বোস ; সে যতীনবাবুরই জামাই, সঙ্গের লোকটি তার ঠাকুরদার আমলের চাকর ; যতীনবাবুর কাছেই তারা আসছিল। আমার বুদ্ধিটা হাঁ-করা বোয়াল মাছের মতো না হলে, আমি সুবাস শুনতে কখনই সুদাস শুনতাম না—ইত্যাদি। অনেক কষ্টে অনেক খোশামুদি করে, অনেক হাতে পায়ে ধরে, সে যাত্রায় চাকরিটা বজায় রাখতে হয়েছিল।"

ইনস্পেকটারের গল্প শেষ হতেই বৃন্দাবনচন্দ্র টিকি দুলিয়ে বললেন, "আপনাদের গল্প শুনে আমারও একটা গল্প মনে পড়ে গেল। সেও ঐরকম 'উদোর-বোঝা-বুদোর-ঘাড়ে' গোছের গল্প। তবে ভুলটা আমি নিজে করিনি, করেছিল আমার ভাইপো—সেই যে ছোকরাটি এখন মেডিকেল কলেজে পড়ে। একদিন সন্ধ্যার সময় ঘরের মধ্যে বসে আছি। ঘরেও বাতি জ্বালা হয়নি, বাইরেও বেশ অন্ধকার, খালি সরু নখের মতো একটুখানি চাঁদ সবেমাত্র পূবদিকে উঁকি দিয়েছে; এমন সময় মনে হল যেন একটা মানুষ দেয়াল বেয়ে বাড়ির ছাদের উপর উঠছে—"

বৃন্দাবনবাবু সবে এইটুকু বলেছেন, এমন সময় বারান্দায় কে ডাক দিল, "বাবু, টেলিগ্রাম।" রামবাবু তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে টেলিগ্রামখানা নিয়ে আসলেন, তারপর চোখের চশমাটি কপালে তুলে টেলিগ্রামখানা খুলে পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে তাঁর চোখ ক্রমেই গোল হয়ে উঠছে দেখে ডাক্তারবাবু জিগ্‌গেস করলেন, "কি ব্যাপারখানা কি?" রামবাবু ধপাস্ করে সোফার উপর বসে পড়ে বললেন, "এই দেখুন না, দেশ থেকে পরেশ টেলিগ্রাম করছে—সিরিয়াস্ এক্‌সিডেন্ট কাম্ হোম ইমেডিয়েটলি।" (অর্থাৎ গুরুতর দুর্ঘটনা, শীঘ্র বাড়ি আসুন)। রামবাবুর তিন ছেলে কয়দিন হল পুজোর ছুটিতে দেশে গিয়েছে, আর একটি মামাবাড়িতে আছে, আর বাকি তিনটে মায়ের কাছে বাড়িতেই রয়েছে। রামবাবু বললেন, "এত লোক থাকতে পরেশ ছোকরাটাকে দিয়েই বা টেলিগ্রাম করাতে গেল কেন? দুটো পয়সা খরচ করে বড়রা কেউ একটু ভালো করে গুছিয়ে টেলিগ্রাম করলেই পারত। এখন কি যে করি? আজ বিষ্যুৎবার, এ-সময়ে রওয়ানাই বা হই কেমন করে কিছুই তো বুঝতে পারছি না।" তিনি চাকরকে ডেকে তিনতলার বড় ঘর থেকে

তাঁর কলমটা আনতে বললেন, আর বললেন, "একটা টেলিগ্রাম করে দেখা যাক কি জবাব আসে।" এই ব'লে তিনি আবার টেলিগ্রামখানা পড়তে লাগলেন।

গল্পগুজব তো চুলোয় গেল, সবাই মিলে ভাবতে বসল এখন কি করা যায়। এমন সময় রামবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, "ও কি! এ কার টেলিগ্রাম? এ তো দেখছি 'রমাপদ সেন' লেখা। আমার কি যে চোখ হয়েছে, আমি পড়ছি রমাপ্রসাদ সান্যাল।" বলতেই পোস্টমাস্টার প্রিয়শঙ্করবাবু বলে উঠলেন, "ও! রমাপদ যে ও-পাড়ার গুপীবাবুর ভাই, আমি জানি তার শ্বশুরের নাম পরেশনাথ কি যেন।" তখন খুব একটা হাসির ধুম পড়ে গেল।

রামবাবু বললেন, "দেখলেন মশাই, পিয়ন ব্যাটার কাণ্ড! এক ভুল টেলিগ্রাম দিয়ে আমায় মেরেছিল আর কি! একে বুড়ো বয়েস, তাতে আবার জানেন তো আমার হার্টের ব্যারাম আছে।" হেডমাস্টার যতীশবাবু শুনে হেসে বললেন, "আপনি আবার এর মধ্যেই বুড়ো হলেন কি করে?" রামবাবু বললেন, "বিলক্ষণ! এ পাড়ায় আমার মতন বুড়ো আর ক'টি খুঁজে পান দেখুন তো! এই আষাঢ় মাসে আমি যাটের কোঠায় পা দিয়েছি।" বৃন্দাবনবাবু বললেন, "তাহলে আমার জ্যেঠামশায়ের কাছে আপনার হার মানতে হল। তাঁর বয়েস উনসত্তর।" ডাক্তারবাবু বললেন, "আমারও বড় কম হয়নি, চৌষট্টি পার হয়ে গিয়েছে কিন্তু এ-পাড়ায় বয়েসের জন্য যদি প্রাইজ দিতে হয়, তাহলে ভোলানাথের বাপকেই দেওয়া উচিত; তার নাকি এখন আটাত্তর বছর চলেছে।" এই রকম বাজে কথা চলছে, এমন সময়ে বড় বড় বারকোশের উপর থালা সাজিয়ে রামবাবুর তিনটে চাকর খাবার নিয়ে হাজির। কচুরি, নিমকি, সন্দেশ থেকে পিঠে পায়েস পর্যন্ত প্রায় বারো-চোদ্দ রকমের খাবার। ডাক্তার বললেন, "বাপরে! এ যে বিরাট আয়োজন। ব্যাপারখানা কি?" রামবাবু বললেন, "ঐ যা! আসল কথাই বলতে ভুলে গেছি। আজ আমার জামাই এসেছেন, তাই বাড়িতে একটু মিষ্টি মুখের আয়োজন করা হয়েছে।" ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, "এত বড় গুরুতর কথাটাই বলতে ভুলে গেলেন? আপনার বয়েসটা নিতান্তই বেড়ে গেছে দেখছি।" বৃন্দাবনবাবু বললেন, "তা হোক, আজকের বৈঠকে অনেক রকমই ভুলের কাণ্ড শুনলাম আর দেখলাম, কিন্তু এ ভুলটি বেশিদূর গড়ায়নি। আসুন, এখন ভুলটা সংশোধন করে নেওয়া যাক।"

ভুলের তালিকা

১. গোড়াতেই রামবাবুকে কৃপণ বলা হইয়াছে, কিন্তু গল্পে তাঁহার স্বভাবের যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহা মোটেই কৃপণের মতো নয়।

২. বলা হইয়াছে রামবাবু ও বৃন্দাবনবাবুর মধ্যে বহুকালের বন্ধুতা অথচ পরেই বলা হইয়াছে কারো সঙ্গেই বৃন্দাবনবাবুর আলাপ পরিচয় নাই।

৩. প্রথমেই বৃন্দাবনবাবুর মাথা-ভরা টাক বলা হইয়াছে, অথচ তিনি টিকি দুলাইতেছেন।

৪. প্রথমে বলা হইয়াছে তাঁহার বয়স ৬০, কিন্তু তিনি চাকরি করিয়াছেন ৫৬ বৎসর।

৫. বলা হইয়াছে যে গিন্নী আর জ্যেঠামহাশয় ছাড়া তাঁহার আর কেহ নাই, কিন্তু পরে তাঁহার এক ভাইপোকে হাজির করা হইয়াছে।

৬. প্রথমে পোস্টমাস্টারের নাম বলা হইয়াছে প্রাণশঙ্কর, পরে লেখা হইয়াছে প্রিয়শঙ্কর।

৭. রামবাবু ইংরাজী জানেন না, অথচ তিনি চট্‌পট্‌ ইংরাজী টেলিগ্রাম পড়িতেছেন।

৮. রামবাবু পাটের তেলের ব্যবসা করেন, কিন্তু এরকম কোনো তেল বা ব্যবসার কথা শোনা যায় না।

৯. তাঁহার বাড়ি দোতলা বলা হইয়াছে কিন্তু চাকরকে তিনতলায় পাঠানো হয়েছে।

১০. রামবাবুর আটটি ছেলে কিন্তু মাত্র সাতটির হিসাব পাওয়া যাইতেছে।

১১. রামবাবুর মেয়ে নাই কিন্তু তাঁহার এক জামাই আসিয়া হাজির।

১২. তাঁহার চশমার যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে সেরূপ চশমা কপালে তোলা যায় না।

১৩. প্রথমে বলা হইয়াছে ঘরে কোনোরকম আসবাবপত্র নাই কিন্তু পরে সোফার উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৪. বলা হইয়াছে, 'বড়দিনের ছুটির মধ্যে এক রবিবার' বৃন্দাবন রামবাবুর সঙ্গে দেখা করিলেন; গল্পের ঘটনা তাহার 'সাত দিনের পরে', সুতরাং সেদিন বৃহস্পতিবার হইতেই পারে না।

১৫. বড়দিনের সপ্তাহখানেকের মধ্যেই পূজার ছুটি অসম্ভব।

১৬. বৃন্দাবনবাবুর বয়েস গোড়াতেই ৬০ বলা হইয়াছে। তাহা হইলে তাঁর জ্যেঠামহাশয়ের বয়েস মোটে ৬৯ হইতেই পারে না।

১৭. চাঁদকে যখন আমরা সূর্যের কাছাকাছি দেখি তখনই তাহার চেহারা থাকে 'সরু নখের মতো।' সন্ধ্যার সময় পুবদিকে, অর্থাৎ সূর্যের উল্‌টা দিকে তাহার ওরকম চেহারা অসম্ভব।

বহুরূপী

গল্প

"বড়মামা, একটা গল্প বল না।"

"গল্প? এক ছিল গ, এক ছিল ল আর এক ছিল প—"

"না—ও গল্পটা না। ওটা বিচ্ছিরি গল্প—একটা বাঘের গল্প বল।"

"আচ্ছা। 'যেখানে মস্ত নদী থাকে আর তার ধারে প্রকাণ্ড জঙ্গল থাকে—সেইখানে একটা মস্ত বাঘ ছিল আর ছিল একটা শেয়াল।"

"না, শেয়াল তো বলতে বলিনি—বাঘের গল্প।"

"আচ্ছা, বাঘ ছিল, শেয়াল-টেয়াল কিছু ছিল না। একদিন সেই বাঘ করেছে কি একটা ছোট্ট সুন্দর হরিণের ছানার ঘাড়ে হাল্লুম ক'রে কাম্‌ড়ে ধরেছে—"

"না—সে রকম গল্প আমার শুনতে ভালো লাগে না। একটা ভালো গল্প বল।"

"ভালো গল্প কোথায় পাব? আচ্ছা শোন—এক ছিল মোটা বাবু আর এক ছিল রোগা বাবু। মোটা বাবু কিনা মোটা, তাই তার নাম বিশ্বম্ভর, আর রোগা বাবু কিনা রোগা, তাই তার নাম কানাই।"

"বিস্‌-কম্বল মানে কি মোটা, আর কানাই মানে রোগা?"

"না: মোটা কিনা, তাই তার মস্ত মোটা নাম—বিশ্‌-শম্‌-ভর্‌। আর রোগা লোকের নাম কানাই।"

"রোগা কানাই বলল, 'মোটা বিশ্বম্ভর, তোমার এমন বিচ্ছিরি ঢাকাই জালার মতন চেহারা কেন?' মোটা বিশ্বম্ভর বলল, 'রোগা কানাই, তোর হাত পা কেন কাঠির মতন, হাড়গিল্লের ঠ্যাঙের মতন, রোদে-শুকনো দড়ির মতন?' তখন তারা ভয়ানক চটে গেল। রোগা বলল, 'মোট্‌কা লোকের বুদ্ধি মোটা।' মোটা বলল, 'রোগা লোকের কিপটে মন।'"

"মোটা বুদ্ধি মানে কি বোকা বুদ্ধি?"

"হ্যাঁ। তারপর শোন—মোটা আর রোগা তখন খুব ঝগড়া করতে লাগল। এ বলল, 'রোগা মানুষ ভালো নয়'—ও বলল, 'মোটা হলেই দুষ্টু হয়।' তখন তারা বলল, 'আচ্ছা চল তো পণ্ডিতের কাছে—বইয়েতে কী লেখা আছে—জিজ্ঞাসা কর তো।'"

"বইয়েতে কি সব কথা লেখা থাকে?"

"হ্যাঁ, থাকে। তারা তখন দুজনেই পণ্ডিতের কাছে গিয়ে নালিশ করল। পণ্ডিতমশাই নাকের আগায় চশমা এঁটে, কানের ফাঁকে কলম গুঁজে, মুণ্ডু নেড়ে, টিকি ঝেড়ে তেড়ে বললেন, 'রোসো! দাঁড়াও, একটু বসো—রোগা এবং মোটা এদের কে কি রকম পাজী,

বিচার করব আজই।' এই বলে পণ্ডিতমশাই তাকিয়ার উপর পাশ ফিরে নাক ডাকিয়ে ঘুমতে লাগলেন। রোগা কানাই আর মোটা বিশ্বম্ভর বসেই আছে বসেই আছে—এক ঘণ্টা যায়, দু ঘণ্টা যায়! তখন পণ্ডিতমশাই চোখ রগড়িয়ে বললেন, 'ব্যাপারখানা কি?' বাবুরা বলল, 'আজ্ঞে, সেই রোগা আর মোটার কথা।' পণ্ডিত বললেন, 'ঠিক ঠিক'—এই বলে প্রকাণ্ড একখানা বই নিয়ে মুখ বাঁকিয়ে হেলেদুলে, ষাঁড়ের মতন সুরটি ক'রে তিনি বলতে লাগলেন—'বইয়ে আছে—

মোটকা মানুষ হোঁৎকা মুখ,
বুদ্ধি ভোঁতা আহাম্মুক—

অমনি রোগা কানাই হো হো ক'রে হেসে উঠল। তখন পণ্ডিত বললেন—

'শুক্‌নো লোকের শয়তানি
দেমাক দেখে হার মানি।'

তাই শুনে মোটাবাবু হেসে লুটোপুটি। তখন পণ্ডিত বললেন, 'বইয়ে লিখেছে—

মস্ত মোটা মানুষ যত
আস্ত কোলা ব্যাঙের মতো
নিষ্কর্মা সব হদ্দ কুঁড়ে
কুমড়ো গড়ায় রাস্তা জুড়ে!
—আর—
চিম্‌সে রোগা যত ব্যাটা
বিষম ফাজিল বেদম জ্যাঠা
শুট্‌কো লোকের কারসাজী
হিংসুটে আর হাড় পাজী।।'

তাই শুনে রোগা মোটা দুয়ে মিলে ভয়ানক রকম চটে গেল।

পণ্ডিত বললেন—

'দুটোই বাঁদর দুটোই গাধা
রোগা মোটা সমান হাঁদা।
ভণ্ড বেড়াল পালের ধাড়ী
লাগাও মুখে ঝাঁটার বাড়ি।
মাথায় মাথায় ঠুকে ঠুকে
চুন কালি দাও দুটো মুখে।।'

"এই বলে পণ্ডিতমশাই এক টিপ নস্যি নিয়ে, নাকে মুখে গুঁজে, আবার নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগলেন।"

"তারপর সেই বাবুরা কী বললে?"

"বাবুরা হাঁ ক'রে বোকার মতো মাথা চুল্‌কোতে চুল্‌কোতে বাড়ি চলে গেল, আর ভাবল পণ্ডিতটা কী বোকা!"

ড্রিঘাংচু
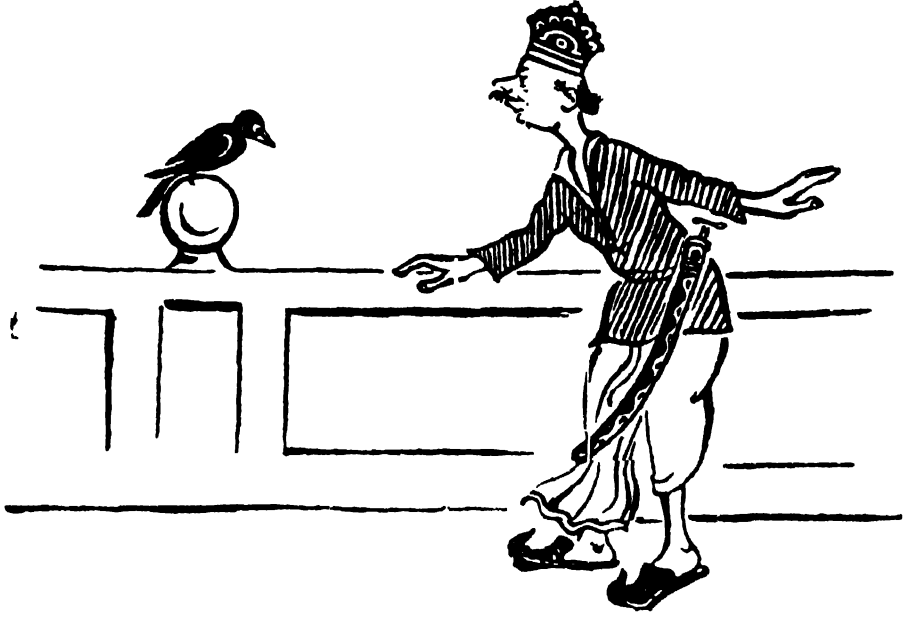
এক ছিল রাজা।

রাজা একদিন সভায় বসেছেন—চারিদিকে তাঁর পাত্রমিত্র আমির ওম্‌রা সিপাই শান্ত্রী গিজ্ গিজ্ করছে—এমন সময় কোথা থেকে একটা দাঁড়কাক উড়ে এসে সিংহাসনের ডান দিকে উঁচু থামের উপর বসে ঘাড় নিচু ক'রে চারদিক তাকিয়ে, অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বলল, "কঃ"।

কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ এ রকম গম্ভীর শব্দ—সভাসুদ্ধ সকলের চোখ এক সঙ্গে গোল হয়ে উঠল—সকলে একেবারে একসঙ্গে হাঁ ক'রে রইল। মন্ত্রী এক তাড়া কাগজ নিয়ে কি যেন বোঝাতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ বক্তৃতার খেই হারিয়ে তিনি বোকার মতো তাকিয়ে রইলেন। দরজার কাছে একটা ছেলে বসেছিল, সে হঠাৎ ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে উঠল, যে লোকটা চামর দোলাচ্ছিল, চামরটা তার হাত থেকে ঠাই ক'রে রাজার মাথার উপর পড়ে গেল। রাজা মশাইয়ের চোখ ঘুমে ঢুলে এসেছিল, তিনি হঠাৎ জেগে উঠেই বললেন, "জল্লাদ ডাক।"

বলতেই জল্লাদ এসে হাজির। রাজা মশাই বললেন, "মাথা কেটে ফেল।" সর্বনাশ! কার মাথা কাটতে বলে? সকলে ভয়ে ভয়ে নিজের নিজের মাথায় হাত বুলাতে লাগল। রাজা মশায় খানিকক্ষণ ঝিমিয়ে আবার তাকিয়ে বললেন "কই মাথা কই?" জল্লাদ বেচারা হাত জোড় ক'রে বলল, "আজ্ঞে মহারাজ, কার মাথা?" রাজা বললেন, "বেটা গোমুখ্যু কোথাকার, কার মাথা কিরে! যে ঐ রকম বিট্‌কেল শব্দ করেছিল, তার মাথা।" শুনে

সভাসুদ্ধ সকলে হাঁফ ছেড়ে এমন ভয়ানক নিশ্বাস ফেলল যে, কাকটা হঠাৎ ধড়ফড় ক'রে সেখান থেকে উড়ে পালাল।

তখন মন্ত্রীমশাই রাজাকে বুঝিয়ে বললেন যে, ঐ কাকটাই ওরকম আওয়াজ করেছিল। তখন রাজা মশাই বললেন, "ডাকো, পণ্ডিত সভার যত পণ্ডিত সবাইকে।" হুকুম হওয়া মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে রাজ্যের যত পণ্ডিত সব সভায় এসে হাজির।

তখন রাজা মশাই পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করলেন, "এই যে একটা কাক এসে আমার সভার মধ্যে আওয়াজ ক'রে গোল বাধিয়ে গেল, এর কারণ কিছু বলতে পার?"

কাক আওয়াজ করল তার আবার কারণ কি! পণ্ডিতেরা সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। একজন ছোকরা মতো পণ্ডিত খানিকক্ষণ কাঁচুমাচু ক'রে জবাব দিল,— "আজ্ঞে, বোধ হয় তার খিদে পেয়েছিল।"

রাজা মশাই বললেন, "তোমার যেমন বুদ্ধি! খিদে পেয়েছিল, তা সভার মধ্যে আসতে যাবে কেন? এখানে কি মুড়ি মুড়কি বিক্রি হয়! মন্ত্রী, ওঁকে বিদেয় ক'রে দাও—" সকলে মহা তম্বী ক'রে বললে, "হাঁ হাঁ, ঠিক ঠিক, ওকে বিদেয় করুন।"

আর একজন পণ্ডিত বললেন, "মহারাজ, কার্য থাকলেই তার কারণ আছে—বৃষ্টি হলেই বুঝবে মেঘ আছে, আলো দেখলেই বুঝবে প্রদীপ আছে, সুতরাং বায়স পক্ষীর কণ্ঠনির্গত এই অপরূপ ধ্বনিরূপ কার্যের নিশ্চয়ই কোনো কারণ থাকবে, এতে আশ্চর্য কি?"

রাজা বললেন, "আশ্চর্য এই যে, তোমার মতো মোটা বুদ্ধি লোকেও এই রকম আবোল তাবোল বকে মোটা মোটা মাইনে পাও। মন্ত্রী, আজ থেকে এঁর মাইনে বন্ধ কর।" অমনি সকলে হাঁ হাঁ করে উঠলেন, "মাইনে বন্ধ কর।"

দুই পণ্ডিতের এ রকম দুর্দশা দেখে সবাই কেমন ঘাবড়ে গেল। মিনিটের পর মিনিট যায়, কেউ আর কথা কয় না। তখন রাজা মশাই দস্তুরমতো খেপে গেলেন। তিনি হুকুম দিলেন, এর জবাব না পাওয়া পর্যন্ত কেউ যেন সভা ছেড়ে না ওঠে। রাজার হুকম—সকলে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। ভাবতে ভাবতে কেউ কেউ ঘেমে ঝোল হয়ে উঠল, চুলকিয়ে চুলকিয়ে কারো কারো মাথায় প্রকাণ্ড টাক পড়ে গেল। বসে বসে সকলের খিদে বাড়তে লাগল—রাজা মশাইয়ের খিদেও নেই, বিশ্রামও নেই—তিনি বসে বসে ঝিমুতে লাগলেন।

সকলে যখন হতাশ হয়ে এসেছে, আর মনে মনে পণ্ডিতদের "মূর্খ অপদার্থ নিষ্কর্মা" ব'লে গাল দিচ্ছে, এমন সময় রোগা সুঁটকো মতো একজন লোক হঠাৎ বিকট চিৎকার ক'রে সভার মাঝখানে পড়ে গেল। রাজা মন্ত্রী পাত্র মিত্র উজির নাজির সবাই ব্যস্ত হয়ে বললেন, "কী হলো, কী হলো?"

তখন অনেক জলের ছিটা পাখার বাতাস আর বলা কওয়ার পর লোকটা কাঁপতে কাঁপতে উঠে বলল, "মহারাজ, সেটা কী দাঁড়কাক ছিল?" সকলে বলল, "হাঁ-হাঁ-হাঁ, কেন বল দেখি?" লোকটা আবার বলল, "মহারাজ, সে কি ঐ মাথার উপর দক্ষিণ দিকে মুখ ক'রে বসেছিল—আর মাথা নিচু ক'রে ছিল, আর চোখ পাকিয়েছিল, আর 'কঃ'

ক'রে শব্দ করেছিল?" সকলে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে বললে, "হাঁ, হাঁ—ঠিক ঐ রকম হয়েছিল।" তাই শুনে লোকটা আবার ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে লাগল—আর বলতে লাগল, "হায়, হায়, সেই সময়ে কেউ আমায় খবর দিলে না কেন?"

রাজা বললেন, "তাই তো, একে তখন তোমরা খবর দাওনি কেন?" লোকটাকে কেউ চেনে না, তবু সে কথা বলতে সাহস পেল না, সবাই বললে, "হ্যাঁ, ওকে একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল"—যদিও কেন তাকে খবর দেবে, আর কী খবর দেবে, একথা কেউই বুঝতে পারল না। লোকটা তখন খুব খানিকটা কেঁদে তাবপর মুখ বিকৃত ক'রে বলল, "দ্রিঘাংচু"। সে আবার কি! সবাই ভাবল, লোকটা খেপে গেছে।

মন্ত্রী বললেন, "দ্রিঘাঞ্চু কি হে?" লোকটা বলল, "দ্রিঘাঞ্চু নয়, দ্রিঘাংচু।" কেউ কিছু বুঝতে পারল না—তবু সবাই মাথা নেড়ে বলল, "ও!" তখন রাজা মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, "সে কি রকম হে," লোকটা বলল, "আজ্ঞে আমি মূর্খ মানুষ, আমি কি অত খবর রাখি, ছেলেবেলা থেকে দ্রিঘাংচু শুনে আসছি, তাই জানি দ্রিঘাংচু যখন রাজার সামনে আসে, তখন তাকে দেখতে দেখায় দাঁড়কাকের মতো। সে যখন সভায় ঢোকে, তখন সিংহাসনের ডান দিকের থামের উপর ব'সে মাথা নিচু ক'রে দক্ষিণ দিকে মুখ ক'রে, চোখ পাকিয়ে 'ক' ব'লে শব্দ করে। আমি তো আর কিছু জানি না—তবে পণ্ডিতেরা যদি জানেন।" পণ্ডিতেরা তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে বললেন, "না, না, ওব সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায়নি।"

বাজা বললেন, "তোমায় খবর দেয়নি ব'লে কাঁদছিলে, তুমি থাকলে করতে কী?" লোকটা বলল, "মহারাজ, সে কথা বললে লোকে যদি বিশ্বাস না কবে, তাই বলতে সাহস হয না।"

রাজা বললেন, "যে বিশ্বাস করবে না, তার মাথা কাটা যাবে—তুমি নির্ভয়ে ব'লে ফেল।" সভাসুদ্ধ লোক তাতে হাঁ হাঁ ক'রে সায দিযে উঠল।

লোকটা তখন বলল, "মহারাজ, আমি একটা মন্ত্র জানি, আমি যুগজন্ম ধরে বসে আছি দ্রিঘাংচুর দেখা পেলে সেই মন্ত্র যদি তাকে বলতে পারতাম তা হলে কি যে আশ্চর্য কাণ্ড হত তা কেউ জানে না। কারণ, তার কথা কোনো বইয়ে লেখেনি। হায় রে হায়, এমন সুযোগ আর কি পাব?" রাজা বললেন, "মন্ত্রটা আমায় বলত।" লোকটা বলল, "সর্বনাশ! সে মন্ত্র দ্রিঘাংচুর সামনে ছাড়া কারুব কাছে উচ্চাবণ করতে নেই। আমি একটা কাগজে লিখে দিচ্ছি—আপনি দু'দিন উপোস ক'রে তিন দিনের দিন সকালে উঠে সেটা পড়ে দেখবেন। আপনার সামনে দাঁড়কাক দেখলে, তাকে আপনি মন্ত্র শোনাতে পারেন, কিন্তু খবরদার, আর কেউ যেন তা না শোনে—কারণ, দাঁড়কাক যদি দ্রিঘাংচু না হয়, আর তাকে মন্ত্র বলতে গিয়ে অন্য লোকে শুনে ফেলে, তা হ'লেই সর্বনাশ!"

তখন সভা ভঙ্গ হল। সভার সকলে এতক্ষণ হাঁ ক'বে শুনছিল, তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল; সকলে দ্রিঘাংচুর কথা, মন্ত্রের কথা আর আশ্চর্য ফল পাওয়ার কথা বলাবলি করতে করতে বাড়ি চলে গেল।

তারপর রাজা মশাই দু'দিন উপোস ক'বে তিন দিনের দিন সকালবেলা—সেই লোকটার লেখা কাগজখানা খুলে পড়লেন। তাতে লেখা আছে—

"হল্‌দে সবুজ ওরাং ওটাং
ইঁট পাট্‌কেল চিৎ পটাং
মুস্কিল আসান উড়ে মালি
ধর্মতলা কর্মখালি।"

রাজা মশাই গম্ভীরভাবে এটা মুখস্থ ক'রে নিলেন। তারপর থেকে তিনি দাঁড়কাক দেখলেই লোকজন সব তাড়িয়ে তাকে মন্ত্র শোনাতেন, আর চেয়ে দেখতেন কোনো রকম আশ্চর্য কিছু হয় কি না! কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি দ্রিঘাংচুর কোনো সন্ধান পাননি।

এক বছরের রাজা

এক ছিলেন সওদাগর—তাঁর একটি সামান্য ক্রীতদাস তাঁর একমাত্র ছেলেকে জল থেকে বাঁচায়। সওদাগর খুশি হয়ে তাকে মুক্তি তো দিলেনই, তা ছাড়া জাহাজ বোঝাই ক'রে নানা রকম বাণিজ্যের জিনিস তাকে বকশিশ দিয়ে বললেন, "সমুদ্র পার হয়ে বিদেশে যাও—এই সব জিনিস বেচে যা টাকা পাবে, সবই তোমার।" ক্রীতদাস মনিবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জাহাজে চড়ে রওনা হল বাণিজ্য করতে।

কিন্তু বাণিজ্য করা আর হল না। সমুদ্রের মাঝখানে তুফান উঠে জাহাজটিকে ভেঙেচুরে জিনিসপত্র লোকজন কোথায় যে ভাসিয়ে নিল, তার আর খোঁজ পাওয়া গেল না। ক্রীতদাসটি অনেক কষ্টে হাবুডুবু খেয়ে, একটা দ্বীপের চড়ায় এসে ঠেকল। সেখানে ডাঙায় উঠে সে চারিদিকে চেয়ে দেখল, তার জাহাজের চিহ্নমাত্র নাই, তার সঙ্গের লোকজন কেউ নাই। তখন সে হতাশ হয়ে সমুদ্রের ধারে বালির উপর বসে পড়ল। তারপর যখন সন্ধ্যা হয়ে এল, তখন সে উঠে দ্বীপের ভিতর দিকে যেতে লাগল। সেখানে বড় বড় গাছের বন—তারপর প্রকাণ্ড মাঠ, আর তারই ঠিক মাঝখানে চমৎকার শহর। শহরের ফটক দিয়ে মশাল হাতে মেলাই লোক বার হচ্ছে। তাকে দেখতে পেয়েই সেই লোকেরা চীৎকার ক'রে বলল, "মহারাজের শুভাগমন হোক। মহারাজ দীর্ঘজীবী হউন।" তারপর সবাই তাকে খাতির ক'রে জমকালো গাড়িতে চড়িয়ে, প্রকাণ্ড এক প্রাসাদে নিয়ে গেল। সেখানের চাকরগুলো তাড়াতাড়ি রাজপোশাক এনে তাকে সাজিয়ে দিল।

সবাই বলছে, 'মহারাজ', 'মহারাজ', হুকুম মাত্র সবাই চট্‌পট্‌ কাজ করছে, এসব দেখেশুনে সে বেচারা একেবারে অবাক। সে ভাবল সবই বুঝি স্বপ্ন—বুঝি তার নিজেরই মাথা খারাপ হয়েছে তাই এরকম মনে হচ্ছে। কিন্তু ক্রমে সে বুঝতে পারল সে জেগেই আছে আর দিব্যি জ্ঞানও রয়েছে, আর যা যা ঘটছে সব সত্যিই। তখন সে লোকদের বলল, "এ কি রকম হচ্ছে বল তো? আমি তো এর কিছুই বুঝছি না। তোমরা কেনই বা আমায় 'মহারাজ' বলছ আর কেনই বা এমন সম্মান দেখাচ্ছ?"

তখন তাদের মধ্যে থেকে এক বুড়ো উঠে বলল, "মহারাজ, আমরা কেউ মানুষ নই—আমরা সকলেই প্রেতগন্ধর্ব—যদিও আমাদের চেহারা ঠিক মানুষেরই মতো। অনেক দিন আগে আমরা 'মানুষ রাজা' পাবার জন্য সবাই মিলে প্রার্থনা করেছিলাম; কারণ, মানুষের মতো বুদ্ধিমান আর কে আছে? সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের মানুষ রাজার অভাব হয়নি। প্রতি বৎসরে একটি ক'রে মানুষ এইখানে আসে, আর আমরা তাকে এক বৎসরের জন্য রাজা করি। তার রাজত্ব শুধু ঐ এক বৎসরের জন্যই। বৎসর শেষ হলেই তাকে সব ছাড়তে হয়। তাকে জাহাজে ক'রে সেই মরুভূমির দেশে রেখে আসা হয়, যেখানে সামান্য ফল ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না—আর সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে বালি না খুঁড়লে এক ঘটি জলও মেলে না। তারপর আবার নূতন রাজা আসে—এই রকমে বৎসরের পর বৎসর আমাদের চলে আসছে।"

তখন দাসরাজা বললেন, "আচ্ছা বল তো—এর আগে তোমাদের রাজারা কি রকম স্বভাবের লোক ছিলেন?" বুড়ো বলল, "তাঁরা সবাই ছিলেন অসাবধান আর খাম-খেয়ালি। সারাটি বছর সবাই শুধু জাঁকজমকে আমোদে আহ্লাদে দিন কাটাতেন—বছর শেষে কি হবে কেউ সে কথা ভাবতেন না।"

নতুন রাজা মন দিয়ে সব শুনলেন, বছরের শেষে তাঁর কি হবে এই কথা ভেবে ক'দিন তাঁর ঘুম হল না!

তারপর সে দেশের সকলের চেয়ে জ্ঞানী আর পণ্ডিত যারা, তাদের ডেকে আনা হল, আর রাজা তাদের কাছে মিনতি ক'রে বললেন, "আপনারা আমাকে উপদেশ দিন—যাতে বছর শেষে এই সর্বনেশে দিনের জন্য প্রস্তুত হতে পারি।"

তখন সবচেয়ে প্রবীণ বৃদ্ধ যে সে বলল, "মহারাজ, শূন্য হাতে আপনি এসেছিলেন, শূন্য হাতেই আবার সেই দেশে যেতে হবে—কিন্তু এই এক বছর আপনি আমাদের যা ইচ্ছা হয় তাই করাতে পারেন। আমি বলি— এই বেলা রাজ্যের ওস্তাদ লোকদের সেই দেশে পাঠিয়ে, সেখানে বাড়ি ক'রে, বাগান ক'রে, চাষবাসের ব্যবস্থা ক'রে চারিদিক সুন্দর ক'রে রাখুন। ততদিনে ফলে ফুলে দেশ ভরে উঠবে, সেখানে লোকের যাতায়াত হবে। আপনার এখানকার রাজত্ব শেষ হতেই সেখানে আপনি সুখে রাজত্ব করবেন। বৎসর তো দেখতে দেখতে চলে যাবে, অথচ কাজ আপনার ঢের; কাজেই বলি, এই বেলা খেটে-খুটে সব ঠিক ক'রে নিন।" রাজা তখনই হুকুম দিয়ে লোকলস্কর, জিনিসপত্র, গাছের চারা, ফলের বীজ, আর বড় বড় কলকব্জা পাঠিয়ে, আগে থেকে সেই মরুভূমিকে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখলেন।

তারপর বছর যখন ফুরিয়ে এল, তখন প্রজারা তাঁর ছত্র মুকুট রাজদণ্ড সব ফিরিয়ে নিল, তাঁর রাজার পোশাক ছাড়িয়ে এক বছর আগেকার সেই সামান্য কাপড় পরিয়ে, তাঁকে জাহাজে তুলে সেই মরুভূমির দেশে রেখে এল। কিন্তু সে দেশ আর এখন মরুভূমি নাই—চারিদিকে ঘর বাড়ি, পথ ঘাট, পুকুর বাগান। সে দেশ এখন লোকে লোকারণ্য। তারা সবাই এসে ফুর্তি ক'রে শঙ্খ ঘন্টা বাজিয়ে তাঁকে নিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দিল। এক বছরের রাজা সেখানে জন্ম ভরে রাজত্ব করতে লাগলেন।

হিংসুটি

এক ছিল দুষ্টু মেয়ে—বেজায় হিংসুটে, আর বেজায় ঝগড়াটি। তার নাম বলতে গেলেই তো মুশকিল, কারণ ঐ নামে শান্ত লক্ষ্মী পাঠিকা যদি কেউ থাকেন, তাঁরা তো আমার উপর চটে যাবেন।

হিংসুটির দিদি বড় লক্ষ্মী মেয়ে—যেমন কাজে কর্মে, তেমনি লেখাপড়ায়। হিংসুটির বয়েস সাত বছর হ'য়ে গেল, এখনও তার প্রথম ভাগই শেষ হল না—আর তার দিদি তার চাইতে মোটে এক বছরের বড়, সে এখনই "বোধোদয়" আর "ছেলেদের রামায়ণ" পড়ে ফেলেছে, ইংরিজি ফার্স্টবুক তার কবে শেষ হয়ে গেছে। হিংসুটি কিনা সবাইকে হিংসে করে, সে তো দিদিকেও হিংসে করত। দিদি স্কুলে যায়, প্রাইজ পায়—হিংসুটি খালি বকুনি খায় আর শাস্তি পায়।

দিদি যেবার ছবির বই প্রাইজ পেলে আর হিংসুটি কিচ্ছু পেলে না, তখন যদি তার অভিমান দেখতে! সে সারাটি দিন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে গাল ফুলিয়ে ঠোঁট বাঁকিয়ে ব'সে রইল—কারও সঙ্গে কথাই বলল না। তারপর রাত্রিবেলায় দিদির অমন সুন্দর বইখানাকে কালি ঢেলে, মলাট ছিঁড়ে, কাদায় ফেলে নষ্ট করে দিল। এমন দুষ্টু হিংসুটে মেয়ে!

হিংসুটির মামা এসেছেন, তিনি মিঠাই এনে দু'বোনকেই আদর ক'রে খেতে দিয়েছেন। হিংসুটি খানিকক্ষণ তার দিদির খাবারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে ফেলল। মামা ব্যস্ত হয়ে বললেন, "কিরে, কী হ'ল? জিভে কামড় লাগল নাকি?" হিংসুটির মুখে আর কথা নেই, সে কেবলই কাঁদছে। তখন তার মা এক ধমক দিয়ে বললেন, "কী হয়েছে বল্ না!" তখন হিংসুটি কাঁদতে কাঁদতে বলল, "দিদির ঐ রসমুণ্ডিটা আমারটার চাইতেও বড়।" তাই শুনে দিদি তাড়াতাড়ি নিজের রসমুণ্ডিটা তাকে দিয়ে দিল। অথচ হিংসুটি নিজে যা খাবার পেয়েছিল তার অর্ধেক সে খেতে পারল না—নষ্ট ক'রে ফেলে দিল। দিদির জন্মদিনে দিদির জন্য নতুন জামা, নতুন কাপড় আস্‌লে হিংসুটি তাই নিয়ে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে তোলে।

একদিন হিংসুটি তার মায়ের আলমারি খুলে দেখে কি—লাল জামা গায়ে, লাল জুতা পায়ে, টুক্‌টুকে রাঙা পুতুল বাক্সের মধ্যে শুয়ে আছে। হিংসুটি বলল, "দেখেছ! দিদি কি দুষ্টু! নিশ্চয়ই মামার কাছ থেকে পুতুল আদায় করেছে—আবার আমায় না দেখিয়ে মায়ের কাছে লুকিয়ে রাখা হয়েছে!" তখন তার ভয়ানক রাগ হল। সে ভাবল, "আমি তো ছোট বোন, আমারই তো পুতুল পাওয়া উচিত। দিদি কেন মিছিমিছি পুতুল পাবে?" এই ভেবে সে পুতুলটাকে উঠিয়ে নিল।

কি সুন্দর পুতুল! কেমন মিট্‌মিটে চোখ, আর ফুট্‌ফুটে মুখ, কেমন কচি কচি হাত পা, আর টুক্‌টুকে জামা কাপড়! যত সব ভালো ভালো জিনিস সব কিনা দিদি পাবে! হিংসুটির চোখ ফেটে জল এল। সে রেগে পুতুলটাকে আছড়িয়ে মাটিতে ফেলে দিল। তাতেও তার রাগ গেল না; সে একটা ডাণ্ডা নিয়ে ধাঁই ধাঁই ক'রে পুতুলটাকে মারতে

লাগল। মারতে মারতে তার নাক মুখ হাত পা ভেঙে, তার জামা কাপড় ছিঁড়ে—আবার তাকে বাক্সের মধ্যে ঠেসে সে রাগে গরগর করতে করতে চলে গেল।

বিকেলবেলা মামা এসে তাকে ডাকতে লাগলেন আর বললেন, "তোর জন্য কি এনেছি দেখিস্‌নি?" শুনে হিংসুটি দৌড়ে এল, "কই মামা? কী এনেছ দাও না।"

মামা বললেন, "মার কাছে দেখ্‌ গিয়ে কেমন সুন্দর পুতুল এনেছি।" হিংসুটি উৎসাহে নাচতে লাগল, মাকে বলল, "কোথায় রেখেছ মা?" মা বললেন, "আলমারিতে আছে।" শুনে ভয়ে হিংসুটির বুকের মধ্যে ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করে উঠল। সে কাঁদ কাঁদ গলায় বলল, "সেটার কি লাল জামা আর লাল জুতো পরান—মাথায় কালো কালো কোঁকড়ানো চুল ছিল?" মা বললেন, "হ্যাঁ, তুই দেখেছিস্‌ নাকি?"

হিংসুটির মুখে আর কথা নেই! সে খানিকক্ষণ ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ ক'রে তাকিয়ে তারপর একেবারে ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে এক দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

এর পরে যদি তার হিংসে আর দুষ্টুমি না কমে, তবে আব কী ক'রে কমবে?

দুই বন্ধু

এক ছিল মহাজন, আর এক ছিল সওদাগর। দুজনে ভারি ভাব। একদিন মহাজন এক থলি মোহর নিয়ে তার বন্ধুকে বলল, "ভাই, ক'দিনের জন্য শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি; আমার কিছু টাকা তোমার কাছে রাখতে পারবে?" সওদাগর বলল, "পারব না কেন? তবে কি জানো, পরের টাকা হাতে রাখা আমি পছন্দ করি না। তুমি বন্ধু মানুষ, তোমাকে আর বলবার কী আছে, আমার ঐ সিন্দুকটি খুলে তুমি নিজেই তার মধ্যে তোমার টাকাটা রেখে দাও—আমি ও টাকা ছোঁব না।" তখন মহাজন তার থলে ভরা মোহর সেই সওদাগরের সিন্দুকের মধ্যে রেখে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি গেল।

এদিকে হয়েছে কি, বন্ধু যাবার পরেই সওদাগরের মনটা কেমন উস্‌খুস্‌ করছে। সে কেবলই ঐ টাকার কথা ভাবছে আর তার মনে হচ্ছে যে বন্ধু না জানি কত কী রেখে গেছে! একবার খুলে দেখতে দোষ কি? এই ভেবে সে সিন্দুকের ভিতর উঁকি মেরে থলিটা খুলে দেখল—থলি ভরা চক্‌চকে মোহর! এতগুলো মোহর দেখে সওদাগরের ভয়ানক লোভ হল—সে তাড়াতাড়ি মোহরগুলো সরিয়ে তার জায়গায় কতগুলো পয়সা ভরে থলিটাকে বন্ধ ক'রে রাখল।

দশ দিন পরে তার বন্ধু যখন ফিরে এল, তখন সওদাগর খুব হাসিমুখে তার সঙ্গে গল্প-সল্প করল, কিন্তু তার মনটা কেবলই বলতে লাগল, "কাজটা ভালো হয়নি। বন্ধু এসে বিশ্বাস করে টাকাটা রাখল, তাকে ঠকানো উচিত হয়নি।" একথা সেকথার পর মহাজন বলল, "তাহলে বন্ধু, আজকে টাকাটা নিয়ে এখন উঠি—সেটা কোথায় আছে?" সওদাগর বললে, "হ্যাঁ বন্ধু, সেটা নিয়ে যাও। তুমি যেখানে রেখেছিলে সেইখানেই পাবে—

আমি থলিটা আর সরাইনি।" বন্ধু তখন সিন্দুক খুলে তার থলিটা বের ক'রে নিল। কিন্তু, কি সর্বনাশ! থলিভরা মোহর ছিল, সব গেল কোথায়? সব যে কেবল পয়সা! মহাজন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল!

সওদাগর বলল, "ওকি বন্ধু! মাটিতে বসলে কেন?" বন্ধু বলল, "ভাই, সর্বনাশ হয়েছে! আমার থলিভরা মোহর ছিল—এখন দেখছি একটাও মোহর নাই, কেবল কতগুলো পয়সা!" সওদাগর বলল, "তাও কি হয়? মোহর কখনও পয়সা হয়ে যায়?" সওদাগর চেষ্টা করছে এরকম ভাব দেখাতে যেন সে কতই আশ্চর্য হয়েছে; কিন্তু তার বন্ধু দেখল তার মুখখানা একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ব্যাপারটা বুঝতে তার আর বাকি রইল না—তবু সে কোনো রকম রাগ না দেখিয়ে হেসে বলল, "আমি তো মোহর মনে করেই রেখেছিলাম—এখন দেখছি কোথাও কোনো গোল হয়ে থাকবে। যাক যা গেছে তা গেছেই—সে ভাবনায় আর কাজ নেই।" এই বলে সে সওদাগরের কাছে বিদায় নিয়ে পয়সার থলি বাড়িতে নিয়ে গেল। সওদাগর হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

দু'মাস পরে হঠাৎ একদিন মহাজন তার বন্ধুর বাড়ি এসে বলল, "বন্ধু, আজ আমার বাড়িতে পিঠে হচ্ছে—বিকেলে তোমার ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিও!" বিকালবেলা সওদাগর তার ছেলেকে নিয়ে মহাজনের বাড়িতে রেখে এল, আর বলল, "সন্ধ্যার সময় এসে নিয়ে যাব।" মহাজন করল কি, ছেলেটার পোশাক বদলিয়ে তাকে কোথায় লুকিয়ে রাখল—আর একটা বাঁদরকে সেই ছেলের পোশাক পরিয়ে ঘরের মধ্যে বসিয়ে দিল।

সন্ধ্যার সময় সওদাগর আসতেই তার বন্ধু এসে মুখখানা হাঁড়ির মতো করে বলল, "ভাই! একটা বড় মুশকিলে পড়েছি। তোমার ছেলেটিকে তুমি যখন দিয়ে গেলে, তখন দেখলাম দিব্যি কেমন নাদুস-নুদুস ফুট্‌ফুটে চেহারা—কিন্তু এখন দেখছি কি রকম হয়ে গেছে—ঠিক যেন বাঁদরের মতো দেখাচ্ছে! কি করা যায় বলত বন্ধু!" ব্যাপার দেখে সওদাগরের তো চক্ষুস্থির! সে বলল, "কি পাগলের মতো বক্‌ছ? মানুষ কখনও বাঁদর হয়ে যায়?" মহাজন অত্যন্ত ভালো মানুষের মতো বলল, "কি জানি ভাই! আজকাল কি সব ভূতের কাণ্ড হচ্ছে, কিছু বুঝবার যো নেই। এই দেখ না সেদিন আমার সোনার মোহরগুলো খামখা বদলে সব তামার পয়সা হয়ে গেল। অদ্ভুত ব্যাপার!"

তখন সওদাগর রেগে বন্ধুকে গালাগালি দিয়ে কাজির কাছে দৌড়ে গেল নালিশ করতে। কাজির হুকুমে চার-চার প্যায়দা এসে মহাজনকে পাকড়াও ক'রে কাজির সামনে হাজির করল। কাজি বললেন, "তুমি এর ছেলেকে নিয়ে কী করেছ?" শুনে চোখ দুটো গোল ক'রে মস্ত বড় হাঁ ক'রে মহাজন বলল, "আমি? আমি মুখ্য-সুখ্য মানুষ, আমি কি অত সব বুঝতে পারি? হুজুর! ওর বাড়িতে মোহর রাখলাম, দশদিনে সব পয়সা হয়ে গেল; আবার দেখুন ওর ছেলেটা আমার বাড়ি আসতে না আসতেই ল্যাজ্-ট্যাজ্ গজিয়ে দস্তুরমতো বাঁদর হয়ে উঠেছে। কি রকম যে হচ্ছে—আমার বোধ হয় সব ভূতুড়ে কাণ্ড।" এই ব'লে সে কাজিকে লম্বা সেলাম করতে লাগল।

কাজিও চালাক লোক, ব্যাপার বুঝতে তাঁর বাকি রইল না। তিনি বললেন, "আচ্ছা, তোমরা ঘরে যাও। আমি দৈবজ্ঞ ফকির ডাকিয়ে মন্ত্র পড়ে ভূত ঝাড়িয়ে সব সায়েস্তা করছি। তোমার পয়সার থলি ওর কাছে দাও—আর তোমার বাঁদর ছেলেকে এর কাছেই

রাখ। কাল সকালের মধ্যে সব যদি ঠিক না হয় তবে বুঝব এতে তোমাদের কারুর শয়তানি আছে। সাবধান! তাহলে তোমার পয়সাও পাবে না, মোহরও পাবে না—আর তোমার ছেলে তো মরবেই, ছেলের বাপ মা খুড়ো জ্যাঠা সবসুদ্ধ মেরে সাবাড় করব।"

সওদাগর পয়সার থলি সঙ্গে নিয়ে ভাবতে ভাবতে ঘরে চলল। মহাজন বাঁদর নিয়ে হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরল। ভোর না হতেই সওদাগর থলির মধ্যে আবার মোহর ভরে মহাজনের বাড়ি গিয়ে বলছে, "বন্ধু! বন্ধু! কি আশ্চর্য দেখে যাও! তোমার পয়সাগুলো আবার সব মোহর হয়েছে।" মহাজন বলল, "তাই নাকি? কি আশ্চর্য এদিকে সেই বাঁদরটাও আবার তোমার খোকা হয়ে গেছে।" তারপর মোহরের থলি নিয়ে সওদাগরের ছেলেটাকে ফিরিয়ে দিয়ে মহাজন বলল, "দেখ্ জোচ্চোর! ফের আমায় 'বন্ধু' 'বন্ধু' বলবি তো মেরে তোর থোঁতামুখ ভোঁতা করে দেব।"

গরুর বুদ্ধি

পণ্ডিতমশাই ভট্টচার্যি বামুন, সাদাসিধে শান্তশিষ্ট নিরীহ মানুষ। বাড়িতে তাঁর সরষের তেলের দরকার পড়েছে, তাই তিনি কলুর বাড়ি গেছেন তেল কিনতে।

কলুর ঘরে মস্ত ঘানি, একটা গরু গম্ভীর হয়ে সেই ঘানি ঠেলছে, তার গলায় ঘণ্টা বাঁধা। গরুটা চলছে চলছে আর ঘানিটা ঘুরছে, আর সরষে পিষে তা থেকে তেল বেরুচ্ছে। আর গলার ঘণ্টাটা টুংটাং টুংটাং ক'রে বাজছে।

পণ্ডিতমশাই রোজই আসেন রোজই দেখেন, কিন্তু আজ তাঁর হঠাৎ ভারি আশ্চর্য বোধ হল। তিনি চোখমুখ গোল ক'রে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তাই তো! এটা তো ভারি চমৎকার ব্যাপার!

কলুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওহে কলুর পো, ও জিনিসটা কি হে?" কলু বলল, "আজ্ঞে ওটা ঘানিগাছ, ওতে তেল হয়।" পণ্ডিতমশাই ভাবলেন—এটা কি রকম হল? আম গাছে আম হয়, জাম গাছে জাম হয়, আর ঘানি গাছের বেলায় তেল হয় মানে কি? কলুকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, "ঘানি ফল হয় না?" কলু বললে, "সে আবার কি?"

পণ্ডিতমশাই টিকিতে হাত বুলিয়ে ভাবতে লাগলেন তাঁর প্রশ্নটা বোধহয় ঠিক হয়নি। কিন্তু কোথায় যে ভুল হয়েছে, সেটা তিনি ভেবে উঠতে পারলেন না। তাই খানিকক্ষণ চুপ করে তারপর বললেন, "তেল কী করে হয়?" কলু বলল, "ঐখেনে সর্ষে দেয় আর গরুতে ঘানি ঠেলে—আর ঘানির চাপে তেল বেরোয়।" এইবারে পণ্ডিতমশাই খুব খুশি হয়ে ঘাড় নেড়ে টিকি দুলিয়ে বললেন, "ও বুঝেছি! তৈল-নিষ্পেষণ যন্ত্র!"

তারপর কলুর কাছ থেকে তেল নিয়ে পণ্ডিতমশাই বাড়ি ফিরতে যাবেন এমন সময় হঠাৎ তাঁর মনে আর একটা খট্কা লাগল—'গরুর গলায় ঘণ্টা কেন?' তিনি বললেন,

"ও কলুর পো, সবি তো বুঝলুম, কিন্তু গরুর গলায় ঘণ্টা দেবার অর্থ কী? ওতে কি তেল ঝাড়াবার সুবিধা হয়?" কলু বলল, "সব সময় তো আর গরুটার উপরে চোখ রাখতে পারি নে, তাই ঘণ্টাটা বেঁধে রেখেছি। ওটা যতক্ষণ বাজে, ততক্ষণ বুঝতে পারি যে গরুটা চলছে। থামলেই ঘণ্টার আওয়াজ বন্ধ হয়, আমিও টের পেয়ে তাড়া লাগাই।"

পণ্ডিতমশাই এমন অদ্ভুত ব্যাপার আর দেখেননি; তিনি বাড়ি যাচ্ছেন আর কেবলই ভাবছেন—'কলুটার কি আশ্চর্য বুদ্ধি! কি কৌশলটাই খেলিয়েছে। গরুটার আর ফাঁকি দেবার যো নেই। একটু থেমেছে কি ঘণ্টা বন্ধ হয়েছে, আর কলুর পো তেড়ে উঠেছে!' এই রকম ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তাঁর মনে হল—'আচ্ছা, গরুটা যদি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ে তাহলেও ত ঘণ্টা বাজবে, তখন কলুর পো টের পাবে কী ক'রে?'

ভট্‌চার্যিমশায়ের ভারি ভাবনা হল। গরুটা যদি শয়তানি ক'রে ফাঁকি দেয়, তা হলে কলুর ত লোকসান হয়। এই ভেবে তিনি আবার কলুর কাছে ফিরে গেলেন। গিয়ে বললেন, "হ্যাঁ হে, ঐ যে ঘণ্টার কথাটা বললে, ওটার মধ্যে একটা মস্ত গলদ থেকে গেছে। গরুটা যদি ফাঁকি দিয়ে ঘণ্টা বাজায় তাহলে কী করবে?" কলু বিরক্ত হয়ে বললে, "ফাঁকি দিয়ে আবার ঘণ্টা বাজাবে কি রকম?" পণ্ডিতমশাই বললেন, "মনে কর যদি এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ে, তা হলেও ত ঘণ্টা বাজবে, কিন্তু ঘানি ত চলবে না। তখন কী করবে?" কলু তখন তেল মাপছিল, সে তেলের পলাটা নামিয়ে পণ্ডিতমশায়ের দিকে ফিরে গম্ভীর হয়ে বলল, "আমার গরু কি ন্যায়শাস্ত্র পড়ে পণ্ডিত হয়েছে, যে তার অত বুদ্ধি হবে? সে আপনার টোলে যায়নি, শাস্ত্রও পড়েনি, আর গরুর মাথায় অত মতলব খেলে না।"

পণ্ডিতমশাই ভাবলেন, 'তাও তো বটে। মূর্খ গরুটা ন্যায়শাস্ত্র পড়েনি, তাই কলুর কাছে জব্দ আছে।'

ছাতার মালিক

তারা দেড় বিঘৎ মানুষ।

তাদের আড্ডা ছিল, গ্রাম ছাড়িয়ে, মাঠ ছাড়িয়ে, বনের ধারে, ব্যাং-ছাতার ছায়ার তলায়। ছেলেবেলায় যখন তাদের দাঁত ওঠেনি, তখন থেকে তারা দেখে আসছে, সেই আদ্যিকালের ব্যাঙের ছাতা। সে যে কোথাকার কোন ব্যাঙের ছাতা, সে খবর কেউ জানে না, কিন্তু সবাই বলে, "ব্যাঙের ছাতা।"

যত সব দুষ্টু ছেলে, রাত্রে যারা ঘুমোতে চায় না, মায়ের মুখে ব্যাঙের ছাতার গান শুনে শুনে তাদেরও চোখ বুজে আসে।—

গালফোলা কোলা ব্যাং, পালতোলা রাঙা ছাতা
মেঠো ব্যাং, গেছো ব্যাং, ছেঁড়া ছাতা, ভাঙা ছাতা।

সবুজ রং জবড়জং জরির ছাতা সোনা ব্যাং
টোক্কা-আঁটা ফোক্‌লা ছাতা কোঁকড়া মাথা কোনা ব্যাং।।

—কত ব্যাঙের কত ছাতা!

কিন্তু, আজ অবধি ব্যাংকে তারা চোখেও দেখেনি। সেখানে, মাঠের মধ্যে ঘাসের মধ্যে, সবুজ সবুজ পাগ্‌লা ফড়িং থেকে থেকে তুড়ুক্ ক'রে মাথা ডিঙিয়ে লাফিয়ে যায়; সেখানে রং-বেরঙের প্রজাপতি, তারা ব্যস্ত হয়ে ওড়ে আর বসতে চায়, বসে বসে আর উড়ে পালায়; সেখানে গাছে গাছে কাঠবেড়ালি সারাটা দিন গাছ মাপে আর জরিপ করে, গাছ বেয়ে ওঠে আর গাছ বেয়ে নামে, আর রোদে বসে গোঁফ তাওয়ায় আর হিসেব কষে। কিন্তু তারাও কেউ ব্যাঙের খবর বলতে পারে না।

গ্রামের যত বুড়োবুড়ি, দিদিমা আর ঠাকুমা, তাঁরা বলেন, আজও সে ব্যাং মরেনি, তার ছাতার কথা ভোলেনি। যখন ভরা বর্ষায় বাদল নামে, বন-বাদাড়ে লোক থাকে না, ব্যাং তখন আপন ছাতার তলায় বসে মেঘের সঙ্গে তর্ক করে। যখন নিশুত রাতে সবাই ঘুমোয়, কেউ দেখে না, তখন ব্যাং এসে তার ছাতার ছাওয়ায় ঠ্যাং ছড়িয়ে বুক ফুলিয়ে তান জুড়ে দেয়, "দ্যাখ্ দ্যাখ্ দ্যাখ্, এখন দ্যাখ্।" কিন্তু যেদিন সব দুষ্টু ছেলে জট্‌লা করে বাদ্‌লায় ভিজে দেখতে গেল, কই তারা ত কেউ ব্যাং দেখেনি। আর যেবার তারা নিঝুম রাতে ভরসা করে বনের ধারে কান পেতেছে, সেবারে ত কই গান শোনেনি!

কিন্তু ছাতা যখন আছে, ব্যাং তখন না এসে যাবে কোথায়? একদিন না একদিন ব্যাং ফিরে আসবেই আসবে,—আর বলবে, "আমার ছাতা কই?" তখন তারা বলবে, "এই যে তোমার আদ্যিকালের নতুন ছাতা—নিয়ে যাও। আমরা ভাঙিনি, ছিঁড়িনি, নষ্ট করিনি, নোংরা করিনি, খালি ওর ছায়ায় বসে গল্প করেছি।"—কিন্তু ব্যাংও আসে না, ছাতাও সরে না, ছায়াও নড়ে না, গল্পও ফুরোয় না।

এমনি করেই দিন কেটে যায়, এমনি করেই বছর ফুরোয়। হঠাৎ একদিন সকাল বেলায় গ্রাম জুড়ে এই রব উঠল, "ব্যাং এসেছে, ব্যাং এসেছে। ছাতা নিতে ব্যাং এসেছে!"

কোথায় ব্যাং? কে দেখেছে? বনের ধারে ছাতার তলায়; লালু দেখেছে, ফালু দেখেছে, চাঁদা ভোঁদা সবাই দেখেছে। কী করছে ব্যাং? কী রকম ব্যাং? লালু বললে, "পাট্‌কিলে লাল ব্যাং—যেন হলুদগোলা চুন। এক চোখ বোজা, এক চোখ খোলা।" ফালু বললে, "ছাইয়ের মতন ফ্যাক্‌সা রং, এক চোখ বোজা, এক চোখ খোলা।" চাঁদা বললে, "চক্‌চকে সবুজ, যেন নতুন কচি ঘাস—এক চোখ বোজা, এক চোখ খোলা।" ভোঁদা বললে, "ভুসো-ভুসো রং, যেন পুরোনো তেঁতুল—এক চোখ বোজা, এক চোখ খোলা।"

গ্রামের যত বুড়ো, যত মহা-মহা পণ্ডিত সবাই বললে, "কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। তোরা কী দেখেছিস্ আবার বল।" লালু কালু চাঁদা ভোঁদা সবাই বললে, "ছাতার তলায় জ্যান্ত ব্যাং, তার চার হাত লম্বা ল্যাজ!" শুনে সবাই মাথা নেড়ে বললে, "উঁহুঁ উঁহুঁ! তাহলে কখনো সেটা ব্যাং নয়, সেটা বোধহয় ব্যাঙের বাচ্চা ব্যাঙাচি। তা নইলে ল্যাজ থাকবে কেন?"

ব্যাং না হোক, ব্যাঙের ছেলে তো বটে—ছেলে না হোক নাতি, কিম্বা ভাইপো, কিম্বা ব্যাঙের কেউ তো বটে। সবাই বললে, "চল্ চল্ দেখবি চল্, দেখবি চল্।" সবাই মিলে দৌড়ে চলল।

মাঠের পারে, বনের ধারে, ব্যাং-ছাতার আগায় বসে কে একজন রোদ পোয়াচ্ছে। রঙটা যেন শ্যাওলা-ধরা গাছের বাকল, ল্যাজখানা তার ঘাসের উপর ঝুলে পড়েছে, এক চোখ বুজে এক চোখ খুলে একদৃষ্টে সে তাকিয়ে আছে। সবাই তখন চেঁচিয়ে বললে, "তুমি কে হে? কস্তম্? তুম্ কোন্ হায়? হু আর ইউ?" শুনে সে ডাইনেও তাকালে না, বাঁয়েও তাকালে না, খালি একবার রং বদলিয়ে খোলা চোখটা বুজলে আর বোজা চোখটা খুললে, আর চিড়িক করে এক হাত লম্বা জিভ বার করেই তক্ষুনি আবার গুটিয়ে নিলে।

গ্রামের যে হোম্‌রা বুড়ো, সে বললে, "মোড়ল ভাই, ওটা যে জবাব দেয় না? কালা না কি?" মোড়ল বললে, "হবেও বা।" সর্দার খুড়ো সাহস করে বললে, "চল্ না ভাই, এগিয়ে যাই, কানের কাছে চেঁচিয়ে বলি।" মোড়ল বললে, "ঠিক বলেছ।" হোম্‌রা বললে, "তোমরা এগোও। আমি এই আঁক্‌শি নিয়ে ঐ ঝোপের মধ্যে উঁচিয়ে বসি। যদি কিছু করতে আসে, ঘ্যাঁচাৎ করে কুপিয়ে দেব।"

তখন সর্দার সেই ছাতার উপর উঠে ল্যাজওয়ালাটার কানের কাছে হঠাৎ "কোন হ—া—য়্" বলে এমনি জোরে হাঁকড়ে উঠল যে, সেটা আরেকটু হলেই ছাতার থেকে পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে, দু'চোখ তাকিয়ে বললে, "উঃ? অত চেঁচান কেন মশাই? আমি কি কালা?" তখন সর্দার নরম হয়ে বললে, "তবে যে জবাব দিচ্ছিলে না?" ল্যাজওয়ালা বললে, "দেখছেন না, মাছি খাচ্ছিলাম? কি বলতে চাচ্ছেন বলুন না?"

সর্দার তখন থতমত খেয়ে আমতা আমতা করে বললে, "বলছিলাম কি, তুমি কি ব্যাঙের ছেলে, না ব্যাঙের নাতি, না ব্যাঙের—" ল্যাজওয়ালা তখন বেজায় চটে গিয়ে বললে, "আপনি কি আরসুলার পিশে? আপনি কি চাম্‌চিকের খোকা?" সর্দার বললে, "আহা, রাগ করছ কেন?" সে বললে, "আপনি আমায় ব্যাং ব্যাং করছেন কেন?" সর্দার বললে, "তুমি কি ব্যাঙের কেউ হও না?" জন্তুটা তখন "না-না-না-না—কেউ না—কেউ না" বলে দুই চোখ বুজে ভয়ানক রকম দুলতে লাগল।

তাই না দেখে সর্দার বুড়ো চিৎকার করে বললে, "তবে যে তুমি ছাতা নিতে এয়েছ?" সঙ্গে সঙ্গে সবাই চেঁচাতে লাগল, "নেমে এসো, নেমে এসো,—শিগ্‌গির নেমে এসো।" মোড়ল খুড়ো ছুটে গিয়ে প্রাণপণে তার ল্যাজটা ধরে টানতে লাগল। আর হোম্‌রা বুড়ো ঝোপের মধ্যে থেকে আঁক্‌শিটা উঁচিয়ে তুলল। ল্যাজওয়ালা বিরক্ত হয়ে বললে, "কি আপদ! মশাই, ল্যাজ ধরে টানেন কেন? ছিঁড়ে যাবে যে?" সর্দার বললে, "তুমি কেন ব্যাঙের ছাতায় চড়েছ? আর পা দিয়ে ছাতা মাড়াচ্ছ?" জন্তুটা তখন আকাশের দিকে গোল গোল চোখ করে অনেকক্ষণ তাকিয়ে বললে, "কি বললেন? কিসের কী?" সর্দার বললে, "বললাম যে ব্যাঙের ছাতা।"

যেমনি বলা, অমনি সে খ্যাক্ খ্যাক্ খ্যাক্ খ্যাক্ খ্যাক্ খ্যাক্ করে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে, একেবারে মাটির উপর গড়িয়ে পড়ল। তার গায়ে লাল নীল হলদে সবুজ রামধনুর মতো অদ্ভুত রং খুলতে লাগল। সবাই ব্যস্ত হয়ে দৌড়ে এল, "কী হয়েছে? কী হয়েছে?" কেউ বললে, "জল দাও," কেউ বললে, "বাতাস কর।" অনেকক্ষণ পর জন্তুটা ঠাণ্ডা হয়ে, উঠে বললে, "ব্যাঙের ছাতা কি হে? ওটা বুঝি ব্যাঙের ছাতা হল? যেমন বুদ্ধি তোমাদের! ওটা ছাতাও নয়, ব্যাঙেরও কিছু নয়। যারা বোকা, তারা বলে ব্যাঙের ছাতা।" শুনে কেউ কোনো কথা বলতে পারলে না, সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। শেষকালে ছোকরা মতো একজন জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি কে মশাই?" ল্যাজওয়ালা বললে, "আমি বহুরূপী—আমি গিরগিটির খুড়তুত ভাই, গোসাপের জ্ঞাতি। এটা এখন আমার হল—আমি বাড়ি নিয়ে যাব।"

এই বলে সে "ব্যাঙের ছাতা"টাকে বগলদাবা করে নিয়ে, গম্ভীরভাবে চলে গেল। আর সবাই মিলে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

অসিলক্ষণ পণ্ডিত

রাজার সভায় মোটা মোটা মাইনেওয়ালা অনেকগুলি কর্মচারী। তাদের মধ্যে সকলেই যে খুব কাজের লোক, তা নয়। দু'চারজন খেটেখুটে কাজ করে আর বাকি সবাই বসে বসে মাইনে খায়।

যারা ফাঁকি দিয়ে রোজগার করে, তাদের মধ্যে একজন আছেন, তিনি অসিলক্ষণ পণ্ডিত। তিনি রাজার কাছে এসে বললেন, তিনি অসিলক্ষণ (অর্থাৎ তলোয়ারের দোষ-গুণ) বিচার করতে জানেন। অমনি রাজা বললেন, "উত্তম কথা, আপনি আমার সভায় থাকুন, আমার রাজ্যের যত তলোয়ার আপনি তার লক্ষণ বিচার করবেন।"

সেই অবধি ব্রাহ্মণ রাজার সভায় ভর্তি হয়েছেন, মোটারকম মাইনে পাচ্ছেন, আর প্রতিদিন তলোয়ার পরীক্ষা করছেন, আর বলছেন "এই তলোয়ারটা ভালো, এই তলোয়ারটা খারাপ।" ভারি কঠিন কাজ! কত তলোয়ার ঘেঁটে-ঘুঁটে, দেখে আর শুঁকে, চট্‌পট্ তার বিচার করছেন।

তাঁর বিচারের নিয়মটি কিন্তু ভারি সহজ! তলোয়ার এনে যখন তাঁর হাতে দেওয়া হয়, তখন তিনি সেটাকে শুঁকে দেখেন। তলোয়ার যারা বানায়, তারা তলোয়ারের গায়ে তাদের মার্কা এঁকে দেয়। তাই দেখে বোঝা যায় কোনটা কার তলোয়ার। পণ্ডিতমহাশয় শুঁকবার সময় সেই মার্কাটুকু দেখে নেন। যাদের উপর তিনি খুব খুশি থাকেন, যারা তাঁকে পয়সা-টয়সা দেয়, আর খাইয়ে-দাইয়ে তোয়াজ করে, তাদের তলোয়ার দেখলেই তিনি নেড়েচেড়ে টিপেটুপে বলেন, "খাসা তলোয়ার! দিব্যি তলোয়ার! হাজার টাকা দামের

তলোয়ার!" আর যাদের উপর তিনি চটা, যারা তাঁকে ঘুষও দেয় না, খাতিরও করে না, তাদের তলোয়ার যত ভালোই হোক না কেন, তাঁর কাছে পার পাবার যো নেই। সেগুলি হাতে পড়লেই তিনি অমনি একটু শুঁকেই নাক সিঁট্‌কিয়ে বলে ওঠেন, "অতি বিচ্ছিরি! অতি বিচ্ছিরি! তলোয়ার তো নয়, যেন কাস্তে গড়েছে!"

এমনি করে কত ভালো ভালো কারিকর, কত চমৎকার তলোয়ার বানিয়ে আনে, কিন্তু বিচারের গুণে তার দু'টাকাও দাম হয় না। এর মধ্যে একজন ওস্তাদ কারিকর আছে, সে বেচারা মনপ্রাণ দিয়ে এক একখানি তলোয়ার গড়ে, আর বিচারক মশাই "দূর! দূর!" করে সব বাতিল করে দেন। এই রকম হতে হতে শেষটা কারিকর গেল ক্ষেপে।

একদিন সে করল কি, একখানি তলোয়ার বানিয়ে, তার গায়ে বেশ করে লঙ্কার গুঁড়ো মাখিয়ে অসিলক্ষণ পণ্ডিতের কাছে এনে হাজির করল। পণ্ডিত নিতান্ত তাচ্ছিল্য করে, "আবার কী গড়ে আনলি? দেখি?" বলে, যেমনি তাতে নাক ঠেকিয়ে শুঁকতে গেছেন, অমনি লঙ্কার গুঁড়ো নাকে ঢুকতেই হ্যাঁ-চ্-চো করে এক বিকট হাঁচি, আর সেই সঙ্গে তলোয়ারের আগায় ঘ্যাঁচ্ করে নাক কেটে দু'খান!

চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল, "জল আন্‌রে," "কবিরাজ ডাক্‌রে,"—ততক্ষণে তলোয়ারওয়ালা লম্বা লম্বা পা ফেলে তার বাড়ি পর্যন্ত পিঠ্‌টান দিয়েছে।

অসিলক্ষণ পণ্ডিতের মহা মুশকিল। একে তো কাটা নাকের যন্ত্রণা, তার উপর সভায় বেরুলে সবাই ক্ষ্যাপায় "নাক-কাটা পণ্ডিত" বলে। বেচারার এখন মুখ দেখানই দায়, সে সভায়ও যেতে পারে না, চাকরিও করতে পারে না। তাকে দেখলেই লোক জিজ্ঞাসা করে, "তঁলোঁয়াঁরটাঁ কেঁমন ছিঁলঁ!"

ব্যাঙের রাজা

রাজবাড়িতে যাবার যে পথ, সেই পথের ধারে প্রকাণ্ড দেয়াল, সেই দেয়ালের একপাশে ব্যাঙেদের পুকুর। সোনাব্যাং, কোলাব্যাং, গেছোব্যাং, মেঠোব্যাং—সকলেরই বাড়ি সেই পুকুরের ধারে। ব্যাঙেদের সর্দার যে বুড়ো ব্যাং, সে থাকে দেয়ালের ধারে, একটা মরা গাছের ফাটলের মধ্যে, আর ভোর হলে সবাইকে ডাক দিয়ে জাগায়—"আয় আয় আয়—গ্যাঁক্ গ্যাঁক্ গ্যাঁক্—দেখ্ দেখ্ দেখ্—ব্যাং ব্যাং ব্যাং—ব্যাঙাচি।" এই বলে সে অহংকারে গাল ফুলিয়ে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, আর ব্যাংগুলো সব "যাই যাই যাই—থাক্ থাক্ থাক্" বলে, ঘুম ভেঙে, মুখ ধুয়ে দাঁত মেজে, পুকুর-পারের সভায় বসে।

একদিন হয়েছে কি, সর্দার ব্যাং ফূর্তির চোটে লাফ দিয়েছে উলটোমুখে ডিগবাজি খেয়ে—আর পড়বি তো পড়, একেবারে দেয়াল টপকে রাজপথের মধ্যিখানে! রাজা তখন সভায় চলেছেন, সিপাইশাস্ত্রী লোকলস্কর দলবল সব সঙ্গে চলেছে। মোটা মোটা সব নাগ্‌রাই

জুতো, খট্‌মট্‌ ঘ্যাচ্‌ম্যাচ্‌ করে ব্যাং বুড়োর মাথার উপর দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছে এমনি রোখ ক'রে চলতে লেগেছে, যে ভয়ে ব্যাঙের প্রাণ তো যায় যায়! হঠাৎ কোত্থেকে কার একটা লাঠি না ছাতা না কিসের গুঁতো এসে এমনি ধাঁই করে ব্যাঙের গায়ে লেগেছে যে সে বেচারা ঠিক্‌রে গিয়ে পথের ধারে ঘাসের উপর চিৎপাত হয়ে পড়েছে।

ব্যাং বুড়োর খুব লেগেছিল, কিন্তু হাতও ভাঙেনি, পাও ভাঙেনি, সে আস্তে আস্তে উঠে বসল—আর চারদিকে তাকিয়ে, দেয়ালের গায়ে একটা ফাটল দেখে, তাড়াতাড়ি তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। সেখান থেকে খুব সাবধানে মুখ বার করে সে চেয়ে দেখল, মাথায়-মুকুট রঙিন-পোশাক রাজা, আলো-ঝল্‌মল্‌ চতুর্দোলায় চড়ে সভায় যাচ্ছেন। লোকেরা সব "রাজা, রাজা" বলে নমস্কার করছে, নাচছে, গাইছে আর ছুটোছুটি করছে। আর রাজামশাই চতুর্দোলায় বসে খুশি হয়ে, এর দিকে তাকাচ্ছেন, ওর দিকে তাকাচ্ছেন, আর কেবলি হাস্‌ছেন। তাই দেখে ব্যাঙের বড় ভালো লাগল, সেও দু'হাত তুলে নমস্কার করতে লাগল আর বলতে লাগল, "রাজা রাজা রাজা—রাজা রাজা রাজা—" তার মনে হল রাজামশাই ঠিক যেন তার দিকে তাকিয়ে ফিক্‌ করে হেসে ফেললেন! ব্যাং তখন কাঁদ কাঁদ হয়ে নিশ্বাস ফেলে ভাবল, "আহা! আমাদের যদি একটা রাজা থাকত!"

তারপর ঘুরে ঘুরে পথ খুঁজে খুঁজে ব্যাং যখন বাসায় ফিরল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। সবাই বলল, "সর্দার বুড়ো, সর্দার বুড়ো, সারাদিন তুমি কোথায় ছিলে? আমরা যে কত ডাকলাম, কত খুঁজলাম, তুমি তো কই সাড়াও দিলে না।" সর্দার বলল—"চোপ্‌ চোপ্‌ চোপ্‌ রাও! রাজা দেখতে গিয়েছিলাম।" তাই শুনে ব্যাঙেরা সব এক সঙ্গে "রাজা কে ভাই?" "রাজা কে ভাই?" "রাজা কে ভাই?" বলে চেঁচিয়ে উঠল। বুড়ো তখন গাল ফুলিয়ে, বুক ফুলিয়ে, দু'চোখ বুজে, দু'হাত তুলে লাফিয়ে বলল, "রাজা হচ্ছে এই এত্তো বড়ো উঁচু, আর ধব্‌ধবে সাদা আর ঝক্‌ঝকে আলোর মতো—আর তাকে দেখলেই সবাই মিলে ডাকতে থাকে—'রাজা রাজা রাজা রাজা'।" তাই শুনে ব্যাঙেরা সবাই বলতে লাগল, "আহা! আহা! আমাদের যদি একটা রাজা থাকত!" তাদের যে রাজা নেই, এই কথা ভাবতে ভাবতে তাদের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল। বুড়ো ব্যাং বলল, "ভাই সকল, এস আমরা রাজার জন্য দরখাস্ত করি।" তখন সবাই মিলে গোল হয়ে বসে, আকাশের দিকে চোখ তুলে, নানান সুরে ডাকতে লাগল—"রাজা রাজা রাজা রাজা—রাজা রাজা রাজা রাজা—রাজা চাই রাজা চাই—রাজা চাই রাজা চাই।"

ব্যাংপুকুরের ব্যাং দেবতা—যিনি বাদ্‌লা দিনে বর্ষা মেঘের ঝাঁঝরি দিয়ে পুকুর ভরে জল ঢালেন—তিনি তখন আকাশতলায় চাদর মেলে ঘুমচ্ছিলেন। হঠাৎ ব্যাঙেদের চীৎকারে তাঁর ঘুম ভাঙল। তিনি চারিদিকে তাকিয়ে বললেন, "বৃষ্টিও নেই, বাদ্‌লাও নেই, মেঘের কোনো চিহ্নও নেই, বাছারা সব চেঁচাও কেন?" ব্যাঙেরা বলল, "আমাদের রাজা নেই, রাজা চাই।" দেবতা বললেন, "এই নে রাজা।" বলে মরা গাছের একখানা ডাল ভেঙে তাদের সামনে ফেলে দিলেন।

ভাঙা ডাল পুকুরপাড়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল—তার মাথার উপর মস্ত মস্ত ব্যাঙের ছাতা জোছনায় চক্‌চক্‌ করতে লাগল। তাই দেখে ব্যাঙের ফূর্তি আর ধরে না।

তারা গোল হয়ে ঘিরে বসে মনের সুখে গাল ফুলিয়ে গাইতে লাগল—"রাজা রাজা রাজা রাজা— রাজা রাজা রাজা রাজা—"

এমনি করে দু'দিন যায়, দশদিন যায়, শেষটায় একদিন সর্দার ব্যাঙের গিন্নী বললেন, "ছাই রাজা! কর্তা যে সেদিন রাজা দেখলেন, এর চেয়ে সে অনেক ভালো। এ রাজা নড়েও না চড়েও না, এদিকেও দেখে না ওদিকেও দেখে না—ছাই রাজা!" তাই শুনে সবাই বলল, "ছাই রাজা! ছাই রাজা!—নড়েও না চড়েও না, দেখেও না শোনেও না—ছাই রাজা!" তখন আবার বুড়ো ব্যাং গাছের উপর চড়ে বলল, "ভাই সকল, এস আমরা দরখাস্ত করি—আমাদের ভালো রাজা চাই।" আবার সবাই গোল হয়ে বসে আকাশপানে চোখ তাকিয়ে নানান্ সুরে ডাকতে লাগল—"রাজা চাই! রাজা চাই! ভালো রাজা—নতুন রাজা।" তাই শুনে ব্যাং দেবতা জেগে বললেন, "ব্যাপারখানা কী? এই তো সেদিন তোদের রাজা দিলাম, এর মধ্যে আবার নতুন কী হল?" ব্যাঙেরা বলল, "ও রাজা ছাই রাজা! ও রাজা বিশ্রী রাজা—ও রাজা নড়েও না চড়েও না—ও রাজা চাই না চাই না চাই না চাই না চাই না চাই" ব্যাং দেবতা বললেন, "থাম্ তোরা থাম্—নতুন রাজা দিচ্ছি।" এই বলে, একটা বককে সেই পুকুরের ধারে নামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "এই নে তোদের নতুন রাজা।"

তাই না দেখে, ব্যাঙেরা সব অবাক হয়ে বলতে লাগল, "বাপ্‌রে বাপ্! কি প্রকাণ্ড রাজা!" চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে ধব্‌ধবে সাদা! ভালো রাজা! সুন্দর রাজা! রাজা রাজা রাজা রাজা। বকের তখন খিদে ছিল না, মাছ খেয়ে পেট ভরা ছিল, তাই সে কিছু বলল না; খালি চোখ মিট্‌মিট্ করে একবার এদিকে তাকাল, একবার ওদিকে তাকাল, তারপর এক পা তুলে চুপচাপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তাই দেখে ব্যাঙেদের উৎসাহ আর ধরে না, তারা প্রাণ খুলে গলা ছেড়ে গাইতে লাগল। সকাল গেল, দুপুর গেল, বিকেল হল, সন্ধ্যা হল—তারপর ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার রাত্রি এল—তখন ব্যাঙেদের গান গাওয়া বন্ধ হল।

তার পরের দিন সকালবেলায় উঠে যেমনি তারা গান ধরেছে, অমনি বকরাজা এসে একটা গোব্‌দামতন মোটা ব্যাংকে টপাস্ করে মুখের মধ্যে পুরে দিয়েছে! তাই দেখে ব্যাঙেরা সব হঠাৎ কেমন মুষড়ে গেল—তাদের "রাজা রাজা"র গান একেবারে পাঁচ সুর নেমে গেল। বকরাজা ব্যাংটিকে দিয়ে জলযোগ করে একটি ঠ্যাং মুড়ে ধ্যান করতে লাগলেন।

এমনি করে এক-এক বেলায় এক-একটি করে ব্যাং বকরাজার পেটের মধ্যে যায়। ব্যাং-মহলে হৈ চৈ লেগে গেল। সবাই মিলে সভায় বসে যুক্তি করে বলল, "এটা বড় অন্যায় হচ্ছে। রাজাকে বুঝিয়ে বলা দরকার, সে হল আমাদের রাজা, সে এমন করলে আমরা পালাই কোথা?" কিন্তু বুঝিয়ে বলবে কে? সর্দার গিন্নী বললেন, "তার জন্য ভাবছিস্ কেন? এতে আর মুশকিল কিসের? এই দেখ্ না, আমিই গিয়ে বলে আসছি।"

সর্দার গিন্নী বকরাজার পায়ের সামনে গ্যাঁট হয়ে বসে, হাতমুখ নেড়ে কড়্‌কড়ে গলায় বলতে লাগলেন, "ও রাজা, তোর ভাগ্যি ভালো, তুই আমাদের রাজা হলি। তোর চোখ ভালো, মুখ ভালো, ঝক্‌ঝকে রঙ ভালো, তোর এক পা-ও ভালো, দুই পা-ও ভালো, কেবল ঐটি তোর ভালো নয়,—তুই আমাদের খাস কেন? শামুক আছে শামুক খা' না, পোকা মাকড় প্রজাপতি তাও তো তুই খেতে পারিস। রাজা হয়ে আমাদের খেতে চাস?

ছ্যা ছ্যা ছ্যা ছ্যা—রাম রাম রাম রাম—অমন আর কখনো করিসনে।" বক দেখলে তার পায়ের কাছে দিব্যি একটা নাদুসনুদুস্ ব্যাং, তার নরম নরম গোলগাল চেহারা! টপ্ করে বকরাজার জিভ দিয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল আর খপ্ করে সর্দার গিন্নী তার মুখের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন!

ব্যাঙেদের মুখে আর কথাটি নেই। সবাই তাড়াতাড়ি চট্‌পট্ সরে ব'সে বড় বড় হাঁ করে তাকিয়ে রইল। পরে সর্দার ব্যাং রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বলল, "পাজ্জি রাজা! লক্ষ্মীছাড়া দুষ্টু রাজা!" তাই শুনে সবাই একসঙ্গে আকাশ ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল, "পাজি রাজা! দুষ্টু রাজা!—চাই না চাই না চাই না চাই না—রাজা চাই না, রাজা চাই না।"

ব্যাং দেবতা জেগে বললেন, "দূর ছাই! আবার কী হল?" ব্যাঙেরা বলল, "বাপ্‌রে বাপ্! বাপ্‌রে বাপ্! কী দুষ্টু রাজা! নিয়ে যাও, নিয়ে যাও, নিয়ে যাও!"

তখন ব্যাং দেবতা হুশ্ করে তাড়া দিতেই বকরাজা পাখা মেলে উড়ে পালাল। আর ব্যাঙেরা সব বাসায় গিয়ে বলতে লাগল, "গ্যাঁক্ গ্যাঁক গ্যাঁক্—বাপ্ বাপ্ বাপ্—ছ্যা ছ্যা ছ্যা—রাজাটাজা আর কক্ষনো চাইব না।"

ডাকাত নাকি?

হারুবাবু সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরছেন। স্টেশন থেকে বাড়ি প্রায় আধ মাইল দূর, বেলাও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। হারুবাবু তাড়তাড়ি পা চালিয়ে চলছেন। তাঁর এক হাতে

ব্যাগ, আর এক হাতে ছাতা।

চলতে চলতে হঠাৎ তাঁর মনে হল, কে যেন তাঁর পিছন পিছন আসছে। তিনি আড়চোখে তাকিয়ে দেখেন, সত্যি সত্যি কে যেন ঠিক তাঁরই মতন হন্‌হনিয়ে তাঁর পিছন পিছন আসছে। হারুবাবুর মনে কেমন ভয় হল—চোর ডাকাত নয়তো! ওরে বাবা! সামনের ঐ মাঠটা পার হবার সময় একলা পেয়ে হঠাৎ যদি ঘাড়ের উপর দু'চার ঘা লাঠি কষিয়ে দেয় তাহলেই তো গেছি! হারুবাবুর রোগা-রোগা পা দু'টো কাঁপতে কাঁপতে ছুটতে লাগল। কিন্তু লোকটাও যে সঙ্গে সঙ্গে ছোটে!

তখন হারুবাবু ভাবলেন, সোজা মাঠের উপর দিয়ে গিয়ে কাজ নেই। বড় রাস্তা দিয়ে বদ্যিপাড়া ঘুরেই যাওয়া যাক, না হয় একটু হাঁটাই হল। তিনি ফস্ করে ডানদিকের একটা গলির ভিতর ঢুকেই বক্সীদের বেড়া টপকিয়ে একদৌড়ে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়লেন। ওমা! সেই লোকটাও কি দুষ্টু, সেও দেখাদেখি ঠিক তেমনি করে বেপথ দিয়ে বড় রাস্তায় এসে হাজির!

হারুবাবু ছাতাটাকে বেশ শক্ত করে আঁকড়ে ধরলেন—ভাবলেন, যা থাকে কপালে, কাছে আসলেই দু'চার ঘা কষিয়ে দেব। হারুবাবুর মনে পড়ল, ছেলেবেলায় তিনি জিম্‌নাস্টিক্ করতেন—দু'তিনবার তিনি হাতের 'মাস্‌ল্' ফুলিয়ে দেখলেন, এখনও শক্ত হয় কিনা।

আর একটু সামনেই কালিবাড়ি। হারুবাবু তার কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ রাস্তা ছেড়ে ঝোপজঙ্গল ভেঙে প্রাণপণ ছুটতে লাগলেন। পিছনে পায়ের শব্দ শুনে বুঝতে পারলেন যে, লোকটাও সঙ্গে সঙ্গেই ছুটছে! এ কিন্তু ডাকাত না হয়ে যেতেই পারে না! হারুবাবুর হাত পা সব ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল, কপালে বড় বড় ঘামের ফোঁটা দেখা দিল। এমন সময় হঠাৎ শোনা গেল, সামনে ঘাটের পাশে বসে কারা যেন গল্প করছে।

শুনবামাত্র হারুবাবুর মনে সাহস হল। তিনি ধাঁ করে ছাতা বাগিয়ে সিংহবিক্রমে ফিরে বললেন, "তবে রে! আমি টের পাইনি বুঝি? ভালো চাস তো—" কিন্তু লোকটির চেহারা দেখে হঠাৎ তাঁর বক্তৃতার তেজ থেমে গেল। অত্যন্ত নিরীহ রোগা ভালোমানুষ গোছের লোকটি—ডাকাতের মতো একেবারেই নয়!

হারুবাবু তখন একটু নরম মতো ধমক দিয়ে বললেন—"খামখা আমার পেছন পেছন ঘুরছ কেন হে?" লোকটি অত্যন্ত ভয় পেয়ে আর থতমত খেয়ে বলল, "স্টেশনের বাবুটি যে বললেন, আপনি বলরামবাবুর পাশের বাড়িতেই থাকেন, আপনার সঙ্গে গেলেই ঠিকমতো পৌছব।—তা আপনি কি বরাবর এইরকম করে বেঁকেচুরে চলেন নাকি?" হারুবাবু ঠিক এক মিনিট হাঁ করে তাকিয়ে থেকেও বলবার মতো কোনো জবাব খুঁজে পেলেন না। কাজেই ঘাড় হেঁট করে আবার সোজা পথে বাড়ি ফিরে চললেন।

পুতুলের ভোজ

পুতুলের মা খুকী আজ ভয়ানক ব্যস্ত। আজ কিনা ছোট্ট পুতুলের জন্মদিন, তাই খুব খাওয়ার ধুম লেগেছে। ছোট্ট টেবিলের উপর ছোট্ট ছোট্ট থালা বাটি সাজিয়ে, তার মধ্যে কি চমৎকার করে খাবার তৈরি ক'রে রাখা হয়েছে। আর চারদিকে সত্যিকারের ছোট্ট ছোট্ট চেয়ার সাজানো রয়েছে, পুতুলেরা বসে খাবে বলে।

খুকীর যে ছোটদাদা, তার কিনা সাড়ে চার বছর বয়স, তাই সে বলে, "পুতুলরা খেতেই পারে না, তাদের আবার জন্মদিন কি?" কিন্তু খুকী সে কথা মানবে কেন? সে বলে, "পুতুলরা সব পারে। কে বলল পারে না? কে বলল যে কক্ষনো কোনোদিন তারা কথা বলে না, কক্ষনো কোনোদিন খায় না?"—খোকাপুতুলের যখন অসুখ করেছিল তখন সে কি 'মা, মা' বলে কাঁদত না? নিশ্চয়ই কাঁদত। তা না হলে খুকী জানল কী করে যে তার অসুখ করেছে? খুকীর দাদা এ সবের জবাব দিতে পারে না, তাই সে "বোকা মেয়ে, হাঁদা মেয়ে" বলে মুখ ভেঙচিয়ে চলে যায়।

খুকী গেল তার মা'র কাছে নালিশ করতে। মা সব শুনে-টুনে বললেন, "সব সময়ে সকলের কাছে কি পুতুলরা জ্যান্ত হয়? যেদিন দেখবি পুতুল সত্যি করে খাবার খাচ্ছে, সেদিন ছোড়দাকে ডেকে দেখাস্।" খুকী বললে, "আজকে যদি ওরা জেগে উঠে খাবার খেতে থাকে, তাহলে কী মজাই হবে! আমার বোধহয় রাত্তিরে যখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি, তখন তাদের দিন হয়! তা না হলে আমরা তো দেখতে পেতাম? সেই যে একদিন টিনের তৈরি দুষ্টু পুতুলটা খাট থেকে পড়ে গিয়েছিল—নিশ্চয় ওরা রাত্রে উঠে মারামারি করেছিল! তা না হলে খাট থেকে পড়ল কেন? আজ থেকে আমি ঘুমোবার সময় খুব ভালো করে কান পেতে থাকব।"

পুতুলের জন্মদিনে কি চমৎকার খাবার! ময়দার মিঠাই, ময়দার পিঠে, ছোট্ট ছোট্ট নারকলের মোয়া, আর ছোট্ট ছোট্ট গুড়ের টিক্‌ল—এমনি সব আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস। রাত্রে শোবার আগে খুকী তার পুতুলদের ঝেড়ে মুছে নাইয়ে খাইয়ে ঘুম পাড়াল আর বলে দিল, "এই দেখ্, খাবার-টাবার রইল, রাত্রে উঠে খাস্।" কোথায় কে বসবে, কোনটার পর কোনটা খাবে, ঝগড়া করলে কে কী শাস্তি পাবে সব বলে, তারপর দুষ্টু পুতুলটাকে খুব বকে ধমকে, আর ছোট্ট পুতুলকে জন্মদিনের জন্য খুব খানিকটা আদর-টাদর ক'রে, তারপর খুকী গেল বিছানায় শুতে। যেমনি শোয়া অমনি ঘুম।

খুকীও ঘুমিয়েছে, আর অমনি ঘরের মধ্যে কাদের টিপ্‌টিপ্ পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তাদের একজন খুকুমণির জুতোর কাছে, ঘরের কোণে ছবির বইগুলোর কাছে, পুতুলদের চাদর-ঢাকা খাটের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে; এটা ওটা শুঁক্‌ছে, আর কুটুর-কুটুর ক'রে এতে ওতে কামড়িয়ে দেখছে! খানিকটা বর্ণ-পরিচয়ের পাতা খেয়ে দেখল, ভালো লাগে না; জুতোর ফিতেটা চিবিয়ে দেখল, তার মধ্যে কিচ্ছু রস নেই; টিনের পুতুলটাকে কামড়িয়ে দেখল—ওরে বাবা, কী শক্ত! এমন সময় হঠাৎ অন্ধকারে তার চোখ পড়ল—টেবিলে

সাজানো ও সব কী রে!

দৌড়ে চেয়ার-টেয়ার উল্‌টিয়ে এক লাফে টেবিলের উপর চড়ে সে একটুখানি শুঁকেই ব্যস্ত হয়ে বলল, "কিঁচ্ কিঁচ্ কী—চ্!" তার মানে, "ওগো শিগ্‌গির এস—দেখে যাও!" অমনি টিপ্ টিপ্ টুপ্ ট্যাপ্ ট্যাপ্ থপ করে সেইরকম আর একটা এসে হাজির। ঠিক সেইরকম লোমে ঢাকা ছেয়ে রং, সেইরকম সরু লম্বা ল্যাজ, আর সেইরকম চোখা চোখা নাক আর মিট্‌মিটে কালো কালো চোখ। দু'জনের উৎসাহ আর ধরে না! টপাটপ্ টপাটপ্ খাচ্ছে আর তাদের ভাষায় কেবলি বলছে, "এটা খাও ওটা খাও! এটা কী সুন্দর! ওটা কেমন চমৎকার!" এমনি করে, দেখতে দেখতে, যত খাবার সব চেটেপুটে শেষ!

সকালবেলায় খুকী উঠে দেখল—ওমা! কি আশ্চর্য! সব খাওয়া শেষ হয়ে গেছে! কখন যে পুতুলগুলো জেগে উঠল, কখন যে খেল, আর কখন যে আবার ঘুমোল, কিছুই সে টের পায়নি। "খেয়েছে! খেয়েছে! সব খাবার খেয়েছে" বলে সে এমন চেঁচিয়ে উঠল যে মা বাবা ছোড়দা বড়দা সবাই ছুটে এসে হাজির।

ব্যাপার দেখে আর খুকীর কথা শুনে সবাই বলল, "তাই তো! কি আশ্চর্য!" খালি ছোড়দা বলল, "তা বই কি! ও নিজে খেয়ে এখন বলছে—পুতুলে খেয়েছে।" দেখ তো কি অন্যায়!

আসলে ব্যাপারটা যে কী, তা কেবল মা জানেন আর বাবা জানেন, কারণ তাঁরা ঘরের কোণে ইঁদুরের ছোট্ট ছোট্ট পায়ের দাগ দেখেছিলেন। কিন্তু সে কথা খুকীকে যদি বল, সে কখনো তোমার কথা বিশ্বাস করবে না।

উকিলের বুদ্ধি

গরিব চাষা, তার নামে মহাজন নালিশ করেছে। বেচারা কবে তার কাছে পঁচিশ টাকা নিয়েছিল, সুদে-আসলে তাই এখন পাঁচশো টাকায় দাঁড়িয়েছে। চাষা অনেক কষ্টে একশো টাকা যোগাড় করেছে; কিন্তু মহাজন বলছে, "পাঁচশো টাকার এক পয়সাও কম নয়; দিতে না পার তো জেলে যাও।" সুতরাং চাষার আর রক্ষা নাই।

এমন সময় শামলা মাথায় চশমা চোখে তোখোড়-বুদ্ধি উকিল এসে বলল, "ঐ একশো টাকা আমায় দিলে, তোমার বাঁচবার উপায় করতে পারি।" চাষা তার হাতে ধরল, পায়ে ধরল, বলল, "আমায় বাঁচিয়ে দিন।" উকিল বলল, "তবে শোন, আমার ফন্দি বলি। যখন আদালতের কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াবে, তখন বাপু কথা-টথা কয়ো না। যে যা খুশি বলুক, গাল দিক আর প্রশ্ন করুক, তুমি তার জবাবটি দেবে না—খালি পাঁঠার মতো 'ব্যা—' করবে। তা যদি করতে পার, তা 'হ'লে আমি তোমায় খালাস করিয়ে দেব।" চাষা বলল, "আপনি কর্তা যা বলেন, তাতেই আমি রাজী।"

আদালতে মহাজনের মস্ত উকিল, চাষাকে এক ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি সাত বছর আগে পঁচিশ টাকা কর্জ নিয়েছিলে?" চাষা তার দিকে চেয়ে বলল, "ব্যা—"। উকিল বলল, "খবরদার!—বল, নিয়েছিলে কি না।" চাষা বলল, "ব্যা—"। উকিল বলল, "হুজুর! আসামীর বেয়াদবি দেখুন।" হাকিম রেগে বললেন, "ফের্ যদি অমনি করিস, তোকে আমি ফাটক দেব।" চাষা অত্যন্ত ভয় পেয়ে কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল, "ব্যা—ব্যা—"। হাকিম বললেন, "লোকটা পাগল নাকি?"

তখন চাষার উকিল উঠে বলল, "হুজুর, ও কি আজকের পাগল—ও বহুকালের পাগল, জন্মে অবধি পাগল। ওর কি কোনো বুদ্ধি আছে, না কাণ্ডজ্ঞান আছে? ও আবার কর্জ নেবে কি! ও কি কখনও খত্ লিখতে পারে নাকি? আর পাগলের খত্ লিখলেই বা কি? দেখুন দেখি, এই হতভাগা মহাজনটার কাণ্ড দেখুন তো! ইচ্ছে করে জেনে শুনে পাগলটাকে ঠকিয়ে নেবার মতলব করেছে। আরে, ওর কি মাথার ঠিক আছে? এরা বলেছে, 'এইখানে একটা আঙ্গুলের টিপ্ দে'—পাগল কি জানে, সে অমনি টিপ্ দিয়েছে। এই তো ব্যাপার!"

দুই উকিলে ঝগড়া বেধে গেল। হাকিম খানিক শুনে-টুনে বললেন, "মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্।" মহাজনের তো চক্ষুস্থির। সে আদালতের বাইরে এসে চাষাকে বলল, "আচ্ছা, না হয় তোর চারশো টাকা ছেড়েই দিলাম—ঐ একশো টাকাই দে।" চাষা বলল, "ব্যা—!" মহাজন যতই বলে, যতই বোঝায়, চাষা তার পাঁঠার বুলি কিছুতেই ছাড়ে না। মহাজন রেগে-মেগে বলে গেল, "দেখে নেব, আমার টাকা তুই কেমন করে হজম করিস!"

চাষা তার পোঁট্‌লা নিয়ে গ্রামে ফিরতে চলেছে, এমন সময় তার উকিল এসে ধরল, "যাচ্ছ কোথায় বাপু? আমার পাওনাটা আগে চুকিয়ে যাও। একশো টাকায় যে রফা হয়েছিল, এখন মোকদ্দমা তো জিতিয়ে দিলাম।" চাষা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "ব্যা—।" উকিল বলল, "বাপু হে, ও-সব চালাকি খাটবে না—টাকাটি এখন বের কর।" চাষা বোকার মতো মুখ করে আবার বলল, "ব্যা—" উকিল তাকে নরম গরম অনেক কথাই শোনাল, কিন্তু চাষার মুখে কেবলই ঐ এক জবাব! তখন উকিল বলল, "হতভাগা গোমুখ্যু পাড়াগেঁয়ে ভূত—তোর পেটে অ্যাতো শয়তানি কে জানে! আগে যদি জানতাম তা হলে পোঁট্‌লাসুদ্ধ টাকাগুলো আটকে রাখতাম।"

বুদ্ধিমান উকিলের আর দক্ষিণা পাওয়া হল না।

বুদ্ধিমান শিষ্য

এক মুনি, তাঁর অনেক শিষ্য। মুনিঠাকুর তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধে এক মস্ত যজ্ঞের আয়োজন করলেন। সে যজ্ঞ এর আগে মুনির আশ্রমে আর হয়নি। তাই তিনি শিষ্যদের ডেকে

বললেন, "আমি এক যজ্ঞের আয়োজন করেছি, সে যজ্ঞ তোমরা হয়তো আর কোথাও দেখবার সুযোগ পাবে না, কাজেই যজ্ঞের সব কাজ কর্ম বিধি ব্যবস্থা বেশ মন দিয়ে দেখো। নিজের চোখে সব ভালো করে না দেখলে শুধু পুঁথি পড়ে এ যজ্ঞ করা সম্ভব হবে না।"

মুনিঠাকুরের আশ্রমে বেড়ালের ভারি উৎপাত; যজ্ঞের আয়োজন সব ঠিক হচ্ছে, এর মধ্যে বেড়ালগুলো এসে জ্বালাতন আরম্ভ করেছে—এটাতে মুখ দেয়, ওটা উল্‌টে ফেলে, কিছুতেই তাদের সামলানো যায় না। তখন মুনিঠাকুর রেগে বললেন, "বেড়ালগুলোকে ধরে ঐ কোণায় বেঁধে রেখে দাও তো।" অমনি নয়টা বেড়ালকে ধরে সভার এক পাশে খোঁটায় বেঁধে রাখা হল। তারপর ঠিক সময় বুঝে যজ্ঞ আরম্ভ হল। শিষ্যেরা সব সভার সাজসজ্জা, আয়োজন, যজ্ঞের সব ক্রিয়া-কাণ্ড, মন্ত্রোচ্চারণের নিয়ম ইত্যাদি মন দিয়ে দেখতে আর শুনতে লাগল। নির্বিঘ্নে অতি সুন্দররূপে মুনিঠাকুরের যজ্ঞ সম্পন্ন হল।

কিছুকাল পরে শিষ্যদের মধ্যে একজনের বাবা মারা গেলেন। শিষ্যের ভারি ইচ্ছা তার পিতৃশ্রাদ্ধে সেও ঐ রকম সুন্দর যজ্ঞের আয়োজন করে। সে গিয়ে তার গুরুকে ধরল। তিনি বললেন, "আচ্ছা, সব আয়োজন করতে থাক, আমি এসে যজ্ঞের পুরোহিত হব।" শিষ্য মহা সন্তুষ্ট হয়ে যজ্ঞের সব ঠিকঠাক করতে লাগল।

ক্রমে যজ্ঞের দিন উপস্থিত। মুনিঠাকুর সশিষ্য শ্রাদ্ধের সভায় উপস্থিত; ঠিক নিয়ম মতো যজ্ঞের সমস্ত ব্যবস্থা প্রস্তুত হয়েছে কিন্তু শিষ্যটি তখনও সভাস্থলে এসে বসছে না, কেবল ব্যস্তভাবে ঘোরাঘুরি করছে। এদিকে যজ্ঞের সময় প্রায় উপস্থিত দেখে মুনিঠাকুরও ক্রমে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তিনি শিষ্যকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আর বিলম্ব কেন? সবই তো প্রস্তুত, যজ্ঞের সময়ও উপস্থিত, এই বেলা সভায় এস।" শিষ্য বলল, "আজ্ঞে একটা আয়োজন বাকি রয়ে গেছে, সেইটা নিয়ে ভারি মুশকিলে পড়েছি।" মুনি বললেন, "কই, কিছুরই তো অভাব দেখছি না।" শিষ্য বলল,"আজ্ঞে চারটে বেড়াল কম পড়েছে।" মুনি বললেন, "সে কি রকম? শিষ্য মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "ঐ যে আপনার যজ্ঞে দেখলাম ঈশান কোণে নয়টা বেড়াল বাঁধা রয়েছে। আমাদের এ গ্রামে অনেক খুঁজে পাঁচটার বেশি পাওয়াই গেল না, কাজেই আর বাকি চারটার জন্য পাশের গ্রামে লোক গিয়েছে; তারা এই এসে পড়ল ব'লে।" শুনে গুরুর তো চক্ষুস্থির! তিনি বললেন, "আরে বুদ্ধিমান! কোনটা যজ্ঞের অঙ্গ আর কোনটা নয় তাও বিচার করতে শেখনি? আশ্রমের বেড়ালগুলি উৎপাত করছিল তাই বেঁধে রেখেছিলাম, তোমার এখানে কোনো উৎপাত ছিল না, তুমি আবার গায়ে পড়ে উৎপাত সংগ্রহ করতে গিয়েছ? বসে পড়, বসে পড়, আর বেড়াল ধরে কাজ নেই। এখন যজ্ঞটা নির্বিঘ্নে শেষ হয়ে যাক্।"

শিষ্য নিজের আহাম্মকিতে লজ্জিত হয়ে অপ্রস্তুত ভাবে সভার মধ্যে বসে পড়ল।

ছিটেফোঁটা

ডাক্তার ফস্টার
ইস্কুল মাস্টার।
বেত তার চট্‌পট্‌,
ছাত্রেরা ছট্‌ফট্‌—
ভয়ে সব পস্তায়,
বাড়ি ছেড়ে রাস্তায়,
গ্রাম ছেড়ে শহরে,
গয়া কাশী লাহোরে।
ফিরে আসে সন্ধ্যায়
পড়ে শোনে মন দ্যায়।।

বাস্‌রে বাস্‌! সাবাস্‌ বীর!
ধনুকখানি ধ'রে,
পায়রা দেখে মারলে তীর—
কাগ্‌টা গেল ম'রে!

বল্‌ছি, ওরে ছাগলছানা,
উড়িস্‌নে রে উড়িস্‌নে।
জানিস্‌নে তোর উড়তে মানা—
হাত পাগুলো ছুঁড়িস্‌নে।

জংলা বনে পাগ্‌লা বুড়ো আমায় এসে বলে,
"আড়াই বিঘা সমুদ্রেতে কাঁঠাল কত ফলে?"
আমিও বলি আন্দাজেতে, "বল্‌ছি শোন কত—
তোমাদের ঐ ঝিঙের ক্ষেতে চিংড়ি গজায় যত।"

খিল্‌খিল্লির মুল্লুকেতে থাকত নাকি দুই বেড়াল,
একটা শুধায় আরেকটাকে, "তুই বেড়াল না মুই বেড়াল?"
তাই থেকে হয় তর্ক শুরু চীৎকারে তার ভূত পালায়,
আঁচড় কামড় চর্কিবাজী ধাঁই চটাপট্‌ চড় চালায়।
খাম্‌চা খাবল ডাইনে বাঁয়ে হুড়মুড়িয়ে হুলোর মতো,
উড়ল রোঁয়া চারদিকেতে রাম-ধুনুরীর তুলোর মতো।
তর্ক যখন শান্ত হল, ক্ষান্ত হল আঁচড় দাগা,
থাকত দুটো আস্ত বেড়াল, রইল দুটো ল্যাজের ডগা।

বুড়ো তুমি লোকটি ভালো,
  চেহারাও নয়তো কালো—
তবু কেন তোমায় ভালো বাস্‌ছিনে?
কেন, তা তো কেউ না জানে,
ভেবে কিছু পাইনে মানে,
  যত ভাবি ততই ভালো বাস্‌ছিনে।

*

আরে ছি ছি, রাম রাম! কলকেতা শহরে,
লাল ধুতি পরে মুদি, তিন হাত বহরে।
মখ্‌মলি জামা জুতো ঝক্‌মকে টোপরে,
খায় দায় গান গায় রাস্তার উপরে।

*

উঠোন-কোণে কড়াই ছিল,
  পায়েস ছিল তাতে,
তাই নিয়ে কাক লড়াই করে
  কুঁকড়ো বুড়োর সাথে
যুদ্ধ জিতে বড়াই ভারি,
  তখন দেখে চেয়ে—
কখন এসে চড়াই পাখি,
  পায়েস গেছে খেয়ে।

*

নন্দ ঘোষের শাম্‌লা গরু
ভাগলো কোথায় লক্ষ্মীছাড়া?
নন্দ ছোটে বনবাদাড়ে,
সন্ধানে ধায় বদ্যিপাড়া;
শেষকালেতে অর্ধরাতে,
হদ্দ হয়ে ফিরলে পরে—
বাসায় দেখে, ঘুমোয় গরু
ল্যাজ গুটিয়ে গোয়াল ঘরে।

আরও গল্প

(অন্যান্য গল্প)

'রংমশাল' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩৫১ সংখ্যায় কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় যে-চিঠিকে 'সম্পাদক-স্বরচিত' বলেছেন তার সমগ্র পাণ্ডুলিপি রয়েছে সুকুমারের 'খসড়া খাতা' বা 'হিজিবিজি খাতা'-য়। অর্থাৎ, এটিও সুকুমার-রচিত। সম্পাদক ছিলেন শিশিরকুমার দত্তদাস।

বোকা বুড়ী

এক ছিল বুড়ো আর এক ছিল বুড়ী। তারা ভারি গরীব। আর বুড়ী বেজায় বোকা আর ভয়ানক বেশি কথা বলে—যেখানে সেখানে যার তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়—তার পেটে কোন কথা থাকে না।

বুড়ো একদিন তার জমি চষ্‌তে চষ্‌তে মাটির নিচে এক কলসী পেলে, সেই কলসী ভরা টাকা আর মোহর! তখন তার ভারি ভাবনা হল—এ টাকা যদি ফেলে রাখি কোনদিন কে চুরি ক'রে নেবে। আর যদি টাকা বাড়ি নিয়ে যাই, বুড়ী টের পেয়ে যাবে—সে সকলের কাছে তার গল্প করবে; ক্রমে কথা রাষ্ট্র হয়ে পড়লে রাজার কোটাল এসে সব কেড়েকুড়ে নিয়ে যাবে। ভেবে ভেবে সে এক ফন্দি আঁট্‌ল। সে ঠিক করল যে বুড়ীকে সব্ কথা বলবে কিন্তু এ রকম উপায় করব যাতে বুড়ীর কথা কেউ না বিশ্বাস করে।

তখন সে একটা মাছ কিনে এনে তার ক্ষেতের ধারে একটা গাছের উপর বেঁধে রাখল, আর একটা খরগোস এনে নদীর ধারে একটা গর্তের মধ্যে জাল দিয়ে জড়িয়ে রাখল। তারপর সে তার স্ত্রীকে গিয়ে বলল, "একটা ভারি আশ্চর্য খবর শুনলাম—গাছের ডালে নাকি মাছ উড়ে বসে আর খরগোস নাকি জলে খেলা করে। আমাদের গণক ঠাকুর বলেন—

"মৎস্য বসেন গাছে
জলে খরগোস নাচে
গুপ্ত রতন খুঁজলে পাবে খুঁড়লে তারি কাছে।"

বুড়ী বলল, "তোমার যেমন কথা!" বুড়ো বলল, "হাঁ! এরকম নাকি সত্যি সত্যি দেখা গেছে।" এই বলে বুড়ো আবার কাজে বেরুল।

আধঘণ্টা না যেতে যেতেই বুড়ো আবার ফিরে এসে ভারি ব্যস্ত হয়ে বুড়ীকে সেই টাকা পাওয়ার কথা বলল। তখন বুড়ো বুড়ী মিলে টাকা আনতে চলল। পথে যেতে যেতে বুড়ো সেই গাছতলায় এসে বলল, "গাছের উপর চক্‌চক্ করছে কি?" এই বলে সে একটা ঢিল ছুঁড়তেই মাছটা পড়ে গেল। বুড়ী ত অবাক! তখন বুড়ো বলল, "নদীতে জাল ফেলেছিলাম, মাছ-টাছ পড়ল কিনা দেখে আসি।" জাল টানতেই—ওমা! খরগোস যে! তখন বুড়ো বলল, "কেমন! গণক ঠাকুরের কথা আর অবিশ্বাস করবে?" তারপর টাকা নিয়ে তারা বাড়ি এল।

টাকা পেয়েই বুড়ী বলল, "ঘর করব, বাড়ি করব, গহনা বানাব, পোশাক কিনব।" বুড়ো বলল, "ব্যস্ত হ'য়ো না—কিছুদিন র'য়ে স'য়ে দেখ—ক্রমে সবই হবে। হঠাৎ অত কাণ্ড করলে লোকে সন্দেহ করবে যে।" কিন্তু বুড়ীর তাতে মন উঠে না—সে একে বলে, ওকে বলে; শেষে একবারে কোটালের কাছে নালিশ ক'রে দিল। কোটালের হুকুমে বুড়োকে হাতকড়া দিয়ে হাজির করা হল।

বুড়ো সব কথা শুনে বলল, "সে কি হুজুর! আমার স্ত্রীর কি মাথার কিছু ঠিক আছে? সে ত ওরকম আবোল তাবোল কত কি বলে।" কোটাল তখন তেড়ে উঠলেন—"বটে! তুমি টাকা পেয়ে লুকিয়ে রেখেছ—আবার বুড়ীর নামে দোষ দিচ্ছ?" বুড়ো বলল,

"কিসের টাকা? কবে পেলাম? কোথায় পেলাম? আমি তো কিছুই জানি না।"

বুড়ী বলল, "না তুমি কিছুই জান না? সেই যেদিন গাছের ডালে মাছ বসেছিল, নদীতে জাল ফেলে খরগোস ধরলে—সেদিনের কথা তোমার মনে নেই? কচি খোকা আর কি?"

তাই শুনে সবাই হাসতে লাগল; কোটাল এক ধমক দিয়ে বুড়ীকে বলল—"যা পাগ্‌লী, বাড়ি যা! ফের যদি এসব যা-তা বলবি তোকে আমি কয়েদ ক'রে রাখব।"

বুড়ী তখন বাড়ি ফিরে গেল। কোটালের ভয়ে সে আর কারু কাছে টাকার কথা বলত না।

রাগের ওষুধ

কেদারবাবু বড় বদরাগী লোক। যখন রেগে বসেন, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না।

একদিন তিনি মুখখানা বিষণ্ণ ক'রে বসে আছেন, এমন সময় আমাদের মাস্টারবাবু এসে বললেন, 'কি হে কেদারকেষ্ট, মুখখানা হাঁড়ি কেন?'

কেদারবাবু বললেন, 'আর মশাই, বলবেন না। আমার সেই রুপোবাঁধানো হুঁকোটা ভেঙে সাত টুকরো হয়ে গেল—মুখ হাঁড়ির মত হবে না তো কি বদনার মত হবে?'

মাস্টারমশাই বললেন, 'বল কি হে? এ তো কাচের বাসন নয় কি মাটির পুতুল নয়—অমনি খামখা ভেঙে গেল, এর মানে কি?'

কেদারবাবু বললেন, 'খামখা ভাঙতে যাবে কেন—কথাটা শুনুন না। হল কী,—কাল রাত্রে আমার ভাল ঘুম হয় নি। সকালবেলা উঠেছি, মুখ হাত ধুয়ে তামাক খেতে বসব, এমন সময় কল্‌কেটা কাত হয়ে আমার ফরাসের উপর টিকের আগুন প'ড়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি যেই আগুনটা সরাতে গেছি অমনি কিনা আঙুলে ছ্যাঁক্ করে ফোস্কা প'ড়ে গেল! আচ্ছা, আপনিই বলুন—এতে কার না রাগ হয়? আরে, আমার হুঁকো, আমার কল্‌কে, আমার আগুন, আমার ফরাস, আবার আমার উপরেই জুলুম! তাই আমি রাগ ক'রে—বেশি কিছু নয়—ঐ মুগুরখানা দিয়ে পাঁচ দশ ঘা মারতেই কিনা হতভাগা হুঁকোটা ভেঙে খান্ খান্!'

মাস্টারমশাই বললেন, 'তা যাই বল বাপু, এ রাগ বড় চণ্ডাল—রাগের মাথায় এমন কাণ্ড ক'রে বস, রাগটা একটু কমাও।'

'কমাও তো বললেন—রাগ যে মুখের কথায় বাগ মানবে—এ রাগ আমার তেমন নয়।'

'দেখো, আমি এক উপায় বলি। শুনেছি, খুব ধীরে ধীরে এক দুই তিন ক'রে দশ গুনলে—রাগটা নাকি শান্ত হয়ে আসে। কিন্তু তোমার যেমন রাগ, তাতে দশ-বারোতে কুলোবে না—তুমি একেবারে একশো পর্যন্ত গুনে দেখো।'

তারপর একদিন কেদারবাবু ইস্কুলের সামনে দিয়ে যাচ্ছেন। তখন ছুটির সময়, ছেলেরা খেলা করছে। হঠাৎ একটা মার্বেল ছুটে এসে কেদারবাবুর পায়ের হাড়ে ঠাই করে লাগল। আর যায় কোথা! কেদারবাবু ছাতের সমান এক লাফ দিয়ে লাঠি উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

ছেলের দল যে যেখানে পারে একেবারে সটান চম্পট্। তখন কেদারবাবুর মনে হল মাস্টারবাবুর কথাটা একবার পরীক্ষা ক'রে দেখি। তিনি আরম্ভ করলেন, এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ—

ইস্কুলের মাঝখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে বিড়্বিড়্ করে অঙ্ক বলছে, তাই দেখে ইস্কুলের দারোয়ান ব্যস্ত হয়ে কয়েকজন লোক ডেকে আনল। একজন বলল, 'কী হয়েছে মশাই?' কেদারবাবু বললেন, 'ষোলো—সতেরো—আঠারো—উনিশ—কুড়ি—'

সকলে বলল, 'এ কী? লোকটা পাগল হল নাকি?—আরে, ও মশাই, বলি অমনধারা কচ্ছেন কেন?' কেদারবাবু মনে মনে ভয়ানক চটলেও—তিনি গুনেই চলেছেন, 'ত্রিশ—একত্রিশ—বত্রিশ—তেত্রিশ—'

আবার খানিক বাদে আর একজন জিজ্ঞাসা করল, 'মশাই, আপনার কি অসুখ করেছে? কবরেজ মশাইকে ডাকতে হবে?' কেদারবাবু রেগে আগুন হয়ে বললেন, 'উনষাট—ষাট—একষট্টি—বাষট্টি—তেষট্টি—'

দেখতে দেখতে লোকের ভিড় জমে গেল—চারিদিকে গোলমাল, হৈ চৈ। তাই শুনে মাস্টারবাবু দেখতে এলেন, ব্যাপারখানা কি! ততক্ষণে কেদারবাবুর গোনা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তিনি দুই চোখ লাল করে লাঠি ঘোরাচ্ছেন আর বলছেন, 'ছিয়ানব্বুই—সাতানব্বুই—আটানব্বুই—নিরেনব্বুই—একশো—কোন্ হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া মিথ্যাবাদী বলেছিল একশো গুনলে রাগ থামে?' বলেই ডাইনে বাঁয়ে দুম্দাম্ লাঠির ঘা।

লোকজন সব ছুটে পালাল। আর মাস্টারমশাই এক দৌড়ে সেই যে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন, আর সারাদিন বেরোলেন না।

পালোয়ান

তাহার আসল নামটি যে কি ছিল, তাহা ভুলিয়াই গিয়াছি—কারণ আমরা সকলেই তাহাকে "পালোয়ান" বলিয়া ডাকিতাম। এমন কি মাস্টারমহাশয়েরা পর্যন্ত তাহাকে "পালোয়ান" বলিতেন। কবে কেমন করিয়া তাহার এরূপ নামকরণ হইল, তাহা মনে নাই; কিন্তু নামটি যে তাহাকে বেশ মানাইয়াছিল, একথা স্কুল শুদ্ধ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিত।

প্রথমত, তাহার চেহারাটি ছিল একটু অতিরিক্ত রকমের হৃষ্টপুষ্ট। মোটা সোটা হাত পা, ব্যাঙের মত গোব্দা গলা—তাহার উপরেই গোলার মতো মাথাটি—যেন ঘাড়ে পিঠে এক হইয়া গিয়াছে। তার উপর সে কলিকাতায় গিয়া স্বচক্ষে কাল্লু ও করিমের লড়াই দেখিয়া আসিয়াছিল, এবং বড় বড় কুস্তির এমন আশ্চর্য রকম বর্ণনা দিতে পারিত যে, শুনিতে শুনিতে আমাদেরই রক্ত গরম হইয়া উঠিত। এক এক দিন উৎসাহের চোটে আমরাও তাল ঠুকিয়া স্কুলের উঠানে কুস্তি বাধাইয়া দিতাম। পালোয়ান তখন পাশে দাঁড়াইয়া নানারকম অঙ্গভঙ্গী করিয়া আমাদের প্যাঁচ ও কায়দা বাত্লাইয়া দিত। মাখনলাল আমার চাইতে আড়াই বছরের ছোট, কিন্তু পালোয়ানের কাছে "ল্যাং মুচ্কির" প্যাঁচ শিখিয়া সে যেদিন আমায় চিৎপাত করিয়া ফেলিল, সেইদিন হইতে সকলেরই বিশ্বাস হইল যে পালোয়ান

ছোকরাটা আর কিছু না বুঝুক কুস্তিটা বেশ বোঝে।

ঘোষেদের পাঠশালার ছাত্রগুলি বেজায় ডানপিটে। খামখা এক একদিন আমাদের সঙ্গে গায়ে পড়িয়া তাহারা ঝগড়া বাধাইত। মনে আছে, একদিন ছুটির পরে আমি আর পাঁচ সাতটি ছেলের সঙ্গে গোঁসাইবাড়ির পাশ দিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময় দেখি পাঠশালার চারটা ছোকরা ঢেলা মারিয়া আম পাড়িতেছে। একটা ঢিল আরেকটু হইলেই আমার গায়ে পড়িত। আমরা দলে ভারি ছিলাম, সেই সাহসে আমাদের একজন ধমক দিয়া উঠিল, "এইও, বেয়াদব! মানুষ চোখে দেখিস্ নে?" ছোকরাদের এমনি আস্পর্ধা, একজন অমনি বলিয়া উঠিল, "হাঁ, মানুষ দেখি, বাঁদরও দেখি!"—শুনিয়া বাকী তিনটায় অসভ্যের মত হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। আমার তখন ভয়ানক রাগ হইল, আমি আস্তিন গুটাইয়া বলিলাম, "পরেশ! দে ত আচ্ছা ক'রে ঘা দুচ্চার কষিয়ে।" পরেশও দমিবার পাত্র নয়, সে হুঙ্কার দিয়া বলিল, "গুপে, আনত ওই ছোক্‌রাটার কানে ধ'রে।" গোপীকেষ্ট বলিল, "আমার হাতে বই আছে—ওরে ভুতো, তুই ধর্ দেখি একবার চেপে—"। ভুতোর বাড়ি বাঙাল দেশে—তার মেজাজটি যখন মাত্রায় চড়ে তখন তার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না—সে একটা ছোকরার কানে প্রকাণ্ড এক কীল বসাইয়া দিল। কীল খাইয়াই সে হতভাগা একেবারে 'গোব্‌রাদা' বলিয়া চীৎকার দিয়া উঠিল, আর সঙ্গে সঙ্গে বাকী তিনজনও 'গোব্‌রাদা', 'গোব্‌রাদা' বলিয়া এমন একটা হৈ চৈ রব তুলিল যে, আমরা ব্যাপারটা কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া রহিলাম। এমন সময় একটা কুচ্‌কুচে কালো মূর্তি হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া দেখা দিল। আসিয়াই আর কথাবার্তা না বলিয়াই ভুতোর ঘাড়ে ধাক্কা মারিয়া, গুপের কান মলিয়া, আমার গালে ঠাস্‌ঠাস্ দুই চড় লাগাইয়া দিল। তারপর কাহার কি হইল আমি খবর রাখিতে পারি নাই। মোট কথা, সেদিন আমাদের যতটা অপমান বোধ হইয়াছিল, ভয় হইয়াছিল তাহার চাইতেও বেশি। সেই হইতে গোব্‌রার নাম শুনিলেই ভয়ে আমাদের মুখ শুকাইয়া আসিত।

পালোয়ানের কেরামতির পরিচয় পাইয়া আমাদের মনে ভরসা আসিল। আমরা ভাবিলাম, এবার যেদিন পাঠশালার ছেলেগুলা আমাদের ভ্যাংচাইতে আসিবে, তখন আমরাও আরো বেশি করিয়া ভ্যাংচাইতে ছাড়িব না। পালোয়ানও এ কথায় খুব উৎসাহ প্রকাশ করিল। কিন্তু অনেকদিন অপেক্ষা করিয়াও যখন তাহাদের ঝগড়া বাধাইবার আর কোন মতলব দেখা গেল না, তখন আমাদের মনটা খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। আমরা বলিতে লাগিলাম, "ওরা নিশ্চয়ই পালোয়ানের কথা শুনতে পেয়েছে।" পালোয়ান বলিল—"হ্যাঁ, তাই হবে। দেখছ না, এখন আর বাছাদের টুঁ শব্দটি নেই।" তখন সবাই মিলিয়া স্থির করিলাম যে পালোয়ানকে সঙ্গে লইয়া গোব্‌রার দলের সঙ্গে ভালরকম বোঝাপড়া করিতে হইবে।

শনিবার দুইটার সময় স্কুল ছুটি হইয়াছে, এমন সময় কে যেন আসিয়া খবর দিল যে গোব্‌রা চার-পাঁচটি ছেলেকে সঙ্গে লইয়া পুকুরঘাটে বসিয়া গল্প করিতেছে। যেমন শোনা অমনি আমরা দলেবলে হৈ হৈ করিতে করিতে সেখানে গিয়া হাজির! আমাদের ভাবখানা দেখিয়াই বোধ হয় তাহারা বুঝিয়াছিল যে আমরা কেবল বন্ধুভাবে আলাপ করিতে আসি নাই। তাহারা শশব্যস্ত হইয়া উঠিতে না উঠিতেই আমরা তিন-চারজনে মিলিয়া গোব্‌রাকে একেবারে চাপিয়া ধরিলাম। সকলেই ভাবিলাম, এ-যাত্রায় গোব্‌রার আর রক্ষা নাই। কিন্তু আহাম্মক রামপদটা সব মাটি করিয়া দিল। সে বোকারাম ছাতা হাতে হাঁ করিয়া তামাসা

দেখিতেছিল, এমন সময় পাঠশালার একটা ছোকরা এক থাব্‌ড়া মারিয়া তাহার ছাতাটা কাড়িয়া লইল। আমরা ততক্ষণে গোব্‌রা-চাঁদকে চিৎপাত করিয়া আনিয়াছি, এমন সময় হঠাৎ আমাদের ঘাড়ে পিঠে ডাইনে বাঁয়ে ধপাধপ্‌ ছাতার বৃষ্টি শুরু হইল। আমরা মুহূর্তের মধ্যে একেবারে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলাম, আর সেই ফাঁকে গোব্‌রাও এক লাফে গা ঝাড়া দিয়া উঠিল। তাহার পর চক্ষের নিমেষে তাহারা আমাদের চার-পাঁচজনকে ধরিয়া পুকুরের জলে ভালরকমে চুবাইয়া রীতিমত নাকাল করিয়া ছাড়িয়া দিল। এই বিপদের সময় আমাদের দলের আর সকলে কে যে কোথায় পালাইল, তাহার আর কিনারাই করা গেল না। সব চাইতে আশ্চর্য এই যে, ইহার মধ্যে পালোয়ান যে কখন নিরুদ্দেশ হইল,—তাহাকে ডাকিয়া ডাকিয়া আমাদের গলা ফাটিয়া গেল, তবু তাহার সাড়া পাইলাম না।

সোমবার স্কুলে আসিয়াই আমরা সবাই মিলিয়া পালোয়ানকে গাল দিতে লাগিলাম। কিন্তু সে যে কিছুমাত্র লজ্জিত হইয়াছে, এমন বোধ হইল না। সে বলিল—"তোরা যে এমন আনাড়ি, তা জানলে কি আমি তোদের সঙ্গে যাই? আচ্ছা, গোব্‌রা যখন তোর টুঁটি চেপে ধরল, তখন আমি যে 'ডানপট্‌কান দে' ব'লে এত চেঁচালাম—কৈ, তুই তো তার কিছুই করলি না। আর ঐ গুপেটা, ওকে আমি এতবার বলেছি যে ল্যাংমুচ্‌কি মারতে হ'লে পাল্টা রোখ্‌ সামলে চলিস—তা তো ও শুনবে না! এরকম করলে আমি কি করব বল্‌? ওসব দেখে আমার একেবারে ঘেন্না ধ'রে গেল—তাই বিরক্ত হয়ে চ'লে এলুম। তারপর ভুতোটা, ওটা কি করল বল্‌ দেখি! আরে, দেখছিস যখন দোরোখা প্যাঁচ্‌ মারছে, তখন বাপু আহ্লাদ ক'রে কাৎ হয়ে পড়তে গেলি কেন?"—ভুতো এতক্ষণ কিছু বলে নাই, কিন্তু পালোয়ানের এই টিপ্পনী কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত তাহার মেজাজের উপর ছ্যাঁক্‌ করিয়া লাগিল। সে গলায় ঝাঁকড়া দিয়া মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "তুমি বাপু কানকাটা কুকুরের মত পলাইছিলা ক্যান্‌?" সর্বনাশ! পালোয়ানকে "কানকাটা কুকুর" বলা! আমরা ভাবিলাম "দেখ, বাঙাল মরে বুঝি এবার!" পালোয়ান খুব গম্ভীর হইয়া বলিল, "দেখ্‌ বাঙাল! বেশী চালাকি করিস তো চর্‌কী প্যাঁচ লাগিয়ে একেবারে তুর্কী নাচন নাচিয়ে দেব!" ভুতো বলিল, "তুমি নাচলে বান্দর নাচবা।" রাগে পালোয়ানের মুখচোখ লাল হইয়া উঠিল। সে বেঞ্চি ডিঙাইয়া একেবারে বাঙালের ঘাড়ে গিয়া পড়িল। তারপর দুইজনে কেবল হুড়াহুড়ি আর গড়াগড়ি। আশ্চর্য এই, পালোয়ান এত যে কায়দা আর এত যে প্যাঁচ্‌ আমাদের উপর খাটাইত, নিজের বেলায় তার একটিও তাহার কাজে আসিল না। ঠিক আমাদেরই মত হাত-পা ছুঁড়িয়া সে খামচা-খামচি করিতে লাগিল। তারপর বাঙাল যখন তাহার বুকের উপর চড়িয়া দুই হাতে তাহার টুঁটি চাপিয়া ধরিল, তখন আমরা সকলে মিলিয়া দুজনকে ছাড়াইয়া দিলাম। পালোয়ান হাঁপাইতে হাঁপাইতে বেঞ্চে বসিয়া ঘাম মুছিতে লাগিল। তারপর গম্ভীরভাবে বলিল, "গত বছর এই ডান হাতের কব্জিটা জখম হয়েছিল—তাই বড় বড় প্যাঁচ্‌গুলো দিতে ভরসা হয় না—যদি আবার মচ্‌কে ফচ্‌কে যায়! তা নৈলে ওকে একবার দেখে নিতুম।" ভুতো এ কথার কোন উত্তর না দিয়া, তাহার নাকের সামনে একবার বেশ করিয়া "কাঁচকলা" দেখাইয়া লইল।

ভুতো ছেলেটি দেখিতে যেমন রোগা এবং বেঁটে, তার হাত-পাগুলিও তেমনি লট্‌পটে, পালোয়ানের পালোয়ানী সম্বন্ধে অনেকের যে আশ্চর্য ধারণা ছিল, সেই দিনই তাহা ঘুচিয়া গেল। কিন্তু পালোয়ান নামটি আর কিছুতেই ঘুচিল না, সেটি শেষ পর্যন্ত টিকিয়া ছিল।

হাসির গল্প

আমাদের পোস্টাপিসের বড়বাবুর বেজায় গল্প করিবার সখ। যেখানে সেখানে সভায় আসরে নিমন্ত্রণে, তিনি তাঁহার গল্পের ভাণ্ডার খুলিয়া বসেন। দুঃখের বিষয়, তাঁর ভাণ্ডার অতি সামান্য—কতগুলি বাঁধা গল্প, তাহাই তিনি ঘুরিয়া ফিরিয়া সব জায়গায় চালাইয়া দেন। কিন্তু একই গল্প বারবার শুনিতে লোকের ভাল লাগিবে কেন? বড়বাবুর গল্প শুনিয়া আর লোকের হাসি পায় না। কিন্তু তবু বড়বাবুর উৎসাহও তাহাতে কিছুমাত্র কমে না।

সেদিন হঠাৎ তিনি কোথা হইতে একটা নূতন গল্প সংগ্রহ করিয়া, মুখুজ্জেদের মজ্‌লিসে শুনাইয়া দিলেন। গল্পটা অতি সামান্য কিন্তু তবু বড়বাবুকে খাতির করিয়া সকলেই হাসিল। বড়বাবু তাহা বুঝিলেন না, তিনি ভাবিলেন গল্পটা খুব লাগসই হইয়াছে। সুতরাং, তার দুদিন বাদে যদু মল্লিকের বাড়ি নিমন্ত্রণে বসিয়া, তিনি খুব আড়ম্বর করিয়া আবার সেই গল্প শুনাইলেন। দু একজন, যাহারা আগে শোনে নাই, তাহারা শুনিয়া বেশ একটু হাসিল। বড়বাবু ভাবিলেন গল্পটা জমিয়াছে ভাল।

তারপর ডাক্তারবাবুর ছেলের ভাতে তিনি আবার সেই গল্পই খুব উৎসাহ করিয়া শুনাইলেন। এবারে ডাক্তারবাবু ছাড়া আর কেহ গল্প শুনিয়া হাসিল না, কিন্তু বড়বাবু নিজেই হাসিয়া কুটি কুটি।

তারপরেও যখন তিনি আরও দু তিন জায়গায় সেই একই গল্প চালাইয়া দিলেন, তখন আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বিষম চটিয়া গেল। বিশু বলিল, "না হে, আর ত সহ্য হয় না। বড়বাবু ব'লে আমরা এতদিন সয়ে আছি—কিন্তু ওঁর গল্পের উৎসাহটা একটু না কমালে চলছে না।"

দুদিন বাদে, আমরা দশবারোজনে বসিয়া গল্প করিতেছি, এমন সময় বড়বাবুর নাদুস্‌নুদুস্‌ মূর্তিখানা দেখা দিল। আমরা বলিলাম, "আজ খবরদার! ওঁর গল্প শুনে কেউ হাসতে পাবে না! দেখি উনি কি করেন।" বড়বাবু বসিতেই বিশু বলিয়া উঠিল, "নাঃ, বড়বাবু আজকাল যেন কেমন হ'য়ে গেছেন। আগে কেমন মজার মজার সব গল্প বলতেন। আজকাল, কৈ? কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছেন।" বড়বাবু একথায় ভারি ক্ষুণ্ণ হইলেন। তাঁর গল্প আর আগের মত জমে না, একথাটি তাঁহার একটুও ভাল লাগিল না। তিনি বলিলেন, "বটে? আচ্ছা রোস। আজ তোমাদের এমন গল্প শোনাব, হাস্‌তে হাস্‌তে তোমাদের নাড়ি ছিঁড়ে যাবে।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার সেই মামুলি পুঁজি হইতে একটা গল্প আরম্ভ করিলেন। কিন্তু গল্প বলিলে কি হইবে? আমরা কেহ হাসিতে রাজি নহি—সকলেই কাঠ হইয়া বসিয়া রহিলাম। বিশু বলিল, "নাঃ, এ গল্পটা জুৎসই হল না।" তখন বড়বাবু তাঁহার সেই পুঁজি হইতে একে একে পাঁচ সাতটি গল্প শুনাইয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতে সকলের মুখ পেঁচার মত আরও গম্ভীর হইয়া উঠিল! তখন বড়বাবু ক্ষেপিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, "যাও যাও! তোমরা হাস্‌তে জান না—গল্পের কদর বোঝ না—আবার গল্প শুনতে চাও! এই গল্প শুনে সেদিন ইন্‌স্পেক্টার সাহেব পর্যন্ত হেসে গড়াগড়ি—তোমরা এসব বুঝবে কি?" তখন আমাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল, "সে কি বড়বাবু? আমরা হাস্‌তে জানিনে? বলেন কি! আপনার গল্প শুনে কতবার কত হেসেছি, ভেবে দেখুন ত। আজকাল আপনার গল্পগুলো তেমন খোলে না—তা হাস্‌ব কোত্থেকে? এই ত, বিশুদা যখন গল্প

বলে তখন কি আমরা হাসিনে? কি বলেন?"

বড়বাবু হাসিয়া বলিলেন, "বিশু? ও আবার গল্প জানে নাকি? আরে, এক সঙ্গে দুটো কথা বলতে ওর মুখে আট্‌কায়, ও আবার গল্প বলবে কি?" বিশু বলিল, "বিলক্ষণ! আমার গল্প শোনেন নি বুঝি?" আমরা সকলে উৎসাহ করিয়া বলিলাম—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটা শুনিয়ে দাও ত।" বিশু তখন গম্ভীর হইয়া বলিল, "এক ছিল রাজা"—শুনিয়া আমাদের চার পাঁচজন হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "আরে রাজার গল্প রে রাজার গল্প!—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।"

বিশু বলিল, "রাজার তিনটা ধাড়ি ধাড়ি ছেলে"—

শুনিবামাত্র আমরা একসঙ্গে প্রাণপণে এমন সশব্দে হাসিয়া উঠিলাম যে, বিশু নিজেই চম্‌কাইয়া উঠিল। সকলে হাসিতে হাসিতে, এ উহার গায়ে গড়াইয়া পড়িতে লাগিলাম—কেহ বলিল, "দোহাই বিশুদা, আর হাসিও না"—কেহ বলিল, "বিশুবাবু রক্ষে করুন, ঢের হয়েছে।" কেহ কেহ এমন ভাব দেখাইল, যেন হাসিতে হাসিতে তাহাদের পেটে খিল ধরিয়া গিয়াছে।

বড়বাবু কিন্তু বিষম চটিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, "এসব ঐ বিশুর কারসাজি। ওই আগে থেকে সব শিখিয়ে এনেছে। নইলে, ও যা বললে তাতে হাস্‌বার মত কি আছে বাপু?" এই বলিয়া তিনি রাগে গজ্‌গজ্‌ করিতে করিতে উঠিয়া গেলেন।

সেই সময় হইতে বড়বাবুর গল্প বলার সখটা বেশ একটু কমিয়াছে। এখন আর তিনি যখন তখন কথায় কথায় হাসির গল্প ফাঁদিয়া বসেন না।

সত্যি

ইনি কে জানো না বুঝি? ইনি নিধিরাম পাটকেল।

কোন নিধিরাম? যার মিঠায়ের দোকান আছে?

আরে দুৎ! তা কেন? নিধিরাম ময়রা নয়—প্র-ফে-সার্‌ নিধিরাম!

ইনি কি করেন?

কি করেন আবার কি? আবিষ্কার করেন!

ও বুঝেছি! ঐ যে উত্তর মেরুতে যায়, যেখানে ভয়ানক ঠাণ্ডা—মানুষজন সব মরে যায়—

দূর মুখ্যু! আবিষ্কার বললেই বুঝি উত্তর মেরু বুঝতে হবে, বা দেশ বিদেশে ঘুরতে হবে? তাছাড়া বুঝি আবিষ্কার হয় না?

ও! তাহলে?

মানে, বিজ্ঞান শিখে নানা রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়া করে নতুন নতুন কথা শিখছেন, নতুন নতুন জিনিস বানাচ্ছেন। ইনি আজ পর্যন্ত কত কী আবিষ্কার করেছেন তোমরা তার খবর রাখ কি? ওঁর তৈরি সেই গন্ধবিকট তেলের কথা শোননি? সেই তেলের আশ্চর্য গুণ! আমি নিজে মাখিনি বা খাইনি কিন্তু আমাদের বাড়িওয়ালার কে যেন বলেছেন যে সে ভয়ঙ্কর তেল। সে তেল খেলে পরে পিলের ওষুধ, মাখলে পরে ঘায়ের মলম, আর গোঁফে লাগালে দেড় দিনে আধহাত লম্বা গোঁফ বেরোয়।

সে কী মশাই! তাও কি হয়?

আলবাৎ হয়! বললে বিশ্বাস করবে না, কিন্তু নন্দলাল ডাক্তার বলেছে ভুলু মিত্তিরের খোকাকে ওই তেল মাখিয়ে তার এয়া মোটা গোঁফ হয়ে গেছিল।

কি আবোল তাবোল বকছেন মশাই!

বিশ্বেস করতে না চাও তা বিশ্বেস করো না, কিন্তু চোখে যা দেখছ তা বিশ্বেস করবে ত? কী কাণ্ড হচ্ছে দেখছ তো? ঐ দেখ নিধিরাম পাটকেলের নতুন কামান তৈরি হচ্ছে। নতুন কামান, নতুন গোলা, নতুন সব। একি সহজ কথা ভেবেছ? ওই রকম আর গোটা পঞ্চাশ কামান আর হাজার দশেক গোলা তৈরি হলেই উনি লড়াই করতে বেরুবেন।

সব নতুন রকম হচ্ছে বুঝি?

নতুন না তো কি? নতুন, অথচ সস্তা! ওই দেখ কামান আর ওই দেখ গোলা। কামানে কি আছে? নল আছে আর বাতাস ভরা হাপর আছে। নলের মধ্যে গোলা ভরে খুব খানিক দম নিয়ে ভ—শ্‌ করে যেমনি হাপর চেপে ধরবে অমনি হুশ্‌ করে গোলা গিয়ে ছিট্‌কে পড়বে আর ফট্‌ করে ফেটে যাবে।

তারপরে?

তার পরেই তো হচ্ছে আসল মজা। গোলার মধ্যে কি আছে জান? বিছুটির আরক আছে, লঙ্কার ধোঁয়া আছে, ছারপোকার আতর আছে, গাঁদালের রস আছে, পচা মুলোর একস্ট্রাকট আছে, আরও যে কত কি আছে, তার নামও আমি জানি না। যত রকম উৎকট বিশ্রী গন্ধ আছে, যত রকম ঝাঁঝালো তেজাল বিটকেল জিনিস আছে, আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক কৌশলে সব তিনি মিশিয়েছেন ঐ গোলার মধ্যে। সেদিন ছোট একটা গোলা ওঁর হাত থেকে প'ড়ে ফেটে গিয়েছিল শুনেছ তো?

তাই নাকি? তারপর হল কি?

যেমনি গোলা ফাটল অমনি তিনি চট্‌ করে একটা ধামা চাপা দিয়েছিলেন, নইলে কি হত কে জানে। তবু দেখছ ওষুধের গন্ধে আর ঝাঁঝে প্রফেসারের চেহারা কেমন

হয়ে গেছে। তার আগে ওঁর চেহারা ছিল ঠিক কার্তিকের মত; মাথাভরা কোঁকড়া চুল আর এক হাত লম্বা দাড়ি! সত্যি!

সত্যি নাকি?

সত্যি না তো কি?

ঠুকে-মারি আর মুখে-মারি

মুখে-মারি পালোয়ানের বেজায় নাম,—তার মত পালোয়ান নাকি আর নাই। ঠুকে-মারি সত্যিকারের মস্ত পালোয়ান, মুখে-মারির নাম শুনে সে হিংসায় আর বাঁচে না। শেষে একদিন ঠুকে-মারি আর থাকতে না পেরে, কম্বলে নব্বুই মন আটা বেঁধে নিয়ে, সেই কম্বল কাঁধে ফেলে মুখে-মারির বাড়ি রওয়ানা হ'লো।

পথে এক জায়গায় বড্ড পিপাসা আর ক্ষিদে পাওয়ায় ঠুকে-মারি কম্বলটা কাঁধ থেকে নামিয়ে একটা ডোবার ধারে বিশ্রাম করতে বসল। তারপর চোঁ-চোঁ করে এক বিষম লম্বা চুমুক দিয়ে ডোবার অর্ধেক জল খেয়ে বাকি অর্ধেকটায় সেই আটা মেখে নিয়ে সেটাও সে খেয়ে ফেলল। শেষে মাটিতে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুম দিল।

সেই ডোবাতে একটা হাতী রোজ জল খেতে আসত। সেদিনও সে জল খেতে এল; ডোবা খালি দেখে তার ভারি রাগ হ'লো। পাশেই একটা মানুষ শুয়ে আছে দেখে সে তার মাথায় দিল গোদা পায়ের এক লাথি! ঠুকে-মারি বলল, "ওরে, মাথা টিপেই দিবি যদি, একটু ভাল করে দে' না বাপু!" হাতীর তখন আরো বেশী রাগ হ'লো। সে শুঁড়ে করে ঠুকে-মারিকে তুলে আছাড় মারতে চেয়েছিল, কিন্তু তার আগেই ঠুকে-মারি তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে হাতী মশাইকে থলের মধ্যে পুরে রওয়ানা হ'লো।

খানিক দূর গিয়ে সে মুখে-মারির বাড়িতে এসে হাজির হ'লো আর বাইরে থেকে চেঁচাতে লাগল, "কই হে মুখে-মারি! ভারি নাকি পালোয়ান তুমি! সাহস থাকে তো লড় না এসে!" শুনে মুখে-মারি তাড়াতাড়ি বাড়ির পিছনে এক জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। মুখে-মারির বৌ বলল, "কর্তা আজ বাড়ি নেই। কোথায় যেন পাহাড় ঠেলতে গিয়েছেন।" ঠুকে-মারি বলল, "এটা তাকে দিয়ে ব'লো যে এর মালিক তার সঙ্গে লড়তে চায়।" এই বলে সে হাতীটাকে ছুঁড়ে তাদের উঠানে ফেলে দিল।

ব্যাপার দেখে বাড়ির লোকের চক্ষুস্থির! কিন্তু মুখে-মারির সেয়ানা খোকা হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "ও মা গো! দুষ্টু লোকটা আমার দিকে একটা ইঁদুর ফেলেছে! কি করি বল তো?" তার মা বলল, "কিছু ভয় নেই। তোমার বাবা এসে ওকে উচিত শিক্ষা দেবেন। এখন ইঁদুরটাকে ঝাঁট দিয়ে ফেলে দাও।"

এই কথা বলা মাত্র ঝাঁটার ঝট্পট্ শব্দ হ'লো আর ছেলেটা বলল, "ঐ যা! ইঁদুরটা নর্দমায় পড়ে গেল।" ঠুকে-মারি ভাবল, "যার খোকা এরকম, সে নিশ্চয়ই আমার উপযুক্ত জুড়ি হবে।"

বাড়ির সামনে একটা তাল গাছ ছিল, সেইটা উপ্‌ড়ে নিয়ে ঠুকে-মারি হেঁকে বলল,

"ওরে খোকা, তোর বাবাকে বলিস্ যে আমার একটা ছড়ির দরকার ছিল, তাই এটা নিয়ে চল্‌লাম।" খোকা তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, "ওমা দেখেছ? ঐ দুষ্টু লোকটা বাবার খড়্‌কে কাঠি নিয়ে পালিয়ে গেল।" খড়্‌কে কাঠি শুনে ঠুকে-মারির চোখ দুটো আলুর মত বড় হয়ে উঠল। সে ভাবল, "দরকার নেই বাপু, ওসব লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে।" সে তখনই হন্ হন্ করে সে গ্রাম ছেড়ে নিজের গ্রামে পালিয়ে গেল।

মুখে-মারি বাড়িতে এসে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল, "কিরে! লোকটা গেল কই?" খোকা বলল, "সে ঐ তাল গাছটা নিয়ে পালিয়ে গেল।" "তুই তাকে কিছু বললি না?" "নিয়ে গেল, তা আমি আর তাকে বলব কি?" এই কথা শুনে মুখে-মারি ভয়ানক রেগে বলল, "হতভাগা! তুই আমার ছেলে হয়ে আমার নাম ডোবালি? দরকার হলে দুটো কথা বলতে পারিস্‌নে? যা! আজই তোকে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসব।" এই বলে সে অপদার্থ ছেলেকে গঙ্গায় ফেলে দিতে চলল।

কিন্তু গঙ্গা তো গ্রামের কাছে নয়—সে অনেক দূর। মুখে-মারি হাঁটছে হাঁটছে আর ভাবছে, ছেলেটা যখন কান্নাকাটি করবে, তখন তাকে বলবে, "আচ্ছা, এবার তোকে ছেড়ে দিলাম।" কিন্তু ছেলেটা কাঁদেও না, কিছু বলেও না, সে বেশ আরামে কাঁধে চড়ে 'গঙ্গায়' চলেছে। তখন মুখে-মারি তাকে ভয় দেখিয়ে বলল, "আর দেরী নেই, এই গঙ্গা এসে পড়ল বলে।" ছেলেটা চট্ করে বলে উঠল, "হ্যাঁ বাবা। বড্ড জলের ছিটা লাগছে।" শুনে মুখে-মারির চক্ষুস্থির! সে তখনই ছেলেকে কাঁধ থেকে নামিয়ে বলল, "শিগ্‌গির বল, সত্যি করে, লোকটাকে তুই কিছু বলেছিস কিনা?" ছেলে বলল, "ওকে তো আমি কিছু বলিনি। আমি মাকে চেঁচিয়ে বললাম, দুষ্টু লোকটা বাবার খড়্‌কে কাঠি নিয়ে পালিয়ে গেল।" মুখে-মারি এক গাল হেসে তার পিঠ থাব্‌ড়ে বলল, "সাবাস্ ছেলে! বাপ্‌কা বেটা!"

বিষ্ণুবাহনের দিগ্বিজয়

বিষ্ণুবাহন খাসা ছেলে। তাহার নামটি যেমন জমকালো, তার কথাবার্তা চাল-চলনও তেমনি। বড় বড় গম্ভীর কথা তাহার মুখে যেমন শোনাইত, এমন আর কাহারও মুখে শুনি নাই। সে যখন টেবিলের উপর দাঁড়াইয়া হাত পা নাড়িয়া 'দুঃশাসনের রক্তপান' অভিনয় করিত, তখন আমরা সবাই উৎসাহে হাততালি দিয়া উঠিতাম, কেবল দু-একজন হিংসুটে ছেলে নাক সিঁট্‌কাইয়া বলিত, "ওরকম ঢের ঢের দেখা আছে।" ভুতো এই হিংসুটে দলের সর্দার, সে বিষ্ণুবাহনকে ডাকিত 'খগা'। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, "বিষ্ণুবাহন মানে গরুড়, আর গরুড় হচ্ছেন খগরাজ—খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল—তাই বিষ্ণুবাহন হলেন খগা।" বিষ্ণুবাহন বলিল, "ওরা আমার নামটাকে পর্যন্ত হিংসে করে।"

বিষ্ণুবাহনের কে এক মামা 'চন্দ্রদ্বীপের দিগ্বিজয়' ব'লে একখানা নতুন নাটক লিখিয়াছেন। বিষ্ণুবাহন একদিন সেটা আমাদের পড়িয়া শোনাইল। শুনিয়া আমরা সকলেই বলিলাম, "চমৎকার!" বিশেষত, যে জায়গায় চন্দ্রদ্বীপ "আয় আয় কাপুরুষ আয় শত্রু আয় রে"

বলিয়া নিষাদরাজার সিংহদরজায় তলোয়ার মারিতেছেন, সেই জায়গাটা পড়িতে পড়িতে বিষ্ণুবাহন যখন হঠাৎ "আয় শত্রু আয়" বলিয়া ভূতোর ঘাড়ে ছাতার বাড়ি মারিল, তখন আমাদের এমন উৎসাহ হইয়াছিল যে আর একটু হইলেই একটা মারামারি বাধিয়া যাইত। আমরা তখনই ঠিক করিলাম যে ওটা 'অ্যাক্‌টিং' করিতে হইবে।

ছুটির দিনে আমাদের অভিনয় হইবে, তাহার জন্য ভিতরে ভিতরে সব আয়োজন চলিতে লাগিল। রোজ টিফিনের সময় আর ছুটির পরে আমাদের তর্জন-গর্জনে পাড়াশুদ্ধ লোক বুঝিতে পারিত যে, একটা কিছু কাণ্ড হইতেছে। বিষ্ণুবাহন চন্দ্রদ্বীপ সাজিবে, সেই আমাদের কথাবার্তা শিখাইত আর অঙ্গভঙ্গী লম্ফ ঝম্ফ সব নিজে করিয়া দেখাইত। ভূতোর দল প্রথমটা খুব ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছিল, কিন্তু যেদিন বিষ্ণুবাহন কোথা হইতে এক রাশ নকল গোঁফ-দাড়ি, কতকগুলা তীর ধনুক, আর রূপালি কাগজে মোড়া কাঠের তলোয়ার আনিয়া হাজির করিল, সেইদিন তাহারা হঠাৎ কেমন মুষ্‌ড়াইয়া গেল। ভূতোর কথাবার্তা ও ব্যবহার বদলাইয়া আশ্চর্যরকম নরম হইয়া আসিল এবং বিষ্ণুবাহনের সঙ্গে ভাব পাতাইবার জন্য সে হঠাৎ এমন ব্যাকুল হইয়া উঠিল যে ব্যাপার দেখিয়া আমরা সকলেই অবাক হইয়া রহিলাম। তার পরদিনই টিফিনের সময় সে একটি ছেলেকে দিয়া বলিয়া পাঠাইল যে, 'দূত হোক, পেয়াদা হোক, তাহাকে যাহা কিছু সাজিতে দেওয়া যাইবে, সে তাহাই সাজিতে রাজী আছে।' শেষ দৃশ্যে রণস্থলে মৃতদেহ দেখিয়া নিষাদরাজের কাঁদিবার কথা—আমরা কেহ কেহ বলিলাম, "আচ্ছা, ওকে মৃতদেহ সাজতে দাও।" বিষ্ণুবাহন কিন্তু রাজী হইল না। সে ছেলেটাকে বলিল, "জিজ্ঞাসা করে আয়; সে তামাক সাজতে পারে কিনা।" শুনিয়া আমরা হো হো করিয়া খুব হাসিলাম, আর বলিলাম, "এইবার ভূতোর মুখে জুতো।"

তারপর একদিন আমরা হরিদাসকে দিয়ে একটা বিজ্ঞাপন লেখাইলাম। হরিদাস ছবি আঁকিতে জানে, তার হাতের লেখাও খুব ভাল; সে বড় বড় অক্ষরে একটা সাইনবোর্ড লিখিয়া দিল—

"চন্দ্রদ্বীপের দিগ্বিজয়"

১৪ই আশ্বিন, সন্ধ্যা ৬।। ঘটিকা

আমরা মহা উৎসাহ করিয়া সেইটা স্কুলের বড় বারান্দায় টাঙ্গাইয়া দিলাম। কিন্তু পরের দিন আসিয়া দেখি কে যেন 'চন্দ্রদ্বীপ' কথাটাকে কাটিয়া মোটা মোটা অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে—"বিষ্ণুবাহন"—বিষ্ণুবাহনের দিগ্বিজয়! ইহার উপর ভূতো আবার গায়ে পড়িয়া বিষ্ণুবাহনকে শুনাইয়া গেল "কিরে খগা, খুব দিগ্বিজয় করছিস যে!"

এমনি করিয়া শেষে ছুটির দিন আসিয়া পড়িল। সেদিন আমাদের উৎসাহ যেন ফাটিয়া পড়িতে লাগিল, আমরা পর্দা ঘেরিয়া তক্তা ফেলিয়া মস্ত স্টেজ বাঁধিয়া ফেলিলাম। অভিনয় দেখিবার জন্য দুনিয়াশুদ্ধ লোককে খবর দেওয়া হইয়াছে, ছয়টা না বাজিতেই লোক আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা সকলে তাড়াহুড়া করিয়া পোশাক পরিতেছি, বিষ্ণুবাহন ছুটাছুটি করিয়া ধমক-ধামক দিয়া সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া উপদেশ দিতেছে। দেখিতে দেখিতে সমস্ত যখন ঠিকঠাক হইল, তারপর ঘণ্টা দিতেই স্টেজের পর্দা সর্‌সর্‌ করিয়া উঠিয়া গেল, আর চারিদিকে খুব হাততালি পড়িতে লাগিল।

প্রথম দৃশ্যেই আছে, চন্দ্রদ্বীপ তাহার ভাই বজ্রদ্বীপের খোঁজে আসিয়া নিষাদ-রাজার দরজায় উপস্থিত হইয়াছেন, এবং খুব আড়ম্বর করিয়া নিষাদরাজাকে "আয় শত্রু আয়"

বলিয়া যুদ্ধে ডাকিতেছেন। যখন তলোয়ার দিয়া দরজায় মারা হইবে তখন নিষাদের দল হুঙ্কার দিয়া বাহির হইবে, আর একটা ভয়ানক যুদ্ধ বাধিবে। দুঃখের বিষয়, বিষ্ণুবাহনের বক্তৃতাটা আরম্ভ না হইতেই সে অতিরিক্ত উৎসাহে ভুলিয়া খটাং করিয়া দরজায় হঠাৎ এক ঘা মারিয়া বসিল। আর কোথা যায়! 'অমনি নিষাদের দল "মার মার" করিয়া আমাদের এমন ভীষণ আক্রমণ করিল যে, নাটকে যদিও আমাদের জিতিবার কথা, তবু আমরা বক্তৃতা-টক্তৃতা ভুলিয়া যে যার মত পিট্‌টান দিলাম। বাহিরে আসিয়া বিষ্ণুবাহন রাগে গজ্‌রাইতে লাগিল। আমরা বলিলাম, "আসল নাটকে কি আছে কেউ ত তা জানে না—না হয়, চন্দ্রদ্বীপ হেরেই গেল।" কিন্তু বিষ্ণুবাহন কি সে কথা শোনে? সে লাফাইয়া ধমকাইয়া হাত পা নাড়িয়া শেষটায় নাটকের বইয়ের উপর এক কালির বোতল উল্টাইয়া ফেলিল এবং তাড়াতাড়ি রুমাল বাহির করিয়া কালি মুছিতে লাগিল। ততক্ষণে এদিকে দ্বিতীয় দৃশ্যের ঘন্টা পড়িয়াছে।

বিষ্ণুবাহন ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া আবার আসরে নামিতে গিয়াই পা হড়্‌কাইয়া প্রকাণ্ড এক আছাড় খাইল। দেখিয়া লোকেরা কেহ হাসিল, কেহ 'আহা আহা' করিল, আর সব গোলমালের উপর সকলের চাইতে পরিষ্কার শোনা গেল ভূতোর চড়া গলার চীৎকার—"বাহবা বিষ্ণুবাহন।" বিষ্ণুবাহন বেচারা এমন অপ্রস্তুত হইয়া গেল যে সেখানে যাহা বলিবার তাহা বেমালুম ভুলিয়া "সেনাপতি! এই কি সে রত্নগিরিপুর" বলিয়া একেবারে চতুর্থ দৃশ্যের কথা আরম্ভ করিল। আমি কানে কানে বলিলাম, "ওটা নয়," তাহাতে সে আরো ঘাবড়াইয়া গেল। তাহার মুখে দরদর করিয়া ঘাম দেখা দিল, সে কয়েকবার ঢোক গিলিয়া, তারপর রুমাল দিয়া মুখ মুছিতে লাগিল। রুমালটি আগে হইতেই কালিমাখা হইয়াছিল, সুতরাং তাহার মুখখানার চেহারা এমন অপরূপ হইল যে আমাদেরই হাসি চাপিয়া রাখা মুস্কিল হইল। ইহার উপর সে যখন ঐ চেহারা লইয়া, ভাঙা ভাঙা গলায় "কোথায় পালাবে তারা শৃগালের প্রায়" বলিয়া বিকট আস্ফালন করিতে লাগিল, তখন ঘরশুদ্ধ লোক হাসিয়া গড়াগড়ি দিবার জোগাড় করিল। বিষ্ণুবাহন বেচারা কিছুই জানে না, সে ভাবিল, শ্রোতাদের কোথাও একটা কিছু ঘটিয়াছে, তাই সকলে হাসিতেছে। সুতরাং সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য আরও উৎসাহে হাত-পা ছুঁড়িয়া ভীষণ রকম তর্জন-গর্জন করিয়া স্টেজের উপর ঘুরিতে লাগিল। ইহাতেও হাসি ক্রমাগতই বাড়িতেছে দেখিয়া তাহার মনে কি যেন সন্দেহ হইল, সে হঠাৎ আমাদের দিকে ফিরিয়া দেখে আমরাও প্রাণপণে হাসিতেছি—এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই হাসিতেছি! তখন রাগে একেবারে দিগ্বিদিক ভুলিয়া সে তাহার 'তলোয়ার' দিয়া বিশুর পিঠে সপাং করিয়া এক বাড়ি মারিল। বিশু চন্দ্রদ্বীপের মন্ত্রী, তাহার মার খাইবার কথাই নয়, সুতরাং সে ছাড়িবে কেন? সে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া বিষ্ণুবাহনের গালে দুই চড় বসাইয়া দিল। তখন সেই স্টেজের উপরেই সকলের সামনে দুজনের মধ্যে একটা ভয়ানক হুড়োহুড়ি কিলাকিলি বাধিয়া গেল। প্রথমে, প্রায় সকলেই ভাবিয়াছিল ওটা অভিনয়ের লড়াই; সুতরাং অনেকে খুব হাততালি দিয়া উৎসাহ দিতে লাগিল। কিন্তু বিষ্ণুবাহন যখন দস্তুরমত মার খাইয়া "দেখুন দেখি সার্, মিছামিছি মারছে কেন" বলিয়া কাঁদ-কাঁদ গলায় হেডমাস্টার মহাশয়ের কাছে নালিশ জানাইতে লাগিল, তখন ব্যাপারখানা বুঝিতে আর কাহারও বাকী রহিল না।

ইহার পর, সে দিন যে আর অভিনয় হইতেই পারে নাই, একথা বুঝাইয়া বলিবার

আর দরকার নাই। ছুটি হইবার তিনদিন পরেই বিষ্ণুবাহন তাহার মামার বাড়ি চলিয়া গেল। ঐ তিনদিন সে বাড়ি হইতে বাহির হয় নাই, কারণ তাহাকে দেখিলেই ছেলেরা চেঁচায় "বিষ্ণুবাহনের দিগ্বিজয়!" স্কুলের গায়ে রাস্তার ধারে প্ল্যাকার্ড মারা "বিষ্ণুবাহনের দিগ্বিজয়"—এমনকি বিষ্ণুবাহনের বাড়ির দরজায় খড়ি দিয়া বড় বড় অক্ষরে লেখা—**'বিষ্ণুবাহনের দিগ্বিজয়'**।

বাজে গল্প ১

দুই বন্ধু ছিল। একজন অন্ধ আর একজন কালা। দুইজনে বেজায় ভাব। কালা বিজ্ঞাপনে পড়িল, আর অন্ধ লোকমুখে শুনিল, কোথায় যেন যাত্রা হইবে, সেখানে সঙেরা নাচগান করিবে। কালা বলিল, "অন্ধ ভাই, চল, যাত্রায় গিয়া দেখি।" অন্ধ হাত নাড়িয়া গলা খেলাইয়া কালাকে বুঝাইয়া দিল, "কালা-ভাই, চল, যাত্রায় নাচ গান শুনিয়া আসি।"

দুইজনে যাত্রার আসরে গিয়া বসিল। রাত দুপুর পর্যন্ত নাচ গান চলিল, তারপর অন্ধ বলিল, "বন্ধু, গান শুনিলে কেমন?" কালা বলিল, "আজকে ত নাচ দেখিলাম—গানটা বোধহয় কাল হইবে।" অন্ধ ঘন ঘন মাথা নাড়িয়া বলিল, "মূর্খ তুমি! আজ হইল গান—নৃত্যটাই বোধহয় কাল হইবে।"

কালা চলিয়া গেল। সে বলিল "চোখে দেখ না, তুমি নাচের মর্ম জানিবে কি?" অন্ধ তাহার কানে আঙ্গুল ঢুকাইয়া বলিল, "কানে শোন না, গানের তুমি কাঁচকলা বুঝিবে কি?" কালা চিৎকার করিয়া বলিল, "আজকে নাচ, কালকে গান," অন্ধ গলা ঝাঁকড়াইয়া আর ঠ্যাং নাচাইয়া বলিল, "আজকে গান, কালকে নাচ।"

সেই হইতে দুজনের ছাড়াছাড়ি। কালা বলে, "অন্ধটা এমন জুয়াচোর—সে দিনকে রাত করিতে পারে।" অন্ধ বলে, "কালাটা যদি নিজের কথা শুনিতে পাইত, তবে বুঝিত সে কত বড় মিথ্যাবাদী।"

বাজে গল্প ২

কলকেতার সাহেব বাড়ি থেকে গোষ্ঠবাবুর ছবি এসেছে। বাড়িতে তাই হুলুস্থুল। চাকর বামুন ধোপা নাপিত দারোগা পেয়াদা সবাই বলে, "দৌড়ে চল, দৌড়ে চল।"

যে আসে সেই বলে, "কি চমৎকার ছবি! সাহেবের আঁকা।" বুড়ো যে সরকার মশাই তিনি বললেন, "সব চাইতে সুন্দর হয়েছে বাবুর মুখের হাসিটুকু—ঠিক তাঁরই মতন ঠাণ্ডা হাসি!" শুনে অবাক হয়ে সবাই বললে "যা হোক! সাহেব হাসিটুকু ধরেছে খাসা।"

বাবুর যে বিষ্টুখুড়ো তিনি বললেন, "চোখ দুটো যা এঁকেছে, ওরই দাম হাজার টাকা—চোখ দেখলে, গোষ্ঠর ঠাকুরদার কথা মনে পড়ে।" শুনে একুশজন একবাক্যে হাঁ হাঁ করে সায় দিয়ে উঠল।

রেধো ধোপা তার কাপড়ের পোঁটলা নামিয়ে বললে, "তোফা ছবি। কাপড়খানার ইস্ত্রি যেন রেধো ধোপার নিজের হাতে করা।" নাপিত তার ক্ষুরের থলি দুলিয়ে বললে, "আমি উনিশ বছর বাবুর চুল ছাঁট্‌ছি—আমি ঐ চুলের কেতা দেখেই বুঝ্‌তে পারি, একখান ছবির মতন ছবি। আমি যখনই চুল ছাঁটি, বাবু আয়না দেখে ঐ রকম খুশী হন।"
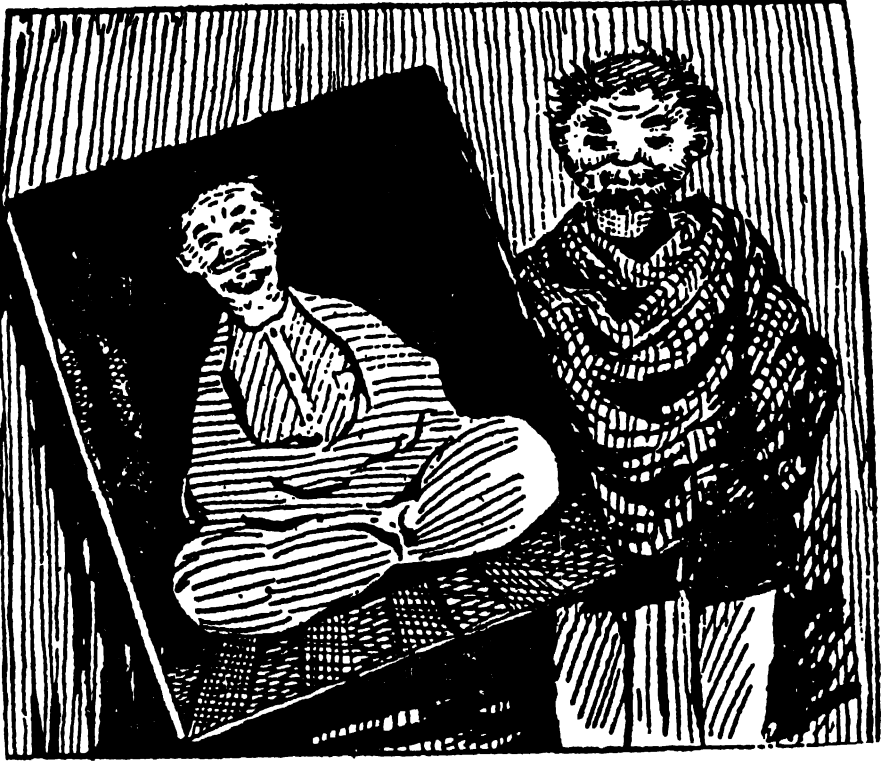
বাবুর আহ্লাদী চাকর কেষ্টারাম বললে, "বল্‌ব কি ভাই, এমন জলজ্যান্ত ছবি—আমি ত ঘরে ঢুকেই এক পেনাম ঠুকে চেয়ে দেখি, বাবু ত নয়—ছবি!" সবাই বললে, "তা ভুল হবারই কথা—আশ্চর্য ছবি যা হোক।"

তারপর সবাই মিলে ছবির নাক মুখ গোঁফ দাড়ি সমস্ত জিনিষের খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আলোচনা ক'রে প্রমাণ করলেন যে সব বিষয়েই বাবুর সঙ্গে আশ্চর্য রকম মিলে যাচ্ছে—সাহেবের বাহাদুরী বটে! এমন সময় বাবু এসে ছবির পাশে দাঁড়ালেন।

বাবু বললেন, "একটা বড় ভুল হ'য়ে গেছে। কলকেতা থেকে ওরা লিখ্‌ছে যে ভুলে আমার ছবি পাঠাতে কার যেন ছবি পাঠিয়ে দিয়েছে। ওটা ফেরৎ দিতে হবে।"

শুনে সরকার মশাই মাথা নেড়ে বললেন, "দেখেছ! ওরা ভেবেছে আমায় ঠকাবে! আমি দেখেই ভাবছি অমন ভিরকুটি দেওয়া প্যাখ্‌না হাসি—এ আবার কার ছবি!" খুড়ো বললেন, "দেখ না! চোখ দুটো যেন উলটে আসছে—যেন গঙ্গাযাত্রার জ্যান্ত মড়া!" রেধো

ধোপা সেও বলল, "একটা কাপড় পরেছে যেন চাষার মত। ওর সাতজন্মে কেউ যেন পোষাক পরতে শেখেনি।" নাপিত ভায়া মুচকি হেসে মুখ বাঁকিয়ে বলল, "চুল কেটেছে দেখ না—যেন মাথার উপর কাস্তে চালিয়েছে।" কেনারাম ভীষণ ক্ষেপে চেঁচিয়ে বললে, "আমি সকাল বেলায় ঘরে ঢুকেই চোর ভেবে চমকে উঠেছি। আরেকটু হ'লেই মেরেছিলাম আর কি! আবার এরা বলছিল, ওটা নাকি বাবুর ছবি। আমার সামনে ও কথা বললে মুখ থুড়ে দিতুম না।"

তখন সবাই মিলে এক বাক্যে বললে যে, সবাই টের পেয়েছিল, এটা বাবুর ছবি নয়। বাবুর নাক কি অমন চ্যাটাল? বাবুর কি হাঁসের পায়ের মত কান? ও কি বসেছে, না ভালুক নাচছে?

বাজে গল্প ৩

কতগুলো ছেলে ছাতের উপর হুড়োহুড়ি করে খেলা করছে—এমন সময়ে একটা মারামারির শব্দ শোনা গেল। তারপরেই হঠাৎ গোলমাল থেমে গিয়ে সবাই মিলে "হারু পড়ে গেছে" বলে কাঁদতে কাঁদতে নীচে চলল।

খানিক বাদেই শুনি একতলা থেকে কান্নাকাটির শব্দ উঠছে। বাইরের ঘরে যদুর বাবা গণেশবাবু ছিলেন—তিনি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে?" শুনতে পেলেন ছেলেরা কাঁদছে "হারু পড়ে গিয়েছে।" বাবু তখন দৌড়ে গেলেন ডাক্তার ডাকতে।

পাঁচ মিনিটে ডাক্তার এসে হাজির—কিন্তু হারু কোথায়? বাবু বললেন, "এদিকে ত পড়েনি, ভেতর বাড়িতে পড়েছে বোধহয়।" কিন্তু ভেতর বাড়িতে মেয়েরা বললেন, "এখানে ত পড়েনি—আমরা ত ভাবছি বার-বাড়িতে পড়েছে বুঝি।" বাইরেও নেই, ভেতরেও নেই, তবে কি ছেলে উড়ে গেল? তখন ছেলেদের জিজ্ঞাসা করা হ'ল "কোথায় রে? কোথায় হারু?" তারা বললে, "ছাতের উপর।" সেখানে গিয়ে তারা দেখে হারুবাবু অভিমান করে বসে বসে কাঁদ্ছেন! হারু বড় আদুরে ছেলে, মারামারিতে সে প'ড়ে গেছে দেখেই আর সকলে মার খাবার ভয়ে সেখান থেকে চম্পট দিয়েছে। "হারু পড়ে গেছে" বলে এত যে কান্না, তার অর্থ, সকলকে জানান হচ্ছে যে "হারুকে আমরা ফেলে দিইনি—সে পড়ে গেছে ব'লে আমাদের ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে।"

হারু তখন সকলের নামে বাবার কাছে নালিশ করবার জন্য মনে মনে অভিমান জমিয়ে তুলছিল—হঠাৎ তার বাবাকে লোকজন আর ডাক্তার শুদ্ধু এগিয়ে আসতে দেখে, ভয়ে তার আর নালিশ করাই হ'ল না। যা হোক, হারুকে আস্ত দেখে সবাই এমন খুশি হ'ল যে, শাসন-টাসনের কথা কারও মনেই এল না।

সবচেয়ে বেশি জোরে কেঁদেছিলেন হারুর ঠাকুরমা। তিনি আবার কানে শোনেন কিছু কম। তাঁকে সবাই জিজ্ঞেস করল, "আপনি এত কাঁদ্ছিলেন কেন?" তিনি বললেন, "আমি কি অত জানি? দেখ্‌লুম ঝিয়েরা কাঁদ্ছে, বৌমা কাঁদ্ছেন, তাই আমিও কাঁদ্তে লাগলুম—ভাবলুম একটা কিছু হয়ে থাক্‌বে।"

কুকুরের মালিক

ভজহরি আর রামচরণের মধ্যে ভারি ভাব। অন্তত, দুই সপ্তাহ আগেও তাহাদের মধ্যে খুবই বন্ধুতা দেখা যাইত।

সেদিন বাঁশপুকুরের মেলায় গিয়া তাহারা দুইজন মিলিয়া একটা কুকুরছানা কিনিয়াছে। চমৎকার বিলাতি কুকুর—তার আড়াই টাকা দাম। ভজুর পাঁচসিকা আর রামার পাঁচসিকা—দুইজনের পয়সা মিলিয়াই কুকুর কেনা হইল। সুতরাং দুইজনেই কুকুরের মালিক।

কুকুরটাকে বাড়িতে আনিয়াই ভজু বলিল, "অর্ধেকটা কুকুর আমার, অর্ধেকটা তোর।" রামা বলিল, "বেশ কথা! মাথার দিকটা আমার, ল্যাজের দিকটা তোর।" ভজু একটু ভাবিয়া দেখিল, মন্দ কি! মাথার দিকটা যার সেই তো কুকুরকে খাওয়াইবে, যত হাঙ্গাম সব তার। তাছাড়া কুকুর যদি কাউকে কামড়ায়, তবে মাথার দিকের মালিকই দায়ী, ল্যাজের মালিকের কোন দোষ দেওয়া চলিবে না। সুতরাং সে বলিল, "আচ্ছা, ল্যাজের দিকটাই নিলাম।"

দুইজনে দুপুর বেলায় বসিয়া কুকুরটার পিঠে হাত বুলাইয়া তোয়াজ করিত। রামা বলিত, "দেখিস, আমার দিকে হাত বোলাসনে।" ভজু বলিত, "খবরদার, এদিকে হাত আনিসনে।" দুইজনে খুব সাবধানে নিজের নিজের ভাগ বাঁচাইয়া চলিত। যখন ভজুর দিকের পা তুলিয়া কুকুরটা রামার দিকে কান চুলকাইত, তখন ভজু খবু উৎসাহ করিয়া বলিত, "খুব দে—আচ্ছা করে খাম্‌চিয়ে দে।" আবার ভজুর দিকে মাছি বসিলে রামার দিকের মুখটা যখন সেখানে কামড়াইতে যাইত, তখন রামা আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিত, "দে কামড়িয়ে! একেবারে দাঁত বসিয়ে দে।"

একদিন একটা মস্ত লাল পিঁপড়ে কুকুরের পিঠে কামড়াইয়া ধরিল। কুকুরটা গা ঝাড়া দিল, পিঠে জিভ লাগাইবার চেষ্টা করিল, নানারকম অঙ্গভঙ্গী করিয়া পিঠটাকে দেখিবার চেষ্টা করিল। তারপর কিছুতেই কৃতকার্য না হইয়া কেঁউ কেঁউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন দুইজনে বিষম তর্ক উঠিল, কার ভাগে কামড় পড়িয়াছে। এ বলে, "তোর দিকে পিঁপড়ে লেগেছে—তুই ফেলবি," ও বলে, "আমার বয়ে গেছে পিঁপড়ে ফেলতে—তোর দিকে কাঁদছে, সে তুই বুঝবি।" সেদিন দুইজনে প্রায় কথাবার্তা বন্ধ হইবার জোগাড়।

তারপর একদিন কুকুরের কী খেয়াল চাপিল, সে তাহার নিজের ল্যাজটা লইয়া খেলা আরম্ভ করিল। নেহাৎ 'কুকুরে' খেলা—তার না আছে অর্থ, না আছে কিছু। সে ধনুকের মত একপাশে বাঁকা হইয়া ল্যাজটার দিকে তাকাইয়া দেখে আর একটু একটু ল্যাজ নাড়ে। সেটা যে তার নিজের ল্যাজ, সে খেয়াল বোধহয় তার থাকে না—তাই হঠাৎ অতর্কিতে ল্যাজ ধরিবার জন্য সে বোঁ করিয়া ঘুরিয়া যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরটাও নড়িয়া যায়, কাজেই ল্যাজটা আর ধরা হয় না। ভজু আর রামা এই ব্যাপার দেখিয়া উৎসাহে চিৎকার করিতে লাগিল। রামার মহা স্ফূর্তি যে ভজুর ল্যাজকে তাড়া করা হইতেছে, আর ভজুর ভারি উৎসাহ যে তার ল্যাজ রামার মুখকে ফাঁকি দিয়া নাকাল করিতেছে।

দুইজনের চিৎকারের জন্যই হোক কী নিজের ট্যাঁটামির জন্যই হোক কুকুরটার জেদ চড়িয়া গেল। সমস্তদিন সে থাকিয়া থাকিয়া চর্কীবাজির মত নিজের ল্যাজকে তাড়া করিয়া ফিরিতে লাগিল। এইরকমে খামখা পাক দিতে দিতে কুকুরটা যখন হয়রান হইয়া হাঁপাইতে লাগিল, তখন রামা ব্যস্ত হইয়া উঠিল। ভজু বলিল, "আমার দিকটাই জিতিয়াছে।"

কিন্তু কুকুরটা এমন বেহায়া, পাঁচমিনিট যাইতে না যাইতেই সে আবার ল্যাজ তাড়ান শুরু করিল। তখন রামা রাগিয়া বলিল, "এইয়ো! তোমার ল্যাজ সামলাও। দেখছ না কুকুরটা হাঁপিয়ে পড়ছে?" ভজু বলিল, "সামলাতে হয় তোমার দিক সামলাও—ল্যাজের দিকে তো আর হাঁপাচ্ছে না!" রামা ততক্ষণে রীতিমত চটিয়াছে। সে কুকুরের পিছন পিছন গিয়া ধাঁই করিযা এক লাথি লাগাইয়া দিল। ভজু বলিল, "তবে রে! আমার দিকে লাথি মারলি কেন রে?" এই বলিয়াই সে কুকুরের মাথায় ঘাড়ে কানে চটাপট কয়েকটা চাঁটি লাগাইয়া দিল। দুই দিক হইতেই রেষারেষির চোটে কুকুরটা ছুটিয়া পালাইল। তখন দুইজনে বেশ একচোট হাতাহাতি হইয়া গেল।

পরের দিন সকালে উঠিয়াই রামা দেখে, কুকুরটা আবার ল্যাজ তাড়া করিতেছে। তখন সে কোথা হইতে একখানা দা' আনিয়া এক কোপে ক্যাঁচ্ করিয়া ল্যাজের খানিকটা এমন পরিপাটি উড়াইয়া দিল যে কুকুরটার আর্তনাদে ভজু ঘুমের মধ্যে লাফ দিয়া একেবারে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত। সে আসিয়াই দেখিল কুকুরের ল্যাজ কাটা, রামার হাতে দা'। ব্যাপারটা বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না।

তখন সে রামাকে মারিতে মারিতে মাটিতে ফেলিয়া তাহার উপর কুকুর লেলাইয়া দিল। কুকুরটা ল্যাজ কাটার দরুণ রামার উপর একটুও খুশী হয় নাই—সে নিমকহারাম হইয়া 'রামার দিক' দিয়াই রামার ঠ্যাঙে কামড়াইয়া দিল।

এখন দুইজনেই চায় থানায় নালিশ করিতে। রামা বলে ল্যাজটা ভারি বেয়াড়া, বারবার মুখের সঙ্গে ঝগড়া লাগাইতে চায়—তাই সে ল্যাজ কাটিয়াছে। ল্যাজ না কাটিলে কুকুর পাগল হইয়া যাইত, না হয় সর্দিগর্মি হইয়া মরিত। মারা গেলে ত, সমস্ত কুকুরই মারা যাইত, সুতরাং ল্যাজ কাটার দরুণ গোটা কুকুরটারই উপকার হইয়াছে। মুখও বাঁচিয়াছে, ল্যাজও বাঁচিয়াছে; তাতে রামারও ভাল, ভজুরও ভাল। কিন্তু ভজুর এতবড় আস্পর্ধা যে সে রামার দিকের কুকুরকে রামার উপরে লেলাইয়া দিল। মুখের দিকে ভজুর কোন দাবিদাওয়া নাই, সে দিকটা সম্পূর্ণ ভাবেই রামার—সুতরাং রামার অনুমতি ছাড়া ভজু কোন্ সাহসে এবং কোন্ শাস্ত্র বা আইন মতে তাহা লইয়া পরের ধনে পোদ্দারি করিতে যায়? ইহাতে অনধিকারচর্চা চুরি তছরূপ—সব রকম নালিশ চলে।

ভজু কিন্তু বলে অন্যরকম। সে বলে রামার দিকের কুকুর রামাকে কামড়াইয়াছে, তাতে ভজুর কি দোষ? ভজু কেবল 'লে লে লে' বলিয়াছিল; তাহাতে কুকুর যদি রামাকে কামড়ায়, তবে সেটা তার শিক্ষার দোষ—রামা তাহাকে ভাল করিয়া শিক্ষা দেয় নাই কেন? তাছাড়া ভজুর ল্যাজ খেলা করিতে চায়, রামার হিংসুটে মুখটা তাহাতে আপত্তি করে কেন? ভজুর ল্যাজকে কামড়াইতে যাইবার তাহার কি অধিকার আছে? আর, রামা তার কুকুরের চোখ বাঁধিয়া কিংবা মুখোস আঁটিয়া দিলেই পারিত—সে ল্যাজ কাটিতে গেল কাহার হুকুমে? একবার নালিশটি করিলে রামচরণ "বাপ বাপ" বলিয়া ছয়টি মাস জেল খাটিয়া আসিবেন—তা নইলে ভজুর নাম ভজহরিই নয়।

এখন এ তর্কের আর মীমাংসাই হয় না। আমাদের হরিশখুড়ো বলিয়াছিলেন, "এক কাজ কর্, কুকুরটার নাকের ডগা থেকে ল্যাজের আগা পর্যন্ত দাঁড়ি টেনে তার ডান দিকটা তুই নে, বাঁ দিকটা ওকে দে—তা হ'লেই ঠিকমত ভাগ হবে।" কিন্তু তাহারা ওরকম "ছিল্‌কা কুকুরের" মালিক হইতে রাজী নয়। কেউ কেউ বলিল, "তা কেন? ভাগাভাগির

দরকার কি? গোটা কুকুরটাই রামার, আবার গোটা কুকুরটাই ভজুর।" কিন্তু এ কথায়ও তাহাদের খুব আপত্তি। একটা বই কুকুর নাই, তার গোটা কুকুরটাই যদি রামার হয় তবে ভজুর আবার কুকুর আসে কোথা হইতে? আর রামার গোটা কুকুরটাই যদি ভজুর হয়, তবে রামার আর থাকিল কি? কুকুর থেকে কুকুর বাদ, বাকি রইল শূন্যি!

এখন তোমরা যদি ইহার মীমাংসা করিয়া দাও।

টাকার আপদ

বুড়ো মুচী রাতদিনই কাজ করছে আর গুণ্ গুণ্ গান করছে। তার মেজাজ বড় খুশি, স্বাস্থ্যও খুব ভাল। খেটে খায়; স্বচ্ছন্দে দিন চলে যায়।

তার বাড়ির ধারে এক ধনী বেনে থাকে। বিস্তর টাকা তার; মস্ত বাড়ি, অনেক চাকর-বাকর। মনে কিন্তু তার সুখ নাই, স্বাস্থ্যও তার ভাল নয়। মুচীর বাড়ির সামনে দিয়ে সে রোজ যাতায়াত করে আর ভাবে, 'এ লোকটা এত গরীব হয়েও রাতদিনই আনন্দে গান করছে, আর আমার এত টাকাকড়ি, আমার একটুও আনন্দ হয় না মনে,—গাওয়া তো দূরের কথা। ইচ্ছা হলে তো টাকা দিয়ে রাজ্যের বড় বড় ওস্তাদ আনিয়ে বাড়িতে গাওয়াতে পারি—নিজেও গাইতে পারি,—কিন্তু সে ইচ্ছা হয় কই?' শেষটায় একদিন সে মনে মনে ঠিক করল যে এবার যখন মুচীর বাড়ির সামনে দিয়ে যাবে তখন তার সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা বলবে।

পরদিন সকালেই সে গিয়ে মুচীকে জিজ্ঞাসা করল, "কি হে মুচী ভায়া, বড় যে ফুর্তিতে গান কর, বছরে কত রোজগার কর তুমি?"

মুচী বলল, "সত্যি বলছি মশাই, সেটা আমি কখনও হিসাব করি নি। আমার কাজেরও কোনদিন অভাব হয় নি, খাওয়া পরাও বেশ চলে যাচ্ছে। কাজেই, টাকার কোন হিসাব রাখবারও দরকার হয় নি কোনদিন।"

বেনে বলল, "আচ্ছা, প্রতিদিন কত কাজ করতে পার তুমি?"

মুচী বলল, "তারও কিছু ঠিক নেই। কখনও বেশি করি, কখনও কম করি।"

মুচীর সাদাসিধে কথাবার্তায় বেনে বড় খুশি হল, তারপর, একটা টাকার থলে নিয়ে সে মুচীকে বলল, "এই নাও হে;—তোমাকে এই একশো টাকা দিলাম। এটা রেখে দাও, বিপদ-আপদ অসুখ-বিসুখের সময় কাজে লাগবে।"

মুচীর তো ভারি আনন্দ; সে সেই টাকার থলেটা নিয়ে মাটির তলায় লুকিয়ে রেখে দিল। তার জীবনে সে কখনও একসঙ্গে এতগুলি টাকা চোখে দেখে নি।

কিন্তু, আস্তে আস্তে তার ভাবনা আরম্ভ হল। দিনের বেলা বেশ ছিল; রাত্তির হতেই তার মনে হতে লাগল, "ঐ বুঝি চোর আসছে!" বেড়ালে ম্যাও করতেই সে মনে করল, "ঐ রে! আমার টাকা নিতে এসেছে।" শেষটায় আর তার সহ্য হল না। টাকার থলিটা নিয়ে সে ছুটে বেনের বাড়ি গিয়ে বলল, "এই রইল তোমার টাকা! এর চেয়ে আমার গান আর ঘুম ঢের ভাল!"

রাজার অসুখ

এক ছিল রাজা। রাজার ভারি অসুখ। ডাক্তার বদ্যি হাকিম কবিরাজ সব দলে দলে আসে আর দলে দলে ফিরে যায়। অসুখটা যে কী তা কেউ বলতে পারে না, অসুখ সারাতেও পারে না।

সারাবে কী করে? অসুখ তো আর সত্যিকারের নয়। রাজা মশাই কেবলই বলেন 'ভারি অসুখ', কিন্তু কোথায় যে অসুখ তা আর কেউ খুঁজে পায় না! কত রকমের কত ওষুধ রাজা মশাই খেয়ে দেখলেন, কিছুতেই কিছু হ'ল না। মাথায় বরফ দেওয়া হল, পেটে সেঁক দেওয়া হ'ল, পায়ে জোঁক লাগান হ'ল, হাতে মাদুলি বাঁধা হ'ল, কিন্তু অসুখের কোন কিনারাই হ'ল না।

তখন রাজামশাই গেলেন ক্ষেপে। তিনি বললেন, "দূর করে দাও এই অপদার্থগুলোকে, আর ওদের পুঁথিপত্র যা আছে সব কিছু কেড়ে নিয়ে জ্বালিয়ে দাও।" এমনি করে চিকিৎসকেরা বিদায় হলেন। ভয়ে আর কেউ রাজার বাড়ির দিকেও যায় না। তখন সকলের ভাবনা হ'ল, তাই তো, শেষটায় কী রাজা মশাই বিনা চিকিৎসায় মারা যাবেন?

এমন সময় কোথা থেকে এক সন্ন্যাসী এসে বলল, "অসুখ সারাবার উপায় আমি জানি, কিন্তু সে ভারি শক্ত। তোমরা কী সে সব করতে পারবে?" মন্ত্রী, কোটাল, সেনাপতি, পাত্রমিত্র সবাই বলল—"কেন পারব না? খুব পারব। জান্ দিতে হয় জান্ দেব!" তখন সন্ন্যাসী বলল, "প্রথমে এমন একটি লোক খুঁজে আন যার মনে কোন ভাবনা নেই, যার মুখে হাসি লেগেই আছে, যে সব সময়ে, সব অবস্থাতেই খুশি থাকে।" সবাই বলল, "তারপর?" সন্ন্যাসী বলল, "তারপর সেই লোকের গায়ের জামা যদি রাজা মশাই একটা দিন পরে থাকেন, আর সেই লোকের তোষকে যদি এক রাত্রি ঘুমিয়ে থাকেন, তাহলেই সব অসুখ সেরে উঠবে।" সবাই শুনে বলল, "এ তো চমৎকার কথা!"

তাড়াতাড়ি রাজা মশাইয়ের কাছে খবর গেল। তিনি শুনে বললেন, "আরে, এই সহজ উপায়টা থাকতে এতদিন সবাই মিলে করছিল কী? এইটা কারো মাথায় আসেনি? যাও, এখনি খোঁজ করে সেই হাসি-ওয়ালা লোকটার জামা আর তোষক নিয়ে এস।"

চারদিকে লোক ছুটল, রাজ্যময় 'খোঁজ-খোঁজ' রব পড়ে গেল, কিন্তু সে লোকের আর সন্ধান পাওয়া যায় না। যে যায় সেই ফিরে আসে আর বলে, "যার দুঃখ নেই, ভাবনা নেই, সর্বদাই হাসিমুখ, সর্বদাই খুশি মেজাজ, কই, তেমন লোকের তো দেখা পাওয়া গেল না!" সবার মুখে এই একই কথা। তখন মন্ত্রীমশাই রেগে বললেন, "এদের দিয়ে কী কোন কাজ হয়? এ মূর্খেরা খুঁজতেই জানে না।" এই বলে তিনি নিজেই বেরোলেন সেই অজানা লোকের খোঁজ করতে।

বাজারের কাছে মস্ত এক দালানের সামনে তিনি দেখলেন, মেলা লোক জমে গিয়েছে আর এক বুড়ো শেঠজি হাসিমুখে তাদের চাল, ডাল, পয়সা আর কাপড় দান করছে। মন্ত্রী ভাবলেন বাঃ এই লোকটাকে তো বেশ হাসি-খুশি দেখাচ্ছে। ওর তো অনেক টাকা পয়সাও আছে দেখছি। তাহলে আর ওর দুঃখই বা কিসের, ভাবনাই বা কিসের? ওরই একটা জামা আর তোষক চেয়ে নেওয়া যাক।

মন্ত্রীমশাই এই রকম ভাবছেন, ঠিক সেই সময়ে একটা ভিখারী করেছে কি, ভিক্ষা নিয়ে শেঠজিকে সেলাম না করেই চলে যাচ্ছে। আর শেঠজির রাগ দেখে কে! তিনি ভিখারীকে গাল দিয়ে, জুতো মেরে, তার ভিক্ষা কেড়ে তাকে তাড়িয়ে দিলেন। ব্যাপার দেখে মন্ত্রীমশাই মাথা নেড়ে সেখান থেকে সরে পড়লেন।

তারপর নদীর ধারে এক জায়গায় তিনি দেখলেন, একটা লোক ভারি মজার ভঙ্গি করে নানারকম হাসির গান করছে আর তাই শুনে চারদিকের লোকেরা হো হো করে হাসছে। মানুষ যে এত রকম হাসির ভঙ্গি করতে পারে তা মন্ত্রীমশায়ের জানা ছিল না। তিনি লোকটার গান শুনে আর তামাসা দেখে একেবারে হেসে অস্থির হয়ে উঠলেন আর ভাবলেন, এমন আমুদে লোকটা থাকতে কিনা আমার লোকগুলো সব হতাশ হয়ে ফিরে যায়! তিনি পাশের একটি লোককে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই লোকটা কে হে?" সে বলল, "ও হচ্ছে গোব্‌রা মাতাল। এখন দেখছেন কেমন খোস মেজাজে আছে, কিন্তু সন্ধ্যা হলেই ওর মাতলামি, চেঁচামেচি আর উৎপাত শুরু হয়। ওর ভয়ে পাড়ার লোক তিষ্ঠোতে পারে না।" শুনে মন্ত্রীমশাই গম্ভীর হয়ে আবার চললেন সেই লোকটির সন্ধানে।

সারাদিন খুঁজে খুঁজে মন্ত্রীমশাই সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরলেন, কিন্তু সে লোকের সন্ধান কোথাও মিলল না। এমনি করে দিনের পর দিন তিনি খোঁজ করেন আর দিনের পর দিন হতাশ হয়ে বাড়ি ফেরেন। তাঁর উৎসাহ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, এমন সময়ে হঠাৎ এক গাছতলায় তিনি একটা পাগলা গোছের বুড়ো লোকের দেখা পেলেন।

লোকটার মাথাভরা চুল, মুখভরা দাড়ি, সমস্ত শরীর যেন শুকিয়ে দড়ি হয়ে গিয়েছে। সে একা একা বসে বসে আপন মনে কেবলই হাসছে, কেবলই হাসছে। মন্ত্রী বললেন, "তুমি এত হাসছ কেন?" সে বলল, "হাসব না? পৃথিবী বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে, গাছের পাতা সরে সরে যাচ্ছে, মাঠে মাঠে ঘাস গজাচ্ছে, রোদ উঠছে, বৃষ্টি পড়ছে, পাখিরা গাছে এসে বসছে, আবার সব উড়ে যাচ্ছে। এসব চোখের সামনে দেখছি আর হাসি পাচ্ছে।"

মন্ত্রী বললেন, "তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু শুধু বসে বসে হাসলে তো আর মানুষের দিন চলে না। তোমার কী আর কোন কাজকর্ম নেই?"

ফকির বলল, "তা কেন থাকবে না? সকাল বেলায় নদীতে যাই, সেখানে স্নান-টান সেরে, লোকজনের যাওয়া-আসা কথাবার্তা এই সব তামাসা দেখে, আবার গাছতলায় এসে বসি। তারপর, যেদিন খাওয়া জোটে খাই, যেদিন জোটে না খাই না। যখন বেড়াতে ইচ্ছা হয় বেড়াই, যখন ঘুম পায় তখন ঘুমাই। কোনও ভাবনা চিন্তা, হট্টগোল কিছুই নেই। ভারি মজা!"

মন্ত্রী খানিক মাথা চুলকিয়ে বললেন, "যেদিন খাওয়া পাও না সেদিন কি কর?"

ফকির বলল, "সেদিন তো কোন ল্যাঠাই নেই! চুপচাপ পড়ে থাকি আর এই সব তামাসা দেখি। বরং যেদিন খাওয়া হয়, সেদিনই হাঙ্গামা বেশি। ভাত মাখরে, গ্রাস তোলরে, মুখের মধ্যে ঢোকাওরে, চিবোওরে, গেলোরে,—তারপর জল খাওরে, আঁচাওরে, হাত মুখ মোছরে! কত রকম কাণ্ড!"

মন্ত্রী দেখলেন, এতদিনে ঠিক মতন লোক পাওয়া গিয়েছে। তিনি বললেন, "তোমার গায়ের এক-আধখানা জামা দিতে পার? তার জন্য তুমি যত ইচ্ছা দাম নাও, আমরা দিতে প্রস্তুত আছি।" শুনে লোকটা হো হো করে হাসতে লাগল, বলল, "আমার আবার

জামা। এই সেদিন একটা লোক একটা শাল দিয়েছিল, তাও তো ছাই ভিখারীকে দিয়ে ফেললাম। জামা-টামার ধারই ধারি না কোনদিন।"

মন্ত্রী বললেন, "তাহলে তো মহা মুশকিল! যদি বা একটা লোক পাওয়া গেল, তারও আবার জামা নেই। আচ্ছা, তোমার বিছানার তোষকখানা দিতে পার? কত দাম চাও বল, আমরা টাকা ঢেলে দিচ্ছি।"

এবারে ফকির হাসতে হাসতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তার হাসি আর থামেই না। অনেকক্ষণ হেসে তারপর সে বলল, "চল্লিশ বছর বিছানাই চোখে দেখলাম না, তা আবার তোষক আর গদি!"

মন্ত্রীমশাই বড় বড় চোখ করে বললেন, "জামাও গায়ে দাও না, লেপ-কম্বল-বিছানাও সঙ্গে রাখ না, তোমার কি অসুখও করে না ছাই?"

ফকির বলল, "অসুখ আবার কি? অসুখ-টসুখ ওসব আমি বিশ্বাস করি না। যারা কেবল অসুখ-অসুখ ভাবে, তাদেরই খালি অসুখ করে।" এই বলে ফকির আবার গাছে হেলান দিয়ে ঠ্যাং মেলে খুব হাসতে লাগল।

মন্ত্রীমশাই হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরলেন। রাজার কাছে খবর গেল। রাজা মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন, তার কাছে সব কথা শুনলেন, শুনে মন্ত্রীমশাইকে বিদায় দিলেন।

আবার সবাই ভাবতে বসল, এখন উপায় কী হবে? চিকিৎসাও হল না, অনেক কষ্টে যা একটা উপায় পাওয়া গেল, সেটাও গেল ফস্‌কে! সবাই বসে বসে এ ওর মুখ চায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আর বলে—"নাঃ, আর তো বাঁচাবার উপায় দেখছি না।" ওদিকে রাজামশাই ভাবতে বসেছেন, 'আমি থাকি রাজার হালে, ভাল ভাল জিনিস খাই, কোন কিছুর অভাব নেই, লোকেরা সব সময়ে তোয়াজ করছেই—আমার হল অসুখ! আর ঐ হতভাগা ফকির, যার চাল-চুলো কিচ্ছু নেই, জামা নেই, কম্বল নেই, গাছতলায় পড়ে থাকে, যা পায় তাই খায়—সে কিনা বলে অসুখ-টসুখ কিছু মানেই না! সে ফকির হয়ে অসুখ উড়িয়ে দিতে পারল, আর আমি রাজা হয়ে পারব না?"

তার পরদিনই রাজা ঘুম থেকে উঠে পাত্র মিত্র সবাইকে ডেকে বললেন, "যা হতভাগা মুখ্যুগুলো সব, সভায় বসগে যা! তোরা কেউ কিছু করতে পারলি না, এখন এই দেখ আমার অসুখ আমি নিজেই সারিয়ে দিয়েছি। আজ থেকে আবার সভায় গিয়ে বসব। আর যে টুঁ শব্দটি করবে তার মাথা উড়িয়ে দেব!"

দানের হিসাব

এক ছিল রাজা। রাজা জাঁকজমকে পোশাক পরিচ্ছদে লাখ লাখ টাকা ব্যয় করেন, কিন্তু দানের বেলায় তাঁর হাত খোলে না। রাজার সভায় হোমরা-চোমরা পাত্র-মিত্র সবাই আসে, কিন্তু গরিব-দুঃখী পণ্ডিত-সজ্জন এরা কেউ আসে না। কারণ সেখানে গুণীর আদর নাই, একটি পয়সা ভিক্ষা পাবার আশা নাই।

রাজার রাজ্যে দুর্ভিক্ষ লাগল, পূর্ব সীমানার লোকেরা অনাহারে মরতে বসল। রাজার কাছে খবর এল, রাজা বললেন, "এ সমস্ত দৈবে ঘটায়, এর উপর আমার কোন হাত

নেই।" লোকেরা বলল, "রাজভাণ্ডার থেকে সাহায্য করতে হুকুম হোক, আমরা দূর থেকে চাল কিনে এনে এ-যাত্রা রক্ষা পেয়ে যাই।" রাজা বললেন, "আজ তোমাদের দুর্ভিক্ষ, কাল শুনব আর এক জায়গায় ভূমিকম্প, পরশু শুনব অমুক লোকেরা ভারি গরিব, দুবেলা খেতে পায় না। সবাইকে সাহায্য করতে হলে রাজভাণ্ডার উজাড় করে রাজাকে ফতুর হতে হয়!" শুনে সবাই নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।

ওদিকে দুর্ভিক্ষ বেড়েই চলেছে। দলে দলে লোক অনাহারে মরতে লেগেছে। আবার দূত এসে রাজার কাছে হাজির। সে রাজসভায় হত্যা দিয়ে পড়ে বলল, "দোহাই মহারাজ, আর বেশি কিছু চাই না, দশটি হাজার টাকা দিলে লোকগুলো আধপেটা খেয়ে বাঁচে।" রাজা বললেন, "অত কষ্ট করে বেঁচেই বা লাভ কি? আর দশটি হাজার টাকা বুঝি বড় সহজ মনে করেছ?" দূত বলল, "দেবতার কৃপায় কত কোটি টাকা রাজভাণ্ডারে মজুত রয়েছে, যেন টাকার সমুদ্র! তার থেকে এক-আধ ঘটি তুললেই বা মহারাজের ক্ষতি কি?" রাজা বললেন, "দেদার থাকলেই কি দেদার খরচ করতে হবে?" দূত বলল, "প্রতিদিন আতরে, সুগন্ধে, পোশাকে, আমোদে, আর প্রাসাদের সাজসজ্জায় যে টাকা বেরিয়ে যায়, তারই খানিকটা পেলে লোকগুলো প্রাণে বাঁচে।" শুনে রাজা রেগে বললেন, "ভিখারি হয়ে আবার উপদেশ শোনাতে এসেছ? মানে সরে পড়।" দূত বেগতিক দেখে সরে পড়ল।

রাজা হেসে বললেন, 'যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! দুশ' পাঁচশ' হত, তবু না হয় বুঝতাম; দারোয়ানগুলোর খোরাক থেকে দু চারদিন কিছু কেটে রাখলেই টাকাটা উঠে যেত। কিন্তু তাতে ত' ওদের পেট ভরবে না, একবারে দশ হাজার টাকা হেঁকে বসল! ছোটলোকের একশেষ!" শুনে পাত্রমিত্র সবাই মুখে 'হুঁ-হুঁ' করল, কিন্তু মনে মনে সবাই বলল—"ছি, ছি কাজটা অতি খারাপ হল!"

দিন দুই বাদে কোথা থেকে বুড়ো সন্ন্যাসী এসে রাজসভায় হাজির। সন্ন্যাসী এসেই রাজাকে আশীর্বাদ করে বললেন, "দাতাকর্ণ মহারাজ! ফকিরের ভিক্ষা পূর্ণ করতে হবে!" রাজা বললেন, "ভিক্ষার বহরটা আগে শুনি। কিছু কমসম করে বললে হয়ত বা পেতেও পারেন।" সন্ন্যাসী বললেন, "আমি ফকির মানুষ, আমার বেশি দিয়ে দরকার কি? আমি অতি যৎকিঞ্চিৎ সামান্য ভিক্ষা একটি মাস ধরে প্রতিদিন রাজভাণ্ডারে পেতে চাই। আমার ভিক্ষা নেবার নিয়ম এই—প্রথম দিন যা নিই, দ্বিতীয় দিন নিই তার দ্বিগুণ, তৃতীয় দিনে তারও দ্বিগুণ আবার চতুর্থ দিনে তৃতীয় দিনের দ্বিগুণ। এমনি করে প্রতিদিন দ্বিগুন করে নিই, এই আমার ভিক্ষার রীতি।" রাজা বললেন, "তা ত বেশ বুঝলাম। কিন্তু প্রথম দিন কত চান সেটাই হল আসল কথা। দু'চার টাকায় পেট ভরে ত' ভাল কথা, নইলে একেবারে বিশ পঞ্চাশ হেঁকে বসলে সে যে অনেক টাকার মামলায় গিয়ে পড়তে হয়!"

সন্ন্যাসী একগাল হেসে বললেন, "মহারাজ, ফকিরের কি লোভ থাকে? আমি বিশ পঞ্চাশও চাইনে, দু' চার টাকাও চাইনে। আজ আমায় একটি পয়সা দিন, তারপর উনত্রিশ দিন দ্বিগুণ করে দেবার হুকুম দিন।" শুনে রাজা মন্ত্রী পাত্রমিত্র সবাই প্রকাণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তখন চটপট হুকুম হয়ে গেল, সন্ন্যাসী ঠাকুরের হিসাব মত রাজভাণ্ডার থেকে এক মাস তাঁকে ভিক্ষা দেওয়া হোক। সন্ন্যাসী ঠাকুর মহারাজের জয়-জয়কার করে বাড়ি ফিরলেন।

রাজার হুকুমমত রাজ-ভাণ্ডারী প্রতিদিন হিসাব করে সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দেয়। এমনি

করে দুদিন যায়, দশদিন যায়। দু' সপ্তাহ ভিক্ষা দেবার পর ভাণ্ডারী হিসাব করে দেখল ভিক্ষাতে অনেক টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। দেখে তার মন খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল। রাজামশাই ত' কখনো এত টাকা দান করেন না! সে গিয়ে মন্ত্রীকে খবর দিল।

মন্ত্রী বললেন, "তাইতো হে, এটা তো আগে খেয়াল হয় নি। তা এখন তো আর উপায় নাই, মহারাজের হুকুম নড়চড় হতে পারে না!"

তারপর আবার কয়েকদিন গেল। ভাণ্ডারী আবার মহাব্যস্ত হয়ে মন্ত্রীর কাছে হিসাব শোনাতে চলল। হিসাব শুনে মন্ত্রীমশায়ের মুখের তালু শুকিয়ে গেল। তিনি ঘাম মুছে, মাথা চুলকিয়ে, দাড়ি হাতড়িয়ে বললেন, "বল কি হে! এখন এত? তাহলে মাসের শেষে কত দাঁড়াবে?" ভাণ্ডারী বলল, "আজ্ঞে তা তো হিসাব করা হয় নি!" মন্ত্রী বললেন, "দৌড়ে যাও, এখনি খাজাঞ্চিকে দিয়ে একটা পুরো হিসাব করিয়ে আন।" ভাণ্ডারী হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে চলল; মন্ত্রীমশাই মাথায় বরফ জলের পট্টি দিয়ে ঘন ঘন হাওয়া খেতে লাগলেন।

আধঘণ্টা যেতে না যেতেই ভাণ্ডারী কাঁপতে কাঁপতে হিসাব নিয়ে এসে হাজির। মন্ত্রী বললেন, "সবশুদ্ধ কত হয়?" ভাণ্ডারী হাত জোড় করে বলল, "আজ্ঞে, এক কোটি সাতষট্টি লক্ষ সাতাত্তর হাজার দুশো পনের টাকা পনের আনা তিনি পয়সা...।" মন্ত্রী চটে গিয়ে বললেন, "তামাসা করছ নাকি?" ভাণ্ডারী বলল, "আজ্ঞে তামাসা করব কেন? আপনিই হিসাবটা দেখে নিন!"—এই বলে সে হিসাবের কাগজখানা মন্ত্রীর হাতে দিল। মন্ত্রীমশাই হিসাব পড়ে, চোখ উলটিয়ে মূর্ছা যান আর কি! সবাই ধরাধরি করে অনেক কষ্টে তাঁকে রাজার কাছে নিয়ে হাজির করল।

রাজা বললেন, "ব্যাপার কি?" মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, রাজকোষের প্রায় দু' কোটি টাকা লোকসান হতে যাচ্ছে!" রাজা বললেন, "সে কি রকম?" মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, সন্ন্যাসী ঠাকুরকে যে ভিক্ষা দেবার হুকুম দিয়েছেন, এখন দেখছি তাতে ঠাকুর রাজভাণ্ডারের প্রায় দু কোটি টাকা বের করে নেবার ফিকির করেছে!" রাজা বললেন, "এত টাকা দেবার তো হুকুম হয় নি! তবে এ রকম বে-হুকুম কাজ করছে কেন? বোলাও ভাণ্ডারীকে—!" মন্ত্রী বললেন, "আজ্ঞে, সমস্তই হুকুমমত হয়েছে! এই দেখুন না দানের হিসাব।"

রাজামশাই একবার দেখলেন, দুবার দেখলেন, তারপর ধড়ফড় করে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন! তারপর অনেক কষ্টে তাঁর জ্ঞান হলে পর লোকজন ছুটে গিয়ে সন্ন্যাসী ঠাকুরকে ডেকে আনল। ঠাকুর আসতেই রাজামশাই কেঁদে তাঁর পায়ে পড়লেন। বললেন, "দোহাই ঠাকুর, আমায় ধনে-প্রাণে মারবেন না। যা হয় একটা রফা করে আমার কথা আমায় ফিরিয়ে নিতে দিন।" সন্ন্যাসী ঠাকুর গম্ভীর হয়ে বললেন, "রাজ্যের লোক

১ম দিন	—	৫ এক পয়সা
২য় দিন	—	১০
৩য় দিন	—	৴০
৪র্থ দিন	—	৵০
৫ম দিন	—	।০
৬ষ্ঠ দিন	—	।।০
৭ম দিন	—	১৲
৮ম দিন	—	২৲
৯ম দিন	—	৪৲
১০ম দিন	—	৮৲
১১শ দিন	—	১৬৲
১২শ দিন	—	৩২৲

১৩শ দিন	—	৬৪
১৪শ দিন	—	১২৮
১৫শ দিন	—	২৫৬
১৬শ দিন	—	৫১২
১৭শ দিন	—	১০২৪
১৮শ দিন	—	২০৪৮
১৯শ দিন	—	৪০৯৬
২০শ দিন	—	৮১৯২
২১শ দিন	—	১৬,৩৮৪
২২শ দিন	—	৩২,৭৬৮
২৩শ দিন	—	৬৫,৫৩৬
২৪শ দিন	—	১৩১০৭২
২৫শ দিন	—	২৬২১৪৪
২৬শ দিন	—	৫২৪২৮৮
২৭শ দিন	—	১০৪৮৫৭৬
২৮শ দিন	—	২০৯৭১৫২
২৯শ দিন	—	৪১৯৪৩০৪
৩০শ দিন	—	৮৩৮৮৬০৮
	মোট	১,৬৭,৭৭,২১৫৫ ৶১৫

দুর্ভিক্ষে মরে, তাদের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা চাই। সেই টাকা নগদ হাতে হাতে পেলে আমার ভিক্ষা পূর্ণ হয়েছে মনে করব।" রাজা বললেন, "সেদিন একজন এসেছিল, সে বলেছিল দশ হাজার টাকা হলেই চলবে!" সন্ন্যাসী বললেন, "আজ আমি বলছি পঞ্চাশ হাজারের এক পয়সা কম হলেও চলবে না!" রাজা কাঁদলেন, মন্ত্রী কাঁদলেন, উজির-নাজির সবাই কাঁদল। চোখের জলে ঘর ভেসে গেল, কিন্তু ঠাকুরের কথা যেমন ছিল তেমনি রইল। শেষে অগত্যা রাজভাণ্ডার থেকে পঞ্চাশটি হাজার টাকা গুণে ঠাকুরের সঙ্গে দিয়ে রাজামশায় নিষ্কৃতি পেলেন।

দেশময় রটে গেল, দুর্ভিক্ষে রাজকোষ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করা হয়েছে। সবাই বললে, "দাতাকর্ণ মহারাজ!"

হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরী

(প্রফেসর হুঁশিয়ার আমাদের উপর ভারি রাগ করেছেন। আমরা সন্দেশে সেকালের জীবজন্তু সম্বন্ধে নানা কথা ছাপিয়েছি; কিন্তু কোথাও তাঁর অদ্ভুত শিকার কাহিনীর কোনও উল্লেখ করিনি। সত্যি, এ আমাদের ভারি অন্যায়। আমরা সে সব কাহিনী কিছুই জানতাম না, কিন্তু প্রফেসর হুঁশিয়ার তাঁর শিকারের ডায়েরী থেকে কিছু কিছু উদ্ধার করে আমাদের পাঠিয়েছেন। আমরা তারই কিছু কিছু ছাপিয়ে দিলাম। এসব সত্যি কী মিথ্যা তা তোমরা বিচার করে নিও।)

২৬শে জুন ১৯২২—কারাকোরম্, বন্দাকুশ পাহাড়ের দশ মাইল উত্তর। আমরা এখন সবসুদ্ধ দশজন—আমি, আমার ভাগ্নে চন্দ্রখাই, দুজন শিকারী (ছক্কড় সিং আর লক্কড় সিং) আর ছয়জন কুলি। আমার কুকুরটাও সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে।

নদীর ধারে তাঁবু খাটিয়ে জিনিসপত্র সব কুলিদের জিম্মায় দিয়ে, আমি চন্দ্রখাই আর শিকারী দুজন সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে বন্দুক, ম্যাপ, আর একটা মস্ত বাক্স, তাতে আমাদের যন্ত্রপাতি আর খাবার জিনিস। দু ঘণ্টা পথ চলে আমরা এক জায়গায়

হেশোরাম হুঁশিয়ার ও দলবল

এলাম; সেখানকার সবই কেমন অদ্ভুত রকম। বড় বড় গাছ, তার একটারও নাম আমরা জানি না। একটা গাছে প্রকাণ্ড বেলের মতো মস্ত মস্ত লাল রঙের ফল ঝুলছে; একটা ফুলের গাছ দেখলাম—তাতে হলদে সাদা ফুল হয়েছে—এক-একটা দেড় হাত লম্বা। আর-একটা গাছে ঝিঙের মতো কী-সব ঝুলছে, পঁচিশ হাত দূর থেকে তার ঝাঁঝালো গন্ধ পাওয়া যায়। আমরা অবাক হয়ে এইসব দেখছি, এমন সময় হঠাৎ হুপ্‌হাপ্ গুব্‌গাপ্ শব্দে পাহাড়ের উপর থেকে ভয়ানক একটা কোলাহল শোনা গেল।

আমি আর শিকারী দুজন তৎক্ষণাৎ বন্দুক নিয়ে খাড়া; কিন্তু চন্দ্রখাই বাক্স থেকে দুই টিন জ্যাম বের করে নিশ্চিন্তে বসে খেতে লাগল। ওইটে তার একটা মস্ত দোষ খাওয়া পেলে তার আর বিপদ-আপদ কিছুই জ্ঞান থাকে না। এইভাবে প্রায় মিনিট দুই দাঁড়িয়ে থাকবার পর লক্কড় সিং হঠাৎ দেখতে পেল হাতির চাইতেও বড় কী একটা জন্তু গাছের উপর থেকে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে। প্রথমে দেখে মনে হল একটা প্রকাণ্ড মানুষ, তারপর মনে হল মানুষ নয় বাঁদর, তারপর দেখি, মানুষও নয়, বাঁদরও নয়—একেবারে নতুন রকমের জন্তু। সে লাল লাল ফলগুলোর খোসা ছাড়িয়ে খাচ্ছে আর আমাদের দিকে ফিরে ফিরে ঠিক মানুষের মতো করে হাসছে। দেখতে দেখতে পঁচিশ-ত্রিশটা ফল সে টপাটপ্ খেয়ে শেষ করল। আমরা এই সুযোগে তার কয়েকখানা ছবি তুলে ফেললাম। তারপর চন্দ্রখাই ভরসা করে এগিয়ে তাকে কিছু খাবার দিয়ে আসল। জন্তুটা মহা খুশী হয়ে এক গ্রাসে আস্ত একখানা পাঁউরুটি আর প্রায় আধসের গুড় শেষ করে, তারপর পাঁচ-সাতটা সিদ্ধ ডিম খোলাসুদ্ধ কড়্‌মড়িয়ে খেয়ে ফেলল। একটা টিনে করে গুড় দেওয়া হয়েছিল, সেই টিনটাও সে খাবার মতলব করেছিল, কিন্তু খানিকক্ষণ চিবিয়ে হঠাৎ বিশ্রী মুখ করে সে কান্নার সুরে গাঁও গাঁও শব্দে বিকট চিৎকার করে জঙ্গলের মধ্যে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। আমি জন্তুটার নাম দিয়েছি হ্যাংলাথেরিয়াম।

২৪শে জুলাই, ১৯২২—বন্দাকুশ পাহাড়ের একুশ মাইল উত্তর। এখানে এত দেখবার

জিনিস আছে, নতুন নতুন এত সব গাছপালা জীবজন্তু যে তারই সন্ধান করতে আর নমুনা সংগ্রহ করতে আমাদের সময় কেটে যাচ্ছে। দুশো রকম পোকা আর প্রজাপতি, আর পাঁচশো রকম গাছপালা ফুলফল সংগ্রহ করেছি; আর ছবি যে কত তুলেছি তার সংখ্যাই হয় না। একটা কোন জ্যান্ত জানোয়ার ধরে সঙ্গে নেবার ইচ্ছা আছে, দেখা যাক কতদূর কী হয়। সেবার যখন কটক্ টোডন্ আমায় তাড়া করেছিল, তখন সে কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। এবার তাই জলজ্যান্ত প্রমাণ সংগ্রহ করে নিচ্ছি।

আমরা যখন বন্দাকুশ পাহাড়ে উঠেছিলাম, তখন পাহাড়টা কত উঁচু তা মাপা হয়নি। সেদিন জরিপের যন্ত্র দিয়ে আমি আর চন্দ্রখাই পাহাড়টাকে মেপে দেখলাম। আমার হিসাবে হল ষোল হাজার ফুট কিন্তু চন্দ্রখাই হিসাব করল বেয়াল্লিশ হাজার। তাই আজ আবার সাবধানে দুজনে মিলে মেপে দেখলাম, এবার হল মোটে দু' হাজার সাতশো ফুট। বোধহয় আমাদের যন্ত্রে কোনও দোষ হয়ে থাকবে। যা হোক, এটা নিশ্চয়ই যে এ পর্যন্ত ঐ পাহাড়ের চুড়োয় আর কেউ ওঠেনি। এ এক সম্পূর্ণ অজানা দেশ, কোথাও জনমানুষের চিহ্নমাত্র নাই, নিজেদের ম্যাপ নিজেরা তৈরি করে পথ চলতে হয়।

হ্যাংলাথেরিয়াম

আজ সকালে এক কাণ্ড হয়ে গেছে। লক্কড় সিং একটা গাছে হলদে রঙের ফল ফলেছে দেখে তারই একটুখানি খেতে গিয়েছিল। এক কামড় খেতেই হঠাৎ হাত-পা খিঁচিয়ে সে আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে ছট্‌ফট্ করতে লাগল। তাই দেখে ছক্কড় সিং 'ভাইয়া রে, ভাইয়া' বলে কেঁদে অস্থির। যা হোক, মিনিট দশেক ঐ রকম হাত-পা ছুঁড়ে লক্কড় সিং একটু ঠাণ্ডা হয়ে উঠে বসল। তখন আমাদের চোখে পড়ল যে একটা জন্তু কাছেই ঝোপের আড়াল থেকে অত্যন্ত বিরক্ত মতন মুখ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চেহারা দেখলে মনে হয় যে, সংসারে তার কোনও সুখ নেই, এসব গোলমাল কান্নাকাটি কিছুই তার পছন্দ হচ্ছে না। আমি তার নাম দিয়েছি গোম্‌রাথেরিয়াম। এমন খিট্‌খিটে খুঁতখুঁতে গোমরা মেজাজের জন্তু আমরা আর দ্বিতীয় দেখিনি। আমরা তাকে তোয়াজ-টোয়াজ করে খাবার দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করেছিলাম। সে অত্যন্ত বিশ্রীমতো মুখ করে, ফোঁস্ ফোঁস্ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে অনেক আপত্তি জানিয়ে, আধখানা পাঁউরুটি আর দুটো কলা খেয়ে তারপর একটুখানি পেয়ারার জেলি মুখে দিতেই এমন চটে গেল যে রেগে সারা গায়ে জেলি আর মাখন মাখিয়ে আমাদের দিকে পিছন ফিরে মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগল।

১৪ই আগস্ট বন্দাকুশ পাহাড়ের পঁচিশ মাইল উত্তর।—ট্যাপ্ ট্যাপ্ থ্যাপ্ থ্যাপ্ ঝুপ্‌ঝাপ্।—সকালবেলায় খেতে বসেছি, এমন সময় এইরকম একটা শব্দ শোনা গেল। একটুখানি উঁকি মেরে দেখি আমাদের তাঁবুর কাছে প্রায় উটপাখির মতন বড় একটা অদ্ভুত

রকম পাখি অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে কোন্ দিকে চলবে তার কিছুই যেন ঠিক-ঠিকানা নাই। ডান পা এদিকে যায় তো, বাঁ পা ওদিকে; সামনে চলবে তো পিছনবাগে চায়, দশ পা না যেতেই পায়ে পায়ে জড়িয়ে হোঁচট্ খেয়ে পড়ে। তার বোধহয় ইচ্ছা ছিল তাঁবুটা ভালো করে দেখে, কিন্তু হঠাৎ আমায় দেখতে পেয়ে সে এমন ভড়্‌কে গেল যে তক্ষুনি হুমড়ি খেয়ে হুড়্মুড়্ করে পড়ে গেল। তারপর এক ঠ্যাঙে লাফাতে লাফাতে প্রায় হাত দশেক গিয়ে আবার হেলেদুলে ঘাড় বাঁকিয়ে দেখতে লাগল। চন্দ্রখাই বলল, "ঠিক হয়েছে, এইটাকে ধরে, আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাক।" তখন সকলের উৎসাহ দেখে কে। আমি ছক্কড় সিংকে বললাম, "তুমি বন্দুকের আওয়াজ কর, তাহলে পাখিটা নিশ্চয়ই চমকে পড়ে যাবে আর সেই সুযোগে আমরা চার পাঁচজন তাকে চেপে ধরব।" ছক্কড় সিং বন্দুক নিয়ে আওয়াজ করতেই পাখিটা ঠ্যাং মুড়ে মাটির উপর বসে পড়ল, আর আমাদের দিকে তাকিয়ে ক্যাট্ ক্যাট্ শব্দ করে ভয়ানক জোরে ডানা ঝাপ্‌টাতে লাগল। তাই দেখে আমাদের আর এগুতে সাহস হল না। কিন্তু লক্কড় সিং হাজার হোক তেজী লোক, সে দৌড়ে গিয়ে পাখিটার বুকে ধাঁই করে এক ছাতার বাড়ি বসিয়ে দিল। ছাতার বাড়ি খেয়ে পাখিটা তৎক্ষণাৎ দুই পা ফাঁক করে উঠে দাঁড়াল। তারপর লক্কড় সিংয়ের দাড়িতে কামড়ে ধরে তার ঘাড়ের উপর দুই পা দিয়ে ঝুলে পড়ল। ভাইয়ের বিপদ দেখে ছক্কড় সিং বন্দুকের বাঁট দিয়ে পাখিটার মাথাটা থেঁৎলে দেবার আয়োজন করেছিল। কিন্তু সে আঘাতটা পাখিটার মাথায় লাগল না, লাগল গিয়ে লক্কড় সিঙের বুকে। তাতে পাখিটা ভয় পেয়ে লক্কড় সিংকে ছেড়ে দিল বটে, কিন্তু দুই ভাইয়ে এমন মারামারি বেধে উঠল যে আমরা ভাবলাম দুটোই এবার মরে বুঝি। দুজনের তেজ কী তখন! আমি আর দুজন কুলি লক্কড় সিঙের জামা ধরে টেনে রাখছি; সে আমাদের সুদ্ধ হিঁচড়ে নিয়ে ভাইয়ের নাকে ঘুঁষি চালাচ্ছে। চন্দ্রখাই রীতিমত ভারিক্কে মানুষ; সে ছক্কড় সিঙের কোমর ধরে লট্‌কে আছে, ছক্কড় সিং তাই সুদ্ধ মাটি থেকে তিন হাত লাফিয়ে উঠে বন্‌বন্ করে বন্দুক ঘোরাচ্ছে। হাজার হোক পাঞ্জাবের লোক কিনা। মারামারি থামাতে গিয়ে সেই ফাঁকে পাখিটা যে কখন পালাল তা আমরা টেরই পেলাম না। যা হোক, এই ল্যাগ্‌ব্যাগ্ পাখি বা ল্যাগ্‌ব্যাগর্নিসের কতগুলো পালক আর কয়েকটা ফটোগ্রাফ সংগ্রহ হয়েছিল। তাতেই যথেষ্ট প্রমাণ হবে।

ল্যাগব্যাগর্নিস্

১লা সেপ্টেম্বর, কাঁকড়ামতী নদীর ধারে—আমাদের খাবার ইত্যাদি ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে। তরিতরকারি যা ছিল, তা তো আগেই ফুরিয়েছে। টাটকা জিনিসের মধ্যে সঙ্গে কতগুলো হাঁস আর মুরগী আছে, তারা রোজ কয়েকটা করে ডিম দেয়, তাছাড়া খালি বিস্কুট, জ্যাম, টিনের দুধ আর ফল, টিনের মাছ আর মাংস, এই সব কয়েক সপ্তাহের মতো আছে, সুতরাং এই কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের ফিরতে হবে। আমরা এইসব

জিনিস গুনছি আর সাজিয়ে গুছিয়ে রাখছি, এমন সময় ছক্কড় সিং বলল যে লক্কড় সিং ভোরবেলা কোথায় বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি। আমরা বললাম, "ব্যস্ত কেন, সে আসবে এখন। যাবে আবার কোথায়?" কিন্তু তার পরেও দুই-তিন ঘণ্টা গেল অথচ লক্কড় সিঙের দেখা পাওয়া গেল না। আমরা তাকে খুঁজতে বেরোবার পরামর্শ করছি এমন সময় হঠাৎ একটা ঝোপের উপর দিয়ে একটা প্রকাণ্ড জানোয়ারের মাথা দেখা গেল। মাথাটা উঠছে নামছে আর মাতালের মতো টলছে। দেখেই আমরা সুড়্‌সুড়্ করে তাঁবুর আড়ালে পালাতে যাচ্ছি, এমন সময় শুনলাম লক্কড় সিং চেঁচিয়ে বলছে, "পালিও না, পালিও না, ও কিছু বলবে না।" তার পরের মুহূর্তেই দেখি লক্কড় সিং বুক ফুলিয়ে সেই ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। তার পাগড়ির কাপড় দিয়ে সে ঐ অতবড় জানোয়ারটাকে বেঁধে নিয়ে এসেছে। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে লক্কড় সিং বলল যে, সে সকালবেলা কুঁজো নিয়ে নদী থেকে জল আনতে গিয়েছিল। ফেরবার সময় এই জন্তুটার সঙ্গে তার দেখা। তাকে দেখেই জন্তুটা মাটিতে শুয়ে 'কোঁ কোঁ' শব্দ করতে লাগল। সে দেখল জন্তুটার পায়ে কাঁটা ফুটেছে আর তাই দিয়ে দর্‌দর্ করে রক্ত পড়ছে। লক্কড় সিং খুব সাহস করে তার পায়ের কাঁটাটি তুলে বেশ করে ধুয়ে নিজের রুমাল দিয়ে বেঁধে দিল। তারপর জানোয়ারটা তার সঙ্গে সঙ্গে আসছে দেখে তাকে পাগড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে এসেছে। আমরা সবাই বললাম, "তাহলে ওটা ওই রকম বাঁধাই থাক, দেখি ওটাকে সঙ্গে করে দেশে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা।" জন্তুটার নাম রাখা গেল ল্যাংড়াথেরিয়াম।

গোম্‌রাথেরিয়াম

সকালে তো এই কাণ্ড হল; বিকেলবেলা আর-এক ফ্যাসাদ উপস্থিত। তখন আমরা সবেমাত্র তাঁবুতে ফিরেছি। হঠাৎ আমাদের তাঁবুর বেশ কাছেই একটা বিকট চিৎকারের শব্দ শোনা গেল। অনেকগুলো চিল আর প্যাঁচা একসঙ্গে চেঁচালে যে রকম আওয়াজ হয় কতকটা সেইরকম। ল্যাংড়াথেরিয়ামটা ঘাসের উপর শুয়ে শুয়ে একটা গাছের লম্বা লম্বা পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছিল; চিৎকার শুনবামাত্র সে, ঠিক শেয়াল যেমন করে ফেউ ডাকে সেই রকম ধরনের একটা বিকট শব্দ করে, বাঁধন-টাধন ছিঁড়ে, কতক লাফিয়ে, কতক
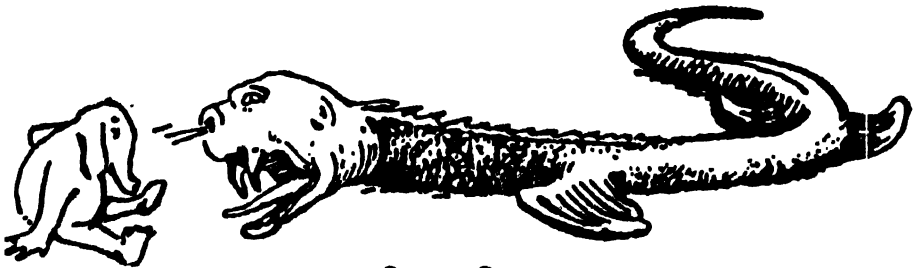
বেচারাথেরিয়াম ও চিল্লানোসোরাস

দৌড়িয়ে, এক মুহূর্তের মধ্যে গভীর জঙ্গলের ভিতর মিলিয়ে গেল। আমরা ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে না পেরে ভয়ে ভয়ে খুব সাবধানে এগিয়ে গিয়ে দেখি, একটা প্রকাণ্ড জন্তু— সেটা কুমিরও নয়, সাপও নয়, মাছও নয়, অথচ তিনটেরই কিছু কিছু আদল আছে। সে এক হাত মস্ত হাঁ করে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে; আর একটা ছোট নিরীহ-গোছের কী যেন জানোয়ার হাত-পা এলিয়ে ঠিক তার মুখের সামনে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। আমরা মনে করলাম যে এইবার বেচারাকে খাবে বুঝি, কিন্তু পাঁচ মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল, কেবল চিৎকারই চলতে লাগল; খাবার কোন চেষ্টাই দেখা গেল না। লক্কড় সিং বলল, "আমি ওটাকে গুলি করি।" আমি বললাম, "কাজ নেই, গুলি যদি ঠিকমতো না লাগে, তাহলে জন্তুটা খেপে গিয়ে কী জানি করে বসবে, তা কে জানে?" এই বলতে বলতেই ধেড়ে জন্তুটা চিৎকার থামিয়ে সাপের মতো এঁকে বেঁকে নদীর দিকে চলে গেল। চন্দ্রখাই বলল, "জন্তুটার নাম দেওয়া যাক চিল্লানোসোরাস।" ছক্কড় সিং বলল, "উ বাচ্চাকো নাম দেও বেচারাথেরিয়াম।"
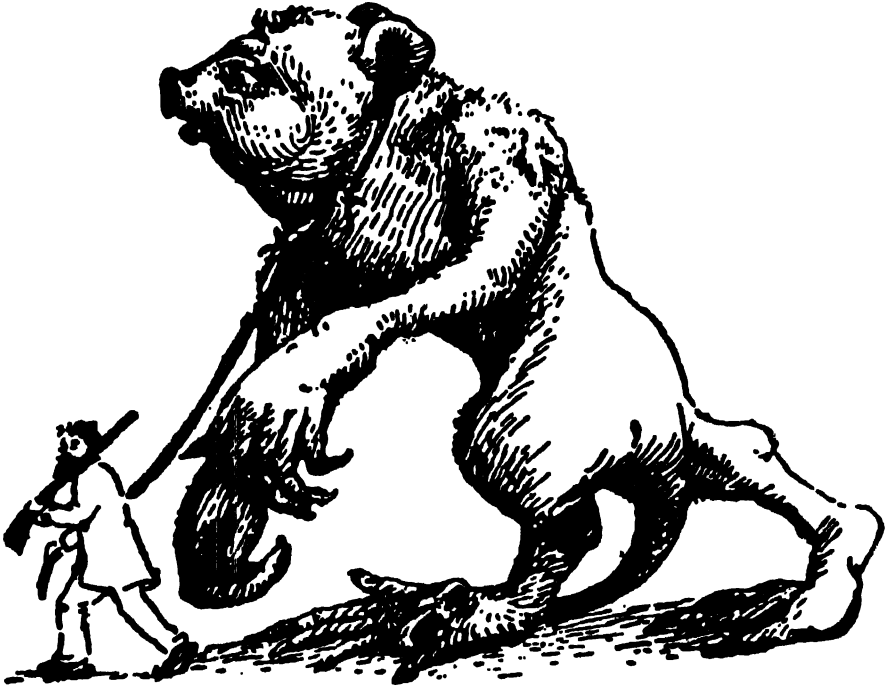
ল্যাংড়াথেরিয়াম

৭ই সেপ্টেম্বর, কাঁকড়ামতী নদীর ধারে।—নদীর বাঁক ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা পাহাড়ের একেবারে শেষ কিনারায় এসে পড়েছি। আর কোনদিকে এগোবার জো নেই। দেওয়ালের মতো খাড়া পাহাড়; সোজা দুশো-তিনশো হাত নীচে সমতল জমি পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। যেদিকে তাকাই, সেইদিকেই এরকম। নীচের যে সমতল জমি সে একেবারে
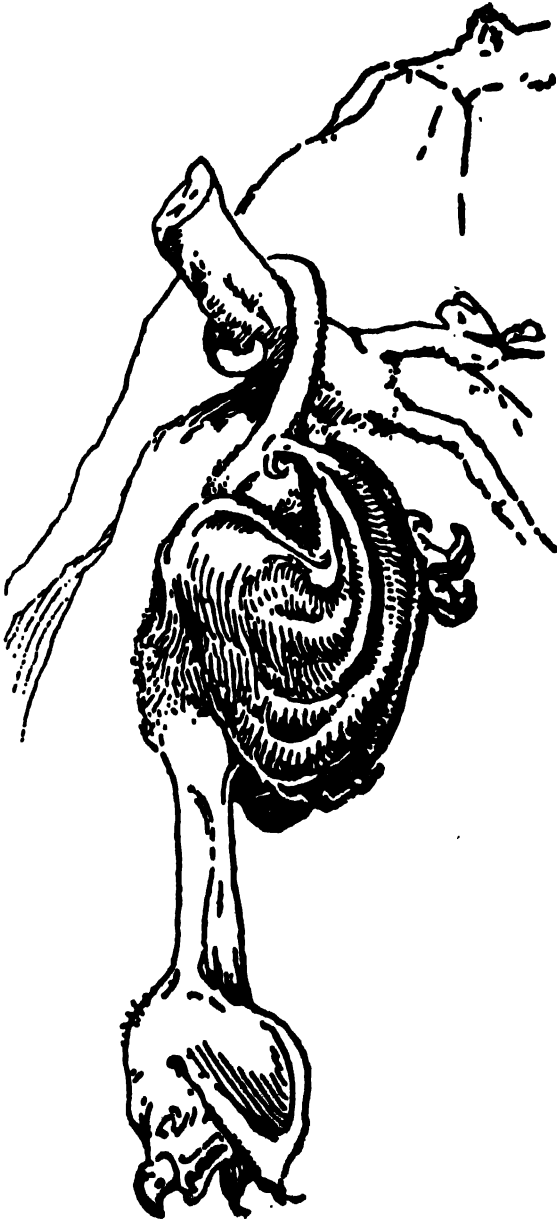
তিমি মাছের মত মস্ত কী জন্তু

মরুভূমির মতো; কোথাও গাছপালা, জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নাই। আমরা একেবারে পাহাড়ের কিনারায় ঝুঁকে এইসব দেখছি, এমন সময় আমাদের ঠিক হাত পঞ্চাশেক নীচেই কী যেন একটা ধড়্ফড়্ করে উঠল। দেখলাম, বেশ একটা মাঝারি গোছের তিমি মাছের মতো মস্ত কী একটা জন্তু পাহাড়ের গায়ে আঁকড়ে ধরে বাদুড়ের মতো মাথা নীচু করে ঘুমোচ্ছে। তখন এদিক-ওদিক তাকিয়ে এইরকম আরো পাঁচ সাতটা জন্তু দেখতে পেলাম। কোনটা ঘাড় গুঁজে ঘুমোচ্ছে, কোনটা লম্বা গলা ঝুলিয়ে দোল খাচ্ছে, আর অনেক দূরে একটা পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে ঠোঁট ঢুকিয়ে কী যেন খুঁটে খুঁটে বের করে খাচ্ছে। এইরকম দেখছি, এমন সময় হঠাৎ কটকটাং-কট শব্দ করে প্রথম জন্তুটা হুড়ুৎ করে ডানা মেলে একেবারে সোজা আমাদের দিকে উড়ে আসতে লাগল। ভয়ে আমাদের হাত-পাগুলো গুটিয়ে আসতে লাগল। এমন বিপদের সময় যে পালানো দরকার, তা পর্যন্ত আমরা ভুলে গেলাম। জন্তুটা মুহূর্তের মধ্যে একেবারে আমাদের মাথার উপরে এসে পড়ল। তারপর যে কী হল আমার ভালো করে মনে নাই—খালি একটু একটু মনে পড়ে, একটা অসম্ভব বিট্‌কেল গন্ধের সঙ্গে ঝড়ের মতো ডানা ঝাপটান আর জন্তুটার ভয়ানক কটকটাং আওয়াজ। একটুখানি ডানার ঝাপটা আমার গায়ে লেগেছিল, তাতেই আমার দম বেরিয়ে প্রাণ বের হবার যোগাড় করেছিল। অন্য সকলের অবস্থাও সেইরকম অথবা তার চাইতেও খারাপ। যখন আমার হুঁশ হল তখন দেখি সকলেরই গা বেয়ে রক্ত পড়ছে। ছক্কড় সিঙের একটা চোখ ফুলে

প্রায় বন্ধ হবার যোগাড় হয়েছে; লক্কড় সিঙের বাঁ হাতটা এমন মচ্‌কে গিয়েছে যে সে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে; আমারও সমস্ত বুকে পিঠে বেদনা ধরে গিয়েছে; কেবল চন্দ্রখাই এক হাতে রুমাল দিয়ে কপালের আর ঘাড়ের রক্ত মুছছে, আর—এক হাতে এক মুঠো বিস্কুট নিয়ে খুব মন দিয়ে খাচ্ছে। আমরা তখনই আর বেশি আলোচনা না করে জিনিসপত্র গুটিয়ে বন্দাকুশ পাহাড়ের দিকে ফিরে চললাম।

(প্রফেসর হুঁশিয়ারের ডায়েরী এইখানেই শেষ। কিন্তু আমরা আরও খবর জানবার জন্য তাঁকে চিঠি লিখেছিলাম। তার উত্তরে তিনি তাঁর ভাগ্নেকে পাঠিয়ে দিয়ে লিখলেন, 'এর কাছেই সব খবর পাবে।' চন্দ্রখাইয়ের সঙ্গে আমাদের যে কথাবার্তা হয় খুব সংক্ষেপে তা হচ্ছে এই ঃ

আমরা। আপনারা যে-সমস্ত নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন সে-সব কোথায় গেলে দেখতে পাওয়া যায়?

চন্দ্র। সে-সব হারিয়ে গেছে।

আমরা। বলেন কি! হারিয়ে গেল? এমন এমন জিনিস সব হারিয়ে ফেললেন?

চন্দ্র। হ্যাঁ, প্রাণটুকু যে হারায়নি তাই যথেষ্ট। সে দেশের ঝড় ত আপনারা দেখেননি। তার এক-এক ঝাপটায় আমাদের যন্ত্রপাতি, বড় বড় তাঁবু আর নমুনার বাক্স, সব কাগজের মতো হুশ্‌ করে উড়িয়ে নেয়। আমাকেই ত পাঁচ-সাতবার উড়িয়ে নিয়েছিল। একবার ত ভাবলাম মরেই গেছি। কুকুরটাকে যে কোথায় উড়িয়ে নিল সে ত আর খুঁজেই পেলাম না। সে যা বিপদ! কাঁটা-কম্পাস, প্ল্যান ম্যাপ, খাতাপত্র—কিছুই আর বাকী রাখেনি। কী করে যে ফিরলাম তা শুনলে আপনার ওই চুলদাড়ি সব সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠবে। আধপেটা খেয়ে, কোনদিন না খেয়ে, আন্দাজে পথ চলে, দুই সপ্তাহের রাস্তা পার হতে আমাদের পুরো তিনমাস লেগেছিল।

আমরা। তাহলে আপনার প্রমাণ-টমাণ যা-কিছু ছিল সব নষ্ট হয়েছে?

চন্দ্র। এই তো আমি রয়েছি, মামা রয়েছেন, আবার কী প্রমাণ চাই? আর এই আপনাদের 'সন্দেশে'র জন্য কতকগুলো ছবি এঁকে এনেছি; এতেও অনেকটা প্রমাণ হবে।

আমাদের ছাপাখানার একটা ছোকরা ঠাট্টা করে বলল, "আপনি কোন্‌ থেরিয়াম?" আর-একজন বলল, 'উনি হচ্ছেন গপ্প-থেরিয়াম—বসে বসে গপ্প মারছেন।" শুনে চন্দ্রখাই ভীষণ রেগে আমাদের টেবিল থেকে একমুঠো চীনেবাদাম আর গোটা আষ্টেক পান উঠিয়ে নিয়ে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে বেরিয়ে গেল। ব্যাপার ত এই। এখন তোমরা কেউ যদি আরো জানতে চাও, তাহলে আমাদের ঠিকানায় প্রফেসার হুঁশিয়ারকে চিঠি লিখলে আমরা তার জবাব আনিয়ে দিতে পারি।)

ওয়াসিলিসা

ওয়াসিলিসা এক সওদাগরের মেয়ে। তার মা ছিল না, কেউ ছিল না—ছিল খালি এক দুষ্টু সৎমা আর ছিল সেই সৎমার দুটো ডাইনীর মত মেয়ে।

ওয়াসিলিসার মা যখন মারা যান, তখন তিনি তাকে একটা কাঠের পুতুল দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন, "একে কখন ছেড়ো না, সর্বদা কাছে কাছে রেখো, আর যখন তোমার বিপদ-আপদ ঘটবে, একে চারটি কিছু খেতে দিও। তবেই দেখবে, এ মানুষের মত তোমার সঙ্গে কথা বলবে; তখন এর পরামর্শমতো চ'লো।" তারপরে এতদিনে ওয়াসিলিসা বড় হয়ে উঠেছে।

সৎমা তার মেয়েদের সঙ্গে মিলে কেবল ওয়াসিলিসার অনিষ্ট চেষ্টা করত। ওয়াসিলিসা দেখতে যেমন সুন্দর, তার কথাবার্তা তেমনি মিষ্টি। গ্রামের যত লোক সবাই তাকে ভালবাসে। আর সেই সৎমার যে দুটো মেয়ে—তাদের দাঁত যেমন উঁচু, চোখ তেমনি টেরা, নাক তার চেয়েও বাঁকা,—আর তার উপরে তারা এমনি দুষ্টু আর হিংসুকে আর ঝগড়াটে, তাদের কে ভালবাসবে? তাই তারা হিংসায় ওয়াসিলিসাকে ধরে মারত। গ্রামের এক কিনারায় ওয়াসিলিসাদের বাড়ি আর বাড়ির পাশেই প্রকাণ্ড বন। সেই বনের মধ্যে সবুজ মাঠের উপরে ডাইনীবুড়ি বাবায়াগার বাড়ি। সে বুড়ি মানুষ খায়,—সুন্দর মেয়েদের ধরতে পেলে ত খুব উৎসাহ করেই খায়।

একদিন রাত্রে দুষ্টু সৎমা তার মেয়েদের বলল, "এক কাজ কর্। ঘরের আগুনটা নিবিয়ে দে ত। তা হলেই ওয়াসিলিসাকে আবার আগুন আনবার জন্য সেই সবুজ মাঠে বাবায়াগার বাড়িতে পাঠানো যাবে; আর বাবায়াগা তাকে ধরে গিলে ফেলবে। কেমন মজা!" যেই এ কথা বলা, অমনি বড় মেয়েটা উঠে ইচ্ছে করে ছাইমাটি চাপা দিয়ে আগুন নিবিয়ে দিল। আর সকলে চেঁচাতে লাগল, "ঐ যা! আগুন তো নিবে গেল! ওয়াসিলিসা, ওয়াসিলিসা, শিগ্গীর ওঠ। বনের মধ্যে সবুজ মাঠ আছে, তার মধ্যে বাবায়াগার বাড়ি, তার বাড়ির আগুন নাকি কখনও নিবে যায় না। শিগ্গীর যাও, দৌড়ে যাও, সেই আগুন খানিকটা নিয়ে এস।"

এই না ব'লে তারা ওয়াসিলিসার চুল ধরে হিড়্হিড়্ করে টেনে তাকে বাড়ির বাইরে তাড়িয়ে দিয়ে, ঘরের খিল এঁটে দিল। ওয়াসিলিসা বাইরে বসে কাঁদছে, এমন সময় তার সেই ছোট কাঠের পুতুলের কথা মনে হল। তখন সে তাড়াতাড়ি তার কাপড়ের মধ্যে থেকে পুতুলটাকে বের করে তার মুখে একটু খাবার দিয়ে বলতে লাগল; "কাঠের পুতুল, খাবার খাও, আবার তুমি জ্যান্ত হও, আমার সঙ্গে কথা কও।" অমনি কাঠের পুতুলের চোখদুটো জ্বলে উঠল, ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল—তারপর সে বলতে লাগল—

"কাঠের পুতুল সঙ্গে রয়, ওয়াসিলিসার কিসের ভয়? তুমি ভয় পেও না, বাবায়াগার বাড়ি সোজা চলে যাও।"

ওয়াসিলিসা চলতে লাগল। রাত গেল, সকাল গেল, দুপুর গেল, তখন দেখা গেল সবুজ মাঠ, তার ঠিক মধ্যখানে ভাঙাচোরা সাদা বাড়ি, তার গায়ে সারি সারি মড়ার খুলি, তার দরজা জানালা ফটক কবাট আস্ত আস্ত হাড়ের তৈরী। হুড়কো কব্জা কাঁটা পেরেক কোথাও কিছু নেই—কিছু দিয়ে বাঁধা নেই, জোড়া নেই, অথচ বাড়িখানা চারটে পাখির ঠ্যাঙের উপর ঠিক দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ওয়াসিলিসা অবাক হয়ে দেখছে, এমন সময় হঠাৎ একটা সাদা লোক ঝক্ঝকে সাদা পোশাক পরে, সাদা ঘোড়ায় চড়ে সাঁই সাঁই করে কোথা থেকে ছুটে এল। এসেই, সোজা বাড়ির ফটকের উপরে ছুটে পড়ল আর ধাঁ করে বাড়ির সঙ্গে মিশে গেল। ওয়াসিলিসা চেয়ে দেখল, তখন বিকেল হয়ে এসেছে, রোদ পড়ে আসছে।

তারপর একজন লোক এল, রাঙা সূর্যের মত লাল তার রং—তার পোশাক, তার ঘোড়া, সবই লাল। সেও তেমনি ছুটে গিয়ে বাড়ির মধ্যে মিশে গেল। ওয়াসিলিসা দেখল, সন্ধ্যে হয়েছে, চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে।

তারপর একজন এল অন্ধকারের মতো কালো—কালো পোশাক, কালো ঘোড়া। সে

যেই বাড়ির মধ্যে মিশে গেল আর চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। কেবল সেই বাড়ির গায়ে মড়ার খুলিগুলো আপনা থেকে ঝক্‌ঝক্ করে জ্বলে উঠল—আর দাঁত বের করে চারদিকে আলো ছড়াতে লাগল।

তারপরে একটা প্রকাণ্ড হামানদিস্তা হাঁকিয়ে বাবায়াগা নিজে এসে হাজির। সে এসেই ত' ওয়াসিলিসার গন্ধ পেয়ে তাকে ধরে নিয়ে গেল। ওয়াসিলিসা আগুন নিতে এসেছে শুনেই সে বলল, "বটে! আগুনের বুঝি দাম লাগে না? তিন দিন আমার বাড়িতে কাজ কর—যদি ভাল কাজ করতে পারিস আগুন পাবি; আর, তা যদি না পারিস তোকে আমি ঝোল রেঁধে খাব। আচ্ছা, এখন আমার খাবারগুলো উনুন থেকে নামিয়ে আমায় দে ত'!"

ওয়াসিলিসা খাবার এনে দিল। বুড়ি চেটেপুটে খেয়ে বলল, "কাল সকালে আমি বেরিয়ে যাব। সন্ধ্যার সময় এসে যেন দেখতে পাই—আমার ঘর ঝাঁট দেওয়া হয়েছে, আমার রান্না ঠিকমত করা হয়েছে, আর ঐ কোণে এক ঝুড়ি সোনার ধান দেখবি তার মধ্যে অনেক কাঁকর, অনেক খুদ, আর তার চাইতেও বেশি কালো ধান মেশানো আছে—সমস্ত ঝেড়ে বেছে রাখিস। খবরদার, কিছু ভুল হয় না যেন।"

ওয়াসিলিসা বসে বসে কাঁদতে লাগল। তখন তার কাঠের পুতুলের কথা মনে হ'ল। সে পুতুলের মুখে একটু খাবার দিয়ে বলতে লাগল, "কাঠের পুতুল! খাবার খাও, আবার তুমি জ্যান্ত হও, আমার সঙ্গে কথা কও।" কাঠের পুতুলের চোখ দুটো জ্বলে উঠল, ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল, সে বলতে লাগল—"কাঠের পুতুল সঙ্গে রয়, ওয়াসিলিসার কিসের ভয়! তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও গিয়ে।"

ওয়াসিলিসা ঘুমাতে গেল। সকালবেলায় বাবায়াগা তার হামানদিস্তায় চড়ে বেরিয়ে গেল। আর কি আশ্চর্য! ঘরদোর সব আপনা থেকে ঝাঁট হয়ে গেল। খাবারগুলো উনুনে চড়ে আপনা থেকে সিদ্ধ হতে লাগল। ওয়াসিলিসা অবাক হয়ে সেই ধানগুলো দেখতে গিয়ে দেখে তার কাঠের পুতুল সমস্ত ধান বেছে সোনার ধান, কালো ধান, কাঁকর আর খুদ সব আলগা করে ফেলেছে!

বিকেলবেলা সাদা লোকটা ফিরে এল, সন্ধ্যার সময় লাল লোকটা ফিরে এল আর ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার রাত্রে কালো লোকটা ফিরে এল,—তারপর ঝম্‌ঝম্ খট্‌খটাং করে হামানদিস্তা হাঁকিয়ে বাবায়াগা ঘরে এল। এসেই সে হামানদিস্তার বাঁটটা দিয়ে ঘরের সব জায়গায় ধাঁই ধাঁই ক'রে মেরে দেখতে লাগল, কোনখান থেকে ধুলো পড়ে কিনা! তারপর যখন সে দেখল ঝাঁট দেওয়াও ঠিক হয়েছে, খাবারও রান্না হয়েছে, ধানও বাছা হয়েছে, তখন সে রেগে চিৎকার করে বলতে লাগল, "হতভাগী মেয়ে, কে তোকে বাঁচিয়েছে—শিগ্গীর আমায় বল্।" ওয়াসিলিসা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "আমার মা মারা যাবার সময় আমায় যা আশীর্বাদ করেছিলেন, তাতেই আমি বেঁচেছি।" এই না শুনে ডাইনী বুড়ি ভয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, "ওরে বাবারে! কার আশীর্বাদ নিয়ে আমার বাড়ি এসেছে রে! আমার সর্বনাশ করবে রে! এই নে তোর আগুন নে-আমার বাড়ি থেকে শিগ্গীর বেরো।" এই ব'লে সে ওয়াসিলিসাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল, আর একটি মড়ার খুলি তাকে ছুঁড়ে দিল।

ওয়াসিলিসা একটা লাঠির আগায় খুলিটাকে চড়িয়ে বাড়ি নিয়ে গেল। কিন্তু বাড়িতে নিলে কি হবে? তার যে সেই সৎমা আর তার দুটো দুষ্টু মেয়ে, তাদের ত' কেউ কোনদিন

আশীর্বাদ করেনি—তারা মহা খুশী হয়ে যেই আগুনটা নিতে গিয়েছে অমনি তাদের গায়ে আগুন ধরে গিয়ে তারা ত' মরলই, বাড়িঘর সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

ওয়াসিলিসা আবার বসে কাঁদতে লাগল। তখন তার কাঠের পুতুলের কথা মনে হল। পুতুলের মুখে খাবার দিয়ে বলল, "কাঠের পুতুল, খাবার খাও, আবার তুমি জ্যান্ত হও, আমার সঙ্গে কথা কও।" কাঠের পুতুল জেগে উঠে বলল—"কাঠের পুতুল সঙ্গে রয়—ওয়াসিলিসার কিসের ভয়! তুমি রাজার কাছে যাও তিনি তোমায় সুখী করবেন।"

ওয়াসিলিসা তখন রাজার বাড়ি চলল। এমন সুন্দর মেয়ে, এমন মিষ্টি কথা বলে, কেউ তাকে বারণ করল না, কেউ তাকে বাধা দিল না। ওয়াসিলিসা একেবারে রাজসভায় রাজার সামনে গিয়ে উপস্থিত।

রাজা এমন চমৎকার মেয়ে কখনো কোথাও দেখেননি—তিনি তার কথা শুনবেন কি—তাড়াতাড়ি সিংহাসন থেকে উঠে পড়লেন, বললেন, "আহা কি সুন্দর মেয়েটি গো! তুমি কার মেয়ে? কি তোমার দুঃখ? তুমি আমায় বিয়ে কর—আমার রাজ্যের রানী হয়ে থাক—আমি তোমার সব দুঃখ দূর করব।"

এমনি করে ওয়াসিলিসা রানী হলেন—আর সেই কাঠের পুতুল সোনার খাটে, মখমলের গদিতে, রেশমের চাদরের উপর ঝক্‌ঝকে পোশাক পরে শুয়ে থাকত।

দেবতার সাজা

থর্ নরওয়ে দেশের যুদ্ধ দেবতা।

যুদ্ধের দেবতা কিনা, তাই তাঁর গায়ে অসাধারণ জোর। তাঁর অস্ত্র একটা প্রকাণ্ড হাতুড়ি। সেই সর্বনেশে হাতুড়ির এক ঘা খেলে পাহাড় পর্যন্ত গুঁড়ো হ'য়ে যায়, কাজেই সে হাতুড়ির সামনে আর কেউ এগুতে সাহস পায় না। তার উপরে থরের একটা কোমর-বন্ধ ছিল, সেটাকে কোমরে বেঁধে নিলে তাঁর গায়ের জোর দ্বিগুণ বেড়ে যেত।

থরের মনে ভারি অহঙ্কার, তাঁর সমান বীর আর তাঁর সমান পালোয়ান পৃথিবীতে বা স্বর্গে আর কেউ নেই।

একদিন থর্ দেখলেন, একটা পাহাড়ের পাশে একটা প্রকাণ্ড দৈত্য ঘুমিয়ে আছে আর সে এমন নাক ডাকাচ্ছে যে গাছপালা পর্যন্ত ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। থর্ বললেন, "এইও বেয়াদব, নাক ডাকাচ্ছিস্ যে?" বলেই হাতুড়ি দিয়ে ধাঁই ধাঁই ক'রে, তার মাথায় তিন ঘা লাগিয়ে দিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য ওই হাতুড়ির অমন ঘা খেয়েও দৈত্যের কিছুই হল না, সে খালি একটু মাথা চুলকিয়ে বলল "পাখিতে কি ফেলল?"

থর্ আশ্চর্য হ'য়ে বললেন, "তুমি ত খুব বাহাদুর হে, আমার এ হাতুড়ির ঘা সহ্য করতে পারে, এমন লোক যে কেউ আছে, তা আমি জানতাম না।"

দৈত্য বলল, "তা জান্‌বেন কোত্থেকে, আমাদের দেশে ত যান নি কখন। সেখানে আমার চেয়েও বড়, আমার চেয়েও ষণ্ডা ঢের ঢের দৈত্য আছে।" থর্ বললেন, "বটে? তবে ত আমার একবার সেখানে যেতে হচ্ছে।"

দৈত্য তাঁকে দৈত্যপুরীর পথ দেখিয়ে দিল আর বলল, "দেখবেন, সেখানে গিয়ে

বেশি বড়াই টড়াই করবেন না কারণ আপনি যত বড়ই দেবতা হন না কেন, সে দেশে বাহাদুরি করতে গেলে শেষে লজ্জা পেতে হবে।"

দৈত্যপুরীর চারদিকে প্রকাণ্ড বরফের দেয়াল—সে এত বড় যে তার নীচে দাঁড়ালে চুড়ো দেখা যায় না। সেই দেয়ালের এক জায়গায় বড় বড় গরাদ দেওয়া আকাশের মত উচুঁ ফটক।

থর্ দেখলেন সে ফটক খোলা তার সাধ্য নয়, তাই তিনি দুটো গরাদের ফাঁকের মধ্যে দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। দেওয়াল-ঘেরা দৈত্যপুরীর রাজসভায় বসে বসে পাহাড়ের মত বড় বড় দৈত্যরা সব গল্প করছে; তাদের মধ্যে সব চেয়ে বড় যে, সেই হ'চ্ছে দৈত্যের রাজা।

দৈত্যেরা থর্‌কে দেখেও যেন দেখেনি এমনিভাবে গল্প করতে লাগল। খানিক পরে দৈত্যরাজ থরের দিকে তাকিয়ে, বড় বড় চোখ ক'রে, যেন কতই আশ্চর্য হয়ে বললেন, "কেও? আরে, আরে, থর্ নাকি? আপনিই কি সেই দেবতা, যাঁর গায়ে ভয়ানক জোর। তা হবেও বা, শুধু শরীর বড় হ'লেই ত আর গায়ে জোর হয় না? আচ্ছা, আপনার সম্বন্ধে যে সকল ভয়ানক গল্প শুনি সে সব কি সত্যি?"

থর্ বললেন, "সত্যি কিনা, এখনি বুঝবে। ওরে কে আছিস, আমায় একটু জল দে ত, এক চুমুকে কতখানি খাওয়া যায় তোদের একবার দেখিয়ে দি।"

তখন রাজার হুকুমে একটা শিঙায় ক'রে ঠান্ডা জল এনে থর্‌কে দেওয়া হল। রাজা বললেন, "আমাদের মধ্যে বড় বড় পালোয়ান ছাড়া, কেউ ওটাকে এক চুমুকে খালি করতে পারে না। সাধারণ দৈত্যেরা দুই চুমুকে শেষ করে। তবে যারা নেহাৎ আনাড়ি, তাদের তিন চুমুক লাগে।"

থর্ তাড়াতাড়ি শিঙাটা নিয়ে চোঁ চোঁ চোঁ ক'রে এমন টান দিলেন যে, মনে হল শিঙা নিশ্চয়ই খালি হ'য়ে গেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! শিঙা যেমন ভর্তি প্রায় তেমনই রইল। থর্ ভারি লজ্জিত হ'য়ে আবার জল খেতে লাগলেন—ঢক্ ঢক্ ঢক্ ঢক্ ঢক্ ঢক্ ঢক্, তবু জল ফুরাল না।

রাজা হো হো ক'রে হেসে বললেন, "তাইত, অনেকটা যে বাকী রাখ্‌লেন।"

থর্ তখন রেগে খুব একটা দম নিয়ে আবার চুমুক দিলেন; খাওয়া আর থামে না— পেট ঢাক হ'য়ে নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হ'য়ে এল, কিন্তু জল তবু ফুরাতে চায় না। তখন থর্ আর কি করে?

তিনি বললেন, "না, জল খাওয়াতে আর বেশি বাহাদুরী কি? পেটুকের মত খানিকটা জল গিল্‌লেই ত আর গায়ের জোর প্রমাণ হয় না। দেখি ত আমার মত ভারী জিনিস কে তুলতে পারে।"

দৈত্যরাজ বললেন, "তা বেশ ত। একটা সহজ পরীক্ষা দিয়েই আরম্ভ করা যাক্—ওরে, আমার বেড়ালটাকে নিয়ে আয় ত।" বলতেই ছেয়ে রঙের বেড়াল ঘরের মধ্যে ঢুকল। থর্ তাড়াতাড়ি বেড়ালটাকে ঘাড়ে ধ'রে ছুঁড়ে ফেলতে গেলেন। কিন্তু বেড়ালটা এমনি শক্ত ক'রে মাটি আঁকড়ে রইল যে অনেক টানাটানির পর তার একটি পা মাটি থেকে মাত্র এক আঙুল উঠান গেল!

দৈত্যরাজ বললেন, "না, আমারই অন্যায় হয়েছে। এতটুকু লোক, সে কি ওই ধাড়ি বেড়ালটাকে তুলতে পারে?"

থর্ তখন ভয়ানক চটে গিয়ে বললেন, "বটে! এতটুকু হই আর যাই হই—দেখি ত, কে আমার সঙ্গে কুস্তিতে পারে?"

দৈত্য বলল, "তবেই ত মুস্কিলে ফেললেন! আপনার সঙ্গে লড়াই করবার লোক এখন আমি কোথায় পাই? আচ্ছা দেখি—ওরে বুড়ী ঝিটাকে ডেকে আনত।"

মান্ধাতার আমলের এক বুড়ী, তার চুল সব শাদা, তার মুখে দাঁত নেই, গাল-টাল সব তুবড়ে গিয়েছে—সে এল কুস্তি করতে! থর্ ত চটেই লাল! বললেন, "একি, তামাসা পেয়েছ?" দৈত্যেরা তাতে আরো হাসতে লাগল। বলল, "ও বুড়ি, থাক্ থাক্, ওকে মারিসনে—ও ভয় পেয়েছে।" থর্ তখন তেড়ে গিয়ে বুড়ীকে এক ধাক্কা দিলেন। তাতে বুড়ী তাঁকে ঘাড় ধ'রে মাটিতে বসিয়ে দিল!

থর্ তখন আর কি করেন? লজ্জায় তাঁর মাথা হেঁট হয়ে গেল। সারারাত্রি সে অপমানের কথা ভেবে তাঁর ঘুম হল না। পরদিন সকালবেলাই তিনি বাড়ি চললেন। দৈত্যরাজ খুব খাতির করে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পুরীর ফটক পর্যন্ত এলেন। ফটকের কাছে এসে দৈত্যরাজ হেসে বললেন, "আপনাকে একটা কথা বলছি, কারণ সেটা না বললে অন্যায় হয়। কাল কিন্তু সত্যিই আপনার হার হয় নি। আপনার অহঙ্কার ভাঙবার জন্যই আমরা আপনাকে একটু ফাঁকি দিয়েছি। ঐ যে শিঙাটা দেখলেন, ওটা সুমদ্রের শিঙা। সমস্ত সমুদ্রের জল না ফুরালে ওর জল ফুরায় না। আপনি যে তিন চুমুক দিয়েছিলেন, তাতে কতক জায়গায় সমুদ্রের ধারে চড়া পড়ে গিয়েছে।

"আর ঐ বেড়ালটা কি জানেন? ও হ'চ্ছে 'স্ক্রাইমিড্'—যে সাপের মত হয়ে সমস্ত পাহাড় নদী সমুদ্র শুদ্ধ পৃথিবীটাকে শক্ত করে বেঁধে রাখে! আপনার টানে পৃথিবীটা প্রায় দশখানা হয়ে ফাটবার জোগাড় করে ছিল।

"আর ঐ বুড়ী ঝি হ'চ্ছে জরা, অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়স। বুড়ো বয়সে কা'কে না কাবু করে? আর, কাল সকালে আপনি যে দৈত্যের মাথায় হাতুড়ি মেরেছিলেন আমিই সেই দৈত্য। সে হাতুড়ি আমার মাথায় একটুও লাগে নি। আমি আগে থেকে মাথা বাঁচাবার জন্য এক মায়া পাহাড়ের আড়াল দিয়েছিলাম—ওই দেখুন আপনার হাতুড়িতে তার কি দুর্দশা হয়েছে।"

থর্ যখন এসব ফাঁকির কথা শুনলেন—তখন তিনি রেগে কাঁপতে লাগলেন। হাতুড়িটাকে মাথার উপরে তুলে বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরিয়ে তিনি যেই সেটা ছুঁড়তে যাবেন, অমনি দেখেন—কোথায় দৈত্য, কোথায় পুরী,—চারিদিকে কোথাও কিছু নাই!

মনের রাগ মনে মনেই হজম ক'রে থর্ সেদিন বাড়ি ফিরলেন।

পাজি পিটার

শহরের কোণে মাঠের ধারে এক পুরানো বাড়িতে পিটার থাকত। তার আর কেউ ছিল না, খালি এক বোন ছিল। পিটারকে সবাই বলত 'পাজি পিটার'—কারণ পিটার কোন কাজকর্ম করে না—কেবল একে ওকে ঠকিয়ে খায়। পিটার একদিন ভাবল ঢের লোক ঠকিয়েছি—একবার রাজাকে ঠকানো যাক। এই ভেবে সে রাজবাড়িতে গেল।

রাজা বললেন, "তুমি কে হে? মতলবখানা কি?"

পিটার বলল, "আজ্ঞে, আমি পিটার—ঠকাবার জন্য লোক খুঁজছি।"

রাজা বললেন, "তাই নাকি? লোক খুঁজবার দরকার কি? আমাকেই একবার ঠকিয়ে দেখাও না।" পিটার মাথা চুল্‌কাতে লাগল—বলল, "তাই ত', আমার সরঞ্জাম সব বাড়িতে ফেলে

এসেছি।" রাজা বললেন, "বেশ ত', তোমার সরঞ্জাম সব নিয়ে এস।" পিটার তাই শুনে ভয়ানক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল, আর বলল, "দোহাই মহারাজ, অত হাঁটাহাঁটি করলে আমি মরেই যাব।" রাজা বললেন, "তবে এই ঘোড়াটায় চড়ে যা— দেরী করিস নে।" পিটার চিৎকার করতে লাগল, "ও ঘোড়ায় আমি চড়ব না—ঘোড়া আমায় ফেলে দেবে।" কিন্তু সে কথা কেউ শুনল না, তাকে জোর করে ঘোড়ায় চড়িয়ে দেওয়া হল। পিটার ঘোড়াটাকে আস্তে আস্তে মোড়ের কাছে নিয়ে গিয়ে—যেই একটু আড়াল পেয়েছে, অমনি ঘোড়া ছুটিয়ে একেবারে শহরের বাইরে উপস্থিত। সেখানে সাজ-সরঞ্জামশুদ্ধ ঘোড়াটাকে বিক্রি করে, সে পকেটভরা টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরল। এদিকে রাজা উজীর পাত্রমিত্র সভায় বসে—পিটার আসে না, আসে না—এলই না—রাজা মশাই বাইরে খুব হাসলেন—বললেন, "ছেলেটা বেজায় চালাক"—কিন্তু মনে মনে ভারি চটলেন।

একদিন পিটার দেখতে পেল মাঠের উপর দিয়ে জমকালো পোশাক পরে ঘোড়ায় চড়ে তলোয়ার হাতে কে যেন আসছে। পিটার বলল, "এই মাটি করেছে! রাজা আসছে।" পিটার দৌড়ে তার বোনকে বলল—"ভাতের হাঁড়িটা উনুনে চড়িয়ে দাও—ফুট্‌তে থাকুক।" এই বলে সে একখানা ভাঙা শিলের উপর হিজিবিজি কি সব লিখতে বসল। তারপর যেই রাজা মশাই তার বাড়ির সামনে এসেছেন, অমনি সে ফুটন্ত ভাতের হাঁড়িটাকে সেই শিলের উপর বসিয়ে বিড়্ বিড়্ করে কি সব বলতে বলতে ভাতটাকে কাঠি দিয়ে নাড়তে লাগল। রাজা মশাই বললেন—"এ আবার কি?" পিটার বলল, "আজ্ঞে, ভাত রাঁধছি।" রাজা বললেন, "সে কি রে? তোর আগুন কৈ?" পিটার জোড়হাতে বলল, "মহারাজ, আমরা গরীব মানুষ, আগুন-টাগুন কোথায় পাব? সন্ন্যাসী ঠাকুর এই পাথরখানা দিয়েছেন, আর দুটো মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছেন, তাতেই আমাদের রান্না চলে যায়।"

রাজা বললেন, "দে, ওটা আমায় দে—তোকে আমি মাপ করে দিচ্ছি।" পিটার কাঁদতে লাগল, দেখাদেখি তার দুষ্টু বোনটাও কাঁদতে লাগল। রাজা বললেন, "অত কান্নাকাটির দরকার কি? আমি ত' কেড়ে নিচ্ছি না, দাম দিয়ে নিচ্ছি। এই নে!" বলে তিনি একমুঠো মোহর ফেলে দিলেন। তখন পিটার তাঁকে একটা যা-তা মন্ত্র শিখিয়ে দিল।

রাজা মশাই সেই শিলখানা নিয়ে বাড়ি গেলেন। গিয়ে সকলকে বলে পাঠালেন, "কাল সকালে তোমাদের এক আশ্চর্য ভোজ খাওয়াব।" সকাল না হতেই মন্ত্রী উজির কোটাল সকলে আশ্চর্য ভোজ খাবার জন্য রাজবাড়িতে হাজির। রাজা মশাই সেই পাথরটিকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে তার উপর প্রকাণ্ড এক হাঁড়ি চাপালেন, আর পোলাওয়ের চাল, ঘি, মাংস, মশ্‌লা সব তার মধ্যে দিয়ে গম্ভীরভাবে মন্ত্র পড়তে লাগলেন। পাঁচ মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল, ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে গেল, পোলাও আর হল না। সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। রাজামশাই রেগে ঘেমে লাল হয়ে উঠলেন। শেষটায় তিনি লাফিয়ে উঠে কাউকে কিছু না বলে এক তলোয়ার হাতে আবার ঘোড়ায় চড়ে পিটারের বাড়ি ছুটলেন। মনে মনে বললেন, "এবারে আর পাজি পিটারকে আস্ত রাখছি নে।"

দূর থেকে রাজাকে দেখেই পিটার এক দৌড়ে শোবার ঘরে গিয়ে লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে রইল। তার বোনকে সে আগে থেকেই সব শিখিয়ে রেখেছিল—সে করল কি একটা খরগোস কেটে তার রক্ত দিয়ে একটা থলি ভরে সেই থলিটা বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখল।

রাজা ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলেন, "পিটার কৈ? তাকে শিগ্গীর ডাক।" পিটারের বোন বলল, "দোহাই মহারাজ, পিটার এখন ঘুমুচ্ছে—সে ভয়ানক রাগী লোক, এখন জাগাতে গেলে

আমায় মারবে।" রাজা বললেন, "কিছু ভয় নেই—আমি আছি।"

পিটারের বোন পিটারকে ডাকতে গেল। খানিক বাদেই একটা চিৎকার গর্জনের মত শোনা গেল, রাজা দৌড়ে গিয়েই দেখেন পিটার একটা ছুরি নিয়ে তার বোনকে মারল আর সে বেচারা ঠিক যেন মড়ার মত পড়ে গেল—রক্তে তার কাপড় লাল হয়ে গেল। রাজা বললেন, "তবে রে পাজি পিটার, তোর বোনটাকে শুধু শুধু মেরে ফেললি?" পিটার বলল, "মহারাজ, এক মিনিট সবুর করুন।" এই বলে সে একটা ভাঙা শিঙের বাঁশী নিয়ে তার বোনের চোখে মুখে ফুঁ দিতে লাগল। এক মিনিটের মধ্যে মেয়েটা চোখ মেলে বড় বড় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে বসল। রাজা ত' অবাক! তিনি বললেন, "এই শিঙেটা আমায় দিতে হবে।" পিটার কাঁদতে লাগল—বলল, "দোহাই মহারাজ, ওটা না হলে আমাদের চলবে কেমন করে?" দেখাদেখি বোনটাও কাঁদতে লাগল, "এবার আমি মারা গেলে কি করে বাঁচাবে? দোহাই মহারাজ, পিটারের মেজাজ বড় ভয়ানক।" রাজা বললেন, "আমার মেজাজ তার চাইতেও ভয়ানক—তোদের যে মেরে ফেলি নি এই ঢের—এই নে—" বলে একমুঠো মোহর ফেলে দিলেন।

রাজা বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবলেন, "এবার থেকে যার উপর রাগ করব—একেবারে তলোয়ারের কোপ বসিয়ে দেব।" বাড়ি ফিরে দেখেন—নিমন্ত্রিত লোকেরা তখনও আশ্চর্য ভোজ খাবার আশায় বসে আছেন! মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, আহারের অন্য বন্দোবস্ত করতে বলব কি?" রাজা বললেন, "কি? এতবড় কথা! আমি করছি একরকম বন্দোবস্ত, তুমি করবে অন্যরকম?" বলেই মন্ত্রীর মাথায় এক কোপ বসিয়ে দিলেন। উজীর নাজীর কোটাল সব হাঁ হাঁ করে উঠতেই রাজা ঘ্যাচ্ ঘ্যাচ্ করে তাদেরও মাথা কেটে দিলেন। চারিদিকে হুলুস্থুল পড়ে গেল। রাজা বললেন, "ভয় নেই, তোমরা এখন মজা দেখ।" বলে তিনি সেই শিঙেটা মন্ত্রীর মুখের কাছে নিয়ে ফুঁ দিতে লাগলেন। কিন্তু ফুঁ দিলে হবে কি—মড়া মানুষ কি আর বাঁচে?

তখন রাজার হুকুমে পেয়াদা পুলিশ দৌড়ে গিয়ে পিটারকে ধরে আনল। একটা মজবুত বাক্সের মধ্যে তাকে বন্ধ করে সেই বাক্স মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধা হল। রাজা বললেন, "পাজি পিটার—তোমার শাস্তি শোন—এই বাক্সে ভরে তিন দিন তিন রাত্রি তোমাকে ঐ পাহাড়ের উপর রাখা হবে। সেখানে রোদে পুড়ে হিমে ভিজে তুমি তোমার দুষ্টুমির কথা ভাববে—তারপর তোমাকে এই পাহাড় থেকে একেবারে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হবে।"

পিটার বললে, "আহা, মহারাজের দয়ার শরীর"—পাহাড়ের আগায় বাক্সের মধ্যে শুয়ে পিটার মনে মনে ভাবছে, 'এখন উপায়?' আর মুখে চিৎকার করে গান করছে—

"ধিন্ তাধিনা তাধেই ধেই—
স্বর্গে যাবার রাস্তা এই"—

এমনি করে দুদিন গেল। তিনদিনের দিন এক বুড়ো বিদেশী সওদাগর সেখানে এল। সে বেচারা তীর্থ করতে বেরিয়েছে, পিটারের গান শুনে ব্যাপারটা কি দেখতে এল। সওদাগর বলল, "তুমি কে ভাই? স্বর্গের রাস্তার কথা বলছিলে?" পিটার বলল, "আরে চুপ—কাউকে ব'লো না, তাহলে স্বর্গে যাবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে—মাঝে থেকে আমার স্বর্গে যাওয়া মাটি হবে।" সওদাগর বলল, "ভাই, তুমি একা যাবে কেন? আমায়ও একটু পথ বাত্লে দাও না।" পিটার বলল, "সকলের কি তা সম্ভব হয়? এই বাক্সকে মন্ত্র পড়ে এখানে রাখা হয়েছে—যেমন তেমন বাক্স হলে হবে না; আজ রাত্রের শেষে স্বর্গের দূত এসে আমায় নিয়ে যাবে। আবার যে সে দিন হবে না—এমনি তিথি, এমনি বার, এমনি মাস, এমনি নক্ষত্র সব মেলা চাই—এরকম সুযোগ হাজার বছরে একদিন হয়।" সওদাগর বলল, "ভাই, আমি বুড়ো হয়েছি, কবে মরে যাই

তার ত' ঠিক নেই— আমার টাকাকড়ি ঘরবাড়ি সব তোমায় লিখে দিচ্ছি। তুমি আমায় ও বাক্সটা দাও-আমি স্বর্গে যাই।" পিটার বলল, "খবরদার, আমি ছেলেমানুষ বলে আমায় টাকার লোভ দেখিও না।" বুড়ো কাঁদতে লাগল; অনেক মিনতি করে বলতে লাগল, "এই বুড়ো বয়সে তীর্থ ঘুরে কতটুকু আর পুণ্য হবে—এখন না হলে আর আমার স্বর্গে যাবার আশা নেই।" তখন পিটার রাজী হল।

বাক্স খুলে বুড়ো তার মধ্যে ঢুকল, পিটার তার কাছ থেকে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি লিখিয়ে নিয়ে বাক্সটা আবার দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল। যাবার সময় বলে গেল, "রাত্রের শেষে স্বর্গের দূত আসবে, তখন কিন্তু টুঁ শব্দটি করবে না। তা হলেই আর স্বর্গে যাওয়া হবে না।"

রাত্রে রাজামশাই শান্ত্রী নিয়ে বাক্সটা নেড়েচেড়ে সমুদ্রে ফেলে দিলেন। রাজা ভাবলেন 'আপদ গেল।' দুদিন বাদে রাজা বেড়াতে বেরিয়েছেন—এমন সময় পাজি পিটার জমকালো পোশাক পরে ধব্‌ধবে সাদা ঘোড়ায় চড়ে এসে সেলাম করে বলল, "মহারাজ আমায় সমুদ্রে ফেলে বড়ই উপকার করেছেন। আহা! সমুদ্রের তলায় যে দেশ আছে—সে বড় চমৎকার জায়গা। আর লোকেরা যে কি ভাল, তা আর কি বলব—আমায় কি ছাড়তে চায়? আসবার সময় থলে ভরা কেবল হীরে মনি মুক্তো সঙ্গে দিল।" এই বলেই সে চম্পট দিল।

রাজামশাই হাঁ করে রইলেন। রাজামশাই জানতে চান সমুদ্রের তলাটার কথা। পাজি পিটার যা বলেছে তা সত্যি কিনা—তাহলে তিনি একবার দেখে আসেন।

টিয়াপাখীর বুদ্ধি

এক ফরাসি ভদ্রলোকের একটা কুকুর আর একটা টিয়াপাখি ছিল। কুকুরটাকে তিনি নানারকম খেলা আর কাজ শিখিয়ে ছিলেন, "বাইরে যাও", "দোকানে যাও", "খাবার আন" ব'লে তিনি যখন যেমন হুকুম করতেন, কুকুরটা ঠিক মতন তাঁর হুকুম তামিল করত। টিয়াপাখিটা কিন্তু কিছু কাজ করতে শেখে নি। সে কেবল সবসময় বকর্ বকর্ করে কথা বলত আর কুকরটার উপর সর্দারি করত। কুকুর বেচারা হয়ত ঘরের মধ্যে শুয়ে আছে হঠাৎ টিয়াপাখিটা চোখ পাকিয়ে ধমক দিয়ে বলল, "এইও বাইরে যাও"—কুকুরেরও হুকুম শুনে অভ্যাস—সে ভয়ে ভয়ে লেজ গুটিয়ে দরজার দিকে রওনা হত। তখন আবার টিয়াপাখিটা ঠিক তার মনিবের মত শিস্ দিয়ে তাকে ডেকে আনত।

সেই ভদ্রলোকটি কুকুরটাকে প্রায়ই রুটিওয়ালার দোকানে 'কেক্' আনবার জন্য পাঠাতেন। কুকুরটাকে সকলেই খুবই চিনত সুতরাং সে টুক্রি মুখে নিয়ে দোকানে আস্‌লেই রুটিওয়ালা টুক্রির মধ্যে কেক্ পুরে দিত আর তার মনিবের নামে হিসাব লিখে রাখত। একদিন ভদ্রলোকটি হিসাব করতে গিয়ে দেখেন যে তাঁর হিসাবের সঙ্গে দোকানের হিসাব মিলছে না! তিনি যতবার কুকুরটাকে পাঠিয়েছেন—দোকানীর হিসাবে তার চাইতেও বেশি লেখা হয়েছে! কয়েক দিন পর্যন্ত এর কারণ কিছু বোঝা গেল না। তারপর তিনি একদিন দেখেন কি, কুকুরটা শুয়ে আছে এমন সময় টিয়াপাখিটা হঠাৎ ব'লে উঠল, "টুক্রি আন।" কুকুরটা একটু উঠে টুক্রি নিয়ে এল। টিয়াপাখি বলল, "দোকানে যাও।" কুকুর বেচারা ইতস্তত করতে লাগল, তাই দেখে সে আবার চীৎকার

ক'রে বলল, "এইও, দোকানে যাও।" কুকুর বেচারা আর কি করে? সে দোকানে গিয়ে দু'মিনিটের মধ্যে খাবার এনে পাখিটার সামনে রেখে লেজ নাড়তে লাগল, ইচ্ছাটা সেও কিছু ভাগ পায়, কিন্তু টিয়াপাখি "বাইরে যাও" ব'লে এক ধমক দিয়ে তাকে তাড়িয়ে, নিজেই সবটা খাবার খেতে লাগল।

তখন ভদ্রলোকটি বুঝতে পারলেন যে দোকানীর হিসাবে কেন বেশি লেখা হয়।

খুকির লড়াই দেখা

একদল ইংরেজ সৈন্য মাঠের পাশ দিয়ে লড়ায়ের জায়গায় যাচ্ছে, এমন সময় তাদের একজন হঠাৎ দেখতে পেল, মাঠের কিনারায় একটা খুকী ঘুমাচ্ছে! আশেপাশে কোথাও লোকজন নাই, ঘর বাড়ি যা কিছু ছিল কোন কালে গোলা লেগে ছাতু হ'য়ে গেছে—এমন জায়গায় খুকী আস্‌ল কোথা থেকে? খুকীর বয়স বছর দুই, টুক্‌টুক্‌ ক'রে হেঁটে বেড়ায়, অতি মিষ্টি ক'রে দু' চারটি কথা বলে ফরাসী ভাষায়। সে যে কোথা থেকে এল তা সে বুঝিয়ে বলতে পারে না। সৈন্যরা ঠিক করল, তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাওয়া যাক্‌, পরে খোঁজ ক'রে যা হয় একটা করা যাবে। লড়াইয়ের জায়গায় মাটির মধ্যে খাদ কেটে সৈন্যরা সব সময় হুঁশিয়ার হয়ে বসে থাকে—কখন একদিন, কখন দুদিন, কখন বা সপ্তাহ ধ'রে এক একদলে সেই খাদের মধ্যে থাকতে হয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে তারা খুকীকে নিয়েই আস্তে আস্তে খাদের মধ্যে ঢুকল।

সামনে জার্মানদের খাদ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে এদিক ওদিক গোলা ফাটার শব্দ হচ্ছে, কখন বা দুটো একটা বন্দুকের গুলি সোঁ ক'রে মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু খুকুমনির তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। সৈন্যরা তার জন্য খড় দিয়ে আর বালির বস্তা দিয়ে সুন্দর বিছানা ক'রে দিয়েছে—তার মধ্যে সে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাচ্ছে! সকাল হতেই কামানের লড়াই আরম্ভ হল—প্রথমটা অল্প-সল্প—তারপরে ক্রমেই বেশি। খুকী তখন ঘুম থেকে উঠেছে, সে প্রথম প্রথম দুম্‌দাম্‌ শব্দে বোধ হয় একটু ভয় পেয়েছিল—কিন্তু খানিকক্ষণ শুনে শুনে আপনা হতেই তার ভয় ভেঙে গেল। সে তখন খাদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে আলাপ করতে লাগল, তাদের বন্দুক দূরবীণ অস্ত্রশস্ত্র দেখিয়ে "এটা কি?" "ওটা কি?" জিজ্ঞাসা করতে লাগল।

তারপর একদিন যায়, দুদিন যায়, সৈন্যরা তখনও সেখান থেকে বদলি হয় নি। তিন দিনের দিন জার্মানরা খাদের উপর প্রকাণ্ড এক বোমা ফেলল। বোমা ভয়ানক শব্দে ফাট্‌বামাত্র খাদের খানিকটা ধ'সে গিয়ে কতগুলো লোক চাপা পড়ল। অমনি সকলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "আগে খুকীকে দেখ।" খুকী এক কোণে পুঁটুলি পাকিয়ে দিব্যি ঘুমিয়ে আছে। পরদিন সকালবেলা সকলে খাওয়া-দাওয়া করছে—এমন সময় একজন চেঁচিয়ে উঠল "দেখ, খুকীটা কোথায় গেল"; সকলে চেয়ে দেখে খুকীটা জার্মান খাদের দিকে খুট্‌খুট্‌ ক'রে হেঁটে যাচ্ছে। জার্মানরা তো ব্যাপার দেখে অবাক্‌! খানিক বাদে তারা খুকীটাকে ডাকতে লাগল। খুকীও তাদের খাদে গিয়ে অনেক চকলেট লজঞ্চুস্‌ আদায় ক'রে ভারি খুশী হয়ে ফিরে এল। এম্নি ক'রে তারা এক সপ্তাহ কাটাল।

তারপর দু বছর কেটে গেছে—সেই খুকীর বাবা-মার কোন খবর পাওয়া যায় নি। সেই সৈন্যদলই এখনও তাকে খরচ দিয়ে খাইয়ে পড়িয়ে মানুষ করছে। অবশ্য এখন সে আর লড়াইয়ের জায়গায় থাকে না—সে থাকে লন্ডনে—সকলে তার নাম রেখেছে ফিলিস্‌

ছয় বীর

সে প্রায় ছয়শত বৎসর আগেকার কথা—সে সময়ে ইংরাজ ও ফরাসীতে প্রায়ই যুদ্ধ চলিত। দুই পক্ষেই বড় বড় বীর ছিলেন—তাঁহাদের আশ্চর্য বীরত্বের কাহিনী ইউরোপের দেশ বিদেশে লোকে অবাক হইয়া শুনিত।

ইংলন্ডের রাজা তৃতীয় এড্ওয়ার্ড তখন খুব বড় সৈন্যদল লইয়া ফ্রান্সে যুদ্ধ করিতে ছিলেন। ফ্রান্সের উত্তর দিকে সমুদ্রের উপকূলে ইংলন্ডের খুব কাছাকাছি একটি শহর আছে, তাহার নাম 'ক্যালে' (Calais)। এই শহরটির উপর বহুকাল ধরিয়া ইংরাজদের চোখ ছিল—কারণ, এইটি দখল করিতে পারিলে, ফ্রান্সে যাওয়া-আসার খুবই সুবিধা হয়। এড্ওয়ার্ড জলস্থল দুইদিক হইতে এই শহরটিকে ঘেরাও করিয়া ফেলিলেন। 'ক্যালে' শহরে সৈন্য সামন্ত বেশী ছিল না, কিন্তু সেখানকার দুর্গ বড় ভয়ানক। তার চারিদিক উঁচু দেয়াল ঘেরা—সেই দেয়ালের বাহিরে প্রকাণ্ড খাল—এক একটা ফটকের সামনে পোল—সেই পোল দুর্গের ভিতর হইতে গুটাইয়া ফেলা যায়। সে সময়ে কামান ছিল বটে—তাহার গোলাতে মানুষ মরে কিন্তু দুর্গ ভাঙে না। সুতরাং জোর করিয়া দুর্গ দখল করা বড় সহজ ছিল না। কিন্তু এড্ওয়ার্ড তাহার জন্য ব্যস্ত হইলেন না—তিনি শহরের পথঘাট আটকাইয়া, প্রকাণ্ড তাম্বু গাড়িয়া দিনের পর দিন নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মতলবটি এই যে, যখন দুর্গের ভিতরের খাবার সব ফুরাইয়া আসিবে আর ভিতরের লোকজন ক্রমে কাহিল হইয়া পড়িবে, তখন তাহারা আপনা হইতেই হার মানিবে; মিছামিছি লড়াই হাঙ্গামা করিবার দরকার হইবে না।

'ক্যালে'র লোকেরা যখন দেখিল, ইংরাজেরা চারিদিক হইতে পথঘাট ঘিরিয়া ফেলিতেছে, তখন তাহারা শিশু, বৃদ্ধ, অক্ষম এবং দুর্বল লোকদিগকে এবং স্ত্রীলোকদিগকে শহরের বাহিরে পাঠাইয়া দিল।

তারপর কিছুদিন ধরিয়া ইংরাজ ও ফরাসিতে রেষারেষি চলিতে লাগিল। ফরাসীদের মতলব, বাহির হইতে দুর্গের ভিতরে খাবার পৌঁছাইবে—ইংরাজের চেষ্টা যে সেই খাবার কিছুতেই ভিতরে যাইতে দিবে না। ডাঙ্গার পথে খাবার পৌঁছান একরূপ অসম্ভব ছিল—কারণ, সেদিকে ইংরাজদের খুব কড়াক্কড় পাহারা। সমুদ্রের দিকেও ইংরাজদের যুদ্ধ-জাহাজ সর্বদা ঘোরাঘুরি করিত কিন্তু অন্ধকার রাতে তাহাদের এড়াইয়া, ফরাসি নাবিকেরা মাঝে মাঝে রুটি, মাংস, শাক সব্‌জি প্রভৃতি শহরের মধ্যে পৌঁছাইয়া দিত। মৌরৎ ও মেস্ত্রিয়েল নামে দুইজন নাবিক এই কাজে আশ্চর্য সাহস ও বাহাদুরি দেখাইয়াছিল। একবার নয়, দুইবার নয়, তাহারা বহুদিন ধরিয়া এই রকমে সেই শহরে খাবার জোগাইয়াছিল। ইংরাজেরা তাহাদের ধরিবার জন্য কতবার কত চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু প্রতিবারেই তাহারা ইংরাজ জাহাজগুলিকে ফাঁকি দিয়া পলাইত।

এইরকমে ছয়মাস কাটিয়া গেল, তবু দুর্গের লোকেরা দুর্গ ছাড়িয়া দিবার নাম পর্যন্ত করে না। তখন রাজা এড্ওয়ার্ড কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি আরো লোকজন আনাইয়া সমুদ্রের তীরে দুর্গ বানাইলেন, সেখানে খুব জবরদস্ত্ পাহারা বসাইলেন, সমুদ্রের ধারে পাহাড়ে বড় বড় পাথর ছুঁড়িবার যন্ত্র বসাইলেন। নৌকার সাধ্য কি সেদিক দিয়া শহরে প্রবেশ করে! খাবার আসিবার পথ যখন বন্ধ হইতে চলিল, দুর্গের লোকদেরও তখন হইতে ক্ষুধার কষ্ট আরম্ভ হইল, তাহারা দুর্বল হইয়া পড়ায় তাহাদের মধ্যে নানারকম রোগ দেখা দিতে লাগিল। তবু তাহারা মাঝে মাঝে দল বাঁধিয়া ইংরাজদের শিবির হইতে খাবার কাড়িয়া আনিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তাহাতে যেটুকু

খাওয়া জুটিত তাহা অতি সামান্য। দুর্গের সৈন্যেরা মাসের পর মাস ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করিয়াও, আশ্চর্য তেজের সঙ্গে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিল—তাহাদের এক ভরসা এই যে, ফরাসি রাজা ফিলিপ নিশ্চয়ই সৈন্য সামন্ত লইয়া তাহাদের সাহায্য করিতে আসিবেন।

একদিন সত্য সত্যই দেখা গেল, শহর হইতে কিছু দূরে ফরাসি সৈন্যদল আসিয়া হাজির হইয়াছে। তাহাদের রঙ্গিন নিশান আর সাদা তাম্বুগুলি দুর্গের লোকেরা যখন দেখিতে পাইল, তখন তাহাদের আনন্দ দেখে কে! তাহারা ভাবিল, আমাদের এত দিনের ক্লেশ সার্থক হইল। যাহা হউক, ফিলিপ আসিয়াই ইংরাজেরা কোথায় কেমনভাবে আছে, তাহার খবর লইয়া দেখিলেন যে, এখান হইতে ইংরাজদের হটান বড় সহজ হইবে না। 'ক্যালে' ঢুকিবার পথ মাত্র দুইটি, একটি একেবারে সমুদ্রের ধারে—সেদিকে ইংরাজের বড় বড় যুদ্ধ-জাহাজ চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দেয়। আর একটি পথে পোলের উপর দিয়া নদী পার হইতে হয়—সেই পোলের উপর ইংরাজেরা রীতিমত দখল জন্মাইয়া বসিয়াছে। পোলের মুখে দুর্গ বসাইয়া বড় বড় যোদ্ধারা তাহার মধ্যে তীরন্দাজ লইয়া প্রস্তুত রহিয়াছে—তাহারা প্রাণ থাকিতে কেহ পথ ছাড়িবে না। ইহা ছাড়া আর সব জলাভূমি, সেখান দিয়া সৈন্য সামন্ত পার করা এক দুরূহ ব্যাপার।

ফিলিপ তখন ইংরাজ শিবিরে দূত পাঠাইয়া প্রস্তাব করিলেন, "আইস! তোমরা একবার খোলা ময়দানে আসিয়া আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর।" এড্‌ওয়ার্ড উত্তর দিলেন, "আমি আজ বৎসরখানেক এইখানে অপেক্ষা করিয়া আছি, ইহাতে আমার খরচপত্র যথেষ্ট হইয়াছে। এতদিনে দুর্গের লোকেরা কাবু হইয়া আসিয়াছে, এখন তোমার খাতিরে আমি এমন সুযোগ ছাড়িতে প্রস্তুত নই। তোমার রাস্তা তুমিই খুঁজিয়া লও।"

তিন দিন ধরিয়া দুই দলে আপসের কথাবার্তা চলিল, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ মীমাংসা হইল না। তখন ফিলিপ অগত্যা তাঁহার সৈন্যদের লইয়া আবার বিনা যুদ্ধেই ফিরিয়া গেলেন। তাঁহাকে ফিরিতে দেখিয়া দুর্গবাসীদের মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। এতদিন তাহারা যে ভরসায় সকল কষ্ট ভুলিয়া ছিল, এখন সে ভরসাও আর রহিল না। তখন তাহারা একেবারে নিরাশ হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিল।

এড্‌ওয়ার্ড বলিলেন, "সন্ধি করিতে আমি প্রস্তুত আছি, কিন্তু তোমরা আমায় বড় ভোগাইয়াছ, আমার অনেক জাহাজ ডুবিয়াছে, টাকা ও সময় নষ্ট হইয়াছে, এবং অন্য নানারকমের ক্ষতি হইয়াছে। আমি ইহার ষোল-আনা শোধ না লইয়া ছাড়িব না। আমার সন্ধির শর্ত এই,—ক্যালের দুর্গ শহর টাকাকড়ি লোকজন সমস্ত আমার হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে—আমার যেমন ইচ্ছা ফাঁসি, কয়েদ, জরিমানা ইত্যাদি দণ্ডবিধান করিব এবং ইহাও জানিও যে, আমি যে শাস্তি দিব তাহা বড় সামান্য হইবে না।"

ইংরাজ দূত যখন ক্যালের লোকেদের এই কথা জানাইল, তাহারা এমন শর্তে সন্ধি করিতে রাজী হইল না। তাহারা বলিল, "রাজা এড্‌ওয়ার্ড স্বয়ং একজন বীরপুরুষ, তাঁহাকে বুঝাইয়া বলুন, তিনি এমন অন্যায় দাবী কখনও করিবেন না।" ইংরাজ দলের ধনী এবং সম্ভ্রান্ত লোকেরা তখন তাহাদের পক্ষ লইয়া রাজাকে অনেক বুঝাইলেন। ক্যালের লোকেরা কিরূপ সাহসের সহিত কত কষ্ট সহ্য করিয়া, বীরের মত দুর্গ রক্ষা করিয়াছে, সে সকল কথা তাঁহারা বার বার বলিলেন। এমন শত্রুকে যে সম্মান করা উচিত একথা এক বাক্যে সকলে স্বীকার করিলেন। কিন্তু এড্‌ওয়ার্ডের প্রতিজ্ঞা অটল। অনেক বলা-কওয়ার পর, তিনি একটু নরম হইয়া এই হুকুম দিলেন—"ক্যালের লোকেরা যদি ক্ষমা চায় তবে তাহাদের ছয়জন প্রতিনিধি পাঠাইয়া দিক—তাহারা দুর্গের চাবি লইয়া, খালি পায়ে খালি মাথায় গলায় দড়ি দিয়া আমার কাছে আসুক এবং সকলের হইয়া শাস্তি

গ্রহণ করুক। তাহা হইলে আর সকলকে মাপ করিতে পারি, কিন্তু এই ছয়জনের আর রক্ষা নাই।"

ইংরাজ দূত আবার দুর্গে গিয়া এই হুকুম জানাইল। দুর্গের লোকেরা রাজার আদেশ জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল—এই হুকুম শুনিয়া তাহারা স্তব্ধ হইয়া গেল। তখন ক্যালের সম্ভ্রান্ত ধনী বৃদ্ধ সেন্ট পিয়ের বলিয়া উঠিলেন, "বন্ধুগণ, আমার জীবন দিয়া যদি তোমাদের বাঁচাইতে পারি, তবে ইহার চাইতে সুখের মৃত্যু আমি চাহি না। আমি ছয়জনের মধ্যে প্রথম প্রতিনিধিরূপে দাঁড়াইলাম।" এই কথায় চারিদিকে ক্রন্দনের রোল উঠিল—অনেকে সেন্ট পিয়েরের পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আরও পাঁচজন লোক অগ্রসর হইয়া, তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল, "আমরাও মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।" এই দৃশ্য দেখিয়া ইংরাজ দূতের চক্ষে জল আসিল—তিনি বলিলেন, "রাজা এড্ওয়ার্ড যাহাতে ইঁহাদের প্রতি সদয় হন, আমি সে জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব।"

ছয়জন প্রতিনিধিকে রাজার সভায় উপস্থিত করা হইল। তাঁহারা শান্তভাবে রাজার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন। তারপর সেন্ট পিয়ের ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "আমাদের 'ক্যালে'বাসী বন্ধুগণ এতদিন অসহ্য দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া দুর্গ রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের অযোগ্য প্রতিনিধি আমরা, আজ তাঁহাদের জীবনরক্ষার জন্য দুর্গের চাবি আপনার কাছে দিতেছি। এখন আমরা সম্পূর্ণভাবে আপনার ইচ্ছা ও আদেশের অধীনে রহিলাম।"

সভাশুদ্ধ লোকে স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। ছয়জনের সকলেই বয়সে বৃদ্ধ; বহুদিন অনাহারে তাঁহাদের শরীর শুকাইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের গম্ভীর প্রশান্ত মুখে কষ্টের রেখা পড়িয়াছে, এক একজন এত দুর্বল যে, চলিতে পা কাঁপে, অথচ তাঁহাদের মন এখনও তেজে পরিপূর্ণ। তাঁহাদের দেখিয়া ইংরাজ যোদ্ধাগণের মনে শ্রদ্ধার উদয় হইল। সকলেই বলিতে লাগিল, "ইহাদের উপর শাস্তি দিয়া প্রতিশোধ লওয়া কখনই উচিত নয়।" যিনি দূত হইয়া গিয়াছিলেন তিনি বলিলেন, "ইঁহাদের শাস্তি দিলে রাজা এড্ওয়ার্ডের কলঙ্ক হইবে—ইংরাজ জাতির কলঙ্ক হইবে।" কিন্তু এর্ডওয়ার্ডের মন গলিল না—তিনি জল্লাদ ডাকিতে হুকুম দিলেন। তখন ইংলন্ডের রানী ফিলিপা বন্দীদের মধ্যে কাঁদিয়া পড়িলেন এবং দুই হাত তুলিয়া ভগবান যীশুর দোহাই দিয়া এড্ওয়ার্ডকে বলিলেন, "ইহাদের তুমি ছাড়িয়া দাও।" তখন এড্ওয়ার্ড আর 'না' বলিতে পারিলেন না।

ছয় বীরকে মুক্তি দিয়া রানী তাহাদিগকে তাঁহার নিজের বাড়িতে লইয়া, পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইলেন এবং নানা উপহার দিয়া বিদায় দিলেন। ইঁহাদের বীরত্বের কথা ফরাসীরা আজও ভোলেন নাই—ইংরাজও তাহা স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন।

ভাঙা তারা

মাতারিকি আকাশের পরী। আকাশের পরী যারা, তাদের একটি ক'রে তারা থাকে। মাতারিকি তার তারাটিকে রোজ সকালে শিশির দিয়ে ধুয়ে মেজে এমনি চক্‌চক্ ক'রে সাজিয়ে রাখত যে, রাত্রিবেলা সবার আগে তার উপরেই লোকের চোখ পড়ত—আর সবাই বলত—"কী সুন্দর!" তাই শুনে শুনে আর সব আকাশ-পরীদের ভারী হিংসা হ'ত।

তানে হচ্ছেন গাছের দেবতা। তিনি গাছে গাছে রস যোগাতেন, ডালে ডালে ফুল ফোটাতেন আর গাছের সবুজ তাজা পাতার দিকে অবাক হ'য়ে ভাবতেন—'এ জিনিস দেখলে পরে আর কিছুর পানে লোকে ফিরেও চাইবে না।' কিন্তু লোকেরা গাছের উপর দিয়ে বার বার কেবল মাতারিকির তারা দেখত, আর কেবল তার কথাই বলত। তানের বড় রাগ হ'ল। সে বলল, "আচ্ছা, তারার আলো আর কতদিন? দুদিন বাদেই ঝাপসা হয়ে আসবে।" কিন্তু যতদিন যায় তারা ততই উজ্জ্বল আর ততই সুন্দর হয়, আর সবাই তার দিকে ততই বেশি ক'রে তাকায়। একদিন অন্ধকার রাত্রে যখন সবাই ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে, তখন তানে চুপি চুপি দুজন আকাশ-পরীর কানে কানে বলল, "এস ভাই, আমরা সবাই মিলে মাতারিকিকে মেরে তারাটাকে পেড়ে আনি।" পরীরা বলল, "চুপ, চুপ, মাতারিকি জেগে আছেন। পূর্ণিমার জোছনা রাতে আলোয় শুয়ে মাতারিকির চোখ যখন আপনা হ'তে ঢুলে আসবে, সেই সময়ে আবার এস।"

এসব কথা কেউ শুনল না, শুনল খালি জলের রাজার ছোট্ট একটি মেয়ে। রাজার মেয়ে রাত্রি হলেই, সেই তারাটির ছায়া নিয়ে খেলতে খেলতে জলের নীচে ঘুমিয়ে পড়ত আর মাতারিকির স্বপ্ন দেখত। দুষ্ট পরীর কথা শুনে তার দু'চোখ ভ'রে জল আসল।

এমন সময় দখিন হাওয়া আপন মনে গুন্‌গুনিয়ে জলের ধারে এসে পড়ল। রাজার মেয়ে আস্তে আস্তে ডাকতে লাগল, "দখিন হাওয়া শুনেছ? ওরা মাতারিকিকে মারতে চায়।" শুনে দখিন হাওয়া 'হায়' 'হায়' ক'রে কেঁদে উঠল। রাজার মেয়ে বলল, "চুপ চুপ, এখন উপায় কি বল ত?" তখন তারা দুজনে পরামর্শ করল যে, মাতারিকিকে জানাতে হবে—সে যেন পূর্ণিমার রাতে জেগে থাকে।

ভোর না হ'তে দখিন হাওয়া রাজার মেয়ের ঘুম ভাঙিয়ে বলল, "এখন যেতে হবে।" সূর্য তখন স্নানটি সেরে সিঁদুর মেখে সোনার সাজে পুবের দিকে দেখা দিচ্ছেন। রাজার মেয়ে তার কাছে আবদার করল, "আমি আকাশের দেশে বেড়াতে যাব।" সূর্য তাঁর একখানি সোনালি কিরণ ছড়িয়ে দিলেন। সেই কিরণ বেয়ে বেয়ে রাজার মেয়ে উঠতে লাগল। সকাল বেলার কুয়াশা দিয়ে দক্ষিণ হাওয়া তাকে ঘিরে ঘিরে চারদিকেতে ঢেকে রাখল। এমনি ক'রে রাজার মেয়ে মাতারিকির বাড়িতে গিয়ে, সব খবর বলে আসল। মাতারিকি কি করবে? সে বলল, "আমি আর কোথায় যাব? পূর্ণিমার রাতে এইখানেই পাহারা দিব—তারপর যা হয় হবে।"

রাজার মেয়ে ঝাপ্‌সা মেঘের আড়াল দিয়ে বৃষ্টি বেয়ে নেমে আসলেন।

তারপর পূর্ণিমার রাতে তানে আর সেই দুষ্টু পরীরা ছুটে বেরুল মাতারিকির তারা ধরতে। মাতারিকি দু'হাত দিয়ে তারাটিকে আঁকড়ে ধ'রে, প্রাণের ভয়ে ছুটতে লাগল। ছুট্, ছুট্, ছুট্। আকাশের আলোর নীচে, ছায়াপথের ছায়ায় ছায়ায় নিঃশব্দে ছুটাছুটি আর লুকোচুরি। দখিন হাওয়া স্তব্ধ হ'য়ে দেখতে লাগল, রাজার মেয়ে রাত্রি জেগে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইল। তারায় তারায় আকাশ-পরী, কিন্তু মাতারিকি যার কাছেই যায়, সেই তাকে দূর্ দূর্ ক'রে তাড়িয়ে দেয়।

ছুট্‌তে ছুট্‌তে মাতারিকি হাঁপিয়ে পড়ল—আর সে ছুটতে পারে না। তখন তার মনে হ'ল, 'জলের দেশে রাজার মেয়ে আমায় বড় ভালবাসে—তার কাছে লুকিয়ে থাকি।' মাতারিকি ঝুপ্ ক'রে জলে পড়েই ডুব, ডুব, ডুব—একেবারে জলের তলায় ঠাণ্ডা কালো ছায়ার নীচে লুকিয়ে রইল। রাজার মেয়ে অমনি তাকে শেওলায় ঢেকে আড়াল করল।

সবাই তখন খুঁজে সারা—"কোথায় গেল, কোথায় গেল?" একজন পরী ব'লে উঠল, "ঐ ওখানে—জলের নীচে।" তানে বললেন, "বটে! মাতারিকিকে লুকিয়ে রেখেছ কে?" রাজার মেয়ের বুকের মধ্যে দুর্ দুর্ ক'রে কেঁপে উঠল—কিন্তু সে কোন কথা বলল না। তখন তানে বলল,

"আচ্ছা দাঁড়াও। আমি এর উপায় করছি।" তখন সে জলের ধারে নেমে এসে, হাজার গাছের শিকড় মেলে শোঁ শোঁ করে জল টানতে লাগল।

তখন মাতারিকি জল ঝেড়ে উঠে আসল। জলের নীচে আরামে শুয়ে তার পরিশ্রম দূর হ'য়েছে, এখন তাকে ধরবে কে? আকাশময় ছুটে ছুটে কাহিল হ'য়ে সবাই বলছে, "আর হলো না।" তানে তখন রেগে বলল, "হতেই হবে।" এই ব'লে হঠাৎ সে পথের পাশের একটা মস্ত তারা কুড়িয়ে নিয়ে, মাতারিকির হাতের দিকে ছুড়ে মারল।

ঝন্ ঝন্ ক'রে শব্দ হল, মাতারিকি হায় হায় ক'রে কেঁদে উঠল, তার এতদিনের সাধের তারা সাত টুক্‌রো হ'য়ে ভেঙে পড়ল। তানে তখন দৌড়ে এসে সেগুলোকে দুহাতে ক'রে ছিটিয়ে দিলেন আর বললেন, "এখন থেকে দেখুক সবাই—আমার গাছের কত বাহার।" দুষ্টু পরীরা হো হো করে হাসতে লাগল।

এখনও যদি দখিন হাওয়ার দেশে যাও, দেখবে, সেই ভাঙা তারার সাতটি টুক্‌রো আকাশের এক্কই জায়গায় ঝিকমিক করে জ্বলছে। ঘুমের আগে রাজার মেয়ে এখনও তার ছায়ার সঙ্গে খেলা করে। আর জোছনা রাতে দখিন হাওয়ায় মাতারিকির দীর্ঘনিশ্বাস শোনা যায়।

খৃষ্টবাহন

তার নাম অফেরো। অমন পাহাড়ের মত শরীর, অমন সিংহের মত বল, অমন আগুনের মত তেজ, সে ছাড়া আর কারও ছিল না। বুকে তার যেমন সাহস, মুখে তার তেমনি মিষ্টি কথা। কিন্তু যখন তার বয়স অল্প, তখনই সে তার সঙ্গীদের ছেড়ে গেল; যাবার সময় বলে গেল, "যদি রাজার মত রাজা পাই, তবে তার গোলাম হয়ে থাকব। আমার মনের মধ্যে কে যেন বলে দিচ্ছে, তুমি আর কারও চাকরি করো না; যে রাজা সবার বড়, সংসারে যার ভয় নাই, তারই তুমি খোঁজ কর।" এই বলে অফেরো কোথায় জানি বেরিয়ে গেল।

পৃথিবীতে কত রাজা, তাদের কত জনের কত ভয়। প্রজার ভয়, শত্রুর ভয়, যুদ্ধের ভয়, বিদ্রোহের ভয়—ভয়ে কেউ আর নিশ্চিন্ত নেই। এরকম হাজার দেশ ছেড়ে ছেড়ে অফেরো এক রাজ্যে এল, সেখানে রাজার ভয়ে সবাই খাড়া! চোরে চুরি করতে সাহস পায় না, কেউ অন্যায় করলে ভয়ে কাঁপে। অস্ত্রেশস্ত্রে সৈন্যসামন্তে রাজার প্রতাপ দশদিক দাপিয়ে আছে। সবাই বলে, "রাজার মত রাজা।" তাই শুনে অফেরো তাঁর চাকর হয়ে রইল।

তারপর কতদিন গেল—এখন অফেরো না হ'লে রাজার আর চলে না—উঠতে বসতে তার ডাক পড়ে। রাজা যখন সভায় বসেন অফেরো তাঁর পাশে খাড়া। রাজার মুখের প্রত্যেকটি কথা সে আগ্রহ করে শোনে! রাজার চালচলন ধরনধারণ ভাবভঙ্গি—সব তার আশ্চর্য লাগে। আর রাজা যখন শাসন করেন, চড়া গলায় হুকুম দেন, অফেরো তখন অবাক হয়ে ভাবে, "যদি রাজার মত রাজা কেউ থাকে, তবে সে এই!"

তারপর একদিন রাজার সভায় কথায় কথায় কে যেন শয়তানের নাম করেছে। শুনে রাজা গম্ভীর হয়ে গেলেন। অফেরো চেয়ে দেখলে রাজার চোখে হাসি নেই, মুখখানি তাঁর ভাবনা ভরা। অফেরো তখন জোড়হাতে দাঁড়িয়ে বলল, "মহারাজের ভাবনা কিসের? কি আছে তাঁর ভয়ের কথা?" রাজা হেসে বললেন, "এক আছে শয়তান আর আছে মৃত্যু—এ ছাড়া আর কাকে

ডরাই?" অফেরো বলল, "হায় হায়, আমি এ কার চাকরি করতে এলাম? এ যে শয়তানের কাছে খাটো হয়ে গেল। তবে যাই শয়তানের রাজ্যে; দেখি সে কেমন রাজা!" এই বলে সে শয়তানের খোঁজে বেরুল।

পথে কত লোক আসে যায়—শয়তানের খবর জিজ্ঞাসা করলে তারা বুকে হাত দেয় আর দেবতার নাম করে, আর সবাই বলে, "তার কথা ভাই বলো না, সে যে কোথায় আছে, কোথায় নেই কেউ কি তা বলতে পারে?" এমনি করে খুঁজে খুঁজে কতগুলো নিষ্কর্মা কুঁড়ের দলে শয়তানকে পাওয়া গেল। অফেরোকে পেয়ে শয়তানের ফূর্তি দেখে কে! এমন চেলা সে আর কখনও পায়নি।

শয়তান বলল, "এস এস, আমি তোমায় তামাসা দেখাই। দেখবে আমার শক্তি কত?" শয়তান তাকে ধনীর প্রাসাদে নিয়ে গেল, সেখানে টাকার নেশায় মত্ত হয়ে, লোকে শয়তানের কথায় ওঠে বসে; গরীবের ভাঙা কুঁড়ের ভিতরে গেল, সেখানে এক মুঠো খাবার লোভে পেটের দায়ে বেচারীরা পশুর মত শয়তানের দাসত্ব করে। লোকেরা সব চলছে ফিরছে, কে যে কখন ধরা পড়ছে, কেউ হয়ত জানতে পারে না; সবাই মিলে মারছে, কাটছে, কোলাহল করছে "শয়তানের জয়।"

সব দেখে শুনে অফেরোর মনটা যেন দমে গেল। সে ভাবল, "রাজার সেরা রাজা বটে, কিন্তু আমার ত কৈ এর কাজেতে মন লাগছে না।" শয়তান তখন মুচকি মুচকি হেসে বললে, "চল ত ভাই, একবারটি এই শহর ছেড়ে পাহাড়ে যাই। সেখানে এক ফকির আছেন, তিনি নাকি বেজায় সাধু। আমার তেজের সামনে তাঁর সাধুতার দৌড় কতখানি, তা' একবার দেখতে চাই।"

পাহাড়ের নীচে রাস্তার চৌমাথায় যখন তারা এসেছে, শয়তান তখন হঠাৎ কেমন ব্যস্ত হয়ে থমকিয়ে গেল—তারপর বাঁকা রাস্তা ঘুরে তড়্‌তড়্ করে চলতে লাগল। অফেরো বললে, "আরে মশাই, ব্যস্ত হন কেন?" শয়তান বললে, "দেখছ না ওটা কি?" অফেরো দেখল, একটা ক্রুশের মত কাঠের গায়ে মানুষের মূর্তি আঁকা! মাথায় তার কাঁটার মুকুট—শরীরে তার রক্তধারা! সে কিছু বুঝতে পারল না। শয়তান আবার বললে, "দেখছ না ঐ মানুষকে—ও যে আমায় মানে না, মরতে ডরায় না,—বাবারে! ওর কাছে কি ঘেঁষতে আছে? ওকে দেখলেই তফাৎ হটি।" বলতে বলতে শয়তানের মুখখানা চামড়ার মত শুকিয়ে এল।

তখন অফেরো হাঁপ ছেড়ে বললে, "বাঁচালে ভাই! তোমার চাকরি আর আমায় করতে হল না। তোমায় মানে না, মরতেও ডরায় না, সেইজনকে যদি পাই তবে তারই গোলাম হয়ে থাকি।" এই বলে আবার সে খোঁজে বেরুল।

তারপর যার সঙ্গে দেখা হয়, তাকেই সে জিজ্ঞাসা করে, "সেই ক্রুশের মানুষকে কোথায় পাব?"—সবাই বলে, খুঁজতে থাক, একদিন তবে পাবেই পাবে। তারপর একদিন চলতে চলতে সে এক যাত্রীদলের দেখা পেল। গায়ে তাদের পথের ধূলা, হাঁটতে হাঁটতে সবাই শ্রান্ত, কিন্তু তবু তাদের দুঃখ নাই—হাসতে হাসতে গান গেয়ে সবাই মিলে পথ চলছে। তাদের দেখে অফেরোর বড় ভাল লাগল—সে বললে, "তোমরা কে ভাই? কোথায় যাচ্ছ?" তারা বললে, "ক্রুশের মানুষ যীশু খৃষ্ট—আমরা সবাই তাঁরই দাস। যে পথে তিনি গেছেন, সেই পথের খোঁজ নিয়েছি।" শুনে অফেরো তাদের সঙ্গ নিল।

সে পথ গেছে অনেক দূর। কত রাত গেল দিন গেল, পথ তবু ফুরায় না—চলতে চলতে

সবাই ভাবছে, বুঝি পথের শেষ নাই। এমন সময় সন্ধ্যার ঝাপসা আলোয় পথের শেষ দেখা দিল। ওপারে স্বর্গ, এপারে পথ, মাঝে অন্ধকার নদী। নৌকা নাই, কূল নাই, মাঝে মাঝে ডাক আসে, "পার হয়ে এস।" অফেরো ভাবল, 'কি করে এরা সব পার হবে? কত অন্ধ, খঞ্জ, কত অক্ষম বৃদ্ধ, কত অসহায় শিশু—এরা সব পার হবে কি ক'রে?' যাঁরা বৃদ্ধ, তাঁরা বললেন, "দূত আসবে। ডাক পড়বার সময় হলে, তখন তাঁর দূত আসবে।"

বলতে বলতে দূত এসে ডাক দিল। একটি ছোট মেয়ে ভুগে ভুগে রোগা হয়ে গেছে, সে নড়তে পারে না, বাইতে পারে না, দূত তাকে বলে গেল,—"তুমি এস, তোমার ডাক পড়েছে।" শুনে তার মুখ ফুটে হাসি বেরুল, সে উৎসাহে চোখ মেলে উঠে বসল। কিন্তু হায়! অন্ধকার নদী, অকূল তার কালো জল, স্রোতের টানে ফেনিয়ে উঠছে—সে নদী পার হবে কেমন করে? জলের দিকে তাকিয়ে তার বুকের ভিতরে দুর্ দুর্ করে উঠল। ভয়ে দু চোখ ঢেকে নদীর তীরে একলা দাঁড়িয়ে মেয়েটি তখন কাঁদতে লাগল। তাই দেখে সকলের চোখে জল এল, কিন্তু যেতেই যখন হবে তখন আর উপায় কি? মেয়েটির দুঃখে অফেরোর মন একেবারে গলে গেল। সে হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠল, "ভয় নাই—আমি আছি।" কোথা হতে তার মনে ভরসা এল, শরীরে তার দশগুণ শক্তি এল—সে মেয়েটিকে মাথায় করে, স্রোত ঠেলে, আঁধার ঠেলে, বরফের মত ঠাণ্ডা নদী মনের আনন্দে পার হয়ে গেল। মেয়েটিকে ওপারে নামিয়ে সে বলল, "যদি সেই ক্রুশের মানুষের দেখা পাও, তাঁকে বলো, এ কাজ আমার বড় ভাল লেগেছে—যতদিন আমার ডাক না পড়ে, আমি তাঁর গোলাম হয়ে এই কাজেই লেগে থাকব।"

সেই থেকে তার কাজ হল নদী পারাপার করা। সে বড় কঠিন কাজ! কত ঝড়ের দিনে কত আঁধার রাতে যাত্রীরা সব পার হয়—সে অবিশ্রাম কেবলই তাদের পৌঁছে দেয় আর ফিরে আসে! তার নিজের ডাক যে কবে আসবে, তা ভাববার আর সময় নেই।

একদিন গভীর রাত্রে তুফান উঠল। আকাশ ভেঙে পৃথিবী ধুয়ে বৃষ্টির ধারা নেমে এল। ঝড়ের মুখে স্রোতের বেগে পথ ঘাট সব ভাসিয়ে দিল—হাওয়ার পাকে পাগল হয়ে নদীর জল ক্ষেপে উঠল। অফেরো সেদিন শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে—সে ভেবেছে, এমন রাতে কেউ কি আর পার হতে চায়: এমন সময় ডাক শোনা গেল। অতি মিষ্টিকচি গলায় কে যেন বলছে, "আমি এখন পার হব।" অফেরো তাড়াতাড়ি উঠে দেখল, ছোট্ট একটি শিশু ঝড়ের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, আর বলছে, "আমার ডাক এসেছে, আমি এখন পার হব।" অফেরো বললে, "আচ্ছা! এমন দিনে তোমায় পার হতে হবে! ভাগ্যিস আমি শুনতে পেয়েছিলাম।" তারপর ছেলেটিকে কাঁধে নিয়ে "ভয় নাই", "ভয় নাই" বলতে বলতে সে দুরন্ত নদী পার হয়ে গেল।

কিন্তু এবারেই শেষ পার। ওপারে যেমনি যাওয়া অমনি তার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে পড়ল, চোখ যেন ঝাপসা হয়ে গেল, গলার স্বর জড়িয়ে এল। তারপর যখন সে তাকাল তখন দেখল, ঝড় নেই আঁধার নেই, সেই ছোট শিশুটিও নেই—আছেন শুধু এক মহাপুরুষ, মাথায় তাঁর আলোর মুকুট। তিনি বললেন, "আমিই ক্রুশের মানুষ—আমিই আজ তোমায় ডাক দিয়েছি। এতদিন এত লোক পার করেছ, আজ আমায় পার করতে গিয়ে নিজেও পার হলে, আর তারি সঙ্গে শয়তানের পাপের বোঝা কত যে পার করেছ তা তুমিও জান না। আজ হতে তোমার অফেরো নাম ঘুচল; এখন তুমি Saint Christopher—সাধু খৃষ্টবাহন! যাও, স্বর্গের যাঁরা শ্রেষ্ঠ সাধু, তাঁদের মধ্যে তুমি আনন্দে বাস কর।"

নাপিত পণ্ডিত

বাগদাদ শহরে এক ধনীর ছেলে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল—সে কাজীর মেয়েকে বিবাহ করিবে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করা যত সহজ, কাজটা তত সহজ নয়—সুতরাং কিছুদিন চেষ্টা করিয়াই সে বেচারা একেবারে হতাশ হইয়া পড়িল। দিনে আহার নাই, রাত্রে নিদ্রা নাই—তার কেবলই ঐ এক চিন্তা—কী করিয়া কাজীর মেয়েকে বিবাহ করা যায়।

বিবাহের সব চাইতে বড় বাধা কাজী সাহেব স্বয়ং। সকলেই বলে, "বাপু হে! কাজী সাহেব এ স্পর্ধার কথা জানতে পারলে তোমার একটি হাড় আস্ত রাখবেন না।" বেচারা কী করে? ক্রমাগত ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে রীতিমত জ্বর আনিয়া ফেলিল—বন্ধু-বান্ধব বলিতে লাগিল, "ছোকরা বাঁচলে হয়।" ইহার মধ্যে হঠাৎ একদিন এক বুড়ি আসিয়া খবর দিল, বিবাহের সমস্তই ঠিক। কাজী সাহেবকে না জানাইয়াই এখন চুপচাপ বিবাহটা হইয়া যাক—তারপর সুবিধামত তাঁহাকে খবর দেওয়া যাইবে; তখন তিনি গোল করিয়া করিবেন কি? সে আরও বলিল, "শুক্রবার সন্ধ্যার সময় কাজী সাহেব বাড়ি থাকবেন না—সেই সময় বিয়েটা সেরে ফেল—কিন্তু খবরদার! কাজীসাহেব যেন এসব কথার বিন্দুমাত্রও জানতে না পারেন।"

শুক্রবার দিন ভোর না হইতে বর বেচারা হাত মুখ ধুইয়া প্রস্তুত, সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহার আর সবুর সয় না। দুপুর না হইতেই সে চাকরকে বলিল, "একটা নাপিত ডেকে আন্। এখন থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকি।" চাকর তাড়াতাড়ি কোথা হইতে এক নাপিত আনিয়া হাজির করিল।

নাপিত আসিয়াই বরকে বলিল, "আপনাকে বড় কাহিল দেখছি—যদি অনুমতি করেন ত' ছুরি দিয়ে বাঁ হাতের একটুখানি রক্ত ছাড়িয়ে দিই—তা হলেই সমস্ত শরীরটা ঠাণ্ডা বোধ করবেন।" বর বলিল, "না হে, তোমাকে চিকিৎসার জন্য ডাকি নাই—আমার দাড়িটা একটু চট্‌পট্ কামিয়ে দাও দেখি।" নাপিত তখন তাহার সরঞ্জামের থলি খুলিয়া অনেকগুলা ক্ষুর বাহির করিল, তারপর প্রত্যেকটা ক্ষুর হাতে লইয়া বার বার করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। এইরূপে অনেক সময় নষ্ট করিয়া সে একটা বাটির মত কী একটা বাহির করিল। বর ভাবিল, এইবার বাটিতে জল দিয়া কামান শুরু করিবে। কিন্তু নাপিত তাহার কিছুই করিল না; সে অদ্ভুত একটা কাঁটা-কম্পাসের মানযন্ত্র লইয়া ঘরের বাহিরে উঠানের মাঝখানে গিয়া, সূর্যের গতিবিধির কী সব হিসাব করিতে লাগিল। তারপর আবার গম্ভীরভাবে ঘরে আসিয়া বলিল, "মহাশয়, হিসাব ক'রে দেখলাম, এই বৎসর এই মাসে এই শুক্রবারের ঠিক এই সময়টি অতি চমৎকার শুভক্ষণ—দাড়ি কামাবার উপযুক্ত সময়। কিন্তু আজ মঙ্গল বুধ গ্রহ-সংযোগ হওয়াতে আপনার কিছু বিপদের সম্ভাবনা দেখছি।"

কাজের সময় এরকম বক্‌বক্ করিলে কাহার না রাগ হয়? বিবাহার্থী ছোকরাটি রাগিয়া বলিল, "বাপু হে, তোমাকে কি বক্তৃতা শোনাবার জন্য অথবা জ্যোতিষ গণনার জন্য ডাকা হয়েছে? কামাতে এসেছ, কামিয়ে যাও।" কিন্তু নাপিত ছাড়িবার পাত্রই নয়, সে অভিমান করিয়া বলিল, "মশাই, এ রকম অন্যায় রাগ আপনার শোভা পায় না। আপনি জানেন আমি কে? আপনি কি জানেন যে বাগদাদ শহরে আমার মত দ্বিতীয় আর কেউ নাই? আমার গুণের কথা শুনবেন?

আমি একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক, রসায়ন শাস্ত্রে আমার অসাধারণ দখল, আমার জ্যোতিষ গণনা একেবারে নির্ভুল, নীতিশাস্ত্র ব্যাকরণশাস্ত্র তর্কশাস্ত্র, এ সমস্তই আমার কণ্ঠস্থ, জ্যামিতি থেকে শুরু ক'রে বীজগণিত পাটিগণিত পর্যন্ত গণিতশাস্ত্রের কোন তত্ত্বই জানতে বাকি রাখি নি। তার উপর আবার আমি একজন পাকা দার্শনিক পণ্ডিত, আর আমি যে সকল কবিতা রচনা করি, সমঝদার লোকের মুখে তার সুখ্যাতি আর ধরে না।"—নাপিতের এই বক্তৃতার দৌড় দেখিয়া ছোকরাটি ভীষণ রাগের মধ্যেও হাসিয়া ফেলিল। সে বলিল, "তোমার বক্তৃতা শুনবার ফুরসৎ আমার নাই—তুমি কামান শেষ করবে কি না বল, না কর চলে যাও।" নাপিত বলিল, "এই কি আপনার উপযুক্ত কথা হল? আমি কি আপনাকে ডাকতে এসেছিলাম, না আপনি নিজেই লোক পাঠিয়ে আমাকে ডাকিয়ে ছিলেন? এখন আমি আপনাকে না কামিয়ে গেলে, আমার মান সম্ভ্রম থাকে কি ক'রে? আপনি সেদিনকার ছেলে, আপনি এসবের কদর বুঝবেন কি? আপনার বাবা যদি আজ থাকতেন, তবে আমাকে ধন্য ধন্য বলতেন—কারণ তাঁর কাছে কোন দিনই আমার সম্মানের ত্রুটি হয় নি। আমার এ সকল অমূল্য উপদেশ শুনবার সৌভাগ্য সকলে পায় না—তিনি তা বেশ বুঝতেন। আহা, তিনি কী চমৎকার লোকই ছিলেন! আমার কথাগুলি কত আগ্রহ ক'রে তিনি শুনতেন! আর কত খাতির, কত তোয়াজ ক'রে কত অজস্র বকশিস্ দিয়ে তিনি আমায় খুসি রাখতেন। আপনি ত' সে সব খবর রাখেন না।" এই রকম বক্তৃতায় সে আরও আধঘন্টা সময় কাটাইয়া দিল। এদিকে বেলাও বাড়িতেছে, বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে; কাজেই বর একেবারে সপ্তমে চড়িয়া বলিল, "যাও! যাও! তোমায় কামাতে হবে না।"

নাপিত তখন তাড়াতাড়ি ক্ষুর লইয়া কামাইতে শুরু করিল। কিন্তু ক্ষুরের দুই চার টান দিয়াই সে আবার থামিয়া বলিল, "মশাই! ওরকম রাগ করা ভাল নয়। ভেবে দেখুন, জ্ঞানে গুণে বয়সে সব বিষয়েই আপনি ছেলেমানুষ। তবে অবশ্যি, আপনার যে রকম তাড়া দেখছি, তাতে বোধহয় আপনি আজকে একটু বিশেষ ব্যস্ত আছেন। এ রকম ব্যস্ততার কারণটা কী জানতে পারলে, আমি সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে ঠিক ভালমত ব্যবস্থা করতে পারি।" এই বলিয়াই সে আবার তাহার মানযন্ত্র লইয়া হিসাব করিতে লাগিল। যতই তাড়া দেওয়া যায়, ততই সে বলে, "এই, হিসাবটা হল ব'লে।" তখন বেগতিক দেখিয়া বর বলিল, "আরে, ব্যাপারটা কিছু নয়—আজ রাত্রে আমার এক জায়গায় নিমন্ত্রণ আছে—তাই, বড় তাড়াতাড়ি।"

এই কথা শুনিবা মাত্র নাপিত একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। সে বলিল, "ভাগ্যিস্ মনে করিয়ে দিলেন! আমার বাড়িতেও যে আজ ছয়জন লোককে নেমন্তন্ন করে এসেছি! তাদের জন্য ত' কোনরকম বন্দোবস্ত ক'রে আসি নি। এখন, মনে করুন, মাংস কিনতে হবে, রাঁধবার ব্যবস্থা করতে হবে, মিঠাই আনতে হবে;—কখন বা এসব করি, আর কখনই বা আপনাকে কামাই।" বর দেখিল আবার বেগতিক, সে নিরুপায় হইয়া বলিল, "দোহাই তোমার। আর আমায় ঘাঁটিও না—আমার চাকরকে বলে দিচ্ছি—তোমার যা কিছু চাই আমার ভাঁড়ার থেকে সমস্তই সে বা'র ক'রে দেবে—তার জন্য তুমি মিথ্যে ভেব না।" নাপিত বলিল, "এ অতি চমৎকার কথা। দেখুন, হামামের মালিশওয়ালা জান্তোৎ—আর ঐ যে কড়াইশুঁটি বিক্রী করে, সালি—আর ঐ শিম বেচে, সাল্তোৎ—আর আখের শা তরকারিওয়ালা আর আবু মেকারেজ ভিস্তি আর পাহারাদার কাশেম—এরা সবাই ঠিক আমার মত আমুদে—এরা কখনও মুখ হাঁড়ি করে থাকে না; তাই এদের আমি নেমন্তন্ন করেছি। আর এদের একটা বিশেষ গুণ

যে, এরা ঠিক আমারই মত চুপচাপ থাকে—বেশী বক্‌বক্ করতে ভাল বাসে না। এক একজন লোক থাকে তারা সব সময়েই বকর্ বকর্ করছে—আমি তাদের দু চক্ষে দেখতে পারি নে। এরা কেউ সে রকম নয়; তবে নাচতে আর গাইতে এরা সবাই ওস্তাদ। জান্তৌং কি রকম ক'রে নাচে দেখবেন? ঠিক এই রকম"—এই বলিয়া সে অদ্ভুত ভঙ্গিতে নৃত্য ও বিকট সুরে গান করিতে লাগিল। কেবল তাহাই নয়, ঐ ছয়জন বন্ধুর মধ্যে প্রত্যেকে কি রকম করিয়া নাচে ও গায়, তাহার নকল দেখাইয়া তবে সে ছাড়িল। তারপর, হঠাৎ সে ক্ষুরটুর ফেলিয়া ভাঁড়ার ঘরে চাকরের কাছে তাহার নিমন্ত্রণের ফর্দ দিতে ছুটিল। বর ততক্ষণে আধ কামান অবস্থায় ক্ষেপিয়া পাগলের মত হইয়াছে, কিন্তু নাপিত তাহার কথায় কানও দেয় না। সে গম্ভীরভাবে ঘরের হাঁস মুরগী তরিতরকারি হালুয়া মিঠাই সব বাছিয়া বাছিয়া পছন্দ করিতে লাগিল। তারপর আরও অনেক গল্প আর অনেক উপদেশ শুনাইয়া অতি ধীর মেজাজে সাড়ে চার ঘন্টায় সে তাহার কামান শেষ করিল। আবার যাইবার সময় বলিয়া গেল, "দেখুন, আমার মত এমন বিজ্ঞ, এমন শান্ত, এমন অল্পভাষী হিতৈষী বন্ধু আপনি পেয়েছেন, সেটা কেবল আপনার বাবার পুণ্যে। আজ হ'তে আমি আপনার কেনা হয়ে রইলুম।"

নাপিতের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া বর দেখিল, আর সময় নাই। সে তাড়াতাড়ি বিবাহ করিতে বাহির হইল। লোকজন সঙ্গে লইল না, এবং কাহাকেও খবর দিল না; পাছে কথাটা কোন গতিকে কাজী সাহেবের কাছে ফাঁস হইয়া যায়।

এদিকে নাপিতও কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকে নাই। সে কেবল ভাবিতেছে, "না জানি সে কি রকম নেমন্তন্ন, যার জন্য সে এমন ব্যস্ত, যে আমার ভাল ভাল কথাগুলো পর্যন্ত শুনতে চায় না। ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে।" সুতরাং বর যখন সন্ধ্যার সময় বাহির হইল, নাপিতও তাহার পিছন পিছন লুকাইয়া চলিল।

বর সাবধানে কাজীর বাড়ি হাজির হইয়া খবর লইল যে কাজীসাহেব বাড়িতে নাই; এদিকে সব আয়োজন প্রস্তুত—তাড়াতাড়ি বিবাহ সারিতে হইবে। দৈবাৎ যদি কাজীসাহেব আসিয়া পড়েন, তাহার জন্য ছাতের উপর পাহারা বসান হইল, তাঁহাকে আসিতে দেখিলেই সে চিৎকার করিয়া সঙ্কেত করিবে এবং বরকে খিড়কী দরজা দিয়া পলাইতে হইবে। এদিকে কিন্তু হতভাগা নাপিতটা বাড়ির বাহিরে থাকিয়া যে আসে তাহাকেই বলে, "তোমরা সাবধানে থেক—আমাদের মনিবটি কেন জানি এই কাজীর বাড়িতে ঢুকেছেন—তাঁর জন্য আমার বড় ভাবনা হচ্ছে।"

বিবাহ আরম্ভ না হইতেই মুখে মুখে এই খবর রটিয়া বাড়ির চারিদিকে ভীড় জমিয়া গেল—তাহা দেখিয়া ছাতের উপরে সেই পাহারাদার ব্যস্তভাবে ডাক দিয়া উঠিল। আর কোথা যায়! তাহার গলার আওয়াজ পাওয়া মাত্র "কে আছিস রে, আমার মনিবকে মেরে ফেললে রে" বলিয়া নাপিত "হায় হায়" শব্দে আপনার চুল দাড়ি ছিঁড়িতে লাগিল। তাহার বিকট আর্তনাদে চারিদিকে এমন হৈ হৈ পড়িয়া গেল যে, স্বয়ং কাজীসাহেব পর্যন্ত গোলমাল শুনিয়া বাড়ি ছুটিয়া আসিলেন। সকলেই বলে ব্যাপার কি? নাপিত বলিল, "আর ব্যাপার কী। ঐ লক্ষ্মীছাড়া কাজী নিশ্চয়ই আমার মনিবকে মেরে ফেলেছে।" তখন মার মার করিয়া সকলে কাজীর বাড়িতে ঢুকিল। বর বেচারা পলাইবার পথ না পাইয়া, ভয়ে ও লজ্জায় একটা সিন্দুকের মধ্যে লুকাইয়া ছিল, নাপিত সেই হাজার লোকের মাঝখানে সিন্দুকের ভিতর হইতে "এই যে আমার মনিব" বলিয়া তাহাকে টানিয়া বাহির করিল। সে বেচারা এই অপমানে লজ্জিত হইয়া যতই সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইতে যায়, নাপিত ততই তাহার পিছন পিছন ছুটিতে থাকে আর বলে, "আরে মশাই, পালান কেন? কাজীসাহেবকে ভয় কিসের? আরে মশাই, থামুন না।" ব্যাপার দেখিয়া চারিদিকে লোকজন

হাসাহাসি ঠাট্টা তামাসা করিতে লাগিল। কাজীর মেয়েকে বিবাহ করিতে গিয়া, বিবাহ ত' হইলই না, মাঝে হইতে প্রাণপণে দৌড়াইতে গিয়া, হোঁচট খাইয়া বরের একটা ঠ্যাং খোঁড়া হইয়া গেল। এখানেও তাহার দুর্দশার শেষ নয়, নাপিতটা সহরের হাটে বাজারে সর্বত্র বাহাদুরি করিয়া বলিতে লাগিল, "দেখেছ? ওকে কি রকম বাঁচিয়ে দিলাম। সেদিন আমি না থাকলে কি কাণ্ডই না হ'ত। কাজীসাহেব যে রকম খ্যাপা মেজাজের লোক, কখন কী ক'রে বসত কে জানে। যা হোক, খুব বাঁচিয়ে দিয়েছি।" যে আসে তাহার কাছেই সে এই গল্প জুড়িয়া দেয়।

ক্রমে ছোকরাটির অবস্থা এমন হইল যে, সে কাহাকেও আর মুখ দেখাইতে পারে না—যাহার সঙ্গে দেখা হয় সেই জিজ্ঞাসা করে, "ভাই, কাজীর বাড়িতে তোমার কি হয়েছিল? শুনলাম ঐ নাপিত না থাকলে তুমি নাকি ভারি বিপদে পড়তে।" শেষটায় একদিন অন্ধকার রাত্রে বেচারা বাড়িঘর ছাড়িয়া বাগদাদ সহর হইতে পলাইল, এবং যাইবার সময় প্রতিজ্ঞা করিয়া গেল, "এমন দূর দেশে পলাইব, যেখানে ঐ হতভাগা নাপিতের মুখ দেখিবার আর কোন সম্ভাবনা না থাকে।"

বুদ্ধিমানের সাজা

আলি শাকালের মত ওস্তাদ আর ধূর্ত নাপিত সে সময়ে মেলাই ভার ছিল। বাগদাদের যত বড় লোক তাকে দিয়ে খেউরী করাতেন, গরিবকে সে গ্রাহ্যই করত না।

একদিন এক গরীব কাঠুরে ঐ নাপিতের কাছে গাধা বোঝাই ক'রে কাঠ বিক্রী করতে এল। আলি শাকাল কাঠুরেকে বলল, "তোমার গাধার পিঠে যত কাঠ আছে সব আমাকে দাও; তোমাকে এক টাকা দেব।" কাঠুরে তাতেই রাজী হয়ে গাধার পিঠের কাঠ নামিয়ে দিল। তখন নাপিত বলল, "সব কাঠ তো দাও নি; গাধার পিঠের 'গদি'টা কাঠের তৈরী; ওটাও দিতে হবে।" কাঠুরে তো কিছুতেই রাজী হলো না; কিন্তু নাপিত তার আপত্তি গ্রাহ্য না ক'রে গদিটা জবরদস্তি ক'রে কেড়ে নিয়ে, কাঠুরেকে এক টাকা দিয়ে বিদায় করে দিল।

কাঠুরে বেচারা আর কি করে? সে গিয়ে খালিফের কাছে তার নালিশ জানাল। খালিফ বললেন, "তুমি তো 'গাধার পিঠের সমস্ত কাঠ' দিতে রাজী ছিলে; তবে আর এখন আপত্তি করছ কেন? কথামতই তো কাজ হয়েছে।" তারপর কাঠুরের কানে ফিস্ ফিস্ ক'রে কি জানি বললেন; কাঠুরেও মুচ্‌কি হেসে, "যো হুকুম" বলে সেলাম ঠুকে চলে গেল।

কিছুদিন বাদে কাঠুরে আবার নাপিতের কাছে এসে বলল, "নাপিত সাহেব, আমি আর আমার সঙ্গীকে খেউরী করার জন্য তোমাকে ১০্ টাকা দেব, তোমার মত ওস্তাদের হাতে অনেক বেশি টাকা দিয়েও খেউরী হ'তে পারলে জন্ম সার্থক হয়. তুমি কি রাজী আছ?" নাপিত তো খোসামোদে ভুলে, কাঠুরেকে কামিয়ে চট্‌পট্ দিল; তারপর তাকে বলল, "কৈ হে তোমার সঙ্গী?" কাঠুরে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে তার গাধাটি এনে হাজির করল। নাপিত তো বেজায় চটে গিয়ে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে, ঘুঁষি বাগিয়ে বলল, "এত বড় বেয়াদবি আমার সঙ্গে! সুলতান, খালিফ, আগা, বেগ যার হাতে খেউরী হবার জন্য সর্বদাই খোসামোদ করে, সে কিনা গাধাকে কামাবে! বেরোও এখনি এখান থেকে!"

কাঠুরে নাপিতের কথার কোন উত্তর না দিয়ে সটান গিয়ে খালিফের কাছে হাজির। খালিফ তার নালিশ শুনে আলি শাকালকে ডেকে পাঠালেন। নাপিত এসেই হাত জোড় করে বলল, "দোহাই ধর্মাবতার! গাধাকে কি কখনও মানুষের সঙ্গী ব'লে ধরা যেতে পারে?" খালিফ বললেন,

"তা' না হ'তেও পারে, কিন্তু গাধার পিঠের গদিও কি কখনও কাঠের বোঝার মধ্যে ধরা যেতে পারে? তুমিই একথার জবাব দাও।" নাপিত তো একেবারে চুপ! কিছুক্ষণ বাদে খালিফ বললেন, "আর দেরি কেন? গাধাকে কামিয়ে ফেল; কথা-মত কাজ না করতে পারলে তার উচিত সাজার ব্যবস্থা হবে জানই তো।"

নাপিত বেচারা আর করে কি? গাধাকে বেশ ক'রে খুর বুলিয়ে কামাতে লাগল। সেই তামাসা দেখবার জন্য চারিদিকে ভিড় জমে গেল। কামান শেষ হতেই নাপিত অপমানে মাথা হেঁট ক'রে বাড়ি পালাল। কাঠুরেও নেড়া গাধায় চ'ড়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে বাড়ি পালাল।

হারকিউলিস

মহাভারতে যেমন ভীম, গ্রীস দেশের পুরাণে তেমনই হারকিউলিস। হারকিউলিস দেবরাজ জুপিটারের পুত্র কিন্তু তাঁর মা এই পৃথিবীরই এক রাজকন্যা, সুতরাং তিনিও ভীমের মত এই পৃথিবীরই মানুষ, গদাযুদ্ধে আর মল্লযুদ্ধে তাঁর সমান কেহ নাই। মেজাজটি তাঁর ভীমের চাইতেও অনেকটা নরম, কিন্তু তাঁর এক একটি কীর্তি এমনই অদ্ভুত যে, পড়িতে পড়িতে ভীম, অর্জুন, কৃষ্ণ আর হনুমান এই চার মহাবীরের কথা মনে পড়ে।

হারকিউলিসের জন্মের সংবাদ যখন স্বর্গে পৌঁছিল, তখন তাঁর বিমাতা জুনো দেবী হিংসায় জ্বলিয়া বলিলেন, "আমি এই ছেলের সর্বনাশ করিয়া ছাড়িব।" জুনোর কথামত দুই প্রকাণ্ড বিষধর সাপ হারকিউলিসকে ধ্বংস করিতে চলিল। সাপ যখন শিশু হারকিউলিসের ঘরে ঢুকিল, তখন তাহার ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখিয়া ঘরসুদ্ধ লোকে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল, কেহ শিশুকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা করিতে পারিল না। কিন্তু হারকিউলিস নিজেই তাঁর দুইখানি কচি হাত বাড়াইয়া সাপ দুটার গলায় এমন চাপিয়া ধরিলেন যে, তাহাতেই তাদের প্রাণ বাহির হইয়া গেল। জুনো বুঝিলেন, এ বড় সহজ শিশু নয়!

বড় হইয়া হারকিউলিস সকল বীরের গুরু বৃদ্ধ চীরণের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখিতে গেলেন। চীরণ জাতিতে সেণ্টর—তিনি মানুষ নন। সেণ্টরদের কোমর পর্যন্ত মানুষের মত, তার নীচে একটা মাথাকাটা ঘোড়ার শরীর বসান। চীরণের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখিয়া হারকিউলিস অসাধারণ যোদ্ধা হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'এইবার পৃথিবীটাকে দেখিয়া লইব।'

হারকিউলিস পৃথিবীতে বীরের উপযুক্ত কাজ খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন, এমন সময় দুটি আশ্চর্য সুন্দর মূর্তি তাঁর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হারকিউলিস দেখিলেন দুটি মেয়ে—তাদের মধ্যে একজন খুব চঞ্চল, সে নাকে-চোখে কথা কয়, তার দেমাকের ছটায় আর অলঙ্কারের বাহারে যেন চোখ ঝলসাইয়া দেয়। সে বলিল, "হারকিউলিস, আমাকে তুমি সহায় কর, আমি তোমায় ধন দিব, মান দিব, সুখে স্বচ্ছন্দে আমোদে আহ্লাদে দিন কাটাইবার উপায় করিয়া দিব।" আর একটি মেয়ে শান্তশিষ্ট, সে বলিল, "আমি তোমাকে বড় বড় কাজ করিবার সুযোগ দিব, শক্তি দিব, সাহস দিব। যেমন বীর তুমি তার উপযুক্ত জীবন তোমায় দিব।" হারকিউলিস খানিক চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমি ধন মান সুখ চাই না—আমি তোমার সঙ্গেই চলিব। কিন্তু, তোমার পরিচয়

জানিতে চাই।" তখন দ্বিতীয় সুন্দরী বলিল, "আমার নাম পুণ্য। আজ হইতে আমি তোমার সহায় থাকিলাম।"

তারপর কত বৎসর হারকিউলিস দেশে দেশে কত পুণ্য কাজ করিয়া ফিরিলেন—তাঁর গুণের কথা আর বীরত্বের কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। থেবিসের রাজা ক্রয়ন্ তাঁর সঙ্গে তাঁর কন্যা মেগারার বিবাহ দিলেন। হারকিউলিস নিজের পুণ্য ফলে কয়েক বৎসর সুখে কাটাইলেন।

কিন্তু বিমাতা জুনোর মনে হারকিউলিসের এই সুখ কাঁটার মত বিঁধিল। তিনি কী চক্রান্ত করিলেন, তাহার ফলে একদিন হারকিউলিস হঠাৎ পাগল হইয়া তাঁর স্ত্রী পুত্র সকলকে মারিয়া ফেলিলেন। তারপর যখন তাঁর মন সুস্থ হইল, যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে পাগল অবস্থায় কি সর্বনাশ করিয়াছেন, তখন শোকে অস্থির হইয়া এক পাহাড়ের উপরে নির্জন বনে গিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'আর বাঁচিয়া লাভ কি?'

হারকিউলিস দুঃখে বনবাসী হইয়াছেন, এদিকে জুনো ভাবিতেছেন, 'এখনও যথেষ্ট হয় নাই।' তিনি দেবতাদের কুমন্ত্রণা দিয়া এই ব্যবস্থা করাইলেন যে, এক বৎসর সে আর্গসের দুর্দান্ত রাজা ইউরিসথিউসের দাসত্ব করিবে।

হারকিউলিস প্রথমে এই অন্যায় আদেশ পালন করিতে রাজী হন নাই—কিন্তু দেবতার হুকুম লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই দেখিয়া, শেষে তাহাতেই সম্মত হইলেন। রাজা ইউরিসথিউস্ ভাবিলেন, এইবার হারকিউলিসকে হাতে পাওয়া গিয়াছে। ইহাকে দিয়া এমন সব অদ্ভুত কাজ করাইয়া লইব, যাহাতে আমার নাম পৃথিবীতে অমর হইয়া থাকিবে।

নেমিয়ার জঙ্গলে এক দুর্দান্ত সিংহ ছিল, তার দৌরাত্ম্যে দেশের লোক অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। রাজা ইউরিসথিউস্ বলিলেন, "যাও হারকিউলিস! সিংহটাকে মারিয়া আইস।" হারকিউলিস সিংহ মারিতে চলিলেন। "কোথায় সেই সিংহ?" পথে যাকে জিজ্ঞাসা করেন সেই বলে, "কেন বাপু সিংহের হাতে প্রাণ দিবে? সে সিংহকে কি মানুষে মারিতে পারে? আজ পর্যন্ত যে-কেহ সিংহ মারিতে গিয়াছে সে আর ফিরে নাই।" কিন্তু হারকিউলিস ভয় পাইলেন না। তিনি একাকী গভীর বনে সিংহের গহ্বরে ঢুকিয়া, সিংহের টুঁটি চাপিয়া তাহার প্রাণ বাহির করিয়া দিলেন। তারপর সেই সিংহের চামড়া পরিয়া তিনি রাজার কাছে সংবাদ দিতে ফিরিলেন।

রাজা বলিলেন, "এবার যাও লের্নার জলাভূমিতে। সেখানে হাইড্রা নামে সাতমুন্ড সাপ আছে, তাহার ভয়ে লোকজন দেশ ছাড়িয়া পলাইতেছে। জন্তুটাকে না মারিলে ত আর চলে না!" হারকিউলিস তৎক্ষণাৎ সাতমুণ্ড জানোয়ারের সন্ধানে বাহির হইলেন।

লের্নার জলাভূমিতে গিয়া আর সন্ধান করিতে হইল না, কারণ, হাইড্রা নিজেই ফোঁস ফোঁস্ শব্দে আকাশ কাঁপাইয়া তাঁকে আক্রমণ করিতে আসিল। হারকিউলিস এক ঘায়ে তার একটা মাথা উড়াইয়া দিলেন—কিন্তু, সে কি সর্বনেশে জানোয়ার—সেই একটা কাটা মাথার জায়গায় দেখিতে দেখিতে সাতটা নূতন মাথা গজাইয়া উঠিল। হারকিউলিস দেখিলেন, এ জন্তু সহজে মরিবার নয়। তিনি তাঁহার সঙ্গী ইয়োলাসকে বলিলেন, "একটা লোহা আগুনে রাঙাইয়া আন ত।" তখন জ্বলন্ত গরম লোহা আনাইয়া তারপর হাইড্রার এক একটা মাথা উড়াইয়া কাটা জায়গায় লোহার ছ্যাঁকা দিয়া পোড়াইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এত করিয়াও নিস্তার নাই, শেষ একটা মাথা আর কিছুতেই মরিতে চায় না—সাপের শরীর হইতে একেবারে আলগা হইয়াও সে সাংঘাতিক হাঁ করিয়া কামড়াইতে আসে। হারকিউলিস তাহাকে পিটিয়া মাটিতে পুঁতিয়া, তাহার উপর প্রকাণ্ড

পাথর চাপা দিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন। ফিরিবার আগে হারকিউলিস সেই সাপের রক্তে কতগুলা তীরের মুখ ডুবাইয়া লইলেন, কারণ, তাঁহার গুরু চীরণ বলিয়াছেন—হাইড্রার রক্তমাখা তীর একেবারে অব্যর্থ মৃত্যুবাণ।

হারকিউলিস ইউরিসথিউসের দেশে ফিরিয়া গেলে পর, কিছুদিন বাদেই আবার তাঁর ডাক পড়িল। এবারে রাজা বলিলেন, "সেরিনিয়ার হরিণের কথা শুনিয়াছি, তার সোনার শিং, লোহার পা, সে বাতাসের আগে ছুটিয়া চলে। সেই হরিণ আমার চাই—তুমি তাহাকে জীবন্ত ধরিয়া আন।" হারকিউলিস আবার চলিলেন। কত দেশ দেশান্তর, কত নদী সমুদ্র পার হইয়া, দিনের পর দিন সেই হরিণের পিছন ঘুরিয়া ঘুরিয়া, শেষে উত্তরের ঠাণ্ডা দেশে বরফের মধ্যে হরিণ যখন শীতে অবশ হইয়া পড়িল, তখন হারকিউলিস সেখান হইতে তাকে উদ্ধার করিয়া রাজার কাছে হাজির করিলেন।

ইহার পর রাজা হুকুম দিলেন, এরিম্যান্থাসের রাক্ষসবরাহকে মারিতে হইবে। সে বরাহ খুবই ভীষণ বটে, কিন্তু তাকে মারিতে হারকিউলিসের বিশেষ কোন ক্লেশ হইবার কথা নয়। তা ছাড়া, বরাহ পলাইবার পাত্র নয়, সুতরাং তার জন্য দেশ বিদেশে ছুটিবারও দরকার হয় না। হারকিউলিস সহজেই কার্যোদ্ধার করিতে পারিতেন, কিন্তু মাঝ হইতে একদল হতভাগা সেন্টর আসিয়া তাঁর সহিত তুমুল ঝগড়া বাধাইয়া বসিল। হারকিউলিস তখন সেই হাইড্রার রক্ত-মাখান বিষবাণ ছুঁড়িয়া তাদের মারিতে লাগিলেন। এদিকে বৃদ্ধ চীরণের কাছে খবর গিয়াছে যে, হারকিউলিস নামে কে একটা মানুষ আসিয়া সেন্টরদের মারিয়া শেষ করিল। চীরণ তখনই ঝগড়া থামাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া দৌড়িয়া আসিতেছেন, এমন সময়, হঠাৎ হারকিউলিসের একটা তীর ছুটিয়া তাঁর গায়ে বিঁধিয়া গেল। সকলে হায় হায় করিয়া উঠিল, হারকিউলিসও অস্ত্র ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন। সেন্টরেরা অনেকরকম ঔষধ জানে, হারকিউলিসও তাঁর গুরুর কাছে অস্ত্রাঘাতের নানারকম চিকিৎসা শিখিয়াছেন—কিন্তু সে বিষবাণ এমন সাংঘাতিক, তাঁর কাছে কোন চিকিৎসাই খাটিল না। চীরণ আর বাঁচিলেন না। এবার হারকিউলিস তাঁর কাজ সারিয়া, নিতান্ত বিষণ্ণ মনে গুরুর কথা ভাবিতে ভাবিতে দেশে ফিরলেন।

হারকিউলিস একা সেন্টরদের যুদ্ধে হারাইয়াছেন, এই সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সকলে বলিল, "হারকিউলিস না জানি কত বড় বীর! এমন আশ্চর্য কীর্তির কথা আমরা আর শুনি নাই।" আসলে কিন্তু হারকিউলিসের বড় বড় কাজ এখনও কিছুই করা হয় নাই—তাঁর কীর্তির পরিচয় সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে।

বরাহ মারিয়া হারকিউলিস অল্পই বিশ্রাম করিবার সুযোগ পাইলেন—কারণ তারপরই এলিস নগরের রাজা আগিয়াসের গোয়ালঘর সাফ করিবার জন্য তাঁহার ডাক পড়িল। আগিয়াসের প্রকাণ্ড গোয়ালঘরে অসংখ্য গরু, কিন্তু বহু বৎসর ধরিয়া সে ঘর কেহ ঝাঁট দেয় না, ধোয় না—সুতরাং তাহার চেহারাটি তখন কেমন হইয়াছিল, তাহা কল্পনা করিয়া দেখ। গোয়ালঘরের অবস্থা দেখিয়া হারকিউলিস ভাবনায় পড়িলেন। প্রকাণ্ড ঘর, তাহার ভিতর হাঁটিয়া দেখিতে গেলেই ঘন্টাখানেক সময় যায়। সেই ঘরের ভিতর হয়ত বিশ বৎসরের আবর্জনা জমিয়াছে—অথচ একজন মাত্র লোকে তাকে সাফ করিবে। ঘরের কাছ দিয়া আলফিউস্ নদী স্রোতের জোরে প্রবল বেগে বহিয়া চলিয়াছে—হারকিউলিস ভাবিলেন—'এই ত চমৎকার উপায় হাতের কাছেই রহিয়াছে!' তিনি তখন একাই গাছ পাথরের বাঁধ বাঁধিয়া স্রোতের মুখ ফিরাইয়া, নদীটাকে সেই গোয়ালঘরের উপর দিয়া চালাইয়া দিলেন। নদী হু হু শব্দে নূতন পথে বহিয়া চলিল, বিশ বৎসরের জঞ্জাল মুহূর্তের মধ্যে ধুইয়া সাফ হইয়া গেল। তারপর যেখানকার নদী সেখানে রাখিয়া তিনি দেশে ফিরিলেন।

এদিকে ক্রীটদ্বীপে আর এক বিপদ দেখা দিয়াছে। জলের দেবতা নেপচুন সে দেশের রাজাকে এক প্রকাণ্ড ষাঁড় উপহার দিয়া বলিয়াছিলেন, "এই জন্তুটিকে তুমি দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়া বলি দাও।" কিন্তু ষাঁড়টি এমন আশ্চর্যরকম সুন্দর যে তাকে বলি দিতে রাজার মন সরিল না—তিনি তার বদলে আর একটি ষাঁড় আনিয়া বলির কাজ সারিলেন। নেপচুন সমুদ্রের নীচে থাকিয়াও এ সমস্তই জানিতে পারিলেন। তিনি তাঁর ষাঁড়কে আদেশ দিলেন, "যাও! এই দুষ্ট রাজার রাজ্য ধ্বংস করিয়া ইহার অবাধ্যতার সাজা দাও।" নেপচুনের আদেশে সেই সর্বনেশে ষাঁড় পাগলের মত চারিদিকে ছুটিয়া সারাটি রাজ্য উজাড় করিয়া ফিরিতেছে। একে দেবতার ষাঁড়, তার উপর যেমন পাহাড়ের মত দেহখানি, তেমনই আশ্চর্য তার শরীরের তেজ—কাজেই রাজ্যের লোক প্রাণভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলাইবার জন্য ব্যস্ত। এমন জন্তুকে বাগাইবার জন্য ত হারকিউলিসের ডাক পড়িবেই। হারকিউলিসও অতি সহজেই তাকে শিং ধরিয়া মাটিতে আছড়াইয়া একেবারে পোঁটলা বাঁধিয়া রাজসভায় নিয়া হাজির করিলেন। রাজা ইউরিসথিউসের মেয়ে বাপের বড় আদুরে। সে একদিন আব্দার ধরিল তাকে হিপোলাইটের চন্দ্রহার আনিয়া দিতে হইবে। হিপোলাইট এসেজন্‌দের রানী। এসেজন্‌দের দেশে কেবল মেয়েদেরই রাজত্ব। বড় সর্বনেশে মেয়ে তারা—সর্বদাই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত, পৃথিবীর কোন মানুষকে তারা ডরায় না। কিন্তু হারকিউলিসকে তারা খুব খাতির সম্মান করিয়া তাদের রানীর কাছে লইয়া গেল। হারকিউলিস তখন রানীর কাছে তাঁর প্রার্থনা জানাইলেন। রানী বলিলেন, "আজ তুমি খাও-দাও, বিশ্রাম কর, কাল অলঙ্কার লইতে আসিও।" হারকিউলিসের সৎমা জুনো দেবী দেখিলেন, নেহাৎ সহজেই বুঝি এবারের কাজটা উদ্ধার হইয়া যায়। তিনি নিজে এসেজন্ সাজিয়া এসেজন্ দলে ঢুকিয়া, সকলকে কুমন্ত্রণা দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "এই যে লোকটি রানীর কাছে অলঙ্কার ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে ইহাকে তোমরা বড় সহজ পাত্র মনে করিও না। আসলে কিন্তু এ লোকটা আমাদের রানীকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতে চায়। অলঙ্কার-টলঙ্কার ওসকল মিথ্যা কথা—কেবল তোমাদের ভুলাইবার জন্য।" তখন সকলে রুখিয়া একেবারে মার মার শব্দে হারকিউলিসকে আক্রমণ করিল। হারকিউলিস একাকী গদা হাতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর এসেজন্‌রা বুঝিল, হারকিউলিসের সঙ্গে পারিয়া উঠা তাহাদের সাধ্য নয়। তখন তাহারা রানীর চন্দ্রহার হারকিউলিসকে দিয়া বলিল, "যে অলঙ্কার তুমি চাহিয়াছিলে, এই লও। কিন্তু তুমি এদেশে আর থাকিতে পাইবে না।" হারকিউলিসের কাজ উদ্ধার হইয়াছে, তাঁর আর থাকিবার দরকার কি? তিনি তখনই তাদের নমস্কার করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

ইউরিসথিউস্ মহা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "হারকিউলিস! আমি তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি আমার জন্য আটটি বড় কাজ করিলে, এখন আর চারিটি কাজ করিলে তোমার ছুটি। প্রথম কাজ এই যে, স্টাইমফেলাসের সমুদ্রতীরে যে বড় বড় লৌহমুখ পাখি আছে, সেগুলাকে মারিতে হইবে।" হারকিউলিস হাইড্রার রক্তমাখা বিষাক্ত তীর ছুঁড়িয়া সহজেই পাখিগুলাকে মারিয়া শেষ করিলেন।

ইহার পর তিনি রাজার হুকুমে গেরিয়ানিস নামে এক দৈত্যের গোয়াল হইতে তার গরুর দল কাড়িয়া আনিলেন। পথে ক্যাকাস্ নামে একটা কদাকার দৈত্য কয়েকটা গরু চুরি করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। হারকিউলিস তাকে তার বাসা পর্যন্ত তাড়া করিয়া, শেষে গদার বাড়িতে তাহার মাথা গুঁড়াইয়া দেন।

পশ্চিমের দেবতা সন্ধ্যাতারার মেয়েদের নাম হেস্‌পেরাইডিস্। লোকে বলিত, তাদের বাগানে আপেল গাছে সোনার ফল ফলে। একদিন রাজা সেই ফল হারকিউলিসের কাছে চাহিয়া বসিলেন।

এমন কঠিন কাজ হারকিউলিস আর করেন নাই। ফলের কথা সকলেই জানে, কিন্তু কোথায় যে সে ফল, আর কোথায় যে সে আশ্চর্য বাগান, কেউ তাহা বলিতে পারে না। হারকিউলিস দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া কেবলই জিজ্ঞাসা করিয়া ফিরিতে লাগিলেন, কিন্তু কেউ তার জবাব দিতে পারে না। কত দেশের কত রকম লোকের সঙ্গে তাঁর দেখা হইল, সকলেই বলে, "হাঁ, সেই ফলের কথা আমরাও শুনিয়াছি, কিন্তু কোথায় সে বাগান তাহা জানি না।" এই রূপে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন হারকিউলিস এক নদীর ধারে আসিয়া দেখিলেন, কয়েকটি মেয়ে বসিয়া ফুলের মালা গাঁথিতেছে। হারকিউলিস বলিলেন, "ওগো, তোমরা হেস্‌পেরাইডিসের বাগানের কথা জান? সেই যেখানে আপেল গাছে সোনার ফল ফলে?" মেয়েরা বলিল, "আমরা নদীর মেয়ে, নদীর জলে থাকি—আমরা কি দুনিয়ার খবর রাখি? আসল খবর যদি চাও তবে বুড়ার কাছে যাও।" হারকিউলিস বলিলেন, "কে বুড়া? সে কোথায় থাকে?" মেয়েরা বলিল, "সুমদ্রের থুড়্‌থুড়ে বুড়া, যার সবুজ রঙের জটা, যার গায়ে মাছের মত আঁশ, যার হাত-পাগুলো হাঁসের মত চ্যাটাল—সে বুড়া যখন তীরে ওঠে তখন যদি তাকে ধরিতে পার, তবে সে তোমায় বলিতে পারিবে পৃথিবীর কোথায় কি আছে। কিন্তু খবরদার! বুড়া বড় সেয়ানা, তাকে ধরিতে পারিলে খবরটা আদায় না করিয়া ছেড়ো না।" হারকিউলিস তাদের অনেক ধন্যবাদ দিয়া বুড়ার খবর লইতে চলিলেন। সুমদ্রের তীরে তীরে খুঁজিতে খুঁজিতে একদিন হারকিউলিস দেখিলেন, শ্যাওলার মত পোশাক পরা কে একজন সমুদ্রের ধারে ঘুমাইয়া রহিয়াছে। তাহার সবুজ চুল আর গায়ের আঁশেই তার পরিচয় পাইয়া হারকিউলিস এক লাফে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "বুড়া! হেস্‌পেরাইডিসের বাগানের সন্ধান বল, নহিলে তোমায় ছাড়িব না।" এই বলিতে না বলিতেই বুড়া তাঁর সামনেই কোথায় মিলাইয়া গেল, তার জায়গায় একটা হরিণ কোথা হইতে আসিয়া দেখা দিল। হারকিউলিস বুঝিলেন এসব বুড়ার শয়তানী, তাই তিনি খুব মজবুত করিয়া হরিণের ঠ্যাং ধরিয়া থাকিলেন। হরিণটা তখন একটা পাখি হইয়া করুণ স্বরে আর্তনাদ আর ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। হারকিউলিস তবু ছাড়িলেন না। তখন পাখিটা একটা তিন-মাথাওয়ালা কুকুরের রূপ ধরিয়া তাঁকে কামড়াইতে আসিল। হারকিউলিস তখন তার ঠ্যাংটা আরও শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিলেন। তাতে কুকুরটা চিৎকার করিয়া গেরিয়ানের মূর্তিতে দেখা দিল। গেরিয়ানের শরীরটা মানুষের মত, কিন্তু তার ছয়টি পা। এক পা হারকিউলিসের মুঠার মধ্যে, সেইটা ছাড়াইবার জন্য সে পাঁচ পায়ে লাথি ছুঁড়িতে লাগিল।

তাহাতেও ছাড়াইতে না পারিয়া সে প্রকাণ্ড অজগর সাজিয়া হারকিউলিসকে গিলিতে আসিল। হারকিউলিস ততক্ষণে ভয়ানক চটিয়া গিয়াছেন, তিনি সাপটাকে এমন ভীষণভাবে টুঁটি চাপিয়া ধরিলেন যে, প্রাণের ভয়ে বুড়া তাহার নিজের মূর্তি ধরিয়া বাহির হইল। বুড়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "তুমি কোথাকার অভদ্র হে! বুড়া মানুষের সঙ্গে এরকম বেয়াদবি কর।" হারকিউলিস বলিলেন, "সে কথা পরে হইবে, আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও।" বুড়া তখন বেগতিক দেখিয়া বলিল, "যার কাছে গেলে তোমার কাজটি উদ্ধার হইবে, আমি তার সন্ধান বলিতে পারি। এইদিকে আফ্রিকার সমুদ্রতীর ধরিয়া বরাবর চলিয়া যাও, তাহা হইলে তুমি এটলাস দৈত্যের দেখা পাইবে। এমন দৈত্য আর দ্বিতীয় নাই। দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর সমস্ত আকাশটিকে ঘাড়ে করিয়া সে ঠায় দাঁড়াইয়া আছে। এক মুহূর্ত তাহার কোথাও যাইবার যো নাই, তাহা হইলেই আকাশ ভাঙ্গিয়া পৃথিবীর উপর পড়িবে। মেঘের উপরে কোথায় আকাশ পর্যন্ত তাহার মাথা উঠিয়া গিয়াছে, সেখান হইতে দুনিয়ার সবই সে দেখিতে পায়। সে যদি খুশী মেজাজে থাকে, তবে হয়ত তোমার সোনার ফলের কথা বলিতে পারে।" হারকিউলিস তাঁর গদা ঘুরাইয়া বলিলেন,

"যদি খুশী মেজাজে না থাকে, তবুও সোনার ফলের কথা তাকে বলাইয়া ছাড়িব।"

সমুদ্রের বুড়ার কাছে এটলাসের খবর আদায় করিয়া হারকিউলিস তাহার কথা মত আফ্রিকায় উপকূল ধরিয়া পশ্চিম মুখে চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে কত পাহাড় নদী, কত সহর গ্রাম পার হইয়া, তিনি এক অদ্ভুত দেশে আসিলেন। সেখানে মানুষগুলা অসম্ভবরকম বেঁটে। শত্রুর ভয় তাদের এতই বেশী যে, তাহাদের দেশ রক্ষার জন্য তারা এক দৈত্যের সঙ্গে বন্ধুতা করিয়া, তারই উপর পাহারা দিবার ভার রাখিয়াছে। এই দৈত্যের নাম এন্টিয়াস—পৃথিবী তার মা।

দূর হইতে হারকিউলিসকে গদা ঘুরাইয়া আসিতে দেখিয়া, বামনদের মধ্যে মহা হৈ-চৈ বাধিয়া গেল। তারা চিৎকার করিয়া এন্টিয়াসকে সাবধান করিয়া দিল। এন্টিয়াসও তাহাই চায়। তার ভয়ে বহুদিন পর্যন্ত লোকজন কেউ সে দিকে ঘেঁষে না, তাই হারকিউলিসকে দেখিয়াই সে একেবারে গদা উঠাইয়া "মার্ মার্" করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। হারকিউলিসও তৎক্ষণাৎ তার গদা এড়াইয়া, এক বাড়িতে তাকে মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! মাটিতে পড়িবামাত্র তার তেজ যেন দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। সে আবার উঠিয়া ভীষণ তেজে হারকিউলিসকে মারিতে উঠিল। হারকিউলিস আবার তাকে ঘাড়ে ধরিয়া মাটিতে পাড়িয়া ফেলিলেন, কিন্তু মাটি ছোঁয়ামাত্র আবার তার অসম্ভব তেজ বাড়িয়া গেল, সে আবার হুঙ্কার দিয়া লাফাইয়া উঠিল। হারকিউলিস ত জানে না যে পৃথিবীর বরে মাটি ছুঁইলেই তাহার তেজ বাড়ে। তিনি বার বার তাকে নানারকম মারপ্যাঁচ দিয়া মাটিতে ফেলেন, বার বারই কোথা হইতে তার নূতন তেজ দেখা দেয়। তখন তিনি দৈত্যটাকে ঘাড়ে ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া দুই হাতে তাকে এমন চাপিয়া ধরিলেন যে, সেই চাপের চোটে তার দম বাহির হইয়া প্রাণসুদ্ধ উড়িয়া গেল। তখন তার দেহটাকে তিনি পাহাড় পর্বত ডিঙ্গাইয়া কোথায় ছুঁড়িয়া ফেলিলেন, তাহার আর কোন খোঁজই পাওয়া গেল না।

তখন বামনেরা সবাই মিলিয়া ভয়ানক কোলাহল আর কান্নাকাটি জুড়িয়া দিল। কেহ "হায় হায়" করিয়া চুল ছিঁড়িতে লাগিল, কেহ প্রাণভয়ে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, কেহ আস্ফালন করিয়া বলিল, "এস, আমরা সকলে ইহার প্রতিশোধ লই।" হারকিউলিস তাদের বলিলেন, "ভাইসকল, তোমাদের সঙ্গে আমার কোন ঝগড়া নাই। ওই হতভাগা খামখা আমাকে মারিতে আসিয়াছিল, তাই উহাকে যৎকিঞ্চিৎ সাজা দিয়াছি। তোমাদের আমি কোন অনিষ্ট করিতে চাই না।" এই বলিয়া তিনি লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া, সেখান হইতে সেই সোনার আপেলের সন্ধানে এটলাস দৈত্যের খবর লইতে চলিলেন।

এই ভাবে পথ চলিতে চলিতে শেষে হারকিউলিস সত্য সত্যই এটলাসের দেখা পাইলেন। সেই সমুদ্রের বুড়া যেমন বর্ণনা করিয়াছিল, ঠিক সেইরকমভাবে সেই বিরাট দৈত্য আকাশটাকে মাথায় লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। হারকিউলিসকে দেখিয়া সে মেঘের ডাকের মত গম্ভীর গলায় বলিল, "আমি এটলাস—আমি আকাশকে মাথায় ধরিয়া রাখি—আমার মত আর কেউ নাই।" হারকিউলিস তাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আপনার সন্ধানে আমি দেশ-বিদেশে ঘুরিয়াছি—এখন আমার একটি প্রশ্ন আছে, সেইটি জিজ্ঞাসা করিতে চাই।" দৈত্য বলিল, "এই আকাশের নীচে মেঘের উপরে থাকিয়া আমার চোখ সব দেখে, সব জানে—যাহা জানিতে চাও আমাকে জিজ্ঞাসা কর।" হারকিউলিস বলিলেন, "তবে বলিয়া দিন, হেস্‌পেরাইডিসের বাগানে যে সোনার ফল ফলে, সেই ফল আমি কেমন করিয়া পাইতে পারি।" দৈত্য হইলেও এটলাসের মেজাজটি বড় ভাল। সে বলিল, "তাহাতে আর মুশকিল কি? এই আকাশটাকে তুমি একটুক্ষণ ধরিয়া রাখ, আমি এখনই তোমায় সে ফল আনিয়া দিতেছি।" হারকিউলিস ভাবিলেন, "এ বড় চমৎকার কথা। কত কীর্তি সঞ্চয় করিয়াছি, কিন্তু আকাশটাকে ঠেকাইয়া অক্ষয় কীর্তি রাখিবার এমন

সুযোগ আর কোনদিন পাইব না।" তাই তিনি দৈত্যের কথায় তৎক্ষণাৎ রাজী হইলেন।

কত হাজার হাজার বছর এটলাসের ঘাড়ে আকাশের ভার চাপান রহিয়াছে, শীত গ্রীষ্ম, রোদ বৃষ্টি সব সহিয়া বেচারা সেই বোঝা মাথায় রাখিয়া আসিতেছে। এতদিন পরে হারকিউলিসের কৃপায় সে একটু জিরাইয়া লইবার সুযোগ পাইল। মনের আনন্দে সে খুব খানিকটা লাফাইয়া, মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া, তারপর লম্বা পা ফেলিয়া চক্ষের নিমেষে হেস্‌পেরাইডিসের বাগানে গিয়া হাজির। সেখানে 'ড্রেগন' মারিয়া বাগান খুঁজিয়া সোনার আপেল তুলিয়া আনিতে তার একটুও বিলম্ব হইল না। তখন তাহার মনে হঠাৎ এক কুবুদ্ধি জাগিল। সে ভাবিল, কেন আর মিছামিছি আকাশের বোঝা লইয়া থাকি। এই মানুষটার উপরেই এখন আকাশের ভার দিলেই হয়। এই ভাবিয়া সে হারকিউলিসকে বলিল, "ওহে পৃথিবীর মানুষ, তোমার গায়ে ত বেশ শক্তি দেখিতেছি। এখন হইতে তুমিই আকাশটাকে ঠেকাইবার ভার লও না কেন? আমি বরং তোমার রাজার কাছে আপেলগুলা দিয়া আসি!"

হারকিউলিস দেখিলেন, বেগতিক! এ হতভাগা একটুক্ষণ ছুটি পাইয়া আর কাজে ফিরিতে চায় না। তিনি একটু চালাকি করিয়া বলিলেন, "তবে ভাই একটু আকাশটাকে ধর ত, আমার এই সিংহচর্মটিকে কাঁধের উপর ভাল করিয়া পাতিয়া লই।" বোকা দৈত্য তাড়াতাড়ি ফলগুলা রাখিয়া, আবার নিজের কাঁধ দিয়া আকাশটাকে আগলাইয়া ধরিল। হারকিউলিসও তৎক্ষণাৎ ফলগুলা উঠাইয়া লইয়া, দৈত্যকে এক লম্বা নমস্কার দিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন। দৈত্য বেচারা ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

এত পরিশ্রম করিয়া সোনার ফল আনিয়াও হারকিউলিসের দাসত্ব ঘুচিল না। রাজা ইউরিসথিউস্ বলিলেন, "আর একটি কাজ তোমায় করিতে হইবে—তুমি পাতালে গিয়া যমের কুকুর সারবেরাস্‌কে বাঁধিয়া আন।" হারকিউলিস পাতালে গিয়া, সেই ভীষণমূর্তি কুকুরকে ধরিয়া রাজার সম্মুখে হাজির করিলেন। তার তিন মাথায় তিনটি মুখ, সেই মুখ দিয়া বিষ ঝরিয়া পড়িতেছে, নাকে চোখে আগুনের মত ধোঁয়া—তার মূর্তি দেখিয়া ভয়ে রাজার প্রাণ উড়িবার উপক্রম হইল—তিনি একটা জালার মধ্যে ঢুকিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন—"ওটাকে শীঘ্র সরাইয়া লও।" হারকিউলিস তখন আবার যেখানকার কুকুর সেইখানে রাখিয়া আসিলেন।

এতদিনে হারকিউলিস তাঁর স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইলেন। তখন তিনি নিজের ইচ্ছামত ত্রিভুবন ঘুরিয়া আরও অদ্ভুত কাজ করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। কত বড় বড় যুদ্ধে সাহায্য করিয়া, কত বীরত্বের কীর্তিতে যোগ দিয়া তিনি আপনার আশ্চর্য শক্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন। পাহাড় উপড়াইয়া জিব্রাল্টার প্রণালীর পথ খুলিয়া তিনি সমুদ্রের সঙ্গে সমুদ্র জুড়িয়া দিলেন। সুন্দরী আলসেবিটিস নিজের প্রাণ দিয়া স্বামীকে অমর করিতে চাহিয়াছিলেন, হারকিউলিস যমের সহিত যুদ্ধ করিয়া সেই আলসেবিটিসকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে কাড়িয়া আনিলেন।

এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন ঈনিয়ুসের সুন্দরী কন্যা ডেয়ানীরাকে দেখিয়া হারকিউলিস তাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। কিন্তু, কোথা হইতে এক জলদেবতা আসিয়া তাহাতে গোল বাধাইয়া দিল। সে বলিল, "ঈনিয়ুস আমাকে কন্যা দান করিবেন বলিয়াছেন, তুমি কোথাকার কে যে মাঝ হইতে দাবী বসাইতে আসিয়াছ?" তখন ডেয়ানীরার অনুমতি লইয়া হারকিউলিস জলদেবতার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধাইয়া দিলেন। সে এক অদ্ভুত দেবতা, আপন ইচ্ছামত চেহারা বদলায়। প্রথমেই হারকিউলিসের কাছে খুব খানিক চড়চাপড় খাইয়া, সে ষাঁড়ের মূর্তি ধরিয়া তাঁকে গুঁতাইতে আসিল। হারকিউলিস তখন তার শিং ভাঙ্গিয়া দিলেন; সে পলাইয়া আবার আর এক মূর্তিতে ফিরিয়া আসিল। এইরূপ বহুক্ষণ যুদ্ধের পর হারকিউলিস তাকে এমন কাবু করিয়া

ফেলিলেন যে, প্রাণের দায়ে সে দেশ ছাড়িয়া চম্পট দিল।

তারপর হারকিউলিস ডেয়ানীরাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার সঙ্গে দেশ ভ্রমণে বাহির হইলেন। কত রাজ্য কত দেশ ঘুরিয়া, একদিন তাঁরা এক প্রকাণ্ড নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নদীতে ভয়ানক স্রোত দেখিয়া হারকিউলিস ডেয়ানীরাকে পার করিবার উপায় ভাবিতেছেন; এমন সময়ে নেসাস নামে এক বুড়ো সেন্টর (মানুষঘোড়া) আসিয়া বলিল, "আমি এই মেয়েটিকে পিঠে করিয়া পার করিয়া দিব।" ডেয়ানীরা সেন্টরের পিঠে চড়িয়া নদী পার হইলেন, হারকিউলিসও একহাতে তাঁহার তীর ধনুক জল হইতে উঠাইয়া, আর একহাতে ঢেউ ঠেলিয়া পার হইতে লাগিলেন। নদীর ওপারে গিয়া হতভাগা নেসাস ভাবিল, "আহা! এমন সুন্দরী মেয়ে কেন এই মানুষটার সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়? তাহার চাইতে ইহাকে লইয়া আমাদের দেশে পলাইয়া যাই না?" এই ভাবিয়া সে ডেয়ানীরাকে লইয়া এক ছুট্ দিল। ডেয়ানীরার চিৎকারে হারকিউলিস মাথা তুলিয়া চাহিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ জলের ভিতর হইতেই তীর ছুঁড়িয়া নেসাসের মর্মভেদ করিয়া ফেলিলেন। মরিবার সময় দুষ্ট সেন্টর অত্যন্ত ভাল মানুষের মত অনেক অনুতাপ করিয়া ডেয়ানীরাকে বলিয়া গেল, "আমার ঘাড়ের উপর হইতে এই জামাটি খুলিয়া তুমি রাখিয়া দাও। যদি তোমার স্বামীর ভালবাসা কোনদিন কমিতে দেখ, তবে এই জামা তাহাকে পরাইলেই তার সমস্ত ভালবাসা আবার ফিরিয়া আসিবে।" ডেয়ানীরা তাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়া জামাটি পরম যত্নে লুকাইয়া রাখিলেন। ততক্ষণে হারকিউলিসও নদী পার হইয়া আসিয়াছেন, দুইজনে আবার চলিতে লাগিলেন।

তাহার পর কত বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন কি একটা কাজের জন্য দূর দেশের এক রাজসভায় হারকিউলিসের যাওয়া দরকার হইল। তিনি ডেয়ানীরাকে রাখিয়া সেই যে বাহির হইলেন, তারপর কত দিন গেল, কত মাস গেল, হারকিউলিস আর ফিরিলেন না। ডেয়ানীরা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, ভাবিতে লাগিলেন, "তবে কি হারকিউলিস আমায় ভুলিয়া গেলেন? আর কি তিনি আমায় ভালবাসেন না?" তিনি দূত পাঠাইলেন, তারা আসিয়া বলিল, "হারকিউলিস বেশ ভালই আছেন—রাজসভায় নানা আমোদ-প্রমোদে তাঁর দিন কাটিতেছে।" শুনিয়া ডেয়ানীরা সেই সেন্টরের দেওয়া জামাটি বাহির করিলেন। সোনার মত ঝক্‌ঝকে জামা, সেন্টরের মৃত্যু সময়ে রক্তে ভিজিয়া গিয়াছিল—কিন্তু এখন তাহাতে রক্তের চিহ্নমাত্র নাই। সেই জামা তিনি লাইকাস নামে এক দূতকে দিয়া হারকিউলিসের কাছে পাঠাইয়া দিলেন—ভাবিলেন, তাহা হইলে হারকিউলিসকে শীঘ্র ফিরিয়া পাইবেন। জামার কাহিনী ত হারকিউলিস জানেন না, সেন্টরের রক্তে যে তাহা বিষাক্ত হইয়া আছে, এরূপ সন্দেহও তাঁর মনে জাগিল না, তিনি নিশ্চিন্ত মনে সেই জামা পরিলেন। জামা পরিবামাত্র তাঁর সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল, তাঁর শিরায় শিরায় যেন আগুনের প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। তিনি তাড়াতাড়ি জামা ছাড়াইতে গিয়া দেখেন যে সর্বনাশ, জামা তাঁহার শরীরের মধ্যে বসিয়া গিয়াছে ; গায়ের চামড়া উঠিয়া আসে, তবু জামা ছাড়িতে চায় না। রাগে ও যন্ত্রণায় পাগল হইয়া তিনি দূতকে ধরিয়া সমুদ্রে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। তারপর সেন্টরের বিষ এড়াইবার উপায় নাই দেখিয়া তিনি তাঁর অনুচরদের ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা শীঘ্র কাঠ আন, আগুন জ্বাল, আমি এখন মরিতে ইচ্ছা করি।" শুনিয়া সকলে কাঁদিতে লাগিল, কেহ চিতা জ্বালাইতে প্রস্তুত হইল না। তখন তিনি আপন হাতে গাছ উপ্‌ড়াইয়া প্রকাণ্ড চিতা জ্বালাইয়া তাহাতে শুইলেন এবং তাঁর এক বন্ধুকে বলিলেন, "তুমি যদি আমার বন্ধু হও, তবে আমার কথা শুনিয়া এই চিতায় আগুন দাও। বন্ধুতার পুরস্কারস্বরূপ আমার বিষমাখান অব্যর্থ তীরগুলি তোমায় দিলাম।"

তারপর চিতায় আগুন দেওয়া হইল, দেবতারা জয়গান করিয়া তাঁহাকে স্বর্গের দেবতাদের মধ্যে ডাকিয়া লইলেন, এবং তাঁহাকে অমর করিয়া আকাশের নক্ষত্রদের মধ্যে রাখিয়া দিলেন।

আশ্চর্য ছবি

জাপান দেশে সেকালের এক চাষা ছিল, তার নাম কিকিৎসুম। ভারি গরীব চাষা, আর যেমন গরীব তেমনি মূর্খ। দুনিয়ার সে কোনও খবরই জানত না ; জানত কেবল চাষবাসের কথা, গ্রামের লোকেদের কথা, আর গ্রামের যে বুড়ো 'বঞ্জে' (পুরোহিত), তার ভাল ভাল উপদেশের কথা। চাষার যে স্ত্রী, তার নাম লিলিৎসী। লিলিৎসী চমৎকার ঘরকন্না করে, বাড়ির ভিতর সব তক্‌তকে ঝর্‌ঝরে করে গুছিয়ে রাখে, আর রান্না করে এমন সুন্দর যে চাষার মুখে তার প্রশংসা আর ধরে না। কিকিৎসুম কেবলই বলে, "এত আমার বয়স হল, এত আমি দেখলাম শুনলাম, কিন্তু রূপে গুণে এর মত আর একটি কোথাও দেখতে পাইনি।" লিলিৎসী সে কথা যত শোনে ততই খুশী হয়।

একদিন হয়েছে কি, কোথাকার এক শহুরে বড়মানুষ এসেছেন সেই গ্রাম দেখতে; তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর ছোট্ট মেয়েটি, আর মেয়েটির ছিল একটি ছোট্ট আয়না। রাস্তায় চলতে চলতে সেই আয়নাটা সেই মেয়ের হাত থেকে কখন পড়ে গেছে, কেউ তা দেখতে পায়নি। কিকিৎসুম যখন চাষ করে বাড়ি ফিরছে তখন সে দেখতে পেল, রাস্তার ধারে ঘাসের মধ্যে কি একটা চক্‌চক্ করছে। সে তুলে দেখল, একটা অদ্ভুত চ্যাপ্টা চৌকোনা জিনিস! সে কিনা কখনও আয়না দেখেনি, তাই সে ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগল, এটা আবার কি রে! নেড়েচেড়ে দেখতে গিয়ে হঠাৎ সেই আরসির ভিতরে নিজের ছায়ার দিকে তার নজর পড়ল। সে দেখল কে একজন অচেনা লোক তার দিকে গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে আছে। দেখে সে এমন চম্‌কিয়ে উঠল, যে আর একটু হলেই আয়নাটা তার হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল। তারপর অনেক ভেবে চিন্তে সে ঠিক করল, এটা নিশ্চয় আমার বাবার ছবি—দেবতারা আমার উপর খুশী হয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তার বাবা মারা গিয়েছেন সে অনেক দিনকার কথা, কিন্তু তবু তার মনে হল, হ্যাঁ এই রকমই ত তাঁর চেহারা ছিল। তারপর—কি আশ্চর্য! সে চেয়ে দেখল তার নিজের গলায় যেমন একটা রূপার মাদুলি, ছবির গলায়ও ঠিক তেমনি! এ মাদুলি ত তার বাবারই ছিল, তিনি ত সর্বদাই এটা গলায় দিতেন,—তবে ত এটা তার বাবারই ছবি।

তখন কিকিৎসুম করল কি, আয়নাটাকে যত্ন করে কাগজ দিয়ে মুড়ে বাড়ি নিয়ে এল। বাড়ি এসে তার ভাবনা হল, ছবিটাকে রাখে কোথায়? তার স্ত্রীর কাছে যদি রেখে দেয়, তবে সে হয়ত পাড়ার মেয়েদের কাছে গল্প করবে, আর গ্রামসুদ্ধ সবাই এসে ছবি দেখবার জন্য ঝুঁকে পড়বে। গ্রামের মূর্খগুলো ত সে ছবির মর্যাদা বুঝবে না, তারা আসবে কেবল 'তামাসা' দেখবার জন্য! তা হবে না—তার বাবার ছবি নিয়ে ছেলেবুড়ো সবাই এসে নোংরা হাতে নাড়বে-চাড়বে তা কিছুতেই হতে পারবে না। এ ছবি কাউকে দেখান হবে না, লিলিৎসীকেও তার কথা বলা হবে না।

কিকিৎসুম বাড়িতে এসে একটা বহুকালের পুরানো ফুলদানির মধ্যে আরসিটাকে লুকিয়ে রাখল। কিন্তু তার মনটা আর কিছুতেই শান্ত হতে চায় না। খানিকক্ষণ পরে পরেই সে একবার করে দেখে যায় ছবিটা আছে কি না। তার পরের দিন সে মাঠে কাজ করছে এমন সময় হঠাৎ তার মনে হল, 'ছবিটা আছে ত?' অমনি সে কাজকর্ম ফেলে দৌড়ে দেখতে

এল। দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বাইরে যাবে, এমন সময় লিলিৎসী সেই ঘরে এসে পড়েছে। লিলিৎসী বলল, "এ কী! তুমি দুপুরবেলায় ফিরে এলে যে? অসুখ করেনি ত?" কিকিৎসুম থতমত খেয়ে বলল, "না না, হঠাৎ তোমায় দেখতে ইচ্ছা করল তাই বাড়ি এলাম।" শুনে লিলিৎসী ভারী খুশী হয়ে গেল। তারপর আর একদিন এইরকম লুকিয়ে লুকিয়ে ছবি দেখতে এসে কিকিৎসুম আবার তার স্ত্রীর কাছে ধরা পড়ল। সেদিনও সে বলল, "তোমার ঐ সুন্দর মুখখানা বার বার মনে হচ্ছিল, তাই একবার ছুটে দেখতে এলাম।" সেদিন কিন্তু লিলিৎসীর মনে একটু কেমন খট্‌কা লাগল। সে ভাবল, 'কই, এতদিন ত কাজ করতে করতে একবারও আমায় দেখতে আসেনি, আজকাল এরকম হচ্ছে কেন?'

তারপর আর একদিন কিকিৎসুম এসেছে ছবি দেখতে। সেদিন লিলিৎসী টের পেয়েও দেখা দিল না—চুপি চুপি বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগল—কিকিৎসুম সেই ফুলদানির ভিতর থেকে কি একটা জিনিস বার করে দেখল, তারপর খুব খুশী হয়ে যত্ন করে আবার রেখে দিল। কিকিৎসুম চলে যেতেই লিলিৎসী দৌড়ে এসে ফুলদানির ভিতর থেকে কাগজে মোড়া আরসিটাকে টেনে বার করল। তারপর তার মধ্যে তাকিয়ে দেখে অতি সুন্দর এক মেয়ের ছবি!

তখন যে তার রাগটা হল—সে রাগে গজ্‌গজ্‌ করে বলতে লাগল, "এইজন্যে রোজ বাড়িতে আসা হয়—আবার আমায় বলেন 'তোমার মুখখানা দেখতে এলাম', 'তোমার মত সুন্দর আর হয়ই না।' মাগো! কি বিশ্রী মেয়েটা! হোঁৎকা মুখ, থ্যাব্‌ড়া নাক, ট্যার্‌চা চোখ,— আবার আমার মত করে চুল বাঁধা হয়েছে! দেখ না কি রকম হিংসুটে চেহারা! এই ছবি আবার আদর করে তুলে রেখেছেন—আর রোজ রোজ আহ্লাদ করে দেখতে আসেন।" লিলিৎসীর চোখ ফেটে জল আসল, সে মাটিতে উপুড় হয়ে কাঁদতে লাগল। তারপর চোখ মুছে আর একবার আরসির দিকে তাকিয়ে বলল, "মেয়েটার কি ছিঁচকাঁদুনে চেহারা—এমন চেহারাও কেউ পছন্দ করে!" সে তখন আয়নাটাকে নিজের কাছে লুকিয়ে রাখল।

সন্ধ্যার সময় কিকিৎসুম বাড়ি এসে দেখল, লিলিৎসী মুখ ভার করে মেঝের উপর বসে রয়েছে। সে ব্যস্ত হয়ে বলল, "কি হয়েছে?" লিলিৎসী বলল, "থাক থাক, আদর দেখাতে হবে না—নাও তোমার সাধের ছবিখানা নাও। ওকে নিয়েই আদর ক'র, যত্ন ক'র, মাথায় ক'রে তুলে রাখো।" তখন কিকিৎসুম গম্ভীর হয়ে বলল, "তুমি যে আমার ছবিকে নিয়ে তাচ্ছিল্য করছ—জান ওটা আমার বাবার ছবি?" লিলিৎসী আরও রেগে বলল, "হ্যাঁ, তোমার বাবার ছবি! আমি কচি খুকি কিনা, একটা বলে দিলেই হল! তোমার বাবার কি অমনি আহ্লাদী মেয়ের মত চেহারা ছিল? তিনি কি আমাদের মতো ক'রে খোঁপা বাঁধতেন—" কথাটা শেষ না হতেই কিকিৎসুম বলল, "তুমি না দেখেই রাগ করছ কেন? একবার ভাল ক'রে দেখই না।" এই ব'লে কিকিৎসুম নিজে আবার দেখল, আরসির মধ্যে সেই মুখ।

তখন দুজনের মধ্যে ভয়ানক ঝগড়া বেধে গেল। কিকিৎসুম বলে ওটা তার বাবার ছবি, লিলিৎসী বলে ওটা একটা হিংসুটি মেয়ের ছবি। এইরকম তর্ক চলছে, এমন সময়ে গ্রামের যে বুড়ো 'বঞ্জে', সে তাদের গলার আওয়াজ শুনে দেখতে এল ব্যাপারখানা কি! পুরুতঠাকুরকে দেখে দুজনেই নমস্কার করে তার কাছে নালিশ লাগিয়ে দিল। কিকিৎসুম বলল, "দেখুন, আমার বাবার ছবি, সেদিন আমি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পেলাম, আর ও কিনা বলে যে ওটা

কোন্ এক মেয়ের ছবি।" লিলিৎসী বলল, "দেখলেন কি অন্যায়! এনেছেন একটা গোমড়ামুখী মেয়ের ছবি, আর আমায় বোঝাচ্ছেন, ঐ নাকি তাঁর বাবা!"

তখন 'বঞ্জে' ঠাকুর বললেন, "দাও ত দেখি ছবিখানা।" তিনি আরসি নিয়ে মিনিট পাঁচেক খুব গম্ভীরভাবে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আয়নাটাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললেন, "তোমরা ভুল বুঝেছ। এ হচ্ছে অতি প্রাচীন এক মহাপুরুষের ছবি। আমি দেখতে পাচ্ছি, ইনি একজন যে-সে লোক নন। দেখছ না, মুখে কি গম্ভীর তেজ, কি রকম বুদ্ধি আর পাণ্ডিত্য, আর কি সুন্দর প্রশান্ত অমায়িক ভাব। এ ছবিটা ত এমন করে রাখলে চলবে না; বড় মন্দির গ'ড়ে, তার মধ্যে পাথরের বেদী বানিয়ে, তার মধ্যে ছবিখানাকে রাখতে হবে—আর ফুলচন্দন ধূপধুনা দিয়ে তার সম্মান করতে হবে।"

এই ব'লে 'বঞ্জে' ঠাকুর আরসি নিয়ে চলে গেলেন। আর কিকিৎসুম আর লিলিৎসী ঝগড়া-টগড়া ভুলে খুশী হয়ে খেতে বসল।

অর্ফিয়ুস্

নয়টি বোন ছিলেন, তাঁহারা ছন্দের দেবী। গানের ছন্দ, কবিতার ছন্দ, নৃত্যের ছন্দ, সঙ্গীতের ছন্দ—সকলরকম ছন্দকলায় তাঁহাদের সমান আর কেহই ছিল না। তাঁহাদেরই একজন, দেবরাজ জুপিটারের পুত্র আপোলোকে বিবাহ করেন।

আপোলো ছিলেন সৌন্দর্যের দেবতা, শিল্প ও সঙ্গীতের দেবতা। তিনি যখন বীণা বাজাইয়া গান করিতেন তখন দেবতারা পর্যন্ত আবাক হইয়া শুনিতেন।

এমন বাপ-মায়ের ছেলে অর্ফিয়ুস্ যে গান-বাজনায় অসাধারণ ওস্তাদ হইবেন, সে আর আশ্চর্য কি? অর্ফিয়ুসের গুণের কথা দেশ-বিদেশে রটিয়া গেল—স্বয়ং আপোলো খুশী হইয়া তাঁহাকে নিজের বীণাটি দিয়া ফেলিলেন। পাহাড়ে পর্বতে বনে জঙ্গলে অর্ফিয়ুস্ বীণা বাজাইয়া ফিরিতেন আর সমস্ত পৃথিবী স্তব্ধ হইয়া তাহা শুনিত। অর্ফিয়ুসের বীণার সুরে আকাশ যখন ভরিয়া উঠিত, তখন সুরের আনন্দে গাছে গাছে ফুল ফুটিত, সমুদ্রের কোলাহল থামিয়া যাইত, বনের পশু হিংসা ভুলিয়া অবাক হইয়া পড়িয়া থাকিত।

এই রকমে দেশে দেশে বীণা বাজাইয়া অর্ফিয়ুস্ ফিরিতেছেন এমন সময় একদিন ইউরিডিস নামে এক আশ্চর্য সুন্দরী মেয়ে তাঁহার বীণার সুরে মোহিত হইয়া দেখিতে আসিলেন, কে এমন সুন্দর বাজায়। ইউরিডিসকে দেখিবামাত্র অর্ফিয়ুসের মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তাঁহার আনন্দ বীণার ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে আকাশকে মাতাইয়া তুলিল। তন্ময় হইয়া সেই সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে ইউরিডিসের মন একেবারে গলিয়া গেল। তারপর ইউরিডিসের সহিত অর্ফিয়ুসের বিবাহ হইল; মনের আনন্দে দুইজনে দেশ-দেশান্তরে বেড়াইতে চলিলেন।

কিন্তু এ আনন্দ তাঁহাদের বেশীদিন থাকিল না। একদিন মাঠের মধ্যে এক বিষাক্ত সাপ ইউরিডিসকে কামড়াইয়া দিল এবং সেই বিষেই ইউরিডিসের মৃত্যু হইল। অর্ফিয়ুস্ তখন শোকে পাগলের মত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার বীণার তারে হাহাকার করিয়া করুণ সঙ্গীত বাজিয়া উঠিল। কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া, ঘুরিতে ঘুরিতে

অর্ফিয়ুস্ একেবারে অলিম্পাস্ পর্বতের উপর আসিয়া পড়িলেন। সেখানে দেবরাজ বজ্রধারী জুপিটার তাঁহার দুঃখের গানে ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "যাও, পাতালপুরীতে প্রবেশ করিয়া যমরাজ প্লুটোর নিকট তোমার স্ত্রীর জন্য নূতন জীবন ভিক্ষা করিয়া আন। কিন্তু জানিও, এ বড় দুঃসাধ্য কাজ; প্রাণের মায়া যদি থাকে, তবে এমন কাজে যাইবার আগে চিন্তা করিয়া দেখ।"

অর্ফিয়ুস্ নির্ভয়ে বীণা বাজাইতে বাজাইতে পাতালের দিকে চলিলেন। পাতালপুরীর সিংহদ্বারে যমরাজের ত্রিমুন্ড কুকুর দিনরাত পাহারা দেয়। অর্ফিয়ুস্‌কে আসিতে দেখিয়া রাগে তাহার ছয় চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল—তাহার মুখ দিয়া বিষাক্ত আগুন ফেনাইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু অর্ফিয়ুসের বীণার সুর যেমন তাহার কানে আসিয়া লাগিল, অমনি সে শান্ত হইয়া শুইয়া পড়িল। আর্ফিয়ুস্ অবাধে পাতালপুরীতে প্রবেশ করিলেন।

তখন পাতালপুরী কম্পিত করিয়া বীণার ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিল। নরকের অন্ধকার ভেদ করিয়া সে সঙ্গীত পাতালের অতল গুহায় প্রবেশ করিল। সেই শব্দে যমদূতের হুঙ্কার আর পাপীদের চিৎকার মুহূর্তের মধ্যে থামিয়া গেল। জলের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবিয়া অত্যাচারী ট্যান্টেলাস পিপাসায় পাগল,—পান করিতে গেলেই জল সরিয়া যায়! বীণার সঙ্গীতে সে তাহার তৃষ্ণা ভুলিয়া গেল। মহাপাপী ইক্সিয়ন নরকের ঘুরন্ত চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে এতদিন পরে বিশ্রাম পাইল, ঘুরন্ত চক্র স্তব্ধ হইয়া রহিল। ধূর্ত নিষ্ঠুর সিসিফাস্ চিরকাল ধরিয়া পাহাড়ের উপর পাথর গড়াইয়া তুলিতেছে, যতবার তোলে ততবার পাথর গড়াইয়া পড়ে; সেও দারুণ শ্রমের দুঃখ ভুলিয়া সেই সঙ্গীত শুনিতে লাগিল।

অর্ফিয়ুস্ যমরাজের সিংহাসনের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। যমরাজ প্লুটো ও রানী প্রসেরপিনা গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছেন; তাঁহাদের পায়ের কাছে নিয়তিরা তিন বোনে জীবনের সূতা লইয়া খেলিতেছে। একজন সূতা টানিয়া ছাড়াইতেছে, একজন সেই সূতা পাকাইয়া জড়াইতেছে, আর একজন কাঁচি দিয়া পাকানো সূতা ছাঁটিয়া ফেলিতেছে। অর্ফিয়ুসের সঙ্গীতে যমরাজ সন্তুষ্ট হইলেন, নিয়তিরা প্রসন্ন হইল। তখন আদেশ হইল, "ইউরিডিসকে ফিরাইয়া দাও, সে পৃথিবীতে ফিরিয়া যাক। কিন্তু সাবধান অর্ফিয়ুস্! যমপুরীর সীমানা পার হইবার পূর্বে ইউরিডিসের দিকে ফিরিয়া চাহিও না—তবে কিন্তু সকলই পণ্ড হইবে।"

অর্ফিয়ুস্ মনের আনন্দে বীণা বাজাইয়া চলিলেন, তাঁহার পিছন পিছন ইউরিডিসও চলিলেন। যমপুরীর সীমানায় আসিয়া অর্ফিয়ুস্ মনের আনন্দে নিষেধের কথা ভুলিয়া ফিরিয়া তাকাইলেন! অমনি তাঁহার চোখের সম্মুখেই ইউরিডিসের অপূর্বসুন্দর মূর্তি বিদায়ের ম্লান হাসি হাসিয়া শূন্যের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

তারপরে অর্ফিয়ুস্ আর কি করিবেন? তিনি বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পাগলের মত সন্ধান করিতে লাগলেন। তাঁহার মনে হইল, বনের আড়ালে আড়ালে, পর্বতের গুহায় গুহায় ইউরিডিস লুকাইয়া আছেন। মনে হইল, গাছের পাতায় পাতায় বাতাসের নিশ্বাস বলিতেছে "ইউরিডিস, ইউরিডিস—" পাখিরা শাখায় শাখায় করুণ সুরে গান করিতেছে "ইউরিডিস, ইউরিডিস!"

এমনিভাবে অস্থিরমনে যখন তিনি ঘুরিতেছেন, তখন একদিন মদের দেবতা ব্যাকাসের সঙ্গীরা তাঁহাকে ধরিয়া বলিল, "তুমি স্ফূর্তি করিয়া বীণা বাজাও, আমরা নাচিব।" কিন্তু অর্ফিয়ুসের মনে সে স্ফূর্তি নাই, তাই বীণার তারেও কেবল দুঃখের সুরই বাজিতে লাগিল। তখন মাতালেরা রাগিয়া বলিল, "মার ইহাকে—এ আমাদের আমোদ মাটি করিতেছে।" তখন

সকলে মিলিয়া অর্ফিয়ুস্‌কে মারিয়া তাহার দেহ নদীতে ভাসাইয়া দিল। সেই দেহ ইউরিডিসের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ভাসিয়া চলিল। শূন্যে অর্ফিয়ুসের আনন্দধ্বনি শুনিয়া সকলে বুঝিতে পারিল আবার তিনি ইউরিডিসকে ফিরিয়া পাইয়াছেন।

জলে স্থলে নদীর কলস্রোতে ঝরণার ঝর্ঝর শব্দে আনন্দ-কোলাহল বাজিয়া উঠিল।

দেবতার দুর্বুদ্ধি

স্বর্গের দেবতারা যেখানে থাকেন, সেখান থেকে পৃথিবীতে নেমে আসবার একটিমাত্র পথ সেই পথ রামধনুকের তৈরী। জলের রঙে আগুন আর বাতাসের রং মিশিয়ে দেবতারা সেই পথ বানিয়েছেন। আশ্চর্য সুন্দর সেই পথ, স্বর্গের দরজা থেকে নামতে নামতে পৃথিবী ফুঁড়ে পাতাল ফুঁড়ে কোন অন্ধকার ঝরণার নিচে মিলিয়ে গেছে। কোথাও তার শেষ নেই।

পথটি পেয়ে দেবতাদের আনন্দও হল, ভয়ও হল। ভয় হল এই ভেবে যে, ঐ পথ বেয়ে দুর্দান্ত দানবগুলো যদি স্বর্গে এসে পড়ে! দেবতারা সব ভাবনায় বসেছেন, এমন সময় চারদিক ঝলমলিয়ে, আলোর মত পোশাক প'রে, হীমদল এসে হাজির হলেন। হীমদল কে? হীমদল হলেন আদি দেবতা অদীনের ছেলে। তাঁর মায়েরা নয়টি বোন সাগরের মেয়ে। তাঁদের কাছে পৃথিবীর বল, সমুদ্রের মধু, আর সূর্যের তেজ খেয়ে তিনি মানুষ হয়েছেন। তাঁকে দেখেই দেবতারা সব ব'লে উঠলেন, "এস হীমদল, এস মহাবীর, আমাদের রামধনুকের প্রহরী হয়ে স্বর্গদ্বারের রক্ষক হও।"

সেই অবধিই হীমদলের আর অন্য কাজ নেই, তিনি যুগযুগান্তর রাত্রিদিন স্বর্গদ্বারে প্রহর জাগেন। ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, একটিবার পলক ফেললেই বহুদিনের সমস্ত শ্রান্তি জুড়িয়ে যায়। রামধনুকের ছায়ার নিচে সারারাত শিশির ঝরে, তার একটি কণাও হীমদলের চোখ এড়ায় না। পাহাড়ের গায়ে গায়ে সবুজ কচি ঘাস গজায়, হীমদল কান পেতে তার আওয়াজ শোনেন। ফাঁকি দিয়ে স্বর্গে ঢুকবে এমন কারও সাধ্যি নেই। হাতে তাঁর এক শিঙের বাঁশি, সেই বাঁশিতে ফুঁ দিলে স্বর্গ মর্ত পাতাল জুড়ে হুঙ্কার বাজবে "সাবধান! সাবধান!"— সেই সঙ্গে ত্রিভুবনের সকল প্রাণী কাঁপতে কাঁপতে জেগে উঠবে। এমনি করে প্রস্তুত হয়ে হীমদল সেখানে পাহারা দিতে লাগলেন।

কিন্তু দেবতাদের মনের ভয় তবুও কিছু কমল না। তাঁরা বললেন, "বিপদ বুঝে সাবধান হয়েও যদি বাইরের শত্রুকে ঠেকাতে না পারি, তখন আমাদের উপায় হবে কি? যদি বাঁচতে হয় ত' অক্ষয়দুর্গ গড়তে হবে। আকাশজোড়া স্বর্গটিকে দুর্গ দিয়ে ঘিরতে হবে।" কিন্তু, তেমন দুর্গ বানাবে কে? নানাজনে নানারকম মন্ত্রণা দিচ্ছেন, কিন্তু কোন কিছুই মীমাংসা হচ্ছে না। এমন সময় কোথাকার এক অজানা কারিগর এসে খবর দিল, হুকুম পেলে আর বকশিশ পেলে সে অক্ষয়দুর্গ বানাতে পারে। হিমের অসুর ঋম্‌তুরষ্‌ যে ছদ্মবেশে কারিগর হয়ে এসেছেন, দেবতারা তা বুঝতে পারলেন না। তাঁরা বললেন, "কি রকম তুমি বকশিশ চাও?" কারিগর বলল, "চন্দ্র চাই, সূর্য চাই, আর স্বর্গের মেয়ে ফ্রেয়াকে চাই।"

আবদার শুনে দেবতারা সব রেগে উঠলেন। সবাই বললেন, "বেয়াদবকে দূর করে দাও।" কিন্তু দেবতাদের মধ্যে একজন ছিলেন, তাঁর নাম লোকী; তিনি সকল রকম দুর্বুদ্ধির দেবতা। লোকী বললেন, "আচ্ছা, কাজটা আগে করিয়ে নিই না—তারপর দেখা যাবে।" দুষ্ট দেবতার কূট মন্ত্রণা শুনে দেবতারা সব ঋম্‌তুরষ্‌কে বললেন, "তুমি চন্দ্র পাবে, সূর্য পাবে, দেবকন্যা ফ্রেয়াকে পাবে,

যদি একলা তোমার ঘোড়ার সাহায্যে শীতকালের মধ্যে এ কাজটাকে শেষ করতে পার।" ছদ্মবেশী অসুর বলল, "অতি উত্তম! এই কথাই ঠিক রইল।"

সেদিন থেকে ঋম্‌তুরষের বিশ্রাম নেই। সারাদিন সে পাথর ব'য়ে ঘোড়াকে দিয়ে স্বর্গে তোলায়, সারারাত দুর্গ বানায়। দেবতারা ঠিক যেমন যেমন বলে দিয়েছেন, তেমনি করে পাথরের পর পাথর জুড়ে আকাশ ফুঁড়ে অক্ষয়দুর্গ গড়ে উঠছে। শীত যখন ফুরোয় ফুরোয়, তখন দেবতারা দেখলেন, সর্বনাশ! দুর্গের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে, একটিমাত্র ফটক বাকি—সে ত শুধু একদিনের কাজ! এখন উপায়? এতদিনের চন্দ্র সূর্য স্বর্গ থেকে খসে পড়বে? সুন্দরী ফ্রেয়া শেষটায় অজানা এক কারিগরকে বিয়ে করবে? ভয়ে ভাবনায় ক্ষেপে গিয়ে সবাই বললে, "হতভাগা লোকীর কথায় আমাদের এই বিপদ হল, ও এখন এর উপায় করুক, তা না হলে ওকেই আমরা মেরে ফেলব।"

লোকী আর করবে কি? সন্ধ্যা হতেই সে স্বর্গ হতে বেরিয়ে দেখল, অনেক দূরে মেঘের নিচে কারিগরের ঘোড়া পাহাড়ের সমান পাথর টেনে ধীরে ধীরে উপরে উঠছে। লোকী তখন মায়াবলে আকাশ-ঘোটকীর রূপ ধ'রে চিঁহি চিঁহি ক'রে অদ্ভুত সুরে ডাকতে ডাকতে একটা বনের ভিতর থেকে দৌড়ে বেরুল। সেই শব্দে ঋম্‌তুরষের ঘোড়া চম্‌কে উঠে লাগাম ছিঁড়ে সাজ খসিয়ে, উর্দ্ধমুখে মন্ত্রে-চালান পাগলের মত ছুটে চলল। দিক-বিদিকের বিচার নেই, পথ-বিপথের খেয়াল নেই, আকাশের কিনারা দিয়ে, আঁধারের ভিতর দিয়ে, বনের পর বন, পাহাড়ের পর পাহাড়, কেবল ছুট ছুট্ ছুট্। লোকীও ছুটেছে, ঘোড়াও ছুটেছে, আর 'হায় হায়' চিৎকার ক'রে পিছন পিছন ঋম্‌তুরষ্ ছুটে চলেছে। এমনি করে শীতকালের শেষ রাত্রি প্রভাত হল, দুষ্ট দেবতা শূন্যে কোথায় মিলিয়ে গেল, অসুর এসে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘোড়া ধরল। তখন বসন্তের প্রথম কিরণে পুবের মেঘে রং ধরেছে, দক্ষিণ বাতাস জেগে উঠছে।

অসুর বুঝল এ সমস্তই দেবতার ফাঁকি। কোথায় বা চন্দ্র সূর্য, কোথায় বা দেবকন্যা ফ্রেয়া! এতদিনের পরিশ্রম সব একেবারেই পণ্ড। ভাবতে ভাবতে অসুরের মাথা গরম হল, ভীষণ রাগে কাঁপতে কাঁপতে দেবতাদের সে মারতে চলল। দূর থেকে তার মূর্তি দেখেই দেবরাজ থর্ বুঝলেন, অসুর আসছে স্বর্গপুরী ধ্বংস করতে। তিনি তখন ব্যস্ত হয়ে তাঁর বিরাট হাতুড়ি ছুঁড়ে মারলেন। অসুরের বিশাল দেহ চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ল।

কিন্তু, দেবতাদের মনে আর শান্তি রইল না। এই অন্যায় কাজের জন্য তাঁরা লজ্জায় বিমর্ষ হয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। দেবতাদের মুখ মলিন দেখে সাগরের দেবতা ঈগিন বললেন, "আমার প্রবালপুরীতে রাজভোজ হবে, তোমরা এস—ভাবনাচিন্তা দূর কর।" দেবতাদের সবাই এলেন, কেবল লোকীকে কেউ খবর দিল না। সবাই যখন ভোজে বসেছেন, লোকী তখন জানতে পেরে ভোজের সভায় হাজির হয়ে সকলকে গাল দিতে দিতে বিনা দোষে ঈগিনের প্রিয় দাস ফন্‌ফেন্‌কে মেরে ফেলল। দেবতারা অনেক দিন অনেক সয়েছেন, আজকে তাঁরা সহ্য করতে পারলেন না। লোকীর সমস্ত অন্যায় অত্যাচারের কথা তাঁদের মনে পড়ল। তাঁরা বললেন, "এই লোকীর জন্য স্বর্গের সর্বনাশ হচ্ছে। এই হিংসুকে লোকী থরের স্ত্রীর সোনার চুল চুরি করেছিল; এই কাপুরুষ লোকীই বাজি রেখে নিজের মুণ্ড পণ ক'রে বাজি হেরে পালিয়েছিল; এই বিশ্বাসঘাতক লোকীই স্বর্গের অমৃতফল অসুরের হাতে দিয়েছিল; এই হতভাগা লোকীই ফ্রেয়াকে রাক্ষসের কাছে পাঠাতে চেয়েছিল; এই চোর লোকীই ফ্রেয়ার গলার সোনার হার সরাতে গিয়ে হীমদলের হাতে সাজা পেয়েছিল; এই পাষণ্ড লোকীই নিষ্পাপ বলোদরের মৃত্যুর কারণ! এই লোকী পৃথিবীতে গিয়ে অত্যাচার করে, পাতালে গিয়ে শত্রুর সঙ্গে মন্ত্রণা করে! মারো এই অপদার্থকে।"

লোকী প্রাণভয়ে পালাতে গেল কিন্তু স্বয়ং দেবরাজ থর আর আদি দেবতা অদীন যখন তাঁর পিছনে ছুটলেন, তখন সে আর পালাবে কোথায়? বিষের ঝরণার নিচে হাত-পা বেঁধে লোকীকে ফেলে রাখা হল। লোকীর স্ত্রী সিগীন যতক্ষণ ঝরণাতলায় পাত্রে ক'রে বিষ ধরেন আর ফেলে দেন, ততক্ষণ লোকী একটু আরাম পায়; আর সিগীন যদি মুহূর্তের জন্য খেতে যান কি ঘুমিয়ে পড়েন, তবে বিষের যন্ত্রণায় লোকীর আর সোয়াস্তি থাকে না।

দেবতারা ভাবলেন, স্বর্গের পাপ দূর হল, স্বর্গে এবার শান্তি এল। কিন্তু হায়! তার অনেক আগেই পাপের মাত্রা পূর্ণ হয়েছে। লোকীর জন্য স্বর্গের পাপ মর্তে নেমেছে, পাতালে ঢুকে অসুর পিশাচ দৈত্য দানব সবগুলোকে জাগিয়ে তুলেছে। যে বনের লোহার গাছে লোহার পাতা, সেই বনের ছায়ায় বসে লোকীর রাক্ষসী স্ত্রী অঙ্গুর্বদা নেকড়ে-মুখো পিশাচ-রাহুদের যত্ন ক'রে পাপীর হাড় আর পাপীর মজ্জা খাইয়ে খাইয়ে বাড়িয়ে তুলছে। তারা চন্দ্র সূর্যের পিছুন পিছুন যুগের পর যুগ ছুটে বেড়ায়। এতদিনে খেয়ে খেয়ে তাদের মূর্তি এমন ভীষণ হল যে চন্দ্র সূর্য ম্লান হয়ে কাঁপতে লাগল, পৃথিবী চৌচির হয়ে ফেটে উঠল, আকাশের নক্ষত্রেরা খসে খসে পড়তে লাগল। পাতালের রক্তকুকুর আর রাহুর বাপ ফেন্‌রিস বিকট শব্দে ছুটে বেরুল। লোকী তার বাঁধন ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। সৃষ্টির মেরুদণ্ড য়গদ্রাসিল বা জগৎতরুর শিকড় কেটে মহানাগ নিধুগ বিকট মূর্তিতে বেরিয়ে এল। আর তারই সঙ্গে ভীষণ শব্দে হীমদলের শিঙার আওয়াজ বেজে উঠল—সাবধান! সাবধান! সাবধান!

দেবতারা সব ঘুমের থেকে লাফিয়ে উঠে রামধনুকের রঙিন পথে নেমে আসলেন। যে বিরাট সাপ সমুদ্রের গভীর গুহায় দেবতার ভয়ে লুকিয়ে ছিল, সে আজ সমুদ্রের জল তোলপাড় করে বেরিয়ে এল। হিমের দেশের অসুররা সব ঝাপসা ধোঁয়ার বর্ম প'রে কুয়াশায় চ'ড়ে এগিয়ে এল। অগ্নিপুরীর দৈত্যদানব মশাল জ্বেলে চারিদিক রাঙিয়ে এল। তারপর আকাশ চিরে দৈত্যরাজ সুর্ত্র এলেন; আগুনের শিখার মত, প্রলয়ের উল্কার মত, এসেই তিনি স্বর্গদ্বারের সেতুর উপর দলেবলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, আর রামধনুকের রঙিন সেতু কাচের মতন গুঁড়িয়ে গেল।

তারপরই প্রলয় যুদ্ধ। আদি দেবতা অদীনের একটি মাত্র চোখ, আর নেকড়ে অসুর ফেন্‌রিসের সঙ্গে লড়তে গিয়েই বিপদে পড়লেন। রাহুর বাপ ফেন্‌রিস, তার মা হল রাক্ষসী অঙ্গুর্বদা আর তার বাপ স্বয়ং লোকী। অসুরের প্রকাণ্ড দেহ যুদ্ধের উৎসাহে বাড়তে বাড়তে পাহাড় পর্বত ছাড়িয়ে উঠল; তার রক্তমাখা হাঁ-করা মুখে অদীন একবার ঢুকে গেলেন, আর তাঁকে পাওয়াই গেল না। ফ্রেয়ার ভাই মহাবীর ফ্রে গোলমালে তাঁর অজেয় খড়্গ খুঁজেই পেলেন না; তিনি সুর্ত্রের হাতে প্রাণ হারালেন। দেবরাজ থর তাঁর ভীষণ হাতুড়ির ঘায়ে সমুদ্রের বিরাট সাপকে খণ্ড খণ্ড করে আপনি তার বিষাক্ত রক্তে ডুবে মরলেন। যমপুরীর রক্তকুকুর যুদ্ধের দেবতা তাইর্‌কে মেরে উল্লাসে তাঁর রক্ত পান করতে লাগল। এদিকে অদীনের পুত্র বিদার এসে পিতৃঘাতী ফেন্‌রিসকে দুই টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন। বড় বড় দেবতা অসুর একে একে সবাই যখন প্রায় শেষ হয়েছে, তখন সুর্ত্রের হাত থেকে আগুনের খড়্গ ছুটে গিয়ে স্বর্গে মর্তে পাতালে প্রলয়ের আগুন জ্বেলে দিল। গাছপালা পুড়ে গেল, নদীর জল শুকিয়ে গেল, স্বর্গের সোনার পুরী ভস্ম হয়ে মিলিয়ে গেল। তারপর সব যখন ফুরিয়ে গেল তখন বিদার দেখলেন, বড় বড় দেবতা অসুর কেউ আর বাকি নেই। কেবল থরের দুই ছেলে যুদ্ধের শ্মশানে থরের হাতুড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে!

আর লোকী? বিশ্বাসঘাতক লোকী অসুরের দলের মধ্যে ম'রে রয়েছে—হীমদলের খড়্গ তার বুকে বসান। হীমদলও মহাযুদ্ধে অবসন্ন হয়ে বীরের মত রক্তাক্ত বেশে মরে আছেন।

বুদ্ধিমান শিষ্য

টোলের যিনি গুরু, তাঁর অনেক শিষ্য। সবাই লেখে, সবাই পড়ে, কেবল একজনের আর কিছুতেই কিছু হয় না। বছরের পর বছর গেল, তার বিদ্যাও হল না, বুদ্ধিও খুলল না। সকলেই বলে—"ওটা মূর্খ, ওটা নির্বোধ, ওটার আর হবে কি? ওটা যেমন বোকা, তেমনিই থাকবে।" শেষটায় গুরু পর্যন্ত তার আশা ছেড়ে দিলেন। বেচারার কিন্তু একটি গুণ সকলেই স্বীকার করে,—সে প্রাণপণে গুরুর সেবা করতে ত্রুটি করে না।

একদিন গুরু শুয়ে আছেন, মূর্খ শিষ্য বসে বসে তাঁর পা টিপে দিচ্ছে। গুরু বললেন, "তুমি ঘুমতে যাবার আগে খাটিয়াটা ঠিক করে দিও। পায়াগুলো অসমান আছে।" শিষ্য উঠবার সময় দেখল, একদিকের পায়াটা একেবারে ভাঙা। এখন উপায়? বেচারা খাটের সেই দিকটা নিজের হাঁটুর উপর রেখে সারারাত জেগে কাটাল। সকালে গুরু ঘুম থেকে উঠে ব্যাপার দেখে অবাক!

গুরুর মনে ভারি দুঃখ হল। তিনি ভাবলেন, আহা বেচারা এমন করে আমার সেবা করে, এর কি কোনরকম বিদ্যা বুদ্ধি হবার উপায় নাই? পুঁথি পড়ে বিদ্যালাভ সকলের হয় না, কিন্তু দেখে শুনেও ত কত লোকে কত কি শেখে? দেখা যাক, সেই ভাবে একে কিছু শেখান যায় কিনা। তিনি শিষ্যকে ডেকে বললেন, "বৎস, এখন থেকে তুমি যেখানেই যাও, ভাল ক'রে সব দেখবে—আর কি দেখলে, কি শুনলে, কি করলে, সব আমাকে এসে বলবে।" শিষ্য বলল, "আজ্ঞে, তা বলব।"

তারপর কিছুদিন যায়, শিষ্য একদিন জঙ্গলে একটা কাঠ আনতে গিয়ে একটা সাপ দেখতে পেল। সে টোলে ফিরে এসে গুরুকে বলল, "আজ একটা সাপ দেখেছি।" গুরু উৎসাহ ক'রে বললেন, "বেশ বেশ। বল ত, সাপটা কি রকম?" শিষ্য বললে, "আজ্ঞে, ঠিক যেন লাঙ্গলের ঈষ্।" শুনে গুরু বেজায় খুশী হয়ে বললেন, "হাঁ হাঁ ঠিক বলেছ। অনেকটা লাঙ্গলের ডাণ্ডার মতই ত। সরু, লম্বা, বাঁকা আর কালো মতন। তুমি এমনি ক'রে সব জিনিস মন দিয়ে দেখতে শেখ, আর ভাল ক'রে বর্ণনা করতে শেখ, তা হলেই তোমার বুদ্ধি খুলবে।"

শিষ্য ত আহ্লাদে আটখানা। সে ভাবলে, "তবে যে লোকে বলে আমার বুদ্ধি নেই।" আর একদিন সে বনের মধ্যে গিয়ে ফিরে এসে গুরুকে বলল, 'আজ একটা হাতী দেখলাম।" গুরু বললেন, "হাতীটা কি রকম?" শিষ্য বললে, "ঠিক যেন লাঙ্গলের ঈষ্।" গুরু ভাবলেন, 'হাতীটাকে লাঙ্গল-দণ্ডের মত বলছে কেন? ও বোধহয় শুঁড়টাকেই ভাল করে দেখেছে। তা ত হবেই—শুঁড়টাই হল হাতীর আসল বিশেষত্ব কিনা। ও শুধু হাতী দেখেছে তা নয়, হাতীর মধ্যে সব চাইতে যেটা দেখবার জিনিস, সেইটাই আরও বিশেষ করে দেখেছে।' সুতরাং তিনি শিষ্যকে খুব উৎসাহ দিয়ে বললেন, "ঠিক, ঠিক, হাতীর শুঁড়টা দেখতে অনেকটা লাঙ্গলের ঈষের মতই ত।" শিষ্য ভাবলে, 'গুরুর তাক্ লেগে গেছে—না জানি আমি কি পণ্ডিত হলাম রে!'

তারপর শিষ্যরা একদিন গেছে নিমন্ত্রণ খেতে। মূর্খও সঙ্গে গিয়েছে। খেয়েদেয়ে ফিরে আসতেই গুরু বললেন, "কি ক'রে এলে?" শিষ্য বললে, "দুধ দিয়ে, দৈ দিয়ে, গুড় মেখে খেলাম।" গুরু বললেন, "বেশ করেছ। বল ত, দৈ দুধ কি রকম?" শিষ্য একগাল হেসে বলল, "আজ্ঞে, ঠিক যেন লাঙ্গলের ঈষ্।"

গুরুর ত চক্ষুস্থির! তিনি বললেন, "ও মূর্খ! এই বুঝি তোর বিদ্যে! আমি ভাবছি যে তুই বুঝি বুদ্ধি খাটিয়ে সব জবাব দিচ্ছিস। তুই লাঙ্গলও দেখেছিস, দুধ দৈও খেয়েছিস, তবে কোন্

আক্কেলে বললি যে লাঙ্গলের ঈষের মত? দূর্ দূর্ দূর্! কোনদিন তোর কিচ্ছু হবে না।"

শিষ্য বেচারা হঠাৎ এমন তাড়া খেয়ে একেবারেই দমে গেল। সে মনে মনে বলতে লাগল, "এদের কিছুই বোঝা গেল না। ঐ কথাটাই ত ক'দিন ধ'রে ব'লে আসছি, শুনে গুরু রোজই ত খুশী হয়। তাহলে আজকে কেন বলছে 'দূর দূর'! দুত্তারি! এদের কথার কিছু ঠিক নেই।"

সূদন ওঝা

সূদন ছিল ভারি গরীব, তার একমুঠা অন্নেরও সংস্থান নাই। রোজ জুয়া খেলে লোককে ঠকিয়ে যা পায়, তাই দিয়ে কোনরকমে তার চলে যায়। যেদিন যা উপায় করে, সেইদিনই তা খরচ করে ফেলে, একটি পয়সাও হাতে রাখে না। এইরকমে কয়েক বছর কেটে গেল; ক্রমে সূদনের জ্বালায় গ্রামের লোক অস্থির হয়ে পড়ল, পথে তাকে দেখলেই সকলে ছুটে গিয়ে ঘরে দরজা দেয়। সে এমন পাকা খেলোয়াড় যে কেউ তার সঙ্গে বাজি রেখে খেলতে চায় না।

একদিন সূদন সকাল থেকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু গ্রামময় ঘুরেও কাউকে দেখতে পেল না। ঘুরে ঘুরে নিরাশ হয়ে সূদন ভাবল—"শিবমন্দিরের পুরুত ঠাকুর ত মন্দিরেই থাকে—যাই, তার সঙ্গেই আজ খেলব।" এই ভেবে সূদন সেই মন্দিরে চলল। দূর থেকে সূদনকে দেখেই পুরুতঠাকুর ব্যাপার বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি মন্দিরের মধ্যে অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ল।

মন্দিরের পুরুতকে না দেখতে পেয়ে সূদন একটু দমে গেল বটে, কিন্তু তখনই স্থির করল—'যাঃ—তবে আজ মহাদেবের সঙ্গেই খেলব।' তখন মূর্তির সামনে গিয়ে বলল—"ঠাকুর! সারদিন ঘুরে ঘুরে এমন একজনকেও পেলাম না, যার সঙ্গে খেলি। রোজগারের আর কোন উপায়ও আমি জানি না, তাই এখন তোমার সঙ্গেই খেলব। আমি যদি হারি, তোমার মন্দিরের জন্য খুব ভাল একটি দাসী এনে দিব; আর তুমি যদি হার, তবে তুমি আমাকে একটি সুন্দরী মেয়ে দিবে—আমি তাকে বিয়ে করব।" এই বলে সূদন মন্দিরের মধ্যেই ঘুঁটি পেতে খেলতে বসে গেল। খেলার দান ন্যায়মত দুই পক্ষেই সূদন দিচ্ছে—একবার নিজের হয়ে, একবার দেবতার হয়ে খেলছে। অনেকক্ষণ খেলার পর শেষে সূদনেরই জিত হল। তখন সে বলল—"ঠাকুর! এখন ত আমি বাজি জিতেছি, এবারে পণ দাও।" পাথরের মহাদেব কোন উত্তর দিলেন না, একেবারে নির্বাক রইলেন। তা দেখে সূদনের হল রাগ। "বটে! কথার উত্তর দাও না কেমন দেখে নেব"—এই বলেই সে করল কি, মহাদেবের সম্মুখে যে দেবীমূর্তি ছিল সেটি তুলে নিয়েই উঠে দৌড়।

সূদনের স্পর্ধা দেখে মহাদেব ত একেবারে অবাক! তখনি ডেকে বললেন—"আরে আরে, করিস কি? শীগ্গির দেবীকে রেখে যা। কাল ভোরবেলা যখন মন্দিরে কেউ থাকবে না, তখন আসিস, তোকে পণ দিব।" এ-কথায় সূদন দেবীকে ঠিক জায়গায় রেখে চলে গেল।

এখন হয়েছে কি, সেই রাতে একদল স্বর্গের অপ্সরা এল মন্দিরে পুজো করতে। পুজোর পর সকলে স্বর্গে ফিরে যাবার অনুমতি চাইলে, মহাদেব রম্ভা ছাড়া অন্য সকলকে যেতে বললেন, সকলেই চলে গেল, রইল শুধু রম্ভা। ক্রমে রাত্রি প্রভাত না হতেই সূদন এসে হাজির। মহাদেব রম্ভাকে পণস্বরূপ দিয়ে তাকে বিদায় দিলেন।

সূদনের আহ্লাদ দেখে কে! অপ্সরা স্ত্রীকে নিয়ে অহঙ্কারে বুক ফুলিয়ে সে বাড়ি ফিরে এল। সূদনের বাড়ি ছিল একটা ভাঙা কুঁড়ে, অপ্সরা মায়াবলে আশ্চর্য সুন্দর এক বাড়ি তৈরী করল।

সেই বাড়িতে তারা পরম সুখে থাকতে লাগল। এইভাবে এক সপ্তাহ কেটে গেল।

সপ্তাহে একদিন, রাত্রে, অপ্সরাদের সকলকে ইন্দ্রের সভায় হাজির থাকতে হয়। সেই দিন উপস্থিত হলে, রম্ভা যখন ইন্দ্রের সভায় যেতে চাইল, তখন সূদন বললে—"আমাকে সঙ্গে না নিলে কিছুতেই যেতে দিব না।" মহা মুশকিল! ইন্দ্রের সভায় না গেলেও সর্বনাশ—দেবতাদের নাচ গান সব বন্ধ হবে—আবার সূদনও কিছুতেই ছাড়ছে না। তখন রম্ভা মায়াবলে সূদনকে একটা মালা বানিয়ে গলায় পরে নিয়ে ইন্দ্রের সভায় চলল। সভায় নিয়ে সূদনকে মানুষ করে দিলে পর, সে সভার এক কোণে লুকিয়ে বসে সব দেখতে লাগল। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হ'লে, নাচগান সব থেমে গেল। রম্ভা সূদনকে আবার মালা বানিয়ে গলায় পরে চলল তার বাড়িতে। ক্রমে সূদনের বাড়ির কাছে একটা নদীর ধারে এসে রম্ভা যখন আবার তাকে মানুষ করে দিল, তখন সূদন বলল—"তুমি বাড়ি যাও, আমি এই নদীতে স্নান আহ্নিক করে, পরে যাচ্ছি।"

এই নদীর ধারে ছিল, ত্রিভুবন তীর্থ। এখানে দেবতারা পর্যন্ত স্নান করতে আসতেন। সেদিন সকালেও ছোটখাটো অনেক দেবতা নদীর ঘাটে স্নান করছিলেন। তাঁদের মধ্যে কাউকে কাউকে দেখে সূদন চিনতে পারল—তাঁরা রাত্রে ইন্দ্রের সভায় রম্ভাকে খুব খাতির করেছিলেন। সূদন ভাবল—'আমার স্ত্রীকে এরা এত সম্মান করে তাহলে আমাকে কেন করবে না?' এই ভেবে সে খুব গম্ভীর ভাবে তাঁদের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়াল—যেন সেও ভারি একজন দেবতা! কিন্তু দেবতারা তাকে দেখে অত্যন্ত অবজ্ঞা ক'রে তার দিকে ফিরেও চাইলেন না—তাঁরা তাঁদের স্নান আহ্নিকেই মন দিলেন। এ তাচ্ছিল্য সূদনের সহ্য হল না। সে করল কি, একটা গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে দেবতাদের বেদম প্রহার দিয়ে বলল—"এতবড় আস্পর্ধা! আমি রম্ভার স্বামী, আমাকে তোরা জানিস নে?" দেবতারা মার খেয়ে ভাবলেন—'কি আশ্চর্য! রম্ভা কি তবে মানুষ বিয়ে করেছে?' তাঁরা তখনই স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রের কাছে সব কথা বললেন।

এদিকে সূদন বাড়ি গিয়েই হাসতে হাসতে স্ত্রীর কাছে তার বাহাদুরির কথা বলল। শুনে রম্ভার ত চক্ষুস্থির! স্বামীর নির্বুদ্ধিতা দেখে লজ্জায় সে মরে গেল, আর বলল—"তুমি সর্বনাশ করেছ! এখনি আমাকে ইন্দ্রের সভায় যেতে হবে।"

দেবতারা ইন্দ্রের কাছে গিয়ে নালিশ করলে পর ইন্দ্রের যা রাগ! "এতবড় স্পর্ধা! স্বর্গের অপ্সরা হয়ে রম্ভা পৃথিবীর মানুষ বিয়ে করেছে?" ঠিক এই সময়ে রম্ভাও গিয়ে সেখানে উপস্থিত! তাকে দেখেই ইন্দ্রের রাগ শতগুণ বেড়ে উঠল। আর তিনি তৎক্ষণাৎ শাপ দিলেন, "তুমি স্বর্গের অপ্সরা হয়ে মানুষ বিয়ে করেছ, আবার তাকে লুকিয়ে স্বর্গে এনে আমার সভায় নাচ দেখিয়েছ এবং স্পর্ধা করে সেই লোক আবার দেবতাদের গায়ে হাত তুলেছে—অতএব, আমার শাপে তুমি আজ হতে দানবী হও। বারণসীতে বিশ্বেশ্বরের যে সাতটি মন্দির আছে, সেই মন্দির চুরমার করে আবার যতদিন কেউ নূতন করে গড়িয়ে না দিবে, ততদিন তোমার শাপ দূর হবে না।"

রম্ভা তখনি পৃথিবীতে এসে সূদনকে শাপের কথা জানিয়ে বলল—"আমি এখন দানবী হয়ে বারাণসী যাব। সেখানে বারাণসীর রাজকুমারীর শরীরে ঢুকব, আর লোকে বলবে রাজকুমারীকে ভূতে পেয়েছে। রাজা নিশ্চয়ই যত ওঝা কবিরাজ ডেকে চিকিৎসা করাবেন; কিন্তু আমি তাকে ছাড়ব না, তাই কেউ রাজকুমারীকে ভাল করতে পারবে না। এদিকে তুমি বারাণসী গিয়ে বলবে যে, তুমি রাজকুমারীকে আরাম করতে পার। তারপর তুমি বুদ্ধি ক'রে ভূত ঝাড়ানর চিকিৎসা আরম্ভ করলে আমি একটু একটু করে রাজকুমারীকে ছাড়তে থাকব। তারপর তুমি রাজাকে বলবে যে, তিনি বিশ্বেশ্বরের সাতটা মন্দির চূর্ণ ক'রে, আবার যদি নূতন করে গড়িয়ে দেন, তবেই রাজকুমারী সম্পূর্ণ আরাম হবেন। রাজা অবিশ্যি তাই করবেন আর তাহলেই আমার শাপ দূর

হবে। তুমিও অগাধ টাকা পুরস্কার পেয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে।" এই কথা বলতে বলতেই রম্ভা হঠাৎ দানবী হয়ে, তখনই চক্ষের নিমেষে বারাণসী গিয়ে একেবারে রাজকুমারীকে আশ্রয় করে বসল।

রাজকুমারী একেবারে উন্মাদ পাগল হয়ে, বিড় বিড় করে বক্‌তে বক্‌তে, সেই যে ছুটে বেরুলেন, আর বাড়িতে ঢুকলেনই না। তিনি শহরের কাছেই একটা গুহার মধ্যে থাকেন, আর রাস্তা দিয়ে লোকজন যারা চলে তাদের গায় ঢিল ছুঁড়ে মারেন! রাজা কত ওঝা বদ্যি ডাকালেন, রাজকুমারীর কোন উপকারই হল না। শেষে রাজা ঢেঁড়া পিটিয়ে দিলেন—"যে রাজকুমারীকে ভাল করতে পারবে, তাকে অর্ধেক রাজত্ব দিব—রাজকুমারীর সঙ্গে বিয়ে দিব।"

রাজবাড়ীর দরজার সামনে ঘণ্টা ঝুলান আছে, নূতন ওঝা এলেই ঘণ্টায় ঘা দেয়, আর তাকে নিয়ে গিয়ে রাজকুমারীর চিকিৎসা করান হয়। সূদন রম্ভার উপদেশমত বারাণসী গিয়ে রাজকুমারীর পাগল হওয়ার কথা শুনে ঘণ্টায় ঘা দিল। রাজা তাকে ডেকে বললেন—"ওঝার জ্বালায় অস্থির হয়েছি বাপু! তুমি যদি রাজকুমারীকে ভাল করতে না পার, তবে কিন্তু তোমার মাথাটি কাটা যাবে।" এ-কথায় সূদন রাজী হয়ে তখনই রাজকন্যার চিকিৎসা আরম্ভ করে দিল।

ভূতের ওঝারা ভড়ংটা করে খুব বেশী, সূদনও সেসব করতে কসুর করল না। ঘি, চাল, ধূপ, ধুনা দিয়ে প্রকাণ্ড যজ্ঞ আরম্ভ করে দিল, সঙ্গে সঙ্গে বিড়্ বিড়্ করে হিজিবিজি মন্ত্র পড়াও বাদ দিল না। যজ্ঞ শেষ করে সকলকে সঙ্গে নিয়ে সেই পর্বতের গুহায় চলল, যেখানে রাজকন্যা থাকে। সেখান গিয়েও বিড়্ বিড়্ ক'রে খানিকক্ষণ মন্ত্র পড়ল—"ভূতের বাপ—ভূতের মা—ভূতের ঝি, ভূতের ছা—দূর দূর দূর, পালিয়ে যা।" ক্রমে সকলে দেখল যে, ওঝার ওষুধে একটু একটু করে কাজ দিচ্ছে। কিন্তু ভূত রাজকুমারীকে একেবারে ছাড়ল না। তিনি তখনও গুহার ভিতরেই থাকেন, কিছুতেই বাইরে আসলেন না। যা হোক, রাজা সূদনকে খুব আদর যত্ন করলেন, আর, যাতে ভূত একেবারে ছেড়ে যায়, সেরূপ ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলেন। দুদিন পর্যন্ত সূদন আরো কত কিছু ভড়ং করল। তৃতীয় দিনে সে রাজার কাছে এসে বলল—"মহারাজ! রাজকুমারীর ভূত বড় সহজ ভূত নয়—এ হচ্ছে দৈবী ভূত। মহারাজ যদি এক অসম্ভব কাজ করতে পারেন—বিশ্বেশ্বরের সাতটা মন্দির চুরমার ক'রে, আবার নূতন ক'রে ঠিক আগের মত গড়িয়ে দিতে পারেন,—তবেই আমি রাজকন্যাকে আরাম করতে পারি।"

রাজা বললেন—"এ আর অসম্ভব কি?" রাজার হুকুমে তখনই হাজার হাজার লোক লেগে গেল। দেখতে দেখতে মন্দিরগুলি চুরমার হয়ে গেল। তারপর এক মাসের মধ্যে আবার সেই সাতটি মন্দির ঠিক যেমন ছিল তেমনটি করে নতুন মন্দির গড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারীও সেরে উঠলেন, অপ্সরাও শাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে চলে গেল। তারপর খুব ঘটা ক'রে সূদনের সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে হল আর রাজা বিয়ের যৌতুক দিলেন তাঁর অর্ধেক রাজত্ব।

লোলির পাহারা

শহর থেকে অনেক দূরে "লোলি"দের বাড়ি। সে বাড়িতে খালি লোলি থাকে আর তার বাবা থাকেন, আর থাকে একটা বুড়ো শূয়োর। বাড়ির চারদিকে ছোট ছোট ক্ষেত, তার চারদিকে বেড়া দিয়ে ঘেরা। ক্ষেতে যে সামান্য ফসল হয়, তাই বেচবার জন্য লোলির বাবা শহরে যান,

আর লোলিকে বলে দিয়ে যান, "তুই বাড়িতে থেকে ভাল করে পাহারা দিস্।" লোলি বাড়িতেই থাকে, কিন্তু পাহারা দেয় বিছানায় শুয়ে, চোখ বুজে, নাক ডাকিয়ে!

একদিন লোলির বাবা শহরে যাবার সময়ে লোলিকে বললেন, "ওরে! আমার ত আজকেও ফিরতে সন্ধ্যে হবে, একটু ভাল করে মন দিয়ে পাহারা দিস্। কশাই বুড়ো বলেছিল শূয়োরটাকে কিন্‌বে—তাহলেই শীতকালটা আমাদের কোনরকমে চলে যাবে। দেখ বাপু, ফটকটি খোলা রেখো না যেন! শূয়োরটা যদি পালায়, তাহলে কিন্তু উপোস করে মরতে হবে।" লোলি খুব খানিক ঘাড় নেড়ে গম্ভীর হয়ে বলল, "হ্যাঁ, আমি খুব করে পাহারা দেব—আর কখনো ফটক খুলে রাখব না।"

লোলির বাবা চললেন শহরের দিকে, আর লোলি একটা খড়ের গাদার উপর বসে পাহারা দিতে লাগল। বুড়ো শূয়োরটা শুয়ে শুয়ে ঘঁৎ ঘঁৎ করে নাক ডাকছে, তাই শুনতে শুনতে লোলিও কখন যে চোখ বুজে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, তা সে নিজেও টের পায়নি। হঠাৎ সে কেমন যেন চম্‌কে উঠল, বাবার কথাগুলো তার মনে পড়ল। সর্বনাশ! শূয়োর যদি পালায়, তবে এবার দুজনকেই উপোস থাকতে হবে। সে কান পেতে শুনল, শূয়োরের ঘঁৎ ঘঁৎ শব্দ শোনা যাচ্ছে না! সে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখল—ফটকের দরজা খোলা! ভয়ে অমন শীতের মধ্যেও লোলির গা বেয়ে দরদর করে ঘাম ছুটতে লাগল।

লোলি ভাবল, হয়ত শূয়োরটা ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে, কিন্তু সমস্ত ঘরদোর খুঁজে কোথাও সেটাকে পাওয়া গেল না। তখন লোলি পাগলের মত রাস্তার দিকে ছুটে চলল। কিন্তু রাস্তায় গিয়ে দেখল, শূয়োর-টুয়োর কোথাও কিছু নেই—খালি একটা বুড়ো ভিখারি লাঠিতে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। তখন লোলি আবার বাড়ির মধ্যে দৌড়ে গেল। সে বিছানার তলায় ঢুকে দেখল, মাচার উপর চড়ে দেখল, প্রকাণ্ড জালাটার ভিতরে হাত দিয়ে দেখল, সমস্ত টেবিল চেয়ার ঝেড়েঝুড়ে দেখল, মই দিয়ে বাড়ির চালায় উঠে দেখল—শূয়োর কোথাও নেই! লোলি কাঁদ কাঁদ হয়ে আবার রাস্তার দিকে ছুটল।

রাস্তায় গিয়ে সে এদিকে-ওদিকে, মাঠের দিকে, গাছের দিকে, নর্দমার দিকে, সব দিকে তাকিয়ে দেখল, শূয়োর কোথাও নেই। তখন লোলি সত্যি সত্যিই ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। সে কেঁদে উঠতেই তার মনে হল, কোথায় যেন শূয়োরটা "ঘঁ—চ" করে চেঁচিয়ে উঠল। লোলি তখন কী করবে বুঝতে না পেরে, সেই বুড়োর পিছন পিছন ছুটতে লাগল আর কাঁদতে লাগল, "মশাই গো! মশাই গো! আমাদের শূয়োরটা কোথায় গেল বলে দিন্ না, মশাই!"

লোলির কান্না দেখে বুড়োর হাসি পেয়ে গেল। সে বলল, "কী, বলছ কি? কার শূয়োর? কী হয়েছে?" লোলি বলল, "আমাদের সেই শূয়োরটা—আমি শূয়োর পাহারা দিতে দিতে একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছি, আর—" বুড়ো অমনি ভেঙচিয়ে উঠল, "একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছ—আর শূয়োর অমনি পালিয়েছে। খুব পাহারাদার যা হোক!" লোলি ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল, "দোহাই মশায়, আমার শূয়োর কোথায় গেল বলে দিন।" বুড়ো তখন রেগে বলল, "ভারি ত একটা শূয়োর, তাই নিয়ে আবার এত ঘ্যান্ ঘ্যান্—এ কিন্তু বাপু নেহাৎ বাড়াবাড়ি!" লোলি বলল, "শূয়োর গেলে আমাদের উপায় হবে কী? আমাদের শীতকালে খাবার পয়সা পাব কোথায়?" বুড়ো দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, "যখন পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছিলে, তখন সে কথার খেয়াল ছিল না?" এই বলে বুড়ো আবার কুঁজো হয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে চলতে লাগল।

লোলি এবার তার পা জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কান্না শুরু করল, "মশাই গো, দোহাই আপনার!—ও মশাই গো! আমাদের কী হবে গো!" বুড়ো বলল, "কী আপদ! এমন বিচ্ছিরি

প্যান্‌পেনে ছিঁচকাঁদুনে ছেলেও ত দেখিনি কোথাও! চুপ কর শীগগির। এখনি পাড়ার লোক সব ছুটে আসবে, ডাকাত পড়েছে মনে করে!" কিন্তু লোলি কী সে কথা শোনে? সে প্রাণপণে কেবলই চেঁচাচ্ছে, "ওরে আমার শূয়োর কোথায় গেল রে? ওরে আমার শূয়োর কে নিল রে?"

বুড়ো তখন বিরক্ত হয়ে পা দুটো ছাড়িয়ে আবার ঠক্‌ঠক্ করে হেঁটে চলল—আর ঠিক সেই সময়ে বুড়োর গায়ের ছেঁড়া কম্বলের ভিতর থেকে ঘঁৎ ঘঁৎ করে কিসের একটা শব্দ শোনা গেল। লোলি শব্দ শুনেই চিৎকার করে উঠল, "তবে রে হতভাগা চোর! আমাদের শূয়োর নিয়ে পালাচ্ছিস!" এই বলেই সে বুড়োর লাঠিখানা টেনে ধরল। যেমন লাঠিতে হাত দেওয়া, অমনি লোলির মনে হল যেন তার সমস্ত শরীর ঝিম্‌ঝিম্ করছে; তার হাত-পাগুলো সুড়্ সুড়্ করে বেঁকেচুরে কী রকম ছোট হয়ে যাচ্ছে; ঘাড় গলা পেট সব অসম্ভব মোটা হয়ে ফুলে উঠছে; মুখটা অদ্ভুত রকম বদ্‌লে গিয়ে নাকটাকে ঠেলে এগিয়ে দিচ্ছে! তারপর দেখতে দেখতে সে চার পায়ে হাঁটতে লাগল।

বুড়ো তখন এক গাল হেসে বলল, "হ্যাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে। কেমন? আগে ছিলি একটা অপদার্থ নিষ্কর্মা ঘুমকাতুরে কুঁড়ে, আর এখন হয়েছিস কেমন থপ্‌থপে নাদুসনুদুস্ হ্যাংলামুখো শূয়োর। বেশ বেশ! আর কোনদিন দুষ্টুমি করবি? আর কখনও বুড়োমানুষকে 'চোর' বলে ধরতে যাবি? যা, এইবার তোর খড়ের গাদায় গিয়ে শুয়ে থাক্। তোর বাবা যখন ফিরে আসবে কশাইবুড়োকে নিয়ে, তখন দেখবে শূয়োরটা আছে, কিন্তু হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া লোলিটা কোথায় পালিয়েছে! হোঃ—হোঃ—হোঃ—হোঃ।" বুড়ো খুব একচোট হেসে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেল, আর লোলি রাস্তার ধুলোয় পড়ে কাঁদতে কাঁদতে চোখের জলে ধুলো ভিজিয়ে কাদা করে ফেললে।

লোলি রাস্তায় পড়ে কাঁদছে, এমন সময় হঠাৎ কোত্থেকে একটা খেঁকী কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে আসল। লোলি বেচারা কী করে? সে এখন শূয়োর হয়ে গেছে, তাই সে তার ভুঁড়ো পেট নিয়ে ছোট ছোট চারটি পায়ে প্রাণপণ ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে সে নিজের বাড়ির ফটকের সামনে এসেই এক দৌড়ে সেই খড়ের গাদার মধ্যে ঢুকে বলল, "ঘঁৎ"—অর্থাৎ "বড্ড বেঁচে গিয়েছি!"

লোলি খড়ের মধ্যে শুয়ে হাঁপাচ্ছে আর ভাবছে, এখন কী করা যায়। এমন সময়ে হঠাৎ ভয়ে তার হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে গেল—তার মনে পড়ল, তার বাবা ত সন্ধ্যে হলেই কশাইকে নিয়ে বাড়ি ফিরবেন, আর তাকেই ত শূয়োর ভেবে কশাইয়ের কাছে বিক্রি করবেন! আর কশাই তাকে একবার পেলেই ত গলায় ছুরি বসিয়ে—! লোলি আর ভাবতে পারে না। সে শূয়োরের ভাষায় একেবারে "বাপরে মারে! গেছি গেছি!" ব'লে চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল। সে ভাবল, এই বেলা সময় থাকতে ছুটে পালাই। কিন্তু পালাবে কোথায়? ঠিক সেই সময়ে তার বাবা সেই কশাইকে নিয়ে ফটক দিয়ে ঢুকছেন! লোলির বাবা ঢুকেই এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন, "দেখেছ! হতভাগা ছেলেটা ফটক খোলা রেখেই কোথায় সরে পড়েছে! শূয়োরটা যে পালায়নি এই ভাগ্যি!" এই বলে তিনি লোলির কানদুটো ধরে কশাইয়ের কাছে টেনে আনলেন। কশাই লোলিকে হাঁ করিয়ে তার মুখ দেখল, তার পাঁজরে খোঁচা মেরে, পিঠের উপর আচ্ছা করে চাপড়িয়ে তাকে পরীক্ষা করল, তারপর খুশী হয়ে বলল, "হুঁ, বেশ।" লোলি তার মাথা নেড়ে হাত পা ছুঁড়ে লাফাতে লাগল, ক্যাঁক কোঁক ঘঁৎ ঘঁৎ কত রকম শব্দ করল, কিন্তু কিছুতেই তার বাবাকে বোঝাতে পারল না যে, সে সত্যি করে শূয়োর নয়, সে লোলি।

কশাই তার দাম চুকিয়ে দিয়ে, তারপর মুগুরের মত একটা ডাণ্ডা দিয়ে লোলিকে গুঁতো

মেরে বলল, "চল্, দেখি। বড় তেজ দেখাচ্ছিস—না? আচ্ছা, কালকে আর বাছাধনকে তেজ দেখাতে হবে না। কাল রাজার জন্মতিথির ভোজ—কেল্লা থেকে হুকুম এসেছে চোদ্দটা শূয়োর পাঠাতে হবে। এইটাকেই সবার আগে চালান দিচ্ছি। তাহলে ভোজটিও হবে ভাল।"

লোলি ঘঁৎ ঘঁৎ করে অনেক আপত্তি জানাতে লাগল, আর মনে মনে ভাবল, 'যেই ফটক খুলবে অমনি দৌড়ে পালাব।' যেমন ভাবা তেমনি কাজ; লোলির বাবা কশাইয়ের সঙ্গে এগিয়ে এসে যেমন ফটকটা খুলে ফাঁক করে ধরেছেন, অমনি লোলিও হন্‌হন্ করে দৌড় দিয়েছে। কিন্তু দৌড়িয়ে যাবে কোথায়? বেরিয়েই দেখে কশাইয়ের দুটো ষণ্ডা কুকুর দাঁত বের করে বসে আছে। কাজেই তার আর পালান হল না। যাবার সময় লোলি শুনল, তার বাবা বকাবকি করছেন,—"মনে করেছিলাম, ছোঁড়াটাকে একটু তামাসা দেখাতে নিয়ে যাব, কিন্তু হতভাগাটা কোথায় যে গেল!"

কশাই লোলিকে ঠেলে ঠেলে তার বাসায় নিয়ে ছোট্ট নোংরা একটা খোঁয়াড়ের মধ্যে পুরে নিজের কাজে চলে গেল, আর লোলি কাদার মধ্যে পড়ে কাঁদতে লাগল। খানিক বাদে যমের মত চেহারা দুটো লোক এল, তাদের একজনের হাতে দড়ি, আরেকজনের হাতে মস্ত একটা ছুরি। তারা এসেই লোলিকে দেখে বলল, "হাঁ হাঁ, এইটা তো বেশ মোটা আছে—বাঃ। ধর্ দেখি!" এই বলে তারা লোলিকে মাটিতে ফেলে চেপে ধরল। লোলি তখন "মেরো না, মেরো না—আমি সত্যিকারের শূয়োর নই" বলে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল।

ঠিক সেই সময়ে লোলির কানের কাছেই কে যেন "হো-হো" করে হেসে উঠল, আর লোলি ধড়্‌ফড়্ করে লাফিয়ে উঠে দেখল, সে তখনও সেই খড়ের গাদার উপরেই রয়েছে—আর তার বাবা তার সামনে দাঁড়িয়ে হো হো করে হাসছেন, আর বলছেন, "স্বপ্নে বুঝি শূয়োর হবার শখ হয়েছিল? আচ্ছা হতভাগা ছেলে যা হোক!" লোলি কতক্ষণ বোকার মত ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল, তারপর চোখ রগড়িয়ে আবার চারদিকে চেয়ে দেখল, তারপর বলল, "আমাদের শূয়োরটা?" তার বাবা বললেন, "ঐ তো! শুনছিসনে? ঐ শোন্।" লোলি শুনল, শূয়োরটা দিব্যি আরামে ঘঁৎ ঘঁৎ করে ডাকছে।

তখন লোলি বলল, "ভাগ্যিস্ পালায়নি!" তার বাবা বললেন, "তোমার মত গুণধর ছেলেকে পাহারার ভার দিয়েছি, শূয়োর যে পালায়নি এ তো আমার আশ্চর্য ভাগ্য বলতে হবে।" লোলি বলল, "এখন থেকে খুব ভাল করে পাহারা দেব, আর কক্ষনো ফাঁকি দিয়ে ঘুমোব না।"

গল্পস্বল্প

একদিন এক কৃষক তার ঘোড়া বোঝাই করে, কতকগুলি শস্যের থলে নিয়ে যাচ্ছিল—যাঁতাকলে পিষিয়ে আনবার জন্য। পথে যেতে যেতে ঘোড়াটা হঠাৎ হোঁচট খাওয়ায়, তার পিঠ থেকে মস্ত বড় একটা থলে মাটিতে পড়ে গেল। থলেটা ছিল বেজায় ভারি, কৃষক অনেক চেষ্টা করেও সেটাকে ঘোড়ার পিঠে তুলতে পারল না।

কৃষক মাথায় হাত দিয়ে ভাবছে, কী করা যায়। এমন সময় দেখল, একজন ভদ্রলোক ঘোড়ায় চড়ে আসছেন। নিকটে এলে দেখল, ভদ্রলোকটি তাদের গ্রামের জমিদার। কিন্তু এতবড় একজন লোককে সে কী করে থলেটায় হাত লাগাতে বলবে?

যা হোক, ভদ্রলোকটি শুধু ধনে মানে বড়লোক ছিলেন না—তাঁর মনটাও ছিল খুব বড়।

কৃষকের মুস্কিল দেখে ঘোড়া থেকে নেমে বললেন—'তাই তো! তুমি দেখছি বড় বিপদে পড়েছ। এ পথে তো আর সহজে কারও সাহায্য পাওয়া যায় না—ভাগ্যিস আমি এসেছিলাম।' বলেই, তিনি থলেটার এক পাশে ধরলেন আর কৃষক অন্য পাশে ধরে সহজেই সেটাকে ঘোড়ার পিঠে তুলল।

তখন সে মাথা নিচু করে জমিদারকে নমস্কার করে বলল—'হুজুর! কী বলে আপনাকে ধন্যবাদ দিব?'

জমিদার বললেন—'খুব সহজেই পার। রাস্তায় বিপদগ্রস্ত কাউকে দেখলেই, প্রাণপণে তার সাহায্য করো—তবেই আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া হবে।'

* * *

এক রাজা তাঁহার মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভাগ্য বলে একটা জিনিস আছে, একথা তুমি বিশ্বাস কর?' মন্ত্রী বলিলেন—'হাঁ মহারাজ! আমি তা বিশ্বাস করি।'

রাজা হাসিয়া বলিলেন—'কিন্তু এটা তুমি প্রমাণ করে দেখাতে পারবে না।'

মন্ত্রী—'তা হতে পারে মহারাজ! তবে, আপনি যদি বলেন, তা হলে একবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। আমি একটা উপায়ও ভেবেছি।' মন্ত্রী রাজার কানে ফিস্ ফিস্ করিয়া কী জানি বলিলেন। শুনিয়া রাজা ভারি খুশি হইয়া বলিলেন—'বাঃ, খাসা মতলব ঠিক করেছ। তবে আর দেরি কেন? এখনই পরীক্ষা করে দেখা যাবে।'

সেই রাত্রে মন্ত্রী প্রাসাদের মধ্যেই একটা ঘরে, দড়ি দিয়া একটা থলি ঝুলাইয়া রাখিলেন। থলিতে কী আছে তাহা রাজা আর মন্ত্রীই শুধু জানিতেন। তারপর দুটি লোককে সেই ঘরে বন্ধ করিয়া রাখা হইল।

ঘরের দরজা বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দিলে পর, একটি লোক, সে ভাগ্য মানিত, সে করিল কী—ঘরের এক কোণে বসিয়া ঘুমের চেষ্টা দেখিতে লাগিল। অন্য লোকটি চারিদিক চাহিয়া দেখিল, ছাত হইতে একটা ব্যাগ ঝুলিতেছে। নিকটে গিয়া ব্যাগে হাত দিতেই দেখে, তাহাতে চমৎকার মটর ভাজা রহিয়াছে। ক্ষুধার জ্বালায় সে তখন একপেট মটরভাজাই খাইল। তারপর আবার যখন ব্যাগে হাত দিল তখন বাহির হইল এক মুঠা হীরা! কিন্তু অন্ধকারে সেগুলোকে সাধারণ পাথর ভাবিয়া, কোণের লোকটির কাছে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—'তুই যেমন কুঁড়ে, তোকে আজ এই পাথর খেয়েই থাকতে হবে।' সকাল বেলা রাজা ও মন্ত্রী ঘরে ঢুকিয়াই লোক দুটিকে বলিলেন—'রাত্রে তোমরা যে যা পেয়েছ তা তোমাদেরই হবে।' তখন দেখা গেল, একজন চেষ্টার ফলে মটর পাইয়াছে আর যে কুঁড়েমি করিয়া ঘরের কোণে বসিয়াছিল, সে পাইয়াছে

মন্ত্রী বলিলেন—'মহারাজ! দেখলেন তো? তবু কি বলবেন, ভাগ্য বলে কিছু নাই?'

রাজা মন্ত্রীর কাছে হার মানিয়া বলিলেন—'তুমিই ঠিক বলেছ মন্ত্রী। কিন্তু মটরের সঙ্গে হীরা মেশানো থাকবে—এমনটা তো আর সচরাচর হবে না! কাজেই, কেউ যেন না ভাবে যে, শুধু ভাগ্যের জোরেই সে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে।'

* * *

আফ্রিকায় এক নিগ্রো রাজা ছিলেন, ভারি অহঙ্কারী আর তাঁর মেজাজটা ছিল বেজায় কড়া—সকলে তাঁকে খুব ভয় করত। তাঁর হুকুমগুলি মুখ থেকে বেরোবামাত্র সকলে তা পালন করতো। একদিন রাজা ভারি জাঁক করে বলছিলেন যে, রাজ্যের সকলেই তাঁর চাকর। তখন খুব জ্ঞানী এবং বৃদ্ধ এক নিগ্রো বলল—'মহারাজ! এমন কথা বলবেন না—আমরা সকলেই সকলের চাকর।'

রাজা বললেন—'তবে কি তুমি বলতে চাও যে, আমিও তোমার চাকর? আচ্ছা বেশ, তাহলে সেটা তুমি প্রমাণ করে দেখাও। আজ সন্ধ্যার মধ্যে আমাকে দিয়ে তোমার কোনও কাজ করাও দেখি? যদি পার, তোমাকে পুরস্কার দিব আর যদি না পার, তবে তোমার মাথা কাটা যাবে।' বৃদ্ধ নিগ্রো বলল—'আচ্ছা মহারাজ, আমি তা প্রমাণ করে দিচ্ছি।'

নিগ্রোটি ছিল খুবই বুড়ো, লাঠিতে ভর না দিয়ে চলতে পারত না। সে লাঠিটি ঠক্‌ঠক্ করে চলে যাচ্ছে, এমন সময় ঘরের দরজায় এক ভিখারি এসে উপস্থিত। তাকে দেখে বৃদ্ধ নিগ্রো রাজাকে বলল—'মহারাজ! আপনার যদি অনুমতি হয় তবে এই ভিখারিকে কিছু খাবার এনে দি।'

রাজার হুকুম পেয়ে বৃদ্ধ দুই হাত বোঝাই করে, ভিখারির জন্য খবার নিয়ে টলতে টলতে চলল—তার হাতে দিবে বলে। যাবার সময়, তার লাঠিটা যে বগলে চেপে রেখেছিল, সেটা মাটিতে পড়ে গিয়ে তার কাপড়ে এমনি জড়িয়ে গেল যে, আর একটু হলেই বৃদ্ধ হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। তার দু'হাত খাবারে বন্ধ, তাই এভাবে বিপদগ্রস্ত হয়ে রাজাকে বলল 'মহারাজ! অনুগ্রহ করে লাঠিটা তুলে দিন, নতুবা আমি পড়ে যাব।' রাজার কি আর ততটা ভাববার সময় ছিল? বুড়োর মুশকিল দেখে তাড়াতাড়ি লাঠিটা তুলে দিলেন। যেই লাঠি তুলে দিয়েছেন, অমনি বুড়ো হাসতে হাসতে বলল—'দেখলেন তো মহারাজ! সাধুলোক মাত্রেই পরস্পর পরস্পরের চাকর। এই দেখুন না, আমি ভিখারির একটু কাজ করলাম, আবার আপনিও আমার একটু কাজ করে দিলেন। যা হোক, আমাকে যে পুরস্কার দিবেন বলেছিলেন, সেটা অনুগ্রহ করে এই ভিখারিকে দিন।"

রাজা তখনই ভিখারিকে যথেষ্ট পুরস্কার দিলেন। শুধু তাই নয়, বৃদ্ধকে নিজের প্রধানমন্ত্রী করে, তাঁর সদুপদেশে এমনই সুন্দরভাবে প্রজাপালন করেছিলেন যে, অন্য কোনও নিগ্রো রাজার সময়ে প্রজারা তেমন সুখে ছিল না।

অগ্নি পরীক্ষা

তোমরা দ্বারভাঙ্গার নাম বোধ হয় শুনিয়াছ। দ্বারভাঙ্গার প্রাচীন নাম মিথিলা। মিথিলা সীতার পিতা জনকের রাজধানী ছিল। এবার দ্বারভাঙ্গা যাইয়া এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আসিয়াছি. তাহার কথাই তোমাদের নিকট বলিব। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বাহাদুরের নিমন্ত্রণে, এবার বিহার প্রদেশের প্রদেশের গভর্নর স্যার হেনরি হুইলার সপত্নীক মহারাজা বাহাদুরের রাজধানী রাজনগরে গিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে এক হিন্দু যোগী তথায় যে এক আশ্চর্য শক্তি দেখাইয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত অদ্ভুত।

রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে ২০ হাত দীর্ঘ ২০ হাত চওড়া ও ২ হাত গভীর এক চৌবাচ্চার মতো গর্ত খুঁড়িয়া, তথায় সকাল হইতে কাঠ পোড়ানো হইতেছিল। পার্শ্ববর্তী স্থান হইতে বহুলোক, এক হিন্দু সন্ন্যাসী জ্বলন্ত আগুনের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইবেন শুনিয়া, সেখানে আসিয়াছিল। অপরাহ্নে সপত্নীক লাটবাহাদুর, পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, দ্বার-ভাঙ্গার মহারাজা বাহাদুর ও অন্যান্য গণ্যমান্য লোকের সম্মুখে সন্ন্যাসী তাঁহার শক্তি প্রদর্শন করিলেন। সমস্ত দিন চৌবাচ্চাতে কাঠ পুড়িয়া বেশ গট্‌গটে আগুন হইয়াছে; সন্ন্যাসীর আদেশ পাইয়া তাঁহার এক শিষ্য প্রথমে তাহার উপর দিয়া খালি পায়ে হাঁটিয়া গেল। তৎপরে সন্ন্যাসীর আদেশ লইয়া বহু লোক অক্ষত

কী চমৎকার রূপ, কী সুন্দর স্নিগ্ধ উজ্জ্বল মূর্তি। সূর্য অবাক হয়ে দেখতে দেখতে তাঁর চোখের সামনেই উষা কোথায় মিলিয়ে গেল।

সে দিন সূর্যের আর কাজে মন নেই। সারাদিন ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যার সময় অস্তাচল পাহাড়ের ওপারে রাত্রির সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। রাত্রি তখন বসে বসে ভাবছেন আমার মেয়ের জন্য মনের মতো জামাই কোথায় পাই। সোনার মতো উজ্জ্বল রূপ, আগুনের মতো তেজস্বী, এমন জামাই কোথায় পাওয়া যায়। এমন সময়ে সূর্য এসে বললেন, 'আমি আপনার মেয়ে উষাকে বিয়ে করতে চাই।' শুনে রাত্রি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। পরের দিন রাত্রি তাঁর মেয়েকে বুকে টেনে নিয়ে সূর্যের সঙ্গে বিবাহের কথা তাকে জানালেন; কিন্তু উষা বলল, 'আমি কিছুতেই সূর্যকে বিয়ে করব না। থাকুক তার অনেক গুণ, থাকুক তার আশ্চর্য রূপ, আমি তাকে বিয়ে করব না।' আমার সন্ধ্যার সময় যখন সূর্যের সঙ্গে রাত্রির দেখা হল, তখন রাত্রি সূর্যকে সব কথা খুলে বললেন। শুনে সূর্য বললেন, 'একটিবার যদি তাকে কাছে পেতাম বুঝিয়ে সুঝিয়ে, মিষ্ট কথায় ভুলিয়ে নিশ্চয়ই তাকে রাজি করাতে পারতাম।' রাত্রি বললেন, 'তা কী করে সম্ভব হয়?' সূর্য বললেন, 'আপনার যখন বিদায় নেওয়ার সময় হবে তখন যদি হঠাৎ তাকে একলা ফেলে পালাতে পারেন, তবে সেই সুযোগে আমি তার কাছে গিয়ে এক মুহূর্তে তার মন গলিয়ে দিতে পারি।'

পরের দিন রাত্রির যখন যাবার সময়, তখন উষা হঠাৎ দেখল, তার মা তাকে ফেলে যেন কোথায় যে পালিয়ে যাচ্ছেন। ভয় পেয়ে বলে উঠল, 'মা, আমায় ফেলে তুমি কোথায় যাচ্ছ?' এমন সময় হঠাৎ পুবের আকাশ ভেদ করে মেঘের ভিতর দিয়ে সূর্যদেব বেরিয়ে এলেন। উষা দেখল সূর্য তাকে লক্ষ্য করেই ছুটে আসছেন। ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল, সে প্রাণপণে ছুটে আকাশভরা মেঘের মধ্যে, পৃথিবীজোড়া আলোর মধ্যে, লুকিয়ে পড়ল। সূর্য সারাদিন ব্যাকুল হয়ে তার সন্ধানে ছুটে ছুটে সন্ধ্যার সময়ে রাত্রিকে বললেন, 'আপনার কন্যা ছুটতে ছুটতে কোথায় যে মিলিয়ে গেল, আমি তাকে খুঁজেই পেলাম না।' রাত্রি বললেন, 'তুমি চেষ্টা করতে থাক, একদিন না একদিন সে ধরা দিবেই।'

সেই থেকে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, আকাশভরে কেবল এই খেলাই চলেছে। রাত্রি এসে বিদায় নেন, সুন্দরী উষাকে একলা ফেলে,; সূর্য রঙিন সাজে পূব আকাশে দেখা দেন; আর তা দেখলেই উষা দিক্‌বিদিকের আলোর মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। আর ছায়া?— বেচারা বুঝতে পারে না, কার সন্ধানে তাঁর স্বামী সারাদিন এমন করে আকাশময় ছুটে বেড়ান। তিনি গাছের আড়ালে পাহাড়ের আড়ালে, সংসারের সকল বস্তুর আড়ালে লুকিয়ে থেকে নিঃশব্দে সূর্যের সকল কাণ্ড দেখতে থাকেন। যে দিকে সূর্য যান, সর্বদা সাবধানে তার বিপরীত দিকে আপনাকে আড়াল করে রাখেন পাছে সূর্য দেখতে পান। আর সমস্ত পৃথিবীর লোকে অবাক হয়ে দিবা ও রাত্রি রৌদ্র, ও ছায়ার এই খেলা দেখতে থাকে।

নাটক সমগ্র

ঝালাপালা

পাত্রগণ

পণ্ডিতমশাই
ঘটিরাম—ছাত্র
কেষ্টা—ছাত্র
পুলিশ
খেঁটুরাম
কেবলচাঁদ—ওস্তাদ
দুলিরাম—জমিদার-ভৃত্য
জমিদার
রামকানাই—জমিদারের মামা
জুড়ির দল

[জুড়ির গান]

সখের প্রাণ গড়ের মাঠ
ছাত্র দুটি করেন পাঠ—
পড়ায় নাই রে মন
সবাই হচ্ছে জ্বালাতন!

অতি ডেঁপো দুকান কাটা
ছাত্র দুটি বেজায় জ্যাঠা
কাউকে নাহি মানে
সবাই ধর ওদের কানে!

গুরুমশাই টিকিওলা
নিত্যি যাবেন ঝিঙেটোলা
জমিদারের বাড়ি—
সেথা আড্ডা জমে ভারি!

প্রথম দৃশ্য

পণ্ডিত (*স্বগত*) রোজ ভাবি জমিদারমশাইকে বলে কয়ে তার বাড়িতেই একটা টোল বসাব। তা, একটু নিরিবিলি যে কথাটা পাড়ব, সে আর হয়ে উঠল না। যেসব বাঁদর জুটেছে, দুটো কাজের কথা বলবার কি আর যো আছে, এইজন্যেই বলি ন্যায়শাস্ত্র যে পড়েনি সে মানুষই নয়—সে গরু, মর্কট!

[নেপথ্যে সংগীত]

এই!—আবার চলল! এ এখন সারাদিন চলতে থাকবে! গলা ত নয়, যেন ফাটা বাঁশ! গানের তাড়ায় পাড়াসুদ্ধ লোক ত্রাহি ত্রাহি কচ্ছে—কাগটা পর্যন্ত ছাতে বসতে ভরসা পায় না, অথচ ভাবখানা দেখায় এমনি, যেন গান শুনিয়ে আমাদের সাতচোদ্দং তিপ্পান্ন পুরুষ উদ্ধার করে দিচ্ছে! আ মোলো যা!

[ঘটিরামের প্রবেশ]

এত দেরি হল কেন? এতক্ষণ কী কচ্ছিলি?

ঘটিরাম আজকে শিগগির শিগগির ছুটি দিতে হবে!

পণ্ডিত বটে! অনেকদিন পিঠে কিছু পড়েনি বুঝি! ছুটি কিসের?

ঘটিরাম তাও জানেন না! ও পাড়ায় গানের মজলিস হবে যে! বড় বড় ওস্তাদ—

পণ্ডিত না না ছুটি পাবিনে—যা! পড়ার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, এসেই ছুটির খোঁজ—

ঘটিরাম বাঃ! ঝিঙেটোলার জমিদারবাবু আসবেন!

পণ্ডিত লাটসাহেব এলেও যেতে পাবিনে। কেষ্টা কোথায়?

ঘটিরাম জানিনে। ডেকে আনব? ওরে কেষ্টা! [প্রস্থানোদ্যম]

পণ্ডিত থাক্ থাক্ ডাকতে হবে না। ওখেনে বসে পড়।

ঘটিরাম 'অল্ ওয়ার্ক্ অ্যান্ড্ নো প্লে মেকস জ্যাক এ ডাল বয়'—বালকদিগকে খেলিবার সুযোগ দেওয়া উচিত, কেননা, কেবলই লেখাপড়া করিলে মনের স্ফূর্তি নষ্ট হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বালকদিগকে খেলিবার সুযোগ দেওয়া উচিত, কেননা, কেবলই লেখাপড়া করিলে মনের স্ফূর্তি নষ্ট হয়—ফুর্তিটুর্তি সব মাটি। কেননা, কেবলই লেখাপড়া করিলে মনের স্ফূর্তি নষ্ট হয়—এই আমাদের যেমন হয়েছে—কেননা—

পণ্ডিত ও জায়গাটা পাঁচশোবার করে পড়তে হবে না। তোর অন্য পড়া নেই? —ঐ যে পুলিসটা যাচ্ছে, ওকে একটু ডাকা যাক্। এই পাহারাওয়ালা—ইদিকে আও!

[পুলিসের প্রবেশ]

দেখো, হামারা পাশের বাড়িমে দিনরাত ভর এইসা ক্যাঁচক্যাচ করতা, নিদ্রার অত্যন্ত ব্যাঘাত হোতা হায়—ইস্‌কো কুছ প্রতিকার হয় না রে ব্যাটা?

পুলিস কেয়া বোল্‌তা বাবু?

পণ্ডিত আহা! এইটা দেখি একেবারে নিরক্ষর মূর্খ! আরে, পাশের বাড়িমে একঠো গানের ওস্তাদ হায় নেই? উস্‌কো একদম কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেহি হায়—দিনরাত ভর্ কেবল সারে গামা ভাঁজতা হায়।

পুলিস কেয়া হোতা?

পণ্ডিত আরে, খেলে যা! (*সুর করিয়া*) সারে গাগা মাপা ধানি ধানি এইসা করতা হায়—

পুলিস হাম কেয়া করেগা বাবু—উ হামারা কাম নেহি।

পণ্ডিত নাঃ তোমার কাজ না! মাইনে খাবে তুমি কাজ করবে বেচারাম তেলি!

পুলিস হাঁ বাবু।

পণ্ডিত চেঁচাস কাঁহে? ফের পুজোর বকশিশ চায়গা ত এইসা উত্তম মধ্যম দেগা—থোঁতামুখ ভোঁতা কর দেগা।

পুলিস আরে, পাগলা হায়রে—পাগলা হায়! [প্রস্থান]

পণ্ডিত দেখ! ছোঁড়াটার আর সাড়াশব্দ নেই! ঘটে!

ঘটিরাম অ্যাঁ—

পণ্ডিত 'অ্যাঁ' কিরে বেয়াদব? 'আজ্ঞে' বলতে পারিসনে? আধঘণ্টা ধরে 'অ্যাঁ' করতে লেগেছে! বলি, পড়ছিস না কেন?

ঘটিরাম হ্যাঁ, পড়ছিলাম ত!

পণ্ডিত শুনতে পাই না কেন? চেঁচিয়ে পড়!

ঘটিরাম (*চিৎকার*) অন্ধকারে চৌরাশিটা নরকের কুণ্ড
তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড—

পণ্ডিত থাক্, থাক্—অত চেঁচাসনে—একেবারে কানের পোকা নড়িয়ে দিয়েছে।

[কেষ্টার প্রবেশ]

কেষ্টা লেখাপড়া করে যেই গাড়িচাপা পড়ে সেই। শুনলুম আজকে ও পাড়ায় গানের মজলিস হবে।

পণ্ডিত এতক্ষণে পড়তে এসেছিস?

কেষ্টা 'আই গো আপ্, ইউ গো ডাউন্'—সেই কখন এসেছি—এতক্ষণ কত পড়ে ফেললাম! 'আই গো আপ্, ইউ গো ডাউন্'—

পণ্ডিত যা, যা, আমি যেন আর দেখিনি, কাল আসিস্‌নি কেন?

কেষ্টা কালকে, কাল কি করে আসব? ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত—

পণ্ডিত ঝড় বৃষ্টি কিরে? কাল ত দিব্যি পরিষ্কার ছিল!

কেষ্টা আজ্ঞে, শুক্কুরবারের আকাশ, কিচ্ছু বিশ্বেস নেই কখন কি হয়ে পড়ে!

পণ্ডিত বটে! তোর বাড়ি কদ্দুর?

কেষ্টা আজ্ঞে, ঐ তালতলায়—'আই গো আপ্, উই গো ডাউন্—' মানে কি?

পণ্ডিত 'আই'—'আই' কিনা চক্ষুঃ, 'গো'—গয়ে ওকারে গো গৌ গাবৌ গাবঃ', ইত্যমরঃ, 'আপ্' কিনা আপঃ, সলিলং বারি, অর্থাৎ জল—গরুর চক্ষে জল—অর্থাৎ কিনা গরু কান্দিতেছে—কেন কান্দিতেছে—না 'উই গো ডাউন', কিনা 'উই' অর্থাৎ যাকে বলে উইপোকা—'গো ডাউন', অর্থাৎ গুদোমখানা—গুদোমঘরে উই ধরে আর কিছু রাখলে না—তাই না দেখে, 'আই গো আপ্'—গরু কেবলি কান্দিতেছে—

[ঘটির বিকট হাস্য]

পণ্ডিত ঘটে!

ঘটিরাম অ্যাঁ—না, আজ্ঞে—

পণ্ডিত ফের ওরকম বিটকেল শব্দ করবি ত পিটিয়ে সিধে করে দেব।

[নিদ্রাচেষ্টা]

কেষ্টা পণ্ডিতমশাই. ও পণ্ডিতমশাই!

ঘটিরাম ঘুমুচ্ছে? (*ঠেলিয়া*) ও পণ্ডিতমশাই! কেষ্টা ডাকছে, কেষ্টা ডাকছে—

কেষ্টা পণ্ডিতমশাই, এই জায়গাটা বুঝতে পারছি না।

পণ্ডিত হুঁ! দেখি নিয়ে আয়, কোন জায়গাটা—সব বলে দিতে হবে! তোদের আর কিচ্ছু হবে না—'ওয়ান্‌স্ আই মেট্ এ লেম্' ম্যান ইন এ স্ট্রিট নিয়ার মাই হাউস।' ওয়ান্‌স্ আই মেট্ এ লেম্ ম্যান্—কিনা একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। 'ইন্ এ স্ট্রিট'—সে বিস্তর চেষ্টা করিল 'নিয়ার মাই হাউস্'—কিন্তু হাড় বাহির হইল না। এই সোজা ইয়েটা বুঝতে পাল্লি না? (*ঘটিরামের প্রতি*) কিরে? পালাচ্ছিস যে!

ঘটিরাম নাঃ, পালাচ্ছি না ত! কেষ্টা এমনি গোলমাল কচ্ছে—কিচ্ছু আঁক কষতে পারছি না।

পণ্ডিত কি আঁক দেখি নিয়ে আয়।

ঘটিরাম আজ্ঞে এই যে! এই চার সের আলুর দাম যদি দশ আনা হয় তবে

আদ্ মোন পটলের দাম কত?

পণ্ডিত দেখি, চার সের আলু দশ আনা ত! তবে আদ্ মোন পটল—আহা, আবার পটল এল কোত্থেকে?

ঘটিরাম তা তো জানি না, বোধ হয় 'পটলডাঙা থেকে!

পণ্ডিত দূৎ! একি একটা আঁক হতে পারে? গাধা কোথাকার!

ঘটিরাম তাই বলুন! আমি কত যোগ কল্লাম ভাগ কল্লাম শেষটায় জি-সি-এম্ পর্যন্ত করলাম, কিছুতেই হচ্ছিল না। বড্ড শক্ত—না?

পণ্ডিত মেলা বকিস নে, যাঃ!

ঘটিরাম যাব? ছুটি?

কেষ্টা ছুটি—ছুটি—ছুটি—

পণ্ডিত না, না, ছুটি টুটি হবে না—

ঘটিরাম হ্যাঁ ভাই, তুই সাক্ষী আছিস, বলেছে 'যা'!

কেষ্টা হ্যাঁরে, আমাদের কিন্তু কোনো দোষ নেই। [প্রস্থান]

পণ্ডিত দেখলে কাণ্ডটা! এই সব হুজুকেই ত ছেলেগুলোকে মাটি কললে! আর জমিদারমশাইয়ের আক্কেলটা দেখ—এখানে এসে অবধি দশভূতে তাকে পেয়ে বসেছে—দেখ দেখি, টাকা ওড়াবার জন্য শেষটায় কিনা গানের মজলিস! ছ্যা ছ্যা— [প্রস্থান]

জুড়ির গান

সাবধান হয়ে সবে অবধান কর রে।
ওহে শিষ্য গুণধর কোলাহল ছাড় রে।।
(আহা) কেনা জানে চণ্ডীবাবু ঝিঙেটোলার জমিদার—
(আহা) অনুরক্ত ভক্ত মোরা চরণে প্রণমি তার।।
(ওসে) বিক্রমে বিক্রমাদিত্য সর্বশাস্ত্রে ধুরন্ধর।
(আহা) সাক্ষাৎ যেন দাতাকর্ণ দানব্রতে ভয়ঙ্কর।।
(এরা) খাচ্ছে দাচ্ছে ফুর্তি কচ্ছে নিত্য তারি কল্যাণে।
(সেথা) চব্বিশ ঘণ্টা মারছে আড্ডা বখশিশাদি সন্ধানে।।
(সেথা) নিত্য নতুন হচ্ছে হল্লা লোকারণ্য মারাত্মক!
(সেথা) বাদ্যের ঘটা খাদ্যের ঘটা অর্থের শ্রাদ্ধ অনর্থক!!
(আহা) একজন বড্ড সাধাসিধে ভেদ করে না আত্মপর।
(আর) টাকার লোভে বসে থাকে যত ব্যাটা স্বার্থপর!!
(ওরে) পণ্ডিতমশাই ব্যস্ত বড্ড চণ্ডীবাবুর হিতার্থ!
(দেখ) অন্নলুচি ধ্বংস করি কচ্ছেন সবায় কৃতার্থ!!
(আহা) বিদ্যে জাহির কচ্ছে সবাই পোলাও কোর্মা ভোজনে।
(দেখ) যত রাজ্যের নিষ্কম্মার দল বাড়ছে সবাই ওজনে।।
(ওরে) অবিশ্রান্ত হুজুক নিত্য মুহূর্তেকো শান্তি নেই।
(আজ) পঞ্চ বর্ষ অন্ত হৈল ক্ষান্ত দেবার নামটি নেই!!

(ওরে) কস্মিনকালে শুনি নাই রে এমন কাণ্ডকারখানা।
(ওই) খোসামুদে ভণ্ডগুলো আহ্লাদেতে অষ্টখানা!!
(আহা) পুষ্পচন্দন বৃষ্টি হবে চণ্ডীবাবুর মস্তকে।
(দেখ) অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হবে চিত্রগুপ্তের পুস্তকে।।

দ্বিতীয় দৃশ্য

জমিদার গৃহ

[দুলিরাম ও খেঁটুরাম]

দুলিরাম এত কাণ্ডকারখানা করা গেল, এখন ভালো রকম দু-একটা ওস্তাদ আসে তবে মজলিসটা জমে।

খেঁটুরাম হ্যাঁ। বেশ তালে আছি দাদা! ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, খাও দাও আর ফুর্তি কর।

দুলিরাম হ্যাঁ হ্যাঁ, যেরকম ঘি দুধ চর্ব চোষ্য চলছে, আর কটা দিন যেতে দাও না—আর চিনবার যো থাকবে না!

[কেবলচাঁদের প্রবেশ]

কেবল আমি মনে কচ্ছিলুম আপনাদের মজলিসে আজ গুটি দশেক গান শোনাব।

খেঁটুরাম ও দুলিরাম (*পরস্পরের প্রতি*) এ কে রে?

কেবল সিকী! আপনারা কেবলচাঁদ ওস্তাদকে চেনেন না?

খেঁটুরাম কোনো জন্মে নামও শুনিনি—

দুলিরাম চোদ্দপুরুষে কেউ চেনে না—

কেবল হ্যাঁ, তা আপনারা গোপীকেষ্টবাবুকে চেনেন ত?

দুলিরাম ও খেঁটুরাম গোপীকেষ্ট; হ্যাঁ—নাম শুনেছি বোধ হচ্ছে।

কেবল আমি গোপীকেষ্টবাবুর বাড়িওয়ালার খুড়শ্বশুরের জামাইয়ের পিসতুতো ভাই।

দুলিরাম তাই নাকি!!

খেঁটুরাম সে কথা বলতে হয়—আসতে আজ্ঞে হোক মশাই।

দুলিরাম বসতে আজ্ঞে হোক মশাই—

খেঁটুরাম কি নামটা বললেন আপনার?

কেবল কেবলচাঁদ।

দুলিরাম কি বললে? বক্কেশ্বর? তা বেশ, বকদাদা, আজ তোমার গান শোনা যাবে!

কেবল তা বেশ! কি বলেন? গানটা আরম্ভ করলে হয় না?

খেঁটুরাম না, না! এখনই কি দরকার? সবাই আসুক আগে—

কেবল এই সুরটুরগুলো একটু গুছিয়ে নিতে হবে।

দুলিরাম আরে মশাই! আমাদের কাছে 'গা'-ও যা, 'ধা'-ও তাই—সবই সমান।

কেবল হ্যাঁ—গানগুলোর কি মুশকিল জানেন? ওগুলো আমার স্বরচিত কিনা—

তাই, গাইতে একটু সংকোচ বোধ কচ্ছি।

খেঁটুরাম তা নাই বা গাইলে—অন্য কিছু গাও না—

কেবল আ মোলো যা! এরা আমায় গাইতে দেবে না দেখছি, আমার ভালো ভালো গানগুলো—

[কেষ্টা ও ঘটিরামের প্রবেশ]

ঘটিরাম আমরা গান শুনতে এলুম।

কেষ্টা কই রে, লোকজন সব কই? গাইবে কে? আপনি বুঝি?

কেবল হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা এঁরা যখন নেহাত পেড়াপীড়ি কচ্ছেন তখন না গাইলে সেটা ভয়ঙ্কর খারাপ দেখাবে।

[গুন গুন করিতে করিতে সহসা সপ্তমে চিৎকার]

খেঁটুরাম রক্ষে কর দাদা, এ অত্যেচার কেন?

দুলিরাম মশাই, এটা 'ডেফ অ্যাণ্ড ডাম্ব্' ইস্কুল নয়—আমাদের কানগুলো বেশ তাজা আছে।

কেবল আজ্ঞে, সুরতো ঠিক আন্দাজ পাইনি—একটু চড়ে গেছিল—না?

দুলিরাম একটু বলে একটু?

খেঁটুরাম রীতিমতো তেড়ে এসেছিল।

কেবল আচ্ছা, একটু নামিয়ে ধরি—

[*সংগীত*] আহা, পড়িয়া কালের ফেরে মোরা কি হনু রে?
কোথায় ভীষ্ম কোথা দ্রোণ কোথা কর্ণ ভীমার্জুন
কোথায় গেলেন যাজ্ঞবল্ক্য কোথায় বা সে মনু রে?
মাটির সঙ্গে মিশছে সবি কেঁচোর মতো খাচ্ছে খাবি।
কেবল আপিস খাটি কচ্ছে মাটি নধরপুষ্ট তনু রে—
ব্রাহ্মণের সে তেজ নাই হ্যাঁ হ্যাঁ বাহ্মণের সে—[মাথা চুলকানো]

দুলিরাম শিং নাই আর লেজ নাই—

কেবল হ্যাঁ হ্যাঁ—

ব্রাহ্মণের সে তেজ নাই খাদ্যাখাদ্য ভেদ নাই
মনের দুঃখ বলি কারে মোরা কি হনু রে—
আহা পড়িয়া কালের ফেরে মোরা কি হনু রে।

খেঁটুরাম দাঁড়ান একটু সামলে নি—অত করুণ রস করবেন না।

[খেঁটু ও দুলি ক্রন্দনোম্মুখ। কেষ্ট ও ঘটিরামের উচ্চহাস্য]

খেঁটুরাম তবে রে ছোকরা! তোরা হাসছিস কেন?

ঘটিরাম বাঃ! হাসি পেলে হাসব না?

দুলিরাম হাসি পাবে কেন? এখানে হাসবার কি হল?

খেঁটুরাম ছ্যাবলামি পেয়েছিস? কথা নেই বার্তা নেই—হ্যাঃ হ্যাঃ!

ঘটিরাম কিরে কেষ্টা, হাসি পেলে হাসব না?

কেষ্টা এই রে, পণ্ডিতমশাই আসছে—

ঘটিরাম ও কেষ্টা এই রেঃ, এই রেঃ, এই রেঃ, পণ্ডিতমশাই আসছে—মাটিং চকার—

তোর র‍্যাপারটা দে ত।

[ঘটিরাম ও কেষ্টার র‍্যাপার মুড়ি হইয়া উপবেশন। পণ্ডিতের প্রবেশ]

পণ্ডিত ভালো, ভালো! তোমরা মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম নিতে পার না? নিত্যি নিত্যি জমিদারমশাইকে বিরক্ত করাটা কি ভালো দেখায়?—ইকী! ক্যাবলাটা এখানে এয়েছে কি করতে? (দুলিরাম ও খেঁটুরামের প্রতি) আ মোলো যা! তোমাদের যত ইয়ার-বকশী বুঝি জোটাচ্ছ একে একে?

কেবল দেখলেন মশাই? আমাকে অপমান কললে! আমায় ইয়ার-বকশী বললে, অমন কল্‌লে কিন্তু আমি গাইব না।

পণ্ডিত তা নাই বা গাইলে—কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিচ্ছে? যা না গান। গানের ধমকে আমাদের পর্যন্ত পিলে চমকে ওঠে—তা, অন্য পরে কা কথা!

[ছাতা ও বিশাল পুঁটুলি লইয়া রামকানাইয়ের প্রবেশ]

রামকানাই (*ঘটি ও কেষ্টার প্রতি*) আপনাদের কি হয়েছে? অমন করে বসে আছেন যে? কাশি? জ্বর? ন্যাড়া মাথা? ঠাণ্ডা লাগবে ব'লে?

পণ্ডিত (*ঘটি ও কেষ্টার প্রতি*) কি হে, এখানে এসে হাজির হয়েছ? আচ্ছা বেরিয়ে নেও তারপর— [পণ্ডিতস্কন্ধে রাম কর্তৃক পুঁটুলি স্থাপন]

তুমি কি রকম মানুষ হে?

রামকানাই কেন? বেশ দিব্যি মানুষটি।

পণ্ডিত বলি চোখ দিয়ে দেখতে পাও না কি?

রামকানাই চোখ দিয়ে দেখতে পাই না ত কি কান দিয়ে দেখতে পাই?

পণ্ডিত না হে, তুমি বড় বাচাল, শাস্ত্রে বলেছে—

রামকানাই না—শাস্ত্রে আমার সম্বন্ধে কিছু বলেনি—

পণ্ডিত আহা, বলি, তোমায় তো কেউ এখেনে ডাকেনি?

রামকানাই ডাকবে আবার কি? এ কি নিলেমের মাল পেয়েছ যে ডাকাডাকি করবে?

পণ্ডিত হ্যাঁ, তবে অমন করে বসে থাকলে ত ভালো দেখায় না।

রামকানাই ভালো দেখায় না কি হে? তোমাকে যে অশ্বত্থগাছের মামদো ভূতের মতো দেখা যায়, সে বেলা কি?

পণ্ডিত আহা, বলি, যদি কিছু বলবার থাকে, তা ঝট্‌পট্ বলে বাড়ি যাও না কেন?

রামকানাই হ্যাঁ, তাহলে তুমিও আমার পুঁটলিটা সরাবার সুবিধে পাও!

পণ্ডিত কি আপদ! বলি পুঁটলিটা রেখে যেতে বললে কে? নিয়েই যাও না কেন?

রামকানাই মুটের পয়সা দিবে কে?

পণ্ডিত হাঁঃ—মুটের পয়সা দিবে কে? মুটের পয়সা দিবে!

রামকানাই উঃ! দুৎ! তোমার ময়লা চাদরটা আমার নাকের কাছে নেড়ো না।

[জমিদারের প্রবেশ]

খেঁটুরাম সর সর, জমিদারমশাই আসছেন।

দুলিরাম হ্যাঁ, হ্যাঁ, সর, সর।

জমিদার কি রে! রামা কখন এলি? বেশ, বেশ, ভালো আছিস ত?

রামকানাই (*প্রণাম করিয়া*) আজ্ঞে এই মাত্র আসছি—

পণ্ডিত আপনার এই লোকটা ভারি উদ্ধতস্বভাব—কথা বলে যেন তেড়ে মারতে আসে।

জমিদার ওরে রামা! বাবুদের কিছু বলিস টলিসনে।

রামকানাই যে আজ্ঞে।

জমিদার ও আমার বহুকেলে পুরোনো চাকর কিনা—কারুর কথা টথা বড় শোনে টোনে না। তবে লোকটা ভালো—দেশে গিছিল, আজ বহুকাল পরে এল।

খেঁটুরাম ও দুলিরাম ইনি হচ্ছেন কেবলচাঁদ ওস্তাদ—মস্ত গাইয়ে।

খেঁটুরাম আশ্চর্য! যত ওস্তাদ এসেছিল, ওঁর চেহারা দেখেই দে চম্পট।

দুলিরাম তা হবে না? এঁরই গান শুনে আমাদের নবাবসাহেব মূর্ছো গেছিলেন, এঁরই গান শুনবার জন্য কিষণবাবু তেতাল্লিশ মাইল পথ হেঁটে গেছিলেন—

খেঁটুরাম এঁকে সভায় রাখতে কত রাজা-বাদশা হদ্দ হল।

দুলিরাম কত টাকাকড়ির শ্রাদ্ধ হল।

খেঁটুরাম কত ওস্তাদ গাইয়ে জব্দ হল।

পণ্ডিত ওহে, বেশি বাড়িয়ে কাজ কি? আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—অলমতি-বিস্তারেন—বেশি বাড়াতে নেই।

খেঁটুরাম আমি অনেক হাঙ্গামা করে তবে ওঁকে এনেছি।

দুলিরাম তুই এনেছিস? দেখলেন মশাইরা, কাজ করব আমি, আর বাহাদুরি নেবেন উনি!

খেঁটুরাম খবরদার!

দুলিরাম চোপরও!

খেঁটুরাম ফের!

পণ্ডিত সমাশ্বসীহি! সমাশ্বসীহি, জমিদারমশায়ের সামনে এমন গর্হিত আচরণ করতে নেই! আহা! সঙ্গীতশাস্ত্ররসানভিজ্ঞ, সঙ্গীত আর ন্যায়শাস্ত্র বুঝলেন কিনা—অতি উপাদেয় জিনিস! আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—অভূততদ্ভাবে চী সে এক অদ্ভুজ চীজ্—

জমিদার তাহলে গান আরম্ভ হোক। ওস্তাদজি আপনি মাঝে মাঝে আমাদের গান টান শোনাবেন—

কেবল হ্যাঁ, তা, শোনাব বৈকি—অবিশ্যি এর দরুন আমার সব কাজকর্মের বড্ড ভয়ঙ্কর ক্ষেতি হবে, কিন্তু তা হোক—

পণ্ডিত আরে ছো, ছো! তুমি তো ভারি ছোটলোক হে! এই সামান্য কাজটুকু করতেও তোমাদের যত রাজ্যের আপত্তি! আজ যদি জমিদারমশাই আদেশ করেন, এখেনে একটা টোল খুলতে হবে—আমার একশো কাজ থাক, হাজার কাজ থাক, আমি অমনি টোল খুলতে লেগে যাব। কেন? না, এটা আমাদের কর্তব্য। আমাদের উচিত যে ওঁর খাতিরে কিছু ত্যাগ স্বীকার করি, হোক গে ক্ষেতি,

তাতে কি? বিশ্বাস হচ্ছে না? রামা! যাও ত, এখনি একটা লোক পাঠিয়ে আমার জিনিসগুলো ধাঁ ক'রে আনিয়ে দাও ত—আজই টোল বসিয়ে ফেলছি—চণ্ডী জমিদারমশায়ের সম্মান রাখতেই হবে।

জমিদার কিন্তু এখেনে জায়গার যে বড় অসুবিধে—

পণ্ডিত কিচ্ছু না, কিচ্ছু না—ওর মধ্যেই সুবিধা করে নেব। বুঝলেন চণ্ডীবাবু, আপনি আমাদের জন্যে চিন্তিত হবেন না। রামা!

রামকানাই আবার কেন?

পণ্ডিত ওই বাইরের বড় ঘরটায় আমার বন্দোবস্ত করে দাও ত!

রামকানাই সেখেনে দেখলুম দুটি বাবু বসে আছেন।

দুলিরাম হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার গাঁয়ের লোক। আপনার বাগানটা দেখলুম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—তাই ওদের ব'লে ক'য়ে এনেছি; ওরা এ-বিষয়ে একেবারে এক্‌স্‌পার্ট। মাইনের জন্য ভাববেন না—পঞ্চাশ টাকা দিলেই হবে।

পণ্ডিত যা! বাবুদের হটিয়ে দে। বলগে ওখেনে টোল বসবে।

দুলিরাম সিকী! আমার গাঁয়ের লোক! হবুগ্রামের অপমান!

পণ্ডিত আরে না, না—রামা, দেখিস যেন বাবুদের ধমক-ধামক করিস্‌নে—জমিদার মশায়ের যাতে অখ্যাতি না হয়—মিষ্টি করে বলবি। আর দেখ (*গলা নামাইয়া*) নেহাৎ যদি না শোনে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে দিস।

খেঁটুরাম শোন্—ঘর-টর দিয়ে কাজ নেই—জিনিসপত্রগুলো এনে উঠোনে ফেলে রাখিস—

পণ্ডিত আর দেখ্—ওই শব্দকল্পদ্রুমখানা আনতে ভুল হয় না যেন—আর কয়েকখানা মূল্যবান বই আছে—

দুলিরাম যেমন কথামালা ধারাপাত—

পণ্ডিত সেগুলো হারায় না যেন—

কেবল হ্যাঁ—সেই গানের কথাটা চাপা পড়ে গেল—

রামকানাই হ্যাঁ, হ্যাঁ, গানটা হয়ে যাক—তারপর যাব এখন।

কেবল এখানে বাজিয়ে কেউ নেই?

রামকানাই আমি বাজাতে পারি—দাও ত পাখোয়াজটা—ধত্তেরে কেটে তাগ ঘ্ড়ান্ ঘ্ড়ান্ নাগেনাগেনাগে নাগে—নাগে দেৎ ঘেঘে তেটে ঘেঘেতেটেঘেঘেতেটে—কই! গান আসছে না বুঝি?

পণ্ডিত ইকী! চাকরটা এরকম করে কেন?

জমিদার পুরোনো লোক কিনা! রামা তুই এখন চুপ কর—বাবুদের বাধা দিসনে।

রামকানাই যে আজ্ঞে!

[কেবলচাঁদের গান]

তানানা তাইরে নারে—তারে না তাইরে নারে—
তারে না তাইরে নাইরে—না-তানা-ন্না—

রামকানাই এই যা! তাল কেটে গেল!

কেবল আর কেন? থাম না বাপু!

রামকানাই কেন মশাই? থামব কেন? নাগেদেৎ ঘেঘেতেটে ঘেঘেতেটে ঘেড়ে নাগ তেরে কেটে দেৎ—দ্রেগে দ্রেগে দ্রেগে—

পণ্ডিত ওহে, জমিদারমশায়ের সামনে অমন করতে নেই—আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—গত্বমিচ্ছন্তি বর্বরাঃ—বুঝলে কিনা।

জমিদার রামা, তুই একটু কাজে যা—পুরোনো মানুষ কিনা!

দুলিরাম হ্যাঁ, ওস্তাদজি—ওই যে গাইলেন ওটা কি তাল বলছিলেন?

কেবল ওটা—ওটা হচ্ছে মাদ্রাজী একতালা।

খেঁটুরাম সবে একতালা? আহা, যখন চৌতালায় উঠবে—তখন না জানি কেমন হবে!

রামকানাই তখন সব কানে তালা লেগে যাবে।

পণ্ডিত হ্যাঁ ওস্তাদজি, তাহলে আপনার গানটা শিগগির শেষ করে ফেলুন—আহা অতি উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত!

রামকানাই ভারি উচ্চাঙ্গ! সেই আমাদের একজন যা ইমনকল্যাণের আলাপ করেছিল—সেটা পুরোপুরি শিখতে পারিনি। যেটুকু শিখেছি শুনবেন? আ—আ—আ... কেউ কেউ কেউ।

জমিদার রামা!

রামকানাই যে আজ্ঞে। [দ্বার পর্যন্ত প্রস্থান]

[কেবলচাঁদের গান]

হায় রে সোনার ভারত—

[ঘটি ও কেষ্টার উচ্চহাস্য]

ঘটিরাম হাসিয়ে দিলি যে?

কেষ্টা হাসিয়ে দিচ্ছিস কেন রে?

ঘটিরাম তুই ত আগে হাসছিলি—

কেষ্টা যাঃ! আমি কখন হাসলাম—

কেবল দেখলেন মশায়! গম্ভীর বিষয়, এর মধ্যে কী কাণ্ডটা কললে!

খেঁটুরাম রামা! একে সটাং রাস্তা পার করে দিয়ে আয় ত—

রামকানাই (*ওস্তাদকে ধরিয়া*) একে?

[ঘটিরাম ও কেষ্টার প্রস্থান]

কেবল এইও, ইস্টুপিড বেয়াদব, ভদ্রলোকের গায়ে হাত তুলিস্!

পণ্ডিত ইকী! ইকী! কাকস্য পরিবেদনা, গতস্য শোচনা নাস্তিক!

জমিদার রামা, তুই একটু কাজে যা দেখি—তুই আমার নাম ডোবাবি দেখছি।

[রামকানাইয়ের প্রস্থান]

কেবল

হায়রে সোনার ভারত দুর্দশাগ্রস্ত হইল
অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে ধূলায় পতিত রইল
যে দেশের শ্রেষ্ঠতার এত সব ভূরি ভূরি প্রমাণ বর্তমান
আজকাল তাকেই কিনা—সব অবজ্ঞা করিতেছে এবং দেখাচ্ছে
সবাই মর্তমান

কোথা সেই তিরিশ কোটি আটানব্বই লক্ষ
সাড়ে চোদ্দ হাজার মাতৃভক্ত ভারত সন্তান
সহ্য হবে না হবে না তাদের হৃদয়ে
সবাই জাগো জাগো উঠে পড়ে লাগো দেশোদ্ধারে ব্রতী হও হে!

দুলিরাম এই! সিডিশাস্!

পণ্ডিত অ্যাঁ, কি বললে? রাজদ্রোহসূচক? অ্যাঁ?

খেঁটুরাম তবে রে! সিডিশাস্ গান কচ্ছিস কেন রে?

দুলিরাম জানিস, আমার মামাতো ভাই গবর্মেন্টের চাকরি করে।

খেঁটুরাম হ্যাঁরে, ওর মামাতো ভায়ের চাকরি ঘোচাবি কেন রে?

কেবল আমি ত জানতুমনে—আমি জানতুমনে—

পণ্ডিত জানতিনে কিরে? কেন জানতিনে? [প্রহার]

কেবল কী! মারলি কেন রে? ফের মার দেখি! [পুনঃপ্রহার]
এবার মারবি ত একেবারে— [পুনঃপ্রহার]
উঃ! এত জোরে মারলি কেনরে ইস্টুপিড! দাঁড়া দেখাচ্ছি—
[পলায়ন]

পণ্ডিত যা না গাইলেন! গলা শুনলে ছত্রিশ রাগিণী ছুটে পালায়।

দুলিরাম ওর পেটের মধ্যে ডুবুরি নামালে, গানের 'গ'টা মেলে কিনা সন্দেহ!

পণ্ডিত তোমরা কোত্থেকে এ সব আপদ জোটাও হে? জমিদারমশায়ের খ্যাতি প্রতিপত্তির দিকে কি তোমাদের একটুও দৃষ্টি নেই?

খেঁটুরাম এই দুলিরামটাই ত যত নষ্টের গোড়া, যত রাজ্যের অঘামারা রোখো লোক ডেকে আনবে!

দুলিরাম বিলক্ষণ! আমি ডেকে আনলাম? আমার সাতজন্মে ওর সঙ্গে আলাপ নেই।

খেঁটুরাম এত করে বারণ কল্লুম, তবু ডেকে আনলে!

দুলিরাম না, মশাই! ও নিজে ডেকে এনেছে আমি আদবে কিছু জানিনে!

পণ্ডিত জানো না ত জানো না—তা অত গরম হবার দরকার কি? আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—"উষ্ণ ভ্রমগ্ন্যাতপসং প্রয়োগাৎ"—

জমিদার এবারে গরমটা কেমন টের পাচ্ছ বল দিখি—

খেঁটুরাম আঃ! গরম বলে গরম! আগুন লাগে কোথা! উঃ!

দুলিরাম আমাদের বেড়ালটা সর্দি-গর্মি হয়ে মারা গেছে—

জমিদার এ সব বোধ হয় সেই ধূমকেতুর জন্যে—

পণ্ডিত হ্যাঁ, সিদিন আমাদের ওখানে ধূমকেতুর ন্যাজ্ দেখা গিছিল—

দুলিরাম কার ন্যাজ কে জানে?

খেঁটুরাম ওঁরই ন্যাজ হয়ত।

জমিদার ধূমকেতুটা এসে কি কাণ্ড কল্লল? ঝড়, বৃষ্টি ভূমিকম্প—

খেঁটুরাম প্লেগ, দুর্ভিক্ষ, বেরিবেরি—

দুলিরাম পানের পোকা, এলাহাবাদ একজিবিশন!

পণ্ডিত — আমি শুনিছি ওই পানের পোকার খবরটা নাকি সত্যি নয়!

খেঁটুরাম — আলবাৎ সত্যি! নন্দলাল ডাক্তার স্বচক্ষে দেখেছে লোকে পান খাচ্ছে আর মরছে!

জমিদার — ঈস্! বল কি হে? তাহলে ত কথাটা সত্যি বলতে হবে।

পণ্ডিত — হ্যাঁ—দূরবীণ দিয়ে সে পোকা দেখা গেছে—

খেঁটুরাম — কলকেতার সাহেব ডাক্তার বলেছে তার ভয়ঙ্কর তেজাল বিষ।

দুলিরাম — হ্যাঁ—আমি দেখিছি, শাদা মতন আবার ন্যাজ আছে। কার ন্যাজ কে জানে?

[রামকানাইয়ের দ্রুত প্রবেশ]

রামকানাই — এইরে সেই দাড়িওয়ালা! সেই দাড়িওয়ালা বাবুটা আমায় তেড়ে এসেছিল! উঃ!

সকলে — কি হয়েছে! কি হয়েছে!

রামকানাই — সেই বাইরের ঘরের বাবুরা—উঃ আমায় বেদম মারপিট করেছে! একজন ছাগলদাড়ি বাবু আছে, সে আমায় দেখেই হঠাৎ ছাতের সমান লাফ দিয়ে তেড়ে এসেছিল—উঃ!

পণ্ডিত — সিকী রে! তুই করেছিলি কি?

রামকানাই — আমি তো কিচ্ছু করিনি—আমি বললুম, এখেনে ঢোল বসবে, বাবুরা যদি একটু অন্যত্তর যান, নেহাৎ যদি না যান, আপনাদের ঘাড় ধাক্কা দেওয়া হবে।

দুলিরাম — কী! ভদ্রলোককে এমনি করে ইনসাল্ট্!

খেঁটুরাম — যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

রামকানাই — আমি ত মিষ্টি করে বলেছিলুম—

খেঁটুরাম — ব্যাটা, তোমায় মিষ্টি জুতো না দিলে তুমি সিধে হবে না—

পণ্ডিত — আমার জিনিস পত্রগুলো কি কল্লি?

রামকানাই — ওই যে, বাইরে উঠোনে ফেলে রেখেছি!

পণ্ডিত — দেখলেন মশাই, কাণ্ডটা দেখলেন?

রামকানাই — ওই বাবুটি যে বললেন!

পণ্ডিত — যা, যা, যেখানে হয় শিগগির বন্দোবস্ত করে দে! আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে এক জায়গায় এমনি লিখেছে—

রামকানাই — বলি ন্যায়শাস্ত্র শুনলে ত আর পেট ভরবে না! তোমরা কি এইখেনে বসেই রাত কাবার করবে নাকি? জমিদারমশায়ের কি খাওয়া-দাওয়া নেই?

জমিদার — ওরে রামা, অমন করে বলতে নেই—বাবুদের মান্য করে কথা বলিস—আর পণ্ডিতমশাইকে কি চোখ রাঙায়?

রামকানাই — যে আজ্ঞে, প্রাতঃ-প্রণাম পণ্ডিতমশাই!

পণ্ডিত — রামা, নেতাইবাবুর বাড়ি আমার দুই পোড়ো থাকে, তাদের খপর দিস ত।

[পণ্ডিত, খেঁটুরাম ও দুলিরামের প্রস্থান]

জমিদার রামা, দেখছিস ত কাণ্ডটা?

রামকানাই আজ্ঞে হ্যাঁ—

জমিদার উৎপাত যে বেড়ে চলল—কি করা যায়?

রামকানাই আজ্ঞে, হুকুম পেলেই সব সাফ করে দি।

জমিদার না, না, ওরা আপনা থেকে উঠে যায়, এমন কিছু করা যায় না? অথচ আমার নিন্দেটা না হয়!

রামকানাই তাহলে ওদের ঘরে লঙ্কার ধোঁয়া দিলে হয় না?

জমিদার দূৎ! এটাকে কিছু জিজ্ঞেস করাই ঝকমারি! যা, তুই এক কাজ কর—আমার মামাবাড়ি যা। সেখেন থেকে কেদারমামাকে ডেকে আনবি—তাকে সব বলে কয়ে আনিস!

রামকানাই যে আজ্ঞে—

জমিদার মামা এলেই সব সিধে করে দেবে—উকিলে বুদ্ধি কিনা!

[*গান*] নাছোড়বান্দা নড়েন না,—

উড়ে আসেন, জুড়ে বসেন, মাথায় কেন চড়েন না!

নাছোড়বান্দা নড়েন না!
যাবার নামটি করেন না।
ধাক্কা দিলে সরেন না।
—নাছোড়বান্দা নড়েন না!

কচ্ছে সবাই যাচ্ছা তাই!
চাকর ব্যাটা দিচ্ছে গালি, হাঁ করে সব খাচ্ছে তাই!

কচ্ছে সবাই যাচ্ছে তাই
আসছে যে-কেউ পাচ্ছে ঠাঁই,
ইকী রকম হচ্ছে ভাই?
কচ্ছে সবাই যাচ্ছে তাই।

তৃতীয় দৃশ্য

[কেদারকৃষ্ণ, জমিদার ও রামকানাই]

কেদার ডোণ্ট্ পরওয়ার ভাগনে! আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। তুমি বড় জোর দুটো দিন গা ঢাকা দিয়ে থাক। রামা!

রামকানাই আজ্ঞে—

কেদার তুই মেলা বুদ্ধি খরচ করিসনে—যা বলব তাই করে যাবি। আগে আমার বইগুলো আর খাতা পেনসিলটে বার করে রাখ্। [রামকানাইয়ের প্রস্থান] ভাগনে, তুমি নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোও গিয়ে, আমি সব সাবাড় করে দিচ্ছি—কিছু গোলটোল বাধলে সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিও—আমায় গাল দিয়ে একেবারে ভূত ছাড়িয়ে দিও।

[উভয়ের প্রস্থান। পণ্ডিত ও দুলিরামের প্রবেশ]

পণ্ডিত হ্যাঁ দেখ, কাল জমিদারমশাই বড় আপসোস কচ্ছিলেন—বলছিলেন, এই খেঁটুরামের উৎপাতে তাঁর আর সোয়াস্তি নেই—ওকে যত শিগগির পার অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় ক'রে দাও—আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে, প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ—বুঝলে কিনা।

দুলিরাম হ্যাঁ, এ আর একটা মুশকিল কি? এক্ষুনি ঘাড় ধরে—

[খেঁটুরামের প্রবেশ]

দাঁড়ান আমার গাঁয়ের লোক দুটোকে ডেকে আনি। [প্রস্থান]

পণ্ডিত হ্যাঁ দেখ, কাল জমিদারমশাই যা চটেছেন দুলিরামের উপর—কী বলব! দেখ, শেষটায় ওর জন্যেই তোমাদের সক্কলের অন্ন মারা যাবে। ওকে যদি তাড়াতে পার, আঃ—জমিদারমশাই যা খুশি হবেন!

খেঁটুরাম ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? সব ব্যাটাকে ভাগিয়ে দিচ্ছি, (*তোমাকে সুদ্ধ*)।

পণ্ডিত আর তোমার নিন্দেটা যা করে, কী বলব—এইমাত্র তোমার নামে যা নয় তা বলে গেল।

[দুলিরামের প্রবেশ]

রামা! ওরে রামারে! ঝট করে দুটো পান দিয়ে যা ত—রামাটা গেল কোথায়? ওহে, রামাকে একটু ডেকে দাও ত।

খেঁটুরাম না রে, ডাকিসনে।

দুলিরাম রামা!—হয়ত বাড়ি নেই!

খেঁটুরাম রামাটা ভারি দুষ্টু! এতক্ষণ হয়ত ছিল, যেই আপনি ডেকেছেন, অমনি হয়ত পালিয়েছে!

দুলিরাম হয়ত অসুখ টসুখ করেছে।

পণ্ডিত তোমরা হয়ত হয়ত করেই সব সারলে দেখছি! রামারে! [রামকানাইয়ের প্রবেশ]

রামা, জমিদারমশাই নিচে নামলে একটু খবর দিস ত, আমার একটু নিরিবিলি কথা আছে।

খেঁটুরাম আ মোলো যা! আমারও নিরিবিলি কথা আছে।

দুলিরাম আমারও আছে—

রামকানাই তোমরা বসে বসে ভেরেন্ডা ভাজো, তিনি আজ নিচে নামছেন না—তাঁর মামা এসেছেন যে! তাঁকে কিন্তু তোমরা চটিও না, ভারি বদমেজাজ আর রগচটা—এই যে তিনি আসছেন—আসুন, আসুন—ইনিই কেদারকেষ্টবাবু, জমিদারমশায়ের মামা!

[সকলের অভিবাদনাদি]

পণ্ডিত আসুন, আসুন—আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে নরানাং মাতুলক্রমঃ। আপনার ভাগনেটি—আহা! অতি চমৎকার লোক। আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলছে—

দুলিরাম নাঃ! আবার ন্যায়শাস্ত্র শুরু করল।

খেঁটুরাম চল আমরা একটু ঘুরে আসিগে। [প্রস্থান]

কেদার এই লোক দুটোর চেহারা ত বড় সুবিধের নয়—

পণ্ডিত তা সুবিধের হবে কোত্থেকে—হাজার হোক ছোটলোক ত! আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—"মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ।" আপনার ভাগনে তো কাউকে কিছু বলেন না—তাই ওরা আসকারা পেয়ে গেছে। এমনি বেয়াদবী করে—কী বলব!

কেদার বটে! তা আপনারা এর কোন প্রতিকার করেন না কেন?

পণ্ডিত কি করি বলুন? আপনারা থাকতে আমার ত কিছু বলা উচিত হয় না।

কেদার এক কাজ করুন, এর পর যদি কিছু বাড়াবাড়ি করে, ঘাড়টি ধরে বার করে দেবেন।

পণ্ডিত হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই ত করা উচিত। আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—"যা শত্রু পরে পরে।"

কেদার আহা, আপনার সঙ্গে কথা কয়েও সুখ আছে—কী পাণ্ডিত্য! আবার কি মিষ্ট স্বভাব! আমার এই কয়েকটা লেখা আছে, এগুলো আপনাকে একটু শোনাই—এমন সমঝদার লোক ত আর সচরাচর জোটে না! 'অমানিশার গভীর তমসাজাল ভেদ করিয়া ঐ পূর্বদিকে তরুণ তপন ধীরে ধীরে উঁকি মারছে। বিহঙ্গের কলকল্লোলে, শিশিরসিক্ত বায়ু হিল্লোলে দিগ্‌দিগান্ত আমোদিত মুখরিত উচ্ছ্বসিত হইয়া, আহা, স্বভাবের সেই শোভা ভারি চমৎকার হয়েছে! হে নিদ্রিত মানব সকল ঐ শুন বাছুরগুলি ল্যাজ তুলিয়া হাম্বা হাম্বা রবে ছুটিতেছে, তোমরা "উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত"। আহা, কবিরা ত সত্যই বলিয়াছেন, "পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল—"

পণ্ডিত চমৎকার হয়েছে! আমার একটু কাজ আছে—এক্ষুনি যেতে হবে।

কেদার একটু দাঁড়ান, এই জায়গাটা ভারি ইণ্টারেস্টিং ঃ
দিন নেই রাত নেই, সকাল নেই বিকাল নেই, রোদ নেই বৃষ্টি নেই, শীত নেই গ্রীষ্ম নেই—কেবল সেই এক কথা, সেই এক চিন্তা; সেই এক কল্পনা, এক জল্পনা, এক তন্ত্র, এক মন্ত্র। কেমন? সমুদ্রের ফেনিল লবণাম্বুরাশি নীলাম্বরাভিমুখে নৃত্য করিতে করিতে নিত্য নবোৎসাহে—কেমন? ভাষার কেমন একটা সহজ ভঙ্গী আছে সেইটা লক্ষ করেছেন? —সমুদ্রের ফেনিলাম্বুরাশি নীলাম্বরাভিমুখে নৃত্য করিতে করিতে নিত্য নবোৎসাহে সেই একই সুর, সেই একই ছন্দ, সেই একই সঙ্গীতকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে—তাহার শেষ নাই, অন্ত নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ক্ষান্তি নাই, বিচ্ছেদ নাই—

পণ্ডিত দাঁড়ান, আমার বড় তাড়াতাড়ি—ধাঁ করে এক্ষুনি আসব। [প্রস্থান]

কেদার হ্যাঁ, একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র ঝেড়ে দিয়েছি—আচ্ছা, আবার ঘুরে আসুক—হাড় জ্বালিয়ে ছাড়ব!
[নেপথ্যে]

খেঁটুরাম দেখ, চোরের দশদিন আর সাধুর একদিন।

দুলিরাম হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই ত সবই করবি, যা! যা!

[খেঁটুরাম ও দুলিরামের প্রবেশ]

খেঁটুরাম দেখ, মেলা চালাকি করিসনে, কিছু বলিনে বলে?

দুলিরাম একদিন ধরে এইসা পিট্‌টি দেব—

খেঁটুরাম দেখ, এসব আমি পছন্দ করি'না কিন্তু—

দুলিরাম দাঁড়া, আমার গাঁয়ের লোক দুটোকে ডেকে আনছি—

[পণ্ডিতের প্রবেশ]

পণ্ডিত (*দুলির প্রতি*) ওহে, হস্ত থাকিতে কেন মুখে কথা বল, ঘা দু-চার লাগিয়ে দেও না—

[খেঁটুরাম ও দুলিরামের লড়াই—পণ্ডিতের ইনটারফিয়ারেন্স]

অ্যাঁ! মারামারি কচ্ছ? এক্ষুনি ঘাড় ধরে বের করে দেব।

খেঁটুরাম কী! উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, আবার কথার ভঙ্গী দেখ।

দুলিরাম ঘাড় ধরবে? আমার গাঁয়ের লোক দুটো গেল কোথায়?

পণ্ডিত তোমাকে বলিনি ত! তোমাকে বলিনি!

খেঁটুরাম তবে আমাকে বলেছ? [প্রহার]

পণ্ডিত ইকী! উঃ! ওরে রামা! রামারে! শিগগির ছুটে আয়, ওহে—উঃ! দেখ, আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—উঃ!

[কেদারকৃষ্ণ ও রামকানাইয়ের প্রবেশ]

রামকানাই তোমরা কী আরম্ভ করেছ বল দেখি? দিনরাত কেবল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ?

খেঁটুরাম কি আরম্ভ করেছিস বল্ দেখি?

দুলিরাম দিনরাত কেবল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ?

পণ্ডিত আমাকে মারতে মারতে একেবারে কালশিরে পড়িয়ে দিয়েছে।

কেদার দেখ, আমার ভাগনে ভালোমানুষ, এসব সইতে পারে—কিন্তু আমার সহ্য হয় না। রামা!

রামকানাই যে আজ্ঞে। [খেঁটুরাম ও দুলিরামকে গলহস্ত]

দুলিরাম কী ভদ্রলোকের ঘাড়ে ধাক্কা!

খেঁটুরাম চাকর দিয়ে ইন্‌শাল্ট!

দুলিরাম কী! এত বড় কথা! এক্ষুনি আমি রাগ করে বাড়ি চলে যাব। তোকে অপমান করেছে—কক্ষনো এখেনে থাকিস না—আচ্ছা থাক, এবারে মাপ করা গেল। আর একবার কললে টের পাইয়ে দেব। আমার গাঁয়ের লোক দুটোকে খবর দিচ্ছি।

[খেঁটুরাম ও দুলিরামের ডিগনিফাইড একসিট, রামকানাইয়ের প্রস্থান]

পণ্ডিত দেখলেন ত! এর উপর ত আর ওষুধ চলে না!

কেদার হ্যাঁ—তা আসুন—একটু কাব্যালাপ করা যাক।

পণ্ডিত এই মাটি করেছ—আচ্ছা আজ রাত্রে বেশ করে শোনা যাবে।

কেদার না, রাত্রে ত সুবিধে হবে না—আমার চোখ খারাপ কিনা! শুনুন—ছেলেবেলায়, তখন আমার বয়স খুব কম ছিল—সাত বছর কি আট বছর হবে, কি বড় জোর নয় কি দশ কি এগার বারো। সেই সময়

আমি একখানা বই পড়েছিলাম—আঃ, সে একখানা বইয়ের মতন বই বটে! এখনো যখন তার কথা মাঝে মাঝে স্মৃতিপথে উদিত হয়, মন যেন একেবারে উৎসাহে আপ্লুত হয়ে যায়। শুনুন—চমৎকার বই, বোধোদয়—শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত—

পণ্ডিত ও আমি পাঁচশোবার পড়েছি।

কেদার পড়েছেন? কেমন! স্বীকার করুন, ভালো বই না? শুনুন— [পাঠ]

পণ্ডিত ঘ্যান ঘ্যান করে মাথা ধরিয়ে দিলে—

[ঘটিরাম ও কেষ্টার প্রবেশ]

ঘটিরাম মাথা ধরেছে? অ্যাঁ?

কেষ্টা আজ বুঝি আমাদের ছুটি? অ্যাঁ? [পণ্ডিত কর্তৃক উভয়কে চপেটাঘাত]

পণ্ডিত যা! এখন ত্যক্ত করিসনে—

কেষ্টা কিরে, তোকে মারল নাকি?

ঘটিরাম দুৎ! আমাকে মারবে কেন? তোকে ত মারল।

কেষ্টা হ্যাঁঃ! নিজে মার খেয়ে এখন—

ঘটিরাম আমি দেখলুম তোকে মারল— [উভয়ের প্রস্থান]

কেদার হ্যাঁ, তারপর শুনুন—

পণ্ডিত এ তো আচ্ছা বেল্লিকের হাতে পড়া গেল! ইকী মশায়! বলছি শুনব না—কেন খামখা বিরক্ত কচ্ছেন?

কেদার আহা! এইটে শুনে নিন—আমি ছেলেবেলায় একটা পোয়েট্রি লিখেছিলাম—তখন বয়েস অল্প। কিন্তু সে হিসেবে লেখাটা কেমন দেখুন—

একদা সকালে আমি খাইতেছিলাম ভাত
হেন কালে ধেয়ে আসে প্রকাণ্ড এক ব্যাঘ্র
ভয় পেয়ে সকলে ত থরহরি কম্পমান
চিৎকারিল কেহ সুকরুণ আর্তরবে অথবা যেমতি
লট্‌খটে গরুর গাড়ি চলিবার কালে
প্রকাশে দারিদ্র্য নিজ বিচিত্র বিলাপে—
কেহ জপে রাম নাম—আমি হয়ে ক্রুদ্ধ
ডাকিলাম ভৃত্যকে—'হরে, ধেয়ে যাও দ্রুত
রাস্তার দরজাটা করে দাও বন্ধ—
আর নিয়ে এস ঝট্ করে তিনতলা হতে
আমার সে দো-নলা বন্দুক'—এইরূপে
বাখানিল সবে মোর উপস্থিত বুদ্ধি
কহিল সকলে, 'আমি মরিতাম নির্ঘাৎ
যদি না থাকিত ব্যাঘ্র পিঞ্জরের মধ্যে—'

পণ্ডিত হাড় জ্বালালে দেখছি—

কেদার বকে বকে গলা শুকিয়ে গেল—এখন রামাকে লেলিয়ে দি গিয়ে—[প্রস্থান।

[খেঁটুরাম ও দুলিরামের প্রবেশ]

পণ্ডিত যাও, যাও, এখন আমায় ঘাঁটিও না, আমার মেজাজ ভালো নেই—

খেঁটুরাম ওরে বাসরে, দুর্বাসা মুনির মেজাজ ভালো নেই!

দুলিরাম দেখিস্ ঘাঁটাস টাঁটাসনে—শেষটায় ব্রহ্মতেজে ভস্ম হয়ে যাবি!

[রামকানাইয়ের প্রবেশ]

রামকানাই ওয়াক্—থুঃ—থু থু থু—ওয়াক্—

খেঁটুরাম ইকীরে? ওরকম কচ্ছিস কেন?

রামকানাই অ্যাঃ—থু—থু—কেরোসিন তেল খেয়ে ফেলেছি।

দুলিরাম কেরোসিন তেল খেয়েছিস?

খেঁটুরাম সিকী! কেরোসিন খেতে গেলি কেন রে?

রামকানাই শখ করে কি আর কেউ কেরোসিন খায়? শিশির গায়ে লেখা ছিল—লেমন্ সিরাপ!

দুলিরাম এখন একটা দেশলাইয়ের কাটি খেয়ে ফেল্—তাহলে সব ল্যাঠা চুকে যায়।

রামকানাই কি পণ্ডিতমশায়, আপনার ন্যায়শাস্ত্রে আর কিছু বলে টলেনি?

খেঁটুরাম (*মশা মারিতে মারিতে*) আর দাদা ন্যায়শাস্ত্র টাস্ত্র ভালো লাগে না—বলি আজকাল মশাটা কেমন বল দেখি?

রামকানাই বরাবর যেমন থাকে, ছোট ছোট কালো মতন, উড়ে বেড়ায়—

খেঁটুরাম আহা, বলি লাগে কেমন?

রামকানাই তা কি করে বলব? কখনো ভাজাও করিনি, চচ্চড়িও খাইনি।

খেঁটুরাম আহা বলি অত্যেচারটা দেখ্‌ছ ত?

রামকানাই অত্যেচার আবার কি! চুরিও করে না, ডাকাতিও করে না, পরের বাড়িতে আড্ডাও মারে না—

পণ্ডিত ওহে দেখ, তোমাদের ওসব ইয়ার্কি করতে হয় বাইরে গিয়ে কর—আমার কানের কাছে নয়! রামা! আমার ব্যাকরণটা গেল কোথায়—

রামকানাই ট্যাক্‌রম্?

পণ্ডিত তবেরে, ণত্বমিচ্ছন্তি বর্বরাঃ—আমার সঙ্গে রসিকতা?

রামকানাই আবার রসিকতা কি কললুম?

পণ্ডিত বলি, বইখানা কি কাগে নিল, না উড়ে গেল বাতাসে?

রামকানাই বাতাসা?

পণ্ডিত হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাতাসা—বাতাসা খাওয়াচ্ছি—এইরকম করে তোরা জিনিসপত্র লোসকান করবি? ব্যাটা হতভাগা জোচ্চোর—

[প্রহার। দুলিরাম ও খেঁটুরামের পলায়ন]

রামকানাই মেরে ফেললেরে! উঃ—ইকী মশাই! দাঁড়াও আমি মামাবাবুকে ডাকছি,

আর পুলিসে খবর দিচ্ছি।

পণ্ডিত ওহে শোনো শোনো—আমি কিন্তু সে রকম ভাবে মারিনি।

রামকানাই মেরেছ তার আবার রকম বেরকম কি হে? পুলিস! পুলিস! উঃ!

[রামার পতন। কেদারের প্রবেশ। পণ্ডিতের পলায়ন]

কেদার কিরে, চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় কললি যে! ব্যাপারটা কি?

রামকানাই আমায় মেরেছে! উঃ—আমায় মেরেছে—উঃ! কান দুটো ভোঁ ভোঁ কচ্ছে—মাথা ঘুরছে!

কেদার মেরেছে! বাঃ! এই তো চাই। দাঁড়া এইসা চাল চালব, একেবারে বাজি মাত। তুই এক কাজ কর, সেই দড়িটা আর লাল পাগড়িটা ঠিক করে রাখ। আর ঐ উঠোনটায় বসে বসে আর্তনাদ করতে থাক, যখন 'কোন্ হ্যায় রে' বলে ডাক দেব অমনি এসে হাজির হবি—একেবারে রামসিং দারোগা, বুঝলি ত? তুই খালি চেহারাটা দেখিয়ে যাবি—বোল-চাল সব আমি দেব। বাঃ, আপনা থেকে দিব্যি কাজ এগিয়ে গেল, তারপর ও দুটোকে সরাতে কতক্ষণ?

[রামকানাইয়ের প্রস্থান। পণ্ডিতের প্রবেশ]

পণ্ডিত রামার কী হয়েছে? বেশি কিছু হয়নি ত?

কেদার না, না, বেশি কিছু হয়নি। খান চার পাঁচ পাঁজর ভেঙে গেছে আর ডিজেসচান অফ দি লান্‌গ্‌স—সাংঘাতিক! তা আপনি কিছু ব্যস্ত হবে না। ও ব্যাটা আবার পুলিসে খবর না দেয়! সেবারে একটা এরকম কেস হয়েছিল—পুলিসে টের পেয়ে পাঁচ বছরের মতো চালান করে দিয়েছিল।

পণ্ডিত অ্যাঁ! অ্যাঁ! পাঁচ বছর!!

কেদার আপনি ব্যস্ত হবেন না! উঃ—সেবারে একটা লোক মারামারি করেছিল, তাকে দিয়েছিল ঘানি ঠেলতে। বলব কী মশাই, দেড় মাসে অর্ধেক রোগা!

পণ্ডিত অ্যাঁ—অ্যাঁ একেবারে অর্ধেক! অ্যাঁ!

কেদার তা আপনি বেশি ভাববেন না—ওই পুলিস ব্যাটারা কোনো রকমে টের না পেলেই হল—কিন্তু আজকাল যে রকম গোয়েন্দা টিকটিকির আমদানি হয়েছে—কোনো কথা লুকোবার যো নাই—আপনি কবার হাই তুললেন, তুড়ি দিলেন—সব খাতায় লেখা! সেবার এক ব্যাটা বামুন মারামারি করে লুকিয়েছিল—লুকোলে হবে কি? পুলিসে টের পেয়ে ধরে এনে পঁচিশ দফা জুতো!

পণ্ডিত অ্যাঁ! অ্যাঁ! বামুন? জুতো!!

কেদার বাইরে কে? কোন হ্যায় রে? তা আপনি বেশি ব্যস্ত হবেন না! আমি থাকতে ভয় কি? কি রকম ভাবে মেরেছিলেন বলুন ত?

পণ্ডিত খুব আস্তে পিঠের এইখেনে—

কেদার পিঠে! এইখেনে!! সর্বনাশ! ৭৯৪ ধারা! এর উপর ত আমার হাত নেই—

তা আপনি বেশি চিন্তিত হবে না। আমি দারোগাবাবুকে বলে কয়ে আপনার মেয়াদ কমিয়ে দেব।

[খেঁটুরাম ও দুলিরামের শশব্যস্তে প্রবেশ]

খেঁটুরাম এক ব্যাটা পুলিস ইদিকে আসছে!!

দুলিরাম আমায় দেখে রুল উঁচিয়ে আসছিল—আপনার বাক্সের মধ্যে একটা সোনার চেন ছিল—আমি কিন্তু সেটা চুরি করিনি।

খেঁটুরাম চুরি হবে কোত্থেকে—যেখানে যা থাকে আমরা সব যত্ন করে তুলে রাখি।

[খেঁটুরাম ট্যাঁক দেখাইল। পুলিসের প্রবেশ]

খেঁটুরাম এইরে! এইরে!

দুলিরাম ওই যে সিদিন নিতাইবাবুর একটা ঘড়ি চুরি হয়েছিল আমি কিন্তু তার কিছুই জানি না!

খেঁটুরাম আর, সিদিন যে চৌরাস্তার মোড়ে একটা লোক বেদম ঠেঙা খেয়েছিল—আমি কিন্তু তার গায়ে হাতও দিইনি।

দুলিরাম আমার পুঁটলির মধ্যে সোনার চেন, নক্সা কাটা কটা রুপোর ঘড়ি, দুটো আংটি এসব কিচ্ছু নেই।

পণ্ডিত হাম্ পুজোর সময় তোম্‌কো বহুত মিষ্টান্ন আউর পুলিপিঠে খাওয়ায়গা।

কেদার দারোগাবাবু আতা হায়?

পুলিস হাঁ বাবু—

কেদার হাত কড়া লেকর?

পুলিস হাঁ বাবু—

কেদার বাড়ি সারচ্ হোগা?

পুলিস হাঁ বাবু—

কেদার সব মাটি কললে—আচ্ছা, আমি ও ব্যাটাকে একটু ফাঁকতাল্‌লায় সরিয়ে নিচ্ছি, আপনি এই সুযোগে সরে পড়ুন—আর এ মুখো হবেন না—বছর দুই বাড়ি থেকে বেরোবেন না। তোমরা পালিও না কিন্তু। (*পুলিসের প্রতি*) আচ্ছা চল— [প্রস্থান]

পণ্ডিত আর থামাথামি নেই—একেবারে সেই বদ্যি পাড়ায় মামার বাড়ি গিয়ে উঠব—ওরে ঘটে, ওরে কেষ্টা, দৌড়ে আয়—ও ঘর থেকে আমার বিছানাটা আর শব্দকল্পদ্রুমখানা নিয়ে আয় ত! শিগগির বাড়ি চল। [প্রস্থান]

দুলিরাম আর কেন দাদা? পৈত্রিক প্রাণটি নিয়ে সরে পড়া যাক না!

খেঁটুরাম হ্যাঁ—পুলিসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় কাজ কি দাদা?

দুলিরাম জমিদার ব্যাটার কাণ্ডটা দেখ—আমাদের কি নাস্তানাবুদটাই কললে—চাকর দিয়ে ঘাড়ে ধাক্কা—তার উপরে পুলিস।

খেঁটুরাম আমরা বেচারারা যে দুটি করে খাচ্ছিলাম, সে আর তার সহ্য হল না।

দুলিরাম ছোটলোক! ছোটলোক! ওরে, গল্প আক্কেল গুড়ুমটা উঠিয়ে নে! যথা

লাভ! [প্রস্থান]

[কেদারকৃষ্ণ ও রামকানাইয়ের প্রবেশ]

কেদার দেখলি তো রামা! একেই বলে বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য—মানুষ চেনা চাই। ঠিক লক্ষণ দেখে ওষুধ দিতে হয়—

রামকানাই আজ্ঞে—ঝড়ে কাগ মরে আর ফকিরের কেরামত বাড়ে—

[জুড়ির গান]

ওরে ও চণ্ডীচরণ!
তোমার কি নাইরে মরণ!
কোন সাহসে চাকর ডেকে
ভদ্রলোকের কান মলাও!
তুমি সবার হাড় জ্বালাও!
বলে কিনা ঠাণ্ডা!
দুর্দান্ত পাষণ্ড ভণ্ড শয়তানেরি পাণ্ডা
তারেই বলে ঠাণ্ডা!
আণ্ডামানে পাঠিয়ে তারে মাথায় মারো ডাণ্ডা
তবেই হবে ঠান্ডা!
লাগাও চাঁটি অতি খাঁটি সাড়ে পঁচিশ গণ্ডা
তবেই হবে ঠাণ্ডা!

লক্ষ্মণের শক্তিশেল

পাত্রগণ

রাম	সুগ্রীব
জাম্বুবান	হনুমান
সভাসদ্গণ	বানরগণ
বিভীষণ	রাবণ
লক্ষ্মণ	যমদূতদ্বয়
দূত	যম

প্রথম দৃশ্য । রামের শিবির

রাম কাল রাত্তিরে আমি একটা চমৎকার স্বপ্ন দেখেছি। দেখলুম কি, রাবণ ব্যাটা একটা লম্বা তালগাছে চড়েছে। চড়তে চড়তে হঠাৎ পা পিছলে একেবারে—পপাত চ, মমার চ!

জাম্বুবান তবে হয়তো রাবণ ব্যাটা সত্যি সত্যিই মরেছে—রাজস্বপ্ন মিথ্যা হয় না।

সকলে হয় না, হবে না—হতে পারে না।

রাম আমি হনুমানকে বললুম, 'যা, ব্যাটাকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আয়।' হনুমান এসে বললে কি, 'ফেলবারও দরকার হল না—সে এক্কেবারে মরে গেছে।'

সকলে বাঃ বাঃ!—একদম মরে গেছে—ব্যস। আর চাই কি, খুব ফুর্তি কর!

[বাইরে গোলমাল]

ঐ দেখ্ রাবণের রথ দেখা যাচ্ছে—দেখেছিস? ঐটা রাবণ, ঐ যে লাঠি কাঁধে—

সকলে সে কি! রাবণ ব্যাটা তবু মরেনি—ব্যাটার জান্ তো খুব কড়া!

জাম্বুবান এই হনুমান ব্যাটাই তো মাটি কললে—তখন রাবণকে সমুদ্রে ফেলে দিলেই গোল চুকে যেত—না, ব্যাটা আবার বিদ্যে জাহির করতে গিয়েছে—'এক্কেবারে মরে গেছে'—

বিভীষণ চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে—

[দূতের প্রবেশ]

সকলে কি হে, খবর কি?

দূত আজ্ঞে, আমি এই মাত্র আসছি—

লক্ষ্মণ ব্যস! মস্ত খবর দিয়েছ আর কি!

জাম্বুবান এইমাত্র আসছ? তোপ ফেলতে হবে?

রাম আজ কি ঘটল না ঘটল সব ভালো করে গুছিয়ে বল।

দূত আজ্ঞে, আমি ছান টান করেই পুঁইশাক চচ্চড়ি আর কুমড়ো ছেঁচকি দিয়ে চাট্টি ভাত খেয়েই অমনি বেরিয়েছি—অবিশ্যি আজকে পাঁজিতে কুষ্মাণ্ড

ভক্ষণ নিষেধ লিখেছিল, কিন্তু কি হল জানেন? আমার কুমড়োটা পচে যাচ্ছিল কিনা—

সকলে — বাজে বকিসনে—কাজের কথা বল্।

দূত — হ্যাঁ—হ্যাঁ—খেয়ে উঠেই ঘণ্টা দু-তিন জিরিয়ে সেখানে গিয়ে দেখি খুব ঢাক-ঢোল বাজছে—ধ্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা—ধ্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা—ধ্যার‍্যা—

সকলে — মার—ব্যাটাকে মার—ব্যাটার কান কেটে দে!

জাম্বুবান — ব্যাটার ধ্যার‍্যার‍্যার‍্যা—চলেছে যেন রেকারিং ডেসিমাল!

সুগ্রীব — ব্যাটা, তুই ভালো করে ধারাবাহিকরূপে আদ্যোপান্ত পর্যায়পরম্পরা সব বলবি কি না?

রাম — তারপরে কি হল শুনি—ততঃ কিম্?

দূত — (*গান*) আসিছে রাবণ বাজে ঢক্ক ঢোল,
মহা ধুমধাম মহা হট্টোগোল।

সকলে — ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্?

দূত — শঙ্খ হুলাহুলি সানাই নিঃস্বন
কর্তাল ঝঙ্কার অস্ত্রের ঝনন।

সকলে — ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্?

দূত — লাখো লাখো সৈন্য চলে সাথে সাথে
উড়িছে পতাকা সমুখে পশ্চাতে।

সকলে — ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্?

দূত — বীর দর্পে সবে করে কোলাহল
মহা আস্ফালনে কাঁপে ধরাতল।

সকলে — ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্?

দূত — তাহাদের রুদ্র দাপটের চোটে
ভয়ে প্রাণ উড়ে পিলে চমকে ওঠে।

সকলে — ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্?

দূত — আজি দুর্দিনেতে নাহি কারো রক্ষা।
দলে বলে সবে পাবি আজি অক্কা।

জাম্বুবান — চোপরও বেয়াদব! মুখ সামলে কথা বলিস।

রাম — তুমি রাবণকে দেখেছ, এখান থেকে কত দূরে?

দূত — আজ্ঞে, এখেন থেকে প্রায় পাঁচ ঘণ্টার রাস্তা।

সকলে — হ্যাঁ—হ্যাঁ—পাঁচ ঘণ্টা, না পঁচিশ ঘণ্টা!

দূত — আজ্ঞে একটু দ্রুত হাঁটলে পোয়া ঘণ্টায় হতে পারে।

জাম্বুবান — তুমি কি করে আসছিলে? হামাগুড়ি দিয়ে?

রাম — কোনদিকে আসছিল, বল ত?

দূত — আজ্ঞে, তা তো জিজ্ঞেস করিনি।

সকলে — ব্যাটা! তুমি আছ কোন কর্মে?

রাম — তাড়াতাড়ি আসছিল, না আস্তে আস্তে?

দূত আজ্ঞে, তাড়াতাড়ি—আজ্ঞে, আস্তে। আজ্ঞে—সেটা ঠিক ঠাওর করে দেখিনি!

সকলে এটা কোথাকার অপদার্থ রে? দে, ওটাকে তাড়িয়ে দে।

বিভীষণ (*জাম্বুবানের প্রতি*) মন্ত্রীমশাই! একটা কথা শুনুন! কানে কানে বলব—

জাম্বুবান উঃ—দূৎ! বনমানুষ কোথাকার! তোর দাড়িতে ভারি গন্ধ! শুনব না—

দূত হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

বিভীষণ ব্যাটা হাসছিস কেন রে বেয়াদব? [প্রহার ও অর্ধচন্দ্র]

সুগ্রীব ওরে, কে কোথায় আছিস? আমার গদাটা নিয়ে আয় ত।

সকলে কেন? গদা কেন?

সুগ্রীব রাবণকে ঠ্যাঙাব!

[গান]

লিখিয়াছে ঠিক বটে পুরাতন শ্লোকে।
শাস্ত্র আদি পড়ে তবু মূর্খ হয় লোকে।।
পুঁথিগত বিদ্যে তার ভুঁড়িখানি ভরা।
পাণ্ডিত্যের অভিমানে ভ্রান্ত দেখে ধরা।।
বক্তৃতার গন্ধ পেলে গণ্ডে বহে লালা।
কূটতর্কে ত্রস্ত লোকে কর্ণ ঝালাপালা।।
সমস্বরে পরস্পরে পাড়ে গালাগালি—
মহাশব্দে বিশ্ব ফাটে কর্ণে লাগে তালি।।
লম্ফঝম্প ভঙ্গিমায় কেহ বা নহে কম।
কারে ছেড়ে কারে দেখি সমস্যা বিষম।।
সুকার্য্যে উৎসাহ নাই দেহে নাই বল।
ভক্তিহীন ভণ্ড যত নিষ্কর্মার দল।।
রোগা রোগা হাতে দেখি মোটা মোটা লাঠি।
প্লীহাগ্রস্ত ভুঁড়ো পেট ঠ্যাং যেন কাঠি।।
ক্ষীণদেহ খর্বকায় মুণ্ড তাহে ভারি।
যশোরের কই যেন নরমূর্তিধারী।।

[হনুমানের প্রবেশ]

হনুমান রাবণ বোধহয় আসছে!

সকলে যা—যা, ব্যাটা এতক্ষণে এক বাসি সংবাদ নিয়ে এসেছে!

সুগ্রীব চল হে লক্ষ্মণ, আমরা যুদ্ধ করি গিয়ে— [সকলের উত্থান ও প্রস্থান]

[ইতি সমাপ্তোয়ং লক্ষ্মণের শক্তিশেলাভিধেয়স্য কাব্যস্য প্রথমো সর্গঃ]

দ্বিতীয় দৃশ্য । রণস্থল

[সুগ্রীবের প্রবেশ]

সুগ্রীব (*ভয়ে ভয়ে*) কেউ নেই ত? [পাদচারণা]

[বিভীষণের প্রবেশ]

বিভীষণ দেখ, হাঁটছে দেখ—বাঁদুরে বুদ্ধি কিনা!—দূৎ! যুদ্ধ করতে এসেছিস, ওমনি করে হাঁটলে লোকে বাঙাল বলবে যে!—এমনি করে হাঁট্।

[নমুনা প্রদর্শন]

সুগ্রীব রেখে দেও তোমার ভড়ং! আমাদের দেশে ওরকম হাড়গিলের মতো করে হাঁটে না।

বিভীষণ তোদের দেশে আবার হাঁটতে জানে নাকি? আচ্ছা মানুষ ত!

সুগ্রীব মানুষ বললে কেন হে? খামকা গালি দিচ্ছ কেন?

[নেপথ্যে] **জাম্বুবান** ওরে তোরা পালিয়ে আয়, রাবণ আসছে।

বিভীষণ ও সুগ্রীব অ্যাঁ—কৈ?

[গান]

যদি রাবণের ঘুঁষি লাগে গায়—
তবে তুই মরে যাবি—তবে তুই ম—রে—যা—বি
ওরে, পালিয়ে যারে পালিয়ে যা
তা না হলে মরে যাবি—
লগুড়ের গুঁতো খেয়ে হঠাৎ একদিন মরে যাবি।

বিভীষণ ওরে আমার মনে পড়েছে—একটা বড্ড জরুরী কাজ বাকি আছে—সেটা চট করে সেরে আসছি। [প্রস্থান]

সুগ্রীব এইবার বোধহয় রাবণ আসবে—আজ একটা কিছু হয়ে যাবে—ইসপার নয় উসপার—

[রাবণের প্রবেশ]

সুগ্রীব [গান] তবেরে রাবণ ব্যাটা
তোর মুখে মারব ঝ্যাঁটা
তোরে এখন রাখ্‌বে কেটা
এবার তোরে বাঁচায় কেটা বল্।
(*তোর*) মুখের দুপাটি দন্ত
ভাঙিয়া করিব অন্ত
তোর এখনি হবে প্রাণান্ত
আয়রে ব্যাটা যমের বাড়ি চল্।।

রাবণ [গান] ওরে পাষণ্ড, তোর ও মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করিব।
যত অস্থি হাড়, হবে চুরমার, এমনি আছাড় মারিব।।
ব্যাটা গুলিখোর বুদ্ধি নেই তোর নেহাত তুই চ্যাংড়া।
আয় তবে আয় যষ্ঠির ঘায় করিব তোরে ল্যাংড়া।।

সুগ্রীব রেখে দে তোর গলাবাজি
ওরে ব্যাটা ছুঁচো পাজি
অন্তিম সময়ে আজি
ইষ্টদেবে কররে নমস্কার।

তুইরে পাষণ্ড ঘোর
পাল্লায় পড়িলি মোর
উদ্ধার না দেখি তোর
মোর হাতে না পাবি নিস্তার।।

রাবণ ওরে বেয়াদব কহিলে যে সব
ক্ষমা যোগ্য নহে কখন
তার প্রতিশোধ পাবিরে নির্বোধ
পাঠাব শমন সদন।। [প্রহার]

সুগ্রীব ওরে বাবা ইকী লাঠি
গেল বুঝি মাথা ফাটি
নিরেট গদা ইকী সর্বনেশে!
কাজ নেইরে খোঁচা খুঁচি
ছেড়ে দে ভাই কেঁদে বাঁচি
সাধের প্রাণটি হারাব কি শেষে? [সুগ্রীবের পলায়ন]

রাবণ ছি, ছি, ছি—এত গর্ব করে, এত আস্ফালন করে, শেষটায় চম্পট দিলি? শেম্! শেম্!!!

[লক্ষ্মণের প্রবেশ]

রাবণ [গান] আমার সহিত লড়াই করিতে
আগ্রহ দেখি যে নিতান্ত—
বুঝেছি এবার ওরে দুরাচার
ডেকেছে তোরে কৃতান্ত।
আমি পালোয়ান স্যাণ্ডো সমান
তুই ব্যাটা তার জানিস কি?
কোথায় লাগে বা কুরোপাটকিন
কোথায় রোজেদ্‌ভেনিস্কি?
এই যে অস্ত্র দেখিছ পষ্ট
শোভিছে আমার হস্তে
ইহারই প্রভাবে যমালয়ে যাবে
বানর কুল সমস্তে।
অযোধ্যার লোকে যোদ্ধা হয়েছে
শুনে মরি আমি হাসিয়া
(আজি) দেখাব শক্তি রাখিব কীর্তি
দলে বলে সবে নাশিয়া।।

লক্ষ্মণ [লাঠি চালাইয়া] হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ—হর্ হর্ হর্ হর্—মার্, মার্, মার্, মার্, মার্—কাট্ কাট্ কাট্ কাট্ কাট্ কাট্— [শক্তিশেলাহত]

লক্ষ্মণ হা হতোস্মি! [পতন ও মূর্ছা। রাবণ কর্তৃক লক্ষ্মণের পকেট লুণ্ঠন]

[হনুমানের প্রবেশ]

হনুমান অ্যাঁ! কি হচ্ছে—দেখে ফেলেছি!

[রাবণের পলায়ন। অন্যান্য বানরগণের আগমন]

বানরগণ [গান]

অবাক কল্লে রাবণ বুড়ো—
যষ্ঠির বাড়ি সুগ্রীবে মারি
কল্লে যে তার মাথা গুঁড়ো,
অবাক কল্লে রাবণ বুড়ো।

(আহা) অতি মহাতেজা সুগ্রীব রাজা
অঙ্গদেরি চাচা খুড়ো,
অবাক কল্লে রাবণ বুড়ো।

(আরে) গদা ঘুরাইয়া দিল উড়াইয়া
লক্ষ্মণেরি ধড়া চুড়ো—
অবাক কল্লে রাবণ বুড়ো।

(ওরে) লক্ষ্মণে মেরে বানর দলেরে
কল্লে ব্যাটা তাড়াহুড়ো
অবাক কল্লে রাবণ বুড়ো।

(ব্যাটা) বুদ্ধি বিপুল যুদ্ধে নিপুণ
কিন্তু ব্যাটা বেজায় ভুঁড়ো,
অবাক কল্লে রাবণ বুড়ো।।

[লক্ষ্মণকে লইয়া প্রস্থান]

[সমাপ্তেয়াং লক্ষ্মণের শক্তিশেলাভিধেয়স্য কাব্যস্য দ্বিতীয়ো সর্গঃ]

তৃতীয় দৃশ্য । রামচন্দ্রের শিবির

রাম কিছু আগে একটা গোলমাল শোনা যাচ্ছিল—বোধহয় কোথাও যুদ্ধ বেধে থাকবে।

বিভীষণ তা হবে!

[খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ব্যাণ্ডেজ বদ্ধ সুগ্রীবের সকাতর প্রবেশ]

বিভীষণ আরে ও পালওয়ানজি, একি হল—ষাট্ ষাট্ ষাট্। [সকলের উচ্চহাস্য]

রাম কি হে সুগ্রীব, তোমার যে দেখছি বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া হল।

বিভীষণ আজ্ঞে, বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো—

রাম যত তেজ বুঝি তোমার মুখেই।

জাম্বুবান আজ্ঞে হ্যাঁ, মুখেন মারিতং জগৎ।

রাম আমি বলি কি তুমি মস্ত যোদ্ধা।

জাম্বুবান যোদ্ধা ব'লে যোদ্ধা—ঢাল নেই তলোয়ার নেই খামচা মারেঙ্গা।

বিভীষণ আমি বরাবরই বলে আসছি—

সুগ্রীব দ্যাখ! তোর ঘ্যান্‌ঘ্যানানি আমার ভালো লাগে না—

রাম — রাবণের কেন বল এত বাড়াবাড়ি?—

পিঁপড়ের পাখা উঠে মরিবার তরে।
জোনাকি যেমতি হায়, অগ্নিপানে রুষি
সম্বরে খদ্যোত লীলা—

জাম্বুবান — আজ্ঞে ঠিক কথা

রাঘব বোয়াল যবে লভে অবসর
বিশ্রামের তরে—তখনি তো মাথা তুলি
চ্যাংড়া পুঁটি যত করে মহা আস্ফালন;

[বাইরে গোলমাল]

রাম — এত গোলমাল কিসের হে?

সুগ্রীব — রাবণ ইদিকে আসছে না ত?

জাম্বুবান ও বিভীষণ — অ্যাঁ—রাবণ আসছে—অ্যাঁ?

বিভীষণ — আমার ছাতাটা কোথায় গেল? ব্যাগটা?

জাম্বুবান — হ্যাঁরে তোর গায়ে জোর আছে? আমায় কাঁধে নিতে পারবি?

[জাম্বুবানের বিভীষণের কাঁধে চাপিবার চেষ্টা ও দূতের প্রবেশ]

দূত — শ্রীমান লক্ষ্মণ আসছেন।

[সকলে আশ্বস্ত]

রাম — অত হল্লা করে আসছে কেন? চেঁচাতে বারণ কর্।

দূত — আজ্ঞে, তিনি আসছেন ঠিক নয়—তবে হ্যাঁ, এক রকম আসছেনই বটে—মানে, তাঁকে নিয়ে আসছে।

জাম্বুবান — লোকটার কান মলে তাড়িয়ে দাও ত—ব্যাটা হেঁয়ালি পাকাবার আর জায়গা পায়নি!

[লক্ষ্মণকে ধরাধরি করিয়া সকলের প্রবেশ ও গান]

বললেন যাহা জাম্বুবান (সাবাস গণৎকার হে)
আনুপূর্বিক ঘটল তাহা শুনতে চমৎকার হে।
পড়লেন লক্ষ্মণ শক্তিশেলে (যেন) ঝড়ে কলাগাছ রে—
খাবি খেতে লাগলেন যেন ড্যাঙায় বোয়াল মাছ রে!
অনেক কষ্টে রৈল বেঁচে—(আহা) কপাল জোরে মৈল না—
(ওরে) স্বর্গ হৈতে কিচ্ছু তবু পুষ্পবৃষ্টি হৈল না!
ভাগ্যে মোরা সবাই সেথা ছিলাম উপস্থিত গো—
তা নৈলে ত ঘটত আজি হিতে বিপরীত গো!

রাম — হায়, হায়, হায়, হায়—হায় কি হল, হায় কি হল, হায় কি হল, হায় হায় হায়— [মূর্ছা]

বানরগণ — হায়-হায়-হায়-হায়-হায়-হায়, হায়-হায়-হায়-হায়-হায়-হায়, হায় কি হল-হল-হল-হল, হায় কি হল-হল-হল-হল-হল (ইত্যাদি)

[বানরগণের মাঝে-মাঝে কলা ভক্ষণ]

জাম্বুবান — এতগুলো লোক কি সেখানে ঘোড়ার ঘাস কাটছিল নাকি?

সুগ্রীব   হনুমান ব্যাটা কি কচ্ছিল?

হনুমান   আমি বাতাস খাচ্ছিলুম।

সুগ্রীব   ব্যাটা, তুমি বাতাসা খাওয়ার আর সময় পাও নি।

[গান]   শোনরে ওরে হনুমান   হওরে ব্যাটা সাবধান
আগে হতে পষ্ট ব'লে রাখি।
তুই ব্যাটা জানোয়ার   নিষ্কর্মার অবতার
কাজে কর্মে দিস বড় ফাঁকি।।
কাজ কর্ম ছেড়ে ছুড়ে   ঘুমোস খালি প'ড়ে প'ড়ে
অকাতরে নাকে দিয়ে তৈল—
শোন্‌রে আদেশ মোর   এই দণ্ডে আজি তোর
অষ্ট আনা জরিমানা হৈল।

হনুমান   (*জনান্তিকে*) মোটে আট আনা?

বিভীষণ   তারপর, তোমাদের মৎলব কি স্থির হল?

সুগ্রীব   এইবার সবাই মিলে রাবণ ব্যাটাকে কিছু শিক্ষা দিতে হবে।

সকলে   হ্যাঁ, হ্যাঁ! ঠিক কথা! ঠিক কথা!

[জাম্বুবানের নিদ্রা। সকলের গান]

রাবণ ব্যাটায় মারো, সবাই রাবণ ব্যাটায় মারো
(তার) মাথায় ঢেলে ঘোল (তারে) উল্টো গাধায় তোল
(তার) কানের কাছে পিটতে থাকো চোদ্দ হাজার ঢোল।।
কাজ কি ব্যাটার বেঁচে (তার) চুল দাড়ি গোঁফ চেঁচে
নস্যি ঢোকাও নাকে, ব্যাটা মরুক হেঁচে হেঁচে।
(তার) গালে দাও চুন কালি (তারে) চিমটি কাটো খালি
(তার) চোদ্দপুরুষ উড়িয়ে দাও পেড়ে গালাগালি।
(তারে) নাকাল কর আরো যে যেরকম পারো
রাবণ ব্যাটায় মারো, সবাই রাবণ ব্যাটায় মারো।।

[রামচন্দ্রের মূর্চ্ছাভঙ্গ ও গাত্রোত্থান]

বিভীষণ   এই যে, শ্রীরামচন্দ্র গাত্রোৎপাটন করেছেন!

রাম   তারপরে—ওষুধপত্রের কি ব্যবস্থা কললে?

সকলে   ঐ যা! ওষুধপত্রের ত কিছু ব্যবস্থা হল না?

রাম   মন্ত্রীমশাই গেলেন কোথা?

বিভীষণ   মন্ত্রীমশাই—একটু ঘুমোচ্ছেন।

সুগ্রীব   ব্যস! তবেই কেল্লা ফতে করেছেন আর কি!

সকলে   মন্ত্রীমশাই! আরে ও মন্ত্রীমশাই, আহা একবার উঠুন না!

[*ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি*]

বিভীষণ   বাবা! এ যে কুম্ভকর্ণের এক. কাটি বাড়া!

জাম্বুবান   (*সহসা জাগিয়া*) হ্যাঁরে, আমার কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিলি, ব্যাটা বেল্লিক বেরসিক, বেআক্কেল, বেয়াদব—হাঁড়িমুখো ভূত!

সকলে রাগ করবেন না—আহা রাগ করবেন না! কথাটা শুনুন।

[গান] আজকে মন্ত্রী জাম্বুবানের বুদ্ধি কেন খুলছে না?
সঙ্কটকালে চটপট কেন যুক্তির কথা বলছে না?
সর্বকর্মে অষ্টরম্ভা হর্দম পড়ে নাক ডাকছে—
উল্টে কিছু বলতে গেলে বিট্‌কেল বিট্‌কেল গাল পাড়ছে।
মরছে লক্ষ্মণ জানছে তবু দেখছে চেয়ে নিশ্চিন্তে
এন্নি স্বভাব ছিল না তার থাকতাম যখন কিষ্কিন্ধে।
হ্যাঙ্গাম দেখে হট্‌লে পরে নিন্দুক লোকে বলবে কি?
ভেবেই দেখ এন্নি করলে রাজ্যের কার্য চলবে কি?
মুখ্যু মোরা আক্কেল শূন্য এক্কেবারেই বুদ্ধি নেই—
সূক্ষ্মযুক্তি বলতে কারো ঠাকুদ্দাদার সাধ্যি নেই।
বলছি মোরা কিচ্ছু নেইকো চট্‌বার কথা এর মধ্যে
উঠে একবার ব্যবস্থা দেও প্রণাম করি ঠ্যাং পদ্মে।।

হনুমান (*জনান্তিকে*) হ্যাঁরে, আমার লেজে পাড়িয়ে দিলি?

রাম বুঝলে হে জাম্বুবান, তুমি কিনা হচ্ছ প্রবীণ লোক—এ-সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তোমার খুব অভিজ্ঞতা আছে—

জাম্বুবান আজ্ঞে হ্যাঁ—সে কথা আগে বললেই হত—তা না ব্যাটারা খালি ধাক্কাই মারছে—'মন্ত্রীমশাই, আরে ও মন্ত্রীমশাই'—আমি বলি বুঝি ডাকাত পড়ল নাকি?

রাম হ্যাঁ, এইবার একটা কিছু ব্যবস্থা দিয়ে ফেল।

জাম্বুবান (*হনুমানের প্রতি*) এই কাগজে যা প্রেসক্রিপশান লিখে দিচ্ছি, এই ওষুধগুলো চট করে নিয়ে আসতে হবে।

হনুমান আচ্ছা, কাল ভোর না হতে উঠে নিয়ে আসব।

জাম্বুবান না, না, এত দেরি করতে হবে না—এখুনি যা।

হনুমান আবার এত রাত্তিরে কোথায় যাব? সাপে কাটবে না বাঘে ধরবে।

সুগ্রীব ব্যাটা, শখের প্রাণ গড়ের মাঠ।

জাম্বুবান না, ওষুধগুলো এখনই দরকার।

হনুমান আঃ। হোমিওপ্যাথি লাগাও না।

জাম্বুবান যা বলছি শোন্। এই যা গাছের কথা লিখলাম—বিশল্যকরণী মৃত-সঞ্জীবনী—এই সব গাছের শেকড় আনতে হবে।

হনুমান আমি ডাক্তারখানা চিনিনে।

জাম্বুবান আ মরণ আর কি! একি কলকেতার শহর পেয়েছিস নাকি যে, বাথগেট কোম্পানি তোর জন্যে দোকান খুলে বসবে? কৈলেস পাহাড়ের কাছে গন্ধমাদন পাহাড় আছে জানিস ত?

হনুমান কৈলেস ডাক্তার আবার কে?

জাম্বুবান বাস! কানের পটহটা দেখি ভারি সরেস—ব্যাটা, কৈলেস পাহাড় জানিসনে?

হনুমান ও বাবা! সেই কৈলেস পাহাড়! এত রাত্তিরে আমি অত দূর যেতে পারব না।

জাম্বুবান যাবিনে কি রে ব্যাটা? জুতিয়ে লাল করে দেব। এখুনি যা—দেখিস পথে মেলা দেরি কারসনে।

হনুমান আমার কান কটকট কচ্ছে—

রাম আহা, যারে যা, আর গোল করিসনে—নে বকশিশ নে। [কলা প্রদান]

হনুমান যো হুকুম। [কুর্নিশ করিতে করিতে প্রস্থান]

জাম্বুবান তারপর রাত্তিরের জন্য একজন সেনাপতি নির্বাচন কর।

রাম কেন? রাত্তিরে যুদ্ধ করবে নাকি?

জাম্বুবান তা কেন? একজনকে একটু খবরদারি করতে হবে ত। তা ছাড়া, হয়ত লক্ষ্মণকে নিয়ে যমদূতগুলোর সঙ্গে ঝগড়া হতে পারে।

সকলে তা ত বটেই! মন্ত্রীমশাই না হলে এমন বুদ্ধি কার হয়?

সুগ্রীব (*স্বগত*) হ্যাঁ হ্যাঁ, এইবার ভায়া বিভীষণকে কিঞ্চিৎ ফাঁপরে ফেলতে হচ্ছে—

গান] আমার বচন শুন বিভীষণ করহ গ্রহণ সেনাপতি পদ
(আহা) সাজ সজ্জা কর, দিব্য অস্ত্র ধর সমরে সত্বর এ মহা বিপদ
(তুমি) বিপদে নির্ভীক বীর্যে অলৌকিক তোমার অধিক কেবা আছে আর
(আহা) জলেতে পাষাণ যায় গো ভাসান মুশকিলে আসান প্রসাদে তোমার—

সকলে ঠিক কথা—উত্তম কথা।

বিভীষণ তাই ত! মুশকিলে ফেললে দেখছি।

সুগ্রীব শুন সর্বজনে আজিকে এক্ষণে বীর বিভীষণে কর সেনাপতি
(আহা) শ্রীরামের তরে সম্মুখ সমরে যদি যায় মরে কিবা তাহে ক্ষতি?

সকলে তা ত বটেই—কিচ্ছু ক্ষতি নেই।

জাম্বুবান বেশ ত! তাহলে তাই ঠিক হল—খবরদার। দেখ, ভালো করে পাহারা দিও। কোনো ব্যাটাকে পথ ছাড়বে না—স্বয়ং যম এলেও নয়।—আর দেখ যেন ঘুমিও না। [বিভীষণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

বিভীষণ ইকী গেরো! আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল দেখছি!

[গান] বিধি মোর ভালে হায় কি লিখিল
আজ রাত্রে একি বিপদ ঘটিল।
দুর্মতি সুগ্রীব চির শত্রু মোর
ফেলিল আমারে সঙ্কটেতে ঘোর।
জাম্বুবান ব্যাটা কুবুদ্ধির ঢেঁকি
তার চক্রে পড়ি নিস্তার না দেখি।
আসে যদি কেহ রাত্রি দ্বিপ্রহরে—
ঠেকাব কেমনে একাকী তাহারে?
স্বর্গ হতে কহ দেবগণ সবে
আজি এ সঙ্কটে কি উপায় হবে?
যম হস্তে আজি না দেখি নিস্তার
সুযুক্তি তাহার কহ সবিস্তার

শুন দেবাসুর গন্ধর্ব কিন্নর—
মানব দানব রাক্ষস বানর।
শুন সর্বজনে মোর মৃত্যু হলে
শোকসভা ক'রো তোমরা সকলে।

সমাপ্তোয়ং লক্ষ্মণের শক্তিশেলাভিধেয়স্য কাব্যস্য তৃতীয়ো স্বর্গঃ

চতুর্থ দৃশ্য । শিবির প্রাঙ্গণ

[বিভীষণের পাহারাদারি—মধ্যে মধ্যে আয়নায় মুখাবলোকন ইত্যাদি]

বিভীষণ জাম্বুবান বলছিলেন, 'দেখো যেন ঘুমিও না'—বাপু, এমন অবস্থায় পড়ে যিনি ঘুম দিতে পারেন, তাঁকে আমি পাঁচশো টাকা বকশিশ দিতে পারি!

[পদচারণা ও উঁকি-ঝুঁকি]

তবে এ-পর্যন্ত যখন কোনো দুর্ঘটনা হয়নি—তাতে আমার কিছু কিছু ভরসা হচ্ছে—চাই কি, হয়ত বিনা গোলযোগে রাত কাবার হয়ে যেতে পারে। ...যাক! একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক—যমের ত ইদিকে আসবার কোনোই গতিক দেখছি না—আর, আসলেই বা কি? তাকে বাধা দেওয়াটা ত আর বুদ্ধিমানের কার্য হবে না!

[উপবেশন ও অচিরাৎ নিদ্রা। জাম্বুবানের প্রবেশ]

জাম্বুবান দেখেছ, আধ ঘণ্টা না যেতেই ঘঁৎ ঘঁৎ করে নাক ডাকতে আরম্ভ করেছে—ওরে বিভীষণ (খোঁচা দিয়া) ওঠ্!

বিভীষণ (*লাফাইয়া উঠিয়া*) কেরে! ও—জাম্বুবান যে—তুই বুঝি মনে করিছিলি আমি ঘুমিয়ে পড়েছি? আমি কিন্তু সত্যি করে ঘুমোইনি।

জাম্বুবান হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমায় আর সমঝাতে হবে না। দিব্যি পড়ে নাক ডাকছে—আবার বলে, 'সত্যি করে ঘুমোইনি।'

বিভীষণ তুই টের পাসনি?—আমি মিট্‌মিট্ করে চেয়ে দেখছিলাম।

জাম্বুবান না না—মিট্‌মিট্ করে দেখলে চলবে না—ভালো করে পাহারা দিতে হবে। [প্রস্থান]

বিভীষণ ব্যাটা ত ভারি জোচ্চোর! আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিল।

[পুনরুপবেশন ও পুনর্নিদ্রা]

[যমদূতদ্বয়ের প্রবেশ]

প্রথম দূত হ্যাঁরে, বাড়িটা ঠিক চিনে এসেছিস তো?

দ্বিতীয় দূত আরে, হাঁরে, হাঁ, এতদিন কাজ করেছি; একটা বাড়ি চিনতে পারব না?

প্রথম দূত তোকে কি বাৎলিয়ে দিয়েছিল বল্ ত?

দ্বিতীয় দূত আমাকে বলে দিয়েছে, যে, "সেই ডানদিকের উঠোনওয়ালা বাড়িটায় যাবি।"

প্রথম দূত ডানদিক ত এই—আর উঠোনকে উঠোন মিলে গেছে, তবে ত ঠিকই এসেছি—

দ্বিতীয় দূত হ্যাঁ, চল—মড়াটা খুঁজে দেখি! [অন্বেষণ করিতে করিতে বিভীষণোপরি পতন]

বিভীষণ কেরে! কেরে!

প্রথম ও দ্বিতীয় দূত [লাফাইয়া তিন হাত দূরে গিয়া] এটা কি আছে রে! এটা কি আছে রে!

দ্বিতীয় দূত ও বাপ্পো—এ মানুস্ আছে নাকি?

প্রথম ও দ্বিতীয় দূত ও বাপ্পো—মানুস্? জীয়ন্ত মানুস্? [ভয়ে কম্পিত]

দ্বিতীয় দূত কৈ রে কিছু ত বলছে না!

প্রথম দূত তাহলে বোধহয় কিছু বলবে না।

দ্বিতীয় দূত হ্যাঁ, বেশ অমায়িক চেহারা! ওকে জিজ্ঞেস কর ত?

প্রথম দূত তুই জিজ্ঞেস কর!

দ্বিতীয় দূত তুই জিজ্ঞেস কর না! আমি তোকে ধরে থাকব—

প্রথম দূত মশাই গো—মশাই—শুনুন মশাই—একটু পথ ছেড়ে দেবেন মশাই?

দ্বিতীয় দূত আমরা মশাই—গরীব বেচারা মশাই—

বিভীষণ (*স্বগত*) এ ত মজা মন্দ নয়! এরা দেখছি আমার ভয়ে থরহরি কম্পমান।

প্রথম দূত চল একটু পাশ কাটিয়ে চলে যাই! [পাশ কাটিয়া যাইবার উদ্যোগ]

প্রথম ও দ্বিতীয় দূত ওরে নারে, চোখ রাঙাচ্ছে—

[গান]

দয়াবান গুণবান ভাগ্যবান মশাই গো
তোমার প্রাণে একটুও কি দয়ামায়া নাই গো
তোমার তুল্য খাঁটি বন্ধু আর কাহারে পাই গো?
তুমি ভরসা নাহি দিলে অন্য কোথা যাই গো!
এ সময়ে তোমা ভিন্ন কে আছে সহায় গো—
কার্যোদ্ধার না হলে ত না দেখি উপায় গো।
পথ ছেড়ে দাও মুক্ত কণ্ঠে তোমার গুণ গাই গো
দয়াবান গুণবান ভাগ্যবান মশাই গো।।

বিভীষণ ভাগ্ ব্যাটারা, নইলে একেবারে প্রহারেন ধনঞ্জয় করে দেব।

[উভয় দূতের পলায়ন ও পুনঃপ্রবেশ]

প্রথম দূত হ্যাঁরে, পালাচ্ছিস কোথা? খালি হাতে গেলে যমরাজা কাউকে আস্ত রাখবে না।

দ্বিতীয় দূত তাই ত! তাই ত! এ ত ভারি মুশকিল হল—কি করা যায় বল্ দেখি?

প্রথম দূত আয় না, আমরাও ব্যাটার সঙ্গে লড়াই করি গিয়ে।

দ্বিতীয় দূত [গান] "যখন পরাজয় খলু অনিবার্য

তখন যুদ্ধ কি বুদ্ধির কার্য?"

প্রথম দূত তবে তো মুশকিল উপায় কি হবে?
সাধ করে কেবল প্রাণটা হারাবে?

দ্বিতীয় দূত আমিও তাই বলি লড়ায়ে কাজ নাই—
কাজেতে ইস্তফা এখনি দাও ভাই!

প্রথম ও দ্বিতীয় দূত হায় কি ঘটিল হায় কি ঘটিল
এমন সাধের চাকুরি ঘুচিল!

বিভীষণ ব্যাটারা রাত দুপুরে গান জুড়েছিস—চাব্‌কিয়ে রোগা করে দেব।

[দূতদ্বয় প্রস্থানোদ্যত ও দ্বারদেশে যমসহ সাক্ষাৎ]

প্রথম ও দ্বিতীয় দূত দোহাই মহারাজ, দোহাই যমরাজা, আমাদের কিছু দোষ নেই—ওই এক ব্যাটা আমাদের পথ ছাড়ছে না।

[যমের প্রবেশ]

বিভীষণ এই মাটি করেছে—এখন উপায়? আটকাতে গেলে যম মারবে, না আটকালে রাম মারবে। উভয় সঙ্কট। যা থাকে কপালে, ব্যাটাকে পথ ছাড়ব না। (*সদর্পে*) তবে রে ব্যাটা—আমায় চিনিসনে? আমি থাকতে তুই ঢুকবি?

[যমের অগ্রসর হওয়া]

দ্বিতীয় দূত ওরে এবার লড়াই বাধবে—

প্রথম দূত হ্যাঁরে ভারি মজা দেখা যাবে—

দ্বিতীয় দূত (*বিভীষণের*) পালা, পালা—এই বেলা পালা—

প্রথম দূত হ্যাঁ, ঐ যে অস্তর দেখছ ওর একটি ঘা খেলেই সদ্য কেষ্ট প্রাপ্তি হবে।

বিভীষণ তুই কে রে ব্যাটা মর্তে এসেছিস?

যম কালরূপী মৃত্যু আমি যম নাম ধরি—
সর্বগ্রাসী সর্বভুক সকল সংহারি।।
সর্বকালে সমভাব সকলের প্রতি,
ত্রিভুবনে সর্বস্থানে অব্যাহত গতি।।
অন্তিমেতে দেখা দেই কৃতান্তের বেশে—
মোর সাথে পরিচয় জীবনের শেষে।।
সংসারের মহাযাত্রা ফুরায় যেমন—
শ্রান্তজনে শান্তি দেই আমিই শমন।।

[পাহাড় লইয়া হনুমানের প্রবেশ]

[যমের মাথায় পাহাড় স্থাপন। যমের পতন]

হনুমান জয় রামের জয়!

প্রথম দূত ও কিরে!

দ্বিতীয় দূত ঐ যা! চাপা পড়ে গেল!

প্রথম দূত তাই ত রে, চাপা পড়ল যে!

দ্বিতীয় দূত (*সকাতরে*) হ্যাঁরে আমার মাইনে কে দেবে?

প্রথম দূত তাই ত! আমারও যে পাওনা আছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় দূত ওগো, আমাদের কি হল গো—ওগো, আমরা যে ধনেপ্রাণে মলুম গো—(*হনুমানের প্রতি*) পালোয়ান মশাই গো—সর্বনাশ কললেন গো—হায়, আমাদের কি হল গো—

প্রথম দূত ওরে যম ব্যাটা যে দিল ফাঁকি

দ্বিতীয় দূত মোদের তেরো আনা মাইনে বাকি

প্রথম দূত আহা দেখ্ না ব্যাটা ম'ল নাকি?

দ্বিতীয় দূত ওর চুলে ধরে দে না ঝাঁকি।

প্রথম দূত এই বিপদকালে কারে ডাকি
হায় হায় যম ব্যাটা যে দিল ফাঁকি।—অ্যাঁক্

[হনুমান কর্তৃক দূতদ্বয়ের গলা পাকড়ানো]

হনুমান ভাগ! ভাগ!—ব্যাটারা গান ধরেছে যেন কুকুরের লড়াই বেধেছে।

[দূতদ্বয়ের প্রস্থান]

বিভীষণ এবার সকলকে ডেকে নিয়ে আয়—

[হনুমানের প্রস্থান। লক্ষ্মণকে ধরাধরি করিয়া সকলের প্রবেশ]

সকলে ওটা কিরে? ওটা কিরে?

হনুমান আজ্ঞে, ওপরেরটা গন্ধমাদন পাহাড়।

জাম্বুবান ব্যাটা গোমুখ্যু কোথাকার, পাহাড়সুদ্ধু নিয়ে এসেছিস?

হনুমান আজ্ঞে, গাছ চিনিনে।—আর ঐ নিচেরটা যমরাজা।

সকলে আরে, আরে করেছিস কিরে ব্যাটা? করেছিস কি?

জাম্বুবান থাক, ওমনি থাক। আগে লক্ষ্মণের একটা কিছু গতিক করে নি, তারপর দেখা যাবে—

[ঔষধান্বেষণ—ঔষধ প্রয়োগে লক্ষ্মণের চেতনা লাভ]

সকলে বা, বা! কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ! কি সাফাই ওষুধ রে!

হনুমান হাজার হোক—স্বদেশী ওষুধ ত!

সকলে তাই বল! স্বদেশী না হলে কি এমন হয়?

জাম্বুবান হ্যাঁ, এইবার যমকে ছেড়ে দাও।

[পাহাড় সরাইয়া যমকে মুক্তিদান]

যম (*চোখ রগ্‌ড়াইয়া লক্ষ্মণের প্রতি*) সেকি! আপনি তবে বেঁচে আছেন?

লক্ষ্মণ তা না ত কি? তুমি জ্যান্ত মানুষ নিয়ে কারবার আরম্ভ করলে কবে থেকে?

যম আজ্ঞে, চিত্রগুপ্ত ব্যাটা আমায় ভুল বুঝিয়ে দিয়েছিল। আমি এখনি গিয়ে ব্যাটার চাকরি ঘুচোচ্ছি— [প্রস্থান]

লক্ষ্মণ হনুমান ব্যাটা বুঝি ওকে চাপা দিয়েছিল—ব্যাটার বুদ্ধি দেখ।

হনুমান তা বুদ্ধি থাকুক আর নাই থাকুক—ওষুধ এনে বাহাদুরিটা নিয়েছি ত।

বিভীষণ আমি পাহারা না দিলে ওষুধ কি হত রে—ওষুধ আনতে আনতে যমের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যেত। আমারই ত বাহাদুরি।

সুগ্রীব অর্থাৎ কিনা আমার বাহাদুরি—আমি বললুম তবে ত বিভীষণ পাহারা দিল—আর বিভীষণ পাহারা দিল বলেই ত যমদূতগুলো আট্‌কা পড়ল।

জাম্বুবান আরে ব্যাটা ওষুধের ব্যবস্থা কলল কে? তোদের বুদ্ধি সে সময় উড়ে গেছিল কোথায়?

রাম হ্যাঁ, সেটা ঠিক—কিন্তু আমি যুক্তির কথা না জিজ্ঞেস করলে তুমি হয়ত এখনো পড়ে নাক ডাকাতে!

লক্ষ্মণ আর আমি যদি শক্তিশেল খেয়ে না পড়তাম ত এত সব কাণ্ডকারখানা কিছুই হত না—আর তোমরাও বিদ্যে জাহির করতে পারতে না।

জাম্বুবান যাক, এখন মেলা রাত হয়ে গেছে, তোমরা স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তনপূর্বক নিদ্রার চেষ্টা দেখ; তোমাদের মাথা ঠাণ্ডা হবে আর আমিও একটু ঘুমিয়ে বাঁচব।

হনুমান আমায় কিছু বকশিশ দেবে না?

বিভীষণ হ্যাঁ, ওকে চারটি বাতাসা দিয়ে মধুরেণ সমাপয়েৎ করে দাও।

প্রথম আমার কথাটি ফুরোলো

দ্বিতীয় নটে গাছটি মুড়োলো।

তৃতীয় ক্যান্‌রে নটে মুড়োলি

চতুর্থ বেশ করেছি—তোর তাতে কিরে ব্যাটা।

সকলে ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

। ইতি সমাপ্তোযং লক্ষ্মণের শক্তিশেলাভিধেয়স্য কাব্যস্য চতুর্থ সর্গঃ ।

। সমাপ্তোয়ং মহানাটকং ।

অবাক জলপান

পাত্রগণ

পথিক	ছোকরা
প্রথম বৃদ্ধ	খোকা
দ্বিতীয় বৃদ্ধ	মামা

[ছাতা মাথায় এক পথিকের প্রবেশ, পিঠে লাঠির আগায় লোটা-বাঁধা পুঁটলি, উস্কোখুস্কো চুল, শ্রান্ত চেহারা]

পথিক নাঃ—একটু জল না পেলে আর চলছে না। সেই সকাল থেকে হেঁটে আসছি, এখনও প্রায় এক ঘণ্টার পথ বাকি। তেষ্টায় মগজের ঘিলু শুকিয়ে উঠল। কিন্তু জল চাই কার কাছে? গেরস্তের বাড়ি দুপুর রোদে দরজা এঁটে সব ঘুম দিচ্ছে, ডাকলে সাড়া দেয় না। বেশি চেঁচাতে গেলে হয়তো লোকজন নিয়ে তেড়ে আসবে। পথেও ত লোকজন দেখছিনে।—ঐ একজন আসছে! ওকেই জিজ্ঞেস করা যাক।

[ঝুড়ি মাথায় এক ব্যক্তির প্রবেশ]

পথিক মশাই, একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন?

ঝুড়িওয়ালা জলপাই? জলপাই এখন কোথায় পাবেন? এ ত জলপাইয়ের সময় নয়। কাঁচা আম চান দিতে পারি—

পথিক না না, আমি তা বলিনি—

ঝুড়িওয়ালা না, কাঁচা আম আপনি বলেননি, কিন্তু জলপাই চাচ্ছিলেন কিনা, তা ত আর এখন পাওয়া যাবে না, তাই বলছিলুম—

পথিক না হে, আমি জলপাই চাচ্ছিনে—

ঝুড়িওয়ালা চাচ্ছেন না তো, 'কোথায় পাব' 'কোথায় পাব' কচ্ছেন কেন? খামকা এরকম করবার মানে কি?

পথিক আপনি ভুল বুঝেছেন—আমি জল চাচ্ছিলাম—

ঝুড়িওয়ালা জল চাচ্ছেন তো 'জল' বললেই হয়—'জলপাই' বলবার দরকার কি? জল আর জলপাই কি এক হল? আলু আর আলুবোখরা কি সমান? মাছও যা আর মাছরাঙাও তাই? বরকে কি আপনি বরকন্দাজ বলেন? চাল কিনতে গেলে কি চালতার খোঁজ করেন?

পথিক ঘাট হয়েছে মশাই।। আপনার সঙ্গে কথা বলাই আমার অন্যায় হয়েছে।

ঝুড়িওয়ালা অন্যায় তো হয়েছেই। দেখছেন ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছি—তবে জলই বা চাচ্ছেন কেন? ঝুড়িতে করে কি জল নেয়? লোকের সঙ্গে কথা কইতে গেলে একটু বিবেচনা করে বলতে হয়। [প্রস্থান]

পথিক দেখলে! কি কথায় কি বানিয়ে ফেললে! যাক, ঐ বুড়ো আসছে, ওকে একবার বলে দেখি।

[লাঠি হাতে, চটি পায়ে, চাদর গায়ে এক বৃদ্ধের প্রবেশ]

বৃদ্ধ — কে ও? গোপ্‌লা নাকি?

পথিক — আজ্ঞে না, আমি পুবগাঁয়ের লোক—একটু জলের খোঁজ কচ্ছিলুম—

বৃদ্ধ — বল কিহে? পুবগাঁও ছেড়ে এখেনে এয়েছ জলের খোঁজ করতে?—হাঃ, হাঃ, হাঃ। তা, যাই বল বাপু, অমন জল কিন্তু কোথাও পাবে না। খাসা জল, তোফা জল, চমৎকা-া-র জল!

পথিক — আজ্ঞে হাঁ, সেই সকাল থেকে হাঁটতে হাঁটতে বেজায় তেষ্টা পেয়ে গেছে।

বৃদ্ধ — তা ত পাবেই। ভালো জল যদি হয়, তা দেখলে তেষ্টা পায়, নাম করলে তেষ্টা পায়, ভাবতে গেলে তেষ্টা পায়। তেমন তেমন জল ত খাওনি কখনো!—বলি ঘুম্‌ড়ির জল খেয়েছ কোনোদিন?

পথিক — আজ্ঞে না, তা খাইনি—

বৃদ্ধ — খাওনি? অ্যাঃ! ঘুম্‌ড়ি হচ্ছে আমার মামাবাড়ি—আদত জলের জায়গা। সেখানকার যে জল, সে কি বলব তোমায়? কত জল খেলাম—কলের জল, নদীর জল, ঝরনার জল, পুকুরের জল—কিন্তু মামাবাড়ির কুয়োর যে জল, অমনটি আর কোথায় খেলাম না। ঠিক যেন চিনির পানা, ঠিক যেন ক্যাওড়া-দেওয়া সরবৎ!

পথিক — তা মশাই আপনার জল আপনি মাথায় করে রাখুন—আপাতত এখন এই তেষ্টার সময়, যা হয় একটু জল আমার গলায় পড়লেই চলবে—

বৃদ্ধ — তাহলে বাপু তোমার গাঁয়ে বসে জল খেলেই ত পারতে? পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে জল খেতে আসবার দরকার কি ছিল? যা হয় একটা হলেই হল ও আবার কি রকম কথা? আর অমন তাচ্ছিল্য করে বলবারই বা দরকার কি? আমাদের জল পছন্দ না হয়, খেও না—বাস্‌। গায়ে পড়ে নিন্দে করবার দরকার কি? আমি ওরকম ভালোবাসিনে। হ্যাঃ—

[রাগে গজগজ করিতে করিতে বৃদ্ধের প্রস্থান]

[পাশের এক বাড়ির জানলা খুলিয়া আর এক বৃদ্ধের হাসিমুখ বাহির করণ]

বৃদ্ধ — কি হে? এত তর্কাতর্কি কিসের?

পথিক — আজ্ঞে না, তর্ক নয়। আমি জল চাইছিলুম, তা উনি সে কথা কানেই নেন না—কেবলই সাত পাঁচ গপ্‌প করতে লেগেছেন। তাই বলতে গেলুম ত রেগে মেগে অস্থির!

বৃদ্ধ — আরে দূর দূর! তুমিও যেমন! জিজ্ঞেস করবার আর লোক পাওনি? ও হতভাগা জানেই বা কি, আর বলবেই বা কি? ওর যে দাদা আছে, খালিপুরে চাকরি করে, সেটা ত একটা আস্ত গাধা। ও মুখ্যুটা কি বললে তোমায়?

পথিক — কি জানি মশাই—জলের কথা বলতেই কুয়োর জল, নদীর জল, পুকুরের জল, কলের জল, মামাবাড়ির জল, ব'লে পাঁচ রকম ফর্দ শুনিয়ে দিলে—

বৃদ্ধ — হুঁঃ—ভাবলে খুব বাহাদুরি করেছি। তোমায় বোকা মতন দেখে খুব চাল চেলে নিয়েছে। ভারি ত ফর্দ করেছেন! আমি লিখে দিতে পারি, ও যদি পাঁচটা জল বলে থাকে তা আমি এক্ষুনি পঁচিশটা বলে দেব—

পথিক — আজ্ঞে হ্যাঁ! কিন্তু আমি বলছিলুম কি একটু খাবার জল—

বৃদ্ধ — কি বলছ? বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা শুনে যাও। বিষ্টির জল, ডাবের জল, নাকের জল, চোখের জল, জিবের জল, হুঁকোর জল, ফটিক জল, রোদে ঘেমে জ—ল, আহ্লাদে গলে জ—ল, গায়ের রক্ত জ—ল, বুঝিয়ে দিল যেন জ—ল—কটা হয়? গোনোনি বুঝি?

পথিক — না মশাই, গুনিনি—আমার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই—

বৃদ্ধ — তোমার কাজ না থাকলেও আমাদের কাজ থাকতে পারে ত? যাও, যাও, মেলা বকিও না।—একেবারে অপদার্থের একশেষ! [সশব্দে জানলা বন্ধ]

পথিক — নাঃ, আর জলটল চেয়ে কাজ নেই—এগিয়ে যাই, দেখি কোথাও পুকুরটুকুর পাই কি না!

[লম্বা লম্বা চুল, চোখে সোনার চশমা, হাতে খাতা পেন্সিল, পায়ে কটকী জুতা, একটি ছোকরার প্রবেশ]

লোকটা নেহাৎ এসে পড়েছে যখন, একটু জিজ্ঞাসাই করে দেখি। মশাই, আমি অনেক দূর থেকে আসছি, এখানে একটু জল মিলবে না কোথাও?

ছোকরা — কি বলছেন? 'জল' মিলবে না? খুব মিলবে। একশোবার মিলবে! দাঁড়ান, এক্ষুনি মিলিয়ে দিচ্ছি—জল চল তল বল কল ফল—মিলের অভাব কি? কাজল-সজল-উজ্জ্বল-জ্বলজ্বল-চঞ্চল চল্ চল্, আঁখিজল ছল্‌ছল্, নদীজল কল্-কল্, হাসি শুনি খল্‌খল্, অ্যাঁকানল ব্যাঁকানল, আগল ছাগল পাগল—কত চান?

পথিক — এ দেখি আরেক পাগল! মশাই, আমি সে রকম মিলবার কথা বলিনি।

ছোকরা — তবে কোন রকম মিল চাচ্ছেন বলুন? কি রকম, কোন ছন্দ, সব বলে দিন—যেমনটি চাইবেন তেমনটি করে মিলিয়ে দেব।

পথিক — (*স্বগত*) ভালো বিপদেই পড়া গেল দেখছি—(*জোরে*) মশাই! আর কিছু চাইনে,—(*আরো জোরে*) শুধু একটু জল খেতে চাই!

ছোকরা — ও, বুঝেছি। শুধু—একটু—জল—খেতে—চাই! এই ত? আচ্ছা বেশ। এ আর মিলবে না কেন?—শুধু একটু জল খেতে চাই—ভারি তেষ্টা প্রাণ আই-ঢাই। চাই কিন্তু কোথা গেলে পাই—বল্ শীঘ্র বল্ নারে ভাই। কেমন? ঠিক মিলছে ত?

পথিক — আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব মিলছে—খাসা মিলছে—নমস্কার। (*সরিয়া গিয়া*) নাঃ, বকে বকে মাথা ধরিয়ে দিলে—একটু ছায়ায় বসে মাথাটা ঠাণ্ডা করে নি।

[একটা বাড়ির ছায়ায় গিয়া বসিল]

ছোকরা — (*খুশী হইয়া লিখিতে লিখিতে*) মিলবে না? বলি, মেলাচ্ছে কে? সেবার

যখন বিষ্টুদাদা 'বৈকাল' কিসের সঙ্গে মিল দেবে খুঁজে পাচ্ছিল না, তখন 'নৈপাল' বলে দিয়েছিল কে? নৈপাল কাকে বলে জানেন ত? নেপালের লোক হল নৈপাল। (পথিককে না দেখিয়া) লোকটা গেল কোথায়? দুত্তেরি! [প্রস্থান]

[বাড়ির ভিতরে বালকের পাঠ—পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল। সমুদ্রের জল লবণাক্ত, অতি বিস্বাদ]

পথিক ওহে খোকা! একটু এদিকে শুনে যাও ত?

[রুক্ষমূর্তি, মাথায় টাক, লম্বা দাড়ি খোকার মামা বাড়ি হইতে বাহির হইলেন]

মামা কে হে? পড়ার সময় ডাকাডাকি করতে এয়েছ?—(*পথিককে দেখিয়া*) ও! আমি মনে করেছিলুম পাড়ার কোন ছোকরা বুঝি। আপনার কি দরকার?

পথিক আজ্ঞে, জল তেষ্টায় বড় কষ্ট পাচ্ছি—তা একটু জলের খবর কেউ বলতে পারলে না।

মামা (*তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলিয়া*) কেউ বলতে পারলে না? আসুন, আসুন। কি খবর চান, কি জানতে চান, বলুন দেখি? সব আমায় জিজ্ঞেস করুন, আমি বলে দিচ্ছি। [ঘরের মধ্যে টানিয়া লওন—ভিতরে নানারকম যন্ত্র, নকশা, রাশি রাশি বই] কি বলছিলেন? জলের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন না?

পথিক আজ্ঞে হাঁ, সেই সকাল থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসছি—

মামা আ হা হা! কি উৎসাহ! শুনেও সুখ হয়। এ রকম জানবার আকাঙ্ক্ষা কজনের আছে, বলুন ত? বসুন! বসুন! (কতগুলি ছবি, বই আর এক টুকরা খড়ি বাহির করিয়া) জলের কথা জানতে গেলে প্রথমে জানা দরকার, জল কাকে বলে, জলের কি গুণ—

পথিক আজ্ঞে, একটু খাবার জল যদি—

মামা আসছে—ব্যস্ত হবেন না। একে একে সব কথা আসবে। জল হচ্ছে দুই ভাগ হাইড্রোজেন আর এক ভাগ অক্সিজেন—[বোর্ডে খড়ি দিয়া লিখলেন— $H_2+O=H_2O$]

পথিক এই মাটি করেছে।

মামা বুঝলেন? রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জলকে বিশ্লেষণ করলে হয়—হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন। আর হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ হলেই, হল জল! শুনছেন ত?

পথিক আজ্ঞে হ্যাঁ, সব শুনছি। কিন্তু একটু খাবার জল যদি দেন, তাহলে আরো মন দিয়ে শুনতে পারি।

মামা বেশ ত! খাবার জলের কথাই নেওয়া যাক না। খাবার জল কাকে বলে? না, যে জল পরিষ্কার, স্বাস্থ্যকর, যাতে দুর্গন্ধ নাই, রোগের বীজ নাই—কেমন? এই দেখুন এক শিশি জল—আহা, ব্যস্ত হবেন না। দেখতে মনে হয় বেশ পরিষ্কার, কিন্তু অনুবীক্ষণ দিয়ে যদি দেখেন, দেখবেন

পোকা সব কিলবিল করছে। কেঁচোর মতো কৃমির মতো সব পোকা— এমনি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখায় ঠিক এত্তো বড় বড়। এই বোতলের মধ্যে দেখুন, ও বাড়ির পুকুরের জল; আমি এইমাত্র পরীক্ষা করে দেখলুম, ওর মধ্যে রোগের বীজ সব গিজ্‌গিজ্ করছে—প্লেগ, টাইফয়েড, ওলাউঠা, ঘেয়োজ্বর—ও জল খেয়েছেন কি মরেছেন! এই ছবি দেখুন—এইগুলো হচ্ছে কলেরার বীজ, এই ডিপথেরিয়া, এই নিউমোনিয়া, ম্যালেরিয়া—সব আছে। আর এই সব হচ্ছে জলের পোকা—জলের মধ্যে শ্যাওলা ময়লা যা কিছু থাকে, ওরা সেইগুলো খায়। আর এই জলটার কি দুর্গন্ধ দেখুন! পচা পুকুরের জল— ছেঁকে নিয়েছি, তবু গন্ধ।

পথিক	উঁ হুঁ হুঁ হুঁ! করেন কি মশাই? ওসব জানবার কিচ্ছু দরকার নেই—

মামা	খুব দরকার আছে। এ সব জানতে হয়—অত্যন্ত দরকারী কথা!

পথিক	হোক দরকারী—আমি জানতে চাইনে, এখন আমার সময় নেই।

মামা	এই ত জানবার সময়। আর দুদিন বাদে যখন বুড়ো হয়ে মরতে বসবেন, তখন জেনে লাভ কি? জলে কি কি দোষ থাকে, কি করে সে সব ধরতে হয়, কি করে তার শোধন হয়, এসব কি জানবার মতো কথা নয়? এই যে সব নদীর জল সমুদ্রে যাচ্ছে, সমুদ্রের জল সব বাষ্প হয়ে উঠছে, মেঘ হচ্ছে, বৃষ্টি পড়ছে—এরকম কেন হয়, কিসে হয়, তাও ত জানা দরকার?

পথিক	দেখুন মশাই! কি করে কথাটা আপনাদের মাথায় ঢোকাব তা ত ভেবে পাইনে। বলি, বারবার করে যে বলছি—তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, সেটা ত কেউ কানে নিচ্ছেন না দেখি। একটা লোক তেষ্টায় জল-জল করছে তবু জল খেতে পায় না, এরকম কোথাও শুনেছেন?

মামা	শুনেছি বৈকি—চোখে দেখেছি। বদ্যিনাথকে কুকুরে কামড়াল, বদ্যিনাথের হল হাইড্রোফোবিয়া—যাকে বলে জলাতঙ্ক। আর জল খেতে পারে না— যেই জল খেতে যায় অমনি গলায় খিঁচ ধরে যায়। মহা মুশকিল!— শেষটায় ওঝা ডেকে, ধুতুরো দিয়ে ওষুধ মেখে খাওয়াল, মন্তর চালিয়ে বিষ ঝাড়াল—তারপর সে জল খেয়ে বাঁচল। ওরকম হয়।

পথিক	নাঃ—এদের সঙ্গে আর পেরে ওঠা গেল না—কেনই বা মরতে এয়েছিলাম এখেনে? বলি, মশাই, আপনার এখানে নোংরা জল আর দুর্গন্ধ জল ছাড়া ভালো খাঁটি জল কিছু নেই?

মামা	আছে বৈকি! এই দেখুন না বোতলভরা টাটকা খাঁটি 'ডিস্টিল ওয়াটার'— যাকে বলে 'পরিশ্রুত জল'।

পথিক	(*ব্যস্ত হইয়া*) এ জল কি খায়?

মামা	না, ও জল খায় না—ওতে ত স্বাদ নেই—একেবারে বোবা জল কিনা,

এইমাত্র তৈরি করে আনল—এখনো গরম রয়েছে।

[পথিকের হতাশ ভাব]

তারপর যা বলছিলাম শুনুন—এই যে দেখছেন গন্ধওয়ালা নোংরা জল—এর মধ্যে দেখুন এই গোলাপী জল ঢেলে দিলুম—বাস, গোলাপী রঙ উড়ে শাদা হয়ে গেল। দেখলেন ত?

পথিক না মশাই, কিচ্ছু দেখিনি—কিচ্ছু বুঝতে পারিনি—কিচ্ছু মানি না—কিচ্ছু বিশ্বাস করি না—

মামা কি বললেন! আমার কথা বিশ্বেস করেন না?

পথিক না, করি না। আমি যা চাই, তা যতক্ষণ দেখাতে না পারবেন, ততক্ষণ কিছু শুনব না, কিচ্ছু বিশ্বাস করব না।

মামা বটে! কোনটা দেখতে চান একবার বলুন দেখি—আমি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি—

পথিক তাহলে দেখান দেখি। শাদা, খাঁটি, চমৎকার, ঠাণ্ডা, এক গেলাশ খাবার জল নিয়ে দেখান দেখি। যাতে গন্ধপোকা নেই, কলেরার পোকা নেই, ময়লাটয়লা কিচ্ছু নেই, তা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখান দেখি।

মামা এক্ষুনি দেখিয়ে দিচ্ছি—ওরে ট্যাপা, দৌড়ে আমার কুঁজো থেকে এক গেলাশ জল নিয়ে আয় ত।

[পাশের ঘরে দুপদাপ শব্দে খোকার দৌড়]

নিয়ে আসুক, তারপর দেখিয়ে দিচ্ছি। ঐ জলে কি রকম হয়, আর এই নোংরা জলে কি রকম তফাৎ হয়, সব আমি এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছি।

[জল লইয়া ট্যাপার প্রবেশ]

রাখ, এইখানে রাখ।

[জল রাখিবামাত্র পথিকের আক্রমণ—মামার হাত হইতে জল কাড়িয়া এক নিশ্বাসে চুমুক দিয়ে শেষ]

পথিক আঃ! বাঁচা গেল!

মামা (*চটিয়া*) এটা কি রকম হল মশাই?

পথিক পরীক্ষা হল—এক্সপেরিমেণ্ট! এবার আপনি নোংরা জলটা একবার খেয়ে দেখান ত, কি রকম হয়?

মামা (*ভীষণ রাগিয়া*) কি বললেন!

পথিক আচ্ছা থাক, এখন নাই বা খেলেন—পরে খাবেন এখন। আর এই গাঁয়ের মধ্যে আপনার মতো আনকোরা পাগল আর যতগুলো আছে, সব কটাকে খানিকটে করে খাইয়ে দেবেন। তারপর খাটিয়া তুলবার দরকার হলে আমায় খবর দেবেন—আমি খুশী হয়ে ছুটে আসব—হতভাগা জোচ্চোর কোথাকার! [দ্রুত প্রস্থান]

[পাশের গলিতে সুর করিয়া কে হাঁকিতে লাগিল—'অবাক জলপান']

হিংসুটি

পাত্রীগণ

পাঁচটি মেয়ে স্বপ্নবুড়ি হিংসে

[পাঁচটি ছোট মেয়ের প্রবেশ]

প্রথম আমি ভাই একটা স্বপ্ন দেখেছি—এমন মজার!

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম কি ভাই—কি স্বপ্ন? বল্ না ভাই—

প্রথম না ভাই, আমি ঐ ওকে বলব না—ও ভারি হিংসুটে।

পঞ্চম আচ্ছা, নাই বা বললি। ভারি তো স্বপ্ন—আমি বুঝি আর স্বপ্ন দেখতে জানিনে—

প্রথম দেখলি ভাই, কি রকম হিংসে!

দ্বিতীয়, তৃতীয় আচ্ছা, ওকে নাই বা বললি, আমাদের বল না।

চতুর্থ আর না হয় ও শুনলই বা—তাতে দোষ কি ভাই?

পঞ্চম আমার বয়ে গেছে—ও ছাই স্বপ্ন আমি একটুও শুনতে চাই না।

প্রথম শুনলি ভাই! কি রকম হিংসে করে করে কথা কয়? আমি কি ওকে শুনতে বলেছি?

চতুর্থ কিসের স্বপ্ন ভাই?—রাজহাঁসের?

প্রথম দুৎ! রাজহাঁসের স্বপ্নকে বুঝি মজার স্বপ্ন বলে?

চতুর্থ হ্যাঁ। রাজহাঁসের স্বপ্ন খুব মজার হয়। আমি যখন রাজহাঁসদের সঙ্গে মেঘের মধ্যে ভাসছিলাম, তখন নীল নীল ঢেউগুলো সব আমার গায়ে লাগছিল। আর তারাগুলো সব ফুটেছিল, ঠিক যেন পদ্মফুলের মত! আমার খুব মজা লাগছিল।

পঞ্চম তুই সেখানে দোলনা-দেওয়া লালফুলের বাগান দেখেছিলি?—আর পেখমধরা ময়ূর দেখেছিলি?

চতুর্থ কই, না ত!

পঞ্চম আমি দেখেছিলাম। ময়ূরদের পায়ে সোনার ঘুঙুর এমনি সুন্দর বাজছিল! —এমন সময় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, শুনলাম সকালবেলায় বোর্ডিঙের ঘণ্টা বাজছে।

প্রথম দেখলি ভাই, আমি একটা কথা বলতে যাচ্ছিলুম, এর মধ্যে কি রকম বকবক্ করতে লেগেছে! ওরা ইচ্ছে করে আমায় বলতে দেবে না।

দ্বিতীয়, তৃতীয় আহা, তোরা একটু থাম না বাপু—

প্রথম আবার কিন্তু ও রকম করলে আমি কক্ষনো বলব না।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ না, না, কেউ বাঁধা দেব না—বল্।

প্রথম আমি স্বপ্ন দেখেছি—ঐ বাগানের মধ্যে একটা মেলা হচ্ছে। আমি সেই মেলায় গিয়েছি, আর সেখানে এক মেম সকলকে পুতুল দিচ্ছে—ঠিক

এত্তো বড় বড় পুতুল!—তার জন্যে পয়সা নিচ্ছে না!—আমায় একটা পুতুল দিল, তার মাথা ভরা কোঁকড়া চুল, এমনি মোটা মোটা গাল, আর ঠিক সত্যিকার মানুষের মতন কথা বলে।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও—মা! কি চমৎকার!

তৃতীয় হাত-পা নাড়তে পারে?

চতুর্থ নিজে নিজে চলতে পারে?

দ্বিতীয় হাসতে পারে?

প্রথম হ্যাঁ, হাসতে পারে, খেলতে পারে, সব পারে।

পঞ্চম সত্যিকার মানুষের মতন তৈরি?

দ্বিতীয় কেন—এখন যে বড় কথা বলতে এয়েছিস?

তৃতীয় তবে যে বলছিলি ছাই স্বপ্ন—তুই একটুও শুনতে চাস না—

চতুর্থ তা কেন? তোরাই ত ভাই ওকে শুনতে দিচ্ছিলি না।

প্রথম বেশ করেছি। ও কেন কথায় কথায় হিংসে করে? তারপর শোন—সবাইকে পুতুল দিল, কিন্তু কারু পুতুল ও রকম কথাও কয় না, খেলাও করে না—আর, ঐ ও একটা পুতুল পেয়েছিল—নোংরা, কালো, দাঁতভাঙা, বিচ্ছিরি মতন।

পঞ্চম ইস! তা বৈকি! নিজের বেলায় সব ভালো ভালো, আর পরের বেলায় সব নোংরা আর ময়লা আর বিচ্ছিরি!

প্রথম দেখলি ভাই, কি রকম হিংসে করে করে বলছে! মেমসাহেব ও রকম দিয়েছে, তা আমি কি করব ভাই?

তৃতীয় হ্যাঁ, তা ছাড়া এ ত সত্যি নয়—স্বপ্ন।

দ্বিতীয় স্বপ্ন নিয়ে আবার হিংসে কি?—ছি-ছি-ছি!

চতুর্থ হ্যাঁ—তারপর কি হল ভাই?

প্রথম তারপর সে পুতুল নিয়ে কত মজা হল—সব আমার মনেও নেই। শেষটায় কিন্তু ভাই আমার ভারি কষ্ট হয়েছিল।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ কেন? কি হয়েছিল?

প্রথম সে ভাই বলব কি—পুতুলটাকে সবাই নিয়ে দেখছে দেখছে, হঠাৎ দেখি পুতুলটা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। আমার ভাই এমন কান্না পেতে লাগল।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ কি করে ভাঙল ভাই?

প্রথম কি জানি, কি করে! আমার বোধহয়, নিশ্চয়ই ঐ হিংসুটিটা কখন হিংসে করে ভেঙে দিয়েছিল!

পঞ্চম মাগো! এমন বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারে আমার নামে!

প্রথম তা বৈকি! যারা হিংসুটি, তারা স্বপ্নেও হিংসুটি হয়।

দ্বিতীয় হয় না তো কি? নিশ্চয়ই হয়—হিংসুটি! হিংসুটি!

তৃতীয় আমি কিন্তু ভাই যেদিন স্বপ্নে পথ হারিয়েছিলুম, সেদিন ও আমায় পথ বলে দিয়েছিল।

চতুর্থ — কি করে পথ হারিয়েছিলি ভাই?

তৃতীয় — সেই একটা বাগানের মধ্যে এক বুড়ি একটা কাঠি ছুঁয়ে ছুঁয়ে সবাইকে পাথর করে দিচ্ছিল—আর আমি কিছুতেই পালাবার পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তারপর ও এসে আমায় একটা লুকোনো পথ দেখিয়ে দিল, সেইখেন দিয়ে আমরা পালিয়ে গেলাম।

চতুর্থ — তবু কিন্তু, ভাই, ওরা ওকে হিংসুটি বলে!—আচ্ছা ভাই, তুই বুঝি খালি ময়ূরের স্বপ্ন দেখিস?

পঞ্চম — না—সে খালি একদিন দেখেছিলাম। অন্য সময়ে আমি আল্‌তামাসির স্বপ্ন দেখি।

তৃতীয়, চতুর্থ — আল্‌তা মাসি কে ভাই?

পঞ্চম — সে আমার একজন মাসি হয়। তার কেউ নেই কিনা, সব মরে গিয়েছে, তাই সে রোজ রোজ কাঁদে। আমি ভাই স্বপ্ন দেখি, আল্‌তা মাসির খোকাকে কত করে খুঁজছি; কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। আর আল্‌তামাসির চোখ দিয়ে কেবলি জল পড়ছে।

প্রথম — দেখলি ভাই, আমার দেখাদেখি ও আবার এক স্বপ্ন বলতে লেগেছে। এমন হিংসুটে!

দ্বিতীয় — ওঃ! আমার ভাই বড় ঘুম পেয়ে গেল!

পঞ্চম — হ্যাঁ, তাই ত! চোখ বুজে আসছে যে!

[একে একে সকলে বসিয়া পড়িল, ঘুমে চোখ ঢুলিতে লাগিল। স্বপ্নবুড়ি স্বপ্নের গান গাহিতে গাহিতে সকলের চোখে ঘুমের কাঠি বুলাইয়া দিল। রঙ-মাখানো বিশ্রী চেহারা, ঝুঁটিবাঁধা কে একজন আসিয়া প্রথম ও দ্বিতীয়ার পিছনে দাঁড়াইল। তাহার নাম হিংসে]

পঞ্চম — ঠিক যেন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। না, ভাই?

চতুর্থ — হ্যাঁ—সত্যি হচ্ছে, কি স্বপ্ন হচ্ছে, কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না।

তৃতীয় — ও মা! ও কে ভাই? ঐ যে দাঁড়িয়ে আছে?

চতুর্থ, পঞ্চম — মাগো! কি বিশ্রী চেহারা!

হিংসে — দেখ্‌ ত, আমায় চিনিস কিনা?

প্রথম — হ্যাঁ,—কোথায় দেখেছি মনে নেই, কিন্তু চেনা চেনা লাগছে।

দ্বিতীয় — তুই কোথায় থাকিস ভাই?

হিংসে — তাও জানিসনে? এই ত, তোদের মনের মধ্যেই থাকি।

প্রথম — মনের মধ্যে থাকে সে আবার কি রকম ভাই? সেখানে কি থাকবার জায়গা আছে?

হিংসে — হ্যাঁ, আছে বৈকি। ঘর বাগান জল মাটি আকাশ—সব আছে।

দ্বিতীয় — তাই নাকি? তোর নাম কি ভাই?

হিংসে — আমার নাম হিংসে—হিংসুটিদের মনের মধ্যে যে থাকে, সেই হিংসে—

তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম — হিংসে হাসি চিম্‌সে বাঁকা—
কাল্‌কুট্‌কুট্ গরল মাখা।

দ্বিতীয় কি সুন্দর কালো কালো হাত দেখেছিস?
প্রথম হ্যাঁ, আবার মুখে কি সুন্দর রং বেরঙের কাজ করেছে!
চতুর্থ মাগো! ওকে আবার সুন্দর বলছে!
তৃতীয়, পঞ্চম এমন কুচ্ছিত! ছ্যাঃ!
প্রথম আচ্ছা ভাই, যারা হিংসুটি, তারা বুঝি খুব দুষ্টু?
হিংসে হ্যাঁ, দুষ্টু বৈকি—দুষ্টু আর ঝগড়াটে—
প্রথম কথায় কথায় বুঝি রাগ করে?
হিংসে হ্যাঁ, নিজেরা রাগ করে আর অন্যদের বলে হিংসুটি।
দ্বিতীয় অন্যদের ভালো দেখতে পারে না, না?
হিংসে একেবারেই পারে না। এমনিও পারে না—স্বপ্নেও পারে না।
প্রথম ঠিক ঐ ওর মতো!
দ্বিতীয় আচ্ছা ভাই, তুই হিংসুটিদের মনের মধ্যে থাকিস কেন?
হিংসে বা! তা নাহলে থাকব কোথায়? তোদের মনের মধ্যে, যেখানে কালো কালো ঝুল-মাখানো পর্দা ঝোলে, সেখানে ছ্যাঁকছেঁকে আগুন জ্বেলে বসি—আর কাটা কাটা ঝাল ঝাল কথা বানিয়ে খাই। ভারি আরাম!
তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম কি ভয়ানক দুষ্টু!
হিংসে দেখলি! ওরা আমাকে দুষ্টু বলছে, বিশ্রী বলছে—তাই ওদের কাছে আমি একটুও ঘেঁষি না। আর তোরা আমায় লক্ষ্মী বলিস, মনের মধ্যে আদর করে পুষে রাখিস—তাই তোদের সঙ্গে আমার কত ভাব। আয় ভাই আমরা তিনজনে একটা গান গাই।

[হিংসে প্রথম ও দ্বিতীয় মেয়ে গান]

আমরা ভালো লক্ষ্মী সবাই তোমরা ভারি বিশ্রী,
তোমরা খাবে নিমের পাঁচন আমরা খাব মিস্‌রী।
আমরা পাব খেলনা পুতুল আমরা পাব চম্‌চম্‌,
তোমরা তো তা পাচ্ছ না কেউ পেলেও পাবে কম কম্‌।
আমরা শোব খাট পালঙে মায়ের কাছে ঘেঁষটে
তোমরা শোবে অন্ধকারে একলা ভয়ে ভেস্তে।
আমরা যাব জাম্‌তাড়াতে চড়ব কেমন ট্রেইনে,
চেঁচাও যদি 'সঙ্গে নেযাও' বলব 'কলা এইনে'।
আমরা ফিরি বুক ফুলিয়ে রঙিন জুতোয় মচমচ,
তোমরা হাঁদা নোংরা ছি ছি হ্যাংলা নাচে ফঁচ্‌ফঁচ্‌।
আমরা পরি রেশ্‌মি জরি আমরা পরি গয়না,
তোমরা সে সব পাওনা বলে তাও তোমাদের সয়না।
আমরা হব লাট মেজাজী তোমরা হবে কিপটে,
চাইবে যদি কিচ্ছু তখন ধরব গলা চিপটে।।

প্রথম দেখলি ভাই, কেমন মিষ্টি করে করে কথা বলছে!
দ্বিতীয় দেখলি! আমাদের কত ভালোবাসে, আর ওদের একটুও ভালোবাসে না।

হিংসে		তাহলে এখন আসি ভাই? মনে থাকবে ত? এই আমার ছাপ রেখে গেলাম।

[কালো কালো আঙুল দিয়া দুইজনের গালে কালো ছাপ লাগাইয়া দিল। জাল গুটাইয়া লইয়া স্বপ্নবুড়ি চলিয়া গেল। আস্তে আস্তে সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল।]

তৃতীয়		ওমা! কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, মনেও নেই।

চতুর্থ		কি যে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি! সেই হিংসে বলে একজন কে আছে—

পঞ্চম		কি আশ্চর্য! আমিও ঠিক তাই দেখেছি! ওদের সঙ্গে তার কত ভাব!

তৃতীয়		হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওদের মনের মধ্যে থাকে—

চতুর্থ		আর ঝাল ঝাল কথা খায়—

প্রথম		ও কি ভাই! তোর গালে অমন দাগ দিয়ে গেল কে?

তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম	ও কি! সত্যি সত্যি ছাপ দিয়ে গেছে যে!

[দ্বিতীয়ার দাগ মুছিবার চেষ্টা]

সকলে		কি দুষ্টু! কি দুষ্টু! কি দুষ্টু!

প্রথম		আবার বলে আমাদের সঙ্গে ভাব করবে!

দ্বিতীয়		কক্ষনো আর কোনোদিন ভাব করব না।

প্রথম		এমনিও করব না, স্বপ্নেও করব না।

সকলে		কক্ষনো না, কক্ষনো না, কক্ষনো না।

মামা গো!

[ঘরের এক পাশে মাদুরে বসিয়া একটি ছেলে কাগজ হাতে লইয়া কি যেন ভাবিতেছে; অন্য পাশে তাহার দিকে পিছন করিয়া আরাম-কেদারার উপর হাত পা ছড়াইয়া তাহার মামা আধা-ঘুমন্ত অবস্থায় বিশ্রাম করিতেছেন।]

বালক		(*হঠাৎ ব্যাকুলস্বরে*) মামা!

মামা		(*চমকিয়া*) কি রে!

বালক		ও মামা!

মামা		(*একটুখানি মাথা তুলিয়া*) আরে, হল কি?

বালক		(*প্রায় কাঁদ কাঁদ সুরে*) মামা গো!

মামা		(*বিরক্তভাবে*) আরে, কি হল তাই বল্ না? খালি 'মামা' 'মামা' করতে লেগেছে।

বালক		ও মামা গো, তা হলে কি হবে গো?

মামা		(*উঠিয়া বসিয়া ভ্যাংচান সুরে*) এই, তোমার পিঠে ঘা দু'চার পড়বে গো—আর হবে কি?

বালক		(*ঘ্যাঙানি সুরে*) না মামা, দেখ না—এই কাগজে কি লিখেছে!

মামা — কি আবার লিখবে? ওদের যা খুসী তাই লিখেছে—তোর তা নিয়ে চ্যাঁচাবার দরকার কি?

বালক — শোন না একবার কি বলছে ওরা—(*মামার কাছে গিয়ে পাঠ*) "আমেরিকার কোন বিখ্যাত মানমন্দির হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, তত্রস্থ দূরবীক্ষণ যন্ত্রে একটি ধূমকেতু দেখা গিয়াছে। জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, আগামী জুন মাসে এই ধূমকেতু পৃথিবীর নিকটবর্তী হইবে এবং তখন পৃথিবীর সহিত তাহার সংঘর্ষ হইবে।"

মামা — হবে ত হবে—তাতে চেঁচাবার কি হয়েছে?

বালক — (*আবার কাঁদ কাঁদ*) যদি ধূমকেতুর সঙ্গে ধাক্কা লাগে, আর পৃথিবী চূরমার হয়ে ভেঙে যায়?—তাহলে ত,—

মামা — যাঃ যাঃ—কাঁচের পুতুল কিনা, অমনি চুরমার হয়ে ভেঙে যাবে!

বালক — যদি ধূমকেতুটা ধুম করে আমাদের বাড়ির উপর এসে পড়ে?—কিংবা ভূমিকম্প হয়?

মামা — (*ভ্যাংচান সুরে*) কিংবা বাড়িতে আগুন লেগে যায়, কিংবা পরেশনাথের পাহাড় তোর মাথায় এসে পড়ে, কিংবা তোর মগজের গোবরগুলো শুকিয়ে ঘুঁটে হয়ে যায়!

বালক — (*অত্যন্ত গম্ভীরভাবে*) তা কখন কি হয় কিছু ত বলা যায় না। (*কাঁদ কাঁদ ভাবে*) এই ত, গোবিন্দরও ত মামা ছিল, সে মামা ত গত বছর সর্দিগরমি হয়ে মরে গেল।

মামা — মরেছে ত আপদ গেছে, তাতে হয়েছে কি?

বালক — না, তাই বলছিলুম—এই সেদিনও ত আমাদের জিমনাস্টিক মাস্টার পিলে হয়ে মরে গেল। তাহলে কে কতদিন বাঁচবে, কখন মরবে, কখন কি হবে, কিছু ত বলা যায় না—

মামা — (*কতক রাগে, কতক ব্যঙ্গসুরে*) ওরে বাবারে! এ যে একেবারে বৈরাগীর দাদা ঠাকুর হয়ে উঠল দেখি।—দেখ্! কান ধরে এমন থাপ্পড় লাগাব!

বালক — (*আবার কাঁদ কাঁদ*) বা! ব্রজলালের বাবা যদি এক মাস আগে মরে যেত, তাহলে সে কি ব্রজলালকে সেদিন এমন চমৎকার সুন্দর প্রাইজ দিতে পারত?

মামা — (*কটমট করিয়া তাকাইয়া*) তুই কি বলতে চাস বল্ দেখি।

বালক — (*হঠাৎ কাঁদিয়া*) তুমি যে বলেছিলে আমাকে প্রাইজ দেবে—কই দিচ্ছ না ত—শেষটায় যদি—ভ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ—

মামা — (*ধমক দিয়া*) সেই কথাটা সোজাসুজি একসময়ে বললেই হত—তার জন্য ঘ্যাঙানি ঘোঙানি করে আমার ঘুমটি নষ্ট করবার কি দরকার ছিল? (*চড় মারিয়া*) যা! আজ বিকেলে প্রাইজ পাবি এখন।

[হাসিতে হাসিতে ও গালে হাত ঘষিতে ঘষিতে বালকের প্রস্থান]

ভাবুক-সভা

পাত্রগণ

ভাবুক দাদা	দ্বিতীয় ভাবুক
প্রথম ভাবুক	ভাবুক দল

[ভাবুকদাদা নিদ্রাবিষ্ট—ছোকরা ভাবুকদলের প্রবেশ]

প্রথম ভাবুক ইকি ভাই লম্বকেশ, দেখছ নাকি ব্যাপারটা?
ভাবুকদাদা মূর্চ্ছাগত, মাথায় গুঁজে র‍্যাপারটা!

দ্বিতীয় ভাবুক তাই তো বটে! আমি বলি এত কি হয় সহ্য?
সকাল বিকাল এমন ধারা ভাবের আতিশয্য!

প্রথম ভাবুক অবাক কল্লে! ঠিক যেমন শাস্ত্রে আছে উক্ত—
ভাবের ঝোঁকে একেবারে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত।
সাংঘাতিক এ ভাবের খেলা বুঝতে নারে মূর্খ—
ভাবরাজ্যের তত্ত্ব রে ভাই সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম!

দ্বিতীয় ভাবুক ভাবটা যখন গাঢ় হয়—বলে গেছেন ভক্ত,
হৃদয়টাকে এঁটে ধরে আঠার মতো শক্ত।

প্রথম ভাবুক (যখন) ভাবের বেগে জোয়ার লেগে বন্যা আসে তেড়ে,
আত্মারূপী সূক্ষ্ম শরীর পালায় দেহ ছেড়ে—
(কিন্তু) হেথায় যেমন গতিক দেখছি শঙ্কা হচ্ছে খুবই
আত্মা পুরুষ গেছেন হয়তো ভাবের স্রোতে ডুবি।
যেমন ধারা পড়ছে দেখ গুরু-গুরু নিঃশ্বাস,
বেশিক্ষণ বাঁচবে এমন কোরো নাকো বিশ্বাস।
কোনখানে হায় ছিঁড়ে গেছে সূক্ষ্ম কোনো স্নায়ু
ক্ষণজন্মা পুরুষ কিনা, তাইতে অল্প আয়ু।

[বিলাপ সঙ্গীত]

ভবনদী পার হবি কে চড়ে ভাবের নায়?
ভাবের ভাবনা ভাবতে-ভাবতে ভবের পারে যায় রে
ভাবুক ভবের পারে যায়।

ভবের হাটে ভাবের খেলা, ভাবুক কেন ভোল?
ভাবের জমি চাষ দিয়ে ভাই ভবের পটোল তোল রে
ভাই ভবের পটোল তোল।

শান বাঁধানো মনের ভিটেয় ভাবের ঘুঘু চরে—
ভাবের মাথায় টোক্কা দিলে বাক্য-মানিক ঝরে রে মন
বাক্য-মানিক ঝরে।

ভাবের ভারে হদ্দ কাবু ভাবুক বলে তায়

ভাব-তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ভাবের খাবি খায় রে
ভাবুক ভাবের খাবি খায়।

[কীর্তন 'জমাট' হওয়ায় ভাবুকদাদার নিদ্রাচ্যুতি]

ভাবুক দাদা — জুতিয়ে সব সিধে করব,. বলে রাখছি পষ্ট—
চ্যাঁচামেচি করে ব্যাটা ঘুমটি কল্‌লি নষ্ট?

প্রথম ভাবুক — ঘুম কি হে? সিকি কথা? অবাক কল্‌লে খুব!
ঘুমোওনি তো—ভাবের স্রোতে মেরেছিলে ডুব।
ঘুমোয় যত ইতর লোকে—তেলী মুদী চাষা—
তুমি আমি ভাবুক মানুষ ভাবের রাজ্যে বাসা।

ভাবুক দাদা — সে ঘুম নয়, সে ঘুম নয়, ভাবের ঝোঁকে টং,
ভাবের কাজল চোখে দিয়ে দেখছি ভাবের রঙ;
মহিষ যেমন পড়ে রে ভাই শুকনো নদীর পাঁকে,
ভাবের পাঁকে নাকটি দিয়ে ভাবুক পড়ে থাকে।

প্রথম ভাবুক — তাই তো বটে, মনের নাকে ভাবের তৈল গুঁজি
ভাবের ঘোরে ভোঁ হয়ে যাই চক্ষু দুটি বুজি!

দ্বিতীয় ভাবুক — হাঃ হাঃ হা—দাদা তোমার বচনগুলো খাসা,
ভাবের চাপে জমাট, আবার হাস্য রসে ঠাসা!

ভাবুক দাদা — ভাবের ঝোঁকে দেখতেছিলাম স্বপ্ন চমৎকার
কোমর বেঁধে ভাবুক জগৎ ভবের পগার পার।
আকাশ জুড়ে তুফান চলে, বাতাস বহে দমকায়,
গাছের পাতা শিহরি কাঁপে, বিজলী ঘন চমকায় ·
মাভৈ রবে ডাকছি সবে খুঁজছি ভাবের রাস্তা
(এই) ভণ্ডগুলোর গণ্ডগোলে স্বপ্ন হল ভ্যাস্তা।

প্রথম ভাবুক — যা হবার তা হয়ে গেছে—বলে গেছেন আর্য—
গতস্য শোচনা নাস্তি বুদ্ধিমানের কার্য।

দ্বিতীয় ভাবুক — কি আশ্চর্য, ভাবতে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে মশায়
এমনি করে মহাত্মারা পড়েন ভাবের দশায়!

ভাবুক দাদা — অন্তরে যার মজুত আছে ভাবের খোরাকি—
(তার) ভাবের নাচন মরণ বাঁচন বুঝবি তোরা কি?

দ্বিতীয় ভাবুক — পরাবিদ্যা ভাবের নিদ্রা—আর কি প্রমাণ বাকি
পায়ের ধুলো দাও তো দাদা মাথায় একটু মাখি!

ভাবুক দাদা — সবুর কর স্থিরোভব, রাখ এখন টিপ্পনী,
ভাবের একটা ধাক্কা আসছে, সরে দাঁড়াও এক্ষুনি!

[ভাবের ধাক্কা]

প্রথম ভাবুক — বিনিদ্র চক্ষু, মুখে নাহি অন্ন
আক্কেল বুঝি জড়তাপন্ন!
স্নানবিহীন যে চেহারা রুক্ষ—
এত কি চিন্তা—এত কি দুঃখ?

দ্বিতীয় ভাবুক	সঘনে বহিছে নিশ্বাস তপ্ত— মগজে ছুটিছে উদ্দাম রক্ত। দিন নাই রাত নাই—লিখে লিখে হাত ক্ষয়— একেবারে পড়ে গেলে ভাবের পাতকোয়!
ভাবুক দাদা	শৃঙ্খল টুটিয়া উন্মাদ চিত্ত আঁকুপাঁকু ছন্দে করিছে নৃত্য— নাচে ল্যাগব্যাগ তাণ্ডব তালে ঝলক জ্যোতি জ্বলিছে ভালে। জাগ্রত ভাবের শব্দ পিপাসা শূন্যে শূন্যে খুঁজিছে ভাষা। সংহত ভাবের ঝংকার মাঝে বিদ্রোহ ডম্বুরু অনাহত বাজে।
দ্বিতীয় ভাবুক	*(হ্যাঁ-হ্যাঁ)* ঐ শোনো দুড়দাড় মার-মার শব্দ দেবাসুর পশুনর ত্রিভুবন স্তব্ধ।
প্রথম ভাবুক	বাজে শিঙা ডম্বরু শাঁখ জগঝম্প, ঘন মেঘ গর্জন, ঘোর ভূমিকম্প—!
ভাবুক দাদা	কিসের তরে দিশেহারা ভাবের ঢেঁকি পাগল পারা আপনি নাচে নাচে রে! ছন্দে ওঠে ছন্দে নামে নিত্যধ্বনি চিত্তধামে গভীর সুরে বাজে রে! নাচে ঢেঁকি তালে তালে যুগে-যুগে কালে-কালে বিশ্ব নাচে সাথে রে! রক্ত-আঁখি নাচে ঢেঁকি, চিত্ত নাচে দেখাদেখি নৃত্যে মাতে মাতে রে!
প্রথম ভাবুক	চিন্তা পরাহতা বুদ্ধি বিশুষ্কা মগজে পড়েছে ভীষণ ফোসকা! সরিষার ফুল যেন দেখি দুই চক্ষে! ডুবজলে হাবুডুবু কর দাদা রক্ষে!
দ্বিতীয় ভাবুক	সূক্ষ্ম নিগূঢ় নব ঢেঁকিতত্ত্ব, ভাবিয়া-ভাবিয়া নাহি পাই অর্থ!
ভাবুক দাদা	অর্থ! অর্থ তো অনর্থের গোড়া! ভাবুকের ভাত-মারা সুখ-মোক্ষ-চোরা; যত সব তালকানা অঘামারা আনাড়ে 'অর্থ-অর্থ' করি খুঁজে মরে ভাগাড়ে! *(আরে)* অর্থের শেষ কোথা কোথা তার জন্ম অভিধান ঘাঁটা, সে কি ভাবুকের কম্ম? অভিধান, ব্যাকরণ, আর ঐ পঞ্জিকা— ষোলো আনা বুজরুকী আগাগোড়া গঞ্জিকা।

মাখন-তোলা দুগ্ধ, আর লবণহীন খাদ্য,
(আর) ভাবশূন্য গবেষণা—একি ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ?

[ভাবের নামতা]

ভাবের পিঠে রস তার উপরে শূন্যি—
ভাবের নামতা পড় মাণিক বাড়বে কত পুণ্যি—
(ওরে মানিক মানিক রে নামতা পড় খানিক রে)
ভাব এক্কে ভাব, ভাব দুগুণে ধোঁয়া,
তিন ভাবে ডিসপেপ্‌শিয়া—ঢেকুর উঠবে চোঁয়া
(ওরে মানিক মানিক রে চুপটি কর খানিক রে)
চার ভাবে চতুর্ভুজ ভাবের গাছে চড়—
পাঁচ ভাবে পঞ্চত্ব পাও গাছের থেকে পড়।
(ওরে মানিক মানিক রে এবার গাছে চড় খানিক রে)

।। **যবনিকা** ।।

চলচিত্ত-চঞ্চরি

পাত্রগণ

১। সাম্য-সিদ্ধান্ত সভার পাণ্ডাগণ

সত্যবাহন সমাদ্দার	চিন্তাশীল নেতা
ঈশান বাচস্পতি	মিস্টিক ও ভাবুক নেতা
সোমপ্রকাশ	উন্নতিশীল যুবক
জনার্দন	ঈশানের ধামাধারী
নিকুঞ্জ	সত্যবাহনের ধামাধারী

২। শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রমচারীগণ

শ্রীখণ্ডদেব	আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা নেতা ও সর্বেসর্বা
নবীন মাস্টার প্রভৃতি	আশ্রমমাসী শিক্ষকগণ
রামপদ, বিনয়সাধন প্রভৃতি	ছাত্রগণ
৩। ভবদুলাল	আগন্তুক জিজ্ঞাসু ভদ্রলোক

প্রথম দৃশ্য

[সাম্য-সিদ্ধান্ত সভাগৃহ। ঈশানবাবু এক কোণে বসিয়া সঙ্গীত রচনায় ব্যস্ত। জনার্দন তাঁহার নিকটেই উপবিষ্ট। সোমপ্রকাশ খুব মোটামোটা দু-তিনটি কেতাব লইয়া তাহারই একটাকে মন দিয়া পড়িতেছে, এমন সময়ে মাল্য হস্তে নিকুঞ্জের প্রবেশ]

জনার্দন আচ্ছা, শ্রীখণ্ডবাবুরা কেউ এলেন না কেন বলুন দেখি?

নিকুঞ্জ শুনলাম, ঈশেনবাবু নাকি ওঁদের কি ইন্সাল্ট করেছেন।

ঈশান কি রকম! ইন্সাল্ট করলাম কিরকম? একটা কথা বললেই হল? এই জনার্দনবাবুই সাক্ষী আছেন—কোথায় ইন্সাল্ট হল তা উনিই বলুন।

জনার্দন কই, তেমন তো কিছু বলা হয়নি—খালি স্বার্থপর মর্কট বলা হয়েছিল। তা, ওঁরা যেমন অসহিষ্ণু ব্যবহার করছিলেন, তাতে ও রকম বলা কিছুই অন্যায় হয়নি।

সোমপ্রকাশ আর যদি ইন্সাল্ট করেই থাকে তাতেই বা কি? তার জন্যে কি এইটুকু সাম্যভাব ওঁদের থাকবে না যে, হৃদ্যতার সঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে মিলতে পারেন?

ঈশান তা ত বটেই। কিন্তু ঐ যে ওঁরা একটি দল পাকিয়েছেন, তাতেই ওঁদের সর্বনাশ করেছে।

জনার্দন অন্তত আজকের মতো এই রকম একটা দিনেও কি ওঁরা দলাদলি ভুলতে পারেন না?

সোমপ্রকাশ যাই বলুন, এই সম্বন্ধে একজন পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক পণ্ডিত যা বলেছেন আমারও সেই মত। আমি বলি, ওঁরা না এসেছেন ভালোই হয়েছে।
[সত্যবাহনের শশব্যস্ত প্রবেশ]

সত্যবাহন আসছেন, আসছেন, আপনারা প্রস্তুত থাকুন, এসে পড়লেন বলে। সোমপ্রকাশ, আমার খাতাখানা ঠিক আছে ত? নিকুঞ্জবাবু, আপনি সামনে আসুন। না, না, থাক, ঈশানবাবু আপনি একটু এগিয়ে যান।

ঈশান আমি গেলে চলবে কেন? আমার গানটা আগে হয়ে যাক—

সত্যবাহন না, না, ওসব গানটানে কাজ নেই—ওসব আজ থাক। আমার লেখাটা পড়তেই মেলা সময় যাবে—আর বাড়িয়ে দরকার নেই।

ঈশান বেশ ত! আপনার লেখাটা যে পড়তেই হবে তার মানে কি? ওটাই থাকুক না কেন?

সত্যবাহন আচ্ছা, তাহলে তাই হোক—আপনাদের গান আর বাজনাই চলুক। আমার লেখা যদি আপনাদের এতই বিরক্তিকর হয়, তা হলে দরকার কি? চল সোমপ্রকাশ, আমরা চলে যাই।

সকলে না, না, সে কি, সে কি! তা কি হতে পারে?

সোমপ্রকাশ *(গদগদ)* দেখুন, আমি মর্মান্তিকভাবে অনুভব করছি, আজ আমাদের প্রাণে প্রাণে দিক্‌বিদিকে কত না আকুতি-বিকুতি অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে—

জনার্দন হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই হবে, তাই হবে। গানটাও থাকুক, লেখাটাও পড়া হোক।

নিকুঞ্জ ঐ এসে পড়েছেন।

সকলে আসুন, আসুন। স্বাগতং, স্বাগতম্।

[ভবদুলালের প্রবেশ, অভ্যর্থনা ও সঙ্গীত]

গুণিজন-বন্দন লহ ফুল চন্দন—কর অভিনন্দন
কর অভিনন্দন।

আজি কি উদিল রবি পশ্চিম গগনে
জাগিল জগৎ আজি না জানি কি লগনে
স্বাগত সঙ্গীত গুঞ্জন পবনে—কর অভিনন্দন।
কর অভিনন্দন।
আলা-ভোলা বাবাজীর চেলা তুমি শিষ্য
সৌম্য মুরতি তব অতি সুখদৃশ্য,
মজিয়া হরষরসে আজি গাহে বিশ্ব—কর অভিনন্দন
কর অভিনন্দন।

সত্যবাহন সোমপ্রকাশ, আমার খাতাখানা দাও তো।

সোমপ্রকাশ আজ আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে গোপনে গোপনে—

সকলে আহা-হা, খাতাখানা চাচ্ছেন, সেইটা আগে দাও।

সত্যবাহন *(খাতা লইয়া)* আজ মনে পড়ছে সেই দিনের কথা, যেদিন সেই চৈত্রমাসে আমরা আলাভোলা বাবাজীর আশ্রমে গিয়েছিলাম। ওঃ, সেদিন যে দৃশ্য দেখেছিলাম, আজও তা আমাদের মানসপটে অঙ্কিত হয়ে আছে। দেখলাম মহা প্রশান্ত আলাভোলা বাবাজী হাস্যোজ্জ্বল মুখে পরম নির্লিপ্ত আনন্দের সঙ্গে তাঁর পোষা চামচিকেটিকে জিলিপি খাওয়াচ্ছেন। আজ আমাদের কি সৌভাগ্য যে বাবাজীর প্রিয় শিষ্য—একি, সোমপ্রকাশ, এ কোন খাতা নিয়ে এসেছ? ধুতি চারখানা, বিছানার চাদর একখানা, বালিশের ওয়াড় একখানা, বাকি একখানা তোয়ালে—এসব কি?

সোমপ্রকাশ কেন? আপনিই ত আমার কাছে রাখতে দিলেন।

সত্যবাহন বলি, একবার চোখ বুলিয়ে দেখতে হয় ত, সাপ দিলাম না ব্যাং দিলাম?—দেখুন দেখি! এত কষ্ট করে রাত জেগে, সুন্দর একটি প্রবন্ধ লিখলাম, এখন নিয়ে এসেছে কিনা কার একটা ধোপার হিসেবের খাতা! এত যে বলি, নিজেদের বিচারবুদ্ধি অনুসারে কাজ করবে, তা কেউ শুনবে না!

ভবদুলাল তা দেখুন, ওরকম ভুল অনেক সময়ে হয়ে যায়—করতে গেলাম এক, হয়ে গেল আর এক! আমার সেজোমামা একবার ঘিয়ের কারবার করে ফেল মেরেছিলেন—সেই থেকে কেউ গব্যঘৃত বললেই তিনি ভয়ানক ক্ষেপে যেতেন। আমি ত তা জানি না; মামাবাড়ি গিয়েছি, মহেশদা বলল, 'বল ত গব্যঘৃত।' আমি চেঁচিয়ে বললাম 'গ-ব্য-ঘৃ-ত'—অমনি দেখি সেজোমামা ছাতের সমান লাফ দিয়ে তেড়ে মারতে এয়েছে! দেখুন ত কি অন্যায়! আমি ত ইচ্ছা করে ক্ষেপাইনি!

সত্যবাহন যাক, আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তা এই যে, বাইরের জিনিস যেমন মানুষের ভেতরে ধরা পড়ে তেমনি ভেতরের জিনিসও সময় সময় বাইরে প্রকাশ পায়। আমাদের মধ্যে আমরা ভেতরে ভেতরে অন্তরঙ্গভাবে যেসব জিনির্স পাচ্ছি সেগুলোকে এখন বাইরে প্রকাশ করা দরকার।

ভবদুলাল ঠিক বলেছেন। এই মনে করুন, যে কেঁচো মাটির মধ্যে থাকে, মাটির রস খেয়ে বাড়ে, সেই কেঁচোই আবার মাটি ফুঁড়ে বাইরে চলে আসে।

সকলে (সোৎসাহে) চমৎকার, চমৎকার।

নিকুঞ্জ দেখেছেন, কেমন সুন্দরভাবে উনি কথাটা গুছিয়ে নিলেন!

ভবদুলাল তা হলে সমাদ্দার মশাই, আপনি ঐ যেটা পড়বেন বলছিলেন, আমায় সেটা দেবেন ত। আমি একখানা বড় বই লিখছি, তাতে ওটা ঢুকিয়ে দেব—

সোমপ্রকাশ এ আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য বলতে হবে। আপনি যদি এ কাজের ভার নেন, তাহলে আমাদের ভেতরকার ভাবগুলি সুন্দরভাবে সাজিয়ে বলতে পারবেন।

জনার্দন হ্যাঁ, এ বিষয়ে ওঁর একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা দেখা যাচ্ছে।

ভবদুলাল আর আপনার ঐ গানটিও আমায় শিখিয়ে দেবেন, ওটাও আমার বইয়ে ছাপাতে চাই।

ঈশান নিশ্চয়! নিশ্চয়! ওটা আমার নিজের লেখা। গান লেখা হচ্ছে আমার একটা বাতিক।

সোমপ্রকাশ কি রকম আগ্রহ আর উৎসাহ দেখেছেন ওঁর?

ঈশান তা ত হবেই। সকলের উৎসাহ কেন যে হয় না এই ত আশ্চর্য।

[গান]

এমন বিমর্ষ কেন?
মুখে নাই হর্ষ কেন?
কেন ভব-ভয়-ভীতি ভাবনা প্রভৃতি
বৃথা বয়ে যায় বর্ষ কেন?
(হায় হায় হায় বৃথা বয়ে যায়
বৃথা বয়ে যায় বর্ষ কেন?)

ভবদুলাল *(লিখিতে লিখিতে)* চমৎকার! এটা আমার বইয়ে দিতেই হবে। আমার কি মুশকিল জানেন? আমিও পৈট্রি লিখি, কিন্তু তার সুর বসাতে পারি না। এই ত এবার একটা লিখেছিলাম—

বলি ও হরি রামের খুড়ো
(তুই) মরবি রে মরবি বুড়ো।

মশায়, কত রকম সুর লাগিয়ে দেখলাম—তার একটাও লাগল না। কি করা যায় বলুন ত?

ঈশান ওর আর করবেন কি? ওটা ছেড়ে দিননা—

ভবদুলাল তা অবিশ্যি, তবে টুইঙ্কল্, টুইঙ্কল্ লিটল্ স্টার—ওই সুরটা অনেকটা লাগে—

[গান]

বলি ও হরিরামের খুড়ো—
(তুই) মরবি রে মরবি বুড়ো।
সর্দি কাশি হল্‌দি জ্বর
ভুগবি কত জল্‌দি মর।

কিন্তু এটাও ঠিক হয় না। ঐ যে 'মরবি রে মরবি' ঐ জায়গাটায় আরও জোর দেওয়া দরকার। কি বলেন?

ঈশান — হ্যাঁ, যে রকম গান—একটু জোরজার না করলে সহজে মরবে কেন?

সোমপ্রকাশ — *(জনান্তিকে)* কিন্তু শ্রীখণ্ডবাবুদের এ সমস্ত কাণ্ড প্রকাশ করে দেওয়া উচিত।

সত্যবাহন — উচিত সে ত আজ বছর ধরে শুনে আসছি। উচিত হয় ত বলে ফেললেই হয়? নিকুঞ্জবাবু কি বলেন?

নিকুঞ্জ — নিশ্চয়। কিসের কথা হচ্ছিল?

সত্যবাহন — ঐ শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রমের কথা। এবারে 'সত্যসন্ধিৎসা'য় কি লিখেছি পড়েননি বুঝি?

নিকুঞ্জ — হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা চমৎকার হয়েছে। পড়ে দিন না—উনি শুনে খুসী হবেন।

সত্যবাহন — *(পাঠ)* এই যে অগণ্য গ্রহ-তারকা মণ্ডিত গগনপথে ধরিত্রী ধাবমান, ভূধর কন্দর ভ্রাম্যমাণ—এই যে সাগরের ফেনিল লবণাম্বুরাশি নীলাম্বরাভিমুখে নৃত্য করিতে করিতে নিত্য নবোৎসাহে দিক্‌দিগন্ত ধ্বনিত ঝংকৃত করিয়া, কি যেন চায়, কি যেন চায়—প্রতিধ্বনি বলিতেছে সাম্যসমীহপন্থা।

নিকুঞ্জ — শুনেছেন? ভাষায় কেমন সতেজ অথচ সহজ ভঙ্গি, সেটা লক্ষ করেছেন? ওর মধ্যে শ্রীখণ্ডবাবুদের উপর বেশ একটু কটাক্ষ রয়েছে।

জনার্দন — তাহলে আশ্রমের কথাটা আগে বলে নিন—নইলে উনি বুঝবেন কেমন করে।

ঈশান — সেইটেই ত আগে বলা উচিত। সোমপ্রকাশ, তুমি বলত হে—বেশ ভালো করে গুছিয়ে বল।

সত্যবাহন — আচ্ছা তা হলে সোমপ্রকাশই বলুক—*(অভিমান)*

সোমপ্রকাশ — কথাটা হয়েছে কি—এই যে ওঁরা একটা আশ্রম করেছেন, তার রকম-সকমগুলো যদি দেখেন—সর্বদাই কেমন একটা—অর্থাৎ, আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না—কি শিক্ষার দিক দিয়ে, কি অন্যদিক দিয়ে, যেমন ভাবেই দেখুন—আমার কথাটা বুঝতে পারছেন ত? যেমন, ইয়ের কথাটাই ধরুন না কেন—মানে সব কথা ত আর মুখস্থ করে রাখিনি।

ভবদুলাল — তা ত বটেই, এ ত আর একজামিন দিতে আসেননি।

নিকুঞ্জ — সমাদ্দার মশাইকে বলতে দাও না—

সত্যবাহন — না, না, আমায় কেন? আমি কি আপনাদের মতো তেমন গুছিয়ে ভালো করে বলতে পারি?

সকলে — কেন পারবেন না? খুব পারবেন।

আর মশাই, ওসব ছোট কথা—কে কি বলল আর কে কি করল! ওর মধ্যে আমায় কেন?

আচ্ছা, তাহলে আর কেউ বলুন না।

কি আপদ! আমি কি বলব না বলেছি? তবে, কি রকম ভাব থেকে বলছি সেটা ত একবার জানানো উচিত। তা নয় ত শেষকালে আপনারাই বলবেন সত্যবাহন সমাদ্দার পরনিন্দা করছে।

জনার্দন — হ্যাঁ, শুধু বললেই ত হল না, দশদিক বিবেচনা করে বলতে হবে ত?

সত্যবাহন — আমার হয়েছে কি, ছেলেবেলা থেকেই কেমন অভ্যাস—পরনিন্দা আর

পরচর্চা এসব আমি আদবে সইতে পারি না।

জনার্দন — আমারও ঠিক তাই। ও সব এক্কেবারে সইতে পারি না।

সোমপ্রকাশ — পরনিন্দা ত দূরের কথা, নিজের নিন্দাও সহ্য হয় না।

সত্যবাহন — কিন্তু তা বলে সত্য কি আর গোপন রাখা যায়?

ভবদুলাল — গোপন করলে আরো খারাপ। ছেলেবেলায় একদিন আমাদের ক্লাসে একটা ছেলে 'কু'—করে শব্দ করেছিল। মাস্টার বললেন, 'কে করল, কে করল?' আমি ভাবলাম আমার অত বলতে যাবার দরকার কি। শেষটায় দেখি, আমাকেই ধরে মারতে লেগেছে। দেখুন দেখি! ওসব কক্ষনো গোপন করতে নেই।

জনার্দন — আমাদেরও তাই হয়েছে। কিচ্ছু বলি না বলে দিন দিন ওরা যেন আস্কারা পেয়ে যাচ্ছে।

নিকুঞ্জ — আশ্রমের ছেলেগুলো পর্যন্ত যেন কি এক রকম হয়ে উঠছে।

জনার্দন — হ্যাঁ, ঐ রামপদটা সেদিন সমাদ্দার মশাইকে কি না বললে!

নিকুঞ্জ — হ্যাঁ, হ্যাঁ,—ঐ কথাটা একবার বলুন দেখি, তাহলে বুঝবেন ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে।

জনার্দন — হ্যাঁ, বুঝলেন? ছোকরার এতবড় আস্পর্ধা সমাদ্দার মশাইকে মুখের উপর বলে কি যে—হ্যাঁ, কি-না বললে!

নিকুঞ্জ — কি যেন—সেই খুলনার মকদ্দমার কথা নয় ত?

জনার্দন — আরে না, ঐ যে পিলসুজের বাতি নিয়ে কি একটা কথা।

সোমপ্রকাশ — হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে কি একটা সংস্কৃত কথা তার দু-তিন রকম মানে হয়।

নিকুঞ্জ — মোটকথা, তার ও-রকম বলা একেবারেই উচিত হয়নি।

ভবদুলাল — কি আপদ! তা আপনারা এসব সহ্য করেন কেন?

সত্যবাহন — সহ্য না করেই বা করি কি? কিছু কি বলবার যো আছে? এই ত সেদিন একটা ছোকরাকে ডেকে গায়ে হাত বুলিয়ে মিষ্টি করে বুঝিয়ে বললাম—'বাপু হে, ও-রকম বাঁদরের মতো ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছ, বলি কেবল এয়ারকি করলে ত চলবে না! কর্তব্য বলে যে জিনিস আছে সেটা কি ভুলেও এক-আধবার ভাবতে নেই? এদিকে নিজের মাথাটি যে খেয়ে বসেছ।'—মশাই, বললে বিশ্বাস করবেন না, এতেই সে একেবারে গজ্‌গজিয়ে উঠে আমার কথাগুলো না শুনেই হন্‌হন্‌ করে চলে গেল!

সোমপ্রকাশ — এই ত দেখুন না, এখানে সকলে সাধুসঙ্গে বসে কত সৎপ্রসঙ্গ হচ্ছে—শুনলেও উপকার হয়। তা, ওরা কেউ ভুলেও একবার এদিকে আসুক দেখি, তা আসবে না।

জনার্দন — তা আসবে কেন? যদি দৈবাৎ ভালোকথা কানে ঢুকে যায়!

সত্যবাহন — আসল কথা কি জানেন? এসব হচ্ছে শিক্ষা এবং দৃষ্টান্ত। এই যে শ্রীখণ্ডদেব, লোকটি বেশ একটু অহং-ভাবাপন্ন। এই ত দেখুননা, আমাদের এখানে আমি আছি, এঁরা আছেন, তা মাঝে মাঝে আমাদের পরামর্শ নিলেই হয়—

[রামপদর প্রবেশ]

এই দেখুন এক মূর্তিমান এসে হাজির হয়েছে।

নিকুঞ্জ আরে দেখছিস আমরা আমরা বসে কথা বলছি, এর মধ্যে তোর পাকামো করতে আসবার দরকার কি বাপু?

জনার্দন বলি, একি বাঁদর নাচ—না সঙের খেলা, যে তামাশা দেখতে এয়েছ?

রামপদ *(স্বগত)* কি আপদ! তখনি বলেছি, আমায় ওখানে পাঠাবেন না—

নিকুঞ্জ কি হে, তুমি সমাদ্দার মশায়ের সঙ্গে বেয়াদপি কর—এই রকম তোমাদের আশ্রমে শিক্ষা দেওয়া হয়?

রামপদ আমি? কই, আমি ত—আমার ত মনে পড়ে না, আমি—

সত্যবাহন আমি, আমি, আমি—কেবল আমি! আমি আমি, এত আত্মপ্রচার কেন? আর কি বলবার বিষয় নেই?

ঈশান 'আত্মম্ভরী অহঙ্কার আত্মনামে হুহুঙ্কার,
তার গতি হবে না হবে না—'

সোমপ্রকাশ দেখ, ওরকমটা ভালো নয়—নিজের কথা দশজনের কাছে বলে বেড়াব, এ ইচ্ছাটাই ভালো নয়।

সত্যবাহন আমি যখন খুলনায় চাকরি করতাম, ফাউসন সাহেব নিজে আমায় সার্টিফিকেট দিলে—'বিদ্যায় বুদ্ধিতে, জ্ঞানে উৎসাহে, চরিত্রে সাধুতায়, সেকেণ্ড টু ন-ন!!'—কারুর চাইতে কম নয়। আমি কি সে কথা তোমায় বলতে গিয়েছিলাম?

নিকুঞ্জ আমার পিসতুতো ভাই যেবার লাট সাহেবের সামনে গান্ করলে আমি কি তা নিয়ে ঢাক পিটিয়েছিলাম?

ঈশান আমার তিন ভল্যুম ইংরিজি কাব্য 'ইন্ মেমোরিয়াম ও মান্ধাতা! ও মোরস্!' যেবার বেরুল সেবার 'বেঙ্গলী'-তে কি লিখেছিল জানেন ত? 'উই কনগ্র্যাচুলেট দি ডিস্টিঙ্গুইস্‌ড্ অথার অফ দিস মনুমেন্টাল প্রডাকশান (ডাব্‌ল ডিমাই অক্‌টেভো ৯৭৪ পেজেস) হু ইজ এভিডেন্টলি ইন পোজেশান অভ এ স্টুপেণ্ডাস অ্যামাউন্ট অভ অ্যাস্টাউন্ডিং ইনফরমেশানস!' এরা যদি কথাটা না তুলতেন, আমি কি গায়ে পড়ে গল্প করতে যেতুম?

রামপদ কি জানি মশাই, আমায় শ্রীখণ্ডবাবু পাঠিয়ে দিলেন—তাই বলতে এলুম—

সত্যবাহন দেখ তর্ক করো না—তর্ক করে কেউ কোনোদিন মানুষ হতে পারেনি।

নিকুঞ্জ হ্যাঁ, ওটা তোমাদের ভারি একটা বদভ্যাস। আজ পর্যন্ত তর্ক করে কোনো বড় কাজ হয়েছে এরকম কোথাও শুনেছ?

ঈশান এই যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, যাতে করে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্রকে চালাচ্ছে, সে কি তর্ক করে চালাচ্ছে?

সোমপ্রকাশ আমি দেখছি এ বিষয়ে বড় বড় পণ্ডিতদের সকলেরই এক মত।

সত্যবাহন আমার সিদ্ধান্ত-বিশুদ্ধিকা বইখানাতে, একথা বার বার করে দেখিয়েছি যে তর্ক করে কিছু হবার যো নেই। মনে করুন যেন তর্ক হচ্ছে যে, আফ্রিকা দেশে 'সেউ' ফল পাওয়া যায় কি না। মনে করুন যদি সত্যি

করে সে ফল থাকে, তবে আপনি বলবার আগেও সে ছিল, বলবার পরেও সে থাকবে। আর যদি সে ফল না থাকে, তবে আপনি হ্যাঁ বললেও নেই, না বললেও নেই। তবে তর্ক করে লাভটা কি?

ভবদুলাল ঠিক বলেছেন। মনে করুন, আপনার বাড়িতে গেলাম, গিয়ে খামখা তর্ক করতে লাগলাম, আপনি রেগে আমায় চা খেতে দিলেন না—তাহলে আমার লাভটা হল কি?

সোমপ্রকাশ এসব কথা বোঝেই বা কয়জন, আর বুঝলেই বা তা ধরতে পারে কয়জন? ঐ ধরাটাই আসল কিনা।

[ঈশানের সঙ্গীত]

ধরি ধরি ধর ধর ধরি কিন্তু ধরে কই?
কারে ধরি কেবা ধবে ধরাধরি করে কই?
ধরনে ধারণে তারে ধরণী ধরিতে নারে
আঁধার ধারণা মাঝে সে ধারা শিহরে কই?

জনার্দন কথাটা বড় খাঁটি। এই যে আমাদের সমীক্ষা-চক্র আর সমসাম্য-সাধন আর মৌলিক খণ্ডাখণ্ড ভাব, এ সমস্ত ধরেই বা কে, আর ধরতে জানেই বা কে?

সত্যবাহন ধরা না হয় দূরের কথা, ও-বিষয়ে ভালো ভালো বই যে দু-একখানা আছে, সেগুলো পড়তে পারে ত? আমি বেশি কিছু বলছি না—অন্তত আমার সাম্য-নির্ঘণ্ট আর সিদ্ধান্ত-বিশুদ্ধিকা, এ দুখানা পড়া উচিত ত?

ভবদুলাল তাহলে ত পড়ে দেখতে হচ্ছে। কি নাম বললেন বইটার?

সত্যবাহন সাম্য-নির্ঘণ্ট, তিন টাকা দু আনা, আর সিদ্ধান্ত-বিশুদ্ধিকা—তিন ভল্যুম, খণ্ড-সিদ্ধান্ত অখণ্ড-সিদ্ধান্ত আর খণ্ডাখণ্ড-সিদ্ধান্ত—সাত টাকা চার আনা। দুখানা বই একসঙ্গে নিলে সাড়ে নয় টাকা, প্যাকিং চার পয়সা, ডাকমাশুল সাড়ে পাঁচ আনা, এই সবসুদ্ধ ন টাকা সাড়ে চোদ্দ আনা।

ভবদুলাল তা এটা আপনার কোন্ এডিশন বললেন?

ঈশান আঃ—ফার্স্ট্ এডিশন মশাই, ফার্স্ট্ এডিশন—এই ত সবে সাত বচ্ছর হল, এর মধ্যেই কি?

সত্যবাহন তা আমি ত আর অন্যদের মতো বিজ্ঞাপনের চটক দিয়ে নিজের ঢাক নিজে পেটাই না—

ঈশান হ্যাঁ, উনি ত আর নিজে পেটান না—ওঁর পেটাবার লোক আছে। তা ছাড়া এইসব কাগজওয়ালাগুলো এমন হতভাগা, কেউ ওঁর বইয়ের সুখ্যাত করতে চায় না।

সত্যবাহন কেন, সচ্চিন্তা-সন্দীপিকায় তা বেশ লিখেছিল।

ঈশান ও হ্যাঁ, আপনার মেজোমামা লিখেছিলেন বুঝি?

সত্যবাহন মেজোমামা নয়, সেজোমামা। কি হে, তোমার এখানে হাঁ করে সব কথা শুনবার দরকার কি বাপু?

[রামপদর প্রস্থান]

ভবদুলাল আচ্ছা, ঐ যে খণ্ডাখণ্ড কি সব বলছিলেন, ওগুলোর আসল ব্যাপারটা কি একটু বুঝিয়ে বলতে পারেন?

নিকুঞ্জ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা এই বেলা বুঝে নিন। এ-বিষয়ে উনিই হচ্ছেন অথরিটি।

সত্যবাহন ব্যাপারটা কি জানেন, খণ্ড-সিদ্ধান্ত হচ্ছে যাকে বলে পৃথগ্‌দর্শন। যেমন কুকুরটা ঘোড়া নয়, ঘোড়াটা গরু নয়, গরুটা মানুষ নয়—এই রকম। এ নয়, ও নয়, তা নয়, সব আলগা, সব খণ্ড খণ্ড—এই সাধারণ ইতর লোকে যেমন মনে করে।

ভবদুলাল *(স্বগত)* দেখলে! আমার দিকে তাকিয়ে বলছে 'সাধারণ ইতর লোক'!

সত্যবাহন আর অখণ্ড-সিদ্ধান্ত হচ্ছে, যাকে আমরা বলি 'কেন্দ্রগতং নির্বিশেষং' অর্থাৎ এই যে নানারকম সব দেখছি এ কেবল দেখবার রকমারি কিনা! আসলে বস্তু হিসাবে ঘোড়াও যা গরুও তা—কারণ বস্তু ত আর স্বতন্ত্র নয়—মূলে কেন্দ্রগতভাবে সমস্তই এক অখণ্ড—বুঝলেন না?

ভবদুলাল হ্যাঁ, বুঝেছি। মানে কেন্দ্রগতং নির্বিশেষং—এই ত?

সত্যবাহন হ্যাঁ, বস্তুমাত্রেই হচ্ছে তার কেন্দ্রগত কতকগুলি গুণের সমষ্টি। মনে করুন, ঘোড়া আর গরু—এদের গুণগুলি সব মিলিয়ে মিলিয়ে দেখুন। ঘোড়া চতুষ্পদ, গরু চতুষ্পদ, ঘোড়া পোষ মানে, গরু পোষ মানে—সুতরাং এখান দিয়ে অখণ্ড। হিসাবে কোনো তফাৎ নেই, এখানে ঘোড়াও যা গরুও তা। আবার দেখুন, ঘোড়াও ঘাস খায় গরুও ঘাস খায়—এও বেশ মিলে যাচ্ছে, কেমন?

ভবদুলাল কিন্তু ঘোড়ার ত শিং নেই, গরুর শিং আছে—তা হলে সেখান দিয়ে মিলবে কি করে?

সত্যবাহন সেখানে গাধার সঙ্গে মিলবে। এমনি করে সব পদার্থের সব গুণ নিয়ে যদি কাটাকাটি করা যায়, তবে দেখবেন খণ্ড ফ্র্যাক্‌শন সব কেটে গিয়ে বাকি থাকবে—এক। তাকেই বলি আমরা অখণ্ড-তত্ত্ব।

ভবদুলাল এইবার বুঝেছি। এই যেমন তাসে তাসে জোড় মিলিয়ে সব গেল কেটে, বাকি রইল—গোলামচোর।

সত্যবাহন কিন্তু সাধন করলে দেখা যায়, এর উপরেও একটা অবস্থা আছে। সেটা হচ্ছে সমসাম্যভাব, অর্থাৎ খণ্ডাখণ্ড-মীমাংসা। এ অবস্থায় উঠতে পারলে তখন ঠিকমতো সমীক্ষা সাধন আরম্ভ হয়।

ভবদুলাল 'সমীক্ষা' আবার কি?

সত্যবাহন সাধনের স্তরে উঠে যেটা পাওয়া যায়, তাকে বলে সমীক্ষা—সেটা কি রকম জানেন?

ভবদুলাল থাক্, আজ আর নয়। আমার আবার কেমন মাথার ব্যারাম আছে।

সত্যবাহন না, আমি ওর ভেতরকার জটিল তত্ত্বগুলো কিছু বলছি না, খালি গোড়ার কথাটা একটুখানি ধরিয়ে দিচ্ছি। অর্থাৎ এটুকু তলিয়ে দেখবেন যে ঘোড়াটা যে অর্থে ঘাস খাচ্ছে গরুটা ঠিক সে অর্থে ঘাস খাচ্ছে কিনা—

ভবদুলাল তা কি করে খাবে? এ হল ঘোড়া, ও হল গরু—তবে দুজনের যদি একই মালিক হয়, তবে এ-ও মালিকের অর্থে খাচ্ছে, ও-ও মালিকের

অর্থে খাচ্ছে—

সত্যবাহন না, না—আপনি আমার কথাটা ঠিক ধরতে পারেননি।

ভবদুলাল ও-তা হবে। আমার আবার মাথার ব্যারাম আছে কিনা। আচ্ছা, আজকে তাহলে উঠি। অনেক ভালো ভালো কথা শোনা গেল—বই লেখবার সময়ে কাজে লাগবে।

ঈশান ওঁকে একখানা নোটিশ দিয়েছেন ত?

জনার্দন ও, না। এই একখানা নোটিশ নিয়ে যান ভবদুলালবাবু। আজ অমাবস্যা, সন্ধ্যার সময় আমাদের সমীক্ষা-চক্র বসবে।

সোমপ্রকাশ আজ ঈশানবাবু চক্রাচার্য—ওঃ! ওঁর ইয়ে শুনলে আপনার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠবে।

ঈশান এই তত্ত্ব-টত্ত্ব যে সব শুনলেন, ওগুলো হচ্ছে বাইরের কথা। আসল ভেতরের জিনিস যদি কিছু পেতে চান তবে তার একমাত্র উপায় হচ্ছে সমীক্ষা-সাধন।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

সমীক্ষা মন্দির

[অন্ধকার ঘরের মাঝখানে লাল বাতি, ধূপধুনা ইত্যাদি। কপালে চন্দন মাখিয়া ঈশান উপবিষ্ট, তাহার পাশে একদিকে সোমপ্রকাশ ও জনার্দন, অপর দিকে নিকুঞ্জ ও দুইটি শূন্য আসন।]

[ঈশানের সঙ্গীত ও তৎসঙ্গে সকলের যোগদান]

[গান]

কাহারে চাহিছে কারা
কে বা সে কেমন ধারা
কেন আসে কেন যায়
কেন ফিরে ফিরে চায়
কার লাগি সন্ধানে সারা।

ঈশান দেখতে দেখতে সব যেন নিস্তেজ হয়ে ছায়ার মতো মিলিয়ে গেল। বোধ হল যেন ভেতরকার খণ্ড খণ্ড ভাবগুলো সব আলগা হয়ে যাচ্ছে। যেন চারিদিকে কি একটা কাণ্ড হচ্ছে। সেটা ভেতরে হচ্ছে কি বাইরে হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। কেবল মনে হচ্ছে, ঝাপসা ছায়ার মতো কে যেন আমার চারদিকে ঘুরছে। ঘুরছে ঘুরছে আর মনের বাঁধন সব খুলে আসছে।

[সত্যবাহন ও ভবদুলালের প্রবেশ]

ভবদুলাল (সশব্দে খাতা ফেলিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে) বাস্ রে! কি গরম!

সকলে স্-স্-স্-স্...

ভবদুলাল এখন সেই মক্ষিকা চক্র হবে বুঝি?

নিকুঞ্জ এখন কথা বলবেন না—স্থির হয়ে বসুন।

সোমপ্রকাশ মক্ষিকা নয়—সমীক্ষা।

ঈশান অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে তারপর ভয়ে ভয়ে বললাম, 'কে?' শুনলাম আমার বুকের ভিতর থেকে ক্ষীণ সরু গলায় কে যেন বললে 'আমি'। বোধ হল যেন ছায়াটা চলতে চলতে থেমে গেল। তখন সাহস করে আবার বললাম 'কে?' অমনি 'কে-কে-কে' বলে কাঁপতে কাঁপতে কাঁপতে কাঁপতে কে যেন পর্দার মতো সরে গেল—চেয়ে দেখলাম, আমিই সেই ছায়া, ঘুরছি ঘুরছি আর বাঁধন খুলছে!

জনার্দন মনের লাটাই ঘুরছে আর সুতো খুলছে, আর আত্মা-ঘুড়ি উধাও হয়ে শূন্যে উড়ে গোঁৎ খাচ্ছে!

ঈশান কালের স্রোতে উজান ঠেলে ঘুরতে ঘুরতে চলছি আর দেখছি যেন কাছের জিনিস সব ঝাপসা হয়ে সরে যাচ্ছে, আর দূরের জিনিসগুলো অন্ধকার করে ঘিরে আসছে। ভূত, ভবিষ্যৎ সব তাল পাকিয়ে জমে উঠছে আর চারিদিক হতে একটা বিরাট অন্ধকার হাঁ করে আমায় গিলতে আসছে। মনে হল একটা প্রকাণ্ড জঠরের মধ্যে অন্ধকারের জারকরসে অল্পে অল্পে আমায় জীর্ণ করে ফেলছে আর সৃষ্টি প্রপঞ্চের শিরায় শিরায় আমি অল্পে অল্পে ছড়িয়ে পড়ছি। অন্ধকার যতই জমাট হয়ে উঠছে, ততই আমায় আস্তে আস্তে ঠেলছে আর বলছে, 'আছ নাকি, আছ নাকি?' আমি প্রাণপণে চিৎকার করে বললাম—'আছি।' কিন্তু কোনও আওয়াজ হল না—খালি মনে হল অন্ধকারের পাঁজরের মধ্যে আমার শব্দটা নিঃশ্বাসের মতো উঠছে আর পড়ছে।

ভবদুলাল উঃ! বলেন কি মশাই?

ঈশান কোথাও আলো নেই, শব্দ নেই, কোনো স্থূল বস্তু নেই—খালি একটা অন্ধপ্রাণের ঘূর্ণি জড়ের বাঁধন ঠেলে ঠেলে বুদ্বুদের মতো চারিদিকে ফুলে উঠছে। দেখলাম সৃষ্টির কারখানায় মালপত্রের হিসাব মিলছে না। অন্ধকারের ভাঁজে ভাঁজে পঞ্চতন্মাত্র সাজানো থাকে, এক জায়গায় তার কাঁচা মশলাগুলো ভূতশুদ্ধি না হতেই হুড়হুড় করে স্থূলপিণ্ডের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমি চিৎকার করে বলতে গেলাম 'সর্বনাশ! সর্বনাশ! সৃষ্টিতে ভেজাল পড়ছে—, কিন্তু কথাগুলো মুখ থেকে বেরোলই না। বেরোল খালি হা হা হা হা করে একটা বিকট হাসির শব্দ। সেই শব্দে আমার সমীক্ষাবন্ধন ছুটে গিয়ে সমস্ত শরীর ঝিম ঝিম করতে লাগল।

ভবদুলাল আপনি চলে আসবার পর আমি দেখলাম, সেই লোকটা যে ভেজাল দিয়েছে, সেই ভেজাল ক্রমাগত ঠেলে উপর দিকে উঠতে চাচ্ছে। উঠতে পারছে না, আর গুমরে গুমরে ফেঁপে উঠছে। আর কে যেন ফিস ফিস করে বলছে—'শেক দি বট্‌ল্, শেক দি বট্‌ল্!'—সত্যি!

ঈশান কি মশাই আবোল তাবোল বকছেন?

সোমপ্রকাশ দেখুন, এসব বিষয়ে ফস্ করে কিছু বলতে নেই—আগে ভিতরে ভিতরে ধারণা সঞ্চয় করতে হয়।

জনার্দন হ্যাঁ, সব জিনিসে কি আর মেকি চলে?

ভবদুলাল ও, ঠিক হয়নি বুঝি? তা আমার ত অভ্যাস নেই—তার উপর ছেলেবেলা থেকেই কেমন মাথা খারাপ। সেই একবার পাগলা বেড়ালে কামড়েছিল, সেই থেকে ঐ রকম। সে কি রকম হল জানেন? আমার মেজোমামা, যিনি ভাগলপুরে চাকরি করেন, তাঁর ঐ পশ্চিমের ঘরটায় টেঁপি, টেঁপির বাপ, টেঁপির মামা, মনোহর চাটুয্যে—না, মনোহর চাটুয্যে নয়—মহেশ দা, ভোলা—

ঈশান তাহলে ঐ চলুক, আমি এখন উঠি।

ভবদুলাল শুনুন না—সবাই বসে বসে গল্প করছে এমন সময় আমরা ধর্ ধর্ ধর্ ধর্ বলে বেড়ালটাকে তাড়া করে ঘরের মধ্যে নিতেই বেড়ালটা এক লাফে জানলার উপর যেই না উঠেছে, অমনি আমি দৌড়ে গিয়ে খপ্ করে ধরেছি তার ন্যাজে—আর বেড়ালটা ফ্যাঁস করে আমার হাতের উপর কামড়ে দিয়েছে।

[ঈশানের প্রস্থানোদ্যম]

ভবদুলাল এই একটু শুনে যান—গল্পটা ভারি মজার।

ঈশান দেখুন, এটা হাসবার এবং গল্প করবার জায়গা নয়।

ভবদুলাল তাই নাকি? তবে আপনি যে এতক্ষণ গল্প করছিলেন?

ঈশান গল্প কি মশাই? সমীক্ষা কি গল্প হল?

জনার্দন কাকে কি বলে তাই জানেন না, কেন তর্ক করেন মিছিমিছি?

ভবদুলাল না, না, তর্ক করব কেন? দেখুন, তর্ক করে কিছু হবার যো নেই। এই যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, এ যে তর্ক করে সব চালাচ্ছে, সে কি ভালো করছে? আমি তর্কের জন্য বলিনি।

সত্যবাহন দেখুন, এ আপনাদের ভারি অন্যায়। ভুলচুক কি আর আপনাদের হয় না? অমন করলে মানুষের শিখবার আগ্রহ থাকবে কেন?

[আশ্রমের ছাত্র বিনয়সাধনের প্রবেশ]

ঈশান ঐ দেখ, আবার একটি এসে হাজির। তুমি কে হে?

বিনয়সাধন আমি? হ্যাঁঃ, আমার কথা কেন বলেন? আমি আবার একটা মানুষ! হ্যাঁঃ, কি যে বলেন?

ঈশান বলি, এখানে এয়েছ কি করতে?

সত্যবাহন কি নাম তোমার?

বিনয়সাধন আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীবিনয়সাধন। [পকেট হইতে পত্র বাহির করিয়া] ভবদুলালবাবু কার নাম?

সত্যবাহন কে হে, বেয়াদব? সে খবরে তোমার দরকার কি?

নিকুঞ্জ এ কি ইয়ার্কি পেয়েছ? তোমার বাপ ঠাকুর্দার বয়সী ভদ্রলোক সব—ছি, ছি, ছি!

জনার্দন কি আস্পর্ধা দেখুন ত?

নিকুঞ্জ হ্যাঁ—কার বাপের নাম কি, শ্বশুরের বয়েস কত, ওর কাছে তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

সত্যবাহন এই এঁর নাম ভবদুলালবাবু। এখন কি বলতে চাও এঁর বিরুদ্ধে বল।
বিনয়সাধন না, না, বিরুদ্ধে বলব কেন?
সত্যবাহন কাপুরুষ! এইটুকু সৎসাহস নেই—আবার আস্ফালন করতে এসেছ?
বিনয়সাধন আহা, আমার কথাটাই আগে বলতে দিন—
সত্যবাহন শুনলেন ভবদুলালবাবু? ওর কথাটা আগে বলতে দিতে হবে। আমাদের কথাগুলোর কোন মূল্যই নেই।
নিকুঞ্জ দশজনে যা শুনবার জন্যে কত আগ্রহ করে আসে, এঁরা সে সব তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবেন।
সোমপ্রকাশ এইজন্য সাধকেরা বলেন যে মানুষের ভূয়োদর্শনের অভাব হলে মানুষ সব করতে পারে।
বিনয়সাধন কি আপদ! মশায় চিঠিখানা দিতে এয়েছিলুম তাই দিয়ে যাচ্ছি—এই নিন। আচ্ছা ঝকমারি যা হোক!

[দ্রুত প্রস্থান]

সোমপ্রকাশ মানুষের মনের গতি কি আশ্চর্য! একদিকে হেরিডিটি আর একদিকে এন্‌ভাইয়ারনমেন্ট—এই দুয়ের প্রভাব এক সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।
ভবদুলাল *(পত্র পাঠ করিয়া)* শ্রীখণ্ডবাবু আমাকে কাল ওখানে নিমন্ত্রণ করেছেন।
ঈশান কি! এত বড় আস্পর্ধা! আবার নিমন্ত্রণ করতে সাহস পান কোন মুখে?
সত্যবাহন না, যাব না আমরা। সত্যবাহন সমাদ্দার ওসব লোকের সম্পর্ক রাখে না।
ভবদুলাল উনি লিখেছেন, 'কাল ছুটির দিন, আপনার সঙ্গে নিরিবিলি বসিয়া কিছু সৎপ্রসঙ্গ করিবার ইচ্ছা আছে।'
ঈশান ঐ দেখছেন? 'নিরিবিলি বসিয়া।' কেন বাপু, আমরা এক-আধজন ভদ্রলোক থাকলে তোমার আপত্তিটা কি?
জনার্দন এর থেকেই বোঝা উচিত যে ওঁর মতলবটা ভালো নয়।
নিকুঞ্জ ঠিক বলেছেন। মতলব যদি ভালোই হবে, তবে এত ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় কেন? নিরিবিলি বসতে চান কেন?
সোমপ্রকাশ বুঝলেন ভবদুলালবাবু, আপনি ওখানে যাবেন না। গেলেই বিপদে পড়বেন।
ভবদুলাল বল কি হে? ছুরিছোরা মারবে নাকি?
সোমপ্রকাশ না, না, বিপদটা কি জানেন? চিন্তাশীল লোকেরা বলেন যে, বিপদ মারাত্মক হয় সেখানে, যেখানে তার অন্তর্গূঢ় ভাবটিকে তার বাইরের কোনো অবান্তর স্বরূপের দ্বারা আচ্ছন্ন করে রাখা হয়।
ভবদুলাল *(পুলকিতভাবে)* এ আবার কি বলে শুনুন।
সোমপ্রকাশ স্বয়ং হার্বার্ট স্পেন্সার একথা বলেছেন। আপনি হার্বার্ট স্পেন্সারকে মানেন ত?
ভবদুলাল হ্যাঁ—হার্বার্ট, স্পেন্সার, হাঁচি, টিকটিকি, ভূত, প্রেত সব মানি।
সত্যবাহন আপনি ভাববেন না ভবদুলালবাবু, আপনার কোনো ভয় নেই। আমি আপনার সঙ্গে যাব, দেখি ওরা কি করতে পারে।

নিকুঞ্জ বাস নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

ঈশান সেই জুবিলির বছর কি হয়েছিল মনে নেই? শ্রীখণ্ডবাবু ওঁদের ওখানে এক বক্তৃতা দিলেন, আমরা দল বেঁধে শুনতে গেলাম। গিয়ে শুনি, তার আগাগোড়াই কেবল নিজেদের কথা। ওঁদের আশ্রম, ওঁদের সাধন, ওঁদের যত ছাইভস্ম, তাই খুব ফলাও করে বলতে লাগলেন।

সত্যবাহন শেষটায় আমি বাধ্য হয়ে উঠে তেজের সঙ্গে বললাম, 'লালাজি দেওনাথের সময় থেকে আজ পর্যন্ত যে অখণ্ড-সাধন-ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে, তা যদি কোথাও অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে সে হচ্ছে আমাদের সাম্য-সিদ্ধান্ত সভা।'

ঈশান ওঁরা সে সব ভেঙেচুরে এখন বিজ্ঞানের আগডুম-বাগডুম করছেন। আরে বিজ্ঞান বিজ্ঞান বললেই কি লোকের চোখে ধুলো দেওয়া যায়!

নিকুঞ্জ বেশি দূর যাবার দরকার কি? ওঁরা কি রকম সব ছেলে তৈরি করছেন তাও দেখুন, আর আমাদের সোমপ্রকাশকেও দেখুন।

জনার্দন একটা আদর্শ ছেলে বললেই হয়।

সোমপ্রকাশ না, না, ছি ছি ছি, কি বলছেন! আমি এই যেমন লোহিত সাগর আর ভূমধ্য সাগরের মধ্যে সুয়েজ প্রণালী, আমায় সেই রকম মনে করবেন।

জনার্দন আসল কথা হচ্ছে, আমরা এখন সাধনের যে স্তরে উঠেছি, ওঁরা সে পর্যন্ত ধারণা করতেই পারেননি।

নিকুঞ্জ ওঃ! গতবারের সমীক্ষায় যদি আপনি থাকতেন। ঈক্ষা ও সমীক্ষা সম্বন্ধে সমাদ্দার মশাই যা বললেন শুনলে আপনার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত।

ঈশান হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাঁটা দিয়ে ত উঠত, কিন্তু এখন দুপুর রাত পর্যন্ত আপনাদের ঐ আলোচনাই চলবে নাকি?

[সকলের গাত্রোত্থান]

সত্যবাহন তাহলে এই কথা রইল, কাল আপনার বাড়ি হয়ে আমি আপনাকে নিয়ে যাব।

[সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রম

[ছাত্রেরা সেমিসার্কল হইয়া দণ্ডায়মান। শিক্ষক নবীনবাবু প্রভৃতি ব্যস্তভাবে ঘোরাঘুরি করিতেছেন। শ্রীখণ্ডদেব ঘরের মধ্যেখানে একটা টেবিলের উপর বড় বড় বই সাজাইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন। একপাশে কতকগুলি অদ্ভুত যন্ত্র ও অর্থহীন চার্ট প্রভৃতি। দেয়ালে কতকগুলি কার্ডে নানারকম মটো লেখা রহিয়াছে।]

নবীন *(জানলা দিয়া বাহিরে তাকাইয়া)* এই মাটি করেছে! সঙ্গে সঙ্গে সত্যবাহন সমাদ্দারও আসছে দেখছি।

শ্রীখণ্ড আসুক, আসুক। একবার চোখ মেলে সব দেখে যাক। তারপর দেখি, ওর কথা বলবার মুখ থাকে কিনা।

নবীন — এসে একটা গোলমাল না বাধালেই হয়।

শ্রীখণ্ড — তা যদি করে তাহলে দেখিয়ে দেব যে শ্রীখণ্ড লোকটিও বড় কম গোলমেলে নয়।

[সত্যবাহন ও ভবদুলালের প্রবেশ]

সত্যবাহন — এই যে, ছেলেগুলো সব হাজির রয়েছে দেখছি।

শ্রীখণ্ড — না, সব আর কোথায়! ছুটিতে অনেকেই বাড়ি গিয়েছে।

সত্যবাহন — খালি খুব খারাপ ছেলেগুলো রয়ে গেছে বুঝি?

শ্রীখণ্ড — খারাপ ছেলে আবার কি মশায়? মানুষ আবার খারাপ কি? খারাপ কেউ নয়। ঘোর অসাম্যবদ্ধ পাষণ্ড যে তাকেও আমরা খারাপ বলি না।

ভবদুলাল — তা ত বটেই। ও-সব বলতে নেই। আমি একবার আমাদের গোবরা মাতালকে খারাপ লোক বলেছিলাম, সে এত বড় একটা থান ইট নিয়ে আমায় মারতে এসেছিল। ওরকম কক্ষনো বলবেন না।

সত্যবাহন — সে কি মশায়! যে খারাপ তাকে খারাপ বলব না? আলবৎ বলব। খারাপ ছেলে!

শ্রীখণ্ড — আহা-হা, উনি আশ্রমের শিক্ষক—নবীনবাবু।

সত্যবাহন — ও, তাই নাকি? যাই হোক, তুমি কি পড় হে ছোকরা?

ছাত্র — শব্দার্থ-খণ্ডিকা, আয়ুস্কন্ধ-পদ্ধতি, লোকাষ্টপ্রকরণ, সিন্নেট্স্ কস্‌মোপোডিয়া, পালস এক্সট্রা সাইক্লিক ইকুইলিব্রিয়াম অ্যান্ড দি নেগেটিভ জিরো—

সত্যবাহন — থাক, থাক, আর বলতে হবে না! দেখুন, অত বেশি পড়িয়ে কিছু লাভ হয় না। আমি দেখেছি ভালো বই খান-দুই হলেই এদিককার শিক্ষা সব একরকম হয়ে যায়।

ভবদুলাল — আমার 'চলচিত্তচঞ্চরি' বইখানা আপনাদের লাইব্রেরিতে রাখেন না কেন?

শ্রীখণ্ড — বেশ তো, দিন না এক কপি।

ভবদুলাল — আচ্ছা, দেব এখন। ওটা হয়েছে কি, বইটা এখনো বেরোয়নি। মানে খুব বড় বই হচ্ছে কিনা; অনেক সময় লাগবে। কোথায় ছাপতে দিই বলুন ত?

শ্রীখণ্ড — ও, এখনো ছাপতে দেননি বুঝি?

ভবদুলাল — না, এই লেখা হলেই ছাপতে দেব। আগে একটা ভূমিকা লিখতে হবে ত? সেটা কি রকম লিখব তাই ভাবছি। খুব বড় বই হবে কিনা!

শ্রীখণ্ড — কি নাম বললেন বইখানার?

ভবদুলাল — কি নাম বললাম? চলচঞ্চল, কি না? দেখুন ত মশাই, সব ঘুলিয়ে দিলেন—এমন সুন্দর নামটা ভেবেছিলাম।

সত্যবাহন — হ্যাঁ, যা বলছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আজকাল বাজারে দুখানা বই বেরিয়েছে—সাম্য-নির্ঘণ্ট আর সিদ্ধান্ত-বিশুদ্ধিকা—তাতে শিক্ষাতত্ত্ব আর সাধনতত্ত্ব এই দুটো দিকই সুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

শ্রীখণ্ড — ওই ত, ও বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে আমাদের মিলবে না। আমরা বলি—অখণ্ড শিক্ষার আদর্শ এমন হওয়া উচিত যে তার মধ্যে বেশ একটা সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য থাকবে—যেমন নিঃশ্বাস এবং প্রশ্বাস।

সত্যবাহন ঐ করেই ত আপনারা গেলেন। এদিকে ছেলেগুলোর শাসন-টাসনের দিকে আপনাদের এক ফোঁটা দৃষ্টি নেই।

শ্রীখণ্ড শাসন আবার কি মশাই? জানেন, ছেলেদের ধমক-ধামক শাসন এতে আমি অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করি।

ভবদুলাল আমারও ঠিক ঐ রকম। আমি যখন পাটনায় মাস্টার ছিলুম—একদিন একেবারে বারো চোদ্দটা ছেলেকে আচ্ছা করে পিটিয়ে দেখলুম সন্ধ্যের সময় ভারি ক্লেশ হতে লাগল—হাত টন্‌টন্, কাঁধে ব্যথা।

সত্যবাহন যাক, যে কথা বলছিলাম। আমরা আজ কদিন থেকে বিশেষভাবে চিন্তা করে বেশ বুঝতে পারছি যে এদের শিক্ষার মধ্যে কতকগুলো গুরুতর গলদ থেকে যাচ্ছে, কেবল নির্বিকল্প সত্যের অনুরোধেই আমি সেদিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য হচ্ছি। যথা—(পাঠ)—প্রথম সাম্যসাধনাদি অবশ্য সম্পাদনীয় বিষয় অনৈকাগ্রতা, অনভিনিবেশ ও চঞ্চলচিত্ততা।

ভবদুলাল 'চলচিত্তচঞ্চরি'—মনে হয়েছে।

সত্যবাহন বাধা দেবেন না। দ্বিতীয়—বিবিধ মৌলিক বিষয়ে সম্যক শিক্ষাভাবজনিত খণ্ডাখণ্ড বিচারহীনতা। তৃতীয়—বিবেক-বৃত্তির নানা বৈষম্যঘটিত অবিমৃষ্যকারিতা—

ভবদুলাল বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সত্যবাহন হোক দেরি। বিবেকবৃত্তির নানা বৈষম্যঘটিত—

ভবদুলাল ওটা বলা হয়েছে—

সত্যবাহন আঃ—নানা বৈষম্যঘটিত অবিমৃষ্যকারিতা ও আত্মপ্রচার-তৎপরতা। চতুর্থ—শ্রদ্ধা গাম্ভীর্যাদিপরিপূর্ণ বিনয়াবনতির ঐকান্তিক অভাব। পঞ্চম—

শ্রীখণ্ড দেখুন, ও-সব এখন থাক। আপনাদের এ-সব অভিযোগ আমরা অনেক শুনেছি। তার জবাব দেবার কোনো প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু তাহলেও সম্যক শিক্ষাভাব বলে যেটা বলছেন সেটা একেবারে অন্যায়। যে-রকম সাবধানতার সঙ্গে উন্নত বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে আমরা আধুনিক মেটাসাইকোলজিক্যাল প্রিন্সিপ্‌ল্‌স অনুসারে সমস্ত শিক্ষা দিয়ে থাকি—তার সম্বন্ধে এমন অভিযোগের কোনো প্রমাণ আপনি দিতে পারেন?

সত্যবাহন একশোবার পারি। তাহলে শুনবেন? আপনাদেরই কোন এক ছাত্রের কাছে কোন একটি ভদ্রলোক খণ্ডাখণ্ডের যা ব্যাখ্যা শুনলেন—আমাদের নিকুঞ্জবাবুর দাদা বলছিলেন সে একেবারে রাবিশ—মানেই হয় না।

শ্রীখণ্ড তাতে কি প্রমাণ হল? ও ত একটা শোনা কথা।

সত্যবাহন দেখুন, নিকুঞ্জবাবু আমার অত্যন্ত নিকট বন্ধু। তাঁর দাদাকে অবিশ্বাস করা আর আমাকে মিথ্যাবাদী বলা একই কথা।

শ্রীখণ্ড তাহলে দেখছি আপনাদের সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ করতে হয়।

সত্যবাহন দেখুন, উত্তেজিত হবেন না। উত্তেজিতভাবে কোনো প্রসঙ্গ করা আমার রীতিবিরুদ্ধ।

ভবদুলাল বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সত্যবাহন আঃ—কেন বাধা দিচ্ছেন? জিজ্ঞাসা করি খণ্ডাখণ্ডের যে তত্ত্বপর্যায় সেটা আপনারা স্বীকার করেন ত?

শ্রীখণ্ড আমরা বলি, খণ্ডাখণ্ডটা তত্ত্বই নয়—ওটা তত্ত্বাভাষ। আর সমসাম্য যেটাকে বলেন সেটা সাধন নয়—সেটা হচ্ছে একটা রসভাব। আপনারা এ-সব এমনভাবে বলেন যেন খণ্ডাখণ্ড সমসাম্য সব একই কথা। আসলে তা নয়। আপনারা যেখানে বলেন—কেন্দ্রগতং নির্বিশেষং, আমরা সেখানে বলি—কেন্দ্রগতং নির্বিশেষঞ্চ। কারণ ও-দুটো স্বতন্ত্র জিনিস। আপনারা যা আওড়াচ্ছেন ও-সব সেকেলে পুরোনো কথা—এ-যুগে ও-সব চলবে না। একালের সাধন বলতে আমরা কি বুঝি শুনবেন—? *(ছাত্রের প্রতি)* বল ত, সাধন কাকে বলে।

ছাত্র নবাগত যুগের সাধন একটা সহজ বৈজ্ঞানিক প্রণালী যার সাহায্যে একটা যে কোনো শব্দ বা বস্তুকে অবলম্বন করে তারই ভিতর থেকে উত্তরোত্তর পর্যায়ক্রমে নানা রকম অনুভূতির ধারাকে অব্যাহত স্বাভাবিকভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়।

শ্রীখণ্ড শুনলেন ত? আপনাদের সঙ্গে আকাশ-পাতাল তফাৎ। ওটা আবার বল ত হে।

ছাত্র [*পুনরাবৃত্তি*]

সত্যবাহন দেখুন, কোনো কথা ধীরভাবে শুনবেন সে সহিষ্ণুতা আপনার নেই। অকাট্য কর্তব্যের প্রেরণায় আপনারই উপকারের জন্য এ-কথা আজকে আমাকে বলতে হচ্ছে যে, ঐ অহঙ্কার ও আত্মসর্বস্বতাই আপনার সর্বনাশ করবে। চলুন, ভবদুলালবাবু।

ভবদুলাল এই একটু শুনে যাই। বেশ লাগছে, মন্দ না।

সত্যবাহন তাহলে শুনুন, খুব করে শুনুন। অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক, পাষণ্ড—

[*প্রস্থান*]

ভবদুলাল হ্যাঁ, তারপর সেই বৈজ্ঞানিক প্রণালী।

শ্রীখণ্ড হ্যাঁ, ওটা এই আশ্রমের একটা বিশেষত্ব—একটা গ্রাজুয়েটেড সাইকো-থীসিস অভ ফোনেটিক ফরম্‌স! ওটা অবলম্বন করে অবধি আমরা আশ্চর্য ফল পাচ্ছি। অথচ আমাদের প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রেরা পর্যন্ত এর সাধন করে থাকে। মনে করুন যে-কোনো সাধারণ শব্দ বা বস্তু—কতখানি জোরের কথা একবার ভাবুন ত?

ভবদুলাল চমৎকার! আমার চলচিত্তচঞ্চরিতে ওটা লিখতেই হবে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যে কোনো সাধারণ শব্দ বা বস্তু—একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারেন?

শ্রীখণ্ড হ্যাঁ, মনে করুন গোরু। গো, রু। 'গো' মানে কি? 'গো স্বর্গপশুবাক্‌বজ্র-দিঙ্‌নেত্রঘৃণিভূজলে', গো মানে গরু, গো মানে দিক, গো মানে ভূ—পৃথিবী, গো মানে স্বর্গ, গো মানে কত কি। সুতরাং এটা সাধন করলে গো বললেই মনে হবে পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র,সূর্য, ব্রহ্মাণ্ড। 'রু' মানে কি? 'রব রাব রুত রোদন' 'কর্ণেরৌতি কিমপিশনৈর্বিচিত্রং'; 'রু' মানে শব্দ।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অব্যক্ত মর্মর শব্দ বিশ্বের সমস্ত সুখ দুঃখ ক্রন্দন—সব ঘুরতে ঘুরতে ছন্দে ছন্দে বেজে উঠছে—মিউজিক অভ দি স্ফীয়ার্স—দেখুন একটা সামান্য শব্দ দোহন করে কি অপূর্ব রস পাওয়া যাচ্ছে। আমার শব্দার্থ খণ্ডিকায় এই রকম দেড় হাজার শব্দ আমি খণ্ডন করে দেখিয়েছি! গরুর সূত্রটা বল ত হে।

ছাত্রগণ খণ্ডিত গোধন মণ্ডল ধরণী
শব্দ শব্দ মন্থিত অরণী,
ত্রিজগৎ যজ্ঞে শাশ্বত স্বাহা
নন্দিত কলকল ক্রন্দিত হাহা
স্তম্ভিত সুখ দুখ মন্থন মোহে
প্রলয় বিলোড়ন লটপট লোহে
মৃত্যু ভয়াবহ হম্বা হম্বা
রৌরব তরণী তুহুঁ জগদম্বা
শ্যামল স্নিগ্ধা নন্দন বরণী
খণ্ডিত গোধন মণ্ডল ধরণী।।

ভবদুলাল ঐ গোরুর কথা যা বললেন—আমি দেখেছি মহিষেরও ঠিক তাই। জয়রামের মহিষ একবার আমায় তাড়া করেছিল—তারপর যেই না গুঁতো মেরেছে অমনি দেখি সব বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। তখন মনে হল—চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ। আচ্ছা আপনারা ঐ সমীক্ষা-টমীক্ষা করেন না?

শ্রীখণ্ড ওগুলো মশায়, করে করে বুড়ো হয়ে গেলাম। আসল গোড়াপত্তন ঠিক না হলে ওসবে কিছু হয় না। ওদের খণ্ডাখণ্ড আর আমাদের শব্দার্থ-খণ্ডন—দুটোই দেখলেন ত? আসল কথা ওদের মতলবটা হচ্ছে একেবারে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবেন। খণ্ড সাধন হতে না হতেই ওঁরা এক লাফে আগ ডালে গিয়ে চড়ে বসতে চান। তাও কি হয় কখনো?

নবীন দেখুন, এরা কিছু শুনবে বলে আশা করে আছে। আপনি এদের কিছু বলুন।

ভবদুলাল বেশ ত, দেখ বালকগণ, চলচিত্তচঞ্চরি বলে আমার একখানা বড় বই হবে—ডবল ডিমাই ৭০০ কি ৮০০ পৃষ্ঠা—দামটা এখনো ঠিক করিনি—একটু কম করেই করব ভাবছি—আচ্ছা, চার টাকা করলে কেমন হয়? একটু বেশি হয়, না? আচ্ছ ধরুন ৩।। টাকা? ঐ বইয়ের মধ্যে নানারকম ভালো ভালো কথা লেখা থাকবে। যেমন মনে কর, এই এক জায়গায় আছে—চুরি করা মহাপাপ—যে না বলিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণ করে তাহাকে চোর বলে। তোমরা না বলে কখনো পরের জিনিস নিয়ো না। তবে অবিশ্যি সব সময় ত আর বলে নেওয়া যায় না। যেমন, আমি একবার একটি ভদ্রলোককে বললাম, 'মশায় আপনার সোনার ঘড়িটা আমাকে দেবেন?' সে বলল, 'না দেব না।' ছোটলোক! আমরা ছেলেবেলায় একটা বই পড়েছিলাম তার নাম মনে নেই—তার মধ্যে একটা গল্প ছিল—

তার সবটা মনে পড়ছে না—ভুবন বলে একটা ছেলে তার মাসির কান কামড়ে দিয়েছিল। মনে কর তার নিজের কান ত নয়—মাসির কান। তবে না বলে কামড়ে নিল কেন? এর জন্য তার কঠিন শাস্তি হয়েছিল।

শ্রীখণ্ড আচ্ছা, আজ এই পর্যন্তই থাক। আবার আসবেন ত?

ভবদুলাল আসব বই কি! রোজ আসব। এই ত আজকেই আমার সতেরো পৃষ্ঠা লেখা হয়ে গেল। এ রকম হপ্তাখানেক চললেই বইখানা জমে উঠবে। আচ্ছা আজ আসি।

[গুন গুন গান করিতে করিতে প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

[ঈশান, নিকুঞ্জ, জনার্দন ও সোমপ্রকাশ উপবিষ্ট। সত্যবাহনের প্রবেশ]

জনার্দন তারপর সেদিন ওখানে কি হল?

নিকুঞ্জ হ্যাঁ, আপনি কদিন আসেননি; আমরা শোনবার জন্য ব্যস্ত হয়ে আছি।

সত্যবাহন হবে আর কি, হুঁঃ! এ কথা ভাবতেও কষ্ট হয় যে এই শ্রীখণ্ডবাবু একদিন আমাদেরই একজন ছিলেন। আজ আমাদের সংস্পর্শে থাকলে তাঁর কি এমন দশা হত? সামান্য ভদ্রতা পর্যন্ত ওঁরা ভুলে গেছেন।

ঈশান ভবদুলালবাবুকে কি ওখানেই রেখে এলেন নাকি!

সত্যবাহন তাঁর কথা আর বলবেন না। তিনি তাঁর গুরুর নামটি একেবারে ডুবিয়েছেন। কি বলব বলুন, তাঁর সামনে শ্রীখণ্ডবাবু আমায় বার বার কি রকম দারুণভাবে অপমান করতে লাগলেন—উনি তার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করলেন না—উলটে বরং ওঁদের সঙ্গেই নানারকম হৃদ্যতা প্রকাশ করতে লাগলেন।

নিকুঞ্জ ছি, ছি, ছি, এ একেবারে অমার্জনীয়।

সোমপ্রকাশ দেখুন, কিসে যে কি হয় তা কি কেউ বলতে পারে? আমরা অসহিষ্ণু হয়ে ভাবছি ভবদুলালবাবু আমাদের ত্যাগ করেছেন—আমি বলি কে জানে? —হয়ত অলক্ষিতে আমাদের প্রভাব এখনো তাঁর উপর কাজ করছে।

সত্যবাহন ওসব কিছু বিশ্বাস নেই হে—সামান্য বিষয়ে যে খাঁটি ও ভেজাল চিনতে পারে না—তার থেকে কি আর আশা করতে বল?

ঈশান

[গান]

কিসে যে কি হয় কে জানে!
কেউ জানে না, কেউ জানে না
যার কথা সে বুঝেছে সে জানে।

[বাহিরে পদশব্দ ও গান গাহিতে গাহিতে ভবদুলালের প্রবেশ—টুইঙ্কিল-টুইঙ্কিল-এর সুর]

ভবভয়ভীতি ভাবনা প্রভৃতি—

ঈশান ও কি রকম বিশ্রী সুরে গাইছেন বলুন ত?

ভবদুলাল ওটা আমার একটা নতুন গান।

ঈশান আপনার গান কি রকম? আমি আজ পাঁচ বছর ওটা গেয়ে আসছি।

আর ওটার ত ও রকম সুর মোটেই নয়। ওটা এই রকম—*(গান)*।

ভবদুলাল তাই নাকি? ওটা আপনার গান? ঐ যা, ওটা ত আমার চলচিত্তচঞ্চরিতে দিয়ে ফেলছি। তা আপনার নামেই দিয়ে দেব।

নিকুঞ্জ কি মশায়, আপনার আশ্রমিক পর্ব শেষ হল?

ভবদুলাল কি বললেন? কি পর্বত ?

নিকুঞ্জ বলি আশ্রমের শখটা মিটল ?

ভবদুলাল হ্যাঁ, দুদিন বেশ জমেছিল, তারপর ওঁরা কি রকম করতে লাগলেন তাই চলে এলাম। আসবার সময় একটা ছেলের কান মলে দিয়ে এসেছি।

সোমপ্রকাশ দূরবীক্ষণ যন্ত্রে যেমন দূরের জিনিসকে কাছে এনে দেখায় তেমনি কিছুক্ষণ আগে আমার একটা অনুভূতি এসেছিল যে আপনি হয়ত আবার আমাদের মধ্যে ফিরে আসবেন।

ভবদুলাল ওঁদের আশ্রমে একটা দূরবীণ আছে—তার এমন তেজ যে চাঁদের দিকে তাকালে চাঁদের গায়ে সব ফোস্‌কা ফোস্‌কা মতন পড়ে যায়। বোধ হয় থাউজ্যান্ড হর্‌স্‌-পাওয়ার, কি তার চাইতেও বেশি হবে।

ঈশান এত বুজরুকিও জানে ওরা।

জনার্দন ওঁকে ভালোমানুষ পেয়ে সাপ বোঝাতে ব্যাঙ বুঝিয়ে দিয়েছে।

ভবদুলাল হ্যাঁ, ব্যাঙ বলতে মনে হল—সোমপ্রকাশের কথা ওঁরা কি বলেছেন শোনেননি বুঝি?

সোমপ্রকাশ না, না, কিছু বলেছেন নাকি?

ভবদুলাল আমি ওঁদের কাছে সোমপ্রকাশের সুখ্যাত করছিলাম, তাই শুনে শ্রীখণ্ডবাবু বললেন যে আমরা চাই মানুষ তৈরি করতে—কতকগুলো কোলা ব্যাঙ তৈরি করে কি হবে?

নিকুঞ্জ আপনি এর কোনো প্রতিবাদ করলেন না?

ভবদুলাল না—তখন খেয়াল হয়নি।

সোমপ্রকাশ মানুষকে চেনা বড় শক্ত। হার্বার্ট ল্যাথাম্ তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন যে, ক্ষমতা এবং অক্ষমতার দুইয়েরই মৌলিক রূপ এক। ওঁরা একথা স্বীকার করবেন কিনা জানি না।

ভবদুলাল হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব স্বীকার করেন—এই ত সেদিন আমায় বলছিলেন যে ঈশেন আর সত্যবাহন দুই সমান—এ বলে আমায় দ্যাখ্ আর ও বলে আমায় দ্যাখ্। আরে দেখব আর কি? এরও যেমন কানকাটা খরগোসের মতন চেহারা, ওরও তেমনি হাঁ-করা বোয়াল মাছের মতন চেহারা!

সত্যবাহন কি! এত বড় আস্পর্ধা! আমায় কানকাটা খরগোস বলে।

ভবদুলাল না, না, আপনাকে ত তা বলেননি—আপনাকে বোয়াল মাছ বলেছে।

নিকুঞ্জ কি অভদ্র ভাষা! আমায় কিছু বললো?

ভবদুলাল আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম—তা বললে, নিকুঞ্জ কোনটা?—ঐ যে ছাগ্‌লা দাড়ি, না যার ডাবা হুঁকোর মত মুখ?

নিকুঞ্জ আপনি কি বললেন?

ভবদুলাল আমি বললাম ডাবা হুঁকো।

নিকুঞ্জ নাঃ—এক একটা মানুষ থাকে, তাদের মাথায় খালি গোবর পোরা!

ভবদুলাল কি আশ্চর্য! শ্রীখণ্ডবাবুও ঠিক তাই বলেন। বলেন ওদের মাথায় খালি গোবর—তাও শুকিয়ে ঘুঁটে হয়ে গেছে।

সত্যবাহন এসব আর সহ্য হয় না। মশায়, আপনি ওখানে ছিলেন—বেশ ছিলেন। আবার আমাদের হাড় জ্বালাতে এলেন কেন?

ঈশান আহা, ও কি? উনি আগ্রহ করে আসছেন সে ত ভালোই।

জনার্দন হ্যাঁ, বেশ ত, উনি আসুন না।

সত্যবাহন আগ্রহ কি নিগ্রহ কে জানে?

নিকুঞ্জ হ্যাঁ, অত অনুগ্রহ নাই করলেন।

ভবদুলাল হাঃ, হাঃ, হাঃ, ওটা বেশ বলেছেন। ছেলেবেলায় আমাদের সঙ্গে একজন পড়ত—সেও ঐ রকম কথার গোলমাল করত। দ্রাক্ষাকে বলত দ্রাহ্মা! ঐ 'ক'-এ মূর্ধণ্য 'ষ'-এ ক্ষ, আর 'হ'-এ 'ম'-এ হ্ম, বুঝলেন না?

সত্যবাহন হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি মশায়।

ভবদুলাল আমরা ছেলেবেলায় পড়েছিলাম—শৃগাল ও দ্রাক্ষা ফল। দ্রাক্ষা বলে এক রকম ফল আছে—মানে আছে কিনা জানি না, কিন্তু তর্ক করে ত লাভ নেই। মনে করুন যদি বলেন নেই, তা সে আপনি বললেও আছে, না বললেও আছে। তাহলে তর্ক করে লাভ কি? কি বলেন?

সত্যবাহন আপনার কাছে কোনো কথা বলাই বৃথা।

ভবদুলাল না, না, বৃথা হবে কেন? ওটা আমার চলচিত্তচঞ্চরিতে দিয়েছি ত। আপনার নাম করেই দিয়েছি।

সত্যবাহন আমার নাম করেছেন, কি রকম? আপনি ত সাংঘাতিক লোক দেখছি মশায়। দেখুন, ঐ যা-তা লিখবেন আর আমার নামে চালাবেন—এ আমি পছন্দ করি না।

ভবদুলাল বাঃ! নাম করব না? তা নইলে শেষটায় লোকে আমায় চেপে ধরবে আর আমি জবাব দিতে পারব না, তখন? সে হচ্ছে না। ঐ ঈশানবাবুর বেলাও তাই। যার যার গান, তার তার নাম।

সত্যবাহন দেখুন, আপনি সহজ কথা বুঝবেন না আবার জেদ করবেন।

ভবদুলাল ও, ভুল হয়েছে বুঝি? তা আমার আবার মাথার ব্যারাম আছে কিনা। সেই যেবার সেই সজারুতে কামড়েছিল—

ঈশান কি মশায়, সেদিন বললেন বেড়াল, আর আজ বলছেন সজারু।

ভবদুলাল ও, তাই নাকি? বেড়াল বলেছিলাম নাকি? তা হবে। তা, ও বেড়ালও যা সজারুও তাই। ও কেবল দেখবার রকমারি কিনা। আসলে বস্তু ত আর স্বতন্ত্র নয়। কারণ কেন্দ্রগতং নির্বিশেষম্। কি বলেন? ওটাও দিয়ে দিই, কেমন?

সত্যবাহন দেখুন, যে বিষয়ে আপনার বুঝবার ক্ষমতা হয়নি সে বিষয়ে এ-রকম যা-তা যদি লেখেন তবে আপনার সঙ্গে আমার জন্মের মতন ছাড়াছাড়ি।

ভবদুলাল কি মুশকিল! শ্রীখণ্ডবাবুও ঠিক ঐ রকম বললেন। ওঁদেরই কতকগুলো ভালো ভালো কথা সেদিন আমি ছেলেদের কাছে বলছিলাম; এমন সময়

উনি রেগে—'ও-সব কি শেখাচ্ছেন' বলে একেবারে তেইশখানা পাতা ছিঁড়ে দিলেন। তাই ত চলে এলাম।

ঈশান — একি মশায়? খাতায় এসব কি লিখেছেন!

ভবদুলাল — কেন, কি হয়েছে বলুন দেখি!

ঈশান — কি হয়েছে? এই আপনার চলচিত্তচঞ্চরি? এসব কি? ঈশানবাবুর ছায়া ঘুরছে—লাটাই পাকাচ্ছে—আর ইশেনবাবু গোঁৎ খাচ্ছেন। পেটের মধ্যে বিরাট অন্ধকার হাঁ করে কামড়ে দিয়েছে—চ্যাচাতে পারছেন না, খালি নিঃশ্বাস উঠছে আর পড়ছে—সব ঝাপ্‌সা দেখছে—গা ঝিম-ঝিম—নাক্ষ ভমিকা থার্টি—

ভবদুলাল — বাঃ! ওগুলো ত আপনাদেরই কথা। শুধু নাক্ষ ভমিকাটা আমার লেখা।

[ঘোর উত্তেজনা]

সকলে — দিন দেখি খাতাখানা।

ভবদুলাল — আঃ—আমার চলচিত্তচঞ্চরি—

সত্যবাহন — ধ্যেৎ তেরি চলচিত্তচঞ্চরি—

ভবদুলাল — ওকি মশায়—টানাটানি করেন কেন? একে ত শ্রীখণ্ডবাবু তেইশখানা পাতা ছিঁড়ে দিয়েছেন—হাঁ, হাঁ, হাঁ, করেন কি, করেন কি? দেখুন দেখি মশায়, আমার চলচিত্তচঞ্চরি ছিঁড়ে দিলেন!

[ছেঁড়া খাতা সংগ্রহের চেষ্টা]

সত্যবাহন — এই ঈশেনবাবুর যত বাড়াবাড়ি। আপনার ওসব গান আর সমীক্ষা ওঁকে শোনাবার কি দরকার ছিল?

ঈশান — আপনি আবার আহ্লাদ করে ওঁর কাছে খণ্ডাখণ্ডের ব্যাখ্যা করতে গেলেন কেন?

ভবদুলাল — খাতা ছিঁড়ে দিয়েছেন ত কি হয়েছে। আবার লিখব—চলচিত্তচঞ্চরি—লাল রঙের মলাট—চামড়া দিয়ে বাঁধানো। তার উপরে বড় বড় করে সোনার জলে লেখা—চলচিত্তচঞ্চরি—পাবলিশ্‌ড্ বাই ভবদুলাল অ্যান্ড কম্পানি। একুশ টাকা দাম করব। তখন দেখব—আপনাদের ঐ সাম্যঘণ্ট আর সিদ্ধান্ত বিসূচিকা কোথায় লাগে।

[গান]

সংসার কটাহ তলে জ্বলে
রে জ্বলে!
জ্বলে মহাকালানল জ্বলে জ্বল
জ্বল,
সজল কাজল জ্বলে রে জ্বলে।
অলক তিলক জ্বলে ললাটে,
সোনালী লিখন জ্বলে মলাটে,
খেলে কাঁচাকচু জ্বলে চুলকানি
জ্বলে রে জ্বলে।

॥ যবনিকা ॥

শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম

পাত্রগণ

হরেকানন্দ	বৃহস্পতি
জগাই	ইন্দ্র
বিহারী	অশ্বিনী
পটলা	নারদ
বিশ্বম্ভর	কার্তিক
গুরুজি	বিশ্বকর্মা

প্রথম দৃশ্য

[গুরুজির আশ্রম। হরেকানন্দ, জগাই, বেহারী, পটলা, বিশ্বম্ভর ও অন্যান্য শিষ্যরা উপবিষ্ট]

হরেকানন্দ দেখ্ জগাই, তুই বললে বিশ্বেস করবিনে—

সকলে কেউ বিশ্বেস করবে না—

হরেকানন্দ কাল থেকে মনটা আমার এমনি ওলটপালট করছে, সারারাত আর ঘুম হয়নি। দুপুরে একটু তন্দ্রার ভাব এয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ প্রশ্নটা তেড়ে উঠে মনের মধ্যে এমনি গুঁতো মারলে—

বেহারী ওর একটা কবিরাজী ওষুধ আছে খুব ভালো—আয়াপানের শেকড় না বেটে—

হরেকানন্দ দেখ্ বড় যে বেশি ওপর চালাকি কচ্ছিস, এক কথায় সব কটার মুখ বন্ধ করে দিতে পারি—জানিস্? পরশু রাত্তিরে গুরুজি নিজে আমায় ডেকে নিয়ে যেসব ভেতরকার কথা বলেছেন, জানিস্?

বেহারী হ্যাঁরে পটলা, সত্যি নাকি?

পটলা কিসের? সব মিছে কথা।

বেহারী এমন মিথ্যে কথা বলতে পারে এই হরেটা—ছিঃ ছিঃ রাম, রাম—

[বেহারীর সঙ্গীত]

রামকহ—ইয়ে রাম কহ

বলবেন না আর মশাই গো, মানুষ নয় সব কশাই গো

তলে তলে যত শয়তানী—*(রাম কহ)*

এই কিরে তোদের ভদ্রতা ঘ্যান ঘ্যান ক্যাঁচ ক্যাঁচ সর্বদা

ডুবে ডুবে জল খাও সব জানি *(রাম কহ)*

হরেকানন্দ প্রশ্ন যখন এয়েছে, জবাব তার একটা আসবেই আসবে—তা তোমাদের ধম্‌কানি আর চোখরাঙানি, হাসি ঠাট্টা আর এয়ার্কি, এসব বেশিদিন টিকছে না।

বিশ্বম্ভর হ্যাঁ হে, তর্কটা কিসের একবার শুনতে পাই কি? কিই বা প্রশ্ন হল আর তা নিয়ে মামলাটাই বা কিসের? —আচ্ছা, হরিচরণ কি বল?

হরেকানন্দ হরিচরণ! দেখ্‌লি, আমায় হরিচরণ বলছে! 'হরিচরণ' কি মশাই?

বিশ্বম্ভর তবে, ওরা যে 'হরে হরে' বলছিল!—

হরেকানন্দ হরে বললেই হরিচরণ? 'ক' বললেই কার্তিকচন্দ্র?

জগাই ওঁর নাম শ্রীহরেকানন্দ—

বিশ্বম্ভর হরে কাননগু—

হরেকানন্দ আরে খেলে যা! তুমি কোথাকার মুখ্যু হে?

বিশ্বম্ভর আজ্ঞে, ফরেশডাঙার—আপনি?

হরেকানন্দ দেখ, এই যে ছ্যাবলামি আর 'ডোন্ট কেয়ার' এসব ভালো নয়। কাউকে যদি নাই মানবে, তবে বাপু ইদিকে এসো টেসো না।

[হরেকানন্দের মৌনাবলম্বন—সাড়ম্বর]

বেহারী *(জনান্তিকে)* দেখ্ পটলা—সিদিন রাত্তিরে একটা স্বপ্ন দেখেছিলুম—কদিন থেকে গুরুজিকে বলব বলব ভাবছি—কিন্তু ঐ হরেটার জন্যে বলা হচ্ছে না। দেখলিনে, সেদিন ঐ ফকিরের গল্পটা বলতেই কি রকম হেসে উঠল—গল্পটা জমতেই দিল না।

বিশ্বম্ভর হ্যাঁ, হ্যাঁ? ফকিরের স্বপ্নটা কি হয়েছিল?

বেহারী আ মোলো যা! মশাই, আমরা আমরা কথা কইছি—আপনি মধ্যে থেকে অমন ধারা করছেন কেন?

বিশ্বম্ভর ও বাবা! এও দেখি ফোঁস্ করে! মশাই, আমার ঘাট হয়েছে—আপনাদের কথা আপনারা বলুন—আমার ওসব শুনে টুনে দরকার নেই—

[বিশ্বম্ভরের সঙ্গীত]

শুনতে পাবিনে রে শোনা হবে না
এসব কথা শুনলে তোদের লাগবে মনে ধাঁধা
কেউ বা বুঝে পুরোপুরি কেউ বা বুঝে আধা।
(কেউ বা বুঝে না)
কারে বা কই কিসের কথা, কই যে দফে দফে
গাছের পরে কাঁঠাল দেখে তেল মেখ না গোঁফে
(কাঁঠাল পাবে না)
একটি একটি কথায় যেন সদ্য দাগে কামান
মন বসনের ময়লা ধুতে তত্ত্ব কথাই সাবান
(সাবান পাবে না)
বেশ বলেছ ঢের বলেছ ঐখেনে দাও দাঁড়ি
হাটের মাঝে ভাঙ্‌বে কেন বিদ্যে বোঝাই হাঁড়ি
(হাঁড়ি ভাঙ্‌বে না)

বিহারী আহা, রাগ করেন কেন মশাই! আমি স্বপ্ন দেখেছি বই ত নয়—আর সে স্বপ্নও এমন কিছু নয়। আমি দেখলুম, একটা অন্ধকার গর্তের মধ্যে এক সন্নিসি বসে বসে ঘড় ঘড় করে নাক ডাকছে!

বিশ্বম্ভর বলেন কি মশাই? তারপর?

বেহারী বাস্! তারপর আর কি? সে নাক ডাকছে ত ডাকছেই!

বিশ্বম্ভর কি আশ্চর্য! আপনার গুরুজিকে জিজ্ঞেস করবেন ত—

পটল হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা চেপে গেলে চলবে না দাদা—ওটা বলতে হবে—দেখিস্, তখন হরেটার মুখ একেবারে দিস্ কাইন্ড অভ স্মল হয়ে যাবে—

বিশ্বম্ভর হ্যাঁ বুঝলেন, বেশ একটু রঙ চঙ দিয়ে বলবেন।

বেহারী আ মোলো যা! আমার স্বপ্ন আমার যেমন ইচ্ছা তেমন করে বলব।

[গুরুজির শুভাগমন। হরেকানন্দ ও বেহারীলালের যুগপৎ কথা বলিবার চেষ্টা]

হরেকানন্দ একটা প্রশ্ন এই কদিন থেকে—

বেহারী সিদিন একটা স্বপ্ন দেখলুম—

হরেকানন্দ তার জন্যে দুদিন ধরে আর সোয়াস্তি নেই—

বেহারী একটু নিরিবিলি যে জিজ্ঞেস করব তার ত যো নেই—

হরেকানন্দ তাই জগাইকে আমি বলছিলুম—

বেহারী পটলা জানে আর এই ভদ্রলোকটি সাক্ষী আছেন—

হরেকানন্দ আঃ—কথা বলতে দাও না—

বেহারী কেন ওরকম করছ বল দেখি?

গুরুজি এত গোলমাল কিসের?

বেহারী আজ্ঞে, হরে বড় গোলমাল কচ্ছে—

হরেকানন্দ বিলক্ষণ! দেখলেন মশাই—

বেহারী হয়েছে কি, আমি একটা স্বপ্ন দেখেছিলুম—

বিশ্বম্ভর হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা সাক্ষী আছি।

বেহারী আমি স্বপ্ন দেখলুম, অমাবস্যার রাত্তিরে একটা অন্ধকার গর্তের মধ্যে ঢুকে আর বেরুবার পথ পাচ্ছিনে। ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় দেখি এক সন্নিসি—

পটলা তার মাথায় এয়া বড় জটা—

বিশ্বম্ভর তার গায়ে মাথায় ভস্মমাখা—তার উপর রক্ত চন্দনের ছিটে—

বেহারী *(স্বগত)* কি আপদ! স্বপ্ন দেখলুম আমি আর রং ফলাচ্ছেন ওঁরা!—সন্নিসিকে খাতির টাতির করে পথ জিজ্ঞেস করলুম—বললে বিশ্বেস করবেন না মশাই, সে কথার জবাবই দিলে না। বসে ঘড়ঘড়, ঘড়ঘড় করে নাকই ডাকছে, নাকই ডাকছে।

পটলা *সে নাক ডাকানি এক অদ্ভুত ব্যাপার—নাক ডাকতে ডাকতে সারে গামা পাধা নিসা...করে সুর খেলাচ্ছে।*

বিশ্বম্ভর হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ! আর সাতটে সুরের সঙ্গে রামধনুর সাতটে রং একবার ইদিকে আসছে, একবার উদিকে যাচ্ছে।

বেহারী সুরের সঙ্গে রঙের সঙ্গে না মিশে দেখতে দেখতে দেখতে দেখতে চারদিক *ফরসা হয়ে উঠল—আমি অবাক হয়ে হাঁ করে রইলুম!*

বিশ্বম্ভর যে বলে এটা বাজে স্বপ্ন, সে নাস্তিক!

গুরুজি অতি সুন্দর, অতি সুন্দর! এ একেবারে ভেতরকার প্রশ্নে এসে ঠেকেছ—এতদিন বলব বলব করেও যে কথা বলা হয়নি, সেই কথার মূলে এসে

ঘা দিয়েছ! বৎস হরেকানন্দ, তুমি স্বপ্নে যা দেখেছ, তা যথার্থই বটে।

বেহারী ও ত স্বপ্ন দেখেনি—আমি দেখেছিলুম—

পটলা হ্যাঁ—ওরা ত দেখেনি—আমরা দেখেছিলুম—

হরেকানন্দ আমি ত এই বিষয়েই প্রশ্ন করব ভেবেছিলাম কিনা। ঐ যে ভেতরকার প্রশ্ন যেটা বলে বলেও বলা হচ্ছে না, আমার প্রশ্নই হচ্ছে তাই।

গুরুজি হ্যাঁ। তোমরা স্বপ্নে যা দেখেছ, তা যথার্থই বটে। শব্দই আলোক! শব্দই বিশ্ব—শব্দই সৃষ্টি—শব্দই সব! আর দেখ, সৃষ্টির আদিতে এক অনাহত শব্দ ছিল, আর কিছুই ছিল না। দেখ—প্রলয়ের শেষে যখন আর কিছু থাকবে না—তখনও শব্দ থাকবে। এই যে শব্দ, এ সেই শব্দ। যাবচ্চন্দ্র দিবাকর, যে শব্দের আর অন্ত নাই, মানুষ ঘাটে ঘাটে ধাপে ধাপে যুগের পর যুগ প্রশ্ন করতে করতে যার কিনারা পায়নি—সেই শব্দের তুমি নাগাল পেয়েছ। একে বলে অন্তর্দৃষ্টি। দেখ, শব্দকে তোমরা তাচ্ছিল্য কোরো না—এই শব্দকে চিনতে পারেনি বলেই, এই আমি আসবার আগে, যে যা কিছু করতে চেয়েছে সব ব্যর্থ হয়ে গেছে। এই কথাটুকু বলবার জন্যই আমি এতদিন দেহ ধারণ করে রয়েছি।

বিশ্বম্ভর হ্যাঁ হ্যাঁ,—ঠিক বলেছেন! আমার মনের কথাটা টেনে বলেছেন। এ সংসার মায়াময়—সবই অনিত্য—দারাপুত্রপরিবার তুমি কার কে তোমার? সব দুদিন আছে দুদিন নেই। বুঝলেন কিনা? আমি ছেলেবেলায় একটা পদ্য লিখেছিলুম, শুনবেন? কি না?

ভব পান্থবাসে এসে কেঁদে কেঁদে হেসে হেসে
ভুগে ভুগে কেশে কেশে, দেশে দেশে ভেসে ভেসে
কাছে এসে ঘেঁষে ঘেঁষে এত ভালোবেসে বেসে
টাকা মেরে পালালি শেষে!

গুরুজি বেদ বল, পুরাণ বল, স্মৃতি বল, শাস্ত্র বল, এসব কি? কতগুলো বাক্য, অর্থাৎ কতকগুলো শব্দ—এই ত? এই যে সব শঙ্খ ঘণ্টা, মন্ত্রতন্ত্র হ্রীং ক্লীং ঝাড় ফুঁক নাম জপ এসব কি? একি শব্দ নয়? সৃষ্টির গোড়াতে প্রাণ কারণ, আকাশ সব মিলে যখন হব হব কচ্ছিল, তখন যদি 'ওম্' শব্দ করে প্রণব ধ্বনি না হত, তবে কি সৃষ্টি হতে পারত? শব্দে সৃষ্টি, শব্দে স্থিতি, শব্দে প্রলয়। বেশি কথায় কাজ কি? বিষ্ণুর হাতে শঙ্খ কেন? শিবের মুখে বিষাণ কেন? হাতে তার ডমরু কেন? নারদ যখন স্বর্গে যায়, চলতে চলতে বীণা বাজায় কেন? এসব কি শব্দ নয়? আর অনাদিকাল হতে যে অনাহত শব্দ যোগীদের ধ্যান কর্ণে ধ্বনিত হয়ে আসছে, সে কি শব্দ নয়? আর সেই কালিন্দীর কূলে যমুনার তীরে শ্যামের যে বাঁশরী বেজেছিল, সেও কি শব্দ নয়? এমনি করে ভেবে দেখ, যা ভাববে তাই শব্দ—শাস্ত্রে বলেছে 'শব্দ ব্রহ্ম'—

বিশ্বম্ভর আমাদের মতিলাল সেবার যে ভুঁইপটকা বানিয়েছিল, উঃ—তার যে শব্দ! আমি ও বিষয়ে একটা কবিতা লিখেছি শুনবেন?

হরেকানন্দ দেখ, গুরুজির সামনে এরকম বেয়াদপি, এটা কি ভালো হচ্ছে?

বিশ্বম্ভর ভালরে ভাল! ইনি বলছেন স্বপ্নের কথা—উনি তাঁর প্রশ্ন হাঁকছেন, এ-ও ফোঁড়ন দিচ্ছে—ও-ও ফোঁড়ন দিচ্ছে—আর আমি কথা কইলেই যত দোষ?

বেহারী আহা, গুরুজি আছেন যে, তাঁকে ডিঙিয়ে কথা বলবে?

বিশ্বম্ভর গুরুজির ন্যাজ ধরে ধরেই যে ঘুরতে হবে তার মানে কি?

জগাই ন্যাজ বলেছে! গুরুজির ন্যাজ বলেছে!

পটলা তুই থাম্ না, তোর ন্যাজ ত বলেনি—

গুরুজি ওরে হতভাগা, শব্দ নিয়ে তোরা ছেলেখেলা করিস—শব্দ যে কি জিনিস আজও তোরা বুঝলিনে। কিন্তু এখন বুঝবার সময় হয়েছে। এই নাও আমার শব্দসংহিতা—এইটে এখন পড়ে নেও। ওর মধ্যে আমি দেখিয়েছি এই যে—এক একটি শব্দ এক একটি চক্র, কেননা শব্দ তার নিজের অর্থের মধ্যে আবদ্ধ থেকে ঘুরে বেড়ায়। তাই বলা হয়েছে অর্থই শব্দের বন্ধন। এই অর্থের বন্ধনটিকে ভেঙে চক্রের মুখ যদি খুলে দাও, তবেই সে মুক্তগতি স্পাইরাল মোশান হয়ে কুণ্ডলীক্রমে ঊর্ধ্বমুখে উঠতে থাকে। অর্থের চাপ তখন থাকে না কি না! যে সঙ্কেত জানে সে ঐ কুণ্ডলীর সাহায্যে করতে না পারে এমন কাজ নেই। তাই বলছি তোমরা প্রস্তুত হও—অমাবস্যার অন্ধকার রাত্তিরে সেই সঙ্কেত মন্ত্র দিয়ে তোমাদের দেখাব, শব্দের কি শক্তি! রাতারাতি স্বর্গ বরাবর পৌঁছে দেবে। পথ পথ করে সব ঘুরে বেড়ায়—কিন্তু শব্দ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই।

[শিষ্যগণের উচ্ছ্বাস ও গদগদভাব]

[গান—ধূম কীর্তন]

তাই ফিরি তুমি আমি ধাঁধায় দিবস যামী
তাই ফিরে মহাজন পথে-পথে অনুখন
অন্ধ আঁধারে মরে নামি
নিজ বেগে নিজ তালে শব্দ ফিরে দেশে কালে
আপনি পথিক পথ চালায় আপন রথ
ভুবন ঘেরিল পথ জালে।
প্রাণে প্রাণে এঁকে বেঁকে পথ যায় হেঁকে হেঁকে
আপনি পথিক পথ চালায় আপন রথ
সেই পথে চল আগে থেকে।।

গুরুজি পূর্বে পূর্বে ঋষিরা এই শব্দমার্গকে ধরে ধরেও ধরতে পারেনি। কেন? ঐ যে সন্নিসির অমাবস্যার অন্ধকার রাত্তিরে ঘড়ঘড় করে নাক ডাকছিল, কেন ডাকছিল? শব্দমার্গের সন্ধান পেয়েছে কিন্তু তার সঙ্কেতটুকু ধরতে পারেনি। ওরা যে ধরেছে সে সব শব্দের অর্থ নেই এবং ছিল না—ঢোঁড়া শব্দ। তা করলে ত চলবে না! জ্যান্ত জ্যান্ত শব্দ, যাদের চলৎশক্তি চাপা রয়েছে, ধরে ধরে মট্‌মট্ করে তাদের বিষদাঁত ভাঙতে হবে। অর্থের বিষ জমে জমে উঠতে থাকবে—আর ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে তাকে কেটে ফেলবে। এইজন্যে তোমাদের ঐ শব্দসংহিতাখানা পড়ে রাখতে বলছি।

[প্রস্থান। শিষ্যগণের 'শব্দসংহিতা' পাঠ]

শ্রীশ্রীগুরুপ্রসাদগুণে তত্ত্বদৃষ্টি লভি
জগৎখানা ঠেকছে যেন শব্দে আঁকা ছবি।
শব্দ পিছে শব্দ জুড়ি চক্রে গাঁথি মায়া
বাক্য ফিরে ছদ্মদেহে বিশ্ব তারি ছায়া।
চক্রমুখে মন্ত্র ঠুকে বাঁধন কর ঢিলা
শব্দ দিয়ে শব্দ কাটো, এই তো শব্দলীলা।
যাঁহা স্বর্গ তাঁহা মর্ত তাঁহা পাতালপুরী
সত্য মিথ্যা একই মূর্তি খেলছে লুকোচুরি!
ভালো মন্দ বিষম ধন্দ্ব কিছু না যায় বোঝা
সহজ কথায় মোচড় দিয়ে বাঁকিয়ে করে সোজা!
ভক্ত বলেন, "আদ্যিকালের সাদার নামই কালো
আঁধার ঘন জমাট হলে তারেই বলে আলো।"
শাস্ত্রে বলে "সৃষ্টি মূলে শব্দ ছিল আদি"
জগৎস্রোতে জড়ের বাঁধন শব্দে রাখে বাঁধি।
বস্তুতত্ত্ব বদ্ধ মায়া সদ্য পরিহরি
শব্দ চক্রে ঘোরে বিশ্ব সূক্ষ্ম দেহ ধরি!
শব্দ ব্রহ্মা, শব্দ বিষ্ণু, শব্দ সরস্বতী
বিশ্বযন্ত্র ধ্বংসশেষে শব্দে মাত্র গতি।।

দ্বিতীয় দৃশ্য । স্বর্গ কাণ্ড

গুরুজি
ঘনায়েছে কলিকাল ঘেরিয়ে আঁধার জাল
পাতিয়ে প্রলয় ফাঁদ কাল রাহু ধরে চাঁদ।
ওই শোনো অতি দূরে সুদূর অসুরপুরে
ভেদিয়া পাতাল তল ওই ওঠে কোলাহল;
ওই রে আঁধার ফুঁড়ি ওই আসে গুড়ি গুড়ি
ঐ এল লাখে লাখ, দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁক।।

[গান]

ওরে ভাই তোরে তাই কানে-কানে কইরে
ঐ আসে ঐ আসে ঐ ঐ ঐ রে
নিঝুম রাতে ফিস্‌ফাস্, বাতাস ফেলে নিঃশ্বাস
স্বপ্নে যেন খোঁজে কারে কৈ কৈ কৈ রে!
আঁধার করে চলাচল স্তব্ধ দেহ রক্ত জল
শব্দ নাচে হাড়ে হাড়ে হৈ হৈ হৈ রে।
পাণ্ডু ছায়া অন্ধ হিম শূন্যে করে ঝিম্ ঝিম্
ঐরে গেল গা ঘেঁষে আর ত আমি নই রে।
মর্মকথা বলি শোন্ লাগল প্রাণে 'কলিশন্'
প্রাণপণে হেঁকে বল মা ভৈ ভৈ রে।।

গুরুজি
দেবতা সবে গাত্র তোলো স্বপ্নলীলা সাঙ্গ হল
দেখ্ রে জেগে কাণ্ডটা কি সৃষ্টি বাঁধন ভাঙল নাকি?

ঈশান কোণে মেঘের পরে শব্দ তরল রক্ত ঝরে
পাণ্ডু বরণ দখিনে বামে অন্ধ আঁধার শব্দ নামে।
প্রলয় বাদল রক্তরাঙা পাগল জেগেছে আগল ভাঙা
উল্কা ঝলকে বিজলী ছোটে গহন শূন্যে শিহরি ওঠে।
তুহিন তিমির ধরণী গায় সভয় পবন থমকি চায়
হরষে পিশাচী পিশাচে কয় রক্ত মড়ক জগতময়।
হে অলক্ষ্মী একি খেলা অনাহূত হেন বেলা
নৃত্য তোমার এমনি ধারা সৃষ্টিছাড়া ছন্দোহারা!
অনাদৃতে হুহুকময়ী খেয়াল তব সর্ব্বজয়ী—
কহ আজি কেন স্কন্ধে, চাপিলে নাছোড়বন্দে!
কেন ঠাট্টা সর্বনাশী, কেন অট্টআঁধার হাসি,
কেন আজি ঘুমটি ভাঙাও, অকারণে চক্ষু রাঙাও?

সকলে [গান] কেন কেন কেনরে কেন কেন?
চেঁচিয়ে কাঁচা ঘুম ভাঙ কেন?
পট্‌কা শব্দ অট্টরোল, শঙ্খ ঘণ্টা ঢক্ক ঢোল
স্বর্গপুরী হদ্দ হৈল বাদ্যভাণ্ড হট্টগোল।
দেবতা বিলকুল কান্দে গো তল্পিতল্পা বান্ধে গো
পাগলা রাহু একলা তেড়ে গিলতে চাহে চান্দে গো।
আগড়ুম্ বাগ্‌ড়ুম শব্দ ছায় চিত্ত গুড়্ গুড় দপ্‌দপায়।
দন্ত কড়মড়, হাড্ডি মড়মড় প্রাণটা ধড়ফড় সর্বদাই।।

গুরুজি কাকস্য পরিবেদনা বৎসগণ আর কেঁদ না,
গতস্য শোচনা নাস্তি যথা কর্ম তথা শাস্তি;
মিথ্যা এত কান্না কেন অলমতি বিস্তারেণ?
অত্র এখন দেবতা সভায় ঠাণ্ডা হয়ে বসছে সবাই
তোমরা একটু ক্ষান্ত হও শান্ত হয়ে মন্ত্র কও।।

[বৃহস্পতি-স্তোত্র]

এ ভব সঙ্কট অর্ণব মন্থনে মাকুরু সংহার মাকুরু সংহার মাকুরু সংহার মাকুরু হে হে গুরু গীস্পতি অষ্টম দিক্‌পতি হে গুরু রক্ষ হে হে গুরু রক্ষ হে গুরু হে।।

[বৃহস্পতির আবির্ভাব]

বৃহস্পতি মাকুরু কোলাহল ভো ভো শিষ্য হে
দরজাটুকু ছেড়ে বোসো আজকে বড় গ্রীষ্ম হে,
আসনটাকে মাড়িও না বোসো না কেউ সোফাতে।
তোমার গায়ে গন্ধ বড় সরে দাঁড়াও তফাতে।
কি বলছিলে বলে ফেল নেইক আমার চাকর-বাকর—
সময় কেন নষ্ট কর ক'রে মেলা বকর বকর?
কারুর বাড়ি যজ্ঞি নাকি বংশ প্রথা চিরন্তন?
তোমার বুঝি ছেলের ভাতে ফলার ভোজে নিমন্ত্রণ?
তোমার বুঝি মেয়ের বিয়ে—আটকে ছিল অনেকদিন?

যা হোক এবার উৎরে গেল রয়ে সয়ে বছর তিন।
তোমার বাড়ি শ্রাদ্ধ নাকি? ঘর জামাইটি গেছেন মরে,
বেজায় বুঝি ভুগেছিল ডেঙ্গু জ্বরে বছর ভরে?

সকলে বিপদকালে হ্যপস্থিতে ঠাকুর মোদের যুক্তি দাও
ঐ চরণের শরণ নেব মরণ হতে মুক্তি দাও।।

বৃহস্পতি মরবে যে তা আগেই জানি—যেমনতর অনাসৃষ্টি
ইন্দ্র তোমার এসব দিকে একেবারেই নাইক দৃষ্টি!
কাজে কর্মে নেইক ছিরি কচ্ছে সবাই যাচ্ছে তাই
অমৃত সে ভেজাল-গোলা দেবতাগুলো খাচ্ছে তাই।
মড়ক সে ত হবেই এতে সর্দিগর্মি বেরিবেরি
একে একে মরবে সবাই আর বেশি দিন নেইক দেরি।
হাজার কর ডিসিনফেক্টো, হাজার কেন ওষুধ গেলো—
যা হোক তোমরা যে যার মতো উইলপত্র লিখে ফেলো।
দেবতালীলা সাঙ্গ যদি নেহাৎ যাবে জাহান্নামে
যার যা কিছু দেবার থাকে দাও না লিখে আমার নামে!

[বীণা হস্তে নারদের প্রবেশ ও গান]

ও বীণা তুই দেখবি মজা বাদ্যি বাজা *(তারে না তানা)*
হেন সুযোগ মাগ্যি বড় ও বীণা তোর ভাগ্যি বড়
এত মজা আর পাবি না পাগ্‌লা বীণা *(তারে না তানা)*
নাচি আমি সঙ্গে তোরি, বাহু তুলে রঙ্গ করি
তোরে বাজাই আপনি বাজি নাচিয়ে নাচি *(তারে না তানা)*
লাঠালাঠি রক্ত মাটি দেখে লাগে দাঁত-কপাটি
ও বীণা তুই থাকবি তফাৎ লাগবে হঠাৎ *(তারে না তানা)*

বৃহস্পতি কি গো ঠাকুর অলুক্ষুণে—ঝাড়তে এলে পায়ের ধুলো?
দেখ্‌ছি এবার হ্যাপায় পড়ে মরবে তবে দেবতাগুলো।

নারদ নাকে ছিপি কানে তুলো ভায়া বড় বিজ্ঞ যে
ডিঙোতে চাও টপাট্টপ আমা হেন দিগ্‌গজে।

[ইন্দ্র ও অশ্বিনীর প্রবেশ]

অশ্বিনী শব্দ শুনে দৌড়ে এলাম যুদ্ধুটুদ্ধু লাগল কি?
দৈত্য দেখে ভীষণ ভয়ে দেবতারা সব ভাগ্‌ল কি?

বৃহস্পতি ওঁর কথা কেউ শুনো নাক ঠাকুর বড় রগ্‌চটা
তাই ত ইন্দ্র তোমার হাতে দেখছি না যে বজ্রটা!

ইন্দ্র বজ্র সে কি হেথায় আছে, গিয়েছে সে কোন্ চুলোয়
তার বেঁধে তায় কাজে লাগায় মর্তলোকের লোকগুলোয়।

নারদ তোমাদের খুব স্নেহ করি, কাজ কি বলে সবিস্তার
এমনি উপায় বাৎলে দেব এক্কেবারে পরিষ্কার।

বৃহস্পতি একটা উপায় আছে বটে—তোমায় সেটা খুলে জানাই
হাড় কখানা দাও না মোদের নতুন করে বজ্র বানাই!

তোমার হাড়ে বজ্র গড়ে পিট্‌লে পরে দমাদম্
একটি ঘায়ে মরবে না যে সেই ব্যাটারাই নরাধম।
শুষ্ক হাড়ে ঘুণ ধরেছে, সূক্ষ্মতর শক্তি তায়
জ্বলবে ভালো হাড্ডি তোমার কাজ কি বল বক্তৃতায়।

নারদ — হোঁৎকামুখো গণ্ডে গোদ আমার উপর টিপ্পুনি
আমায় তুমি মরতে বল? মরবে তুমি এক্ষুনি!
আমার উপর চক্ষু ঠারো! আমায় বল কুন্দুলে
মুখে মাখ জুতোর কালি—গালে লাগাও চুন গুলে।

[কার্তিকের প্রবেশ]

কার্তিক — আমায় সবাই মাপ কোরো ভাই, হয়ে গেল আসতে দেরি
হিসেব মতো পছন্দসই হচ্ছিল না চোস্ত টেরি!
গোঁফ জোড়াটা মেপে দেখি ডাইনে একটু গেছে উঠে
লাগল দেরি সামলে নিতে টেনেটুনে ছেঁটেছুঁটে!
চাকর ব্যাটা খেয়ালশূন্য কাজে কর্মে ঢিলে দিয়ে
শেষ মুহূর্তে কাপড়খানা কুঁচিয়ে দিল গিলে দিয়ে।

নারদ — তুমিই এখন ভরসা এদের তুমিই এদের কর্ণধার
তুমিই এদের ত্রাণ কর ভাই নইলে সবই অন্ধকার!
বলছি এদের বারে বারে নেই রে উপায় যুদ্ধ বই
তোমরা সবাই হট্‌লে এখন কোথায় আমি মুখ লুকাই?

কার্তিক — লড়াই করে মরতে যাব আর ত আমার সেদিন নয়
কারে তুমি হুকুম কর শর্মা কারো অধীন নয়!
যে কয় জনা যুদ্ধে যাবেন ফিরবে না তার অর্ধেকও
তল্পিতল্পা বাঁধ রে ভাই থাকতে সময় পথ দেখ।

১। আমি বলি ঢের হয়েছে শান্তি বাদ্য পিটিয়ে দাও
হাঙ্গামাতে কাজ কি বাপু আপস করে মিটিয়ে দাও!

২। শাস্ত্রে বলে শোন্ রে চাচা আপ্‌না বাঁচা আগে ভাগে—
পিট্টি খেয়ে মরবি কেন থাকলে দেহ কাজে লাগে।

৩। কিসের দাদা স্বর্গভূমি কিসের পুরী পাঁচতলা
দৈত্য যখন ধরবে ঠেসে করবে তুমি কাঁচকলা।

৪। ত্যাগ কর ভাই মিথ্যে মায়া ত্যাগ কর এ স্বর্গধাম
আর ত সবই ছাড়তে পার প্রাণটুকুরই বড্ড দাম!

নারদ — কিসের এত ভাবনা তোদের মিথ্যে এক কিসের ডর
যুক্তি করে দেখ্‌না ভেবে ঠাণ্ডা হয়ে হিসেব কর।
না হয় দুটো খস্‌বে মাথা না হয় দুটো ভাঙ্‌তো ঠ্যাং
তাই বলে কি ঢুক্‌বি ভয়ে কুয়োর মধ্যে জ্যান্ত ব্যাঙ।
আমরা যদি দেবতা হতুম দৈত্য দেখলে ক্যাঁক্ ক'রে
ঘাড়টি ধরে পিট্টি দিতুম হাড্ডি মাসে এক ক'রে।

ইন্দ্র — অস্ত্রগুলো মর্চে-পড়া অনেক কালের অনভ্যাস
এমন হলে লড়বে নাকো স্বয়ং বলেন বেদব্যাস।

নারদ — বিষ্টু বল আত্মাপাখি! এমন দিনও ঘটল শেষে
দৈত্য বেড়ায় বুক ফুলিয়ে দেবতা পালায় ছদ্মবেশে।
আসছি ধেয়ে ব্যস্ত হয়ে পয়সা-কড়ি খরচ ক'রে
করলে না কেউ খাতির আমায় ডাকলে না কেউ গরজ ক'রে!
তোমরা সবাই ডুবে মরো ইন্দ্র তোমার গলায় দড়ি
কার্তিকেয় মরবে তুমি ঐরাবতের তলায় পড়ি।
মরব এবার দেহত্যাগে এ-ভাবে আর থাকছি নেকো
ঐখেনেতেই মূর্ছা যাব তোমরা সবাই সাক্ষী থেকো। [শয়ন ও মূর্ছা]

বৃহস্পতি — ব্রহ্মহত্যা আমার ঘরে ও ঠাকুর তোর পায়ে পড়ি
মরতে চাও ত বাইরে মর আমরা কেন দায়ে পড়ি?
অশ্বিনী গো বদ্যিমশাই দাঁড়িয়ে কেন চুপ্‌টি ক'রে
ঠাকুর হোথা তুলছে পটল বাঁচাও তারে যুক্তি ক'রে।

[অশ্বিনী কর্তৃক রোগ পরীক্ষাদি]

অশ্বিনী — বদ্যি রাজা ধন্বন্তরি শিষ্য হয়ে স্মরণ করি
তোমার নামে মন্ত্র পড়ি হাতে নিলাম জ্যান্ত বড়ি
প্রেত পিশাচ শুদ্ধি হোক যেই খাবে তার বুদ্ধি হোক
রুষ্ট বায়ু ক্ষান্ত হও মরা মানুষ জ্যান্ত হও
মুক্ত হবে পিত্ত দোষ নিত্য রবে চিত্ততোষ
লুপ্ত নাড়ি শক্ত বেশ উঠবে কেঁচে পক্ক কেশ।
ঘুচবে পিলে ছুটবে বাৎ ফোকলা মুখে উঠবে দাঁত
রাত্রি দিনে ফূর্তি রবে কার্তিকেরি মূর্তি হবে।
কিন্তু যারা মিথ্যে কয় নাইকো যাদের চিত্তে ভয়
মিথ্যে রোগের নিত্যি ভান ওষুধ তাদের মৃত্যুবাণ।
রোগ যেথা নয় সত্যিকার তোর পরে নাই ভক্তি যার
জ্যান্ত বড়ি বিষ বড়ি কণ্ঠে তাদের দিস্ দড়ি।
নয়কো যে-জন শান্তরকম হয় যেন সে জ্যান্ত জখম—
নৃত্য কোঁদল বন্ধ রবে চক্ষু দুটি অন্ধ হবে,
জ্বলবে গরল তিক্ত ধারা নাচবে রোগী ক্ষিপ্ত পারা
গণ্ডে ফোড়া তুণ্ডে বাত ভণ্ডজনের মুণ্ডপাত!
ও বড়ি তুই নিদান কর বিচার বুঝে বিধান কর
কপট রোগী খবরদার ওষুধ আমার সমঝদার।

[নারদের গাত্রোত্থান]

নারদ — গা-ঝিমঝিম মাথা ঘোরা এক্কেবারে কেটে গেল
মূর্ছা আমার আপনি সারে ওষুধটা কেউ চেটে ফেল।
হায় রে হায় কলির ফেরে দেবতা গুরু ভোগ না পায়
যার লাগি লোক চুরি করে চোর ব'লে সে চোখ পাকায়।
তোদের ভেবেই শরীর মাটি রাত্রে আমার ঘুমটি নেই
তোদের ছেড়ে জগৎ যেন ব্যঞ্জনেতে নুনটি নেই।

তোদের তরেই মূর্চ্ছা গেলাম, তোদের তরেই প্রাণটি ধরি
তোরাই আমার মাথার মাণিক তোরাই আমার কলসী দড়ি।
এই কি তোদের দেবতাগিরি এই কি সাহস জ্বলন্ত!
দুয়ো দেবতা দুয়ো ইন্দ্র দেবতাকুলের কলঙ্ক!

[গান]

বীণা রে এই কি রে তোর সেই সনাতন দেবতা এরা

বৃহস্পতি রাখ তোমার বকর বকর ভগ্ন ঢেঁকির কচকচি
মিথ্যে তুমি প্যাঁচাল পাড় বাক্য ঝাড় দশগজি
ঐদিকে যে বিশ্ব ডোবে বান ডেকেছে সৃষ্টিতে
লুটিয়ে গেল চুটিয়ে গেল শব্দ বাণের বৃষ্টিতে।
অর্থহারা শব্দ ফিরে স্থাবর হতে জঙ্গমে
বিশ্বব্যাপার উধাও হল শব্দ সাগর সঙ্গমে
ঘূর্ণি পাকের ছন্দ জাগে গুপ্তগভীর গর্জনে
মুক্ত কৃপাণ শক্তি মাতে অর্থমহিষ মর্দনে।
আদিকালের বাদ্যি বাজে স্বর্গ মর্ত ফক্কিকার
ধাক্কা লাগে গোলকধামে রোধ করে তায় শক্তি কার।
শব্দ ধারায় বর্ষা যেন কৃষ্ণ ভাদ্র অষ্টমী
শীঘ্র দেখ ছিদ্র খুঁজে কার এ সকল নষ্টামী।

গুরুজি ওরে বাস্ রে! এমনি ব্যাপার? আর কি আছে রক্ষে?
আরেক টুকুন সবুর কর দেখবে ধোঁয়া চক্ষে
মন্ত্র নাচে ছন্দ নাচে শব্দ নাচে রঙ্গে
বুকের শব্দ শোষণ করে রক্তধারার সঙ্গে
দেখবে ক্রমে শব্দ জমে হাত পা হবে ঠাণ্ডা
শক্ত কঠিন শব্দ দিয়ে মারবে মাথায় ডাণ্ডা—
অর্থ বাঁধন হুড়কো ভেঙে শব্দ এল পশ্চিমে
যার খুশি হয় বসে থাক আমরা দাদা বসছিনে।

[সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

[স্বর্গপথে সশিষ্য গুরুজি—বহু পশ্চাতে বিশ্বম্ভর]

বিশ্বকর্মা আদিকাল হতে বিশ্ব ফিরে মহাচক্রপথে,
চক্রে চলে জলস্থল, চক্রে ঘোরে ভূমণ্ডল—
সেই চক্রে চির গণ্ডি ঘেরা শব্দ করে চলাফেরা।
মহাকাল ফিরে শূন্যে বস্তুরূপ মাগি, স্পর্শে তার শব্দ উঠে জাগি
অর্থ তারে চক্রপথে টানি ঘোরায় আপন ঘানি—
বাক-অর্থ দোঁহে যুক্ত নিত্য বসবাস ইতি কালিদাস।।
আজ কেন রুদ্ধ পথ খুলে মন্ত্রাঘাত করি শব্দ মূলে
ছিন্ন করে শব্দের বাঁধন—অসাধ্য সাধন!

কাল চক্র ব্যূহ ভেদ করি   উর্দ্ধগতি কুণ্ডলীর মুক্ত পথ ধরি
জাগে ঐ নিদ্রিত অশনি— হাহাকার ক্রন্দনের ধ্বনি!
অন্ধকার রাতে অঙ্গহীন শব্দের পশ্চাতে
কার তপ্ত নিশ্বাসের রুদ্ধ অভিশাপ জপিছে প্রলাপ?

[মন্ত্রপাঠ]

হলদে সবুজ ওরাং ওটাং   ইঁটপাটকেল চিৎ পটাং
গন্ধ গোকুল হিজিবিজি   নো অ্যাড্‌মিশন ভেরি বিজি
নন্দী ভৃঙ্গী সারেগামা   নেইমামা তাই কানামামা
মুশকিল আশান উড়ে মালি   ধর্মতলা কর্মখালি
চীনে বাদাম সর্দি কাশি   ব্লটিংপেপার বাঘের মাসি।

গুরুজি দাঁড়াও আমাদের গতি যে ক্রমশ মন্দীভূত হয়ে আসছে, সেটা কি তোমরা অনুভব করেছ?

সকলে আজ্ঞে—ক্রমশই কমে আসছে—

গুরুজি এর কি কোনো কারণ নির্ণয় করতে পারছ? কেউ কি পশ্চাতে পড়ে থাকছ?

বেহারী আজ্ঞে, আপনার পরেই এই ত আমি আসছি—

হরেকানন্দ তার পরেই আমি শ্রীহরেকানন্দ—

জগাই তার পর আমি—জগাই—

পটলা তার পর আমি—

গুরজি তবে এর কারণ কি? শব্দের আকর্ষণটা বেশ অনুভব করছ কি?

পটলা আজ্ঞে, আমার বাক্য পিছন দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে।

গুরুজি সর্বনাশ!—তবে একবার নির্বিশেষ মন্ত্রটা বেশ ক'রে উচ্চারণ করে শক্তি সঞ্চার ক'রে—তারপর তাকিয়ে দেখ—কিছু দেখা যায় কিনা—

সকলে গৌ গাবৌ গাবঃ—গৌ গাবৌ গাবঃ—গৌ গাবৌ গাবঃ—

বিশ্বম্ভর ইত্যমরঃ

সকলে কে শব্দ করে?

পটলা সেই লোকটা!

সকলে সর্বনাশ! ও আবার চায় কি?

বিশ্বম্ভর ঐ যে, তোমরা কোথায় যাচ্ছ সেইখেনে যাব।

গুরুজি বৎস বিশ্বম্ভর, তুমি আসলেই যদি, তবে এমন পশ্চাতে পড়ে থাকছ কেন?

বিশ্বম্ভর আজ্ঞে—বেজায় পরিশ্রম লাগছে—

গুরুজি কেন? তুমি কি সম্যকরূপে মন্ত্রে আরোহণ করতে পার নাই? তুমি কি কোনোরূপ ভার বহন করে আনছ?

বিশ্বম্ভর আজ্ঞে—এই শরীরটে—

গুরুজি ও সব ছেড়ে দাও—কিছুক্ষণ ধুক্‌ধুক্ মন্ত্র জপ কর—ও সব স্থূল সংস্কার কেটে যাবে—

[ছাত্রগণের মন্ত্রজপ]

বিশ্বম্ভর আমি ভাবছিলুম—

সকলে ভাবছিলে? সর্বনাশ!—সর্বনাশ! ভেব না, ভেব না—

গুরুজি শব্দের ঘাড়ে চিন্তাকে চাপাচ্ছ—? ছিঃ! অমন ক'রে শব্দশক্তি ম্লান কোরো না—আমার পূর্ব উপদেশ স্মরণ কর—শব্দের সঙ্গে তার অর্থের যে একটা সূক্ষ্ম ভেদাভেদ আছে সাধারণ লোকে সেটা ধরতে পারে না।

সকলে তাদের শব্দজ্ঞান উজ্জ্বল হয়নি—

সকলে তারা শব্দের রূপটিকে ধরতে জানে না—

গুরুজি তারা ধরে তার অর্থকে। তারা শব্দ চক্রের আবর্তের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায়। যেমন কর্মবন্ধন, যেমন মোহবন্ধন, যেমন সংসারবন্ধন,—তেমনি শব্দবন্ধন!

সকলে শব্দবন্ধনে প'ড়োনা—প'ড়োনা—

গুরুজি শব্দকে যে অর্থ দিয়ে ভোলায়—সে অর্থপিশাচ। শব্দকে আটকাতে গিয়ে সে নিজেই আট্‌কা পড়ে। নিজেকেও ঠকায় শব্দকেও বঞ্চিত করে। সে কেমন জানো? এই মনে কর, তুমি বললে 'পৃথিবী'—তার অর্থ করে দেখ দেখি?—সূর্য নয় চন্দ্র নয় আকাশ নয় পাতাল নয়—সব বাদ—শুধু পৃথিবী! এরা নয় ওরা নয় তারা নয়—এসব কি উচিত? আবার যদি বল 'পৃথিবী গোল'—তার সঙ্গে অর্থ জুড়ে দেখ দেখি, কি ভয়ানক সংকীর্ণতা!—পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে তা বলা হল না—পৃথিবীর উত্তরে কি দক্ষিণে কি, তা বলা হল না—তার তিনভাগ জল একভাগ স্থল' তা বলা হল না—তবে বলা হল কি? গোটা পৃথিবীটার সবই ত বাদ গেল! এটা কি ভালো?

বিশ্বম্ভর আজ্ঞে না—এটা ত ভালো ঠেক্‌ছে না—তাহলে কি করা যায়?

গুরুজি তাই বলেছিলাম—শব্দের বিষদাঁত যে অর্থ, আগে তাকে ভাঙ। শুধু পৃথিবী নয়, শুধু গোল নয়, শুধু এটা নয়, শুধু ওটা নয়; আবার এটাই ওটা, ওটাই সেটা—তাও নয়। তবে কী? না সবই সব। তাকেই আমরা বলি গৌ গাবৌ গাবঃ—

[*গৌ গাবৌ গাবঃ*
হলদে সবুজ ওরাং ওটাং-ইত্যাদি]

[বিশ্বকর্মার আবির্ভাব]

বিশ্বকর্মা নিঝুম তিমির তীরে শব্দহারা অর্থ আসে ফিরে
কালের বাঁধন টুটে দশদিক কেঁদে উঠে
দশদিকে উড়ে শব্দধুলি উড়ে যায় উড়ে যায় মোক্ষপথ ভুলি—
ভেবেছ কি উদ্ধতের হবে না শাসন? জাগে নি কি সুপ্ত হুতাশন?
বিদ্রোহের বাজেনি সানাই? শব্দ আছে প্রতিশব্দ নাই?
শব্দমুখে প্রতিলোম শক্তি এস ঘিরে কুণ্ডলীর মুখ যাও ফিরে
শব্দঘন অন্ধকার নিত্যঅর্থভারে নামে বৃষ্টি ধারে
শব্দ যজ্ঞ হবিকুণ্ড অফুরন্ত ধূম এই মারি শব্দকল্পদ্রুম।

['দ্রুম' শব্দে সশিষ্য গুরুজির স্বর্গ হইতে পতন]

॥ যবনিকা ॥

জীবজন্তু

গরিলা

গরিলা থাকে আফ্রিকার জঙ্গলে। গাছের ডালপালার ছায়ায় যে জঙ্গল দিনদুপুরেও অন্ধকার হয়ে থাকে; সেখানে ভাল করে বাতাস চলে না, জীবজন্তুর সাড়াশব্দ নাই। পাখির গান হয়ত কচিৎ কখন শোনা যায়। তারই মধ্যে গাছের ডালে বা গাছের তলায় লতাপাতার মাচা বেঁধে গরিলা ফলমূল খেয়ে দিন কাটায়। সে দেশের লোকে পারতপক্ষে সে জঙ্গলে ঢোকে না—কারণ গরিলার মেজাজের ত ঠিক নেই, সে যদি একবার ক্ষেপে দাঁড়ায়, তবে বাঘ ভালুক হাতি তার কাছে কেউই লাগে না। বড় বড় শিকারী, সিংহ বা গণ্ডার ধরা যাদের ব্যবসা, তারা পর্যন্ত গরিলার নাম শুনলে এগোতে চায় না।

পৃথিবীর প্রায় সবরকম জানোয়ারকেই মানুষে ধরে খাঁচায় পুরে চিড়িয়াখানায় আটকাতে পেরেছে—কিন্তু এ পর্যন্ত কোন বড় গরিলাকে মানুষে ধরতে পারেনি। মাঝে মাঝে দুটো একটা গরিলার ছানা ধরা পড়েছে কিন্তু তার কোনটাই বেশি দিন বাঁচেনি।

একবার এক সাহেব একটা গরিলার ছানা পুষবার চেষ্টা করেছিলেন, সেটার বয়স ছিল দু-তিন বৎসর মাত্র। তিনি বলেন, তার চালচলন, মেজাজ দুষ্টুমি বুদ্ধি ঠিক মানুষের খোকার মতো। তাকে যখন ধরে খাঁচায় বন্ধ করে রাখা হত, তখন সে মুখ বেজার করে পিছন ফিরে বসে থাকত। যে জিনিস সে খেতে চায় না সেই জিনিস যদি তাকে খাওয়াতে যাও, তবে সে চিৎকার করে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে হাত-পা ছুঁড়ে অনর্থ বাধিয়ে বসবে। একদিন তাকে জোর করে ওষুধ খাওয়াবার জন্য চারজন লোকের দরকার হয়েছিল। তাকে যখন জাহাজে করে আফ্রিকা থেকে ইউরোপে আনান হয়, তখন প্রায়ই জাহাজের উপর ছেড়ে দেওয়া হত কিন্তু সে কোনদিন কারো অনিষ্ট করেনি। তবে জাহাজের খাবার ঘরের পাশে যে একটা আলমারি ছিল, যার মধ্যে চিনি থাকত আর নানারকম মিষ্টি আচার ইত্যাদি রাখা হত সেই আলমারিটার উপর তার ভারি লোভ ছিল। কিন্তু সে জানত যে ওটাতে হাত দেওয়া তার নিষেধ, কারণ দু-একবার ধরা পড়ে সে বেশ শাস্তি পেয়েছিল। তারপর থেকে যখন তার মিষ্টি খেতে ইচ্ছা হত তখন সে কখনও সোজাসুজি আলমারির দিকে যেত না; প্রথমটা যেত ঠিক তার উল্টোদিকে, যেন কেউ কোনরকম সন্দেহ না করে! তারপর একটু আড়ালে গিয়েই এক দৌড়ে বারান্দা ঘুরে একেবারে আলমারির কাছে উপস্থিত!

একবার একটা গরিলার ছানাকে চিড়িয়াখানায় রাখা হয়েছিল। চিড়িয়াখানায় নানারকম অদ্ভুত জন্তু দেখতে তার খুব মজা লাগত—কোন কোনটার খাঁচার কাছে দাঁড়িয়ে খুব মন দিয়ে তাদের চালচলন দেখত। একটা শিম্পাঞ্জির বাচ্চা ছিল, সে নানারকম কসরৎ জানত—সে যখন ডিগবাজি খেয়ে বা ছুটোপাটি করে নানারকম তামাসা দেখাত, গরিলাটা ভারি খুশী হয়ে তার কাছে এসে বসত।

গরিলার চেহারাটা মোটেও শান্তশিষ্ট গোছের নয়—মানুষের মতো লম্বা, চওড়ায় তার দ্বিগুণ, গায়ের জোর তার দশটার মতো—তার উপর সে যখন রাগের চোটে চিৎকার করে নিজের বুকে কিল মারতে মারতে এগোতে থাকে তখন তার সেই শব্দ আর মুখভঙ্গী আর রকমসকম দেখে খুব সাহসী লোক পর্যন্ত ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু মানুষ দেখলেই গরিলা তেড়ে মারতে আসে না—বরং সে অনেক সময়ে মানুষকে এড়িয়েই

চলতে চায়। কিন্তু তুমি একেবারে তার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হও ত সে কি করে বুঝতে পারে যে তোমার কোন দুষ্ট মতলব নাই? বিশেষত লোকে যখন লাঠিসোটা নিয়ে হৈ হৈ করে জঙ্গলে হাজির হয়, তাতে যদি গরিলা খুশী না হয়, তবেই কি তাকে হিংস্র বলতে হবে?...

গরিলার লড়াই

যতরকম বনমানুষ আছে তার মধ্যে, বুদ্ধিতে না হোক, শরীরের বলে গরিলাই সেরা। হাত-পায়ের মাংসপেশীর বাঁধন থেকে তার দাঁড়াবার ধরন আর ভ্রূকুটিভঙ্গি পর্যন্ত সবই যেন খাঁ খাঁ করে তেড়ে বলছে, "খবরদার! কাছে এস না!"

মানুষের মধ্যে এত বড় পালোয়ান কেউ নেই যে এক মিনিটের জন্যেও একটা গরিলার রোখ সামলাতে পারে। কিন্তু গরিলায় গরিলায় যদি লড়াই লাগে, তাহলে সেটা দেখতে কেমন হয়? বড় বড় পালোয়ান কুস্তিগীরের লড়াই দেখতে কত মানুষ পয়সা দিয়ে টিকিট কেনে; সে লড়াই যতই ভীষণ হয়, হুড়াহুড়ি ধস্তাধস্তি যতই বেশি হয়, মানুষের ততই উৎসাহ বাড়ে। কিন্তু গরিলাদের মধ্যেও কি সেরকম লড়াই বা রেষারেষি লাগে? লাগে বৈকি! এমন গরিলা পাওয়া গিয়েছে যার দাঁত ভাঙা বা কানটা ছেঁড়া, অথবা গায়ে মাথায় অন্য গরিলার দাঁতের চিহ্ন রয়েছে। লড়াইয়ের সময় কোন মানুষ উপস্থিত থেকে তা দেখেছে, আজ পর্যন্ত এরকম শোনা যায়নি—কিন্তু মাঝে মাঝে এরকম লড়াই যে হয়, নানারকম গর্জন আর হুংকার আর বুক চাপড়াবার গুম্ গুম্ শব্দে অনেক সময় তার পরিচয় পাওয়া যায়। গরিলা যখন ক্ষেপে, তখন রাগে সে খাড়া হয়ে দাঁড়ায় আর আপনার বুকে দমাদম্ কিল মারতে থাকে। তার চোখ দুটো তখন আগুনের মতো জ্বলজ্বল করে, তার কপালের লোম ফুলে ফুলে খাড়া হয়ে ওঠে আর সেই সঙ্গে নাকের ফস্ ফস্ আর দাঁতের কড়মড় শব্দ চলতে থাকে। তার উপর সে যখন হুংকার ছাড়ে, তখন অতিবড় সাহসী জন্তুও পালাবার পথ খুঁজতে চায়। লোকে বলে, সে হুংকার নাকি সিংহের ডাকের চাইতেও ভয়ানক।

মনে কর, জঙ্গলের মধ্যে কোন গরিলাসুন্দরীর বিয়ের জন্য দুই মহাবীর পাত্র এসেছেন। দুজনেই তাকে ভালোবাসে, দুজনেই তাকে চায়, কেউ দাবি ছাড়তে রাজী নয়। এমন অবস্থায় পশুপাখির মধ্যে সর্বত্রই যা হয়ে থাকে, আর পুরাণের বড় বড় স্বয়ংবর সভাতেও যেমন হয়ে এসেছে, এখানেও ঠিক তাই হওয়াই স্বাভাবিক। তখন দুই বীর আপন আপন তেজ দেখিয়ে লড়াই করতে লেগে যায়। সে ভীষণ লড়াই যে একটা দেখবার মতো ব্যাপার তাতে আর সন্দেহ কি? গরিলার চড় আর গরিলার ঘুঁষি, যার একটি মারলে মানুষের ভুঁড়ি ফেঁসে যায় মাথার খুলি দু'ফাঁক হয়ে যায়, সে কেবল গরিলার গায়েই সয়। সেই চট্‌পট্ দুম্‌দুম্ কিল চড়ের সঙ্গে খাম্‌চা-খাম্‌চি আর কাম্‌ড়া-কাম্‌ড়িও নিশ্চয়ই চলে। এইরকমে যতক্ষণ না লড়াইয়ের মীমাংসা হয়, অর্থাৎ যতক্ষণ এক পক্ষ হার মেনে চম্পট না দেয়, ততক্ষণ হয়ত গরিলাসুন্দরীর চোখের সামনেই এই ভীষণ কাণ্ড চলতে

থাকে। সে বেচারা হয়ত চুপ করে তামাসা দেখে, কিংবা দুজনের মধ্যে কাউকে যদি তার বেশি পছন্দ হয়, তবে তার পক্ষ হয়ে লড়াইয়ে একটু-আধটু যোগ দেওয়াও তার কিছু আশ্চর্য নয়।

বেবুন
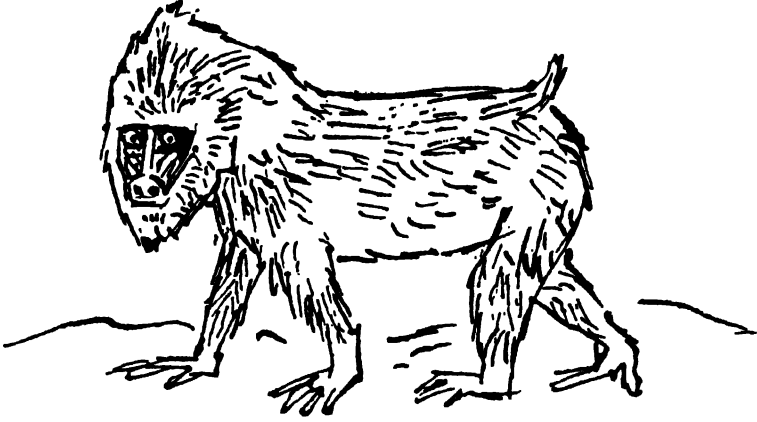
যেসব বানরের মুখ কুকুরের মতো লম্বাটে, যারা চার পায়ে চলে, যাদের ল্যাজ বেঁটে আর গালের মধ্যে থলি আর পিছনের দিকটায় কাঁচা মাংসের মতো ঢিপি, তাদের নাম বেবুন। বেবুনের আসল বাড়ি আফ্রিকায়, কেউ কেউ এশিয়াতেও থাকেন। বেবুন বংশের অনেক শাখা—হলদে বেবুন, লালমুখো বেবুন, ঝুঁটিওয়ালা কালো বেবুন, চিত্রমুখ সং-বেবুন বা ম্যানড্রিল, চাকমা বেবুন, ড্রিল বেবুন ইত্যাদি। কিন্তু সকলেরই মুখের ভঙ্গী চালচলন ও স্বভাব প্রায় একইরকম। উঁচু উঁচু ধারাল দাঁত, বদ্‌খত মেজাজ আর তার চাইতেও বদ্‌খত চেহারা। সমস্ত জানোয়ারদের মধ্যে বিদ্ঘুটে চেহারা যদি কারও থাকে তবে সে ঐ ম্যানড্রিলের। টকটকে লাল নাক, খাঁজকাটা নীল গাল, ভেংচিকাটা ভ্রূকুটি মুখ, সব মিলে অপূর্ব চেহারাখানা হয়!

আফ্রিকার পাহাড়ে জঙ্গলে বেবুনেরা দল বেঁধে লুকিয়ে থাকে। 'বল, বুদ্ধি, ভরসা' এই তিন জিনিসের জোরে সে নীচের জমিতে নেমে এসে চাষার ক্ষেতের উপর অত্যাচার করে ফল শস্য খেয়ে পালায়। তাদের দল বাঁধবার কায়দা, আর পথঘাট পাহারা দেবার ব্যবস্থা এমন চমৎকার, আর এমন হঠাৎ এসে লুটপাট করে তারা ফস্ করে পালায় যে, চাষারা তাদের সঙ্গে কিছুতেই পেরে ওঠে না। পালাবার সময় বেবুনেরা কখনও দলের কাউকে ফেলে যায় না—যদি একজন বিপদে পড়ে অমনি পালের গোদারা তাকে সাহায্য করবার জন্য তেড়ে আসে। একবার একটা বাচ্চা বেবুনকে কতগুলো কুকুরে ঘেরাও করে ফেলেছিল, কিন্তু একটা ধাড়ি বেবুন এসে সেই কুকুরের দলের মধ্যে ঢুকে, এমনি দু-তিন ভেংচি দিয়ে তাদের মুখের সামনে থেকেই সেই বাচ্চাটাকে কেড়ে নিয়ে গেল

যে, কুকুরগুলো ভয়ে কিছুই করতে সাহস পেল না—দূরে শিকারীরা পর্যন্ত তার তেজ দেখে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

বিপদে পড়লে বেবুনেরা পিছনের পায়ে ভর করে খাড়া হয়ে বসে—শত্রুকে হাতের কাছে পেলেই নখ দিয়ে খাম্‌চে টেনে মুখের কাছে নিয়ে এসে, তার পরেই প্রচণ্ড এক কামড়। কামড়ের জোরে হাড়গোড় পর্যন্ত অনায়াসেই গুঁড়িয়ে দিতে পারে। নখ দাঁতই হচ্ছে বেবুনের প্রধান অস্ত্র—কিন্তু দরকার হলে তারা পাথর ছুঁড়তেও জানে। বড় বড় পাথর গড়িয়ে শত্রুর মাথায় ফেলতে তারা খুব ওস্তাদ।

আলিপুরের বাগানে

আলিপুরের চিড়িয়াখানায় আমাদের একটি বন্ধু আছেন। আমরা যখনই আলিপুর যাই, অন্তত একটিবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ভুলি না। দেখা করবার সময় শুধু হাতে যাওয়াটা ভাল নয়, তাই বন্ধুর জন্য প্রায়ই কিছু উপহার নিয়ে যাই। তিনিও তাঁর সাধ্যমত নানারকম তামাসা কসরত ও মুখভঙ্গী দেখিয়ে আমাদের আপ্যায়িত করেন।

অনেকে চিড়িয়াখানায় গিয়ে গোড়া থেকেই বাঘের ঘরটা দেখবার জন্য ব্যস্ত হন। সাপ, কুমির, উটপাখি, গণ্ডার আর হিপোপটেমাস—কেউ কেউ এঁদেরও খুব খাতির করে থাকেন। কিন্তু যে যাই বল, বাগানে ঢুকতে না ঢুকতেই আমাদের মনটা সকলের আগে বলতে থাকে, বন্ধুর বাড়ি চল্‌ বন্ধুর বাড়ি চল্‌। বন্ধুর সঙ্গে কেন যে আমাদের এত ভাব, তা যদি শুনতে চাও, তাহলে তাঁর নামের পরিচয়, গুণের পরিচয়, বিদ্যার পরিচয়, সব তোমাদের শুনতে হয়।

বন্ধুটির নাম হচ্ছে শ্রীযুক্ত ওরাংচন্দ্র ওটান। আফ্রিকা নিবাসী, আলিপুর প্রবাসী। অমন অমায়িক্‌ চেহারা, অমন ঢিলাঢালা প্রশান্ত স্বভাব অমন ধীর গম্ভীর মেজাজী চাল, সমস্ত আলিপুর খুঁজে আর কোথাও দেখবে না।

কত যে ভাবনা আর কত যে হিসাবপত্র সর্বদা তাঁর মাথার মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছে, তাঁর ঐ প্রকাণ্ড কপালজোড়া হিজিবিজি রেখাগুলো দেখলেই তা বুঝতে পারবে। যখন তিনি চিৎপাত হয়ে শুয়ে, মুখের মধ্যে আঙুল দিয়ে, পেট চুলকাতে থাকেন, আর তাঁর কালো কালো হ্যাংলা মতন চোখ-দুটি মিট্‌মিট্‌ করে তাকিয়ে থাকে, তখন যদি তাঁর মনের মধ্যে কান পেতে শুনতে পারতে, তাহলে শুনতে সেখানে অনর্গল হিসাব চলছে—'আর চারটে কলা, আর দু ঠোঙা বাদাম, আর কতগুলো বিস্কুট, আর ঐ নাম-জানি-না গোল-গোল-মতন অনেকখানি'—ইত্যাদি। যখন তিনি খাঁচার ছাত থেকে গরাদ ধরে অত্যন্ত ভালমানুষের মতো ঝুলতে থাকেন, আর দুলতে থাকেন—যেন সংসারের কোন কিছুতে তাঁর মন নেই—তখন যদি তাঁর মনের কথা শুনতে, তাহলে শুনতে পেতে, তিনি কেবলই ভাবছেন, কেবলই ভাবছেন 'এই লোকটার পাগড়ি না হয় ঐ লোকটার চাদর, না হয় এই সাহেবটার টুপি, না হয় ঐ বাবুটার ছাতা—নেবই নেব, নেবই নেব।'

একদিন আমরা চিড়িয়াখানায় গিয়ে দেখি, ওরাংবাবু দোলনা বেঁধে দোল খাচ্ছেন।

কোত্থেকে কি করে, কার একটা পাগড়ি তিনি আদায় করেছেন, আর সেইটাকে ছাতের গরাদের উপর থেকে ঝুলিয়ে অপূর্ব দোলনা তৈরি হয়েছে। তিনি দুহাতে তার দুই মাথায় ধরে মনের আনন্দে দুলছেন। তাঁর মুখখানা যেন সদানন্দ শিশুর মতো, নিজের বাহাদুরি দেখে নিজেই অবাক।

হঠাৎ তাঁর কি খেয়াল হল, পাগড়ির একটা দিক ছেড়ে দিয়ে তিনি গেলেন মাথা চুলকোতে। অমনি পাগড়ির একটা মাথা ভারি হয়ে নেমে পড়ল, আর আরেক মাথা আলগা পেয়ে সুড়ুৎ করে গরাদের উপর দিয়ে পিছলে বেরিয়ে এল। ব্যাপারখানা বুঝবার আগেই ওরাংবাবু মেঝের উপর চিৎপাত। আর কেউ হলে অপ্রস্তুত হত, কিন্তু বন্ধু আমাদের অপ্রস্তুত হবার পাত্রই নন। তিনি পড়েই একটা ডিগবাজি খেয়ে উঠলেন আর এমনভাবে ফিরে দাঁড়ালেন যেন আগাগোড়া তিনি ইচ্ছা করেই আমাদের তামাসা দেখাচ্ছিলেন। তারপর অনেকখানি ভেবে আর অনেক বুদ্ধি খরচ করে আবার তিনি দোলনা খাটালেন। কাপড়টাকে গরাদের উপর দিয়ে গলিয়ে তার দুটো মাথাকেই যে ধরে রাখতে হয়, এটা বুঝতে তাঁর কিছুক্ষণ সময় লেগেছিল। তিনি পাগড়িটাকে ঝুলিয়ে এক মাথা ধরে টানেন, আর হুস্ করে দোলনা খুলে আসে, তাতে প্রথমটা বেচারার ভারি ভাবনা হয়েছিল।

আমাদের বন্ধুটির নানারকম বিদ্যা আছে। তিনি পান খেতে ভারি ভালোবাসেন। পানটা হাতে দিলে, আগে সেটাকে খুলে পরীক্ষা করে দেখেন, তারপর হাতের মুঠোর মধ্যে মুড়ে টপ্ করে মুখের মধ্যে দিয়ে ফেলেন। যখন পান খেয়ে তাঁর মুখখানা লাল হয়, আর গাল বেয়ে পানের রস পড়তে থাকে, তখন তিনি মাটির মধ্যে থুতু ফেলেন, আর লাল রঙের থুতু দেখে খুশী হয়ে তাকিয়ে থাকেন। একদিন গিয়ে দেখি, তিনি জবাফুলের মালা গলায় দিয়ে অত্যন্ত লাজুক ছেলের মতো চুপচাপ করে বসে আছেন। আমাদের দেখে তাঁর কি খেয়াল হল জানি না, তিনি ফুলগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেললেন। শুনেছি, তিনি নাকি লুকিয়ে সিগারেট খেতেও শিখেছেন, আর সুযোগ পেলে মালীদের হুঁকোতেও দু-এক টান দিতে ছাড়েন না।

বন্ধু গানবাজনার সমজদার কিনা, অথবা 'সন্দেশ' পড়তে পারেন কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখবার সুযোগ পাইনি, কিন্তু তিনি যে সুগন্ধ জিনিসের কদর বোঝেন, তার পরিচয় অনেক পেয়েছি। তুলোয় করে খানিকটা এসেন্স দিয়ে দেখেছি, সেই তুলোটুকু নাকে ঠেকিয়ে শুঁকতে শুঁকতে আরামে তাঁর দুই চোখ বুজে আসে, জোরে জোরে নিশ্বাস টানতে টানতে, তিনি চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়েন। অনেকক্ষণ শুঁকে শুঁকে তারপর তুলোটাকে যত্ন করে তুলে রেখে দেন, আর থেকে থেকে ফিরে এসে তার গন্ধ শোঁকেন। একবার আমরা তামাসা দেখবার জন্য তুলোয় করে খানিকটা ঝাঁঝালো অ্যামোনিয়া দিয়েছিলাম। সেটাকে শুঁকে যেরকম অদ্ভুত চোখমুখের ভঙ্গী তিনি করেছিলেন, আর যেরকম করে বারবার হাতে আর রেলিঙে নাক ঘষেছিলেন, সে কথা মনে হলে আজও আমাদের হাসি পায়। একবার শুঁকেও তাঁর কৌতূহল মেটেনি, খুব সাবধানে দূর থেকে আরও দু-চারবার তুলোটাকে শুঁকে, আর দু-চারবার চমৎকার মুখভঙ্গি করে, তিনি সেটাকে তাঁর প্রতিবেশী এক বেবুনের ঘরের মধ্যে ফেলে দিলেন। সেই হতভাগা বেবুনটাও, কথা নেই বার্তা নেই, তুলোটুকু নিয়েই ঝপ্ করে মুখে দিয়ে ফেলেছে। তারপর যদি তার দুরবস্থা দেখতে! অনেকক্ষণ পর্যন্ত নাক রগড়িয়ে হাঁচতে হাঁচতে, আর হাঁ করে জিভের জল ফেলতে ফেলতে বেচারা অস্থির।

এই বেবুনটার সঙ্গে ওরাং ওটানের একটুও ভাব নেই। আরেকবার ওরাং আমাদের কাছ থেকে একটা লাঠি আদায় করেছিলেন। লাঠিটা পেয়েই তিনি ব্যস্তভাবে বাইরে গিয়ে, রেলিঙের ফাঁক দিয়ে তাঁর নিশ্চিন্ত প্রতিবেশীর ঘাড়ের উপর এক খোঁচা। তখন যদি বেবুনের রাগ দেখতে! আমরা সেবার দুই খাঁচার মাঝখানে কলা গুঁজে দিয়ে, বেবুন আর ওরাঙের ঝগড়া দেখেছিলাম। বোকা বেবুনটা যতক্ষণে আঁচড় কামড় আর কিল ঘুঁষি চালাতে থাকে, ততক্ষণে ওরাংবাবু গম্ভীরভাবে ঘাড় গুঁজে কলাটুকু বার করে নেন। কলাটি নিয়ে মুখে দিয়ে তারপরে তাঁর উল্লাস আর ভেংচি। বেবুনটা রাগে যতই পাগলের মতো হয়ে উঠতে থাকে, বন্ধুর ততই ফুর্তি বাড়ে।

এসব কথা কিন্তু চুপিচুপি খালি তোমাদের কাছেই বললাম। তোমরা আলিপুরের কর্তাদের কাছে কক্ষনো এসব বল না; তাহলে আমাদের বাগানে যাওয়া মুশকিল হবে।

মানুষ মুখো
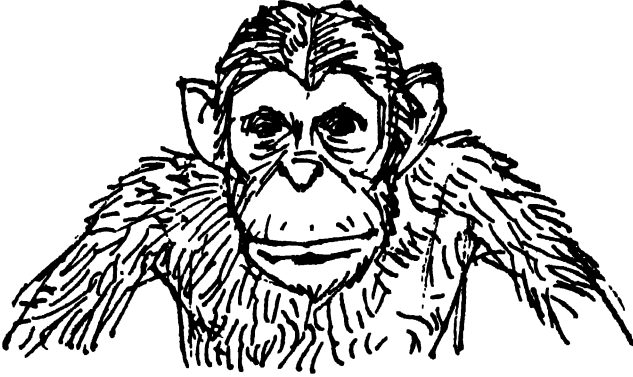
বাঁদরের মুখের চেহারা যে অনেকটা মানুষের মতো তা দেখলেই বোঝা যায়; বিশেষত ওরাং ওটান শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি বুদ্ধিমান বাঁদরদের চালচলন আর মুখের ভাব দেখলে মানুষের মতো আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। কোন কোন বাঁদর আছে তাদের মাথার লোমগুলি দেখলে ঠিক টেরিকাটা মানুষের মাথার মতো মনে হয়, যেন কেউ চিরুনি দিয়ে চুল ফিরিয়ে সিঁথি কেটে দিয়েছে। এক ধরনের বাঁদরের যেরকম গোঁফের বাহার খুব কম মানুষেরই সেরকম আছে। এর বাড়ি আমেরিকায়। ছোট্ট আধ হাত উঁচু বাঁদরটি, কিন্তু ওই গোঁফের জন্যে তার মুখে একটা গাম্ভীর্যের ভাব দেখা যায়। এদের রং কাল, হাতে লম্বা লম্বা নখ থাকে, তাই দিয়ে কাঠবেড়ালীর মতো গাছে খাম্‌চিয়ে ওঠে। এই জাতীয় বাঁদরের নাম টামারিন্‌। এদের সকলের এরকম গোঁফ থাকে না; গুঁফো বাঁদরদের এম্পারার টামারিন্‌ অর্থাৎ সম্রাট টামারিন্‌ বলে। তা সম্রাটের মতো চেহারাই বটে। সম্রাটের প্রিয় খাদ্য হচ্ছে কলা। গুঁফো বাঁদরের পর দাড়িওয়ালা বাঁদর, তার নাম হচ্ছে কাল সাকী। এরও বাড়ি আমেরিকায়। সে দেশের লোকেরা এই বাঁদরকে শয়তান বাঁদর বলে। এরকম

অন্যায় নাম দেবার কোনই কারণ পাওয়া যায় না, কারণ এদের মেজাজ যেমন ঠাণ্ডা, স্বভাবও তেমনি নিরীহ। দাড়ির বহর যতই হোক না কেন, আসলে এরা ভীতুর একশেষ। মানুষের কোন অনিষ্ট করা দূরে থাক, কাছে কোথাও মানুষ আছে জানতে পারলে এরা তার ত্রিসীমানা ছেড়ে পালায়। এদের কোনরকমে পোষ মানান যায় না; ধরে আনলে অতি অল্প দিনের মধ্যে মরে যায়। আর এক জাতের সাকী বাঁদর রয়েছে। এর গায়ের রং খুব হাল্‌কা তাই একে সাদা সাকী বলা হয়। এর চেহারা যেন আরো উদ্ভট গোছের। দাড়িও অন্য রকমের। এইরকমের গালপাট্টা দেওয়া চেহারা আর বিকট ধেব্‌ড়ান মুখ দেখে বুঝবার যো নেই যে, বেচারার স্বভাবটি মোটেও তার চেহারার মতো নয়।

বুড়ো-ধাড়ী সিন্ধুঘোটকদের চেহারাও অনেক সময় খুব মাতব্বর গোছের মানুষের মতো মনে হয়। গোঁফ দাড়ি, মাথায় টাক, সবই বেশ মানিয়ে যায়, কেবল হাতির মতো ওই প্রকাণ্ড দাঁত দুটোতেই সব মাটি করে দেয়।...

পেকারি

'পেকারি' কি জান? দক্ষিণ আমেরিকায় একরকম শুয়োর আছে তার নাম পেকারি! আমাদের দেশী এক একটা বড় বড় বরাহের কাছে পেকারি যেন কুকুরের পাশে ইঁদুরটা। বেশ বড় একটি পেকারি হয়ত একটি সাধারণ ছাগলের চাইতে বড় হবে না। কিন্তু পেকারিকে ভয় করে না, এমন জানোয়ার সে দেশে কম আছে। তার কারণ পেকারিরা সব সময় বড় বড় দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। এক একটা দলে এক-এক সময় চল্লিশ-পঞ্চাশটা পর্যন্ত পেকারি থাকতে দেখা যায়।

পেকারির প্রধান শত্রু 'জাগুয়ার'। যতরকম চিতে বাঘ আছে তার মধ্যে এই জাগুয়ারই সব চাইতে বড় আর ভয়ানক। কিন্তু পেকারির দল সামনে পড়লে জাগুয়ার পর্যন্ত মানে মানে পথ ছেড়ে পালায়। একবার একদল সাহেব দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে শিকার করতে গিয়েছিলেন। হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড ঝোপের মধ্যে থেকে এমনি ভয়ানক ফোঁস্ ফোঁস্ ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ আসতে লাগল যে, তাঁরা ব্যস্ত হয়ে চট্‌পট্ গাছে উঠে পড়লেন। উঁচুতে উঠে তাঁরা দেখেন, একটা ভাঙা গাছের ডালের উপর এক জাগুয়ার চড়ে বসেছে— আর তার চারিদিকে পেকারির দল ভয়ানক গোল বাধিয়ে তুলেছে। জাগুয়ারটা যেখানে বসেছে, ততদূর পর্যন্ত তাদের নাগাল পৌঁছায় না, তাই তারা কেবল রাগের মাথায় ফোঁস্ ফোঁস্ করছে। আর গাছের গোড়ায় ঢুঁ মারছে। মাঝে মাঝে এক একটা লাফ দিয়ে জাগুয়ারটাকে গুঁতো লাগাবার চেষ্টা করছে। কয়েকটা গাছে উঠতে গিয়ে বার বার পড়ে যাচ্ছে, তবু ছাড়ছে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এইরকম থেকে জাগুয়ারটার বোধহয় একটু পরিশ্রম হয়েছিল। সে যেই একটু নড়ে বসতে গেছে, অমনি তার একটা পা হড়কিয়ে ঝুলে পড়েছে। যেমন ঝোলা অমনি একটা পেকারি গিয়ে তার উপর তার দাঁত দিয়ে এক ঘা বসিয়ে দিয়েছে। জাগুয়ারটাও একবারে ক্ষেপে গিয়ে, এক লাফে পেকারিগুলোকে ডিঙিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু পড়ে আর তাকে উঠতে হল না,

মাটিতে ঠেকার সঙ্গে সঙ্গে পেকারির পাল তার উপর পড়ে, তাকে মাড়িয়ে থেঁতলিয়ে গুঁতিয়ে আঁচড়িয়ে কামড়িয়ে তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলল। জাগুয়ারটা যতক্ষণ বেঁচে ছিল, ততক্ষণ সে ধস্তাধস্তি করতে ছাড়েনি। কিন্তু তার উপরে এতগুলো শুয়োর চেপেছিল যে, মাটিতে পড়বার পর আর তাকে চোখেই দেখা যায়নি। শুয়োরগুলি যদি তাকে আর কিছু নাও করত, তবু শুধু চাপের চোটেই মেরে ফেলতে পারত। জাগুয়ারটা মরে যাবার পরেও পেকারিদের রাগ থামেনি। তারা প্রায় আধঘণ্টা পর্যন্ত, থেকে থেকে পাগলের মতো তার উপর তেড়ে যাচ্ছিল। তারপর যখন পেকারির দল চলে গেল তখন দেখা গেল এগারোটা পেকারি মরে পড়ে আছে, আর জাগুয়ারের রক্ত চামড়া মাংস আর হাড় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

পেকারিরা যখন শত্রুর সামনে পড়ে, তখন তারা ধনুকের মতো গোল হয়ে তার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। যদি শত্রু আপনা থেকে সরে পড়ে তবে ভালই; কিন্তু সে যদি একটুও তেজ দেখাতে চেষ্টা করে, তবে আর রক্ষা নেই। দলকে দল তার উপর পড়ে তাকে আর আস্ত রাখবে না। সেইজন্যে জাগুয়ারেরা কখনও ইচ্ছা করে পেকারির দলকে ঘাঁটাতে চায় না; অথচ পেকারির মাংস তার অতি প্রিয় খাদ্য। জাগুয়ার সাধারণত গাছের উপর পাতার আড়ালে চুপচাপ লুকিয়ে থাকে। যদি এক-আধটা পেকারি দল থেকে একটু এদিকে ওদিকে গিয়ে পড়ে সে এক লাফে তার ঘাড় ভেঙে আবার দৌড়ে গাছের উপর উঠে বসে; সেই সঙ্গে পেকারির দলও একেবারে চিৎকার করতে করতে সেই গাছের চারিদিকে এসে জড়ো হয়। জাগুয়ার ততক্ষণে বেশ একটি উঁচু ডালের উপর হাত পা ছড়িয়ে বিশ্রাম করতে থাকে। পেকারির দল সারাদিন কেবল চিৎকার আর দাপাদাপি করুক, তাতে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। যখন তারা চলে যাবে, তখন সেও সুযোগ বুঝে সেই আগের মারা পেকারিটাকে খেতে নামবে।

অনেক সময়ে নদীর ধারে কাদার মধ্যে গাছের গুঁড়ির উপর পেকারির দল হুড়োহুড়ি করে খেলে বেড়ায়। সেইখানে কাদামাখা কাঠের চেলার মতো কুমির হাত পা গুটিয়ে শুয়ে থাকে। সে আবার আমাদের দেশের কুমিরের চাইতেও চট্‌পটে—এই দেখছ মড়ার মতো, এর পরেই হয়ত দেখবে পাঁচ হাত লাফ দিয়ে জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। পেকারির দল এদিক ওদিক ঘুরে-টুরে যখন সেইদিকে আসে, কুমিরও ল্যাজটিকে টান করে ভাবে 'এইবার সময় এসেছে'। যদি দৈবাৎ এক-আধটা পেকারি খেলতে খেলতে সেই ল্যাজের উপর উঠে পড়ে, তবে আর রক্ষা নেই। নিশ্চয় দেখবে, তার পরের মুহূর্তেই ল্যাজের এক ঝাপটায় পেকারি ভায়া ডিগবাজি খেয়ে শূন্যে উঠেছেন, তারপর, শূন্যে থাকতে থাকতেই সেই সাংঘাতিক ল্যাজ চাবুকের মতো ছুটে এসে, আবার এক বাড়িতে তাকে কাদার মধ্যে আছাড় মেরে ফেলেছে।

ব্যাপারটা কি হল, দলের সবাই সেটা ভাল করে বুঝবার আগেই কুমির তার শিকার মুখে নিয়ে আচ্ছা করে ঝাঁকানি দিয়ে জলের মধ্যে নেমেছে। এদিকে পেকারির দল তেড়ে এসে দাঁত উঁচিয়ে তীরের কাছে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে একটিবার কুমিরের চেহারাটি দেখেই একেবারে চার পা তুলে দে দৌড়। ওই একমাত্র জানোয়ার যার কাছে পেকারির দল ঘেঁষতে সাহস পায় না।

সে দেশের লোকেরা যে পেকারিকে খুব হিসাব করে চলে, সহজেই বুঝতে পার। একলা পেলেও কেউ তাকে সহজে ঘাঁটাতে চায় না; কারণ কাছেই তার দলটি আছে কিনা জানবে কি করে? সুতরাং পেকারির সামনে যদি কখন পড়, তবে আর কিছু করবার আগে সুবিধামত একটি গাছের উপর চড়ে সবাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

জানোয়ার এঞ্জিনিয়ার

পাখির মধ্যে কাক, আর পশুর মধ্যে শেয়াল—বুদ্ধির জন্য মানুষে ইহাদের প্রশংসা করে। কিন্তু এখন যে জন্তুটির কথা বলিব, তাহার বুদ্ধি শেয়ালের চাইতে বেশি কিনা, সেটা তোমরা বিচার করিয়া দেখ। এই জন্তুর বাড়ি উত্তরের শীতের দেশে—বিশেষত উত্তর আমেরিকায়। ল্যাজশুদ্ধ দুহাত লম্বা জন্তুটি, দেখিতে কতকটা ইঁদুর বা 'গিনিপিগে'র মতো; তাহার চেহারায় বিশেষ কোন বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহার কাজ যদি দেখ, তবে বুঝিবে সে কত বড় কারিকর। জানোয়ারের মধ্যে এত বড় 'এঞ্জিনিয়ার' আর দ্বিতীয় নাই। ইহার নাম বীভার।

মৌমাছির চাক, মাকড়সার জাল, পিঁপড়ার বাসা প্রভৃতি অনেক ব্যাপারের মধ্যে আমরা খুব কৌশলের পরিচয় পাই—কিন্তু বীভারের বুদ্ধি কৌশল আরও অদ্ভুত। ইহারা বড় বড় বাঁধ বাঁধিয়া নদীর স্রোত আটকাইয়া রাখে, জঙ্গলের বড় বড় গাছ কাটিয়া ফেলে এবং সেই গাছের 'লাক্‌ড়ি' বানাইয়া নানারকম কাজে লাগায়। খাল কাটিয়া এক জায়গার জল আরেক জায়গায় নিতেও ইহারা কম ওস্তাদ নয়। এই সমস্ত কাজে ইহাদের প্রধান অস্ত্র বাটালির মতো ধারাল চারটি দাঁত। বড় বড় গাছ, যাহা কোপাইয়া কাটিতে মানুষের রীতিমত পরিশ্রম লাগে, বীভার তাহার ঐ দাঁত দুটি দিয়া সেই গাছকে কুরিয়া মাটিতে ফেলে। যেখানে বীভারেরা পল্লী বাঁধিয়া দলেবলে বসতি করে, তাহার আশেপাশেই দেখা যায় যে অনেকগুলি গাছের গোড়ার দিকে, জমি হইতে হাতখানেক উপরে, খানিকটা কাঠ যেন খাবলাইয়া ফেলা হইয়াছে। এক একটা গাছ প্রায় পড়ো পড়ো অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে; আরেকটু কাটিলেই পড়িয়া যাইবে। এ সমস্তই বীভারের কাণ্ড। গাছটি যখন কাটা হইল তখন তাহাকে ছোট বড় নানারকম টুকরায় কাটিবার জন্য বীভারের দল ভারি ব্যস্ত হইয়া উঠে। শীতকালে যখন বরফ জমিয়া যায়, যখন চলাফিরা করিয়া খাবার সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়ে, তখন বীভারের প্রধান খাদ্য হয় গাছের ছাল। সেইজন্য শীত আসিবার পূর্বেই তাহাদের গাছ কাটিবার ধুম পড়িয়া যায়, এবং তাহারা গাছের নরম বাকল কাটিয়া বাসার মধ্যে জমাইতে থাকে।

বীভারের প্রধান আশ্চর্য কীর্তি নদীর বাঁধ; কিন্তু তাহার কথা বলিবার আগে ইহাদের বাসা সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। জলের ধারে কাঠকুটা ও মাটির ঢিপি বানাইয়া তাহার মধ্যে বীভারেরা স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া বাস করে। এই অদ্ভুত বাসায় ঢুকিবার দরজাটি থাকে জলের নীচে, একটা লম্বা প্যাঁচালো সুড়ঙ্গের মুখে। জলে ডুব মারিয়া ঐ সুড়ঙ্গের মুখটি বাহির করিতে না পারিলে বাসায় ঢুকিবার আর কোন উপায় নাই। বাসার

উপরে যে টিপির মতো ছাদ থাকে তাহাও দু-তিন হাত বা তাহার চাইতে বেশি পুরু এবং খুবই মজবুত। এক একটা টিপি প্রায় পাঁচ, সাত বা দশ হাত উঁচু হয়।

শীত পড়িবার কিছু আগেই তাহারা বাসায় ঢুকিবার একটা নূতন সুড়ঙ্গপথ কাটিতে আরম্ভ করে। এই পথটা একেবারে সোজা আর খুব মোটা হয়—কারণ এইখান দিয়াই তাহারা গাছের ডালপালা আনিয়া শীতকালের জন্য সঞ্চয় করিতে থাকে। এই সুড়ঙ্গেরও মুখটি থাকে জলের নীচে। প্রত্যেক পরিবারের লোকেরা আপন আপন বাসায় ঢুকিবার পথ জানে এবং প্রত্যেক পরিবার নিজের নিজের খাবার সংগ্রহ করে। কেবল বড় বড় বাঁধ বাঁধিবার সময়ে দুটি চারটি বা আট দশটি পরিবার একত্র হইয়া কাজ করে। মেজের উপর পাতিবার জন্য প্রত্যেক বাসায় কিছু কিছু নরম ঘাসও রাখা হয়। কোন কোন জায়গায় আবার বাসার মধ্যে দেয়াল তুলিয়া ছোটদের ঘর, বড়দের ঘর ইত্যাদি নানারকম আলগা ঘরের ব্যবস্থা করা হয়। আবার কোথাও কোথাও দোতলা তিনতলা করিয়াও ঘরের বন্দোবস্ত করা হয়। খাবার সংগ্রহ হইয়া গেলে অনেক সময়ে বড় সুড়ঙ্গ টার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। শীতকালে যখন জলের উপরে বরফ জমিয়া যায়, সেই সময়ে বাহির হইবার জন্যও একটা আলগা সুড়ঙ্গের দরকার হয়। এই সুড়ঙ্গটা থাকে বাসার বাহিরে—ইহার এক মুখ জলের নীচে, আরেক মুখ উঁচু ডাঙার উপরে। জলের নীচে বাসার দরজা দিয়া বাহির হইয়া তারপর এই সুড়ঙ্গের ভিতরে ঢুকিয়া তবে বীভারেরা বাহিরে আসে।

বীভারের শরীরের গঠন দেখিলেই বোঝা যায় যে জলে থাকা অভ্যাস তাহার আছে। হাঁসের পায়ের মতো চ্যাটালো পা, নৌকার বৈঠার মতো চওড়া চ্যাপ্টা ল্যাজ, গায়ের নরম লোমের উপরে আবার লম্বা তেলতেলা লোমের ঢাকনি—এ সমস্তই জলজন্তুর উপযোগী ব্যবস্থা। বাসার কাছে জল না হইলে তাহাদের চলে না, সুতরাং সেখানে যাহাতে বারো মাস যথেষ্ট জল থাকে তাহার জন্য সে নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া জল আটকাইয়া বড় বড় বিল জমাইয়া ফেলে। আর সেই বিলের ধারে বাসা বাঁধিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে। কোথাও বসতি করিবার আগে বীভারেরা দল বাঁধিয়া জায়গা দেখিতে বাহির হয়। যেখানে নদী আছে অথচ স্রোত বেশি নাই, অথবা জল খুব গভীর নয়, সেইরকম জায়গা তাহাদের খুব পছন্দ। জলের ধারে গাছ থাকা চাই আর জায়গাটা বেশ নির্জন চাই, তবেই তাহা ষোলো আনা মনের মতো হয়। দলের মধ্যে যাহারা বয়সে প্রবীণ তাহারা প্রথমত চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া জায়গা ঠিক করে; তারপর সকলে মিলিয়া নদীর ধারের আঠাল মাটি আর ছোট বড় লাক্ড়ি ফেলিয়া জলের মধ্যে বাঁধ বাঁধিতে থাকে। এক পরত মাটি দিয়া তাহার উপর এক সার লাক্ড়ি চাপায়; তাহার উপরে আবার মাটি ফেলিয়া, তাহার উপর ডালপালা শিকড় জড়াইয়া মজবুত করিয়া গাঁথিয়া তোলে। বাঁধ যতই উঁচু হইতে থাকে, নদীর স্রোত বাধা পাইয়া ততই দুইদিকে ছড়াইয়া পড়ে—আর বীভারেরাও সেই বুঝিয়া বাঁধটাকে ক্রমাগতই লম্বা করিতে থাকে। এমনি করিয়া দেখিতে দেখিতে নদীর মধ্যে প্রকাণ্ড বিল জমিয়া যায়। অনেক সময়ে জলের বেগ কমাইবার জন্য কাছে কাছে আরও দু-একটা ছোটখাট বাঁধ দেওয়ার দরকার হয়। এ কাজটিও বীভারেরা খুব হিসাবমত বুদ্ধি খাটাইয়া করে।

এ সমস্ত কাজ করিতে হইলে—জলের স্রোত কোনদিকে, কোথায় কতখানি জল ইত্যাদি অনেক বিষয় জানা দরকার। কানাডার এক এঞ্জিনিয়ার সাহেব একটা নদীতে তিন-চারটি বীভারের বাঁধ পরীক্ষা করিয়া দেখেন। তিনি বলেন যে, তাঁহার উপর ও কাজের ভার থাকিলে তিনি যেখানে যেখানে যেরকম ভাবে বাঁধ রাখা উচিত বোধ করিতেন বীভারেরাও ঠিক সেইসব জায়গায় তেমনিভাবে বাঁধ বসাইয়াছে। এইরকম এক একটি বাঁধ এক-এক সময়ে একশ বা দুইশ হাত লম্বা এবং পাঁচ হাত বা দশ হাত উঁচু হইতে দেখা যায়। একবার এক সাহেব তামাসা দেখিবার জন্য রাত্রে একটা বাঁধের খানিকটা কোদাল দিয়া ভাঙিয়া লুকাইয়া থাকেন। ভাঙা বাঁধের ফাঁক দিয়া হুড় হুড় করিয়া জল বাহির হইতে লাগিল—তাহার শব্দে কোথা হইতে একটা বীভার বাহির হইয়া আসিল—তারপর দেখিতে দেখিতে ৮/১০টি বীভার অতি সাবধানে এদিক ওদিক কান পাতিয়া আস্তে আস্তে বাঁধের কাছে আসিল। তারপর সবাই মিলিয়া খানিকক্ষণ কি যেন পরামর্শ করিয়া হঠাৎ সকলে ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে ছুটিয়া গেল এবং দু' ঘণ্টার মধ্যেই কাঠ ও মাটি দিয়া বাঁধটাকে মেরামত করিয়া তুলিল। তারপর একটা বীভার তাহার ল্যাজ দিয়া জলের উপর চটাৎ করিয়া বাড়ি মারিতেই সকলে যে যার মতো কোথায় সরিয়া পড়িল আর সারারাত তাহাদের দেখাই গেল না। হঠাৎ ভয় পাইলে বা সকলকে সতর্ক করিতে হইলে বীভারেরা এইরূপ জলের উপর ল্যাজের বাড়ি মারিয়া শব্দ করে। নিস্তব্ধ রাত্রে এই শব্দ পিস্তলের আওয়াজের মতো শুনায় এবং অনেক সময়ে একটা আওয়াজের পর সকলের জলে ঝাঁপ দিবার চটাপট্ শব্দ অনেক দূর হইতে পরিষ্কার শুনিতে পাওয়া যায়। বাঁধ বাঁধিবার জন্য গাছের দরকার হয়। এই গাছ কাটিয়া বড় বড় লাক্‌ড়ি বানাইয়া তাহা বহিয়া লওয়া খুবই পরিশ্রমের কাজ। সেইজন্য বীভারেরা এমন জাগায় বাসা খোঁজে যাহার কাছে যথেষ্ট গাছ আছে। সেই গাছগুলিকে তাহারা দাঁত দিয়া এমনভাবে কাটে যে গাছগুলি পড়িবার সময় ঠিক নদীমুখো হইয়া পড়ে। তখন তাহাকে কাটিয়া কুটিয়া অল্প পরিশ্রমেই জলে ভাসাইয়া লওয়া যায়, কিন্তু গাছগুলি যদি জল হইতে দূরে থাকে অথবা কাছের গাছগুলি যদি সব ফুরাইয়া যায়, তাহা হইলে উপায় কি? তাহা হইলে বীভারেরা দস্তুরমত খাল কাটিয়া সেই গাছ আনিবার সুবিধা করিয়া লয়। তাহারা নদীর কিনারা হইতে গাছের গোড়া পর্যন্ত দু হাত চওড়া ও দু হাত গভীর একটি খাল কাটিয়া যায়। তারপর সেই খালে যখন নদীর জল আসিয়া পড়ে, তখন গাছের টুকরাগুলি তাহাতে ভাসাইয়া ঠেলিয়া লইতে আর কোনই মুশকিল হয় না।

এমন যে বুদ্ধিমান নিরীহ জন্তু, মানুষে তাহার উপরেও অত্যাচার করিতে ছাড়ে নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে, বীভারের গায়ের চামড়াটি বড়ই সুন্দর ও মোলায়েম—সৌখিন লোকের লোভ হইবার মতো জিনিস। সুতরাং এই জন্তুকে মারিয়া তাহার চামড়া বিক্রয় করিলে বেশ দু পয়সা লাভ করা যায়। এই চামড়ার লোভে বিস্তর শিকারী আজ প্রায় দেড়শ বৎসর ধরিয়া নানা দেশে ইহাদের মারিয়া উজাড় করিয়া ফিরিতেছে। মানুষের শখের জন্য কত লক্ষ লক্ষ বীভার যে প্রাণ দিয়াছে তাহার আর সংখ্যা হয় না। এখনও যে ইহারা পৃথিবী হইতে লোপ পায় নাই, ইহাই আশ্চর্য।

গ্লাটন

বীভারের কথা বলিয়াছি কিন্তু বুদ্ধিমান জীবের কথা বলিতে গেলে আর একটি জন্তুর কথা বলিতে হয় তাহার নাম গ্লাটন। চুরি-বিদ্যায় ফাঁকি-বিদ্যায় খাওয়া-বিদ্যায় এবং নানারকম ধূর্ত-বিদ্যায় ইনি একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। শীতের দেশে যাহারা নানারকম দামী চামড়া সংগ্রহের জন্য বীভার প্রভৃতি জন্তু মারিয়া ফেরে তাহারা এই গ্লাটনকে যেমন ভয় করে, এমন আর কাহাকেও নয়। এই গ্লাটন যেখানে দেখা দেয় সেখানে শিকারীর ব্যবসা মাটি। কত কৌশলে কত কষ্ট করিয়া শিকারীরা ফাঁদ পাতে আর গ্লাটন আসিয়া ফাঁদে পড়া জন্তুগুলিকে খাইয়া সব ফাঁদ নষ্ট করিয়া চলিয়া যায়। সে নিজে কখন ফাঁদে পড়িবে না, কিন্তু ফাঁদ নষ্ট করিতে তাহার মতো ওস্তাদ আর নাই। যখনি দেখা যায় ফাঁদগুলিকে টানিয়া ঘাঁটিয়া সব লণ্ডভণ্ড করা হইয়াছে, তখনি শিকারীরা বুঝিতে পারে গ্লাটন আসিয়াছে। এই গ্লাটনকে না মারা পর্যন্ত শিকারীর আর নিস্তার নাই। সে যতদিন থাকিবে ততদিন ফাঁদের সমস্ত শিকার কেবল তাহারই পেটে যাইবে। ফাঁদকে সে গ্রাহ্য করে না, কারণ ফাঁদের মর্ম সে ভাল করিয়াই জানে। সে খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফাঁদ বাহির করে আর ফাঁদের সুতা কাটিয়া স্প্রিং সরাইয়া কাঠি নড়াইয়া তাহাকে একেবারে নষ্ট করিয়া রাখে। সুতরাং শিকারীরা অনেক সময়েই সে স্থান ছাড়িয়া বহু দূরে গিয়া আবার নূতন করিয়া ফাঁদ পাতিতে বাধ্য হয়। তাহাতেও সকল সময়ে নিস্তার নাই; কারণ শিকারীর ফাঁদ হইতে শিকার চুরি করিয়া খাইবার সহজ সুযোগটা ইহারা ছাড়িতে চায় না। তাই একবার কোন শিকারীর সন্ধান পাইলে ইহারা তাহার সঙ্গ ছাড়িতে চায় না, গোপনে তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে চেষ্টা করে।

একবার একটা গ্লাটন প্রায় একমাস ধরিয়া এক শিকারীকে এইরকম জ্বালাতন করিয়াছিল। শিকারী প্রতিদিন পশমী নেউল ধরিবার জন্য ঝোপের মধ্যে দশ বিশটা করিয়া ফাঁদ পাতিয়া রাখিত, আর প্রতিদিনই আসিয়া দেখিত চারিদিকে গ্লাটনের পায়ের দাগ আর ফাঁদগুলি ভাঙা। তাহাতে দু-চারটি শিকার যাহা ধরা গিয়াছিল তাহাদের কিছু কিছু টুকরা মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। নানারকম কায়দা করিয়া নানারকম নূতন ফাঁদ বসাইয়াও সেই একইরকম ব্যাপার চলিতে লাগিল। তখন শিকারী নেউল ছাড়িয়া গ্লাটন ধরিবার ফাঁদ বসাইল। একটা ঝোপের মধ্যে দরজার মতো খানিকটা ফাঁক, তাহার পিছনে একটা কাঠির আগায় মাংস গাঁথা। সেই মাংস খাইতে গেলেই কাঠিতে টান পড়ে আর স্প্রিং ছুটিয়া আপনা হইতেই দরজা আটকাইয়া যায়। কিন্তু গ্লাটন তাহাতে ভুলিবার পাত্র নয়। দরজাটি দেখিয়াই সে আর সে-মুখো হয় নাই—সে ঘুরিয়া ঝোপের পিছন দিক হইতে কাঠ সরাইয়া কাঠিশুদ্ধ মাংসটাকে বাহির করিয়া খাইয়া ফেলিল। তারপর শিকারী খোলা বরফের উপর একটুকরা মাংস বসাইয়া তাহার সঙ্গে খানিকটা সুতা দিয়া একটা বন্দুক এমন কৌশলে আটকাইয়া দিলেন যে মাংসটাকে খাইতে গেলেই সুতায় টান পড়িয়া বন্দুক ছুটিয়া যায়। বন্দুকটা একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকান। পরের দিন শিকারী গিয়া দেখে যে মাংসের চারিদিকে গ্লাটনের পায়ের দাগ, কিন্তু সে মাংসটুকু ছোঁয় নাই! শিকারী আরো বেশি মাংস দিয়া ভাবিল, অমন পেটুক জন্তু কি আর মাংসের লোভ সামলাইতে পারে? পরদিন সকালে দেখা গেল মাংসও খাইয়াছে, বন্দুকও ছুটিয়াছে কিন্তু গ্লাটন মরে নাই। সে গাছের গুঁড়ির

আড়ালে থাকিয়া সূতা টানিয়া ছিঁড়িয়াছে। তাহাতে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া বোধহয় সে ভয় পাইয়া পলাইয়াছিল কিন্তু পায়ের দাগ দেখিয়া বোঝা যায় যে সে পরে আবার আসিয়া মাংসটা খাইয়া গিয়াছে। তখন শিকারীর জেদ চড়িয়া গেল। সে ভাবিল যেমন করিয়া হউক এই হতভাগাটাকে মারিতেই হইবে। এই ভাবিয়া সে মাটিতে মাংস রাখিয়া জ্যোৎস্নারাত্রে বন্দুক হাতে করিয়া একটা গাছের উপর বসিয়া রহিল। কিন্তু সে রাত্রে আর গ্লাটনের দেখাই পাওয়া গেল না। শীতের রাত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া শিকারী যখন তাহার কাঠের তাঁবুতে ফিরিয়া আসিল, তখন সে দেখিল যে তাঁবুর জিনিসপত্র সব উলটপালট, আর অনেক জিনিস চুরি হইয়া গিয়াছে। তাঁবুর বাহিরে কেবল গ্লাটনের পায়ের দাগ। তারপর অনেক কষ্টে চারিদিকে নানা স্থান হইতে চোরাই জিনিস সব সংগ্রহ করিয়া শিকারী সেই যে সেখান হইতে একেবারে সরিয়া পড়িল, ত্রিশ মাইল পথ পার না হইয়া আর নূতন ফাঁদ পাতিল না।

গ্লাটনের নামে এই দুটি মস্ত অপবাদ—সে চোর এবং পেটুক। সে যে পেটুক তাহার আর অন্য প্রমাণ দরকার নাই—এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে ইংরাজিতে 'গ্লাটন' (Glutton) কথাটার অর্থই হয় পেটুক। দেখিতে কতকটা শেয়ালের মতো, চেহারাটাও তাহার চাইতে বড় নয়; কিন্তু সে যে পরিমাণ আহার করে তাহাতে একটা বাঘেরও বেশ পরিতোষ করিয়া নিমন্ত্রণ খাওয়া চলে। আর চোর হওয়ার কথাটা ত আগেই শুনিয়াছ। সে যে কিরকম চোর তাহা চুরির নমুনাতেই বোঝা যায়। যে জিনিস সে খায় না, যাহার ব্যবহার সে জানে না এবং যে জিনিসে তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, এমন সব জিনিসও সে সুযোগ পাইলেই সরাইয়া ফেলে। ছাতা জুতা টুথব্রাশ কাগজ কলম হইতে আরম্ভ করিয়া হাঁড়িকুড়ি বা উনানের লোহার শিক পর্যন্ত চুরি করিতে সে ইতস্তত করে না।

গ্লাটনের আর একটি অভ্যাস আছে, সেও কম অদ্ভুত নয়। হঠাৎ মানুষ বা অপরিচিত জন্তুকে দেখিলে সে খাড়া হইয়া দুই পায়ের উপর ভর দিয়া বসে এবং সামনের পা দুখানা চোখের উপরে এমনভাবে উঠাইয়া ধরে যে দেখিলে মনে হয় ঠিক যেন ভাল করিয়া পরখ করিবার জন্য চোখটাকে আড়াল দিয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরকম বুদ্ধি আর এইসব অদ্ভুত রকম-সকম দেখিয়া সে দেশের লোকে অনেক সময়ে ভয় পায়—তাহারা বলে এই জন্তুটার চালচলন কেমন ভূতের কাণ্ড বলিয়া মনে হয়।

নরওয়ে দেশে ভালুক বা নেকড়ে বাঘ মারিতে পারিলে যে পুরস্কার পাওয়া যায়, গ্লাটন মারিলেও ঠিক সেই পুরস্কার। ইহাতে বুঝিতে পার যে এই ছোট জন্তুটির অত্যাচারকে মানুষে কিরকম ভয় করে।

ঘোড়ার জন্ম

তোমরা সকলেই জান যে এমন সময় ছিল যখন এই পৃথিবীতে মানুষ ছিল না। শুধু মানুষ কেন, জীবজন্তু গাছপালা কোথাও কিছু ছিল না। তখন এই পৃথিবী তপ্ত কড়ার মতো গরম ছিল—বৃষ্টির জল তাহার উপর পড়িবামাত্র টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিত।

তারপর যখন পৃথিবী ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া আসিল, তখন তাহাতে অল্প অল্প গাছপালা জীবজন্তু দেখা দিতে লাগিল।

জীবজন্তু আসিবার অনেক হাজার হাজার বৎসর পরেও মানুষের কোন অস্তিত্ব দেখা যায় নাই। আজকাল আমরা যে-সকল জানোয়ার সচরাচর দেখিতে পাই—এগুলিও সব 'আধুনিক' কালের—অর্থাৎ সেই অতি প্রাচীনকালের জানোয়ারেরা সকলেই এখন লোপ পাইয়াছে। সকলে কিন্তু একেবারে লোপ পায় নাই; যদি পাইত তবে এখন পৃথিবীতে এসব জীবজন্তুর কিছুই দেখিতাম না। এখনকার এইসকল জানোয়ারগুলি সকলেই প্রাচীনকালের কোন না কোন জানোয়ারের বংশধর। এই যে অতি সভ্য অতি বুদ্ধিমান মানুষ, ইহার বংশের ইতিহাস যদি খুঁজিতে যাই তবে এমন জায়গায় গিয়া পড়িব যেখানে মানুষকে আর মানুষ বলিয়া চিনিবার যো থাকিবে না।
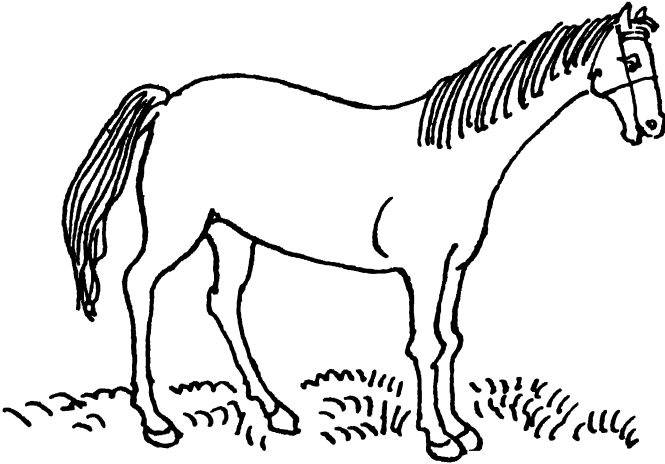
এমনিভাবে প্রত্যেক জানোয়ারের ইতিহাস যদি খুঁজিতে যাই—প্রাচীনকালের পাহাড়ের স্তরে তাহাদের যে-সকল কঙ্কালচিহ্ন পাওয়া যায়, সে সকল পরীক্ষা করিয়া দেখি—তবে প্রত্যেকের বেলায় এই কথারই প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কিন্তু যে-সকল জানোয়ার ছিল, তাহারা সকলেই ত আর আপন আপন কঙ্কালচিহ্ন রাখিয়া যায় নাই—যে-সকল কঙ্কাল পাহাড়ের মধ্যে আজও জমিয়া আছে, তাহারও অতি অল্পই মানুষের চোখে পড়িয়াছে। সেইজন্য সকল জন্তুর পূর্বপুরুষের হিসাব এখনও ভাল করিয়া পাওয়া যায় নাই। দুটা একটা যাহা পাওয়া যায় তাহা হইতেই কতকটা স্পষ্ট দেখা যায়, কতকটা অনুমান করিয়া বুঝিতে হয়, কেমন করিয়া অল্পে অল্পে সেই যুগের এক একটা জানোয়ার এই যুগের কুকুর বেড়াল গরু হরিণে পরিণত হইয়াছে। পুরাতন কঙ্কাল হইতে যত জানোয়ার-বংশের প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে ঘোড়ার ইতিহাস আমরা যেমন জানি এমন আর কাহারও নহে। আমেরিকার 'রকি' পাহাড়ে অনেক জানোয়ারের কঙ্কালচিহ্ন পাওয়া যায়। কয়েকজন পণ্ডিত চৌদ্দ বৎসর ক্রমাগত সন্ধান করিয়া সেখানে নানা প্রাচীন যুগের প্রায় আটশত ঘোড়ার কঙ্কাল বাহির করিয়াছেন। 'ঘোড়া' বলিলাম বটে কিন্তু তাহার অনেকগুলিকেই সহজে ঘোড়া বলিয়া চিনিবার যো নাই।

সবচাইতে পুরাতন যেটি, তাহার নাম 'ইয়োহিপ্‌পাস' (Eohippus) বা 'আদি অশ্ব'। দেখিতে একটি ছোট ছাগলছানার চাইতে বড় হইবে না—পায়ে তার চারটি করিয়া আঙুল বা খুর—আর একটা পঞ্চম আঙুলের চিহ্ন প্রায় লোপ পাইয়া আসিয়াছে। দেখিলে কে বলিবে যে এই জন্তুই ঘোড়ার পূর্বপুরুষ? কিন্তু সবগুলি কঙ্কাল মিলাইয়া যুগ হিসাবে পরপর সাজাইয়া দেখ, ঘোড়ার জন্মের ইতিহাস যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। ছাগলছানার মতো ছোট জন্তুটি কেমন করিয়া যুগের পর যুগ ক্রমে বড় হইল, কেমন করিয়া ক্রমে তাহার চেহারা অল্পে অল্পে বদলাইয়া আসিল, কেমন করিয়া নিত্য নূতন অবস্থার মধ্যে তাহার শরীরের নিত্য নূতন পরিবর্তন ঘটিতে ঘটিতে সেই যুগের 'আদি অশ্ব' এই যুগের আধুনিক ঘোড়ায় পরিণত হইল, তাহার জীবন্ত চিত্র পাথরের গায়ে কঙ্কালের লেখায় লিখিত রহিয়াছে।

বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার পায়ের গড়ন মজবুত হইয়া আসিয়াছে—তাহার সমস্ত শরীরটা দ্রুত দৌড়িবার উপযোগী হইয়াছে। যে দৌড়াদৌড়ি করে, যাহাকে পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার পক্ষে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যক হয়। সুতরাং দেহের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিমাণ খাদ্য চিবাইবার উপযোগী দাঁত তাহার থাকা চাই। তাহার চোয়ালের হাড়ও ক্রমে সেইরূপ মজবুত হওয়া দরকার। এইসকল কঙ্কালের দাঁত ও মাথার হাড় পরীক্ষা করিলেও ঠিক এই কথারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

কিন্তু সকলের চাইতে চমৎকার তাহার খুরের ইতিহাস। আদিকালের সেই পাঁচটি আঙুল কেমন করিয়া এই যুগে একটা ভোঁতা খুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার ইতিহাস অতি সুন্দরভাবে ও স্পষ্টভাবে এই সকল কঙ্কালের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। 'আদি অশ্বের' সময়েই পাঁচ আঙুলের একটি প্রায় লোপ পাইয়া আসিয়াছিল; তারপর ক্রমে আর একটি আঙুলও লোপ পাইল—বাকী রহিল মাত্র তিনটি। সংখ্যায় কমিল বটে, কিন্তু মাঝের আঙুলটি ক্রমে মোটা হইয়া লুপ্ত আঙুলগুলির অভাব দূর করিয়াছে। পাশের আঙুল দুটা ক্রমেই ছোট হইয়া অনেকদিন পর্যন্ত হাড়ের টুকরার মতো পায়ের দু পাশে লাগিয়াছিল। তারপর এখনকার ঘোড়ার পায়ে ওই একটা আঙুলই সবটুকু স্থান দখল করিয়াছে—তাহাকে আর এখন আঙুল বলা চলে না।

কোন সময় হইতে মানুষ ঘোড়াকে বশ মানিতে শিখাইয়াছিল, তাহা ঠিক বলা যায় না। অতি প্রাচীন যুগের আদিম মানুষ যাহারা বনে জঙ্গলে গুহা গহ্বরে বাস করিত, তাহাদের শেষ চিহ্নের আশেপাশে লোমশ গণ্ডার, অতিকায় হস্তী, খড়্গদন্ত ব্যাঘ্র ও গুহা ভল্লুক প্রভৃতি জানোয়ারের কঙ্কালচিহ্ন আজও পাওয়া যায়। ঘোড়ার ঐ তিন আঙুলওয়ালা পূর্বপুরুষদের কেহ যে মানুষের কাজে লাগে নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

সেকালের বাঘ

সেকালে এমন সব জন্তু ছিল যা আজকাল আর দেখা যায় না—এ কথা তোমরা নিশ্চয়ই জান। সেকালের চার দাঁতওয়ালা হাতি, ত্রিশ হাত লম্বা কুমির বা হাঁসুলি-পরা

তিন শিঙা গণ্ডার, এর কোনটাই আজকাল পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে গুহা গহ্বরে পাহাড়ের গায়ে বা বরফের নীচে, তাদের কঙ্কালের কিছু কিছু চিহ্ন পাওয়া যায়—তা থেকেই পণ্ডিত লোকে বুঝতে পারেন যে, এক সময়ে এই-এইরকম জানোয়ার পৃথিবীতে ছিল। যাঁরা এইসকল জিনিসের চর্চা করেন, তাঁরা সামান্য একটুকরা দাঁত দেখে বলতে পারেন—এটা কি রকম জন্তুর দাঁত, সে আমিষ খায় কি নিরামিষ খায়, ইত্যাদি।

এবার যে জানোয়ারের কথা বলছি ইংরাজিতে তাকে বলে Sabre-toothed Tiger (অর্থাৎ খড়্গদন্ত বাঘ)। এর কঙ্কাল ইউরোপে, আমেরিকায়, আমাদের দেশে এবং আরও নানা জায়গায় পাওয়া গিয়েছে। এই খড়্গের মতো দাঁত দুটিতে তার কি কাজ হত, সে কথা বলা বড় শক্ত। অত লম্বা দাঁত দিয়ে কামড়াবার সুবিধা হয় না; তাছাড়া, এই বাঘের চোয়ালের হাড় আজকালকার বাঘের মতো মজবুত নয়, সুতরাং তার কামড়ের জোরও কম ছিল। দাঁত দুটি প্রায় ছয় ইঞ্চি করে লম্বা, তার গায়ে ছুরির মতো ধার—হয়ত তা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে শিকারের মাংস ছাড়াবার সুবিধা হত। যে জন্তু যে-রকম স্থানে যে-রকম অবস্থায় বাস করে সে অনুসারে তার চেহারা ও গায়ের রং কিছু না কিছু বদলিয়ে আসে। বাঘের গায়ে যে কালো কালো দাগ দেখতে পাও তাতেই বুঝতে পারা যায় যে, ঝোপ জঙ্গলে চলাফিরা তার অভ্যাস আছে—সেখানে বড় বড় ঘাসের ঝোপে যখন বাঘমশাই লুকিয়ে থাকেন তখন সেই খাড়া ঘাসের আলো-ছায়ার সঙ্গে বাঘের হলদে-কালোর ডোরাগুলি এমনিভাবে মিশিয়ে যায় যে হঠাৎ দেখলে বুঝবার যো নেই যে ওখানে ঝোপ ছাড়া আর কিছু আছে। কিন্তু যতদূর বোঝা যায়, তাতে মনে হয় আমাদের খড়্গদন্ত মহাশয় সিংহের মতো খোলা জায়গাতেই সাধারণত বাস করতেন—সুতরাং তাঁর গায়ে একালের বাঘের মতো দাগ না থাকাই সম্ভব বোধ হয়।

একালের বাঘের চাইতে খড়্গদন্তের মুখখানা অনেকটা লম্বাটে গোছের ছিল। তার লেজটিও সাধারণত একটু বেঁটে হত। শরীরের গড়নটা মোটের উপর আজকালকার বাঘেরই মতো, কিন্তু একটু ভারি গোছের—বিশেষত সামনের পায়ের দিকটা। সুতরাং তার পক্ষে খুব দৌড়ান বা লাফান বা চট্‌পট্ হাত পা নাড়া বড় সহজ ছিল না। নানান যুগের নানানরকম পাথরে এই বাঘের কঙ্কাল পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় যে, এরা বহুকাল ধরে পৃথিবীতে নানা দেশে দৌরাত্ম্য করে তারপর কেন জানি না একেবারে লোপ পেয়েছে।

সেকালের বাদুড়

'সেকালের জন্তু'র কথা বলিলেই একটা কোন কিম্ভূতকিমাকার জানোয়ারের চেহারা মনে আসে। যে-সকল জন্তু এখন দেখিতে পাই না, অথচ যাহার কঙ্কালচিহ্ন দেখিয়া বুঝিতে পারি যে সে এককালে পৃথিবীতে ছিল, তাহার চেহারা ও চালচলন সম্বন্ধে স্বভাবতই কেমন একটা কৌতূহল জাগে। তাহার উপর যদি তাহার মধ্যে কোন অদ্ভুত বিশেষত্বের পরিচয় পাই, তবে ত কথাই নাই।

সেকালের 'বাদুড়' লিখিলাম বটে, কিন্তু তাহার চেহারা দেখিলে সবসময় বাদুড় বলিয়া

চিনিবে কিনা সন্দেহ। কারণ, সে সময়ের এক একটা জন্তুকে আজকালকার কোন নামে পরিচিত করা অনেক সময়েই অসম্ভব। মনে কর একটা জন্তু, তার সাপের মতো গলা, কচ্ছপের মতো পিঠ, কুমিরের মতো দাঁত, তিমির মতো ডানা আর গিরগিটির মতো মাথা— তখন তাহাকে কি নাম দিবে? সেইজন্য বাদুড় বলিতে খুব সাবধানে বলা দরকার—যেন আজকালকার নিরীহ চামচিকা গোছের কিছু একটা মনে করিয়া না বস।

আজকাল যে-সকল বাদুড় দেখিতে পাও তাহাদের চেহারা ও চালচলনের মধ্যে কত তফাৎ! কোনটার কান খরগোশের মতো লম্বা, কোনটার কান ইদুঁরের মতো গোলপানা, কোনটার মুখ শেয়ালের মতো, কোনটার মুখ ভেংচিকাটা সঙের মতো, কারও নাক পদ্মফুলের মতো ছড়ান, কারও নাক নাই বলিলেও হয়। কিন্তু সেকালের যে জানোয়ারগুলাকে বাদুড় বলিতেছি তাহাদের মধ্যে আরও অদ্ভুত রকমারি দেখা যাইত। এক একটাকে দেখিয়া মনে হয় যেন বাদুড় পাখি আর কুমিরে মিলিয়া খিচুড়ি পাকাইয়াছে। এগুলিকে সাধারণভাবে বলা হয় টেরোড্যাক্টাইল (Ptcrodactyl) অর্থাৎ যাহার আঙুলে পাখা।

পাহাড়ের গায়ে যেসব পাথরের স্তর থাকে তাহারা চিরকালই পাথর ছিল না। অনেক পাথর এক সময় মাটির মতন নরম ছিল। সেই নরম মাটিতে জানোয়ারের কঙ্কাল জমিয়া অনেক সময়ে একেবারে পাথর হইয়া থাকে—এইরকম পাথরকে এক কথায় জীবশিলা বলা যাইতে পারে। এক সময় ছিল যখন পৃথিবীতে পাখি বা বাদুড় কিছুই দেখা যায় নাই—তখন সরীসৃপের যুগ ছিল। অদ্ভুত কুমির বা গোসাপ তখন ভয়ংকর মূর্তি ধরিয়া পৃথিবীতে দৌরাত্ম্য করিত। সেই অতি প্রাচীন যুগের পাথরে এ সকল বাদুড়ের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না—যা কিছু পাওয়া যায় সবই আরও আধুনিক যুগের। 'আধুনিক' বলাতে মনে করিও না যে মাত্র কয়েক শত বা সহস্র বৎসরের কথা বলিতেছি—সে 'আধুনিক' যুগ কয় লক্ষ বৎসর আগেকার তাহা আমি জানি না।

যতরকম 'বাদুড়' পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে সব চাইতে পুরাতনটি যে মাংসাশী ছিলেন, ইঁহার দাঁতের মধ্যে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার নাম রাখা হইয়াছে 'ডাইমর্ফোডন' (Dimorphodon) অর্থাৎ দ্বিমূর্তিদন্তী।

সবগুলি বাদুড়ই যে প্রকাণ্ড বড় হইত তাহা নহে, কিন্তু সব চাইতে বড়গুলি যে খুবই বড় তাহাতে সন্দেহ নাই। দক্ষিণ আমেরিকায় যে-সকল বাদুড়ের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে তাহার এক একটি ডানা মিলিলে ২৫ ফুট চওড়া হয়। ইহাদের মাথার উপরে অদ্ভুত এক প্রকাণ্ড শিং ছিল। এই শিংটা তাহার কি কাজে লাগিত তাহা জানি না, কিন্তু ইহাতে তাহার বিদ্‌ঘুটে চেহারার কোন উন্নতি হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। এত বড় জন্তুটা উড়িলে পরে তাহার ডানা ঝাপটাইবার শব্দ নিশ্চয়ই বহুদূর হইতে শোনা যাইত। ইহারা কোনরূপ শব্দ করিত কিনা বলিতে পারি না কিন্তু আওয়াজ করিলে সেটা খুব সুমিষ্ট হইত কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ইহাদের মুখে নাকি দাঁত থাকিত না কিন্তু তাহাতেও আশ্বস্ত হইবার বিশেষ কোন কারণ দেখি না, কারণ ইহার যে ঠোঁট ছিল তাহাতে সাংঘাতিক ধার! সুতরাং তাহার ঠোকর দু-একটা খাইলে আর বেশি খাইবার দরকার হইত না। মোট কথা, এ জন্তুটা যে সেকালেই লোপ পাইয়াছে এটা আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা বলিতে হইবে।

তিমির খেয়াল

রুশিয়ার দুরন্ত শীতে মানুষ যখন নির্জন পথে চলাফিরা করে তখন অনেক সময় নেকড়ে বাঘের পাল তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে। তাহারা যে বন্ধুভাবে চলে না, তা অবশ্য বুঝিতেই পার। তাহাদের দূরে রাখিবার জন্য মানুষে অস্ত্রশস্ত্র বন্দুক লইয়া পথে বাহির হয় এবং পারতপক্ষে একলা কেহ সে সকল পথে যাওয়া আসা করিতে চায় না।

সমুদ্রের পথে যখন বড় বড় জাহাজ চলাফিরা করে তখনও অনেক সময় দেখা যায়, তাহাদের আশেপাশে নানা জাতীয় মাছ ও হাঙর ঘুরিয়া বেড়ায়। জাহাজ হইতে কত জিনিস কত সময়ে জলে ফেলা হয়, তাহার মধ্যে তরকারির খোসা, মাংসের বা হাড়ের টুকরা, নষ্ট খাবার প্রভৃতি কিছু জলে পড়িবামাত্র তাহারা কাড়াকাড়ি করিয়া সব খাইয়া ফেলে। ঐ খাবারের লোভেই তাহারা জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে চলে।

কেবল মাছ কেন, কত পাখিকেও অনেক সময় দেখা যায় মাঝসমুদ্রে জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে শত শত মাইল উড়িয়া চলিতেছে। তাহাদের অনেকে আসে কেবল কৌতূহল মিটাইবার জন্য, অনেকে আসে খাইবার লোভে অথবা বিশ্রামের আশায়। কিন্তু খামখা বিনা কারণে কেহ জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে চলে না।

কিন্তু নিউজিল্যান্ডের উপকূলের কাছে এক জায়গায় ছোটখাট—অর্থাৎ মোটে বারো হাত লম্বা একটি তিমি আছে, তাহার বাড়ির কাছ দিয়া যত জাহাজ চলাফিরা করে সকলের সঙ্গেই সে আত্মীয়তা করিতে আসে। এইরকম সে কত বছর করিয়া আসিতেছে কেন

করে তাহা কেহ জানে না। জাহাজ হইতে যে-সকল খাবার জিনিস জলে ফেলা হয় তাহার কোনটাই তাহার খাদ্য নয়—জাহাজের লোকেদের দ্বারা তাহার কোনরকম উপকার হওয়াও সম্ভব নয়—অথচ সে প্রত্যেক জাহাজের সঙ্গে একবার খানিক দেখা না করিয়া ছাড়ে না। শুধু দেখা নয়, আধ ঘণ্টাখানেক অনায়াসে জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে সে এমনভাবে চলে যেন সে জাহাজকে পথ দেখাইয়া লইতে চায়। মাঝে মাঝে জাহাজের গায়ে গা ঘষিয়া আর ঢেউয়ের ফেনায় ডিগবাজি খাইয়া সে নানারকমে মনের আহ্লাদ প্রকাশ করে।

সেখানকার নাবিকেরা সকলেই এই অদ্ভুত তিমির কথা জানে। তাহারা আদর করিয়া তাহার নাম দিয়াছে 'পেলোরাস্ জ্যাক্'—'পেলোরাস্' ওই জায়গাটার নাম। এই তিমির সম্বন্ধে সে দেশে অনেকরকম অদ্ভুত গল্প শোনা যায়। একবার নাকি কোন্ জাহাজ হইতে কে একজন লোক 'জ্যাক'কে গুলি করিয়াছিল—তারপর অনেকদিন তাহাকে দেখা যায় নাই। আবার সে ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু সেই জাহাজটার কাছে আর কখনও আসে নাই। নিউজিল্যান্ড মাওরিদের দেশ—তাহারা এই তিমিকে দেবতার মতো ভক্তি করে। এমনকি সে দেশের গভর্নমেণ্ট পর্যন্ত ইস্তাহার দিয়া সকলকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, কেহ যেন 'জ্যাকে'র কোনরকম অনিষ্ট না করে।

তিমির ব্যবসা

কথায় বলে 'ঠেলায় পড়লে বাঘেও ধান খায়'। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানরা যখন পারিস সহর ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল তখন পারিসের লোকেরা খাবারের অভাবে ঘোড়ার মাংস খাইতে বাধ্য হয়। তাহার আগে ইউরোপের লোকে ঘোড়ার মাংস খাইত না। কিন্তু এই সময় হইতে দেখা গেল যে ঘোড়ার মাংসটা খাইতে লাগে মন্দ নয়। এখন শুধু পারিসে নয়, ইউরোপের অন্যান্য বিস্তর সহরেও লোকে সখ করিয়া ঘোড়ার মাংস খাইয়া থাকে। তাহার জন্য আর 'ঠেলায় পড়িবার' দরকার হয় না।

এখন যে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে, তাহাতেও খাদ্য সমস্যা একটা মস্ত সমস্যা। চল্লিশ পঞ্চাশ বা ষাট লক্ষ লোক এক-এক দিকে যুদ্ধ করিতেছে, কেবল তাহাদের খাওয়া যোগাইলেই নিশ্চিন্ত হইবার যো নাই—সমস্ত দেশের লোক কি খাইবে, কি পরিবে, তাহার ভাবনাও প্রত্যেক দেশের শাসনকর্তাদের ভাবিতে হয়। ইউরোপের খাওয়া জোগাইবার ভার এখন অনেক পরিমাণে আমেরিকার উপরে পড়িয়াছে। ইউরোপের জাতিরা মাংসখোর জাতি, প্রতি বৎসর তাহারা লক্ষ লক্ষ মণ মাংস খাইয়া শেষ করে। এত মাংস চালান দেওয়া কি কম কথা? বিদেশ হইতে জাহাজে করিয়া ইংলণ্ডে যে সব খাবার জিনিস চালান আসে জার্মান জলদস্যু ডুবুরি জাহাজ সেইগুলিকে নষ্ট করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাতেও কত খাবার সমুদ্রে ডুবিয়া নষ্ট হয়।

আমেরিকার বুদ্ধিমান লোকে এই সমস্যার একটা মীমাংসা করিয়াছেন বড় চমৎকার। তাঁহারা তিমির মাংস প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহার মধ্যেই আমেরিকার নানা স্থানে এই মাংসের ব্যবসায় আরম্ভ হইয়াছে—তিমি ধরিয়া তাহার মাংস চালান দিবার

জন্য বড় বড় কারখানা বসিয়াছে। তাহার একটিমাত্র কারখানা হইতে বছরে ৯০০০ মণ মাংস টিনে ভরিয়া চালান দেওয়া হয়। নূতন কোন খাওয়ার অভ্যাস মানুষ সহজে ধরিতে চায় না, সেইজন্য আমেরিকার একদল লোকে বক্তৃতা করিয়া, কাগজেপত্রে লিখিয়া, বায়োস্কোপে ছবি দেখাইয়া এ বিষয়ে মানুষের মনের বিরোধ ভাঙিতেছেন। আমেরিকার কোন কোন সহরে প্রকাশ্য বাজারে দশ আনা সেরে তিমির মাংস বিক্রয় হইতেছে।

গরু ঘোড়া শূকর কিছুতেই যাহাদের আপত্তি নাই তাহারা যে তিমি খাইতে বেশি দিন আপত্তি করিবে, এরূপ বোধ হয় না। যাঁহারা ইহার মধ্যেই ও জিনিসটা খাইতে অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন—চমৎকার মাংস! ইউরোপের বাজারে ইহাকে গো-মাংস বলিয়া চালাইলেও কেহ কোন তফাৎ বুঝিবে কিনা সন্দেহ।

সবরকম তিমির মাংস খাইতে ভাল নয়। যেগুলি বিশেষভাবে খাওয়ার উপযোগী সেগুলি সাধারণ ছোটখাট তিমি—অর্থাৎ মোটে ২০/২৫ হাত লম্বা! মোম তিমি বা sperm whale লম্বায় খুব বড় হয়—এক একটা ৬০ হাত পর্যন্ত দেখা গিয়াছে। সব চাইতে বড় যে তিমি সেগুলি থাকে একেবারে উত্তরে, মেরু সমুদ্রের কাছে—তাহারা লম্বায় মোম তিমির সমান, কিন্তু অনেকখানি চওড়া ও মোটা এবং ওজনেও প্রায় দেড়া। এক একটি বড় তিমির ওজন চার হাজার মণেরও বেশি হয়—অর্থাৎ ত্রিশ চল্লিশটা বড় বড় হাতির সমান। এই সমস্ত অতিকায় তিমি আগে সমুদ্রের মধ্যে অনেক দেখা যাইত, কিন্তু মানুষের অত্যাচারে ইহাদের বংশ ক্রমে প্রায় উজাড় হইয়া আসিতেছে।

তিমি নানারকমের হয়—তাহাদের মোটের উপর দুই দলে ভাগ করা যায়। এক দলের দাঁত নাই, আর এক দলের দাঁত আছে। যেগুলার দাঁত নাই তাহাদের মুখের ভিতরে প্রকাণ্ড চিরুনির ঝালরের মতো একটা জিনিস থাকে, তাহাকে বলে কাচকড়া বা whale bone। এই জিনিসটা মানুষের অনেক সৌখিন কাজে লাগে এবং বাজারে বিক্রয় করিলে বেশ দামও পাওয়া যায়। তাছাড়া এক একটা তিমির গায়ে যে পরিমাণ তেল বা চর্বি থাকে তাহার দামও বড় সামান্য নয়। যে মোম তিমির কথা আগে বলিয়াছি তাহার মুখে কাচকড়া নাই কিন্তু তাহার মাথার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা ভরা মোম থাকে! এই মোমের চমৎকার বাতি হয় এবং নানারকম মলম প্রভৃতি হয়। এই মোম চর্বি ও কাচকড়ার জন্য মানুষের সমুদ্রে নানা স্থানে বড় বড় তিমিগুলিকে নিঃশেষ করিয়া এখন ছোটখাট তিমির পিছনে লাগিয়াছে।

যেসব 'ছোটখাট' তিমির কথা বলা হইল, তাহাদের এক একটাকে মারিলে প্রায় তিন-চারশত মণ মাংস পাওয়া যায়। আজকাল তিমির ব্যবসা অনেক কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু গত দুই বৎসরে কেবল উত্তর আমেরিকায় প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলেই বার শতের বেশি তিমি মারা হইয়াছে। এখন এ ব্যবসায়ে আরও লাভ হইবার কথা, কারণ এখন হইতে তিমির হাড় মাংস চর্বি চামড়া সমস্তই কাজে লাগান চলিবে। এতকাল চর্বি ও কাচকড়া বাহির করিবার পর অত বড় প্রকাণ্ড দেহটাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইত—তাহাতে কেবল হাজার হাজার জলজন্তুর খোরাক জুটিত। কিন্তু এখন সেই মাংসে মানুষের উদরপূর্তি হইবে। এইরূপ একটা তিমিকে মারিলে স্বচ্ছন্দে বিশ ত্রিশ হাজার লোকের ভোজের আয়োজন হইতে পারে। তারপর কঙ্কালটুকুও ফেলিবার জিনিস নয়—তাহাকে পোড়াইয়া চমৎকার জমির সার ও নানারকম ঔষধ তৈয়ারি হইবে। চামড়াটায় চর্বি ভরা

বলিয়া তাহাকে অনেকদিন পর্যন্ত কাজে লাগাইবার সুবিধা হয় নাই—এখন তিমির ছাল কলে পিষিয়া চর্বি বাহির করিয়া চমৎকার মজবুত চামড়া তৈয়ারি হইতেছে। সুতরাং মানুষের মতো এ-হেন অত্যাচারী রাক্ষসের হাত এড়াইবার জন্য তিমি গভীর সমুদ্রে পলাইয়া হয়ত এখনও বাঁচিতে পারে—না হইলে তাহার বংশ লোপ হওয়ার খুবই আশঙ্কা আছে।
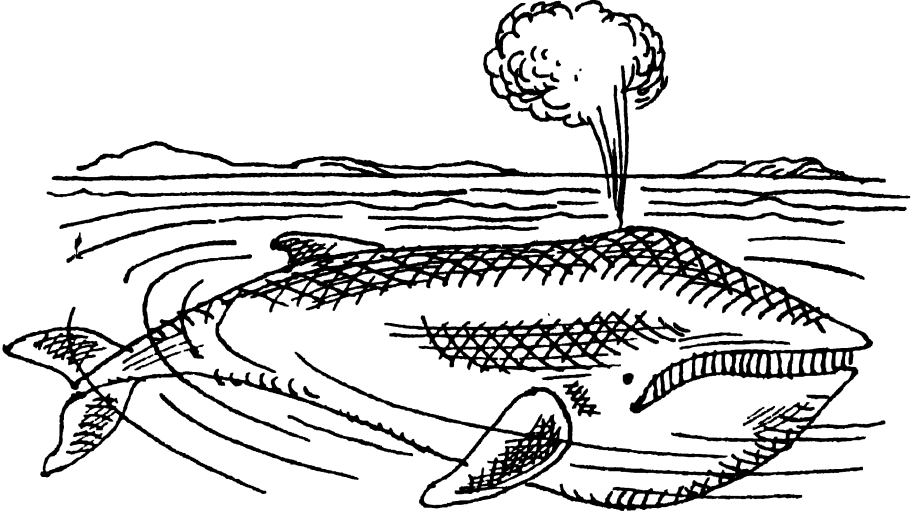
এত বড় প্রাণীটা, কিন্তু মোটের উপর তাহার স্বভাবটি বেশ নিরীহ বলিতে হইবে। অনেক সময়ে দেখা যায় তিমির দল সমুদ্রের উপর ভাসিয়া ভাসিয়া খেলা করিতেছে তাহাদের একটাকে মারিলে বাকীগুলা ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে ভিড় করিয়া আসে। তখন একটার পর একটাকে বল্লমে গাঁথিয়া দলকে-দল মারিয়া ফেলা খুবই সহজ হইয়া পড়ে। কিন্তু সব তিমি সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটে না। কোন কোন দাঁতওয়ালা তিমি আছে, তাহাদের মেজাজটা দস্তুরমত বদরাগী। এ বিষয়ে মোম তিমির দুর্নাম সব চাইতে বেশি। মাঝে মাঝে এক একটা দলছাড়া মোম তিমি দেখা যায়, তাহাদের ঘাঁটাইবার দরকার হয় না—জাহাজ দেখিলেই তাহারা তাড়া করিয়া যায়। তিমির তাড়া যে কেমন তাড়া, সে তাড়া যে খাইয়াছে সেই জানে। কখন সে ঢুঁ মারে, কখন সে হাঁ করিয়া কামড়াইতে আসে, কখন তাহার গায়ের ধাক্কায় জাহাজ চুরমার হয়—অথবা লেজের ঝাপটায় প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত করে, এই ভয়ে মাঝি-মাল্লা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। আর যাহাদের 'নিরীহ তিমি' বলি, তাহারাও যখন মরিবার সময় সমুদ্র তোলপাড় করিয়া ছট্‌ফট্‌ করে তখন সেও একটা কম সাংঘাতিক ব্যাপার হয় না।

তিমির খাওয়ার মধ্যেও রকমারি দেখা যায়। যাহাদের দাঁত নাই, তাহারা সমুদ্রের মধ্যে ছোট ছোট মাছের ঝাঁক খাইয়া বেড়ায়। এক একবার হাঁ করিয়া মাছের ঝাঁকশুদ্ধ সমুদ্রের জল মুখের ভিতর পুরিয়া লয়; তারপর সেই কাচকড়ার ঝালরের ভিতর দিয়া সেই জল ফুঁকিয়া বাহির করে—মাছগুলা সব এই অদ্ভুত ছাঁকনিতে আটকাইয়া থাকে।

ইহাদের গলার ফুটা এত ছোট যে নিতান্ত পুঁটি বাটা ছাড়া কোন বড় মাছ গেলা ইহাদের সাধ্য নয়। কিন্তু দাঁতাল তিমিরা এরকম খুচরা খাইয়া সন্তুষ্ট হয় না। তাহারা বড় বড় সমুদ্রের জন্তুকে মারিয়া খায়। মোম তিমিরা এক মাইল গভীর সমুদ্রে ডুব মারিয়া সেখানকার বড় বড় বিদ্‌ঘুটে জন্তুগুলাকে খাইতে ছাড়ে না। একবার একটা তিমির পেটে একটা প্রকাণ্ড অক্টোপাসের কিছু কিছু টুকরা পাওয়া গিয়াছিল। তাহার এক একটি পা হাতির পায়ের সমান মোটা! সে জন্তুটা যে আট দশটা হাতির সমান বড় ছিল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

'তিমি মাছ' যে আসলে মাছই নয়, সে কথা তোমরা নিশ্চয়ই জান। ইহারা স্তন্যপায়ী জন্তু। ইহাদের এক একটি ছানা হয় ঘোড়ার মতো মস্ত; তাহারা জন্মিয়া মায়ের দুধ খায়। মাছ যেমন অনায়াসে জলের নীচে ডুবিয়া থাকে—তিমি সেরকম পারে না। নিশ্বাস লইবার জন্য তাহাকে বার বার জলের উপরে উঠিতে হয়। কখন কখন জোরে নিশ্বাস ছাড়িবার সময় তাহার নাক হইতে গরম বাতাসের ঝাপটা ছুটিয়া সমুদ্রের উপর জলের ফোয়ারা উঠিতে থাকে। তাহা দেখিয়া শিকারীরা বুঝিতে পারে—ঐখানে তিমি।

রাক্ষুসে মাছ
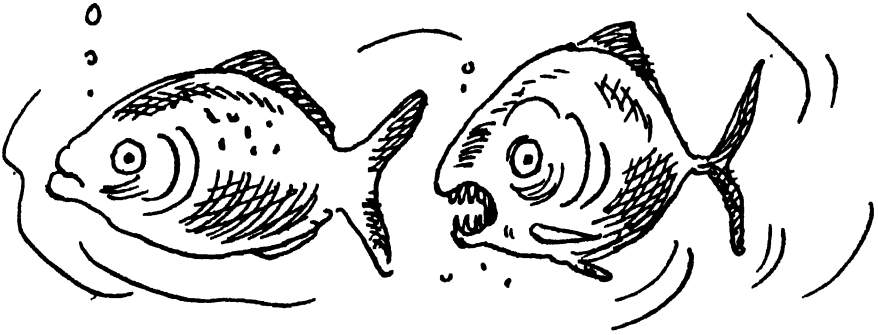
বড় বড় কুমির হাঙর, তারাই জ্যান্ত মানুষ খায় আমরা ত এই জানি। এক হাত লম্বা নদীর মাছ, তারা যে আবার জানোয়ার দেখলে কামড়ে ধরে এমন কথা ত শুনিনি। আমাদের দেশের নদীতে ত এমন রাক্ষুসে মাছ দেখা যায় না। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার এমাজন নদীর আশেপাশে এরকম মাছ দেখতে পাওয়া যায়। সে জায়গায় মানুষ যদি জলে নামে, তবে তাকে আধ মিনিটও জলে থাকতে হয় না, তার মধ্যেই মাছেরা তাকে কামড়িয়ে এমন রক্তারক্তি করে দেয় যে তাকে প্রাণের দায়ে জল ছেড়ে উঠে আসতে হয়। সে দেশের লোকে একে 'পিরাই' বলে।

বুলডগের মতো মুখ মাছটার, তার মধ্যে ছোট ছোট ছুঁচল দাঁত; একেবারে ক্ষুরের মতো ধারাল। তার উপর মেজাজখানাও চেহারারই উপযুক্ত—জলের মধ্যে থেকে এক হাত লাফিয়ে

ডাঙার মানুষকে কামড়ে দেওয়া তার পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নয়। আর যেখানে কামড়ে ধরে, সেখানের খানিকটা ছিঁড়ে না আসা পর্যন্ত সে কামড় ছাড়ে না! তার উপর এরা সব সময় দল বেঁধে ফেরে। হাঙর কুমির যেখানে থাকে সেখানেও নাকি মাছ থাকে, নানারকম জলজন্তু থাকে; কিন্তু 'পিরাই' এর আড্ডা যেখানে তার ত্রিসীমানার মধ্যে কোন প্রাণীর থাকবার যো নেই। সেখানকার জলে যদি গরু ঘোড়া নামে তবে তারা আর আস্ত ফেরে না। একবার একটা ষাঁড় ২০/২৫ হাত চওড়া একটা নদী পার হতে গিয়েছিল—কিন্তু বেচারার পার হওয়া হল না। তার আগেই রাক্ষুসে মাছেরা তাকে খেয়ে শেষ করে দিল। এরকম দুর্ঘটনা অনেক জানোয়ারের ভাগ্যেই ঘটে থাকে—তার মধ্যে মানুষও বাদ পড়েনি। হাজার মাছে একসঙ্গে কামড় দেয় আর এক-এক কামড়ে এক-এক খাবল মাংস উঠিয়ে আনে! দু-চার মিনিটের মধ্যে এক একটা জানোয়ারকে খেয়ে শেষ করে দেয়।

কত সময় এমন হয় যে, লোকে নদীতে জল আনতে গেছে হঠাৎ কে তার হাত কেটে নিল! জানোয়ারেরা জল খেতে এসেছে—কট্‌ করে তার নাক কেটে গেল। সে দেশের লোকে জানে এ পিরাই মাছের কাণ্ড!

অদ্ভুত মাছ

নদীতে আর সমুদ্রে যতরকম মাছ পাওয়া যায় তাহার মধ্যে অদ্ভুত মাছের কোন অভাব নাই। কাহারও চেহারা অদ্ভুত, কাহারও চালচলন অদ্ভুত, কাহারও আহার বিহার বাসাবাড়ি সবই অদ্ভুত। বাস্তবিক ইহার মধ্যে কোন্‌টার কথা যে বলিব আর কোন্‌টা যে বাদ দিব তাহা ঠিক করাই কঠিন।

প্রথমে চারিচক্ষু মাছের কথা বলি। মাকড়সার নাকি আট দশটা চোখ থাকে কিন্তু পোকামাকড় ছাড়া আর কোন প্রাণীর যে দুইটার বেশি চোখ হয় একথা আর শুনিয়াছ কি? কোন কোন জানোয়ারের দেখা যায় কপালের কাছে একটা করিয়া চোখের মতো থাকে—কিন্তু 'চোখের মতো' হইলেও সেটা চোখ নয়, তাহাতে দেখার কাজ চলে না। কিন্তু এই মাছের যে দু-জোড়া চোখ, তাহার প্রত্যেকটিই সত্যিকারের চোখ। দুই দুইটা চোখ একসঙ্গে উপর-নীচ করিয়া বসান; মাছ যখন জলে ভাসে তখন উপরের একজোড়া চোখ থাকে জলের বাহিরে, আর নীচের জোড়া জলের তলায়। যে জোড়া জলের উপরে থাকে তাহার গড়ন ঠিক সাধারণ মাছের মতো নয়—তাহাতে জলের নীচে দেখিবার সুবিধা হয় না। আর নীচের জোড়া ঠিক সাধারণত চোখ, তাহাতেও জলের বাহিরের কোন জিনিস স্পষ্ট দেখা যায় না। জলের ভিতর ও বাহির একসঙ্গে দেখিবার বিশেষ কোন দরকার ইহার ছিল কিনা জানি না, কিন্তু এ ব্যবস্থাটায় যে কাজের কতকটা সুবিধা হয় তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। একরকম চশমা আছে তাহাকে 'বাইফোক্যাল্‌' বলে—সেই চশমার উপরের আধখানা একরকম কাচ, তাহাতে দূরের জিনিস দেখিবার সুবিধা হয়, আর নীচের আধখানা আরেকরকম—তাহাতে পড়াশুনার কাজ চলে। এই মাছের চোখটা ঠিক যেন 'বাইফোক্যাল' চোখ।

চোখের কথা বলিতে গেলে আরেকটি মাছের কথাও বলিতে হয়। সে মাছের একদিকে দুইটা চোখ, আর একদিকে চোখ নাই। এরকম একদিক কানা হইবার অর্থ কি জান? মাছটার স্বভাব এই যে, সে কাদার মধ্যে কাৎ হইয়া শুইয়া থাকে। যেদিকটা কাদার মধ্যে অন্ধকারে পড়িয়া থাকে, সেদিকটায় চোখ থাকা না থাকা সমান কথা—তাই তাহার দুইটা চোখই থাকে মুখের একপাশে—যে পাশটা আকাশের দিকে ফিরান সেই পাশে।

আফ্রিকার নীল নদীতে একরকম মাছ আছে সে চিৎ হইয়া চলে। চলার এরকম অদ্ভুত ভঙ্গি হইবার একমাত্র কারণ যাহা দেখা যায় তাহা এই যে ইহাদের পেটের চাইতে পিঠের রঙটা অনেক বেশি সাদা। সাদা পিঠটা আলোর দিকে থাকিলে চক্‌চক্ করে—তাহাতে মাছটার গা-ঢাকা দিয়া থাকিবার সুবিধা হয় না। তাই সে কালো পেটটাকে উপর দিকে ধরিয়া আপনাকে জলের মধ্যে বেশ বেমালুম করিয়া রাখে।

জানোয়ারের মধ্যে মানুষ ক্যাঙারু প্রভৃতি জন্তু যেমন খাড়া হইয়া চলে, মাছেদের মধ্যেও এমন এক একজন আছেন যাঁহারা মানুষের মতো খাড়া হইয়া চলেন। বিশেষত একজন আছেন, তিনি সমুদ্রে থাকেন, তিনি কেবল খাড়া থাকিয়াই সন্তুষ্ট হন না। তাঁহার মাথাটি আবার নীচের দিকে রাখা চাই। এই মাছের চেহারাটিও অদ্ভুত ছুঁচাল-রকমের, তাই ইংরাজিতে ইহার নাম Needle fish বা ছুঁচ মাছ। সমুদ্রে একরকম চাঁদা মাছ আছে, তাহারা রাগিলে বা ভয় পাইলে পেটটাকে ফুটবলের মতো ফুলাইয়া হঠাৎ চিৎ হইয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠে। তখন ফোলা পেটটি জলের উপর বাহির হইয়া ভারি অদ্ভুত দেখায়। কোন কোন চাঁদা মাছের গায়ে আঁশের বদলে কাঁটা বসান থাকে—রাগের সময় সেগুলি শজারুর কাঁটার মতো খাড়া হইয়া উঠে।

চেহারার কথা যদি বল, মাছের চেহারা যে কত অদ্ভুতরকমের হইতে পারে তাহার কিছু কিছু নমুনা দেওয়া হইতেছে। 'থলে-গলা চাবুক-লেজ' মাছের গলায় লম্বা থলি আর ল্যাজটি চাবুকের মতো; বঁড়শিবাজ মাছের নাকের উপর ছড়ি, তাহার আগায় টোপের মতো নোলক, আর যার যত বড় গা তত বড় হাঁ; শয়তান মাছের চেহারাটা মুখোশপরা সঙের মতো। আমেরিকার রাক্ষুসে মাছের সাংঘাতিক দাঁতের কামড়ে গোরু ঘোড়া পর্যন্ত প্রাণ হারায়—তাহারও চেহারাটি নেহাৎ ভদ্রমতন নয়।

কিন্তু বাস্তবিক উদ্ভুট বিদ্‌ঘুটে মাছের খোঁজ করিতে হইলে সমুদ্রের গভীর জলে যেসব মাছ থাকে, তাহাদের সংবাদ লইতে হয়। সেদিন এইরূপ কতকগুলি মাছের চমৎকার বর্ণনা পড়িয়াছি! তাহার দু-একটি নমুনা শুন। একটি মাছ, তাহার কপালের উপর দুইটা শিং—সেই শিঙের আগায় তাহার চোখ। শিং দুটাকে সে ইচ্ছামত এদিক ওদিক ফিরাইতে পারে। তাহার গায়ে আবার সারি সারি আলো বসান—গভীর অন্ধকার সমুদ্রে সেগুলি আপনা হইতেই জ্বলিতে থাকে। আর একটা মাছ, তাহার মুখে লম্বা দাড়ি—দেখিতে অনেকটা গাছের পাতার মতো; তাহার উপর মুখভরা বড় বড় গজালের মতো দাঁত। অন্ধকারে সমস্তটা দাড়ি জ্বলিতে থাকে। আরেকটি মাছ তাহার চোখ দুইটা ঠোঁটের কোণায়, মনে হয় হাঁ করিলেই চোখ দুইটা গিলিয়া যাইবে। ইহার নাকটা জুতার গোড়ালির মতো উঁচু আর হাঁ করিলেই মুখের ভিতরে আলো জ্বলিয়া উঠে—শিকার ধরিবার ভারি সুবিধা। আর একটি মাছ আছে, তাহার সমস্ত শরীরটি লাল-কালো চিত্রবিচিত্র করা। তাহার চোখ দুইটা এত বড় যে হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যে সমস্ত মাথাভরাই চোখ।

ইহারা সকলেই প্রায় শিকারী মাছ। নিজেদের বাতি দিয়া ইহারা শিকার খোঁজে। কেহ কেহ সমুদ্রের নীচে বাতি জ্বালাইয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে; সেই বাতি দেখিয়া যেসব শিকার তামাসা দেখিতে আসে, তাহাদের খপ্‌ করিয়া গিলিয়া খায়। কোন কোন মাছ আছে, তাহারা শিকারকে বাগাইবার জন্য নানারকম অস্ত্রকৌশল খাটাইয়া থাকে। কাহারও বিষাক্ত ল্যাজ চাবুকের মতো শিকারের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে, কেহ বিদ্যুৎ চালাইয়া শিকারকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলে, কেহ জোঁকের মতো তাহার রক্ত চুষিয়া ধরে আর কেহ পিচকারি মারিয়া ডাঙার শিকারকে জলে পাড়িয়া আনে। টিকটিকির শিকার ধরা দেখিয়াছ? কোন কোন মাছ আছে তাহারাও ঠিক সেইরকম কায়দায় শিকার ধরে। আস্তে আস্তে চুপি চুপি শিকারের পিছনে গিয়া তারপর হঠাৎ, টিকটিকির জিভের মতো তাহাদের মুখটা সরু লম্বা হইয়া শিকারের ঘাড়ে ছুটিয়া পড়ে।
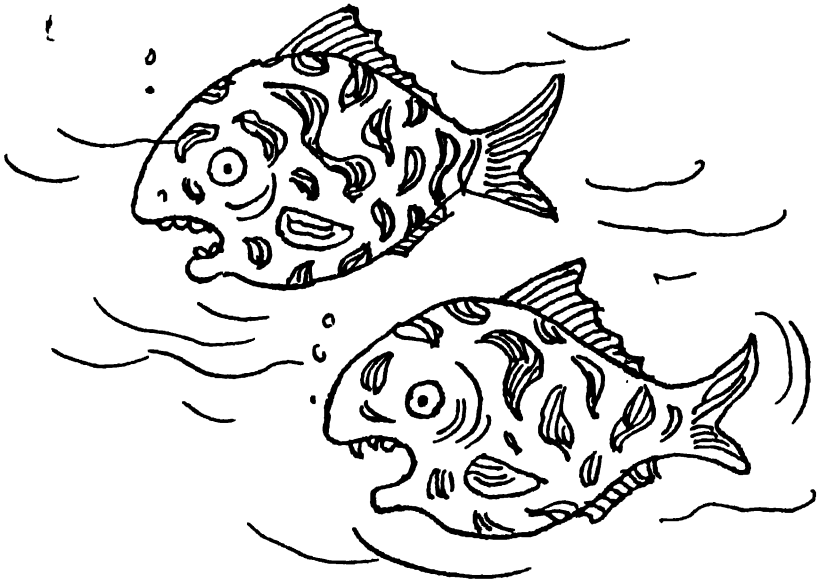
এইবারে একটা মাছের কথা বলিব আমরা তাহার নাম দিয়াছি গেছো মাছ। কোন কোন মাছ আছে, তাহারা জলের বাহিরে আসিয়াও অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাঁচিতে পারে। কই মাছ যে অনেকদূর পর্যন্ত মাটির উপর 'কাতরাইয়া' চলিতে পারে, তাহা বোধহয় সকলেই দেখিয়াছ। কিন্তু মাছ যে আবার সখ করিয়া জল ছাড়িয়া ডাঙায় ওঠে আর রীতিমত গাছে চড়িতে পারে, ইহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন। এই মাছ আফ্রিকাতেই বেশি পাওয়া যায়। ইহার দুপাশের ডানা দুইটি দেখিতে কতকটা আঙুল-জোড়া পায়ের মতো। সেই ডানার উপর ভর করিয়া মাছগুলি অনায়াসে ডাঙায় উঠিয়া গাছে চড়িয়া বসে। ইহাদের মুখ প্রায়ই ব্যাঙের মতো কদাকার হয়—চোখ দুটিও সেইরকম ড্যাব্‌ডেবে। এই মাছ খাইতে এমন বিস্বাদ যে মানুষ ত দূরের কথা—ডাঙার কোন জন্তু বা আকাশের পাখিরা পর্যন্ত ইহাকে ছোঁয় না। কিন্তু জলের বড় বড় মাছগুলি ইহাদের দেখিলে টপাটপ্‌

খাইয়া ফেলে। সেইজন্য ইহারা জল ছাড়িয়া ডাঙায় উঠিবার জন্য এক-এক সময়ে এমন ব্যস্ত হইয়া উঠে।

মাছের বিদ্যার কথা অনেক বলা হইল—এইবার আরেকটি বিদ্যার কথা বলিয়াই শেষ করি। সেটি আর কিছু নয়—সংগীতবিদ্যা! অবশ্য, সংগীত বলিতে মনে করিও না যে তাহারা রীতিমত সা-রে-গা-মা সুর করিয়া রাগ-রাগিণীর চর্চা করে। কোন কোন মাছ আছে তাহারা একটু আধটু শব্দ করিতে জানে। কেহ ইঁদুরের মতো কুট্‌কুট্‌ শব্দ করে, কেহ অদ্ভুতরকম ঘঁৎ ঘঁৎ শব্দ করে, আর কেহ বা ডুব্‌ ডুব্‌ করিয়া ঢাকের মতো আওয়াজ করে। কিন্তু সকলের চাইতে ওস্তাদ যে মাছ, সে দলে-বলে সমুদ্রের তীরে পড়িয়া মোটা কান্নার মতো একরকম অদ্ভুত সুর করিতে থাকে। খানিক দূর হইতে শুনিলে হঠাৎ মনে হয় যেন মানুষের কোলাহলের সুর।

বিদ্যুৎ মৎস্য

এক-একরকম জানোয়ারের এক-একরকম অস্ত্র। কেউ শিং দিয়ে গুঁতায়, কেউ নখ দিয়ে আঁচড়ায়, কেউ দেয় দাঁতের কামড়, কেউ মারে হুলের খোঁচা। ক্যাঙারুর ল্যাজের ঝাপ্‌টা, ঈগলের ধারাল ঠোঁট, অস্ত্র হিসাবে এগুলিও বড় কম নয়। কিন্তু তার চাইতেও আশ্চর্য অস্ত্র আছে একরকম বান্‌ মাছের গায়ে। তোমরা কেউ 'ব্যাটারির' 'শক্‌' খেয়েছ কি? কিংবা খোলা বিদ্যুতের তারে ভুলে হাত দিয়েছ কি? এই মাছকে ধরতে গেলে গায়ের মধ্যে ঠিক তেমনি ধাক্কা লাগে।

এই অদ্ভুত মাছকে ইংরাজিতে বলে Electric Eel অর্থাৎ 'বৈদ্যুতিক ঈল'। বান মাছের মতো চেহারা, সাপের মতো লম্বা, ধারাল দাঁত—এক একটি ঈল পাঁচ ছয় হাত পর্যন্ত বড় হয়। এই জাতীয় মাছ পৃথিবীর নানা স্থানে পাওয়া যায়, কিন্তু যেগুলিতে বিদ্যুতের তেজ দেখা যায় সেগুলি থাকে কেবল আমেরিকার বড় বড় নদীর ধারে-কাছে। এক একটা ঈলের এমন আশ্চর্য তেজ, তারা বিদ্যুৎ চালিয়ে অন্য মাছদের ত মেরে ফেলেই, এমনকি, বড় বড় জানোয়ারগুলোকেও এক-এক সময় তারা অস্থির করে তোলে। গোরু, ঘোড়া পর্যন্ত কত সময়ে জল খেতে নেমে ঈলের পাল্লায় পড়ে যন্ত্রণায় লাফালাফি করতে থাকে। সে দেশের লোকেরা রীতিমত বর্শা বল্লম নিয়ে এই মাছ শিকার করে, কারণ, কোনরকমে তার গায়ে গা ঠেকলেই বড় বড় জোয়ান মানুষকেও বাপ্‌রে মারে করে চেঁচাতে হয়। একবার কতগুলো ঘোড়া বিলের মধ্যে জল খেতে গিয়েছিল। সেখানে প্রায় ৪০/৫০টা বড় বড় ঈল এক জায়গায় জড়ো হয়েছিল। ঘোড়াগুলো তার মাঝখানে পড়েই চিৎকার করে লাথি ছুঁড়ে ডাঙায় পালিয়ে আসল। কিন্তু একটা ঘোড়া তার মধ্যে একটু বেশি কাহিল হয়েছিল, সেটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত জলের ধারে আধমরা অবস্থায় পড়েছিল। ঈলগুলোও অবশ্য লাথির চোটে সেখানে বেশিক্ষণ টিঁকতে পারেনি।

এই সাংঘাতিক অস্ত্র এরা কেমন করে ব্যবহার করে, আর কেমন করে তাদের শরীরের মধ্যে এতখানি বিদ্যুৎ সঞ্চিত হয়, তা এখনও পণ্ডিতেরা খুব স্পষ্ট করে বলতে পারেননি।

মাছটাকে ধরে চিরলে পরে দেখা যায়, তার শিরদাঁড়ার দুই পাশে পিঠ থেকে ল্যাজ পর্যন্ত ছোট ছোট কোষ, তার মধ্যে একরকম আঠাল রস; এইটিই তার বৈদ্যুতিক অস্ত্র। অস্ত্রের ব্যবহার করতে হলে সে কেবল তার শরীরটাকে ঝাঁকিয়ে ল্যাজ আর মাথা শত্রুর গায়ে ঠেকিয়ে দেয়।

কয়েকবার ক্রমাগত অস্ত্রের ব্যবহার করলে মাছটা আপনা থেকেই কেমন নির্জীব হয়ে পড়ে—তখন আর তার বিদ্যুতের তেজ থাকে না। কিন্তু খানিকক্ষণ বিশ্রাম করলে আবার তার তেজ ফিরে আসে। সব সময়ে যে ইচ্ছা করে সে খামখা অস্ত্র ব্যবহার করে, তা নয়; কোনরকম ভয় পেলে বা চমকালেও তার গায়ে বিদ্যুৎ খেলে।

এরকম বৈদ্যুতিক শক্তি আরও কোন কোন মাছের ও অন্য জলজন্তুর মধ্যেও দেখা যায়। আফ্রিকায় মাগুর জাতীয় একরকম মাছ আছে, তারও তেজ বড় কম নয়। তার সমস্ত শরীরটাই যেন বিদ্যুতের কোষে ঢাকা। একটা চৌবাচ্চায় অন্যান্য মাছের সঙ্গে একে রাখলে তবে এর মেজাজের পরিচয় পাওয়া যায়। দুদিন না যেতেই দেখবে যে আর সব মাছকে মেরে সে সাবাড় করেছে। আফ্রিকার আরবেরা এর নাম বলে 'রাদ্' অর্থাৎ বজ্র মাছ।

সমুদ্রের ঘোড়া

সমুদ্রের ঘোড়া বলতে হঠাৎ যেন সিন্ধুঘোটক মনে করে বসো না। সিন্ধুঘোটক থাকে সমুদ্রের ধারে, কিন্তু তাকে ঘোটক বলা হয় কেন তা জানি না। তার চালচলন চেহারা বা শরীরের গড়ন কিছুই ঘোড়ার মতো নয়—ঘোড়ার সঙ্গে তার খুব দূর সম্পর্কেও কোন সম্বন্ধ পাওয়া যায় না—অথচ তাকে বলি 'সিন্ধুঘোটক'। হিপ্পোপটেমাসকে বাংলায় অনেক সময় 'জলহস্তী' লেখা হয়। তারও কিন্তু প্রকাণ্ড নাদুসনুদুস চেহারাটি ছাড়া হাতির সঙ্গে আর কোনরকম মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং তাকে শুয়োরের সঙ্গে সমতুলনা করলে তার পরিচয়টা অনেকটা ঠিক হয়।

এখানে যাকে সমুদ্রের ঘোড়া বলছি, তাকে বর্মধারী মাছ বললেই তার ঠিক মত পরিচয় দেওয়া হয়। কিন্তু তার ঐ অদ্ভুত ঘাড় বাঁকান চেহারা আর খাড়া হয়ে চলাফিরা—এই দেখেই ইংরেজিতে তার নাম দেওয়া হয়েছে সমুদ্রের ঘোড়া (Sea Horse)। চেহারার বর্ণনা হিসাবে নামটি যে চমৎকার হয়েছে, তাতে আর সন্দেহ নেই। এই জন্তুর ল্যাজের দিকটা একেবারেই মাছের মতো নয়—তার উপর গায়ের চামড়াটিও চিংড়িমাছের খোলার মতো শক্ত। ল্যাজটি থাকাতে তার ভারি সুবিধা। যখন ইচ্ছা জলের নীচে শেওলা গাছে ল্যাজটি জড়িয়ে সে বেশ আরাম করে বিশ্রাম করে। যখন জলের নীচে মাথা উঁচিয়ে ল্যাজ নাড়িয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে এরা চলে ফিরে, তখন তেজী ঘোড়ার টগ্‌বগ্ করে ছুটবার ধরনটাও মনে পড়ে। আসলে এরা যে 'নল' মাছের জাতভাই, সেটা এদের চোঙের মতো মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

নলমাছের চেহারাটা ঠিক তার নামেরই মতো। নলমাছের মুখখানা এমনভাবে তৈরি

যে সে হাঁ করতে পারে না। ঐ চোঙার আগায় একটু ফুটো আছে, তাই দিয়ে সে সুড়সুড় করে খাবার টেনে খায়। সমুদ্রের ঘোড়ার মুখখানিও ঠিক এই ধরনের।

এই অদ্ভুত জন্তুগুলির এক একটা আবার ত্রিভঙ্গ ঘোড়ার মতো চেহারা করেও সন্তুষ্ট নয়। তারা নানারকম সাজ করে রংবেরঙের ঝালর ঝুলিয়ে কেমন কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি করে থাকে। ঝালরের সাজগুলো বাস্তবিক তার গায়ের চামড়া। ইংরাজিতে এদের বলে সমুদ্রের 'ড্রাগন' (Sea dragon) বা রাক্ষস। নামটি ভয়ংকর হলেও জন্তুটি ঠিক সমুদ্রের ঘোড়ার মতোই নিরীহ। তার এই রংচঙে পোশাকের বাহারটা কেবল শত্রুর চোখে ধোঁকা দেবার জন্য। সমুদ্রের নীচে যেসব অদ্ভুত রঙিন বাগান থাকে, তারই মধ্যে ফুল পাতার সঙ্গে রং মিশিয়ে এরা বেমালুম গা ঢাকা দিয়ে থাকে। নানারকম হিংস্র জন্তু আর মাছ সেখানে ঘোরে ফিরে। তারা এর চেহারা দেখে হঠাৎ বুঝতেই পারে না যে এটাও একটা জানোয়ার।

এদের আর একটি বড় মজার অভ্যাস আছে—এরা সব সময় ছানার দল সঙ্গে নিয়ে ফেরে। ক্যাঙারুর পেটে যেমন থলি থাকে, তার মধ্যে ছোট ছোট ছানাগুলো দরকার হলেই ঢুকে পড়ে—তেমনি ওদেরও কারও বুকে, কারও পেটে ছোট ছোট থলির মতো থাকে। ছানারা ভয় পেলে ছুটে তার মধ্যে লুকোয়।

কুমিরের জাতভাই

টিকটিকি, গিরগিটি, বহুরূপী, তক্ষক, গোসাপ এঁরা সকলে হলেন কুমিরের জ্ঞাতিবর্গ। পৃথিবীর যে-কোন দেশে যাও, এঁদের কোন না কোনটির সাক্ষাৎ পাবেই। কিন্তু সাক্ষাৎ পেলেই যে সব সময়ে তাদের চিনতে পারবে, তা মনে করো না। অস্ট্রেলিয়ার সেই কাঁটাওয়ালা ভীষণমূর্তি জানোয়ার যে নিতান্ত নিরীহ গিরগিটি মাত্র, এ কথা আগে থেকে না জানলে কি কেউ বুঝতে পারবে? কেবল চেহারা দেখে যদি এর সম্বন্ধে কোন মতামত দিতে হয়, তাহলে অনেকেই হয়ত বেচারির উপর অবিচার করবে। সমস্ত শরীরটি এর অস্ত্রে আর বর্মে ঢাকা, কিন্তু মেজাজটি যারপরনাই ঠাণ্ডা। দুপুরের রোদে শুকনো বালির উপর এরা পড়ে থাকে, ভয় পেলে তাড়াতাড়ি বালির মধ্যে ঢুকে যায়। অন্য জন্তুর অনিষ্ট করা দূরে থাকুক, সামান্য একটা পাখি দেখলেই এরা পালাবার জন্য ব্যস্ত হয়। এদের প্রধান খাদ্য পিঁপড়ে। সব চাইতে আশ্চর্য এই যে, এক বাটি জলের মধ্যে যদি এই গিরগিটিকে ছেড়ে দাও, তবে দেখতে দেখতে এর গায়ের চামড়া সমস্ত জল শুষে নেবে। শুকনো বালিতে থাকে কিনা, সব সময়ে ত স্নানের সুবিধা হয় না, তাই একবার স্নান করলেই সে অনেকদিনের মতো জল বোঝাই করে নেয়।

একটি সবুজ রঙের জন্তু রয়েছে—মাদাগাস্কারের টিকটিকি। এর বিশেষত্বের মধ্যে পায়ের আঙুলগুলি আর গায়ে রঙের বাহার। তাছাড়া রয়েছে বহুরূপী। বহুরূপীর গুণের কথা তোমরা সকলেই জান। তার সমস্ত গায়ের রং তারা চট্‌পট্‌ বদলাতে পারে। চোখে চেয়ে দেখছ তার দিব্যি ঘাসের মতো সবুজ রং, হয়ত এক মিনিট বাদেই দেখবে ফ্যাকাসে!

তারপর ঘুরে এসে দেখ, শুকনো পাতার রং কিংবা সীসার মতো ময়লা। বহুরূপীর চালচলন ভারি অদ্ভুত। এক পা নড়তে হলে অতি সাবধানে ধীরে ধীরে সে পা ফেলে; হয়ত একটা পা অর্ধেকখানা তুলে পাঁচমিনিট চুপ করেই রইল। দেখে মনে হয় যেন পা ফেলবে কি না ফেলবে এর জন্যে তার কত হিসাব আর কত ভাবনা চিন্তা করতে হচ্ছে। এক সময়ে লোকের বিশ্বাস ছিল—অন্তত বিলাতে শিক্ষিত লোকেও এ কথা বিশ্বাস করত যে বহুরূপীরা শুধু হাওয়া খেয়ে থাকে। এরকম বিশ্বাসের কারণ এই যে, বহুরূপী একে ত খায় খুবই কম, তার উপর খাওয়া কাজটি তার চক্ষের নিমেষে এমন চট্‌পট্‌ শেষ হয়ে যায় যে, একটু ঠাওর করে না দেখলে অনেক সময় বোঝাই যায় না। যতটুকু প্রাণী, জিভটি প্রায় ততখানি লম্বা; সেই জিভটি তীরের মতো ছট্‌কিয়ে পোকামাকড়ের উপরে পড়ে আর পরক্ষণেই টপ্‌ করে মুখের ভিতর ফিরে যায়। এর মধ্যে যে শিকার ধরা, শিকার মারা এবং খাওয়া, এই তিন কাজ শেষ হয়ে গেছে সেটা বুঝতে অনেক সময় দেরি লাগে।

বহুরূপীর আর একটি অদ্ভুত জিনিস তার চোখ দুটি। বড় বড় চোখ দুটি এমনভাবে তৈরি যে একবার চোখ পাকালেই উপর নীচ ডাইনে বাঁয়ে ডাঙা এবং আকাশের প্রায় সবখানিই বেশ দেখে নিতে পারে। তার উপর দুইটি চোখ একেবারে আল্‌গাভাবে গাঁথা একটা যখন সামনের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে আছে, আর একটা হয়ত ততক্ষণ চারিদিক ঘুরে ঘুরে ঘর বাড়ি গাছপালা সব তদ্‌বির করছে!

আর আছে বৃদ্ধ জরদ্গবের মতো এক জন্তু—আমেরিকার গেছো-গিরগিটি। গিরগিটি বললাম বটে কিন্তু গোসাপ বললেও চলত, কারণ এর এক একটি নাকি প্রায় সাড়ে তিন হাত পর্যন্ত লম্বা হতে দেখা গিয়েছে। গলায় গলকম্বল, পিঠে সাংঘাতিক কাঁটা, তার উপর কোন কোনটার গায়ে মাথায় বড় বড় আঁচিল, তাতে চেহারাটা কেমন কিম্ভূতকিমাকার হয় তা সহজেই কল্পনা করতে পার।

খাঁটি গোসাপ-জাতীয় জন্তু আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রায় সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। 'হিংস্র' বলতে যা বোঝায় গোসাপেরা ঠিক তা নয় কিন্তু একবার গোঁ ধরলে সেও ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে। আমাদের দেশে কথায় বলে 'কচ্ছপের কামড়', সাহেবেরা বলেন 'বুলডগের কামড়'—কিন্তু গোসাপ খেপলে পরে তার কামড় ছাড়ানও বড় কম শক্ত নয়। ... হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে যে, গিরগিটিটাকে খুব বড় করতে পারলেই বুঝি ঠিক গোসাপ হয়ে দাঁড়াবে, কিন্তু বাস্তবিক গিরগিটি আর গোসাপের গড়নে কিছু তফাৎ আছে। গোসাপের ঘাড়টা অনেকটা লম্বা গোছের, আর তার জিভটা সাপের মতো চেরা, চলতে ফিরতে লক্‌লক্‌ করে। গোসাপেরা আমিষখোর, সাপ, টিকটিকি, ইঁদুর, ব্যাং, পাখি, এইসব খেয়ে থাকে—তাদের বিশেষ প্রিয় খাদ্য নাকি কুমিরের ডিম। আমাদের দেশে গোসাপ ডাঙায়ও থাকে জলেও নামে, তাই সাঁতারের সুবিধার জন্য তাদের ল্যাজগুলি চ্যাটাল হয়। যেসব গোসাপ কেবল শুকনো ডাঙায় বা গাছে থাকে, তাদের ল্যাজ হয় চাবুকের মতো গোল।

আরেকরকমের জন্তু রয়েছে যার গায়ে চক্র চক্র দাগ, সেটি হচ্ছে মেক্সিকোর 'বীভৎস গিলা' (gila monster) বা বিষধর গিরগিটি। ছোট ছোট পা, তাতে শরীরটা মাটি থেকে আলগাই হয় না—তাকে সাপের মতো এঁকে বেঁকে মাটি ঘষে চলতে হয়। ছোট্ট দুটি

চোখ, মুখভরা দাগের মধ্যে চট করে তাকে খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। দুম্বা ভেড়ার মতো ল্যাজটি চর্বিতে ভরা। যখন খাবার জোটে না, তখন ঐ ল্যাজটা শুকিয়ে আসে, ল্যাজের চর্বি সমস্ত শরীরে শুষে গিয়ে শরীরটাকে তাজা রাখে। কিন্তু আসল দেখবার জিনিস ওর মুখের মধ্যে। সেখানে যদি খোঁজ কর তবে দেখবে, ঠিক সাপের মতো তার বিষদাঁত রয়েছে। সে বিষে ছোটখাট জন্তু বা পাখি ত মরেই, মানুষ পর্যন্ত মারা গেছে বলে শোনা যায়।

একরকমের অদ্ভুত গিরগিটি আছে যাদের দেখে মনে হয় রাগে একেবারে ফুলে উঠেছে। তার গলায় যে রঙিন ছাতার মতো রয়েছে, সেটা অন্য সময়ে গুটিয়ে গলার চারদিকে পর্দার মতো ঝুলান থাকে, কিন্তু ভয় বা রাগের সময় খাড়া হয়ে ছাতার মতো ছড়িয়ে পড়ে। তখন তার মুখের চেহারাটিও ভয়ানক হয়ে ওঠে। লাল ছাতার নীচে আগুনের মতো চোখ, তার উপর ঐরকম ধারালো দাঁত আর টক্‌টকে জিভ—আর সেই সঙ্গে ফেঁস ফেঁস শব্দ করে লাফিয়ে ওঠা—এতে বাস্তবিক ভয় হবারই কথা। এই গিরগিটি দু পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে বেশ রীতিমত ছুটতে পারে। ল্যাজশুদ্ধ এক একটা প্রায় দুহাত পর্যন্ত লম্বা হয়। এই জন্তুর বাড়ি অস্ট্রেলিয়ায়।
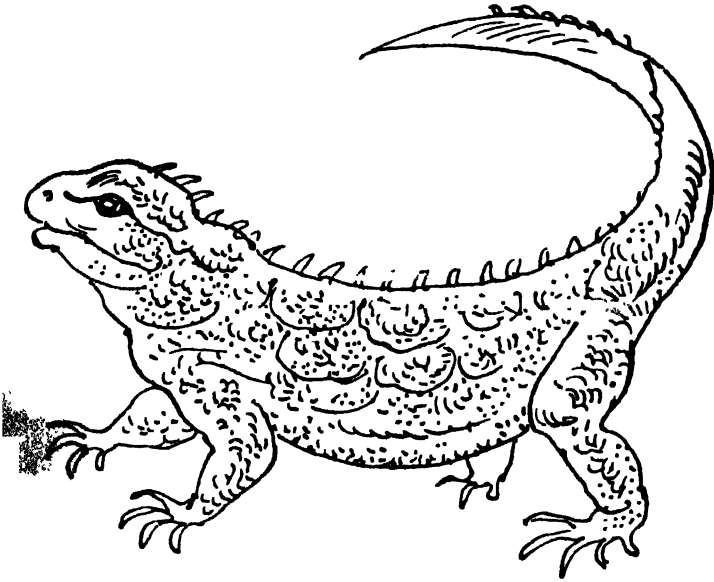
শে এবং ফিলিপাইন দ্বীপে আর একরকম গিরগিটি আছে, তাকে উড়ুক্কু
যেতে পারে। এদের পাঁজরের কয়েকখানা হাড় বুকের চামড়া ফুটো করে
কে, সেগুলো পাতলা পর্দার মতো চামড়া দিয়ে ঢাকা। পর্দাটাকে পাখার
গাছ থেকে আর এক গাছ পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে উড়ে যায়। ছোটখাট
কাছ দিয়ে গেলে এরা চট্ করে তাদের উপর উড়ে পড়ে। এ
ড়া নয়, কারণ এরা রীতিমত বাতাস ঠেলে উড়তে পারে না—

লাফিয়ে বাতাসে ভর করে খানিকটা ভেসে যায় মাত্র। এরা থাকে বড় বড় গাছের আগায়, ক্বচিৎ কখনও নীচে নামে। এক গাছ থেকে আর এক গাছে যেতে হলে এরা শূন্য দিয়েই যাতায়াত করে। এ পর্যন্ত প্রায় কুড়িরকমের উড়ুক্কু গিরগিটি পাওয়া গিয়েছে—তাদের সবগুলোরই রং অতি চমৎকার—কোন ফুল বা প্রজাপতির রঙও তার চাইতে সুন্দর বা উজ্জ্বল হয় না। সমস্ত গায়ে যেন রামধনুর নকশা করা। এরাও কিন্তু বেশ রাগতে জানে, আর রাগলে পরে এদের গলাটি ফুলে তাতে নীল লাল নানারকম রঙের খেলা দেখা যায়।

এ ছাড়াও আরো কতরকমের গিরগিটি আছে, তাদের কথা বলবার আর জায়গা নেই। দাড়িওয়ালা গিরগিটি, শিংওয়ালা গিরগিটি, সাপের মতো গিরগিটি, মাছের মতো গিরগিটি, কত যে তাদের রকমারি তার আর অন্ত নেই। একটা আছে, তার কোন্ দিকটা ল্যাজ আর কোন্ দিকটা মাথা হঠাৎ দেখলে বোঝাই যায় না। আর একটার হাত-পাগুলো লম্বা লম্বা কাঠির মতো। ল্যাজটা গোড়ায় সরু মাঝখানে মোটা আবার আগায় ছুঁচাল—ঠিক যেন কাঁচা লঙ্কাটি। এদের অনেকে আবার রং বদলাতে জানে—কেউ কেউ এ বিষয়ে বহুরূপীর চাইতেও ওস্তাদ। কেউ ডিম পাড়ে, কারও বা একেবারে ছানা হয়। আবার কেউ বা এমন ঠুন্‌কো যে, ধরামাত্র তার হাড়গোড় ভেঙে যায়।

অদ্ভুত কাঁকড়া

রাক্ষুসে কাঁকড়ার চেহারাটি তেমন কিছু ভীষণ নয়, গায়ের রংটিও বেশ সুন্দরই বলতে হবে—তবে একে রাক্ষুসে বলা হচ্ছে কেন? 'রাক্ষুসে' বলার একমাত্র কারণ হচ্ছে তার দেহের আয়তনটি। খুব বড় একটি রাক্ষুসে কাঁকড়ার বড় দুটি দাঁড়া ফাঁক করিয়ে তার এক আগা থেকে আর এক আগা পর্যন্ত মাপ নিয়ে দেখা গেছে, দশ বার হাত লম্বা! এটা হল কর্তা-কাঁকড়ার কথা—তাঁর গিন্নী যে কাঁকড়ি, তাঁকে ত আর যখন তখন লড়াই করতে হয় না, কাজেই তাঁর অত বড় দাঁড়াও নেই।

এই কাঁকড়া থাকে জাপান দেশে সমুদ্রের জলে। সেইখানে কূলের কাছে সমুদ্রের শেওলা-ধরা পাথরের মধ্যে রাক্ষুসে কাঁকড়া গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকে। নামটি রাক্ষুসে হলেও এদের স্বভাবটি মোটেও রাক্ষসের মতো নয়—সেইজন্য নানা জাতীয় মাছ আর অক্টোপাস প্রভৃতি জলজন্তু এদের দেখতে পেলেই তেড়ে খেতে আসে। নানারকম শেওলা প্রবাল আর 'স্পঞ্জ' তার গায়ের উপর বাসা ক'রে তার আসল চেহারাটিকে এমন বেমালুম ঢেকে রাখে যে, খুব কাছে গেলেও অনেক সময় তাকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়।

আরও কতগুলি কাঁকড়া রয়েছে, যেগুলিকে গেছো কাঁকড়া বলা যায়। এরা সত্যি সত্যি গাছে চড়ে কিনা তা নিয়ে [illegible] একেবারে সত্য বলে প্রমাণ হয়েছে। তবে এরা যে নারকেল [illegible] পেড়ে আনে, এ কথাটা অনেক সময় শোনা গেলেও এর কোন বিশ্বাস[illegible] যায় না। যা হোক, অল্পই উঠুক আর বেশিই উঠুক, ডাব পাড়ুক [illegible] চড়া আর নারকেল খাওয়া এই দুই বিদ্যাতেই এর বেশ বাহাদুরি আ[illegible]

কতগুলি ছোট ছোট দ্বীপে এই কাঁকড়ার বাড়ি। সেখানে নারকেল গাছের অভাব নেই, নারকেল মাটিতে পড়লেই গেছো কাঁকড়া তাকে আক্রমণ করে। প্রথমত সে নারকেলটার ছোব্‌ড়া ছাড়িয়ে নেয়—এই ছোব্‌ড়া তাদের গর্তে বিছাবার জন্য দরকার হয়। তারপর যেদিকে নারকেলের 'চোখ' থাকে, সেইদিকে দাঁড়া দিয়ে ঠুকে গর্ত করে সেই গর্তের মধ্যে দাঁড়া ঢুকিয়ে খুব মজা করে খায়। আস্ত নারকেলটিকে যে দাঁড়া দিয়ে ভাঙতে পারে—তার দাঁড়ার একটি চাপটে যে মানুষের হাড় পর্যন্ত ভেঙে দেয় সেটা কিছুই আশ্চর্য নয়। কিন্তু তবু মানুষ তাকে ধরতে ছাড়ে না—কারণ এ কাঁকড়া খেতে নাকি অতি চমৎকার! তার পায়ে এত চর্বি যে সেই চর্বি গলিয়ে সে দেশের লোকেরা তেল বার করে রাখে। তার উপর সে দেশের বুনো শুয়োরগুলোরও কেমন বদভ্যাস—তারা গর্ত খুঁড়ে এই কাঁকড়াদের বার করে খেয়ে ফেলে।

রাক্ষুসে কাঁকড়ার মতো বড় না হলেও, এগুলিও নেহাৎ ছোট নয়। একবার এইরকম একটা কাঁকড়াকে একটা মজবুত টিনের বাক্সে বন্ধ করে বাক্সটাকে তার দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। কিন্তু পরের দিন দেখা গেল যে, কাঁকড়াটা বাক্সের ধার মুচড়িয়ে ফাঁক করে তা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

শামুক ঝিনুক

আমাদের শরীরের ভিতরকার শক্ত কাঠামোটিকে আমরা কঙ্কাল বলি। কঙ্কালটা ভিতরে থাকে আর এই রক্ত মাংসের শরীর তাহাকে ঢাকিয়া রাখে—এইরূপই আমরা সচরাচর দেখি। কিন্তু এমন জীবও আছে যাহার কঙ্কালটা থাকে শরীরের বাহিরে। এমন অদ্ভুত কাণ্ড কেহ দেখিয়াছ কি? বোধহয় সকলেই দেখিয়াছ; কারণ, আমি কোন অসাধারণ বিদ্‌ঘুটে জন্তুর কথা বলিতেছি না—এই নিতান্ত সাধারণ শামুক ঝিনুক প্রভৃতির কথাই বলিতেছি।

শামুক ঝিনুকের মতো নিতান্ত সামান্য জিনিসের মধ্যে যে কত আশ্চর্য ব্যাপার লুকান থাকে, ভাবিলে অবাক হইতে হয়। তোমরা গেঁড়ি দেখিয়াছ? বাগানে পুকুরের কাছে স্যাঁৎসেঁতে জায়গায় ছোট ছোট জীবন্ত শামুকগুলি যারপরনাই অলসভাবে আস্তে আস্তে চলাফিরা করে—তাহাদের নাম গেঁড়ি। ঝিনুকের মধ্যে যে জীবন্ত প্রাণীটি বাস করে, তাহার চালচলনটিও কম অদ্ভুত নয়। তাহাদের অনেকেই সারা জন্ম মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে। কেহ কেহ এমন গোঁয়ার, তাহারা ক্রমাগত পাথর ফুঁড়িয়া তাহার ভিতর ঢুকিতে চায়। দুই-একজন আছে তাহারা লাফান বিদ্যাটি বেশ অভ্যাস করিয়াছে, কথা নাই বার্তা নাই হঠাৎ তড়াক করিয়া এক একটা লাফ দেয়। আর সমুদ্রের নীচে শুক্তিগুলো যে আপনাদের খোলার ভিতরে ছোট বড় নানারকম মুক্তা জমাইয়া রাখে, তাহার কথাও তোমরা নিশ্চয়ই জান। একরকম পোকার জ্বালায় অস্থির হইয়া ঝিনুকের গায়ে রস গড়ায় আর সেই রস জমিয়া মুক্তা হয়।

শামুক বা ঝিনুকের যখন জন্ম হয় তখন তাহাদের খোলাটি থাকে না, তাহার জায়গায় একটা পুরু চামড়ার মতো থাকে; সেই চামড়াটি শক্ত হইয়া ক্রমে মজবুত খোলা তৈরি

হয়। যে ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হয়, সেই ডিমগুলি দেখিতে বড়ই অদ্ভুত। কতগুলি ছোট ছোট পোঁটলা একসঙ্গে মালার মতো বাঁধা থাকে। প্রত্যেকটি পোঁটলার মধ্যে কতগুলি ডিম। এক একটি শামুক অনেকগুলি ডিম পাড়ে—একশ দেড়শ হইতে দশ বিশ হাজার। কিন্তু এ-বিষয়ে এক একটা ঝিনুকের ওস্তাদি অনেক বেশি। সমুদ্র বা নদীর জলে এমন সব ঝিনুক দেখা যায় যাহারা একেবারে দশ বিশ লাখ ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিয়া যখন ছানা বাহির হয়, তখন তাহাদের খাইবার জন্য নানারকম জীবজন্তু চারিদিক হইতে ঘিরিয়া আসে, কারণ খোলা জমিবার আগে এই নরম অবস্থাতেই এগুলিকে খাইবার সুবিধা। বাস্তবিক, অল্প বয়সেই ইহারা যদি এরূপভাবে উজাড় না হইত, তবে শামুক ঝিনুকের অত্যাচারে পৃথিবীতে বাস করাই দায় হইত। যে প্রাণী এক একবারে হাজার হাজার জন্মিতেছে তাহাদের প্রত্যেকটি যদি বড় হইতে পায়, আর প্রত্যেকের হাজার হাজার করিয়া ছানা হয়, আর এইরকম বছরের পর বছর চলিতে থাকে, তবে অবস্থাটা নিতান্তই সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায় বৈকি। এরূপভাবে বাড়িতে পারিলে একটিমাত্র শামুকের বংশধরেরা পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যে সমস্ত কলিকাতা সহরটিকে একেবারে বেমালুম ঢাকিয়া দিতে পারিত।

বলিতে গেলে এক সময় এই পৃথিবীতে ইহাদেরই রাজত্ব ছিল। সেকালের হিসাবেও ইহা খুবই পুরাতন সময়ের কথা। তখন আর কোন জীবজন্তু ছিল না, কেবল নানারকম শঙ্খ আর অদ্ভুত জলজন্তুরা এই দুনিয়ার পরিচয় লইয়া ফিরিত। আজও তাহাদের কঙ্কাল জমিয়া কত মাটির নীচে কত সমুদ্রের বুকে বড় বড় স্তর বাঁধিয়া আছে।

গেঁড়ির কথা বলিতে গেলে সব চাইতে বড় যে আফ্রিকার রাক্ষুসে গেঁড়ি তাহার কথাও বলা উচিত। সেগুলি কতখানি বড় তাহা পুরাপুরি দেখাইতে গেলে সন্দেশের পৃষ্ঠায় কুলাইবে না। ইহারা একটি করিয়া লম্বা গোছের ডিম পাড়ে—ঠিক পাখির ডিমের মতো শক্ত আর সাদা।

কিন্তু সমুদ্রের শঙ্খজাতীয় জন্তুদের মধ্যে ইহার চাইতে অনেক বড় জীবও বিস্তর দেখা যায়। তাহাদের এক একটির খোলা এমন প্রকাণ্ড হয় যে, একটি ছোটখাট ছেলেকে তাহার মধ্যে অনায়াসে শোয়াইয়া রাখা যায়।

শামুকেরা খায় কি? নরম ঘাস, কচি পাতা, জলের পানা—এইগুলি অনেকেরই প্রধান খাদ্য। আবার কেহ কেহ আছেন, তাঁহাদের নিরামিষে রুচি নাই, তাঁহারা নানারকম পোকামাকড়, জলের কীট এই সকল খাইয়া থাকেন। ঝিনুকেরও খাওয়া এইরকমই, তবে তাহারা এক জায়গায় পড়িয়া থাকে বলিয়া তাহাদের আহার জুটিবার সুযোগ কিছু কম। ঝিনুকের খোলার দুটি করিয়া পাট থাকে, সে দুটিকে তাহারা ইচ্ছামত কব্‌জা ঘুরাইয়া খুলিতে ও জুড়িয়া দিতে পারে। খাবারের দরকার হইলে তাহারা সেই দরজা ফাঁক করিয়া রাখে; চলিতে চলিতে অথবা স্রোতে ভাসিয়া যে-সকল কীট সেই হাঁ-করা মুখের মধ্যে আসিয়া পড়ে তাহাদের সে চট্‌পট্‌ খাইয়া ফেলে। শামুক আর ঝিনুকের খাওয়ার মধ্যে আর একটি তফাৎ এই যে, ঝিনুকের দাঁত নাই কিন্তু শামুকের দাঁত আছে। দাঁত বলিতে মানুষের দাঁতের মতো কিছু একটা মনে করিও না। এই দাঁতগুলি তাহাদের জিভের গায়ে অতি সূক্ষ্মভাবে সাজান থাকে; এক একটা শামুকের প্রায় দুই চারশ বা হাজার দেড় হাজার দাঁত। উখার মতো ধারাল এই জিভটিকে সে তাহার খাবারের ভিতরে, উপরে, আশেপাশে ঘ্যাশ্‌ ঘ্যাশ্‌ করিয়া চালাইতে থাকে। তাহাতেই খাবার জিনিস সব টুকরা টুকরা হইয়া

থ্যাৎলাইয়া কাদার মতো নরম হইয়া যায়। এক একটার জিভের আগা পর্যন্ত সাংঘাতিক ধারাল; সেই জিভ দিয়া তাহারা অন্য জন্তুর গায়ে ফুটা করিয়া দেয়, নিরীহ ঝিনুকগুলির খোলা ফুঁড়িয়া তাহাদের চুষিয়া খায়।

তারপর শামুক ঝিনুকের চেহারার বাহার যদি বর্ণনা করিতে বসি, তবে ত শেষ করাই মুশকিল হইবে। কত হাজাররকমের শঙ্খ, তাহার কতরকম আকার, কত রকম রং। তার এক একটার যে কি আশ্চর্য সুন্দর গড়ন শুধু কথায় তাহা আর কত বোঝান যায়।

সিন্ধু ঈগল

সমুদ্রের ধারে যেখানে ঢেউয়ের ভিতর থেকে পাহাড়গুলো দেয়ালের মতো খাড়া হয়ে বেরোয় আর সারা বছর তার সঙ্গে লড়াই করে সমুদ্রের জল ফেনিয়ে ওঠে, তারই উপরে অনেক উঁচুতে পাহাড়ের চূড়ায় সিন্ধু ঈগলের বাসা। সেখানে আর কোন পাখি যেতে সাহস পায় না—তারা সবাই নীচে পাহাড়ের গায়ে ফাটলে ফোকরে বসবাস করে। পাহাড়ের উপরে কেবল সিন্ধু ঈগল—তারা স্বামী-স্ত্রীতে বাসা বেঁধে থাকে।

ঈগলবংশ রাজবংশ—পাখির মধ্যে সেরা। সিন্ধু ঈগলের চেহারাটি তার বংশেরই উপযুক্ত—মেজাজটিও রাজারই মতো। সিংহকে আমরা পশুরাজ বলি—সুতরাং ঈগলকেও পক্ষীরাজ বলা উচিত; কিন্তু তা আর বলবার যো নেই কারণ রূপকথার আজগুবি গল্পে লেখে, পক্ষীরাজ নাকি একরকম ঘোড়া! যাহোক—শুনতে পাই রাজারা নাকি মৃগয়া করতে ভালবাসেন। তাহলে সে হিসাবেও সিন্ধু ঈগলের চালের কোন অভাব নেই। চিল কাক সাঁচান শকুন সবাই মরা মাংস খায়—কাজেই সেরকম খাওয়া যতক্ষণ জোটে ততক্ষণ তাদের আর শিকার করা দরকার হয় না। কিন্তু সিন্ধু ঈগলের স্বভাবটি ঠিক তার উল্টো—যতক্ষণ শিকার জোটে ততক্ষণ সে মরা জানোয়ার পেলেও তা ছোঁয় না। কিন্তু একটি তার বদভ্যাস আছে, সেটাকে ঠিক রাজার মতো বলা যায় না; সেটি হচ্ছে অন্যের শিকার কেড়ে খাওয়া!

সমুদ্রের ধারে ছোট বড় কতরকম পাখি—তারা সবাই মাছ ধরে খায়। নিতান্ত ছোট যারা তারা ধরে ছোট ছোট মাছ—সেসব মাছের উপর সিন্ধু ঈগলের কোন লোভ নাই। কিন্তু বড় বড় গাংচিল আর মেছো চিলগুলো যেসব বড় বড় মাছ জল থেকে টেনে তোলে তার দু-চারটা যে মাঝে মাঝে সিন্ধু ঈগলের পেটে যায় না, এমন নয়। সমুদ্রের ধারে শিকারের অভাব কি? মাছ খেয়ে যদি অরুচি ধরে, তবে এক-আধটা পাখি মেরে নিলেই হয়। তাছাড়া একটু ডাঙার দিকে ইঁদুর খরগোস এমনকি ছাগলছানাটা পর্যন্ত মিলতে পারে। কিন্তু তবু সে অন্যের শিকারে জবরদখল জাহির করতে ছাড়ে না। এই যে ডাকাতি করে কেড়ে খাওয়া, এ বিদ্যায় সিন্ধু ঈগলের বেশ একটু কেরামতি আছে। তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে ডাকাতি করে। সারাদিন তারা আকাশে উড়ে উড়ে বেড়ায়। উড়তে উড়তে কোথায় গিয়ে ওঠে, মনে হয় যেন সে মেঘের রাজ্যে চলে গিয়েছে, পৃথিবীর উপর বুঝি তার কোন দৃষ্টি নেই। কিন্তু ঈগলের চোখ বড় ভয়ানক চোখ। ঐ উঁচুতে থেকেই

সে সমস্ত দেখছে—কিছুই তার চোখ এড়াবার যো নাই। ঐ যে কত পাখি জলের ধারে খেলছে আর মাছ ধরছে, তার মধ্যে একটা মেছো-চিল ঘুরে ঘুরে শিকার খুঁজছে—ঈগল পাখির চোখ রয়েছে তারই উপর।

জলের নীচে একটা মাছ বারবার উঠছে আর নামছে, চিল কেবল তাই দেখছে—মাথার উপরে যে ঈগলরাজ টহল ফিরছেন সেদিকে তার খেয়ালই নাই! একবার মাছটা যেই ভেসে উঠেছে, আর অমনি ছোঁ করে মেছো-চিল জলের উপর পড়েছে। তারপর মাছ শুদ্ধ টেনে তুলতে কতক্ষণ লাগে! চিল ভাবছে এখন একটু নিরিবিলি জায়গা দেখে ভোজনে বসবে, এমন সময়, চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হীঁ—ভূতের হাসির মতো বিকট চীৎকার করে কি একটা প্রকাণ্ড ছায়া তার ঘাড়ের উপর ঝড়ের মতো তেড়ে নামল! সে আর কিছু নয়, সিন্ধু ঈগল; ঐ মাছটার উপর তার নিতান্তই লোভ পড়েছে। তাড়া খেয়ে চিলের বাছা পালাতে পারলে বাঁচে, কিন্তু পালাবে কোথায়? দুদিক থেকে দুইটা ঈগল ক্রমাগত তেড়ে তেড়ে ছোবল মারছে, তার একটি ছোবল গায়ে লাগলে হাড়ে মাংসে আলগা হয়ে যায়। তার উপর সেই বিকট আওয়াজ যখন কানের কাছ দিয়ে হেঁকে যায় তখন বুদ্ধিশুদ্ধি আপনা হতেই ঘুলিয়ে আসে। কাজেই মেছো-চিলের মাছ খাওয়া এবারে আর হল না। সে বারকয়েক ঈগলের ঝাপ্‌টা এড়িয়ে তারপর প্রাণের ভয়ে মাছটাছ ফেলে পালাল।
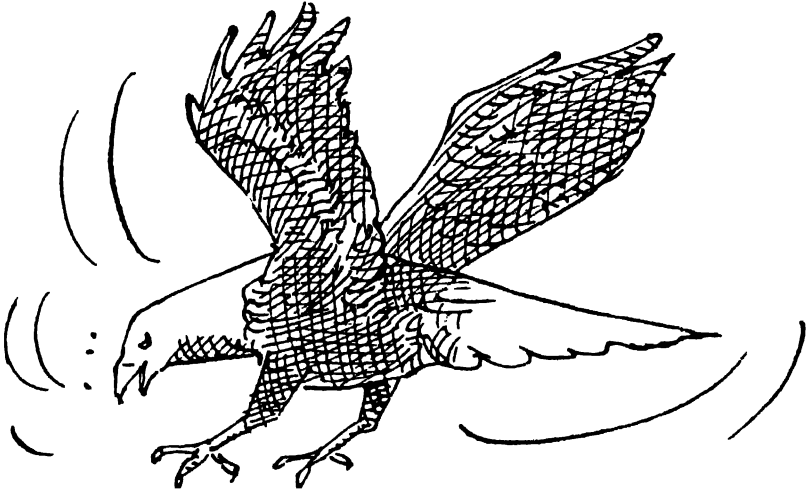
সিন্ধু ঈগল অনেক সময় সমুদ্র ছেড়ে বড় বড় নদীর ধারে গাছের উপর বাসা বাঁধে। সে বাসাও একটি দেখবার মতো জিনিস। এক একটা বাসা ৫/৭ হাত চওড়া; বছরের পর বছর সেটাকে তারা ক্রমাগতই উঁচু করে একটা রীতিমত সিংহাসন বানিয়ে তোলে। এই বাসা বানানো ব্যাপারটা নাকি দেখতে ভারি মজার। একটা ঈগল অনেক কষ্ট করে কতগুলো ডাল সংগ্রহ করে আনল—আর একটা হয়ত সেগুলো পছন্দই করল না! এমনি করে যত ডালপালা জোগাড় হয় তার অধিকাংশই খামখা নেড়ে-চেড়ে ফেলে দেওয়া হয়। তখন তা নিয়ে তাদের মধ্যে ভারি একটা ঝগড়া লেগে যায়; তারা বাসা বানানো

বন্ধ রেখে মুখ ভার করে বসে থাকে। আবার হঠাৎ খানিক বাদেই তারা আপসে ভাব করে বাসা বানাতে লেগে যাবে।

এরা সাধারণত মানুষকে কিছু বলে না—বরং তাড়া করলে বাসাটাসা ফেলে পালায়। তবে, বাসায় যদি ছানা থাকে, তাহলে তাড়াতে গেলে অনেক সময়ে উল্টে তেড়ে আসে। তখন দেখা যায় তাদের তেজ কেমন সাংঘাতিক। একবার এক সাহেবের চাকর তামাসা দেখবার জন্য গাছে উঠে ঈগলের বাসায় উঁকি মারতে গিয়েছিল। তাতে ঈগলেরা তাকে তেড়ে এসে এমনি সাজা দিয়েছিল যে সাহেব বন্দুক নিয়ে ছুটে না আসলে সেদিন তার তামাসা দেখবার শখ একেবারে জন্মের মতো ঘুচে যেত।

ধনঞ্জয়

এ পাখির ইংরাজি নাম হর্নবিল্ (Hornbill) অর্থাৎ শৃঙ্গচঞ্চু কিন্তু তার আসল বাংলা নামটি যে কি, তা আর খুঁজে পেলাম না। লোকে তাকে ধনঞ্জয় বা ধনেশ পাখি বলে কিন্তু অভিধান খুঁজতে গিয়ে দেখি, ও নামে কোন পাখিই নেই। ওর কাছাকাছি একটা আছে, তার নাম ধনচ্চু—'হাড়গিলার আকার-বিশিষ্ট পক্ষীবিশেষ, করেটু পক্ষী'। 'করেটু' মানে 'কর্করেটু পক্ষী'—'কর্করেটু' মানে 'করটিয়া পক্ষী'। আবার 'করটিয়া'র মানে দেখতে গেলে আরও কত নাম বেরুতে পারে, সেই ভয়ে আর দেখা হল না। যা হোক, নাম দিয়ে যদি কেউ চিনতে না পারে, তবে চেহারাটা দেখলে তার পরিচয় পেতে বোধহয় দেরি হবে না—কারণ, এ চেহারা একবার দেখলে আর সহজে ভুলবার যো নেই।

আলিপুরের চিড়িয়াখানায় যত অদ্ভুত পাখি আছে, তার মধ্যে 'ফার্স্ট প্রাইজ' কাউকে দিতে হলে বোধ হয় একেই দেওয়া উচিত। আমরা ছেলেবেলায় যখন এই পাখিকে প্রথম দেখি তখন তার নাম দিয়েছিলাম 'দুই-ঠোঁটওয়ালা পাখি'। বাস্তবিক কিন্তু এর একটা মাত্রই ঠোঁট। উপরেরটা শিং বলতে পার—সেটার সঙ্গে তার মুখ বা ঠোঁটের কোন সম্পর্কই নেই। অত বড় একটা জমকালো শিং দিয়ে তার কি যে কাজ হয়, তা দেখতে পাই না। অত্যন্ত নিরীহ পাখি, কারও সঙ্গে গুঁতাগুঁতি করবার সাহস তার আছে কিনা সন্দেহ। চেহারা দেখলে মনে হয়—'বাপরে! এই ঠোঁটের একটি ঠোকর খেলেই ত গেছি'। কিন্তু নিতান্ত ঠেকা না পড়লে গুঁতা মারার অভ্যাসটিও তার নেই বললেই হয়।

এত বড় ঠোঁট তার উপর এমনধারা শিং, এই বিষম বোঝা বয়ে বয়ে পাখিটার মাথাও কি ধরে না? চলতে ফিরতে উড়তে গিয়ে সে কি উলটেও পড়ে না? আসল কথা কি জান? তার ঠোঁটটি আর শিংটি আগাগোড়াই ফাঁপা, কাঁকড়ার খোলার মতো হালকা। তাই তার ঠোঁট নিয়ে বড় বড় গাছের আগডালের উপরে সে লাফিয়ে বেড়ায়—খাবার দেখলে ঝুপ করে উড়ে এসে পড়ে। কেবল তাই নয়, তার দিকে খাবারের টুক্‌রো ছুঁড়ে দেখ দেখি, সে কেমন চট্‌পট্ ঘাড় ফিরিয়ে তার বিশাল ঠোঁটের মধ্যে খাবার লুফে নেবে। এ বিষয়ে তার মতো ওস্তাদ আর বোধহয় দ্বিতীয় নেই; আর এমন খানেওয়ালাও বোধহয় আর একটি পাওয়া দুষ্কর।

এক সাহেবের এক পোষা ধনঞ্জয় ছিল—সে আমাদের দেশে নয়, বোর্নিও দ্বীপে। সে দেশে এই পাখি অনেকেই পুষে থাকে। সাহেব বলেন, এমন সর্বনেশে পেটুক জীব আর কোথাও মেলে না। সেই এতটুকু বাচ্চা বয়স থেকেই তাকে খাইয়ে খাইয়েও মানুষে ঠাণ্ডা রাখতে পারত না। এইমাত্র খাইয়ে গেলে, আবার পাঁচ মিনিট পরেই দেখবে হতভাগা ল্যাজের উপর ভর দিয়ে পা মুড়ে বসে বসে প্রকাণ্ড হাঁ করে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে বিকট কান্না লাগিয়েছে। তারপর একটু বয়স হলে তখন তার অত্যাচারে বাড়িতে টেঁকা দায় হয়ে উঠল। খাবার সময় তার ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে তাকে আটকে রাখতে হত, তা নইলে সে পাতের খাবারে, ভাতের হাঁড়িতে, ব্যঞ্জনের বাটিতে, দুধের কড়ায় যেখানে সেখানে মুখ দিয়ে সকলকে অস্থির করে তুলত। মাছমাংস, ডালভাত, রুটিবিস্‌কুট, ময়দার ডেলা, যা দাও তাতেই সে খুশী কিন্তু পেট ভরে দেওয়া চাই। পেটটি ভরলেই সে উড়ে গিয়ে গাছের আগায় বিশ্রাম করবে, রোদ পোহাবে আর প্রাণপণে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নতুন করে সাংঘাতিক খিদে ডেকে আনবে।

ধনঞ্জয় পাখির চালচলন স্বভাব যাঁরা লক্ষ করেছেন তাঁরা বলেন, এই পাখির বাসা বাঁধবার ধরনটি তার চেহারার চাইতে কম অদ্ভুত নয়। যখন ছানা হবার সময় হয় তখন মা-পাখিটা একটা গাছের কোটরের মধ্যে আশ্রয় নেয়, আর বাবা-পাখি সেই কোটরের মুখটাকে কাদামাটি শেওলা দিয়ে বেশ করে এঁটে বন্ধ করে দেয়—কেবল একটুখানি ফোকর রাখে, তা না হলে বাইরে থেকে খাবার দেবে কি করে? সেই কোটরের মধ্যে ডিম পেড়ে মা-পাখি দিনের পর দিন তার উপর বসে বসে তা দেয়। আর বাবা-পাখি বাইরে থেকে পাহারা দেয়, আর ফোকরের ভিতর দিয়ে সারাদিন খাবার চালান করে। এমনি করে যখন ডিম ফুটে ছানা বেরোয়, আর সেই ছানাগুলো যখন একটু বড় হয়, তখন বাসা ভেঙে মা-পাখি বেরিয়ে আসে। এতদিন বন্ধ জায়গায় বসে বসে তার পা এমন আড়ষ্ট হয়ে যায় যে কোটর থেকে বেরোবার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে উড়তে পারে না, ভাল করে চলতে ফিরতেও পারে না। এই বাসা গড়া ও ভাঙার সময় ধনঞ্জয়ের লম্বা ঠোঁট আর শিং এ দুটোই বোধহয় বেশ কাজে লাগে।

ধনঞ্জয় পাখি আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়ার নানা জায়গায় বাস করে এবং তার নানারকম চেহারা দেখা যায়। উড়িষ্যা দেশে এ পাখির নাম 'কুচিলাখাই'। 'কুচিলাখাই'য়ের গায়ের রং কালো, তার উপর ঠোঁট আর শিঙের চক্‌চকে লালচে হলুদ দেখতে বেশ মানায়। নেপালের লাল ধনঞ্জয়ের শিং নেই বললেই হয়, কিন্তু তার মুখে মাথায় খুব গম্ভীর গোছের কেশর আছে আর ঠোঁটদুটো করাতের মতো দাঁতাল। সুমাত্রা দ্বীপের ধনঞ্জয়ের শিং একেবারেই নেই, কিন্তু তার জমকালো কেশরটি অতি চমৎকার ধবধবে সাদা। আবার কেউ কেউ আছেন যাঁদের শিংও আছে, কেশরও আছে। শিঙের রকমারিও অনেক দেখা যায়—কারও শিং খড়্গের মতো বাঁকা, কারও কিরিচের মতো সোজা, আবার একজন আছেন তাঁর শিংটি শশার মতো গোল, তার উপরে ঝুঁটি!

ধনঞ্জয়ের চেহারাটি যেমন বিকট তার গলার আওয়াজটিও তেমনি কট্‌কটে। বনের মধ্যে হঠাৎ তার গলা শুনলে পাখিরা ত ভয় পায়ই, বাঁদর বা বনবেড়াল পর্যন্ত ভয়ে পালায় এমনও দেখা যায়। তা ছাড়া তার মাংস নাকি এমন বিস্বাদ যে কুকুরেও খেতে চায় না।

ধনঞ্জয়ের কথা বলতে গেলে আর-এক পাখির কথা বলতে হয়—তার নাম টুকান (Toucan)। এই পাখির বাসা আমেরিকায়। এদের গায়ে অনেক সময়ে খুব জমকালো রঙের বাহার দেখা যায়—কিন্তু আসল দেখবার জিনিস এদের সাংঘাতিক লম্বা ঠোঁট দুখানি। দেখলে মনে হয় যত বড় পাখি প্রায় তত বড় ঠোঁট—যেন 'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি'। তাতে চেহারাটি কেমন খোলে, তার আর বেশি বর্ণনা করবার দরকার নেই। দেখতে অনেকটা ধনঞ্জয়ের মতো হলেও আসলে এরা ধনঞ্জয় নয়—আর ধনঞ্জয়ের মতো অত বড়ও হয় না।

পাখির বাসা

মানুষ যেমন নানারকম জিনিস দিয়ে নানা কায়দায় নিজেদের বাড়ি বানায়—কেউ ইঁট, কেউ পাথর, কেউ বাঁশ-কাদা, কেউ মাটি; কারো এক-চালা, কারো দো-চালা—পাখিরাও সেরকম নানা জিনিস দিয়ে নানান কায়দায় নিজেদের বাসা বানায়। কেউ বানায় কাদা দিয়ে, কেউ বানায় ডাল-পালা দিয়ে, কেউ বানায় পালক দিয়ে, কেউ বানায় ঘাস দিয়ে তার গড়নই বা কতরকমের—কারো বাসা কেবল একটি ঝুড়ির মতো, কারো বাসা গোল, কারো বাসা লম্বা চোঙার মতো। এক একটা পাখির বাসা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়, তাতে বুদ্ধিই বা কত খরচ করেছে, আর মেহনতই বা করেছে কত! পাখির বাসা তোমরা অনেকেই দেখেছ বোধহয়। কেমন সুন্দর করে শুকনো ঘাস দিয়ে বুনে তার বাসাটি সে তৈরি করে। পাছে কোন জন্তু বা সাপ বাসা আক্রমণ করে, সেজন্য বাসায় ঢুকবার রাস্তা তলার দিকে। শত্রুকে জব্দ করবার আর একটা উপায় তারা করেছে—অনেক সময় বাসার গায়ে আর একটা গর্তের মতো মুখ তৈরি করে রাখে, সেটা কেবল ঠকাবারই জন্যে, তার ভিতর দিয়ে বাসার মধ্যে ঢোকা যায় না।

টুনটুনি পাখি তার বাসা তৈরি করার আগে দুটি কি তিনটি পাতা সেলাই করে একটা বাটির মতো তৈরি করে; তার মধ্যে নরম ঘাস পাতা দিয়ে সে তার বাসাটি বানায়। সেলাইয়ের সুতো সাধারণত রেশমেরই ব্যবহার করে; কাছে রেশম না থাকলে যে সুতো পায় তাই দিয়ে করে। সেলাইয়ের ছুঁচ হল তার সরু ঠোঁট-জোড়া। বাসাটা অনেকটা দোলনার মতো ঝুলতে থাকে। খুব ছোট জাতের পাখিরা হিংস্র জন্তু আর সাপ গিরগিটির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে প্রায়ই ঐরকম দোলনার মতো বাসা তৈরি করে থাকে। অনেক জাতের পাখি আবার মাটিতেই বাসা করে; গাছে বাসা তারা পছন্দই করে না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বাসা তৈরিই করে না। নিজেরা গাছের আড়ালে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকে আর মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে ডিম পাড়ে। মোরগ, তিতির, পেরু এরা সবই এই জাতের। আবার কোন কোন পাখি সুন্দর করে লতা পাতা দিয়ে কুঞ্জবনের মতো বানায়। অস্ট্রেলিয়া দেশের 'কুঞ্জ-পাখি' (Bower bird) তার বাসার সামনে খুব সুন্দর লতা-কুঞ্জ তৈরি করে। পাখিটি আকারে ছোট বটে, কিন্তু কুঞ্জটি কিছু ছোট

হয় না। এদের আবার রংচঙে জিনিসের বড় সখ; ভাঙা কাচ, পাথর, রঙিন জিনিস, যা সামনে পাবে সব এনে বাসার চারিদিকে সাজিয়ে রাখবে।

কোন কোন পাখি থুতু দিয়ে বাসা তৈরি করে। তালচোঁচ পাখি এই জাতের। পালক, ঘাস এসব জিনিস থুতু দিয়ে জোড়া লাগিয়ে তার বাসা তৈরি হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জে এক জাতের তালচোঁচ আছে, তারা কেবলই থুতু দিয়ে নিজেদের বাসা বানায়। চীন দেশে এ বাসার খুব আদর; তারা এর ঝোল বানিয়ে খায়। এইজন্য সে দেশে এর দামও খুব বেশি।

অনেক জাতের পাখি কাদা দিয়েও তাদের বাসা বানায়। আফ্রিকার ফ্লামিঙ্গোর বাসা কাদার তৈরি। একটা ঢিপির মতো কাদা সাজিয়ে তার মাঝে একটা গর্ত করে ফ্লামিঙ্গো ডিম পাড়ে। আরো অনেক জাতের পাখিও কাদার বাসা বানায়; তাদের অধিকাংশই আফ্রিকার।

তোমরা অনেকেই বোধহয় কাঠ-ঠোকরা দেখেছ। এরা ঠোঁট দিয়ে ঠোকর মেরে গাছের গায়ে গর্ত করে তার ভিতর বাসা বানায়। দুষ্টু ছেলেরা ছানা চুরি করার লোভে কাঠ-ঠোকরার বাসার গর্তে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে অনেক সময় সাপের কামড় খায়, কারণ সাপেরা কাঠ-ঠোকরার বাসা ডাকাতি করে অধিকার করতে বড় পটু।

মাছি

আমার সামনে টেবিলের উপর এক টুকরা চিনি পড়িয়াছিল। একটা মাছি খুব মন দিয়া সেইটাকে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। চিনির কাছে মুখ রাখিয়া সে অনেকক্ষণ স্থির হইয়া আছে, মনে হয় সে একটা ভারি ভাবনায় পড়িয়া হঠাৎ যেন গম্ভীর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু একটু ভাল করিয়া দেখিলে বোঝা যায় যে সে এখন আহারে ব্যস্ত। তাহার মুখের তলায় শুঁড়ের মতো কি একটা জিনিস বারবার ওঠানামা করিতেছে। একবার চকিতে চিনির উপর ঠেকিয়া আবার মুহূর্তের মধ্যে কোথায় ঢুকিয়া যাইতেছে। কাজটা এত চট্‌পট্‌ তাড়াতাড়ি চলিতেছে যে ভাল করিয়া না দেখিলে চোখে ধরাই পড়ে না।

ভাবিলাম এই বেলা মাছিটাকে ধরিয়া ফেলি। কিন্তু মাছিটা আমার চাইতেও অনেকখানি চট্‌পটে, আমার হাত একটু নড়িতেই সে ব্যস্ত হইয়া উড়িয়া গেল। বাস্তবিক, মাছির চোখ এড়ান খুবই শক্ত। ঐ যে তাহার লালমত মাথাটি দেখিতে পাও ঐ সমস্ত মাথাটি তাহার চোখ। একটি নয়, দুটি নয়, হাজার হাজার চোখ। অনুবীক্ষণ দিয়া বেশ বড় করিয়া দেখিলে মনে হয়, মাথাটি যেন অতি সূক্ষ্ম জাল দিয়া মোড়া। আরো বড় করিয়া দেখিলে দেখা যায় সেই জালের প্রত্যেকটি ফোকর এক একটি আস্ত চোখ। প্রত্যেকটি চোখের ভিতর একটি পর্দা—প্রত্যেকটি পর্দার উপর বাহিরের জিনিসের এক একটি অতি ক্ষুদ্র ছায়া পড়ে। এইরকম হাজার হাজার চক্ষু মেলিয়া না জানি সে জগৎটাকে কিরকম দেখে।

অনুবীক্ষণ দিয়া মাছিকে পরীক্ষা করিয়া দেখ, যেখানে দেখিবে সেখানেই সূক্ষ্ম কৌশলের

অদ্ভুত কাণ্ড। ঐ যে শুঁড়ের মতো তাহার জিভটি, সেও একটা কম আশ্চর্য ব্যাপার নয়। পাখার মতো ছড়ানো জিনিসটি তাহার জিভের আগা। শিরার মতো জিনিসগুলির প্রত্যেকটি এক একটি নল। সেই নল দিয়া সে খাবার জিনিস চুষিয়া খায়। নলগুলি সমস্তে মিলিয়া গোড়ার দিকে মোটা চোঙার মতো হইয়াছে, সেই চোঙার ভিতর দিয়া খাবার জিনিস তাহার মুখের মধ্যে ঢুকিতে পায়। যদি আরও সূক্ষ্মভাবে খুব ভালো অনুবীক্ষণ দিয়া দেখ, দেখিবে প্রত্যেকটি নলের মধ্যে আবার আরও কত সূক্ষ্ম কারিকরি। এক একটি নল যেন অসংখ্য আংটির মালা—আংটির উপর আংটি বসান, তাহাতে অসম্ভবরকম পাতলা চামড়ার ছাউনি। ঐ নলগুলার গায়ে দুপাশে যে দুইটি কালো দাঁড়ার মতো দেখিতেছ, ঐ দুইটি গুটাইলে সমস্ত জিভটা ছাতার মতো গুটাইয়া যায়। জিভটা যখন মুখের ভিতর থাকে তখন তাহাকে এমনিভাবে গুটাইয়া মুড়িয়া রাখিতে হয়, আবার আহারের সময় দাঁড়া দুটি নাড়া দিলেই নলগুলি মুহূর্তের মধ্যে ছড়াইয়া ঝাড়ের মতো ঝুলিয়া বাহির হয়। গরু বা ঘোড়ার গায়ে একরকম বড় মাছি বসে, তাহাদের ডাঁশ বলে। ডাঁশেরা রক্তপায়ী, সুতরাং তাহাদের জিভের সঙ্গে একজোড়া করিয়া হুল থাকে। জিভটাও মাছির জিভের চাইতে অনেকখানি সরু—দেখিতে কতকটা বোতলের মতো। হুলের খোঁচায় জন্তুর গায়ে ফুটা করিয়া সেই ফুটার মধ্যে ইহারা জিভের আগাটুকু ঢুকাইয়া রক্তপান করে।

তারপর দেখ মাছির চরণখানি। ইহার মধ্যেও দেখিবার মতো জিনিস অনেক আছে। প্রথমেই চোখে পড়ে ঐ শিঙের মতো অদ্ভুত জিনিস দুইটি। কিন্তু বাস্তবিক দেখিবার মতো জিনিস চাও ত পায়ের ঐ উঁচু ঢিবলি দুইটিকে দেখ। ঐ দুইটি নরম তেলোর উপর ভর দিয়া মাছি আমাদের খাবারের উপর দিয়া হাঁটিয়া যায়। খাবার জিনিসে যে পা ঠেকাইতে নাই, অন্তত পা-টাকে যে ভাল করিয়া সাবান দিয়া ধোয়া উচিত, সে খেয়াল ত মাছির নাই। সে অখাদ্য ময়লা জিনিসের উপর তিন জোড়া চরণ চাপাইয়া সেই চরণের ধূলি আবার আমাদের খাবারের উপর ঝাড়িয়া যায়। তাহার সঙ্গে কত যে রোগের বীজ চলিয়া আসে, তাহা ভাবিলেও ভয় করে। ঐ পায়ের তেলোটিকে অনুবীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা করিলে অনেক সময় দেখা যায় উহাতে সাংঘাতিক রোগের বীজ কিল্‌বিল্‌ করিতেছে। সেইজন্য লোকে বলে যে মাছিকে খাবারের উপর বসিতে দিয়ো না। পায়ের তেলোটি আগাগোড়া বোলতার চাকের মতো অসমান—তাহার গায়ে অসংখ্য ছিদ্র—সেই ফুটা দিয়া সে যে-কোন জিনিসকে চুষিয়া ধরিতে পারে। তাই কাচের মতো পালিশ জিনিসের উপরেও চলাফিরা করিতে তাহার কোন অসুবিধা হয় না। দরকার হইলে ঐ ফুটাগুলির ভিতর হইতে সে একরকম আঠাল রস বাহির করিতে পারে, তাহাতে পা আরও মজবুতভাবে আঁটিয়া বসাইবার সাহায্য হয়।

মাছি উড়িবার সময় প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ছয়শত বার ডানা ঝাপটায়। খুব ব্যস্ত হইলে এক সেকেন্ডে সে প্রায় বিশ পঁচিশ হাত উড়িয়া যাইতে পারে। অতটুকু প্রাণীর পক্ষে ইহা বড় সামান্য কথা নয়। মাছিটাকে যদি একটা ঘোড়ার মতো কল্পনা করা যায় তাহা হইলে তাহার দৌড়টি হয় যেন কামানের গোলার মতো।

বাতাস ছাড়া মানুষ যেমন বাঁচে না—মাছিরও তেমনি নিশ্বাস না লইলে চলে না। আমরা নিশ্বাস লই ফুসফুসে বাতাস পাইবার জন্য। আমাদের বুকের দুপাশে দুটি হাপরের মতো যন্ত্র আছে, তাহারই নাম ফুসফুস বা Lungs। ঐ ফুসফুসের মধ্যে বাতাস ঢুকিয়া

শরীরের রক্তকে তাজা করিয়া তোলে। মাছির সমস্ত শরীরটাই যেন একটা প্রকাণ্ড ফুসফুস। তাহার শরীরের দুপাশে ছোট ছোট ফুটা থাকে—সেইগুলিই তাহার নিশ্বাস লইবার ছিদ্র বা নাক। শরীরের ভিতরে সরু সরু শিরার মতো অসংখ্য প্যাঁচান নল তাহার গায়ের রক্তের মধ্যে ডুবান রহিয়াছে। সেই নলের ভিতর দিয়া বাতাস চলে আর রক্ত তাজা হইয়া উঠে।

আমাদের যেমন অসুখ-বিসুখ আছে, মাছিরও তেমনি। এই এখন আমকাঁঠালের সময় এত মাছি দেখিতেছ, আর কিছুদিন পরেই তাহারা কমিতে আরম্ভ করিবে। একরকম ছাতাপড়া ব্যারামে প্রতি বৎসর হাজার হাজার মাছি মারা যায়।
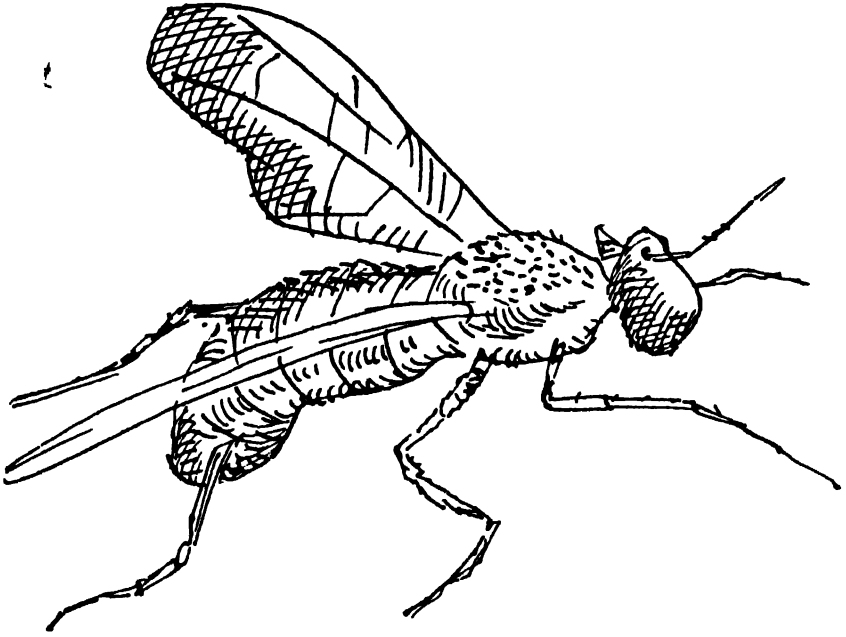
মাছির কথা বলিতে গেলে তাহার জন্মের কথাও বলিতে হয়। আঁস্তাকুড়ের ময়লার মধ্যে বা গোবরের গাদার মধ্যে মাছিরা ডিম পাড়িয়া যায়। খুব ছোট সাদা সাদা চালের মতো ডিমগুলি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ফুটিয়া তাহার ভিতর হইতে একরকম পোকা বাহির হয়। সপ্তাহখানেক ধরিয়া এই পোকাগুলি অল্পে অল্পে বাড়িতে থাকে আর বারবার খোলস বদলায়। তারপর পোকাটা শুকাইয়া কেমন গুটি পাকাইয়া যায়—তাহাতে তামাটে রং ধরিয়া আসে। এইভাবে আরও কয়েকদিন থাকিলেই সেই গুটির ভিতর হইতে আস্ত মাছিটা বাহির হইয়া আসে। তারপর তাহার চেহারার আর কোনও পরিবর্তন হয় না। জন্মিবার সময় তার শরীরটি যতটুকু থাকে মরিবার সময়ও ঠিক ততটুকু। সাধারণত আমরা যেসব মাছি দেখি, তাহাদের ডিমগুলি দেখিতে নিতান্তই সাদাসিধা—তাহার গায়ে কোন কারিকরি নাই। কিন্তু এক একরকম মাছি আছে তাহারা অতি আশ্চর্যরকমের সুন্দর ডিম পাড়ে।

ছারপোকা এবং মশা কামড়াইতে জানে, মাছির সে বিদ্যা নাই। সেইজন্য মানুষে ছারপোকা ও মশা তাড়াইতে যত ব্যস্ত হয়, মাছির ভয়ে ততটা ব্যস্ত হয় না। কিন্তু উৎপাত হিসাবে মাছিকে কাহারও চাইতে কম বলা চলে না। মেসোপটেমিয়ার যেখানে ইংরাজদের সহিত তুর্কীদের লড়াই চলিতেছে সেখানে গ্রীষ্মকাল আসিলেই মাছির উপদ্রব এমন সাংঘাতিক হইয়া উঠে যে, কেবল মাছি মারিবার জন্যই হাজার হাজার টাকা খরচ করিয়া নানারকম কল-কৌশল খাটাইতে হয়। মাছি যেখানে হাজারে হাজারে লাখে লাখে ঘুরিয়া বেড়ায় সেখানে কেবল হাতে মারিয়া তাহাদের কত শেষ করিবে? নানারকম ফাঁদ পাতিয়া বিষাক্ত খাবারের লোভ দেখাইয়া একেবারে দলে দলে তাহাদের বংশকে বংশ উজাড় করিতে হয়। তা না হইলে সে দেশে মানুষের তিষ্ঠান দায় হয়।

ফড়িং

ফড়িং পাওয়া যায় না, এমন দেশ খুব কমই আছে। যে-দেশে লতাপাতা আছে আর সবুজ মাঠ আছে, সে দেশেই ফড়িং পাওয়া যাবে। নানান দেশে নানানরকমের ফড়িং, তাদের রং এবং চেহারাও নানানরকমের, কিন্তু একটি বিষয়ে সবারই মধ্যে খুব মিল দেখা যায়; সেটি হচ্ছে লাফ দিয়ে চলা। এই বিদ্যায় ফড়িঙের একটু বিশেষরকম বাহাদুরি দেখা যায়, কারণ অন্যান্য অনেক পোকার তুলনায় ফড়িঙের চেহারাটি বেশ বড়ই বলতে হবে। আরও অনেক বড় পোকা আছে, যেমন আরশুলা, যারা একটু-আধটু লাফাতে পারে; কিন্তু তাদের লাফানির চাইতে উড়বার ঝোঁকটাই বেশি। ফড়িঙের যদিও ডানা আছে, কিন্তু সেটা সে ঠিক উড়বার জন্য—অর্থাৎ বাতাস ঠেলে উঠবার জন্য—ব্যবহার করে না। তাতে কেবল লাফ দিবার সময় বাতাসে ভর করে শরীরটাকে কিছু হালকা করার সুবিধা হয় মাত্র। ফড়িঙের শরীরটা দেখলেই বোঝা যায় যে, ঐরকম লাফ দিবার আয়োজন করেই তাকে গড়া হয়েছে। তার শরীরের ভিতরটা বাতাসে পোরা বললেও হয়—অন্য কোন পোকার মধ্যে এতগুলা ফাঁপা নল প্রায়ই দেখা যায় না। শরীরটা হালকা হওয়ায় যে লাফাবার সুবিধা হয় তা সহজেই বুঝতে পার। তার উপর ফড়িঙের পা দুটিতেও একটু বিশেষরকমের কেরামতি আছে। পায়ের আগাটি যেন বঁড়শির মতো বাঁকান। লাফাবার সময় সে ঐ বঁড়শি দিয়ে সুবিধামত গাছের ডালপালা কিছু একটা বেশ করে আঁকড়িয়ে ধরে। তারপর পা-টাকে জোর করে গুটিয়ে হঠাৎ টান ছেড়ে দেয়, আর সেইসঙ্গে সমস্ত শরীরটা ধনুকের ছিলার মতো ছিট্‌কিয়ে যায়। এরকম সাংঘাতিকভাবে লাফাতে গিয়ে যাতে হাত পা জখম না হয় তার জন্যও ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথম ব্যবস্থা, তার ডানা দুটি। লাফ দিয়ে পড়বার সময় ঐ ডানার উপর ভর দিয়ে সে লাফানির ঝুঁকিটা সামলিয়ে নেয়। তারপর সামনের পা-গুলোর আগায় যে পুঁটুলি রয়েছে ঐগুলোতে পড়বার চোট্ কমিয়ে দেয়। ফড়িঙের ইংরাজি নামটিতেও তার ঐ লাফানির পরিচয় পাওয়া যায়। (Grass hopper অর্থাৎ "যিনি ঘাসের উপর লাফিয়ে বেড়ান")।

মাঠের মধ্যে ফড়িঙের 'চির্-চির্' শব্দ অনেক সময়ে খুব স্পষ্ট শোনা যায়। এই

আওয়াজটি তার গলা থেকে বেরোয় না—তার যন্ত্রটি থাকে ডানার মধ্যে। ডানা দুটির গোড়ার 'উকা'র মতো খড়্‌খড়ে দুটি সরু তাঁতের উপর একটি পাতলা 'চামড়া'র ছাউনি। ঐ তাঁতের ঘষাঘষিতে আওয়াজ হয় আর ওই পাতলা চামড়াটিতে সেই আওয়াজটাকে বাড়িয়ে তোলে। এইরকম আওয়াজ করে তাদের কি লাভ হয়? একটা লাভ হয় এই যে তারা এমনি করে পরস্পরকে ডাকতে পারে। ভাল খাবার পেলে বা খুব ফূর্তি হলেও তারা এইরকম করে ডাকে; ভয় পেলে চুপ করে থাকে। আশ্চর্য এই যে, স্ত্রী ফড়িংদের আওয়াজ নাই; কিন্তু তাদের 'কান' খুব ভাল।

'কান' বললাম বটে, কিন্তু একটা ফড়িং ধরে যদি তার কান খুঁজতে যাও, হয়ত খুঁজেই পাবে না; কারণ কানটি থাকে তার হাঁটুর কাছে না হয় পিঠের উপর! কানেরও আবার নানান রকম বেরকম আছে। কোনটা একেবারে খোলা দুটো পাতলা চামড়ার খোলা, কোনটা গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে বসান—কোনটার মুখে রীতিমত ঢাকনি দেওয়া।

বর্মধারী জীব

কচ্ছপ কুমির আর সজারু, এই তিন বর্মধারী জন্তুকে বোধহয় তোমরা সকলেই দেখেছ। এদের তিন জনের বর্ম তিনরকমের। কচ্ছপের খোলাটা যেন তার জ্যান্ত বাসা—তার মধ্যে মুখ হাত পা গুটিয়ে যখন সে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে তখন দুর্গের মতো বর্মটাকেই দেখতে পাই—বর্মধারী যিনি, তাঁকে আর খুঁজেই পাওয়া যায় না। কুমিরের বর্মটা যথার্থই বর্ম, অন্য জন্তুর নখ দাঁতের অস্ত্র থেকে কেবল শরীরটাকে বাঁচানই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু সজারুর বর্ম কেবল বর্ম নয়, সেটা একটা সাংঘাতিক অস্ত্রও বটে।

কচ্ছপ আর কুমিরের কথা তোমরা অনেক শুনেছ, কিন্তু তাদের আশ্চর্য বয়সের কথা অনেকেই জানে না। হাতির বয়সের কথা শুনতে পাই, তারা নাকি অনেক বৎসর বাঁচে। কিন্তু এই দুই জন্তু দুশ আড়াইশ বৎসর যে বাঁচে তাতে কোন সন্দেহ নেই, চার-পাঁচশ বৎসর পর্যন্ত তাদের বয়স হয়—এ কথা প্রাণিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরাও বিশ্বাস করে থাকেন। এক ধরনের কচ্ছপকে বলে Giant Tortoise অর্থাৎ রাক্ষুসে কচ্ছপ। এরা এক একটি তিন, সাড়ে তিন হাত পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। আগে পৃথিবীর নানা জায়গায় এরকমের কচ্ছপ পাওয়া যেত, কিন্তু পেটুক মানুষের অত্যাচারে তাদের বংশ এমনভাবে লোপ পেয়ে এসেছে যে, এখন দু-একটি সমুদ্রের দ্বীপ ছাড়া এদের আর কোথাও খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এইরকম আর একটি রাক্ষুসে কচ্ছপকে মরিশাস্ দ্বীপে রাখা হয়েছে। সেই সময়ে তার বয়স যে খুব কম হলেও পঞ্চাশ বৎসর ছিল, তাতে আর সন্দেহ নেই—সুতরাং এখন তার দুশ বৎসর পার হয়ে গেছে। লন্ডনের চিড়িয়াখানায় একটা থুড়থুড়ে বুড়ো কচ্ছপ কয়েক বৎসর হল মারা গিয়েছে—তার বয়স আরও অনেক বেশি হয়েছিল— কেউ কেউ বলেন ৪০০ বৎসরেরও বেশি। কুমিরও অনেকদিন বাঁচে—বয়স নিয়ে কচ্ছপের সঙ্গে তার রেষারেষি হলে কে হারে কে জেতে সে কথা বলা শক্ত।

কুমিরের বর্মটি কতকগুলি চামড়ার চাক্‌তি মাত্র। চামড়ার মধ্যে মোটা মোটা কড়া জমিয়ে বর্মটি তৈরি হয়েছে। কিন্তু কচ্ছপের খোলাটি শুধু চামড়া নয়—মেরুদণ্ডের সঙ্গে পাঁজরের হাড় আর গায়ের চামড়া একসঙ্গে জুবড়িয়ে তাকে শিঙের মতো মজবুত করে বর্মের এই অদ্ভুত সৃষ্টি হয়েছে। আর সজারুর বর্মটি তৈরি হয়েছে তার লোম দিয়ে। লোমের গুচ্ছ মোটা আর মজবুত আর ধারাল হয়ে সাংঘাতিক কাঁটার বর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সজারুরা নিশাচর জন্তু। মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে তারা সারাদিন ঘুমিয়ে থাকে আর রাত্তিরে বেরিয়ে ফল-মূল গাছের পাতা খেয়ে বেড়ায়। গর্তের মধ্যে নরম ঘাস আর কচি পাতা দিয়ে তারা বাসা বানায়। সজারুর যখন ছানা হয় তখন ছানার কাঁটাগুলো থাকে ঘাসের মতো নরম, কিন্তু খুব অল্পদিনের মধ্যেই সেগুলো বেশ শক্ত হয়ে ওঠে। সজারুর ল্যাজটা যেন একটা কাঁটার তোড়া, চলবার সময় তাতে খড়্‌মড় করে শব্দ হতে থাকে। কোন কোন সজারু খুব চট্‌পট্‌ গাছে চড়তে পারে, তাদের ল্যাজ প্রায়ই খুব লম্বা হয়। আবার কোন কোনটার কাঁটা বড় বড় লোমে ঢাকা।

কাঁটাওয়ালা জন্তু আরও অনেক আছে, কিন্তু সজারুর মতো এমন কাঁটার বাহার আর কারও নেই। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার একিড্‌না (Echidna) জন্তুটির একটুখানি চেহারা দেখলেই বুঝতে পারবে যে, এমন অদ্ভুত জানোয়ার সম্বন্ধে দু-একটা কথা না বললে নিতান্তই অন্যায় হবে। সাধারণ একিড্‌নাগুলি বেড়ালের চাইতে বড় হয় না; কিন্তু 'ধাড়ি একিড্‌না' বা Proechidna আরও অনেকখানি বড় হয়—বেশ একটি ছোটখাট ভালুকের মতো। অস্ট্রেলিয়ার প্লেটিপাস (Platypus) বা হংসচঞ্চুর মতো এরাও স্তন্যপায়ী অথচ ডিম পাড়ে—ডিম ফুটে যে ছানা বেরোয় তারা মায়ের দুধ খায়। এই জন্তুর শরীরটি ছোট ছোট কাঁটায় ভরা—ছোট ছোট কিন্তু খুব শক্ত আর ধারাল। মুখখানা ওরকম অদ্ভুত ছুঁচ্‌ল হবার কারণ এই যে, এরা পিঁপড়ে-খোর। চোঙার মতো মুখ, তার মধ্যে একটিও দাঁত নেই—আছে খালি একটি প্রকাণ্ড সরু জিভ—তাই দিয়ে লক্‌লক্‌ করে পিঁপড়ে চেটে খায়। সজারুর মতো এরাও নিশাচর—তাই দিনের বেলায় গর্ত খুঁড়ে লুকিয়ে থাকে।

পিঁপড়ে-খোর জন্তুদের অনেকেরই মুখ ঐ চোঙার মতো কিন্তু সকলের গায়ে বর্ম নেই। যাদের গায়ে বর্ম আছে, তাদের একটার নাম প্যাঙ্গোলিন (Pangolin)। এই জন্তুর বর্মের গড়ন ভারি অদ্ভুত; শিঙের মতো মজবুত চাকতি, সমস্তটি গায়ের উপর মাছের আঁশের মতো সাজান। পায়ের নখগুলি সাংঘাতিক মজবুত—তাই দিয়ে আঁচড়িয়ে তারা উইয়ের ঢিপি আর পিঁপড়ের বাসা ভেঙে ফাঁক করে ফেলে। তারপর জিভ দিয়ে টপাটপ্‌ উই পিঁপড়ে চেটে খায়। হঠাৎ তাড়া করলে বা ভয় পেলে এরা ডিগবাজি খেয়ে ফুটবলের মতো গোল পাকিয়ে যায়। এদের গায়ের ধারাল আঁশগুলি তখন চারিদিকে খাড়া হয়ে ওঠে। দক্ষিণ আমেরিকার আর্‌মাডিলো এ বিষয়ে আরো ওস্তাদ। সে যখন হাত পা গুটিয়ে শরীরটিকে লাড়ু পাকিয়ে ফেলে তখন কোথায় মুখ কোথায় হাত পা কিছুই বুঝবার যো থাকে না। তার বর্মের গড়নটি মাছের আঁশের মতো নয়—চিংড়ি মাছের খোলার মতো।

বর্মধারী জীবের কথা বলতে গেলে আরও অনেক জন্তুরই নাম করতে হয়। শামুক ঝিনুক প্রবাল হতে আরম্ভ করে কাঁকড়া চিংড়ি বিচ্ছু, এমনকি মাছ গিরগিটি পর্যন্ত প্রাণের দায়ে কত দেশে কতরকম বর্ম এঁটে ফেরে তার আর সীমা সংখ্যা নেই। হাজাররকম জীবজন্তু, তারা সবাই যখন বাঁচতে চায় তখন বাঁচবার উপায়ও তাদের করতে হয়। বাঁচবার

উপায় তিন রকম। এক হচ্ছে গায়ের জোরে অস্ত্রেশস্ত্রে প্রবল হয়ে শত্রুকে মেরে বাঁচা আর এক হচ্ছে দৌড়ের জোরে বা কলা-কৌশলে পালিয়ে আর লুকিয়ে বাঁচা; আর তৃতীয়টি হচ্ছে শরীরটিকে এমন জবরদস্ত করা যে, মারধর অত্যাচারের চোট সে সয়ে থাকতে পারে। বর্মধারী জীবেরা এই শেষ উপায়টিকে বাগাবার চেষ্টায় আছেন। এতে এক-একজন যে অনেকখানি ওস্তাদি দেখিয়েছেন তাতে সন্দেহ কি?

লড়াইবাজ জানোয়ার

এক-একজন মানুষ থাকে—কেবল সকলের সঙ্গে ঝগড়া বাধান হচ্ছে তাদের স্বভাব। কথায় কথায় যেমন তাদের মুখ চলে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে হাতও চলে। জানোয়ারদের মধ্যেও এইরকম বদমেজাজী জীবের অভাব নেই। যেসব বড় বড় জন্তুরা পেটের দায়ে অন্য জন্তু শিকার করে বেড়ায়, আমরা তাদের বলি শ্বাপদ জন্তু হিংস্র জন্তু। কিন্তু মানুষ যখন নিরীহ ছাগল ভেড়া বা হাঁস মোরগের গলায় ছুরি মেরে তাদের মাংস কেটে খায় তখন আমাদের মনেই হয় না যে আমরাও ঐ হিংস্র জন্তুর দলে। জানোয়ারদের মতো সাংঘাতিক নখ দাঁত বা শিং আমাদের না থাকতে পারে, কিন্তু তার বদলে যেসব ধারাল অস্ত্র আমরা ব্যবহার করি তাতে আমাদের হিংসা-বৃত্তির পরিচয়টা খুব ভালরকমেই পাওয়া যায়।

জানোয়ারদের মধ্যে যারা আমিষভোজী, অন্য জন্তুর মাংস না খেলে যাদের চলে না তারাই যে কেবল হিংস্র হয় তাও নয়। যারা নিরামিষ খায়, যেমন হাতি, গণ্ডার, বুনো মহিষ বা বরাহ—তাদের মেজাজও সব সময় নিরীহ তপস্বীদের মতো হয় না। আর সে মেজাজ বিগড়ালে বেশ বোঝা যায় যে সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারে তারাও কম ওস্তাদ নয়। মহিষের শিং, বরাহের দাঁত, গণ্ডারের খড়্গ, অস্ত্র হিসাবে এগুলি কোনটাই বড় কম নয়। হাতিরও দাঁত আছে—কিন্তু তার চাইতে তার ঐ গোদা পায়ের চাপুনিটাই বোধহয় বেশি মারাত্মক।

ছোটখাট জন্তুদের আমরা হিংস্র জন্তু বলে বড় একটা গ্রাহ্য করি না, কারণ তাদের দিয়ে আমাদের বিশেষ কোনও অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু তাদের সমান জন্তুদের কাছে তারাও বড় কম ভয়ানক নয়। এমন যে নিরীহ কাঠবেড়ালী যে সারাদিন অন্য জন্তুর ভয়ে ভয়ে থাকে, কোথাও একটু শব্দ পেলেই চমকিয়ে ছুটে পালায়, ছোট ছোট পাখির বাসায় ডিমের সন্ধান পেলে সেও একজন রীতিমত অত্যাচারী হয়ে উঠতে জানে। হঠাৎ তাড়া খেলে বা ভয় পেলে ইঁদুর বা ছুঁচোর মতো ছোট জন্তুও বেশ মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। সেরকম অবস্থায় তারা মানুষকেও কামড়াতে ছাড়ে না। আর সে কামড়ও বড় সামান্য নয়। ছুঁচোর কামড় খেয়ে মানুষকে কখন কখন মাসের পর মাস জ্বরে ভুগতে দেখা গিয়েছে।

কিছুদিন আগে এক সাহেব সাইকেল চড়ে বিলাতের এক পাড়াগেঁয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। সন্ধ্যার সময় পথের মাঝে নেমে তিনি সাইকেলের আলো জ্বালাচ্ছেন, এমন

সময় ছোট্ট একটা বিলাতী বেজি ঘুরতে ঘুরতে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত। সাহেবের কি খেয়াল হল, তিনি রাস্তা থেকে একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে বেজিটার গায়ে ছুঁড়ে মারলেন। মারতেই বেজিটা অদ্ভুত কিচ্‌মিচ্‌ শব্দ করে উঠল; আর তাই শুনে কোত্থেকে বারো চোদ্দটা বেজি এসে একসঙ্গে সাহেবকে আক্রমণ করে বসল। তারা ক্রমাগত লাফ দিয়ে সাহেবের গলার টুঁটি কামড়ে ধরবার চেষ্টা করতে লাগল। সাহেব একটুক্ষণ আত্মরক্ষার চেষ্টা করে তারপর প্রাণের ভয়ে সাইকেল চড়ে সেখান থেকে চম্পট দিলেন। বেজিগুলো তবু প্রায় দেড়মাইল পথ সাইকেলের পিছন পিছন তাড়া করে এসেছিল। হঠাৎ কি করে যে বেজিদের এতখানি তেজ আর সাহস হয়ে উঠল তার কোনও কারণ পাওয়া যায় না; কারণ, সাধারণত তারা মানুষের শব্দ পেলেই ছুটে পালায়।

বেজিগুলো ইচ্ছা করলে খুব সহজেই সাহেবের পা কামড়াতে পারত, কিন্তু তা না করে তারা গলায় টুঁটির দিকেই বারবার তেড়ে উঠছিল; যেন তারা জানে যে ঐখানে কামড়ালে জখমটা হবে সাংঘাতিক। এরকম প্রায়ই দেখা যায় যে শিকারী জন্তুরা অন্য জন্তু মারবার সময় তাকে এমনভাবে মারে যাতে সে সহজেই কাবু হয়। 'হেজহগ্' (Hedgehog) বা কাঁটাচুয়ার সারা গায়ে কাঁটা, তার গায়ে কোথাও কামড় দেবার যো নেই; কিন্তু তার গলার নীচটাতে কাঁটা নেই, সেখানে কামড় দিলে বেচারা আর আত্মরক্ষা করতে পারে না। ইঁদুরেরা তাই সুযোগ বুঝে তার গলায় কামড় বসাবার চেষ্টা করে ভুলেও কখনো পিঠের উপর কামড় দিতে যায় না। বেজি যখন সাপের সঙ্গে লড়াই করে তখন তার দৃষ্টি থাকে সাপের ঘাড়ের কাছে, ঠিক ফণাটির পিছনে; সেখানে কামড় দিয়ে ধরলে সাপ আর উলটে ছোবল মারতে পারে না।

ছোট ছোট পোকামাকড়েরা পর্যন্ত এইসব সংকেত জানে। তোমরা বোল্‌তা আর মাকড়সার লড়াই দেখেছ? সে এক অদ্ভুত জিনিস। মাকড়সা জানে যে বোল্‌তার একটি কামড় খেলে তার আর রক্ষা নেই, তাই সে কেবলই জালের আড়াল দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। সেই জালের ভিতর থেকে সবগুলি পা একসঙ্গে বার করে সে বোল্‌তাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করে, কিন্তু কখনো তেড়ে গিয়ে আক্রমণ করবার সাহস পায় না। বোল্‌তাও বারবার ভন্‌ভন্‌ করে জালের কাছে পর্যন্ত তেড়ে এসে আবার পালিয়ে যায়, কারণ সেও জানে যে ওই জালের মধ্যে একবার আটকা পড়লে তার আর বের হবার উপায় নেই।

কেবল যে অন্য জন্তুদের সঙ্গেই জানোয়ারদের লড়াই বাধে, তা নয়। ছাগলের লড়াই, বেড়ালের ঝগড়া কিংবা কুকুরের কাম্‌ড়াকাম্‌ড়ি তোমরা সকলেই দেখেছ। কাগে কাগে কিংবা চড়াইয়ে চড়াইয়ে ঝগড়াও সর্বদাই দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের ঘরে একটা ধাড়ি টিকটিকি আছে, সন্ধ্যার পর দেয়ালের বাতির কাছে যেসব পোকা বসে সে তাদের ধরে ধরে খায়। অন্য টিকটিকিকে ঘরের ত্রিসীমার মধ্যে আসতে দেখলে সে তাকে তাড়া করে যায়, পাছে সে এসে তার খাবারে ভাগ বসায়। খাবারের জন্যে জানোয়ারদের মধ্যে রেষারেষি ত চলেই, বিয়ের জন্যেও রেষারেষি চলে। মনে কর, জঙ্গলে একজন পরমাসুন্দরী গণ্ডারনী আছেন আর দুটি ছোকরা গণ্ডার আছে, তাদের দুজনেরই তাঁকে ভারি পছন্দ। এখন উপায়? উপায় হচ্ছে দস্তুরমত লড়াই করে এর মীমাংসা করে নেওয়া। এরকম লড়াই হরিণদের মধ্যেও চলে, অন্যান্য অনেক জন্তুদের মধ্যেও চলে। পাখিদের মধ্যে ত খুবই চলে।

এ ছাড়া এমন অনেক জন্তু আছে যারা কেবল লড়াইয়ের খাতিরেই লড়ে। যেসব দলছাড়া হাতি একলা একলা জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, তাদের স্বভাবটা অনেক সময়েই এইরকম হয়। বুনো বরাহদের স্বভাবটাও নাকি অনেকটা এই ধরনের। আর, একরকম ভিমরুলের কথা আমি জানি, সে থাকে খাসিয়া পাহাড়ে, তার গায়ে ডোরা ডোরা দাগ; তাকে কিছু না বললেও সে তেড়ে এসে বঁড়শির মতো হুল দিয়ে কামড় বসিয়ে দেয়। আমার মাথায় ভাল করে কামড়াতে পারেনি, তবু তিনদিন ব্যথার চোটে আমার ঘুমান মুশকিল হয়েছিল।

নিশাচর

নিশাচর বলে তাদের যারা রাত জেগে চলাফেরা করে, অর্থাৎ আহার খোঁজে। নিশাচর জন্তুদের মধ্যে একটির নাম তোমরা সকলেই বলতে পারবে, সেটি হচ্ছে 'প্যাঁচা'।

নিশাচরেরা রাত্রে আহার করে কেন? তার নানা কারণ আছে। প্রথমত যারা শত্রুর ভয়ে দিনের আলোতে বেরুতে সাহস পায় না, রাত্রে অন্ধকারে তাদের গা ঢাকা দিয়ে চলবার সুবিধা হয়। যেমন আফ্রিকার 'কাকাপো' অথবা 'প্যাঁচাটিয়া'। এদের ডানা ছোট বলে ভাল করে উড়তে পারে না; দিনের বেলা বেরোলেই অন্য পাখিরা ঠুক্‌রিয়ে অস্থির করে তোলে। ইঁদুর জাতীয় নানারকম নিরীহ জন্তু আছে, তারাও এরকম শত্রুর ভয়ে সারাদিন লুকিয়ে থাকে, রাত্রে শিকারের খোঁজে বেরোয়।

কোন কোন জন্তু আছে তাদের শরীরের গঠন এমন যে তারা দিনের আলো, রোদ বা গরম সইতে পারে না। প্যাঁচার চোখ এমন অদ্ভুত যে সে আলোর দিকে ভাল করে তাকাতেই পারে না, সহজেই চোখ ঝলসে যায়। সাপ ব্যাঙ প্রভৃতি যেসব জন্তুর রক্ত ঠাণ্ডা, তারা রোদে বেরোলে শরীরের রস শুকিয়ে যায়। তাই তারা সারাদিন ঝোপে জঙ্গলে ছায়ার মধ্যে থাকতে চায়।

আর একদল নিশাচর আছে, যারা রাত্রে বেরোয় ভালরকম শিকার জোটে বলে। বাঘ সিংহ প্রভৃতি বড় বড় মাংসখোর জন্তুরা এই কারণেই অনেক সময় নিশাচর হয়। সন্ধ্যার পর নানারকম পোকামাকড় বেরোয় তাই পোকা-খোর জন্তুরাও ঐ সময়ই খাবার আশায় ঘুরে বেড়ায়। সন্ধ্যার সময় যে চামচিকারা বা 'নাকাটি' পাখিরা ব্যস্ত হয়ে আকাশময় ছুটাছুটি করে, সেটাও তাদের ভোজের আনন্দ। ভাল করে দেখলেই বোঝা যায় যে তারা উড়তে উড়তে পোকা ফড়িং খেয়ে বেড়াচ্ছে।

'লেমার' বা ক্ষুদে বানরদেরও অনেকেই এই দলের মধ্যে পড়ে। তারাও রাত হলেই পোকামাকড় খুঁজে বেড়ায়। রাত্রে আলোর কাছে টিকটিকির পোকা শিকারের উৎসাহ তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। রাত্রে আলো দেখে যত পোকা এসে জড়ো হয় দিনের বেলায় একসঙ্গে তত পোকা পাওয়া শক্ত। টিকটিকির ভোজটাও তাই সন্ধ্যার পরে জমে ভাল।

নিশাচর জন্তুদের প্রায় সকলের মধ্যেই একটি অভ্যাস দেখা যায়—সেটি হচ্ছে নিঃশব্দে চলা। প্যাঁচার শরীরটি ত নেহাৎ ছোট নয়, সে উড়তেও পারে বেশ; অথচ উড়বার সময় তার ডানা ঝাপটার শব্দ শুনতে পাওয়া যায় না। রাত্রে অন্ধকারে দেখতে হয় বলে তাদের

চোখ দুটোও তেমনি করে তৈরি। প্রায়ই দেখা যায় নিশাচর জন্তুদের চোখ প্যাঁচার মতো বড় আর গোল গোল হয়। সেইজন্যে অনেক সময় তাদের দেখতেও অদ্ভুত দেখায়। যেসব ক্ষুদে বানরদের কথা আগে বলেছি, তাদেরও চোখ মুখ আর চলাফেরা এমন অদ্ভুত গোছের হয় যে দেখলে অনেক সময় ভয় হয়। আরেকরকম বানর আছে, তার নাম 'টার্সীয়ের'। যে-দেশে এর বাড়ি সেখানকার লোকেরা একে 'ভূত বানর' বলে। এর সমস্ত কপালজোড়া বড় বড় চোখ, আর রোগা রোগা কাঠির মতো হাত পা। গাছের আড়াল থেকে হঠাৎ উঁকি মেরেই রবারের মতো নিঃশব্দে লাফ দিয়ে আবার দশ হাত দূর থেকে উঁকি মারা—এই হচ্ছে এর চালচলনের ধরন। কারও কোন অনিষ্ট করে না, কেবল পোকামাকড় খেয়ে থাকে অথচ লোকে মিছামিছি তাকে ভূতের মতো ভয় করে। তার একটা কারণ সে নিশাচর।

আমাদের পুরাণে রাক্ষসদের নামও নিশাচর। তারাও নাকি দিনের আলোর চাইতে রাত্রের অন্ধকারটাই বেশি পছন্দ করে। আর চোর ডাকাত যারা পরের বাড়িতে সিঁদ কেটে ঘুমন্ত মানুষের সর্বনাশ করে, তাদেরও 'শিকার' করবার সুবিধা হয় রাত্রে। আজকালকার সভ্য মানুষ রাতকে দিন করে রাখে। রাত্রেও হাজার আলো জ্বালিয়ে দিয়ে তার কলকারখানা, রেল, স্টিমার চালাতে হয়। সুতরাং মাঝে মাঝে ভদ্র মানুষকেও কাজকর্মের জন্য নিশাচর হতে হয়। ভোরবেলা যে খবরের কাগজটি পড় তার জন্যে যে কত লোকের রাত জেগে খাটতে হয় তা কখন ভেবে দেখেছ কি? আর রেলে স্টিমারে ড্রাইভার গার্ড প্রভৃতি কতজনকে যে দিনের পর দিন রাতমজুরি খাটতে হয় তারাও একরকম নিশাচর বৈকি!

নাকের বাহার

মানুষের নাকের প্রশংসা করতে হলে তিল ফুলের সঙ্গে, টিয়া পাখির ঠোঁটের সঙ্গে গরুড়ের নাকের সঙ্গে তার তুলনা করে। কেউ কেউ আবার বলেন শুনেছি, 'বাঁশির মতো নাক'। কিন্তু মোটের উপর এ কথা বলা যায় যে, সকলের নাকেরই মোটামুটি ছাঁদটি সেই একঘেয়েরকমের; দো-নলা সুরঙ্গের মতো। কারো নলদুটি সরু, কারো বা মোটা, কারো চ্যাপটা, কারো উঁচু—কারো মাঝখানে ঢালু, কারো আগাগোড়াই ঢিপি—এইরকম সামান্য উনিশ-বিশ যা একটু তফাৎ হয়। কারো কারো নাক যদি হাতির শুঁড়ের মতো লম্বা হত কি গণ্ডারের মতো খড়্গাধারী হত, অথবা আর কোন উদ্ভট জানোয়ারের মতো হত, তাহলে বেশ একটু রকমারি হতে পারত।

হাতির শুঁড়টাই যে তার নাক এ কথা তোমরা নিশ্চয়ই জান। হাতির পরেই যে জন্তুটির নাম করা যায়, তার নাম টেপির; এর নাকটিও শুঁড় হতে চেয়েছিল, কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারেনি। তার পরেই মনে পড়ে পিঁপড়ে খোরের কথা, এরও একটা শুঁড় আছে কিন্তু সেটা শুধু নাক নয়, নাকমুখ দুই মিলে লম্বা হয়ে ওরকম হয়ে গেছে। কুমিরেরও ঠিক তাই। আর একটি আছে চোঙামুখ, তার পরিচয়ও তোমরা সন্দেশে পেয়েছ ('সমুদ্রের ঘোড়া')। তারপর দুরকমের ছুঁচো আছে, তার একটির বেশ স্পষ্টরকম শুঁড় গজিয়েছে, আর একটি কেবল শুঁড়ে সন্তুষ্ট নয়, তার নাকের আগাটি হয়েছে ঠিক ফুলের মতো। এই সৌখিন ছুঁচোটির গায়ের গন্ধ কিন্তু ফুলের মতো একেবারেই নয়। তার চেয়ে জমকালো নাকের কথা যদি বলতে হয় তবে পুষ্পনাসা বাদুড়ের কথাটা নিতান্তই বলা উচিত। পর্দার পর পর্দা গোলাপফুলের পাপড়ির মতো সাজিয়ে তার উপরে যেন তিলক চন্দন এঁকে নাকটিকে তৈরি করা হয়েছে। এত ঘটা করে নাকের বাহার ফোটাবার উদ্দেশ্যটা কি, মুখের 'সৌন্দর্য' বাড়ান না শত্রুকে ভয় দেখান, তা আমি জানি না।
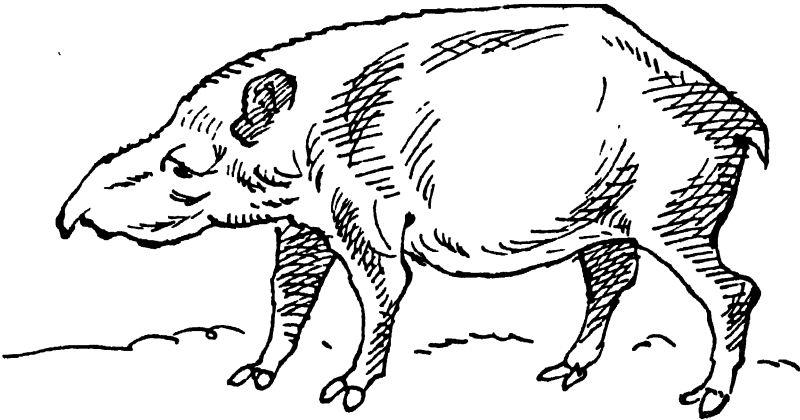
পুষ্পনাসার পরে আসে হংসচঞ্চু, তার নাকমুখ হাঁসের ঠোঁটের মতো চ্যাপটা। আর রয়েছে ম্যানড্রিল বাঁদর। এর রংটিই হচ্ছে এর আসল বাহার। টক্‌টকে লাল নাক, তার

দু-পাশে নীলরঙের টিব্‌লি, তার উপর চমৎকার কারুকার্য—যারা কলকাতায় আছ তারা চিড়িয়াখানায় গেলেই একবার স্বচক্ষে দেখে আসতে পার। ম্যান্‌ড্রিলের সঙ্গে মনে পড়ে নাকেশ্বর বানর। এর নাক সম্বন্ধে আর বেশি কথা বলবার দরকার নেই, ছোটখাট বেগুনের মতো নাকটি। বাঁদরের খাঁদা নাকের দুর্নাম সকলেই করে, কিন্তু এই নাকটি খাঁদা না হলেও তাতে তার সুনাম বাড়বে কিনা সন্দেহ।

ব্যাং যখন হাতির উপর রাগ করে বলেছিল "বড় যে ডিঙোলি মোরে"—তখন হাতি তাকে 'থ্যাব্‌ড়ানাকী" বলে গাল দিয়েছিল। হাতির গালটা খুব লাগসই হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু ব্যাঙের বংশেও যে সকলেরই থ্যাব্‌ড়া নাক, তা নয়; এমন ব্যাংও আছে যাদের নাকটি চড়াই পাখির ঠোঁটের মতো দিব্যি চোখাল।

কোন কোন জন্তু আবার শুধু নাকটাকে নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। তারা নাকের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র জুড়ে বেড়ায়। গণ্ডারের খড়্গাটি থাকে তার নাকের উপরে। আফ্রিকায় একরকম বরাহ আছে তার নাম বাবিরুসা, তার নাকের দুপাশে চামড়া ফুঁড়ে দুই জোড়া দাঁত শিঙের মতো উঁচু হয়ে থাকে। তলোয়ার মাছের নাকের ডগায় যে অস্ত্রটি বসান থাকে তাতে বাস্তবিকই তলোয়ারের কাজ হয়। করাতি মাছের তলোয়ারটির গায়ে আবার করাতের মতো দাঁত কাটা থাকে। বঁড়শিবাজ মাছের কথা শুনেছ—তারা নাকের আগায় বাঁকা ছিপের মতো লম্বা নোলক ঝুলিয়ে রাখে। উদ্দেশ্য, অন্য মাছকে ভুলিয়ে এনে তার ঘাড় ভেঙে খাওয়া।

কোন কোন জন্তুর নাকটা যে কোথায় সেটা হঠাৎ খুঁজে পাওয়াই শক্ত। তিমি মাছের মাথার উপর যেখানে তার চোখ থাকবার সম্ভাবনা মনে হয় সেখানে তার নাক থাকে। কাঁটাল গিরগিটির গা-ভরা উবড়ো খাবড়ো শিঙের মতো কাঁটার ঝোপ—তার মধ্যে তার নাক মুখ চোখ অনেক সময়েই বেমালুম লুকিয়ে থাকে। আর হাতুড়িমুখো হাঙরের চেহারা ত আগাগোড়াই উলটারকম। একটা দুমুখো হাতুড়ির মতো তার মাথা, সেই হাতুড়ির দুই মাথায় দুটি চোখ। আর নাকটা হচ্ছে হাতুড়ির মাঝামাঝি—হাতুড়ির ডাণ্ডাটা যেখানে বসান থাকে সেইখানে।

এখন তোমরা বল, এর মধ্যে কার নাকের বাহার বেশি।

জানোয়ারের প্রবাস যাত্রা

গ্রীষ্ম আসিতেছে—তোমরা কতজনে হয়ত এখন হইতেই তাহার কথা ভাবিতেছ। কবে ছুটি হইবে, তারপর কে কোথায় যাইবে, কেমন করিয়া সময় কাটাইবে ইত্যাদি কত কথা। গ্রীষ্মের সময়ে যে দেশে গরম কম সেই দেশে যাইতে ইচ্ছা করে, তাই লোকে সিমলা যায় দার্জিলিং যায় শিলং যায়। এরকমে দেশ ছাড়িয়া পলাইবার ইচ্ছা কেবল যে আমাদেরই হয় তাহা নয়, পশুপক্ষী সকলেরই মধ্যে কিছু কিছু দেখা যায়।

শীতের দেশের পাখি যাহারা হিমালয়ের উত্তরে সারা বছর কাটায়, তাহারা প্রতি বছর শীতকালে আমাদেরই গরম দেশে হাওয়া খাইতে আসে। কোথায় হিমালয় আর

কোথায় এই বংলাদেশের দক্ষিণ; অথচ বছরের পর বছর কত হাঁস কত বক এই লম্বা পথ পার হইয়া আসে, আবার শীতের শেষে ঠিক নিয়মমত সময়ে হিমালয় ডিঙাইয়া দেশে ফিরিয়া যায়। কোথা হইতে যে তাহারা এ দেশের সন্ধান পায়, আর কেমন করিয়াই বা এতখানি পথ চিনিয়া আসে তাহা কে বলিতে পারে? এরকম যাওয়া-আসা পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায়। গরম দেশের পাখি গ্রীষ্মের ভয়ে ঠাণ্ডা দেশে চলিয়াছে; আবার ঠান্ডা দেশের পাখি শীতের তাড়ায় গরম দেশে শীতকাল কাটাইতেছে। আশ্চর্য এই যে, এ সকল পাখি এমন ভরসার সঙ্গে হিসাবমত চলাফিরা করে যে, মনে হয় যেন পথঘাট সবই তার জানা আছে। যেখানে পথঘাটের কোন চিহ্ন নাই, রাস্তা চিনিবার কোন উপায়ও নাই, সেই অকূল সমুদ্রের মধ্যে দিয়াও তাহারা নির্ভয়ে পথ বুঝিয়া চলে। মেঘ বৃষ্টি কুয়াশায় অন্ধকারে কিছুতেই তাহারা পথ ভুলে না। এইরূপে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পাখি মাস ঋতুর হিসাব রাখিয়া আকাশে পাড়ি দিয়া ফিরে।

এ ত গেল পাখির কথা। বড় বড় ডাঙার জন্তুও যে এইরূপে দল বাঁধিয়া প্রবাস যাত্রা করে, এরকম ত কত সময়েই দেখা যায়। জেব্রা জিরাফ হাতি হরিণ বুনো মহিষ ইহারা সকলেই সময়মত এ-বন ও-বন ঘুরিয়া বেড়ায়। আমেরিকার বাইসনগুলি যখন শীতের সময় বড় বড় দেশ পার হইয়া সবুজ বন আর তাজা ঘাসের সন্ধানে যাত্রা করে, তখন তাহারা একেবারে মাইলকে মাইল পথ জুড়িয়া চলে। এক সময়ে এই বাইসনের চলাফেরা আমেরিকায় সহজেই দেখা যাইত কিন্তু নানা কারণে এখন বাইসনের সংখ্যা খুব কমিয়া আসিয়াছে। তাহার মধ্যে মানুষের অত্যাচার খুব একটা বড় কারণ বলিতে হইবে। যখন বড় বড় দল গোঁ-ভরে নদীজল ভাঙিয়া মাঠ ঘাট পার হইতে থাকে তখন যাহারা দুর্বল, যাহারা চলিতে পারে না, তাহাদের অনেকে পিছে পড়িয়া যায়। সেই সময়ে নানারকম মাংসাশী জন্তু আসিয়া তাহাদের মারিয়া শেষ করে। কিন্তু তবু মানুষে অত্যাচার না করিলে এখনও তাহারা লাখে লাখে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইত! মানুষ কয় বৎসর সেখানে বসবাস না করিতেই পঞ্চাশ লক্ষ বাইসন খাইয়া হজম করিয়াছে। এক-এক দল লোক এক-এক বারে দশ বিশ হাজার বাইসন মারিয়া তবে ছাড়ে।

হাতিরা দল বাঁধিয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায় এরূপ অনেক সময়েই দেখা যায় কিন্তু সেটা কেবল খাবার সংগ্রহের চেষ্টা মাত্র; দেশ ছাড়িয়া লম্বা দৌড় দেওয়ার অভ্যাসটা তাহার নাই। অর্থাৎ আজকাল নাই। হাতির যাহারা পূর্বপুরুষ, তাহারা যে দেশ-বিদেশ বিচরণ করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে নাই, তাহার ঢের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংলন্ড বল, আমেরিকা বল, গ্রীষ্মপ্রধান আফ্রিকা বল আর শীতপ্রধান সাইবেরিয়া বল, সকল স্থানেই জীবন্ত হাতি না পাও, হস্তীজাতীয় জন্তুর কঙ্কালচিহ্ন পাইবে। আফ্রিকার উত্তরদিকে ইজিপ্টের মধ্যে বহু পুরাতন একটা শূকরের মতো জানোয়ারের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, পণ্ডিতেরা বলেন সেই নাকি হাতির একজন পূর্বপুরুষ। বিদেশ ভ্রমণ কাহাকে বলে তাহা এই জানোয়ারের বংশধরেরা খুব ভাল করিয়াই দেখাইয়া গিয়াছে। হাতির কথা বলিতে গেলে আপনা হইতেই ঘোড়ার কথা মনে আসে। হাতির মতো ঘোড়াও, অর্থাৎ তাহার পূর্বপুরুষও এক সময়ে পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। কিন্তু সে ঘোড়া আর আজকালকার মানুষের পোষা ঘোড়ায় আকাশ-পাতাল তফাৎ—ঠিক যেমন নেকড়ে বাঘ আর সৌখিন কুকুরের প্রভেদ।

হরিণের দল বাঁধিয়া চলার কথা বোধহয় সকলেই জান। বড় বড় শিংওয়ালা হরিণগুলি

যখন প্রকাণ্ড দল বাঁধিয়া নদী পার হইতে থাকে, সে নাকি এক চমৎকার দৃশ্য। নদীর এপার হইতে ওপার পর্যন্ত কেবল হরিণের মাথা আর হরিণের শিং। মনে হয় যেন জীবন্ত সাঁকো ফেলিয়া নদীর জলে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। পাঁচ দশ হাজার হরিণ এইরূপে একসঙ্গে বাহির হয়। প্রায়ই দেখা যায় তাহারা এমন নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পথে যাতায়াত করে যে, শিকারীরা আগে হইতে আন্দাজ করিয়া সময়মত ঠিক জায়গায় খাপ পাতিয়া বসিয়া থাকে।

কিন্তু জানোয়ারের বিদেশযাত্রার কথা বলিতে গিয়া যদি কেবল বড় বড় জানোয়ারের কথাই বলি, তবে আসল কথাটাই বাদ থাকিয়া যাইবে। এ সম্বন্ধে যত আশ্চর্য কথা শুনিয়াছি, তাহার মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে লেমিঙের কথা।

পাহাড়ের ধারে যেখানে সবুজ গাছ আর কচি পাতার অভাব নাই, সেইখানে গর্ত করিয়া লেমিং বাস করে। দেখিতে তাহারা ইঁদুরের চাইতে বড় নয়, চেহারাও সেইরকম— কেবল লেজ নাই বলিলেই হয়। আর বিশেষ আশ্চর্য তাহাদের বংশবৃদ্ধি। যেখানে আজ দেখিবে ক্বচিৎ দু-দশটা লেমিং দেখা যায়, বৎসরেক বাদে গিয়া দেখিবে লেমিঙের বংশে পাহাড় ছাইয়া ফেলিয়াছে। সংখ্যায় যত বাড়ে, তত তাহারা গাছপালা খাইয়া শেষ করে। শেষে এমন অবস্থা হয় যে, আর সবজি জোটে না। পাহাড়কে পাহাড় একেবারে নেড়া হইয়া যায়। তখন ঘোর দুর্ভিক্ষের মধ্যে ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তাহারা ব্যস্ত হইয়া বেড়ায়। মনে হয়, যেন তাহাদের মধ্যে খুব একটা আন্দোলন চলিয়াছে, যেন তাহারা কোনরূপে পরামর্শ স্থির করিতে পারিতেছে না। তারপর একদিন কি ভাবিয়া তাহারা একেবারে দলেবলে পাগলের মতো দেশ ছাড়িয়া পলাইতে আরম্ভ করে।
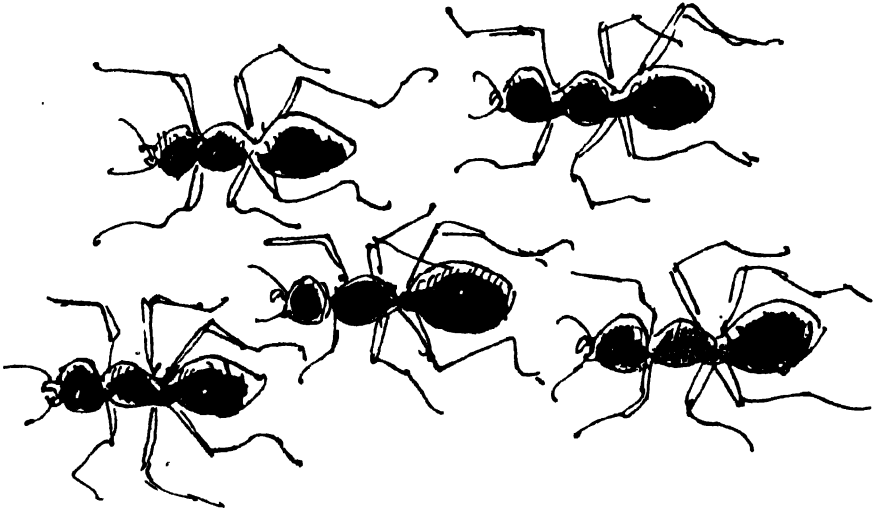
সে এক দেখিবার মতো জিনিস। লক্ষ লক্ষ ইঁদুর একেবারে পাহাড় কালো করিয়া নামিতে থাকে। কোথায় যাইবে, কোথায় খাবার মিলিবে সে খবর কেহ জানে না অথচ একেবারে নিরুদ্দেশ অন্ধের মতো সকলে হুড়াহুড়ি করিয়া বাহির হয়। বাধা মানে না,

বিপদ মানে না, সব হুড়্‌হুড়্‌ করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। ঠেলাঠেলিতে পায়ের চাপে কত হাজার হাজার মারা পড়ে, অনাহারে পথের ধারে আরও কত হাজার মরিয়া থাকে। আর নদীর স্রোতে, সমুদ্রের ঢেউয়ে কত যে প্রাণ হারায়, বুঝি তাহার আর সংখ্যা হয় না। যত রাজ্যের মাংসাশী শিকারী পাখি তখন চারিদিক হইতে আকাশ অন্ধকার করিয়া আসিতে থাকে। এমনি করিয়া অজস্র লেমিং বিনষ্ট হইবার পর যে-কয়টি অবশিষ্ট থাকে, তাহারাই আবার আর কোনখানে নূতন করিয়া বংশসৃষ্টির সূত্রপাত করে। ক্রমে আবার সেই সংখ্যাবৃদ্ধি, সেই দুর্ভিক্ষ আর সেই প্রলয়কাণ্ড!

ছোটর কথা বলিলাম, এখন আরও ছোটর কথা বলিয়া শেষ করি। পিঁপড়ারা যে বাসা ছাড়িয়া নূতন দেশের সন্ধানে বাহির হয়, ইহা সকল দেশেই দেখা যায়। এ বিষয়ে সকলের চাইতে ওস্তাদ যে পিঁপড়া তাহার নাম ড্রাইভার পিঁপড়া। আফ্রিকার জঙ্গলে ইহারা যখন ঠিক সৈন্যদলের মতো পরিষ্কার সার বাঁধিয়া চলিতে থাকে, তখন জানোয়ার মাত্রেই তাহাকে দেখিয়া পথ ছাড়িয়া পালায়।

আর পঙ্গপালের কথা কে না জানে? যে দেশের উপর দিয়া পঙ্গপাল যায়, সে দেশের চাষারা মাথায় হাত দিয়া হায় হায় করিতে থাকে। সে দেশে শস্য আর গাছের পাতা বড় বেশি অবশিষ্ট থাকে না। দশ বিশ মাইল লম্বা পঙ্গপালের দল ত সচরাচরই দেখা যায়; এক একটা দল এত বড় থাকে যে মাথার উপর দিয়া সপ্তাহখানেক উড়িয়াও তাহার শেষ হয় না। আফ্রিকায় এইরকম বড় বড় কাণ্ড প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। সেখানে পঙ্গপালের চাপে পড়িয়া টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়িয়া পড়ে, পুকুর বুজিয়া যায়, ড্রেন আটকাইয়া যায়, এমনকি রেলগাড়ি বন্ধ হইয়া যায়, এমনও দেখা গিয়াছে।

জানোয়ারের ঘুম

এক একজন মানুষের ঘুমাইবার ধরন দেখি এক একরকম। কেউ চুপচাপ নিরীহভাবে জড়োসড়ো হইয়া ঘুমায়, কেউ ঘুমের মধ্যে হাত পা ছুঁড়িয়া এপাশ-ওপাশ করিয়া অস্থির হয়, কেউ বা তুমুল নাসিকাগর্জনে রীতিমত যুদ্ধের কোলাহল সৃষ্টি করিয়া তোলে। মাঝে মাঝে এক একজন লোক দেখি, তাহাদের আর কোন ক্ষমতা থাক বা নাই থাক ঘুমাইবার শক্তিটা খুব আসাধারণ। যেখানে সেখানে উঠিতে-বসিতে তাহারা বেশ একটু ঘুমাইয়া লয়। পাখা-কুলি পাখা টানিতে টানিতে ঘুমাইয়া পড়ে, পণ্ডিত-মহাশয় পড়াইতে পড়াইতে ঢুলিতে থাকেন, আর ছোট ছোট ছেলেবা গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমের ঘোরেই হুঁ হুঁ করিতে থাকে। যুদ্ধের সময়ে ক্রমাগত কয়েকদিন রাত জাগিয়া এবং হয়রান হইয়া সৈন্যেরা যখন শিবিরে ফিরে, তখন অনেক সময়ে দেখা যায় তাহারা চলিতে চলিতেই ঘুমের ঘোরে মাতালের মতো টলিতেছে।

গল্পে শুনিয়াছিলাম, এক ব্রাহ্মণ পুরোহিত শিষ্যবাড়ি গিয়াছিলেন—শীতের সময়ে। সেখানে পাড়াগাঁয়ে শীতটা কিরকম হয় তাঁহার জানা ছিল না। তাই শিষ্য যখন লেপ দিতে চাহিল তখন তিনি বারণ করিয়া বলিলেন "আমার শীত-টিত কিছু লাগে না।" কিন্তু

'লাগেনা' বলিলেই ত আর শীত দূর হয় না; কাজেই রাত্রে যখন ঠাণ্ডা বাড়িয়াই চলিল তখন ঠাকুর মহাশয়ের দুরবস্থা কেমন হইয়াছিল, শিষ্য তাহার বর্ণনা দিয়াছেন অতি চমৎকার—

"প্রথম প্রহরে প্রভু ঢেঁকি অবতার
দ্বিতীয় প্রহরে প্রভু ধনুকে টংকার।
তৃতীয় প্রহরে প্রভু কুকুর কুণ্ডলী
চতুর্থ প্রহরে প্রভু বেনের পুঁটুলি।"

প্রথমে ঢেঁকির মতো সটান সোজা, তারপর ক্রমে ধনুকের মতো বাঁকান, তারপর কুকুরের মতো হাত পা গুটাইয়া জড়োসড়ো, তারপর শীতে তাল পাকাইয়া একেবারেই পুঁটুলির মতো গোল।

জানোয়ারদের ঘুমের কায়দা যদি দেখ, তবে ইহার চাইতেও অনেক বেশি রকমারি পাইবে। কেউ চোখ চাহিয়া ঘুমাইয়া থাকে। কেহ দিনে জাগিয়া রাত্রে ঘুমায়, কেহ প্যাঁচার মতো নিশাচর হইয়া সারারাত জাগিয়া কাটায়। আস্তাবলে ঘোড়াগুলি খাড়া দাঁড়াইয়া ঘুম দেয় কিন্তু মহিষ বা গণ্ডার কাদা জলে গলা পর্যন্ত ডুবাইয়া আরাম করিয়া ঘুমায়। চিড়িয়াখানায় কতগুলি বাঁদর দেখিয়াছি তাহারা দল বাঁধিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া একসঙ্গে বসিয়া ঘুমাইতেছে, আবার কোন কোনটা দেখি ঠিক মানুষের মতো শুইয়া হাত পা এলাইয়া ঘুমায়। একটা ওরাংওটান দেখিয়াছিলাম, সে একটি দোলনার উপর পেটের ভর দিয়া হাত পা ঝুলাইয়া ঘুমাইতেছিল। ইহাতে তাহার যে কিছুমাত্র অসুবিধা হইতেছে এরূপ বোধ হইল না। অনেক জন্তুই ঘুমাইবার সময় ঠাণ্ডা ছায়া খোঁজে, কিন্তু নদীর ধারের কুমিরগুলি দুপুর রোদে চড়ায় পড়িয়া হাঁ করিয়া ঘুমাইয়া থাকে। আবার কত জন্তু আছে, তাহারা শীতকালটা বা গ্রীষ্মের গরমটা কুম্ভকর্ণের মতো লম্বা ঘুম দিয়া কাটায়। ভল্লুক সাপ ব্যাং গেঁড়ি প্রভৃতি কোন কোন জন্তু এ বিদ্যায় বেশ পাকা ওস্তাদ; পরিষ্কার দিন হইলেই কাঠবিড়ালিগুলি রোদে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করে, কিন্তু ঠাণ্ডা মেঘলা দিন দেখিলে তাহারা অনেকেই গাছের ফাটলে কোটরে ঢুকিয়া ঘুমাইতে থাকে—আবার পরিষ্কার রোদ না হওয়া পর্যন্ত সে ঘুম ভাঙিতে চায় না। যে-সকল জন্তু এইরকম লম্বা লম্বা ঘুম দেয়, ঘুমের সময় তাহারা দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ না খাইয়া কাটায়। এই সময়ে তাহাদের শরীরটা প্রায় অসাড় ও নিষ্কর্মা হইয়া পড়ে—এমনকি নিশ্বাস প্রশ্বাসও অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া আসে। এইরকম লম্বা ঘুমের পর তাহারা যখন আবার বাহির হয় তখন দেখা যায় যে শরীরের চর্বি শুকাইয়া তাহাদের চেহারা অত্যন্ত কাহিল হইয়া পড়িয়াছে।

পাখিরা কেমন করিয়া ঘুম যায় দেখিয়াছ ত? কাকাতুয়া যেমন দাঁড়ে বসিয়া ঘুমায়, সেইরকম অনেক পাখিই গাছের উপর খাড়া বসিয়া ঘুমায়। কেহ কেহ বা পা মুড়িয়া মাটির উপর চাপিয়া বসে। বক যে এক ঠ্যাঙে দাঁড়াইয়া চমৎকার ঘুমাইতে পারে তাহা সকলেই জান। প্যাঁচা প্রভৃতি কোন কোন পাখি ঘুমাইবার সময়ে গায়ের পালক ফুলাইয়া আপনাদের শরীরটা প্রায় দ্বিগুণ বড় করিয়া তোলে। একরকম চন্দনা আছে তাহারা ঠিক বাদুড়ের মতো গাছের ডালে ঝুলিয়া ঝুলিয়া ঘুমায়। বাদুড় কেমন করিয়া ঘুমায় তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ—তাহারা মাথা নীচের দিকে রাখিয়া ডানা মুড়িয়া ঝাঁকে ঝাঁকে গাছের ডাল হইতে ঝুলিয়া থাকে। সে এক চমৎকার দৃশ্য। শীতের সময়ে কলিকাতার

ইডেন গার্ডেন্‌সে মাঝে মাঝে বাদুড়ের ঝাঁক দেখিয়াছি। বাদুড়েরা নাকি দিনের বেলায় ঘুমায়, কিন্তু এগুলি যেরকম ক্যাট্ ক্যাট্ শব্দ আর ছট্‌ফট্ করিতেছিল তাহাই যদি ঘুমের নমুনা হয়, তবে না জানি সে কিরকমের ঘুম। ঘুমাইবার পূর্বে বাদুড়েরা যেরকম ঘটা করিয়া ঘুমের আয়োজন করে, তাহা দেখিলে বাস্তবিকই হাসি পায়। লম্বকর্ণ বাদুড় বা চামচিকা ঘুমাইবার সময় প্রথমেই গাছের ডাল আঁকড়াইয়া ঝুলিয়া পড়েন তারপর ডানা দুইটি দু-চারবার ঝাড়িয়া খুব সাবধানে ভাঁজ করিয়া বন্ধ করেন। তারপর ফট্ করিয়া একটি প্রকাণ্ড কান মুড়িয়া যায়; খানিক বাদে সে আর একটি কানও ঠিক ঐরকম হঠাৎ গুটাইয়া লয়— তখন আর তাহাকে চিনিবার যো থাকে না। বাদুড়ের কথা বলিতে গিয়া আরেকটা জন্তুর কথা মনে হয়, সে আপনাকে রীতিমত 'বেনের পুঁটুলি' পাকাইয়া ঘুমায়। তখন তাহাকে দেখিলে হঠাৎ জানোয়ার বলিয়া চিনিতে পারাই অসম্ভব। মনে হয়, যেন একটা প্রকাণ্ড ফল বা মৌচাক ঝুলিয়া আছে। এই জন্তুর নাম কোবেগো। দেখিতে কতকটা বাদুড়ের মতো হইলেও এটি বাদুড় নয় এবং ইহার ডানাটাও বাদুড়ের ডানার মতো ছড়ান নয়। বাদুড়ের মতো উড়িতে না পারিলেও ইহারা এই ডানায় ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে লাফ দিয়া ১০০/১৫০ হাত পার হইয়া যায়। ইহাদের ছানাগুলি বাঁদরের ছানার মতো সব সময়ে মায়ের বুক আঁকড়াইয়া থাকে। এইরকম পুঁটুলি পাকাইবার অভ্যাসটা 'বর্মধারী' বা 'আর্মাডিলো' প্রভৃতি আরও কোন কোন জন্তুরও দেখা যায়।

মাথা ঝুলাইয়া ঘুমান যাহাদের অভ্যাস, তাহাদের মধ্যে আর একজনের কথা বলিয়া শেষ করি। ইহার ইংরাজি নাম 'স্লথ' অর্থাৎ অলস। বাস্তবিক এমন ঢিলা স্বভাবের অলস জন্তু আর বড় দেখা যায় না। গাছের ডালে ঝুলিয়া ঝুলিয়া আর অকাতরে ঘুমাইয়া ইহারা সারাবছর কাটাইয়া দেয়। চিৎ হইয়া মাঝে মাঝে নীচের দিকে তাকান, মাঝে মাঝে হাত বাড়াইয়া গাছের পাতা খাওয়া, আর যখন তখন ঘাড় গুঁজিয়া ঘুমান--ইহাই যেন ইহাদের জীবনের কাজ। যখন এক ডালের পাতা ফুরাইয়া গেল, তখন আর এক ডালে যাওয়াটা যেন ইহাদের পক্ষে প্রাণান্তকর। ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া ভুঁড়ি দুলাইয়া, আস্তে আস্তে হাত পা বাড়াইয়া আধ মিনিটের কাজ আধ ঘণ্টায় সারিতে না সারিতে ইহারা আবার পরিশ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। বাস্তবিক ইহারা এমন অলস যে অনেক সময়ে ইহাদের মাথায় একরকমের শেওলা গজাইয়া সবুজ রঙের স্যাঁৎলা পড়িয়া যায়। পুরাণে বলে, বাল্মীকি, চ্যবন প্রভৃতি ঋষিরা ধ্যানে বসিলে তাঁহাদের গায়ে উইয়ের ঢিপি গজাইয়াছিল। ইনি সারাদিন চিৎপাত হইয়া যে কিসের ধ্যান করেন তাহা জানি না—কিন্তু মাথায় শেওলা না গজাইয়া আরেকটু বুদ্ধি গজাইলে বোধহয় কতকটা সুবিধা হইত।

গোখুরা শিকার

এক সাহেবের আস্তাবলে ইঁদুরে বাসা বেঁধেছিল। তারা আস্তাবলের মেজের নীচে গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে একেবারে ঝাঁঝরার মতো করে ফেলেছিল। ইঁদুরের উৎপাতে সবাই ব্যতিব্যস্ত কতদিন কল পেতে কত ইঁদুর ধরা পড়ল, তবু ইঁদুর আর ফুরায় না। তখন সাহেব ভাবলেন

ইঁদুর মারবার বিষবড়ি না বানালে আর চলছে না। কিন্তু তার পরেই হঠাৎ একদিন দেখা গেল, আস্তাবলের সব ইঁদুর কোথায় পালিয়েছে! সবাই বলল "ব্যাপারখানা কি?" দুদিন না যেতেই বোঝা গেল, ব্যাপার বড় গুরুতর—ইঁদুরের গর্তে প্রকাণ্ড দুই গোখুরো সাপ এসে আশ্রয় নিয়েছে। আস্তাবলে মহা হুলুস্থুল পড়ে গেল, সহিস কোচম্যান সব চলতে-ফিরতে সাবধানে থাকে, রাত্রে গাড়ি জুততে হলে লোকজন, লাঠি, মশাল নানারকম হাঙ্গামার দরকার হয়, তা নইলে কেউ ঘরে ঢুকতেই চায় না। সাহেব দেখলেন মহা মুশকিল, এর চাইতে ইঁদুরই ছিল ভাল।

সাহেবের যে চাপরাসী, সে লোকটি ভারি সেয়ানা—সে বললে, "হুজুর, আমি সাপ তাড়াবার ফন্দি জানি। আমায় চার আনা পয়সা দিন, আমি এখুনি তার সরঞ্জাম কিনে আনছি।" পরের দিন চাপরাসী সেই চার আনার সরঞ্জাম নিয়ে হাজির—একটা বঁড়শি আর ছিপ আর একটা ঠোঙার মধ্যে জ্যান্ত একটা ব্যাং! দেখে সবাই হাসতে লাগল আর চাপরাসীকে ঠাট্টা করতে লাগল। সাহেব বললেন, "বেঅকুফ! তোকে সাপ মারতে বললাম, আর তুই মাছ ধরবার সরঞ্জাম এনে হাজির করলি!" চাপরাসী সেসব কথায় কান না দিয়ে ব্যাংটাকে বঁড়শিতে গেঁথে আস্তাবলের দিকে চলল; তামাসা দেখবার জন্য সবাই তার পিছন-পিছন চলল। তারপর সেই ছিপে-গাঁথা ব্যাংটাকে গর্তের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে চাপরাসী শক্ত করে ছিপের গোড়ায় ধরে বসে রইল। খানিক পরে ছিপে টান পড়তেই অমনি সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। আর চাপরাসী সেই আধ-গেলা ব্যাং শুদ্ধ একটা প্রকাণ্ড সাপকে গর্তের মধ্যে থেকে হিড়হিড় করে টেনে বার করল। সাপেরা যখন খায় তখন তারা ক্রমাগত গিলতেই থাকে, যা একবার গলার মধ্যে ঢোকে তাকে আর ঠেলে বার

করতে পারে না। কাজেই ছিপের আগায় বঁড়শি, বঁড়শিতে গাঁথা ব্যাং আর ব্যাঙের সঙ্গে সাপ; এমনি করে গোখুরোমশাই চার আনার সরঞ্জামে ধরা পড়লেন। তারপর লাঠিপেটা করে তাকে সাবাড় করতে কতক্ষণ?

একটা সাপ মারা পড়তেই আরেকটাকে ধরবার জন্য সকলের ভারি উৎসাহ দেখা গেল। কিন্তু একদিন দুদিন করে এক সপ্তাহ গেল, তবু সাপ আর ধরা দেয় না। সবাই হয়রান হয়ে পড়ল। সাহেব যখন হতাশ হয়ে পড়েছেন, এমন সময় একটা চাকর দৌড়ে এসে খবর দিল—সাপ ধরা পড়েছে। সাহেব ছুটে দেখতে গেলেন, গিয়ে দেখেন সাপ তখনও গর্ত থেকে বেরোয়নি। চাপরাসী ছিপ নিয়ে টানাটানি করছে। তারপর টানতে টানতে ক্রমে সাপের খানিকটা গর্তের বাইরে এসেছে, এমন সময় চাপরাসীর টানে ব্যাংটা তার গলা থেকে পিছলিয়ে বেরিয়ে এল। আর সাপটাও ফোঁস্ ফোঁস্ করতে করতে ছুটে আস্তাবলের বাইরে চলল। তখন সবাই তার পিছনে ছুটে লাঠি দিয়ে তাকে আচ্ছা করে পিটিয়ে শেষ করল। কিন্তু কি আশ্চর্য, লাঠিপেটা করতেই তার পেটের মধ্যে থেকে কতগুলো ব্যাং বেরিয়ে পড়ল। তার মধ্যে দু-একটা তখনও বেঁচে ছিল—একটা ত একটু বাদেই লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগল। সাহেব ত এ কাণ্ড দেখে একেবারে অবাক। সাপের পেটে গিয়েও যে কোন জন্তু বেঁচে থাকতে পারে, এটা তাঁর জানাই ছিল না। কিন্তু সাহেবের জানা না থাকলেও এটা কিছু নতুন খবর নয়। আমেরিকার 'শিংওয়ালা' সাপের সম্বন্ধেও এই রকম গল্প শোনা যায়। সেই সাপগুলো এমন পেটুকের মতো খায় যে খাবার পরে আর তাদের নড়বার শক্তি থাকে না, তখন তারা যেখানে সেখানে মড়ার মতো পড়ে থাকে। সেখানকার প্রাচীন 'রেড ইন্ডিয়ান' জাতির লোক এই সময়ে তাকে দেখতে পেলে তার মাথায় ডান্ডা-পেটা করতে থাকে। তার ফলে অনেক সময়েই তার পেট থেকে আস্ত-গেলা জন্তুগুলো সব বেরিয়ে আসে। তার মধ্যে প্রায়ই দু-একটাকে জ্যান্ত পাওয়া যায়।

যাহোক, সাহেব ত সাপ মারলেন। কিন্তু তখন আবার দেখা গেল যে, আস্তাবলের মেজের নীচে সাপের ছোট ছোট বাচ্চায় একেবারে ভরতি হয়ে গেছে। এখন উপায় কি? দুটো সাপ মারতেই এত হাঙ্গামা, তবে এতগুলো যখন বড় হবে তখন কি হবে। আবার চাপরাসীর ডাক পড়ল। চাপরাসী বলল, "হুজুর! আমি এরও উপায় জানি।" এবারের উপায়টি আরও আশ্চর্য। এবার প্রকাণ্ড বড় বড় কোলা ব্যাং এনে আস্তাবলে ছেড়ে দেওয়া হল। তারা মহা ফূর্তি করে পেট ভরে খেয়ে খেয়ে সাপের বংশ সাবাড় করে দিল। সাপকে দিয়ে ব্যাং খাইয়ে, তারপর ব্যাংকে দিয়ে সাপ গেলানো! চমৎকার শিকার, না?

সিংহ শিকার

আফ্রিকা হল সিংহের দেশ, ইউরোপ আমেরিকার বড় বড় শিকারীরা সেখানে বন্দুক নিয়ে দলেবলে সিংহ শিকার করতে যান। তাঁরা মনে করেন, যতরকম শিকার আছে তার মধ্যে সিংহ শিকার খুব একটা বড় ব্যাপার; কারণ তাতে শিকারীর সাহস এবং বাহাদুরির

পরিচয়টা ভাল করেই পাওয়া যায়। যে শিকারী সিংহ মেরেছে লোকে তাকে ওস্তাদ শিকারী বলে মানে। সিংহ শিকারের বিপদ খুব বেশি। আজকাল বন্দুকের এত যে উন্নতি হয়েছে, তবুও এখনও কত শিকারী সিংহের হাতে প্রাণ হারান। তিন-চারটা সাংঘাতিক গুলি খাবার পরেও একশ গজ দৌড়ে এসে সিংহ তার শিকারীকে শিকার করেছে, এমন ঘটনার কথাও শোনা যায়। তার মধ্যে একটি গুলি সিংহের হৃৎপিণ্ড ফুটো করে বেরিয়ে গিয়েছিল, তবু মরবার আগে সে তার মরণকামড়টি না দিয়ে ছাড়েনি! তাহলে ভাব সিংহ কি জিনিস!
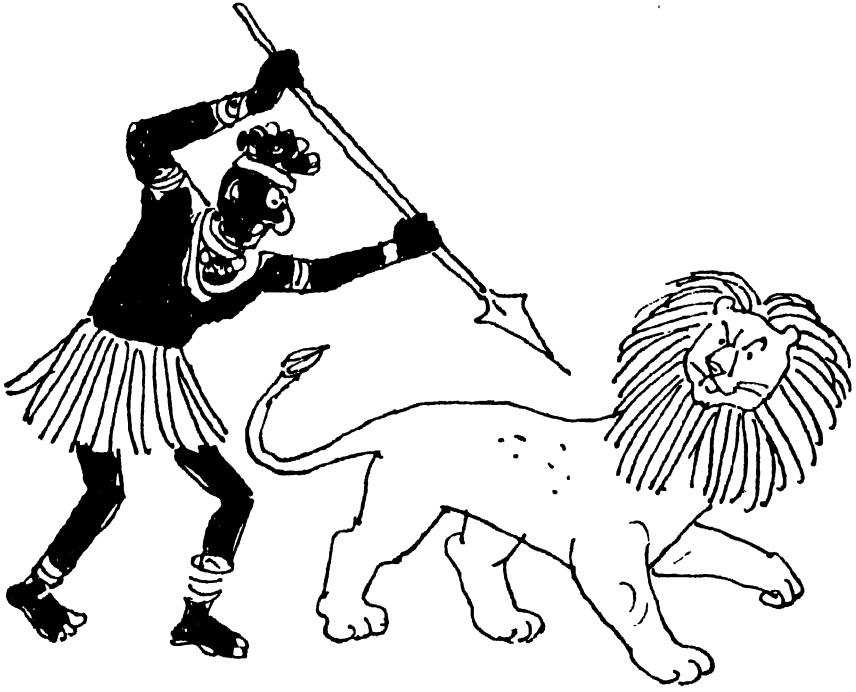
এমন যে সিংহ, তাকে আফ্রিকার 'মাসাই' ও 'নান্দি' জাতের নিগ্রোরা বল্লম দিয়ে শিকার করে থাকে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি এবং অসাধারণ মনস্বী লোক বলে সকল দেশে পরিচিত, কিন্তু শিকারী হিসাবেও তাঁর প্রতিপত্তি বড় কম নয়। তিনি নান্দিদের সিংহ শিকার স্বচক্ষে দেখে তার যে বর্ণনা লিখে গিয়েছেন, তা পড়লে অবাক হতে হয়।

নান্দিদের শিকার দেখবার জন্য তিনি একদিন আফ্রিকার জঙ্গলে দলেবলে সিংহের খোঁজে বেরিয়েছিলেন। কথা ছিল, সিংহ পাওয়া গেলে নান্দিরা শিকার করবে; সাহেবরা কেউ সে শিকারে যোগ দেবেন না, কিছু বলতে পারবেন না; তাঁরা কেবল দূরে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখবেন। ঝোপ জঙ্গল ঘেঁটে অনেক খোঁজার পর প্রকাণ্ড এক সিংহ পাওয়া গেল। তেমন সিংহ সচরাচর মেলে না। রুজভেল্ট লিখেছেন, সিংহটাকে দেখে তাঁদের

শিকার করবার লোভ জেগে উঠছিল, কিন্তু তাহলে তাঁদের কথা রক্ষা হয় না, আর নান্দিদের শিকারটাও দেখা হয় না; তাই তাঁরা দলেবলে সিংহটাকে ঘিরে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। নান্দিরা একটু পিছনে পড়েছিল, দেখতে দেখতে তারা এসে হাজির হল। এক হাতে বল্লম, আর এক হাতে ঢাল—বিশাল দেহটি যেন কালো পাথরে তৈরী, মুখে দয়ামায়া দ্বিধা ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। সিংহ পাওয়া গিয়েছে শুনে তাদের আনন্দ দেখে কে? তারা এক-এক পা চলে আর এক একটি বিরাট লাফ দেয়। দেখতে দেখতে সিংহের ঝোপটিকে তারা নিঃশব্দে ঘেরাও করে ফেলল।

সিংহটাও এতক্ষণ চুপ করে ছিল না। সে ঝোপের আড়ালে বসে ছিল, আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। দেখল কতগুলো মানুষ তার দিকে এগিয়ে আসছে। তারা সব ঢালের আড়ালে গুঁড়ি মেরে বল্লম বাগিয়ে দাঁড়াচ্ছে। এক একটি ঢালের উপর দিয়ে এক-এক জোড়া কালো চোখ যমের ভ্রূকুটির মতো তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে বেশ বুঝল যে তার জন্যই এত সব আয়োজন, তার ঘাড়ের কেশর খাড়া হয়ে দাঁড়াল, তার মুখখানা ভীষণভাবে বিকৃত হয়ে গেল, তার ল্যাজের বাড়িতে সমস্ত ঝোপটা চঞ্চল হয়ে উঠল। সে একবার এপাশ ফিরল একবার ওপাশ ফিরল, ডাইনে তাকাল বাঁয়ে তাকাল, কোন্‌দিকে লোক কম দেখে তারপর তীরের মতো সেইদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

একটি লোকও সেদিক থেকে সরল না। সব ঢাল বাগিয়ে বল্লম তুলে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। দুপাশ থেকে শিকারীরা বল্লম হাতে দৌড়ে এল, দলের যে নেতা সে লাফ দিয়ে দৌড়ে সকলের সামনে গিয়ে পড়ল। তার হাত থেকে বল্লমখানি বিদ্যুতের মতো ছুটে গিয়ে সিংহের গায়ের মধ্যে বিঁধে গেল। সিংহটাও আঘাত লাগামাত্র তার সামনে যাকে পেল তাকেই আক্রমণ করে ধরল। সে লোকটাও তার জন্য প্রস্তুত ছিল, তার বল্লমের এক ঘায়ে সে চক্ষের নিমেষে সিংহটাকে একেবারে এপার ওপার ফুঁড়ে ফেলল—একদিকের ঘাড়ের মধ্যে ঢুকে বল্লমের আগাটা অন্য দিকে পেটের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সিংহটা তার ঢালের উপর দিয়ে প্রচণ্ড এক থাবা মেরে, তার ঘাড়ের মধ্যে নখ দাঁত বসিয়ে, মুহূর্তের মধ্যে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলল। আর অমনি চারদিক থেকে বল্লমের পর বল্লম আগুনের ঝলকের মতো ছুটে এসে সিংহটাকে একেবারে অস্ত্রে অস্ত্রে গেঁথে ফেলল। এর মধ্যেও কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে আরও একটি শিকারীকে জখম করতে ছাড়েনি। মরবার সময় একটা বল্লমকে সে এমন জোরে কামড়িয়ে ধরেছিল যে, লোহার বল্লমটা উল্টে মুচড়ে বঁড়শির মতো বেঁকে গিয়েছিল। তারপর নান্দিদের উল্লাস দেখে কে! খানিকক্ষণ পর্যন্ত সিংহের চারিদিকে তাদের চিৎকার আর বিজয় নৃত্যের ঘটা চলল। সুখের বিষয়, আহত শিকারী দুজনেই বেঁচে উঠেছিল।

সিংহের তেড়ে-আসা থেকে এত কাণ্ড শেষ হওয়া পর্যন্ত দশ সেকেন্ডও সময় লাগেনি। সিংহের আক্রমণ, শিকারীর অস্ত্র বৃষ্টি, আঁচড় কামড় হুড়াহুড়ি আঘাত যন্ত্রণা ও মৃত্যু, ওর মধ্যেই সব এক ঝাপটায় শেষ! সিংহটা যখন পড়ল, তখন তার অবস্থাটি হয়েছিল ঠিক ভীষ্মের শরশয্যার মতো।

সেকালের লড়াই

'সন্দেশে' তোমরা নানারকম জানোয়ারের লড়াইয়ের কথা পড়েছ। কিন্তু বাস্তবিক লড়াইয়ের মতো লড়াই কাকে বলে যদি জানতে চাও তবে সেকালের জানোয়ারদের খোঁজ নিতে হয়। যে কালের কথা বলছি সে সময়ে মানুষের জন্ম হয়নি—সে প্রায় লাখ লাখ বছরের কথা। সে সময়কার জন্তুরা ত এখন বেঁচে নেই, তাদের খোঁজ নেবে কি করে? খোঁজ নেবার উপায় আছে।

যে-সকল পণ্ডিতেরা নানারকম জানোয়ারের শরীর পরীক্ষা করে থাকেন তাঁরা এক একটা জানোয়ারের সামান্য দু-একটা হাড়, দাঁত বা শরীরের কোন টুক্‌রা দেখে সেই জানোয়ার সম্বন্ধে এমন অনেক কথা বলে দিতে পারেন যে শুনলে অবাক হতে হয়। সে আমিষ খায় কি নিরামিষ খায়, জলে থাকে কি ডাঙায় থাকে, দু পায়ে চলে না চার পায়ে চলে, সে কোন জাতীয় জন্তু, এসব কথা শুধু খানিকটা কঙ্কাল পরীক্ষা করে চট্‌ করে বলা যেতে পারে। কিন্তু অনেক সময়ে পাহাড় কাটতে বা মাটি খুঁড়তে গিয়ে এমন সব হাড় পাওয়া যায় যেটা আমাদের জানা কোন জন্তুর হাড় হতেই পারে না। মনে কর, একটা পায়ের টুক্‌রা পাওয়া গেল প্রায় পাঁচ হাত লম্বা আর একটা হাতির পায়ের চেয়েও মোটা। সে হাড় আর এখন হাড় নেই, সে কোন্‌কালে পাথর হয়ে গিয়েছে কিন্তু তার চেহারাটা সেইরকমই আছে। এইসব হাড় পরীক্ষা করে সেকালের অদ্ভুত জন্তু সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য কথা জানা গিয়েছে।

মনে কর, একটা পাথর কাটতে গিয়ে তার মধ্যে একটা জানোয়ারের কঙ্কাল পাওয়া গেল—সে পাথর এক সময়ে নরম মাটি ছিল—জানোয়ারটা তার মধ্যে মারা যায়। ক্রমে সেই নরম মাটি জমে সেই হাড়গোড়শুদ্ধ পাথর হয়ে গেছে। মাটি জমে পাথর হতে হয়ত কত লাখ বৎসর লেগেছে, তারপরে কত হাজার বৎসর কেউ তার কথা জানতে পারেনি। এতদিন পরে মনুষ আবার জানোয়ারের সন্ধান পেল! পণ্ডিতেরা সেই পাথর পরীক্ষা করে হয়ত বলবেন এটা অমুক যুগের পাথর। তারপর হাড় পরীক্ষা করে জানোয়ারটার সম্বন্ধেও নানা কথা বলবেন। যদি অনেকগুলা হাড় পাওয়া যায় তবে হয়ত জানোয়ারটার একটা মোটামুটি চেহারাও খাড়া করতে পারবেন।

এইরকম করে কত অদ্ভুত জানোয়ারের যে খবর পাওয়া গেছে সে কথা ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়।...প্লীসিওসরাস (অর্থাৎ 'প্রায় কুমির জাতীয়') জানোয়ারটির গলা ছিল সরু আর লম্বায় প্রায় ২৫/৩০ হাত হলেও সে মোটের উপর নিরীহ ছিল। আরেকটা ছিল ইকথিরো সরাস ('মাছ কুমির')। আর দুটো জানোয়ার ছিল মেগালোসরাস আর ইগুয়ানোডন; ইগুয়ানোডন দেখতে ভয়ানক বটে, কিন্তু নিরামিষভোজী, মেগালোসরাস আমিষভোজী। এরা দুজনেই হাতির চেয়ে বড় ছিল।

সেকালের কুমিরদের পিছনের পা দুটার গড়ন সাংঘাতিকরকম মজবুত—লড়ায়ের সময় পিছনের পা দুটাই আক্রমণ কিংবা আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করত। এদের নাম টিরানোসরাস অর্থাৎ অত্যাচারী কুমির। এরাও হাতির চেয়ে বড় ছিল।

এরকম আরও কত জানোয়ার সেকালে ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। আমরা যদি তখন বেঁচে থাকতাম তাহলে কি মুশকিল হত বল দেখি? এতগুলো হাতির চেয়ে বড়

হিংস্র জানোয়ারের মধ্যে আমাদের দশাটা কেমন হত একবার ভেবে দেখ। কয়েক বৎসর আগে অনেকের বিশ্বাস ছিল যে দক্ষিণ আমেরিকার প্যাটাগোনিয়ার জঙ্গলে সেকালের জন্তু এখনও আছে। একজন সাহেব অনেক লোকজন নিয়ে খুঁজতে গিয়েছিলেন; কিন্তু তাদের দেখা পেলেন না।

খাঁচার বাইরে খাঁচার জন্তু

বনের জন্তুকে ধরে যখন খাঁচায় পোরা হয় তখন তার যে কিরকম দুরবস্থা হয়, সেটা বেশ সহজেই বুঝতে পারি। কিন্তু খাঁচার জন্তু যখন হঠাৎ ছাড়া পেয়ে বাইরে এসে পড়ে, তখন তার দুরবস্থাটিও এক-এক সময়ে বড় কম হয় না।

লন্ডনের এক চিড়িয়াখানার একটা রেলিং দেওয়া বাগান-করা জমির মধ্যে কতগুলি হরিণ থাকত। সেই ছোট্ট জমিটুকুর মধ্যে নতুন ঘর তৈরি হবে, তাই মজুরেরা সেখানে কাঠের তক্তা এনে ফেলেছিল। একদিন একটা হরিণ সেই রাশি-করা কাঠের উপর চড়ে হঠাৎ কেমন করে এক লাফ দিয়ে রেলিঙের বাইরে গিয়ে পড়েছে। হরিণ পালাচ্ছে দেখে চিড়িয়াখানার লোকেরা সব ব্যস্ত হয়ে ছুটে এল, কিন্তু হরিণ বেচারা ব্যস্ত হল তাদের চাইতে আরও অনেকখানি বেশি। যখন সে বুঝতে পারল যে রেলিঙের মধ্যে ফিরে যাবার আর কোনও উপায় নেই, তখন সে কোথায় যাবে ঠিক করতে না পেরে পাগলের মতো চিড়িয়াখানার বাগানময় কেবল ছুটোছুটি কবতে লাগল। হরিণের দৌড় দেখে বাগানের যত জন্তু সবাই যেন ব্যস্ত হয়ে উঠল। বাঘ সিংহ উঠে দাঁড়াল, হরিণেরা বড় বড় চোখ মেলে যে যার ঘরে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল। আর বাঁদরগুলো রেলিঙে চোখ ঠেকিয়ে চেঁচাতে লাগল আর রেলিং ধরে ঝাঁকাতে লাগল। অনেক হাঙ্গামের পর, শেষটায় সেই ঘেরা জমির দরজাটা খুলে দিয়ে হরিণটাকে সেইদিকে তাড়া করে নিতে তখন সে নিজের পরিচিত আশ্রয়ে ঢুকে তারপর শান্ত হল।

এক টিয়াপাখির গল্প পড়েছিলাম; এক বাজিওয়ালার কাছে সে নানারকমের বোলচাল শিখেছিল। যখন তামাসা দেখবার জন্যে দলে দলে লোক এসে বাজিওয়ালার তাঁবুর ধারে ভিড় করত আর ঢুকবার জন্য ঠেলাঠেলি করত, তখন টিয়াপাখিটা চিৎকার করে বলত— "আস্তে! আস্তে! ঢের জায়গা আছে! মশায়রা অত ভিড় করবেন না।" একদিন টিয়াপাখির কি দুর্মতি হল, সে খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে উড়ে পালাল। কিন্তু পালাবে আর কোথায়? একে ত বেচারার উড়বার অভ্যাস নেই, তার উপর খাঁচায় থেকে খাঁচাটার উপরেও কেমন মায়া হয়ে গেছে। তাই দু-একদিন এদিক ওদিক লুকিয়ে থেকে সে আবার ঘুরে ফিরে সেই তাঁবুর কাছেই একটা গাছে এসে বসল। বাজিওয়ালা ততক্ষণে তাকে খুঁজে খুঁজে শেষটায় তার আশা ছেড়ে দিয়ে বসেছে। এমন সময়ে উপরে ভারি একটা হৈ চৈ গোলমাল শুনে বাজিওয়ালা বেরিয়ে এসে দেখল যে, গাছের উপর টিয়াপাখি বসে আছে আর যত রাজ্যের পাখি এসে তার চারদিকে গোলমাল করে, তাকে ঠুকরিয়ে আর পালক ছিঁড়ে অস্থির করে তুলেছে। টিয়াপাখি বেচারা ব্যাপার দেখে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে, আর ক্রমাগত বলছে—"আস্তে! আস্তে! ঢের জায়গা আছে! মশায়রা অত ভিড় করবেন
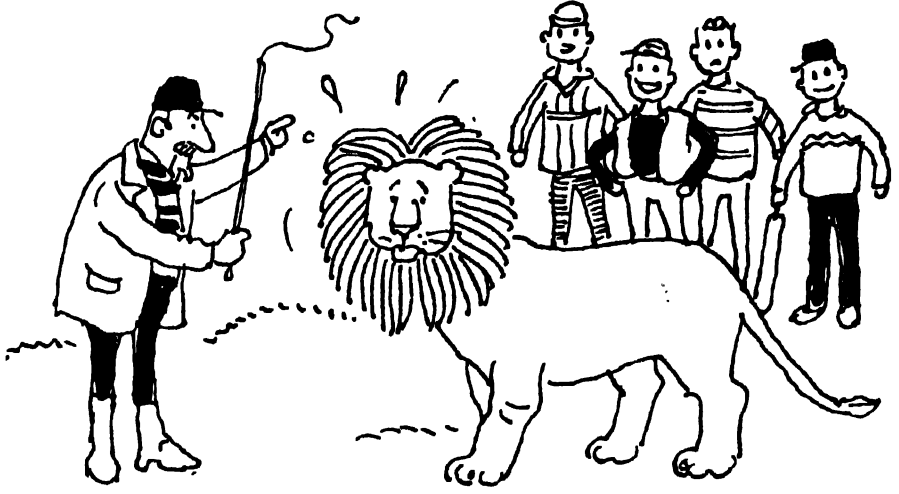
না।" তখন বাজিওয়ালা খাঁচাটা এনে খুলে ধরতেই বেচারা তাড়াতাড়ি তার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

পাখি বা হরিণ বা কোন নিরীহ জন্তু না হয়ে যদি বাঘ বা সিংহের মতো হিংস্র জন্তু এইরকম ভাবে ছাড়া পেত, তাহলে ব্যাপারটা কিরকম হত? হাঙ্গেরীর বুদাপেস্ত শহরে একবার একটা সিংহ সার্কাসওয়ালার খাঁচা থেকে কেমন করে বেরিয়ে পড়েছিল। সিংহ বেরিয়ে পড়েছে দেখে সার্কাসের লোকেরা হৈ চৈ করে গোলমাল করে উঠতেই সিংহ বেচারা থতমত খেয়ে একেবারে সার্কাসের জমি পার হয়ে, সড়ক পার হয়ে, পাঁচিল টপ্‌কিয়ে এক খোলা ময়দানের মধ্যে গিয়ে হাজির। সেটা ছিল ছেলেদের খেলার মাঠ— তারা সেখানে বল খেলছে, ছুটছে, লাফাচ্ছে, হুড়োহুড়ি করছে। সিংহ বেচারার ত চক্ষুস্থির, সে এরকম কাণ্ড আর কখনও দেখেনি। কোথায় আর যায়, সে অপ্রস্তুত হয়ে চুপচাপ সরে পড়বার চেষ্টা করছে এমন সময়ে পাঁচিল টপকিয়ে সিংহওয়ালা স্বয়ং এসে হাজির। সিংহ তখন ভিড়ের মধ্যে চেনা মুখ দেখে আশ্বস্ত হল, আর পোষা বেড়ালটির মতো তার মালিকের সঙ্গে আস্তে আস্তে খাঁচায় ফিরে চলল।

আর একবার আমেরিকার জানোয়ারওয়ালা বোস্টক সাহেবের এক সিংহ খাঁচা থেকে পালিয়েছিল। শহরের রাস্তায় বেরিয়েই সে দেখে চারদিকে লোকজন, গাড়িঘোড়া চলাচল করছে, নিরিবিলি বসবার জায়গা কোথাও নেই। তাই দেখে পশুরাজের মেজাজ গেল খারাপ হয়ে, তিনি গোঁসা করে এক পুরান ড্রেনের মধ্যে গিয়ে যে ঢুকলেন আর কিছুতেই বেরোতে চান না। কুকুর লেলিয়ে, বন্দুক ছুটিয়ে, নানারকমে খোঁচাখুঁচি করেও কিছুতেই তাকে হটান গেল না। এমন সময়ে হঠাৎ কার হাত থেকে একটা টিনের বালতি ঝন্‌ঝন্ করে গিয়েছে ড্রেনের মধ্যে পড়ে! সেই শব্দ শুনে চমকে উঠে পশুরাজ এক দৌড়ে একেবারে তাঁর খাঁচার মধ্যে! কারণ, খাঁচার মতো নিরাপদ জায়গা আর নেই।

জানোয়ারওয়ালা

এক সার্কাসওয়ালার ছেলে—বয়স তার ষোলো বৎসর—সে স্কুলের ছুটিতে বাড়ি এসেছিল। সেখানে সে রোজ সিংহের খাঁচার কাছে দাঁড়িয়ে থাকত আর দেখত সিংহকে কেমন করে খেলা শেখায়। যে লোকটা সিংহের খেলা দেখাত, সে একটা সিংহের উপরে ভারি অত্যাচার করত—সিংহটাকে না খাইয়ে, মারধোর করে, গরম লোহার ছ্যাঁকা দিয়ে সে নানারকমে কষ্ট দিত। দেখে ছেলেটির ভয়ানক রাগ হল; সে তার বাবার কাছে গিয়ে সেই লোকটার নামে নালিশ করল। কিন্তু তার বাবা সে কথা হেসে উড়িয়ে দিলেন বললেন, "ওরকম না করলে সিংহ কি পোষ মানে?" তারপর, অনেকদিন এই অত্যাচার সয়ে সয়ে একদিন সিংহটা সত্যি সত্যিই ক্ষেপে গিয়ে সেই দুষ্টু খেলোয়াড়কে সাংঘাতিকরকম জখম করে দিল।

তখন সেই ছেলে তার বাবাকে বলল, "কাল থেকে আমি সিংহের খেলা দেখাব।" তার বাবা এ কথা শুনে তাকে দুই ধমক দিয়ে দিলেন। কিন্তু ছেলেরও জেদ কম নয়, পরদিন সকালে দেখা গেল সে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে সিংহের খাঁচায় ঢুকে বসে আছে! প্রথমটা সকলে খুবই ভয় পেয়েছিল কিন্তু ক্রমে দেখা গেল যে, সিংহের সঙ্গে তার এমন ভাব হয়ে গেছে যে ভয়ের কোন কারণ নেই। এই ছেলে এখন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় 'জানোয়ারওয়ালা'। এঁর নাম ফ্র্যাঙ্ক বোস্টক।

একটি সিংহ নিয়ে আরম্ভ করে এখন প্রায় চল্লিশটিতে দাঁড়িয়েছে। এক-এক সময়ে পঁচিশ ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশটি সিংহকে একসঙ্গে জড়ো করে তামাসা দেখান হয়। অবশ্য সিংহগুলি সবই পোষা, কিন্তু তা হলে কি হবে—তবু ত সিংহ। সিংহ কি বাঘ হাজার পোষ মানলেও তাকে ভয় করে চলতে হয়। সামান্য একটু কারণে হঠাৎ একটু ভয় পেলে বা চমকে উঠলে তারা হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে সাংঘাতিক কাণ্ড করে ফেলতে পারে। একবার একজন খেলোয়াড় একটা নতুনরকমের পোশাক পরে খাঁচায় ঢুকেছিল বলে তার সিংহটা তাকে তেড়ে কামড়াতে গিয়েছিল—খেলোয়াড় তখন পোশাক বদলিয়ে পুরান পোশাক পরে এসে তারপর খাঁচায় ঢুকতে পেল। আর একবার এক মেমসাহেব একসঙ্গে পাঁচ-সাতটা সিংহের খেলা দেখাতে গিয়ে এইরকম বিপদে পড়েছিলেন। সেদিন তাঁর হাতে একটা ফুলের তোড়া ছিল, একটা সিংহ তাই দেখে বোধহয় মাংস না কি মনে করে হঠাৎ তার উপর থাবা মেরে বসেছে। এই একটি থাবায় মেমসাহেবের গালের আর হাতের মাংস শুদ্ধ উঠিয়ে নিয়েছে আর অমনি চক্ষের নিমেষে সবক'টা সিংহ একেবারে হাঁ হাঁ করে ফুলের তোড়াটার দিকে তেড়ে এসেছে। মেমসাহেবটি তখন বুদ্ধি করে তোড়াটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তাই রক্ষা, তা নইলে অতগুলো সিংহের হুড়াহুড়ির মধ্যে পড়ে তাঁকে আর বাঁচতে হত না! যাহোক, ফুলটা মাটিতে পড়তেই সিংহগুলো তাকে নেড়ে শুঁকে নাক সিঁটকিয়ে আবার যে যার জায়গায় ফিরে গেল!

একবার বার্মিংহাম শহরে বোস্টক সাহেবের একটা সিংহ খাঁচা থেকে পালিয়ে শহরের রাস্তায় এসে হাজির হয়েছিল। শহরের মধ্যে হুলুস্থূল পড়ে গেল, রাস্তায় লোকজনের চলাফেরা বন্ধ হয়ে গেল। দোকানীরাও তাদের দোকানপাট খুলতে চায় না। সিংহটা এদিক ওদিক ঘুরে শেষটায় একটা প্রকাণ্ড ড্রেনের নর্দমায় গিয়ে ঢুকে বসল, আর সেখান থেকে সে বেরোতে চায়

না। সেই নর্দমার ভিতর দিয়ে সে রাস্তার নীচে চলাফিরা করে আর মাঝে মাঝে ডাক ছাড়ে। রাত দুপুরে মাটির নীচ থেকে ঐরকম গুরুগম্ভীর আওয়াজ—অবস্থাখানা কিরকম বুঝতেই পার। শেষটা নর্দমার মুখে একটা খাঁচা বসিয়ে সিংহটাকে তাড়িয়ে সেটার মধ্যে নেবার কথা হল। কিন্তু অনেক তাড়া করেও সিংহটাকে নড়ান গেল না। সকলের চিৎকার, বড় বড় পাথরের আঘাত আর লম্বা লম্বা বাঁশের খোঁচা সেসব সহ্য করে সে চুপচাপ বসে রইল। তারপর কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হল, বোস্টক সাহেব নিজে তার নাকের আগায় এক ঘা জুতো মেরে আসলেন কিন্তু সিংহ সেখান থেকে নড়ে না। সকলে যখন হয়রান হয়ে পড়েছে এমন সময় একজন লোকের হাত থেকে একটা বালতি কেমন করে ফস্‌কে গিয়ে গড়গড় শব্দ করে নর্দমার মধ্যে গড়িয়ে গিয়েছে। সেই আওয়াজ শুনে সিংহমশাই এক দৌড়ে ল্যাজ গুটিয়ে একেবারে খাঁচার মধ্যে।

আর একবার একটা পলাতক সিংহকে পটকা ছুঁড়ে ভয় দেখিয়ে খাঁচার মধ্যে ঢোকান হয়েছিল। সুতরাং সিংহের যেমন একদিকে খুব সাহস, আর একদিকে তেমনি ভয়ও আছে বলতে হবে। বোস্টক সাহেব বলেন, মানুষের যেমন নানারকমের মেজাজ থাকে—কেউ ঠাণ্ডা কেউ চটা, কেউ হাবাগোছের কেউ চট্‌পটে—এইসব জানোয়ারদেরও তেমনি। এক একটা সিংহের চালচলন বুদ্ধিশুদ্ধি এক-এক রকমের। কোনটা পোষ মানে একেবারে কুকুরের মতো—কোনটা হয়ত কোনকালেই ঠিকমত পোষ মানে না—তাকে সর্বদা চোখে চোখে রাখতে হয়। সিংহ পশুরাজ, তাই তার কথাই বেশি করে বললাম, কিন্তু জানোয়ারের মধ্যে হাতির সম্মানও বড় কম নয়। বিশেষত বিলাতে ও আমেরিকায়—যেখানে হাতি সর্বদা দেখা যায় না—সেখানে লোকে হাতিকে খুবই খাতির করে। বোস্টক সাহেবের কতগুলো হাতি আছে, তাদের তোয়াজ করবার জন্য অনেকগুলি চাকর সর্বদা লেগে আছে। আমাদের দেশে হাতিগুলো রোজ স্নান করবার সময় অনেকক্ষণ জলে কাদায় মাটিতে গড়াগড়ি করতে ভালোবাসে—তাতে নাকি তাদের গায়ের চামড়া খুব ভাল থাকে। কিন্তু ঠাণ্ডা দেশে সব সময় সেরকম স্নানের সুবিধা না থাকায় তাদের চামড়া শুকিয়ে কড়া হয়ে ফেটে যায়। সেইজন্য মাঝে মাঝে তাদের রীতিমত ভালোরকম স্নানের বন্দোবস্ত করে দিতে হয়। হাতির পক্ষে 'রীতিমত স্নান' কাকে বলে, তার একটু নমুনা শোন। প্রথম কোন পুকুর বা বড় চৌবাচ্চার জলে হাতিটাকে নামিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে কয়েক ঘন্টা থাকলে পর তাকে ডাঙায় এনে কড়া বুরুশ দিয়ে তার গায়ে কয়েক ঘন্টা খুব করে সাবান ঘষে তাকে আবার জলে নামান হয়। তারপর আবার সাবান ঘষা, আবার জলে নামান। এইরকম তিন-চারবার করা হয়—তাতে প্রায়ই দু-চার দিন সময় লাগে, আর সাবান খরচ হয় প্রায় ২৫ সের। তারপর চামড়াটাকে আগাগোড়া একরকম ঝামা দিয়ে ঘষে কয়েকদিন ধরে তাতে বেশ করে তেল লাগান হয়—এক পিপে জলপাইয়ের তেল। এতেও তার সখ মেটে না—এর পরে তার নখগুলি একটি একটি করে উকা দিয়ে ঘষে পালিশ করে তাকে ফিটফাট করে দিতে হয়। এইরকমে একটি হাতির পিছনে এক সপ্তাহ ধরে পাঁচ-সাতটি লোককে রীতিমত পরিশ্রম করতে হয়। সৌভাগ্যের বিষয়, এরকম সাংঘাতিক স্নান সব সময় দরকার হয় না—বছরে দু-চারবার করলে যথেষ্ট।

বোস্টক সাহেবের লোক পৃথিবীর চারিদিকে জানোয়ারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। একবার একটা গরিলার ছানা বিলাতে আনা হয়েছিল—বোস্টক সাহেব অনেক দর-দস্তুরের পর প্রায় ষোল হাজার টাকায় সেটাকে কিনে নিয়েছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাকে বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারেননি। তার চাইতে শিম্পাঞ্জির খেলা দেখিয়ে তিনি অনেক বেশি নাম

করেছেন। তাঁরই পোষা শিম্পাঞ্জি 'কন্‌সাল' বিলাতের বড় বড় থিয়েটারে তামাসা দেখিয়ে লোকের তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। 'কন্‌সাল'কে বোস্টকের লোকেরা ঠিক মানুষের মতো খাতির করত। তার নিজের চাকর, নিজের থাকবার ঘর, টেবিল চেয়ার, কাপড়চোপড়, আসবাবপত্র সব ছিল। তাকে যখন তামাসা দেখাবার জন্য বড় শহরে নেওয়া হত তখন
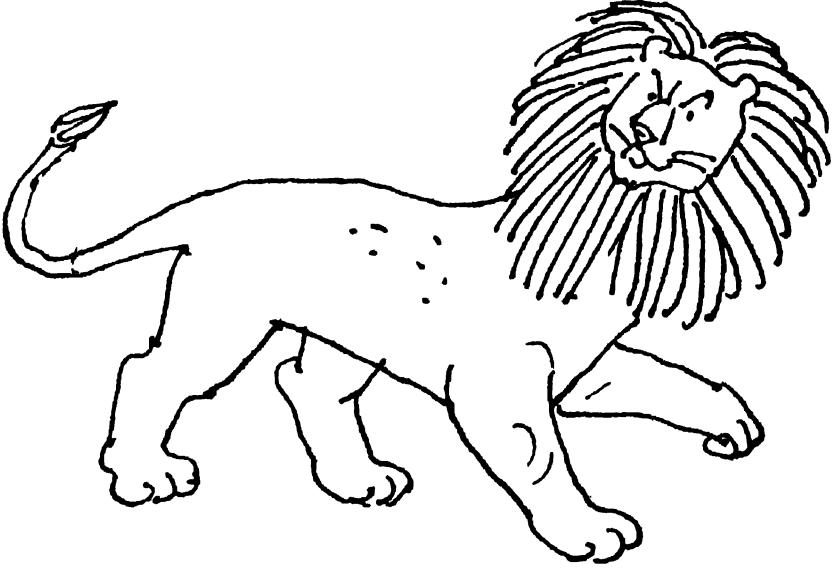
তার জন্য রীতিমত হোটেলের ঘর ভাড়া করা হত—আলাদা শোবার ঘর, বসবার ঘর, স্নানের ঘর ইত্যাদি। তার আদব-কায়দা খুব দুরস্ত। তার বাড়িতে যদি তার সঙ্গে দেখা করতে যাও, সে রীতিমত চেয়ার থেকে উঠে তোমার সঙ্গে 'হ্যান্ডশেক' করবে, তোমাকে টুপি রাখবার জায়গা দেখিয়ে দেবে—তারপর হয়ত পেয়ালা এনে তোমার জন্যে গম্ভীরভাবে চা ঢালতে বসবে। প্রথম যে শিম্পাঞ্জিকে বোস্টক সাহেব এইসব শিখিয়েছিলেন তারই নাম ছিল কন্‌সাল, সে অনেকদিন হল মারা গিয়েছে—কিন্তু তার জায়গায় অন্য শিম্পাঞ্জিকে শিখিয়ে নেওয়া হয়েছে—তারও নাম দেওয়া হয়েছে কন্‌সাল।

প্রাচীনকালের শিকার

মানুষকে যদি কেবল জন্তু হিসাবে শরীরের গঠন দেখিয়ে বিচার করা যায়, তবে তাহাকে নিতান্তই আনাড়ি জানোয়ার বলিতে হয়। সে না পারে ঘোড়ার মতো দৌড়াইতে, না জানে ক্যাঙারুর মতো লাফাইতে; দেহের শক্তি বল, অথবা নখ দাঁত প্রভৃতি যে কোন অস্ত্রের কথা বল, সব বিষয়েই সে অন্যান্য অনেক জানোয়ারের কাছে হার মানিতে বাধ্য। অথচ এই মানুষই এখন আর সব জানোয়ারের উপর টেক্কা দিয়া এই পৃথিবীতে রাজত্ব

করিতেছে। এখনকার যুগের মানুষ ত আত্মরক্ষার জন্য সহস্ররকম উপায় করিয়া রাখিয়াছে—শহর বাড়ি লোকালয় বানাইয়া সে বনের জন্তুর কাছ হইতে আশ্রয় পাইবার নানাপ্রকার ব্যবস্থাও করিয়াছে। কিন্তু সেই আদিমকালের মানুষ, যার ঘরও ছিল না বাড়িও ছিল না—সে বন্দুক চালাইতে শিখে নাই, এমনকি তলোয়ার বল্লম পর্যন্ত বানাইতে পারিত না—সে কেমন করিয়া এতরকম হিংস্র জন্তুর সঙ্গে রেষারেষি করিয়া টিকিয়া রহিল, ভাবিতে আশ্চর্য লাগে।

সে যুগের মানুষ পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইত। কেহ গুহাগহ্বরে, কেহ গাছের ডালে বাসা লইয়া বনের পশুর হাত হইতে আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিত। চলিতে ফিরিতে কতরকম হিংস্র জন্তু আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইত—তাহাদের কোন কোনটা এ যুগের জানোয়ারগুলির চাইতেও ভয়ানক। যেখানেই সেই প্রাচীন মানুষের কঙ্কাল পাও—তাহারই আশেপাশে সেইসব পাথরের স্তরের মধ্যেই দেখিবে আরও কতরকম জানোয়ারের কঙ্কালচিহ্ন। এমন অবস্থায় সেকালের মানুষ যে আত্মরক্ষার জন্য দল বাঁধিতে আরম্ভ করিবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক।

সেকাল কথাটা খুবই অস্পষ্ট। প্রবীণ লোকেরা নিজেদের বাল্যকালের কথা বলিবার সময় বলেন 'সেকালে' এইরূপ হইত। কোন প্রাচীন যুগের উল্লেখ করিবার সময় ইতিহাসে বলে—'সেকালে' এইরূপ হইত। কিন্তু যাঁহারা পৃথিবীর লুপ্ত ইতিহাস লইয়া চর্চা করেন, তাঁহাদের কাছে এ-সমস্ত নিতান্তই 'একাল'। ইতিহাস যাহার কথা লেখে না—যে সময়ে ইতিহাস ত দূরের কথা, লিখিত ভাষারই সৃষ্টি হয় নাই, সেই কালই যথার্থ 'সেকাল'। কত লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া সেকালের মানুষ ক্রমাগত সংগ্রাম করিয়াছে, কে তাহার হিসাব রাখে? কবে কেমন করিয়া সে অস্ত্র গড়িতে শিখিল, কত ঝগড়া কত লড়াইয়ের মধ্যে কেমন করিয়া অল্পে অল্পে তাহার বুদ্ধি খুলিতে লাগিল তাহার একটু আধটু সাক্ষ্য যাহা পাওয়া যায়, তাহারই পরিচয় সংগ্রহ করিতে আজও কত পণ্ডিতের সারাটা জীবন কাটিয়া যায়।

কত যুগের কত দেশের কতরকম মানুষ। তাহারা পৃথিবীর কতদিকে চলাফিরা করিয়াছে, আর নদীর গর্ভে পাহাড়ের স্তরে তাহাদের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। পাহাড়ের গুহার মধ্যে বাস করিয়া যে-মানুষ কাঁচা মাংস খাইত; ভ্রূকুটি-কপাল চ্যাটাল-চোয়াল যে-মানুষ দল বাঁধিয়া নরমাংস ভোজন করিত; গাছের ডালে বাসা বাঁধিয়া যে-মানুষ আপন পরিবার লইয়া লুকাইয়া থাকিত; চারিদিকে আগুন জ্বালিয়া তাহার মধ্যে যে-মানুষ দলেবলে রাত কাটাইত; পাথরে পাথর শানাইয়া যে-মানুষ অস্ত্রেশস্ত্রে পোশাকে-পরিচ্ছদে সভ্য হইয়া উঠিতেছিল; বড় বড় পাথরের স্তূপচক্র গড়িয়া যে মানুষ না জানি কোন্ দেবতার পূজা করিত; তাহাদের কেহই এখন বাঁচিয়া নাই—কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকেরই কিছু কিছু সংবাদ এই যুগের পণ্ডিতেরা তিল তিল করিয়া সংগ্রহ করিতেছেন।

একবার ভাবিয়া দেখ, সেই গুহাবাসীদের কথা; যাহাদের ঘরের পাশে সেকালের প্রকাণ্ড ভালুকগুলি অহরহই ঘুরিয়া বেড়াইত—প্রতিদিন চলিতে ফিরিতে যাহারা নানা জানোয়ারের প্রচণ্ড তাড়ায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকিত, অস্ত্র বলিতে পাথর ছাড়া যাহাদের আর কিছুই ছিল না, তাহারা যে নিতান্ত শখ করিয়া শিকার করিত না, তাহা সহজেই বুঝিতে পার। হয় শত্রুকে মারা না হয় শত্রুর হাতে মরা, ইহা ছাড়া তাহার কাছে আর তৃতীয় কোন পথ ছিল না। 'ম্যামথ্' বা অতিকায় হস্তীর মতো অত বড় একটা জানোয়ারকে কাবু

করা অথবা গুহা-ভল্লুক প্রভৃতি সাংঘাতিক জন্তুগুলির সহিত লড়াই করা একলা মানুষের সাধ্য নয়—সুতরাং শিকার কাজটা তাহাদের দল বাঁধিয়াই করিতে হইত। এই শিকার ব্যাপারের মধ্যে মানুষের প্রধান সম্বল যেটি ছিল, সেটি অস্ত্রও নয় শস্ত্রও নয়—সেটি তার বুদ্ধি। দশ জনে মিলিয়া আগে হইতে পরামর্শ করিয়া শত্রুকে বেকায়দায় মারিবার চেষ্টাতেই মানুষের বুদ্ধিটা খুলিত ভাল।

প্রথমত যেমন-তেমন একটা পাথর পাইলেই সে মনে করিত ভারি একটা অস্ত্র পাইলাম। ক্রমে পাথর ছুঁড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সে হয়ত এটা লক্ষ করিয়া থাকিবে যে, হাতের কাছে

ছোট পাথর না থাকিলে বড় পাথর ভাঙিয়া তাহাকে ছুঁড়িবার উপযোগী করিয়া লওয়া যায়। তারপর যখন হইতে সে বিবেচনাপূর্বক পাথর ভাঙিতে অভ্যাস করিল তখন হইতেই ক্রমে অস্ত্র গড়িবার নানারকম কায়দা দেখা দিল—ঠ্যাঙাইবার অস্ত্র, গুঁতাইবার অস্ত্র, ছুঁড়িয়া বিঁধাইবার অস্ত্র, কোপাইয়া কাটিবার অস্ত্র, ভারি ভারি ভোঁতা অস্ত্র, পাথরে-খোদাই ধারাল অস্ত্র। যেদিন মানুষ আগুনকে কাজে লাগাইতে শিখিল, আর যেদিন সে নানারকম ধাতুর ব্যবহার শিখিল, সেইদিন মানুষের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় দিন। সেইদিন হইতে মানুষ যথার্থরূপে বুঝিতে পারিয়াছে যে, জগতে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহ নাই।

অদ্ভুত জীব

সন্দেশে অনেক সময় নানা রকম অদ্ভুত জন্তুর ছবি দেওয়া হয়ে থাকে। কারোর চেহারা অদ্ভুত, কারোর চালচলন অদ্ভুত, কারোর আত্মরক্ষার উপায় অদ্ভুত। এখানে যে জন্তুর কথা বলা হচ্ছে, তার বাড়ি আমেরিকার কালিফোর্নিয়া প্রদেশে। ছোটখাট এক বিঘৎ লম্বা জন্তু, তার সমস্ত শরীর কাঁটায় ঢাকা; নাকের ওপর গণ্ডারের মতো সিং; চেহারা

দেখলে কোনও জন্তুই চট করে কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না। সাধারণত এগুলিকে শিংওয়ালা ব্যাঙ বলা হয়; কিন্তু আসলে সে ব্যাঙ নয়, গিরগিটি জাতীয় জিনিস।

মনে হতে পারে যে, আত্মরক্ষার জন্য এ জন্তুর পক্ষে ওই কাঁটাওয়ালা পোশাকটিই যথেষ্ট, কিন্তু যে কারণেই হোক, সে কেবল ওই পোশাক নিয়েই সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তার উপরে সে আত্মরক্ষার এমন একটি চমৎকার উপায় বার করেছে, যা পৃথিবীতে আর কোনও জন্তুর জানা নেই। লামা প্রভৃতি দুই একটি জন্তু, আর আফ্রিকার কোনও কোনও সাপ থুতু ছিটিয়ে শত্রুকে জব্দ করতে জানে। অনেক রকম সমুদ্রের পাখি আছে। তারা বিশ্রী রকম শব্দ করে, নাক দিয়ে এক রকম তেলা জিনিস ছিটকাতে পারে। কোনও

পৃথিবীর এক অদ্ভুত জীব

কোনও জন্তু তাড়া করলে অতি বিশ্রী দুর্গন্ধ রস ছড়াতে থাকে, কামানবাজ পোকা (Bombardier beetle) আর কোনও কোনও জাতের শুঁয়ো পোকা নানারকম ঝাঁঝাল রস ছুঁড়ে মারতে ওস্তাদ; কিন্তু এই জন্তুটির আত্মরক্ষার উপায় হচ্ছে চোখ দিয়ে রক্ত ছিটকানো। একবার এক সাহেব কালিফোর্নিয়াতে এই রকম একটি জন্তু ধরেছিলেন। জন্তুটাকে তুলে ধরতেই তার একটা চোখ থেকে সরু রক্তের ফোয়ারা ছুটে প্রায় এক হাত উঁচুতে সাহেবের কাঁধের কাছে গিয়ে পড়ল। তার পরের মুহূর্তেই আরেকটা চোখ থেকে আবার পিচকারির মতো খানিকটা রক্ত ছিটকিয়ে পড়ল। এমনি করে দু-চার মিনিটের মধ্যে চার পাঁচবার রক্ত ছিটিয়ে সে সাহেবের হাত মুখ জামা সব রক্তে ভিজিয়ে দিল। সাহেবের কুকুর ভারি উৎসাহ করে জন্তুটাকে শুঁকতে গিয়েছিল, কিন্তু কাছে যাওয়া মাত্র হঠাৎ এক ঝলক রক্ত ছুটে তার সমস্ত মুখ ভিজিয়ে দিল। কুকুর বেচারা তৎক্ষণাৎ ভয়ে ও ঘৃণায় কাঁপতে কাঁপতে সেই যে তফাতে সরে দাঁড়াল আর কিছুতেই তাকে জন্তুটার কাছে নেওয়া গেল না।

জন্তুটার চেহারা যতই ভয়ানক হোক তার স্বভাবটি নিতান্ত নিরীহ; সে পারতপক্ষে অন্য কোনও জন্তুর সঙ্গে লাগতে যায় না। হঠাৎ শত্রু কাছে এসে পড়লে কেবল আত্মরক্ষায় নিজের অদ্ভুত বিদ্যার পরিচয় দেয়। মরুভূমির দেশে সামান্য পোকামাকড় খেয়েই এরা জীবনধারণ করে।

জীবনী

অজানা দেশে

সেদিন একটা বইয়ে মাঙ্গো পার্কের কথা পড়ছিলাম। প্রায় সওয়া শ বৎসর আগে অর্থাৎ লিভিংস্টোনের অনেক পূর্বে মাঙ্গো পার্ক আফ্রিকার অজানা দেশ দেখতে গিয়েছিলেন। এক-একজন মানুষের মনে কেমন নেশা থাকে, নূতন দেশ নূতন জায়গার কথা শুনলে তারা সেখানে ছুটে যেতে চায়। তারা অসুবিধার কথা ভাবে না, বিপদ-আপদের হিসাব করে না—একবার সুযোগ পেলেই হয়। মাঙ্গো পার্ক এইরকমের লোক ছিলেন। তাঁর বয়স যখন ২৪ বৎসর মাত্র, তখন তিনি নাইগার নদীর সন্ধান করতে গিয়েছিলেন। তার কিছুদিন আগে একজন ইংরাজ সেই অজানা দেশে ডাকাতের হাতে মারা যান—অথচ পার্ক তা জেনেও মাত্র দুজন সে-দেশী চাকর সঙ্গে সেই পথেই বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর উদ্দেশ্য সেই নদী ধরে ধরে তিনি আফ্রিকার ঐ অঞ্চলটা বেশ করে ঘুরে আসবেন। তখনও আফ্রিকার ম্যাপে সেইসব জায়গায় বড় বড় ফাঁক দেখা যেত আর সেগুলোকে 'অজানা দেশ' বলে লেখা হত।

সে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সে সময়ে অনেকটা আরব ও মূর জাতীয় মুসলমানদের হাতে ছিল। ইউরোপীয় লোক সেখানে গিয়ে পাছে তাদের ব্যবসা কেড়ে নেয়, এই ভয়ে সাহেব দেখলেই তারা নানারকম উৎপাত লাগিয়ে দিত। পার্ককেও তারা কম জ্বালাতন করেনি; কতবার তাঁকে ধরে বন্দী করে রেখেছে—তাঁর সঙ্গের জিনিসপত্র কেড়ে নিয়েছে—তাঁর লোকজনকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে এমনকি তাঁকে মেরে ফেলবার জন্যও অনেকবার চেষ্টা করেছে। তার উপর সে দেশের অসহ্য গরম আর নানারকম রোগের উৎপাতেও তাঁকে কম ভুগতে হয়নি। একবার জলের অভাবে তাঁর এত কষ্ট হয়েছিল যে, তিনি গাছের পাতা শিকড় ডাঁটা চিবিয়ে তৃষ্ণা দূর করতে চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু তাতে কি তৃষ্ণা যায়? সারাদিন পাগলের মতো জল খুঁজে খুঁজে, সন্ধ্যার কিছু আগে ঘোড়া থেকে নামতে গিয়ে, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তারপর যখন তাঁর জ্ঞান হল তখন তিনি চেয়ে দেখেন, ঘোড়াটা তখন তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে সূর্য অস্ত গেছে, চারিদিক ক্রমেই অন্ধকার হয়ে আসছে, কাজেই আবার তাঁকে ঘোড়ায় চড়ে জলের সন্ধানে বেরোতে হল। তারপর যখন তাঁর দেহে আর শক্তি নাই, মনে হল প্রাণ বুঝি যায় যায়, তখন হঠাৎ উত্তরদিকে বিদ্যুৎ চমকিয়ে উঠল। তা দেখে তাঁর আবার উৎসাহ ফিরে-এল, তিনি বৃষ্টির আশায় সেইদিকে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে ক্রমে ঠাণ্ডা বোধ হতে লাগল, বাদলা হাওয়া দেখা দিল, তারপর কড়্‌কড়্ করে বাজ পড়ে ঝমাঝম বৃষ্টি নামল। পার্ক তখন তাঁর সমস্ত কাপড় বৃষ্টিতে ধরে দিয়ে, সেই ভিজা কাপড় নিংড়িয়ে তার জল খেয়ে তৃষ্ণা দূর করলেন। তখন ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার রাত্রি, বিদ্যুতের আলোতে কম্পাস দেখে দিক স্থির করে, আবার তাঁকে সারারাত চলতে হল।

একবার তিনি সারাদিন না খেয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে এক সহরে গিয়ে হাজির হতেই, সেখানকার রাজা হুকুম দিলেন, "তুমি গ্রামে ঢুকতে পারবে না।" তিনি সেখান থেকে অন্য এক গ্রামে গেলেন, সেখানেও লোকেরা তাঁকে দেখে ভয়ে পালাতে লাগল—তিনি যে বাড়িতেই যান লোকে দরজা বন্ধ করে দেয়। শেষটায় হতাশ হয়ে তিনি একটা গাছের তলায় বসে পড়লেন। এইরকম অনেকক্ষণ বসে থাকবার পর, একটি নিগ্রো স্ত্রীলোক আর তার 'মেয়ে এসে, তাঁকে ডেকে তাদের বাড়িতে নিয়ে খেতে আর বিশ্রাম করতে দিল। সে-দেশীয় মেয়েরা সন্ধ্যার পর ঘরে বসে চরকায় সুতো

কাটে আর গান গায়। মাঙ্গো পার্কের নামে তারা গান বানিয়ে গেয়েছিল—সেই গানটার অর্থ এই—"ঝড় বইছে আর বৃষ্টি পড়ছে, আর বেচারা সাদা লোকটি শ্রান্ত অবশ হয়ে আমাদের গাছতলায় এসে বসেছে। ওর মা নেই, ওকে দুধ এনে দেবে কে? ওর স্ত্রী নেই, ওকে ময়দা পিষে দেবে কে? আহা, ঐ সাদা লোকটিকে দয়া কর।.ওর যে মা নেই, ওর যে কেউ নেই।"

তিনি অনেকবার 'মূর'দের হাতে পড়েছিলেন। এক একটা গ্রামে তিনি যান আর সেখানকার সর্দার তাঁকে ডেকে পাঠায়, না হয় লোক দিয়ে ধরপাকড় করে নিয়ে যায়। এইরকম অবস্থায় তারা তাঁর কাছ থেকে, প্রায়ই কিছু না কিছু বকশিস আদায় না করে ছাড়ত না। এমনি করে তাঁর সঙ্গের জিনিসপত্র প্রায় সবই বিলিয়ে দিতে হয়েছিল। একবার এক সর্দার তাঁর ছাতাটি তাঁর কাছ থেকে আদায় করে মহা খুশি! ছাতাটাকে সে ফট্ ফট্ করে খোলে আর বন্ধ করে; আর হো হো করে হাসে। কিন্তু ওটা দিয়ে কি কাজ হয়, সে কথাটা বুঝতে তার নাকি অনেকখানি সময় লেগেছিল। আসবার সময় মাঙ্গো পার্কের নীল কোট আর তাতে সোনালী বোতাম দেখে, সর্দার মশাই কোটটাও চেয়ে বসলেন। তখন সেটা তাকে না দিয়ে আর উপায় কি? যাহোক, সর্দারের মেজাজ ভাল বলতে হবে, সে ছাতা আর কোটের বদলে তাঁকে অনেক জিনিসপত্র সঙ্গে দিয়ে, তাঁর চলাফিরার সুবিধা করে দিল। কিন্তু সকল সময়ে তিনি এত সহজে পার পাননি। আলি নামে এক মূর রাজার দল তাঁকে বন্দী করে, মাসখানেক খুব অত্যাচার করেছিল। প্রথমটা তারা ঠিক করল যে, এই বিধর্মী খৃষ্টানকে মেরে ফেলাই ভাল। তারপর কি যেন ভেবে তারা আবার বলল, "ওর ঐ বেড়ালের মতো চোখ দুটো গেলে দেও।" যাহোক শেষটায় সেখানকার রানীর অনুগ্রহে তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন।

এমনি করে অত্যাচার অপমান চুরি ডাকাতি সব সহ্য করে, মাঙ্গো পার্ক শেষটায় একেবারে ফকির হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর লোকজন কাপড়চোপড় জিনিসপত্র, এমনকি ঘোড়াটি পর্যন্ত সঙ্গে রইল না। কিন্তু এত কষ্ট সয়েও শেষটায় যখন তিনি নাইগার নদীর সন্ধান পেলেন, তখন তাঁর মনে হল এত কষ্ট এত পরিশ্রম সব সার্থক হয়েছে। এমনি করে তিনি দুই বৎসর সে দেশ ঘুরে, তারপর দেশে ফিরে আসেন। এই দুই বৎসরের সব ঘটনা তিনি প্রতিদিন লিখে রাখতেন। আমরা এখানে যা লিখছি তার প্রায় সবই তাঁর সেই ডায়ারি থেকে নেওয়া।

আফ্রিকার নিগ্রো জাতীয় লোকদের আমরা সাধারণত 'অসভ্য জাতি' বলে থাকি—কিন্তু মাঙ্গো পার্ক বলেন যে, মূর বা আরব জাতীয় লোকেদের মধ্যে যারা কতকটা 'সভ্য' হয়েছে, তাদের চাইতে এই অসভ্যেরা অনেক ভাল। আমাদের দেশে যেমন সাঁওতালরা প্রায়ই খুব সরল আর সত্যবাদী হয়, মোটের উপর এরাও তেমনি। তাদের দেশে তারা বিদেশী লোক দেখেনি কাজেই হঠাৎ অদ্ভুত পোশাক পরা হলদে চুল নীল চোখ সাদা রঙের মানুষ দেখলে তাদের ভয় হবারই কথা। কিন্তু তবু বিপদ-আপদে পার্ক তাদের কাছেই সাহায্য পেতেন,—মূর বা আরবদের কাছে নয়।

দেশের নানান স্থানে নানান জাতীয় লোক, তাদের মধ্যে সর্বদাই যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে। একবার মাঙ্গো পার্ক মালাকোন্ডা বলে একটা সহরে এসে শুনলেন, আরও উত্তরে খুব বড় একটা লড়াই চলছে—'ফুতা-তরা'র রাজা আবুল কাদের অসভ্য জালফদের রাজা দামেলকে আক্রমণ করেছেন। এই আবুল কাদের আর দামেলের যুদ্ধ বড় চমৎকার। আবুল কাদের একজন দূতকে দিয়ে দামেলের কাছে দুখানা ছুরি পাঠিয়ে দিলেন, আর বলে দিলেন—"দামেল যদি মুসলমান হতে রাজি হন, তবে এই ছুরি দিয়ে আবুল কাদের নিজের হাতে তাঁর মাথা কামিয়ে দিবেন, আর যদি রাজি

না হন তবে ঐ ছুরিটি দিয়ে তাঁর গলা কাটা হবে। এর মধ্যে কোন্‌টি তাঁর পছন্দ?" দামেল একথা শুনে বললেন, "কোনটাই পছন্দ হচ্ছে না। আমি মাথাও কামাতে চাই না, গলায় ছুরিও বসাতে চাই না।" আবুল কাদের তখন প্রকাণ্ড দলবল সঙ্গে নিয়ে, জালফদের দেশে লড়াই করতে এলেন। জালফদের অত সৈন্য-সামন্ত নেই, তারা নিজেদের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে, পথের পাতকুয়া সব বন্ধ করে, সহর গ্রাম সব ছেড়ে পালাতে লাগল। এমনি করে তিনদিন পর্যন্ত আবুল কাদের ক্রমাগত এগিয়েও লড়াইয়ের কোন সুযোগ পেলেন না। তিনি যতই এগিয়ে চলেন, কেবল নষ্ট গ্রাম আর পোড়া সহরই দেখেন, কোথাও জল নাই খাবার কিছু নাই, লুটপাট করবার মতো কোন জিনিসপত্র নাই। চতুর্থ দিনে তিনি পথ বদলিয়ে সারাদিন হেঁটে একটা জলা জায়গার কাছে এলেন। সেখানে কোনরকমে তৃষ্ণা দূর করে ক্লান্ত হয়ে সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে, এমন সময় ভোর রাত্রে দামেল তাঁর দলবল নিয়ে, মারমার করে তাদের উপরে এসে পড়লেন। আবুল কাদেরের দল সে চোট আর সামলাতে পারল না—তাদের কেউ কেউ পালিয়ে গেল, অনেকে মারা পড়ল, কিন্তু অধিকাংশই জালফদের হাতে বন্দী হল—সেই বন্দীদের একজন হচ্ছেন আবুল কাদের নিজে। জালফরা মহা ফুর্তিতে আবুল কাদেরকে বেঁধে দামেলের কাছে নিয়ে গেল। সকলে ভাবল এইবার দামেল বুঝি তাঁর বুকে ছুঁরি মেরে তাঁর শত্রুতার প্রতিশোধ নেবেন। কিন্তু দামেল সেরকম কিছুই না করে, জিজ্ঞাসা করলেন, "আবুল কাদের, তুমি যথার্থ বল ত—আজ তুমি বন্দী না হয়ে যদি আমি বন্দী হতাম, আর তোমার কাছে আমায় নিয়ে যেত, তাহলে তুমি কি করতে?" আবুল কাদের বললেন, "তোমার বুকে আমার বল্লম বসিয়ে দিতাম। তুমি তার বেশি আর কি করবে?" দামেল বললেন, "তা নয়! তোমায় মেরে আমার লাভ কি? আমার এইসব নষ্ট ঘরবাড়ি কি আর তাতে ভাল হয়ে যাবে, আমার প্রজারা কতজনে মারা পড়েছে—তারা কি আবার বেঁচে উঠবে? তোমায় আমি মারব না। তুমি রাজা, কিন্তু রাজার ধর্ম থেকে তুমি পতিত হয়েছ। যতদিন তোমার সে দুর্মতি দূর না হয়, ততদিন তুমি রাজত্ব করবার যোগ্য হবে না—ততদিন তুমি আমার দাসত্ব করবে।" এইভাবে তিনমাস নিজের বাড়িতে বন্দী করে রেখে তারপর তিনি আবুল কাদেরকে ছেড়ে দিলেন। এখনও নাকি সে দেশের লোকেরা দামালের এই আশ্চর্য মহত্ত্বের কথা বলে গান করে।

নাইগার নদীর আশেপাশে যেসব নিগ্রোরা থাকে তাদের 'ম্যান্ডিঙ্গো' বলে। তাদের সম্বন্ধে পার্ক অনেক খবর সংগ্রহ করেছেন। তারা মনে করে, এই পৃথিবীটা একটা প্রকাণ্ড সমতল মাঠের মতো; তার শেষ কোথায় কেউ জানতে পারে না, কারণ তার চারিদিক মেঘে ঘেরা। তারা বছরের হিসাব দেয় বড় বড় ঘটনার নাম করে, যেমন 'কুরবানা যুদ্ধের বছর' 'দামেলের বীরত্বের বছর'। পার্ক যে-সকল গ্রামে গিয়েছিলেন, তার কোন কোনটিতে সেই বছরকে বলা হয় 'সাদা লোক আসবার বছর।'

এর পরেও পার্ক আর-একবার দলবল নিয়ে আফ্রিকায় যান এবং সেইখানেই প্রাণ হারান। এবার গোড়াতেই জ্বর-জারি হয়ে তাঁর লোকজন সব মারা যেতে লাগল। সাতচল্লিশজন সাহেবের মধ্যে তিন মাসে কুড়ি জন মারা গেল, বাকী অনেকগুলি অসুখে একেবারে কাহিল হয়ে পড়ল। চার মাসে তিনি আবার নাইগার নদীর ধারে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি আর সঙ্গে দুই-একটি নিগ্রো ছাড়া আর সকলেই প্রায় অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে। তাঁরপর তিনি নৌকায় চড়ে জলের পথে কয়েকদিন গেলেন, কিন্তু চারিদিক থেকে মুরেরা ক্রমাগত আক্রমণ করে তাঁদের ব্যতিব্যস্ত করে

তুলল। শেষটায় যখন তাঁর সঙ্গের সাতটি মাত্র সাহেব বেঁচে আছে, এমন সময় অনেক কষ্টে নিগ্রোদের দেশে এসে তিনি মনে করলেন, এতক্ষণে নিরাপদ হওয়া গেল। কিন্তু এইখানেই নদী পার হবার সময় তিনি দলবলশুদ্ধ নিগ্রোদের হাতে মারা গেলেন। তাঁর একটিমাত্র বিশ্বস্ত নিগ্রো চাকর, তাঁর চিঠিপত্র নিয়ে ফিরে এসে এই খবর দিল যে, নদীর স্রোতের মধ্যে নৌকাকে বেকায়দায় পেয়ে নিগ্রোরা তাঁদের মেরে কেটে সব লুটে নিয়েছে। তখন পার্কের বয়স ৩৪ বৎসর মাত্র।

ডেভিড লিভিংস্টোন

স্কটল্যান্ডের এক গরীব তাঁতির ঘরে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ডেভিড লিভিংস্টোনের জন্ম হয়। খুব অল্প বয়স হতেই ডেভিড তার বাপের সঙ্গে কারখানায় কাজ করতে যেত, সেখানে তাকে প্রতিদিন চৌদ্দ ঘন্টা খাটতে হত। কিন্তু তার উৎসাহ এমন আশ্চর্য রকমের ছিল যে, এত পরিশ্রমের পরেও সে রাত্রে একটা গরীব স্কুলে পড়তে যেত। যখনই একটু অবসর হত সে তার বই নিয়ে পড়ত, নাহয় মাঠে ঘাটে ঘুরে নানারকম পোকা মাকড় গাছ পাথর প্রভৃতি সংগ্রহ করে বেড়াত। এমনি করে লিভিংস্টোনের বাল্যকাল কেটে গেল। তারপর উনিশ বৎসর বয়সে তাঁর মাহিনা বাড়তে, বাড়ির অবস্থা একটু ভাল হল। তখন তিনি কারখানার মালিকের সঙ্গে এমন বন্দোবস্ত করে নিলেন, যাতে তিনি বছরে ছয় মাস কাজ করতেন আর বাকী ছ'মাস গ্লাস্‌গো সহরে গিয়ে পড়াশুনো করতেন। সেখানে কয়েক বছর ডাক্তারি পড়ে এবং ধর্মশিক্ষার পরীক্ষা পাশ করে, ২৭ বৎসর বয়সে তিনি অসভ্য জাতিদের মধ্যে শিক্ষা ও ধর্ম প্রচারের জন্য চাকুরি নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় গেলেন। আফ্রিকায় তখনও সাহেবরা বেশি যাতায়াত করেনি—ম্যাপের অনেক স্থানেই তখন আজানা দেশ বলে লেখা থাকত। সেই অজানা দেশে অচেনা লোকের মধ্যে লিভিংস্টোন বাস করতে গেলেন।

পাদ্রী ডাক্তার লিভিংস্টোন দেখতে দেখতে আফ্রিকার নানা ভাষা শিখে ফেললেন, সেখানকার লোকেদের সঙ্গে মিশে তাদের সুখ-দুঃখের কথা সব জানলেন—আর দেশটাকে তাঁর এত ভাল লাগল যে, তার সেবায় জীবনপাত করতে তিনি প্রস্তুত হলেন। সে দেশের লোকের বড় দুঃখ যে, দুষ্ট পর্তুগীজ আর আরব দস্যুরা তাদের ধরে নিয়ে দাস করে রাখে, ছাগল গরুর মতো হাটে বাজারে তাদের বিক্রি করে। বেচারীরা হাতীর দাঁত, পাখির পালক ও নানারকম জন্তুর চামড়ার ব্যবসা করে, বিলাতী জাহাজে করে সওদাগরেরা তাদের জিনিস কিনে নিয়ে যায়। কিন্তু মাঝপথে এইসব দুষ্টু লোকেরা তাদের মারধর করে বেঁধে নিয়ে যায়। লিভিংস্টোন এইসব অত্যাচারের কথা শুনে একেবারে ক্ষেপে গেলেন। তিনি বললেন, যেমন করে হোক, এ অত্যাচার থামাতে হবে।

তিনি দেখলেন, ব্যবসা করতে হলে সেই লোকদের এমন সব পথ দিয়ে যেতে হয়, যেখানে পর্তুগীজ আর আরবরা তাদের সহজেই ধরে ফেলতে পারে—সমুদ্রে যাওয়া আসার আর কোন সহজ রাস্তা তাদের জানা ছিল না। তাদের দেশে বাণিজ্যের কোন ভাল বন্দোবস্ত নাই। ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় লোকদের মধ্যে ব্যবসা চালাবার কোন সুযোগ নাই। লিভিংস্টোন তখন পথঘাটের সন্ধান করে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। বড় বড় নদীর পথ ধরে দিনের

পর দিন চলে চলে, কত নতুন দেশ নতুন পাহাড় নতুন লোকের খবর পেলেন। এই কাজ তাঁর এত ভাল লাগল আর তাতে তাঁর এত উৎসাহ হল যে, তিনি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে, পাদ্রির কাজ ফেলে, এই কাজেই দিন রাত লেগে রইলেন।

ক্রমে তিনি বুঝতে পারলেন, আফ্রিকার এপার ওপার পুব-পশ্চিম যাওয়ার মতো পথ পাওয়া গেলে তবে বাণিজ্যের খুব সুবিধা হয়। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে এই রাস্তার খোঁজে তিনি কয়েকজন সে-দেশী লোকের সঙ্গে কালাহারি মরুভূমি পার হয়ে ক্রমাগত উত্তর-পশ্চিম মুখে ঘুরতে ঘুরতে, পাঁচ বছরে পর্তুগীজ রাজ্যে পশ্চিম সমুদ্রের উপকূলে এসে হাজির হলেন। পথের কষ্ট এবং জ্বরে ভুগে তাঁর শরীর তখন একেবারে ভেঙে গেছে, আর যেন নড়বার শক্তি নাই। কিন্তু তিনি সহজে থামবার লোক নন; কয়েক মাস বিশ্রাম করেই তিনি আবার ফিরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এবার তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, সেখান থেকে একেবারে পূর্বদিকে সমুদ্রের কূল পর্যন্ত না গিয়ে তিনি থামবেন না।

জলের পথ দিয়ে নানা নদীর বাঁক ধরে ঘুরতে ঘুরতে, তিনি ক্রমে জাম্বেসি নদীতে এসে পড়লেন। তাঁর আগে আর কোন বিদেশী সে জায়গা দেখে নাই। সেখানকার লোকদের সঙ্গে তিনি আলাপ করে এক আশ্চর্য খবর শুনলেন। তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "তোমাদের দেশেও কি ধোঁয়ায় গর্জন করতে পারে?" লিভিংস্টোন বললেন, "সে কি রকম?" তারা বলল, "তুমি ধোঁয়া-গর্জনের পাহাড় দেখনি?" লিভিংস্টোনের ভারি আগ্রহ হল, এ জিনিসটা একবার দেখতে হবে। সেই জাম্বেসি নদী দিয়ে নৌকা করে তিনি অনেক দূর গিয়ে দেখলেন, এক জায়গায় ধোঁয়ার মতো পাঁচটা স্তম্ভ উঠেছে, তার চারদিকের দৃশ্য এত সুন্দর যে, লিভিংস্টোনের বোধ হল এমন চমৎকার স্থান তিনি আগে কখনও দেখেননি। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, নদীটা গেল কোথায়? সামনে খালি চড়া আর পাহাড়; নদীর চিহ্নমাত্র নাই—আর পাহাড়ের ওদিকে খালি ধোঁয়া আর গর্জন। সেইখানে নৌকা বেঁধে লিভিংস্টোন হেঁটে দেখতে গেলেন ব্যাপারখানা কি? গিয়ে যা দেখলেন তাতে তাঁর বোধ হল যে তাঁর জন্ম সার্থক—তাঁর এত বৎসরের পরিশ্রম সার্থক। তিনি দেখলেন, নদীটা একটা পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে ঢুকে পাহাড়ের পেট কেটে তিনশ হাত খাড়া ঝরনার মতো ঝরে পড়ছে। এত বড় ঝরনা লিভিংস্টোন কোনদিন চক্ষে দেখেননি। পড়বার বেগে ঝরনার জল ভয়ানক শব্দে ধোঁয়ার মতো ছড়িয়ে প্রায় ২০০ হাত উঁচু হয়ে উঠছে—তার উপর সূর্যের আলো পড়ে চমৎকার রামধনুর ছটা বেরিয়েছে—আর সেই ঝাপসা ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে রংবেরঙের গাছপালা পাহাড় জঙ্গল দেখা যাচ্ছে, ঠিক যেন ছিটের পর্দা।

এমনি করে কত আশ্চর্য আবিষ্কার করতে করতে লিভিংস্টোন একেবারে নূতন পথ দিয়ে দুই বছরে আফ্রিকার পূর্বকূলে এসে পড়লেন। তারপর দেশে ফিরে গিয়ে সকলের কাছে সম্মান লাভ করে, তিনি দলবল নিয়ে আবার সেই জাম্বেসি নদীর ধারে ফিরে গেলেন। এবারে তাঁর স্ত্রীও তাঁর সঙ্গে গেলেন—আর ইংরাজ গভর্নমেণ্ট তাঁকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তাঁর স্ত্রী মারা গেলেন, তারপর তাঁর সঙ্গের লোকজন অনেকেই ফিরে গেলেন। ক্রমে বিলাত থেকে খরচ আসাও বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু লিভিংস্টোন একাই নিজের খরচে ঘুরতে লাগলেন। এবার নূতন পথে তিনি উত্তর-পূর্ব মুখে বড় বড় হ্রদের দেশ দিয়ে, একেবারে ইজিপ্টের কাছে 'নায়াসাতে' এসে পড়লেন। তাঁর সঙ্গে সে-দেশী দু-চারটি লোক ছাড়া আর কেউ ছিল না—কিন্তু তারা তাঁকে এত ভালবাসত যে, ঘোর বিপদের মধ্যেও তাঁকে ছেড়ে যেতে রাজি হয়নি।

লিভিংস্টোন কি তাদের কম ভালবেসেছিলেন! সেই আঁধার দেশের লোকের দুঃখে তাঁর যে কি দুঃখ—তাঁর বইয়ের পাতায় পাতায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। পর্তুগীজদের অত্যাচারের বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর কথাগুলো যেন আগুন হয়ে উঠত। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ লেখা এই—"এই নির্জন দেশে বসে আমি এই মাত্র বলতে পারি, পৃথিবীর এই কলঙ্ক (দাস ব্যবসায়) যে মুছে দিতে পারবে—ভগবানের অজস্র আশীর্বাদে সে ধন্য হয়ে যাবে।"

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ৫০ বৎসর বয়সে তিনি শেষবার আফ্রিকায় ঘুরতে গিয়েছিলেন—তারপর আর দেশে ফেরেননি। এবার তিনি গোড়া হতেই নানারকম বিপদে পড়েছিলেন—তাঁর জন্য যে রসদ পাঠান হল কতক তাঁর কাছে পৌঁছলই না—বাকী সব চুরি হয়ে গেল। তারপর ক' বছর ধরে তাঁর আর কোন খবরই পাওয়া গেল না। ক্রমে দেশের লোক ব্যস্ত হয়ে উঠল, লিভিংস্টোনের কি হল জানবার জন্য চারিদিকে লেখালেখি চলতে লাগল। শেষটা স্টান্‌লি বলে একজন ওয়েল্‌শ যুবক তার খবর আনতে আফ্রিকায় গেলেন। এত বড় মহাদেশের মধ্যে একজন লোককে আন্দাজে খুঁজে বার করা যে খুবই বাহাদুরির কাজ, তাতে আর সন্দেহ কি? স্ট্যান্‌লি বছরখানেক ঘুরে তাঁর দেখা পেলেন বটে, কিন্তু তখন লিভিংস্টোনের মর-মর অবস্থা। তিনি এত রোগা আর দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে, দেখলে চেনা যায় না। স্ট্যান্‌লির সাহায্যে লিভিংস্টোন কতকটা সেরে উঠলেন এবং তাঁর সঙ্গে কিছুদিন ঘুরলেন, কিন্তু দেশে ফিরে যেতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, "আমি এই দেশের নির্জন নিস্তব্ধ জঙ্গলের মধ্যেই এ জীবন শেষ করব।"

তারপর, বছরখানেক পরে একদিন লিভিংস্টোন তাঁর বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে বসলেন,—আর উঠলেন না। তাঁর লোকেরা তাঁকে ডাকতে এল, তখন দেখল যে তিনি সেই অবস্থাতেই মারা গেছেন। বিশ্বাসী চাকরেরা অসাধারণ কষ্ট স্বীকার করে পাহাড় জঙ্গল পার হয়ে, সমুদ্রের কূল পর্যন্ত তাঁর মৃতদেহ বয়ে এনে জাহাজে তুলে দিল। ইংলণ্ডে যাঁরা বীর, যাঁরা দেশের নেতা, যাঁদের কীর্তিতে দেশের গৌরব বাড়ে, তাঁদের কবর দেওয়া হয় 'ওয়েস্টমিনস্টার এবি'তে। সেই ওয়েস্টমিনস্টার এবিতে যদি যাও, সেখানে লিভিংস্টোনের সমাধি দেখতে পাবে!

কলম্বস

চারশ বৎসর আগে ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে আসিতে হইলে সকলেই পূর্বমুখে পারস্যের ভিতর দিয়া আসিত। তখন পণ্ডিতেরা সবেমাত্র পৃথিবীটাকে গোল বলিয়া বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্রিস্টোফার কলম্বস নামে ইটালি দেশীয় এক নাবিক ভাবিলেন, যদি সত্য সত্যই পৃথিবীটা গোল হয়, তবে ত পূর্ব মুখে না গিয়া ক্রমাগত পশ্চিম মুখে গেলেও, সেই ভারতবর্ষের কাছাকাছিই কোথাও পৌঁছান যাইবে। এ-বিষয়ে তাঁহার বিশ্বাস এতদূর হইয়াছিল যে, তিনি ইহা প্রমাণ করিবার জন্য আপনার প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু কেবল বিশ্বাস আর সাহস থাকিলেই হয় না—কলম্বস গরীব লোক, তিনি জাহাজ পাইবেন কোথা, লোকজন জোগাড় করিবেন কিসের ভরসায়? তিনি দেশে দেশে ধনীলোকদের কাছে দরখাস্ত করিয়া ফিরিতে ফিরিতে পর্তুগালে আসিয়া হাজির হইলেন। ক্রমে তাঁহার মতলবের কথা রাজার কানে গিয়া পৌঁছিল—তিনি তাঁর মন্ত্রীদের উপর এই বিষয়ে তদন্ত করিবার ভার দিলেন। মন্ত্রীরা ভাবিল, 'এ লোকটার কথা যদি সত্য হয়, তবে খামখা এই বিদেশীকে সাহায্য না করিয়া, আমরাই একবার এ চেষ্টাটা করিয়া

দেখি না কেন?' তাঁহারা কলম্বসের কাছে তাহার হিসাবশুদ্ধ সমস্ত নকশা চাহিয়া লইলেন, এবং গোপনে কয়েকজন পর্তুগীজ নাবিককে সেই পশ্চিমের পথে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু কিছুদূর না যাইতেই ঝড় তুফান আর কেবল অকূল সমুদ্র দেখিয়া তাহারা ভয়ে ফিরিয়া আসিল। কলম্বস যখন জানিতে পারিলেন যে, রাজকর্মচারীরা তাঁহাকে এইভাবে ঠকাইতে চেষ্টা করিতেছেন, তখন রাগে ও ঘৃণায় তিনি সে দেশ ত্যাগ করিয়া স্পেন রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইখানে সাত বৎসর রাজদরবারে দরখাস্ত বহিয়া, তারপর রাণী ইসাবেলার কৃপায় তিনি তাঁহার এতদিনের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার সুযোগ পাইলেন। ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ ঠিক ৪২৫ বৎসর পূর্বে কলম্বস ভারতবর্ষের সন্ধানে যাত্রা করেন।

ক্রমাগত ৭০দিন পশ্চিম মুখে চলিয়াও কলম্বস ডাঙার সন্ধান পাইলেন না। ইহার মধ্যে তাঁহার সঙ্গের লোকেরা কতবার নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে, কতবার তাহারা বাড়ি ফিরিবার জন্য জেদ করিয়াছে, সমুদ্রের কূল-কিনারা না দেখিয়া কতজন ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়াছে—এমনকি কলম্বসকে মারিয়া ফেলিবার জন্যও তাহারা কতবার ক্ষেপিয়াছে। কিন্তু কলম্বস অটল প্রশান্তভাবে সকলকে আশ্বাস দিয়াছেন, "ভয় নাই! আরেকটু ভরসা করিয়া চল, সমুদ্রের শেষ পাইবে।" ৭১ দিনের দিন দূরে কূল দেখা দিল। তখন সকলের আনন্দ দেখে কে। পরদিন তাঁহারা নূতন দেশে এক অজানা দ্বীপে অজানা জাতির মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। তারপর কি আনন্দে সে দেশ হইতে নানা ধনরত্ন অলংকারে জাহাজ ভরিয়া, সে-দেশী লোক সঙ্গে লইয়া তাঁহারা সেই সংবাদ দিবার জন্য দেশে ফিরিলেন। তখন দেশে কলম্বসের সম্মান দেখে কে: কলম্বস ভাবিয়াছিলেন তিনি ভারতবর্ষের কাছে কোন দ্বীপে আসিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি যেখানে গিয়াছিলেন সেটা আমেরিকার বাহামা দ্বীপপুঞ্জের কাছে। ইহার পর তিনি আরও দুবার পশ্চিমে যান, এবং শেষের বার আমেরিকা পৌঁছিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, তিনি ভারতবর্ষ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার এই ভুলের জন্যই এখনও আমেরিকার লোকেদের 'ইন্ডিয়ান' বলা হয়—আর ম্যাপে ঐ দ্বীপগুলার নাম লেখা হয় পশ্চিম ইন্ডিজ (West Indies)।

দুঃখের বিষয়, শেষ জীবনে কলম্বসের অনেক শত্রু জুটিয়াছিল, তাহারা রাজার কাছে কোনরকম নালিশ করিয়া রাজাকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তোলে। রাজা কলম্বসকে সভায় হাজির করিবার জন্য লোক পাঠান—তখন কলম্বস ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ। রাজার লোক কলম্বসের হাতে শিকল বাঁধিয়া, তাঁহাকে জাহাজে কয়েদ করিয়া রাজার কাছে চালান দিল। সৌভাগ্যক্রমে বৃদ্ধের দুর্দশা দেখিয়া রাজার মনে কি দয়া হইল, তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু কলম্বস এ অপমানের কথা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভুলিতে পারেন নাই। মানুষের অকৃতজ্ঞতার কথা ভাবিতে ভাবিতে, দারিদ্র্য ও অনাদরের মধ্যেই এই কীর্তিমান পুরুষের জীবন শেষ হইল।

জোয়ান

সে প্রায় পাঁচশ বছর আগেকার কথা। ফরাসি জাতির তখন বড়ই দুঃখের দিন। দেশের রাজা হলেন পাগল—আর অপদার্থ রাজপুত্র সারাদিন আমোদেই মত্ত। দেশের মধ্যে কোথাও শান্তি নেই, শৃঙ্খলা নেই—চারিদিকে কেবল দলাদলি আর যুদ্ধবিবাদ। ঘরের শত্রু দেশের

লোক, তার উপর বাইরের শত্রু ইংলন্ডের রাজা। দেশশুদ্ধ সবাই দলাদলি নিয়ে ব্যস্ত, সেই সুযোগে ইংরাজরাজ দলবলশুদ্ধ ফ্রান্সের মধ্যে ঢুকে একধার থেকে দেশটা দখল করতে আরম্ভ করেছেন। তাঁকে বাধা দিবার কেউ নাই। এমনই দেশের দুর্দিন।

ফ্রান্সের এক নগণ্য গ্রামের সামান্য এক কৃষকের মেয়ে, তার নাম জোয়ান। সমস্ত দেশের দুঃখ যেন এই মেয়েটির প্রাণে এসে বেজেছিল। ফ্রান্সের পাহাড় নদী, ফ্রান্সের ঘরবাড়ি সব যেন তার আপনার জিনিস ছিল। ফরাসি বীরদের আশ্চর্য কাহিনী শুনতে শুনতে তার উৎসাহ আগুন হয়ে জ্বলে উঠত, আর ফরাসিদের দুঃখের কথা ভাবতে ভাবতে তার চোখের জল আর ফুরাত না। ফ্রান্সকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। আর ভালবাসত তার আপনার গ্রামটিকে। সেই মিউজ নদীর ধারে ছোট্ট ডমরেমি গ্রামটি, তার গির্জার গায়ে কত সাধু 'সেইন্ট্' কত মহাপুরুষের পাথর মূর্তি। সেখানে সারাদিন গির্জার ঘণ্টা বাজে আর গির্জার জানালা দিয়ে রঙিন আলো বাইরে আসে। সেখানে বুড়ো এক গাছ আছে, আর দেবতার কুয়ো আছে, তাদের সম্বন্ধে কত আশ্চর্য গল্প লোকের কাছে শোনা যায়। জোয়ানের কাছে এ সমস্তই সুন্দর আর সমস্তই সত্যি বলে মনে হত। সে অবাক হয়ে গির্জার কাছে বাগানে এসে বসে থাকত, আর ভাবত কে যেন তাকে ডাকছে। দেশের দুঃখে সে যখন কাঁদত তখন কে যেন তাকে বলত, "ভয় নাই, জোয়ান! তোমার এ দুঃখ আর থাকবে না।" জোয়ান চেয়ে দেখত কোথাও কেউ নাই, খালি সেন্ট মাইকেলের ঝক্ঝকে সুন্দর মূর্তিটি যেন তার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে কারা যেন আলোর পোশাক পরে তার কাছ দিয়ে চলে যেত। জোয়ান কিছু বুঝত না, কেবল আনন্দে তার সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত, তার দু চোখ বেয়ে দরদর করে জল পড়ত। এমনি করে কতদিন যায়, একদিন হঠাৎ সে শুনল কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে। অতি মধুর অতি সুন্দর গলায় কে যেন বলছে "জোয়ান! দুঃখিনী জোয়ান! ঈশ্বরের প্রিয় কন্যা জোয়ান! তুমি ওঠ। তোমার দেশকে বাঁচাও; রাজপুত্র আমোদ-বিলাসে ডুবে আছেন, তাঁকে উৎসাহ দাও; সৈন্যদের মনে নতুন সাহস জাগিয়ে তোল; রাজমুকুট রাজাকে ফিরিয়ে এনে দাও।" জোয়ান স্তব্ধ হয়ে সব শুনতে লাগল। সে যেন সত্যি সত্যিই দেখল সে আর সেই সামান্য কৃষকের মেয়ে নয়। তার মনে অদ্ভুত সাহস আর শক্তি এসেছে। সে যেন স্পষ্ট দেখতে পেল যে ফ্রান্সের সৈন্য আবার বিপুল তেজে যুদ্ধ করছে, আর সে নিজে অস্ত্র ও পতাকা নিয়ে তাদের আগে আগে চলেছে।

এ কি অদ্ভুত কথা! সামান্য চাষার মেয়ে, সে না জানে লেখাপড়া, না জানে সংসারের কিছু, তার উপর একি অসম্ভব আদেশ! কিন্তু জোয়ানের মনে আর কোন সন্দেহ হল না। সে সকলকে বলল, "আমায় রাজার কাছে নিয়ে চল।" এ কথা যে শোনে সেই হাসে, সেই বলে "মেয়েটা পাগল।" তার বাবা বললেন, "মেয়েটার বড় সাহস বেড়েছে, কোন্দিন বিপদ ঘটাবে দেখছি।" গ্রামের যে সর্দার সে বলল, "মেয়েটাকে ঘরে নিয়ে বন্ধ করে রাখ।" গির্জার যে বুড়ো পাদ্রি সেও এসে জোয়ানকে গালাগালি দিয়ে শাসিয়ে গেল। কিন্তু জোয়ান তবু তার সেই এক কথাই বলে "আমি রাজার কাছে যাব।" যাহোক শেষে জোয়ানের কথাই ঠিক হল। ছদ্মবেশে গ্রাম থেকে বেরিয়ে, কত বাধা বিপদের ভিতর দিয়ে প্রায় আড়াই শ মাইল পথ পার হয়ে একদিন সে সত্যি সত্যিই রাজদরবারে গিয়ে হাজির হল। সেখানে গিয়ে সে রাজার কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল "আমি চাষার মেয়ে জোয়ান। ভগবান আমায় পাঠিয়েছেন শুধু এই কথা বলবার জন্য যে, রীম্স্ নগর জয় করে আবার তুমি রাজা হবে।" পাড়াগেঁয়ে চাষার মেয়ে, তার মুখে এমন কথা শুনে সভাশুদ্ধ সকলে হেসে অস্থির। কিন্তু রাজার মুখে হাসি নেই—তিনি জোয়ানের শান্ত

মুখের দিকে চেয়ে তার কথা শুনছেন আর তাঁর মনে হচ্ছে—এ মেয়ে বড় সামান্য মেয়ে নয়; এ যা বলছে তা সত্যি হবে। তখনই হুকুম হল "সৈন্যেরা সব প্রস্তুত হও, আবার যুদ্ধে যেতে হবে। ঈশ্বরের দূত জোয়ান তোমাদের সেনাপতি হবেন।"

তারপর মহা উৎসাহে সব ফিরে চলল। যেদিকে ইংরাজ সৈন্য গ্রাম নগর সব দখল করে পথঘাট আগলিয়ে আছে সেইদিকে সবাই চলল। ঝক্‌ঝকে সাদা বর্ম পরে যোদ্ধার বেশে চাষার মেয়ে তাদের আগে আগে চলেছে। তার হাতে সাদা নিশান, তার উপর সোনালী কাজ করা যীশুখৃষ্টের মূর্তি। চারিদিকের গ্রামবাসীরা এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখবার জন্য ছুটে এল—তারা জোয়ানকে ঘিরে আনন্দে কোলাহল করে বলতে লাগল "দেবতার মেয়ে জোয়ান! দেবতার মেয়ে জোয়ান!" এমনি করে সকলে মিলে অর্লেয়াঁ সহরে ইংরাজের শিবিরের সামনে উপস্থিত হল। সেইখানে এসে জোয়ান ইংরাজের কাছে এই খবর পাঠাল, "তোমরা আমার কথা শোন। নগরের চাবি আমার কাছে দিয়ে তোমরা এ সহর ছেড়ে চলে যাও, এ দেশ ছেড়ে তোমাদের দেশে ফিরে যাও। যদি না যাও তবে আমি তোমাদের দুর্গ ভেদ করে যাব আর চারিদিক এমন তোলপাড় করে তুলব যে হাজার বছর কেউ এ দেশে তেমন কাণ্ড দেখেনি।" ইংরাজ হেসে বললেন, "চাষার মেয়ে, চাষবাস গরুবাছুর নিয়ে থাক।" কিন্তু জোয়ান তার দলবলশুদ্ধ যখন ইংরাজ শিবির আক্রমণ করলেন, তখন তার অদ্ভুত উজ্জ্বল মূর্তি দেখে ইংরাজের সাহস ও বুদ্ধিবল সব যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল। কে বা তখন যুদ্ধ করে, কে বা ফরাসি সৈন্যের সামনে দাঁড়ায়—দু একবার মাত্র আক্রমণের বেগ সহ্য করে ইংরাজ সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এক সপ্তাহ মধ্যেই অর্লেয়াঁ সহর উদ্ধার হয়ে গেল। এই সংবাদ যখন দেশময় ছড়িয়ে পড়ল তখন ফরাসিদের মনে কি যে উৎসাহের আগুন জ্বলে উঠল, তার আর বর্ণনা হয় না।

কিন্তু ফ্রান্সের যাঁরা সেনাপতি ছিলেন, তাঁদের হিংসুকে মনগুলো হিংসায় জ্বলতে লাগল। তাঁরা এতদিন যা করতে পারলেন না, একটা কোথাকার পাড়াগেঁয়ে চাষার মেয়ে কিনা তাই করে দিল। তাঁরা ভিতরে ভিতরে নানারকম শত্রুতা করে জোয়ানের কাজে বাধা দিতে লাগলেন। কিন্তু তাঁরা শত্রুতা করে আর কি করবেন—সৈন্যেরা তখন জোয়ানকেই মানে, দেশের লোক জোয়ানের কথাই শোনে, জোয়ানকে তারা দেবতার মতো ভক্তি করে। এমনি করে জোয়ান গ্রামের পর গ্রাম, সহরের পর সহর উদ্ধার করতে করতে তাঁর সেই পুরানো ডমরেমি গ্রামের কাছে এসে পড়লেন। গ্রামের লোকেরা তখন দল বেঁধে তাদের জোয়ানকে দেখতে চলল। তারা দেখল, ফ্রান্সের সৈন্য আবার উৎসাহ করে যুদ্ধে চলেছে, আবার ফ্রান্সের গৌরবে তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে,—আর তাদের আগে আগে রাজার সঙ্গে শ্বেত পতাকা নিয়ে আলোর মতো উজ্জ্বল পোশাকে চলেছেন চাষার মেয়ে জোয়ান! যারা আগে জোয়ানকে ঠাট্টা করেছিল, বাধা দিয়েছিল, শাসন করতে চেয়েছিল, তারা আজ গর্ব করে বলতে লাগল, "এই ত আমাদের জোয়ান—আমাদের গ্রামের মেয়ে।" আর জোয়ানের বাবা, সেই বৃদ্ধ চাষা যে তার মেয়েকে ডুবে মরবার কথা বলেছিল, আনন্দে তার দু চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। সে বলল, "আমার ঘরেও এমন মেয়ে জন্মেছিল!"

সেনাপতিরা চলেছেন পদে পদে বাধা দিবার জন্য। এক একটা সহর জয় হয় আর তাঁরা রাজাকে বলেন, "আর গিয়ে কাজ নাই। হঠাৎ সৈন্যদের একটু উৎসাহ হয়ে কতগুলো সহর দখল করা গেছে। কিন্তু বেশি লোভ করলে, এর পরে ভাবি বিপদ হবে।" কিন্তু জোয়ান বলে, 'আমি জানি, রীম্‌স্ নগর পর্যন্ত আমায় যেতে হবে সেখানে রাজার অভিষেক হবে।" যখন রাজার মনও বিমুখ হয়ে পড়ল, তখন জোয়ান কেঁদে বলল, "আর কিছুদিন আমার কথা শুনুন—তারপর

আমি চলে যাব। শেষে আর সময় হবে না, আমি আর এক বছরের বেশি বাঁচব না।" যখন ত্রয় নগরের কাছে এসে ইংরাজের সৈন্যদল দেখে কাপুরুষ রাজা মন্ত্রণা করতে বসলেন, তখন জোয়ান তাঁর মন্ত্রণাসভায় ঢুকে বলল, "এমন করে সময় নষ্ট করবেন না।" সভার মন্ত্রীরা বললেন, "তোমায় ছয়দিন মাত্র সময় দিলাম, এর মধ্যে যদি সহর দখল করতে না পার, তাহলে আমরা ফিরে যাব।" জোয়ান বলল "ছয়দিন কেন? তিনদিন সময় দিন।" তার পরের দিনই সে সৈন্য নিয়ে ত্রয় নগরের দ্বারে উপস্থিত হতেই ইংরাজ প্রহরীরা বিনাযুদ্ধেই দ্বার ছেড়ে পথ ছেড়ে সহর ছেড়ে উত্তরের দিকে সরে পড়ল। তারপর ক্রমে রীম্‌স্‌ নগরও উদ্ধার হল; মহা সমারোহ করে রাজার অভিষেক হয়ে গেল; জোয়ান নিজের হাতে রাজার মাথায় মুকুট তুলে দিল। তখন রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "ফ্রান্সের গৌরবমণি জোয়ান! আজ তুমি কি পুরস্কার পেতে ইচ্ছা কর?" জোয়ান বলল, "আমার ত সব ইচ্ছাই পূর্ণ হয়েছে—যদি অনুগ্রহ করতে চান, তবে আমার জন্মস্থান ডমরেমি গ্রামকে আজ থেকে খাজনামুক্ত করে দিন।" সেই থেকে আজ পর্যন্ত ডমরেমি গ্রাম আর সরকারী খাজনা দেয় না—আজও রাজস্ব হিসাবের খাতায় জোয়ানের নাম করে বলা হয়, তার খাতিরে খাজনা মাপ।

তারপর জোয়ান বলল, "আমার কাজ এখন শেষ হয়েছে। এখন আমি আমার গ্রামে ফিরে যাই।" কিন্তু সেনাপতিরা উল্টাসুর ধরে বললেন, "এতদূর এলাম যখন, তখন প্যারিস পর্যন্ত যাওয়া যাক।" জোয়ানের মনে এতদিন আশা ছিল, উৎসাহ ছিল, কিন্তু এখন যেন আর তার সে ভরসা নাই। এতদিন তার মনে হত দেবতারা তার সঙ্গে আছেন, আজ প্রথম তার মনে হল সংসারে সে একা—পৃথিবীতে কেউ তার সহায় নেই। তবু রাজার আদেশ মানতে হবে। জোয়ান সৈন্য নিয়ে প্যারিসের দিকে চললেন। কিন্তু দুদিন না যেতেই অকৃতজ্ঞ নরাধম রাজা গোপনে ইংরাজের সঙ্গে সন্ধি করে, জোয়ানকে শত্রুর মুখে ফেলে নিজে দলবল নিয়ে সরে পড়লেন। জোয়ানের জীবনে এই প্রথমবার তার পরাজয় হল। এমন বিশ্বাসঘাতক কাপুরুষ রাজা, কিন্তু জোয়ান তাকে ছাড়তে পারল না। দুদিন যেতে না যেতেই রাজা আবার বিপদে পড়েছেন; সে খবর শুনেই জোয়ান তাঁর উদ্ধারের জন্য সৈন্য নিয়ে ছুটে গেল। এই তার শেষ যাত্রা। একদিন ঘোর যুদ্ধের মধ্যে তার নিজেরই দলের লোক তাকে ইংরাজের কাছে ধরিয়ে দিল।

তারপর সে কি দুঃখের দিন! শিশুর মতো নির্মল সুন্দর জোয়ানকে পশুর মতো খাঁচার মধ্যে পুরে, শিকল দিয়ে তার হাত পা বেঁধে তার শত্রুরা তাকে ধরে নিয়ে গেল। কত লোকে কাঁদল, কত লোকে তার জন্য আকুল হয়ে প্রার্থনা করল, কিন্তু দেশের রাজা, দেশের বীর যোদ্ধা সেনাপতি, কেউ তার উদ্ধারের জন্য ছুটে গেল না, কেউ তার হয়ে একটি কথা পর্যন্ত বলল না। রাজা নির্বাক নিশ্চিন্ত, রাজার বিরোধী যারা তারা ইংরাজের সঙ্গে যোগ দিল। দেশী বিদেশী সকল শত্রু মিলে এই একটি অসহায় মেয়েকে ধ্বংস করবার জন্য মিথ্যা বিচারের ভড়ং করতে বসল। কত তর্জন শাসন, আর কত অন্যায় নির্যাতন করে কত মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে, তারা জোয়ানকে জব্দ করতে চাইল। যুদ্ধের মধ্যেও যে কাউকে আঘাত করেনি; যুদ্ধের সময়েও যে একদিনের জন্যও ভগবানকে ভোলেনি; যার শেষ বিশ্বাস ছিল অস্ত্রে নয়, বর্মে নয়, কিন্তু দেবতার আশীর্বাদে; ধর্ম-ব্যবসায়ী পাদ্রিরা তাকে শয়তানের দূত বলে, ধর্মদ্রোহী মিথ্যাবদী বলে, পুড়িয়ে মারবার হুকুম দিলেন। শেষ পর্যন্ত জোয়ানের বিশ্বাস টলেনি। সে নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল, "যা করেছি, দেবতার আদেশে করেছি। তার জন্য আমার কোন অপরাধ হয়নি।" কিন্তু যখন তাকে খোঁটার মধ্যে বেঁধে

চারিদিকে কাঠ সাজিয়ে দিল, যখন নিষ্ঠুর ঘাতকেরা মশাল নিয়ে সেই কাঠে আগুন ধরাতে এল, তখন ভয়ে তার বুক কেঁপে উঠল। তার মনে হল সেই ডমরেমি গ্রামের কথা,— সেই যে গির্জার ধারে দেবতার বাণী সে শুনেছিল, সেই যে আলোর মতো দেবতারা তাকে ডেকে ডেকে আশার কথা বলেছিলেন,—সেই কথা তার মনে হল। কিন্তু হায়! সেই দেবতারা আজ কোথায়? তাঁরাও কি জোয়ানকে ভুলে গেলেন? অসহায় শিশুর মতো জোয়ান কেঁদে উঠল "সেন্ট মাইকেল। সেন্ট মাইকেল! আজ তুমি কোথায়?" সে ব্যাকুল ডাক শুনে নিষ্ঠুর বিচারকের চোখেও জল এল। চারিদিকে কান্নার রোল উঠল। কিন্তু অন্ধ হিংসার শাসন টলবার নয়। যার পায়ের ধুলো নেবার যোগ্য তারা নয়, সেই মেয়েকে পুড়িয়ে মেরে ধর্মযাজকেরা নিশ্চিন্ত হলেন,—ভাবলেন যাহোক এতদিনে ধর্ম বাঁচল।

পিপাসার জল

ইংলন্ডের ইতিহাসে বীরত্বের জন্য যাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয়, সার ফিলিপ সিডনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। রানী এলিজাবেথ হইতে সাধারণ প্রজা পর্যন্ত সকলেই তাঁহার বীরত্বের কথা জানিত এবং তাঁহাকে সম্মান করিত। এলিজাবেথ বলিতেন, "সার ফিলিপ এই যুগের শ্রেষ্ঠ রত্ন।" সার ফিলিপ যে একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি কেবল যোদ্ধা ছিলেন না,—একাধারে যোদ্ধা, পর্যটক, পন্ডিত, গায়ক ও কবি ছিলেন। কিন্তু লোকে আজও যে তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া রাখিয়াছে, সে কেবল তাঁহার সাহস, বাহুবল বা প্রতিভার জন্য নয়। নানাদিকে তাঁহার নানা কীর্তির কথা যদি সমস্তই লোপ পাইয়া যায়, তবু তাঁহার মৃত্যুকালের শেষ বীরত্বের কাহিনীই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

সুটফেনের যুদ্ধে আহত হইয়া সার ফিলিপের মৃত্যু হয়। যুদ্ধের আরম্ভেই তাঁহার ঘোড়া মরিয়া যায় এবং তিনি আহত হইয়া মাটিতে পড়েন। কিন্তু তাঁহার যুদ্ধের উৎসাহ তখনও মিটে নাই; তখনই আর এক ঘোড়া সংগ্রহ করিয়া তিনি আবার যুদ্ধের মাঝখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। খানিকক্ষণ ভাষণ যুদ্ধের পর তাঁহার এ ঘোড়াটিও যখন মারা পড়িল, তখন তিনি আবার এক ঘোড়া আনিয়া তৃতীয়বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এবারে শত্রুপক্ষের একটি গুলি তাঁহার বুকে লাগিয়া তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিল এবং তাঁহার ঘোড়া পাগলের মতো ছুটিতে ছুটিতে তাঁহাকে শিবিরের কাছে আনিয়া ফেলিয়া দিল। তাঁহার দলের লোকেরা সেখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল; কিন্তু ডাক্তার বলিলেন, বাঁচিবার কোন আশা নাই।

জ্বরে ও যন্ত্রণায় অবসন্ন হইয়া যখন তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল, তখন দারুণ পিপাসা দেখা দিল,—একটু জলের জন্য তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে জল কি সব সময় পাওয়া যায়? বহু চেষ্টার পর অনেক কষ্টে একটি ঘটিতে করিয়া একটু জল আনিয়া তাঁহার হাতে দেওয়া হইল। তিনি মাথা তুলিয়া সেই জল পান করিতে যাইবেন, এমন সময়ে হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, যে তাঁহারই পাশ দিয়া দুজন লোকে একটি আহত সৈনিককে লইয়া যাইতেছে; এবং সে বেচারী এমন করুণভাবে তাঁহার ঘটিটার দিকে তাকাইয়া আছে, যে মনে হয়, একটু জল পাইলে সে যেন বাঁচিয়া যায়। সার ফিলিপ তৎক্ষণাৎ ঘটিটি তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "এই নাও, আমার চাইতে তোমার দরকার বেশি।" ("Thy need is greater than mine")

ইহার কিছু পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সারা জীবন নানা বীরত্বের পরিচয় দিয়া, মৃত্যুকালেও তিনি দেখাইয়া গেলেন যে তিনি কত বড় বীর।

আর একজন বীরের কথা শোনা যায়, যিনি পিপাসার সময়ে হাতের কাছে জল পাইয়াও সে জল পান করিতে চাহেন নাই। অস্ট্রিয়ার রাজা রুডল্‌ফ্‌ একবার যুদ্ধ যাত্রা করিয়া সসৈন্যে এমন জায়গায় গিয়া পড়িলেন, যেখানে আশেপাশে কোথাও জল পাওয়া যায় না। জল আনিবার জন্য বহুদূরে লোক পাঠান হইল; তাহারা কখন ফিরিবে, পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া সকলে তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বেলা যতই বাড়িয়া চলিল, জলের জন্য সকলে ততই অস্থির হইয়া পড়িতে লাগিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "আহা, আমাদেরই এত যন্ত্রণা, রাজা রুডল্‌ফ্‌ না জানি কত কষ্ট পাইতেছেন।" শেষে এদিক ওদিক অনেক খুঁজিয়া এক পথিকের কাছে এক পেয়ালা জল পাওয়া গেল। সেই জল আনিয়া রাজাকে দেওয়া হইল। রুডল্‌ফ্‌ জলের পেয়ালা হাতে লইয়া বলিলেন, "এতগুলি তৃষ্ণার্ত লোক, এতটুকু জলে তাহাদের কি হইবে? আমার পিপাসা শুধু আমার নিজের জন্য নয়; আমার প্রত্যেক সৈন্যের পিপাসা যতক্ষণ না মিটিবে ততক্ষণ আমার তৃষ্ণা মিটিবে কিরূপে?" এই বলিয়া তিনি পেয়ালা মাটিতে উপুড় করিয়া পৃথিবীর জল পৃথিবীকে ফিরাইয়া দিলেন।

আর একটি এইরূপ গল্প আছে, সেও বহুদিনের কথা। প্রায় তিনশ বৎসর আগে সুইডেনের সঙ্গে ডেনমার্কের যুদ্ধ হইয়াছিল। একটি যুদ্ধের পর অনেকগুলি আহত লোক যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন ডেন সৈনিকের সঙ্গে এক বোতল জল ছিল। বোতল খুলিয়া সে সবেমাত্র জল পান করিতে যাইবে, এমন সময় সে শুনিতে পাইল একটু দূরে কে যেন যন্ত্রণায় কোঁকাইতেছে। শুনিয়া তাহার মনে ভারি দয়া হইল; সে টানিয়া হ্যাঁচড়াইয়া কোনরকমে সেই লোকটির কাছে গিয়া দেখিল, সে একজন শত্রুপক্ষীয় সুইড। কিন্তু ডেন সৈনকটি শত্রুমিত্র বিচার না করিয়া মুমূর্ষু শত্রুর মুখের কাছে বোতল লইয়া বলিল, "আহা! তোমার বড় বেশি আঘাত লাগিয়াছে—এই জল খাও।" সুইড সৈনিক এক মুহূর্ত কি ভাবিয়া, হঠাৎ এক পিস্তল তুলিয়া জলদাতার কাঁধে গুলি করিল। ডেন বেচারী, শত্রুর উপকার করিতে গিয়া আবার সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়া পড়িয়া গেল।

এমন করিলে কাহার না রাগ হয়? ডেন চীৎকার করিয়া বলিল, "হতভাগা, আমি তোকে জল দিতে গেলাম, আর তুই আমায় খুন করিতে উঠিলি? দাঁড়া, তোকে আমি আচ্ছারকম শাস্তি দেই। আগে সবটা জল তোকে দিতেছিলাম, এখন অর্ধেকের বেশি কখনই দিব না।" এই বলিয়া সে বোতলের জল খানিকটা পান করিয়া, তারপর বোতলটা শত্রুর হাতে গুঁজিয়া দিল।

ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল

এক চাষার এক কুকুর ছিল, তার নাম ক্যাপ। একদিন এক দুষ্ট লোকে পাথর ছুঁড়িয়া ক্যাপের একটি পা খোঁড়া করিয়া দিল। চাষা ভাবিল, 'এই খোঁড়া কুকুর লইয়া আমি কি করিব? এ আর আমার কোন কাজে লাগিবে না।' শেষটায় কুকুর বেচারাকে মারিয়া ফেলাই ঠিক হইল। একটি ছোট মেয়ে, তার নাম ফ্লরেন্স, সে এই কথা শুনিতে পাইয়া বলিল, "আহা মারবে কেন? আমায়

দেও, আমি ওকে সারিয়ে দেব।" তারপর সে ক্যাপকে বাড়িতে লইয়া গিয়া তার পায়ে পট্টি বাঁধিয়া, তাহাতে ঔষধ দিয়া, সেঁক দিয়া, রীতিমত শুশ্রূষা করিয়া কয়েক দিনের মধ্যেই তাহার খোঁড়া পা সারাইয়া দিল। তখন সেই চাষা বলিল, "ভাগ্যিস আপনি ছিলেন, তা নইলে আমার এমন কুকুরকে আমি মিছামিছি মেরে ফেলতাম।"

কেবল এই একটি ঘটনা নয়, প্রায়ই এমন দেখা যাইত যে, মেয়েটি হয়ত বাগানে বেড়াইতেছে, আর কাঠবিড়ালিগুলা তাঁহার কাছ হইতে খাবার লইবার জন্য চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিতেছে। বাড়ির ঘোড়াটা পর্যন্ত তাঁর গলার আওয়াজ শুনিলে, বেড়ার উপর দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিত! ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল বড়লোকের মেয়ে, তাঁর পয়সাকড়ির ভাবনা ছিল না, কোন অভাব ছিল না। তাঁর বাবারও খুব ইচ্ছা, ছেলেমেয়েরা সকলে খুব ভাল লেখাপড়া শেখে। সুতরাং অল্প বয়স হইতেই ফ্লরেন্সের মনে লেখাপড়ার ঝোঁক ছিল সেটা কিছু আশ্চর্য নয়। কিন্তু লোকে যে ঐ বয়স হইতেই তাঁহাকে ভালবাসিত এবং শ্রদ্ধা করিত, সেটা তাঁহার লেখাপড়ার বাহাদুরির জন্য নয়—তার কারণ এই যে, তিনি যেমন মন প্রাণ দিয়া সকলকে ভালবাসিতেন, লোকের সেবা করিতেন এবং লোকের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইতে পারিতেন, এমন আর কেহ পারিত না। আশেপাশে যেখানে যত গরীবের স্কুল আর হাসপাতাল ছিল, ফ্লরেন্স তাহার সবগুলির মধ্যেই থাকিতেন। সেই সময়ে ইংলণ্ডে কয়েদীদের অবস্থা বড় ভয়ানক ছিল। জেলখানাগুলি অত্যন্ত নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর এবং তাহাদের বন্দোবস্ত এমন বিশ্রী যে, একবার যে জেলে ঢুকিয়াছে তাহার পক্ষে ভবিষ্যতে আবার ভাল হওয়া একরূপ অসম্ভব। মিসেস ফ্রাই নামে একজন ইংরাজ মহিলা এই কয়েদীদের উন্নতির জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতে ছিলেন—কিসে তাহারা আবার চাকরি পায়, কিসে তাহারা সমাজের কাছে ভাল ব্যবহার পায়, কিসে তাহাদের মধ্যে আবার সাধুভাব ফিরিয়া আসে, তিনি এই চিন্তাতেই সমস্ত সময় কাটাইতেন। ইঁহার সঙ্গে ফ্লরেন্সের আলাপ হওয়ায়, দুজনেরই উৎসাহ খুব বাড়িয়া গেল।

ফ্লরেন্স বুঝিলেন যে ইংলণ্ডের হাসপাতালগুলির উন্নতি করিতে হইলে রোগীর সেবার জন্য বিশেষভাবে শিক্ষিত লোক চাই। সেবার কাজ মেয়েদের দ্বারাই খুব ভাল রকমে হইবার কথা, সুতরাং তাঁহার মনে এই চিন্তা আসিল যে, একদল মেয়েকে রোগীর শুশ্রূষা বিষয়ে ভালরকম শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

সে সময়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশে এ-বিষয়ে কিছু কিছু বন্দোবস্ত ছিল। সেখানে এমন সব শুশ্রূষাকারিণীর দল ছিল, যাঁহারা আবশ্যকমত রোগীর শুশ্রূষা ও যুদ্ধক্ষেত্রে আহতের সেবার জন্য সকল সময়ে প্রস্তুত থাকিতেন। ফ্রান্স দেশে Sisters of mercy নামে একদল সন্ন্যাসিনী বহুকাল হইতে অতি আশ্চর্যরূপে এই কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। জার্মানিতেও শুশ্রূষা-শিক্ষার ভাল বন্দোবস্ত ছিল। মিসেস ফ্রাইয়ের সঙ্গে ফ্লরেন্স পরামর্শ করিলেন, 'একবার ঐ সকল দেশ ঘুরিয়া এই বিষয়ে কিছু শিক্ষা করিয়া আসি'। যেমন কথা তেমনি কাজ; ফ্লরেন্স পরম উৎসাহে বিদেশে গিয়া এই শিক্ষা লাগিয়া রহিলেন। সেখানে তাঁহার বুদ্ধি উৎসাহ ও সেবার আগ্রহ দেখিয়া, সকলেই অবাক হইয়া গেল! তিনি ছয় মাসের মধ্যে রীতিমত পরীক্ষা পাশ করিয়া এবং সকল বিষয়ে আশ্চর্য সফলতা দেখাইয়া দেশে ফিরিলেন। কিন্তু এত পরিশ্রমের ফলে তাঁহার শরীর এমন ভাঙিয়া পড়িল যে, তাঁহার কাজ আরম্ভ করিতে আরও বছরখানেক দেরী হইয়া গেল। সুস্থ হইয়াই তিনি চারিদিকে হাসপাতাল আতুরাশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের মধ্যে এক আশ্চর্য পরিবর্তন আনিয়া ফেলিলেন। তখন তাঁহার বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর।

ইহার কিছুদিন পরেই ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রুশিয়ার সঙ্গে ইংলন্ড ও ফ্রান্সের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ইংরাজেরা সে সময়ে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিল না। তাড়াতাড়ি কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান হইল। তাহাদের চিকিৎসার জন্য বা আহতের সেবার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা করিবার সময় হইল না। ইহার ফল এই হইল যে, চারিদিকে অসম্ভব রকম বেবন্দোবস্ত দেখা দিল; এমনকি রুগ্ন ও আহত সৈন্যগণ হাসপাতালে গিয়া, ঔষধপথ্য ও চিকিৎসার অভাবে দলে দলে মরিতে লাগিল। সে সময়ের অবস্থা এমন ভয়ানক হইয়াছিল যে, যুদ্ধে যত লোক মারা পড়ে তাহার সাতগুণ লোকে হাসপাতালে প্রাণ হারায়।

এই সকল কথা ইংলন্ডে পৌঁছিলে পর লোকে শিহরিয়া উঠিল। 'কি করা যায়, কিরূপে এ অবস্থা দূর হয়' এই ভাবনায় সকলে অস্থির হইয়া পড়িল। তখন ইংলন্ডের যুদ্ধমন্ত্রী নিজে ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেলকে লিখিলেন, "আপনি এই কাজের ভার লইতে পারেন কি?" এমন ডাক শুনিয়াও কি ফ্লরেন্স নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? তিনি কিছুমাত্র সময় নষ্ট না করিয়া ৩৪ জন শুশ্রূষাকারিণী (nurse) সঙ্গে যুদ্ধ স্থানে চলিলেন। শুনিয়া দেশশুদ্ধ লোকে আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "আর ভয় নাই।"

মিস নাইটিঙ্গেলের দল যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছিয়া দেখিলেন কাজ বড় সহজ নয়। ছোট্ট একটি হাসপাতাল, তাহার মধ্যে চার হাজার লোক ঘেঁষাঘেঁসি করিয়া শুইয়া আছে। অধিকাংশই জ্বর ও আমাশয়ে ভুগিতেছে—আহতের সংখ্যা খুবই কম। ঔষধের কোন ব্যবস্থা নাই—পথ্যাপথ্যের বিচার নাই—যাহার ভাগ্যে যাহা জুটিতেছে সে তাহাই খাইতেছে। তার উপর হাসপাতালের বিছানাপত্র সমস্ত এমন ময়লা ও দুর্গন্ধ যে, সুস্থ লোকেও সেখানে অসুস্থ হইয়া পড়ে। শুশ্রূষাকারিণীর দল প্রথমে নিজেরা হাসপাতাল ধুইয়া সাফ করিলেন; তারপর প্রত্যেকটি বিছানা মাদুর চাদর পরিষ্কার করিয়া কাচিলেন। কে কি খাইবে, কাহার কি ঔষধ চাই, এ সমস্তের ব্যবস্থা করিলেন। মিস নাইটিঙ্গেল নিজে রান্নাঘরের সমস্ত গুছাইয়া পথ্যের বন্দোবস্ত করিলেন। দেখিতে দেখিতে হাসপাতালের চেহারা ফিরিয়া গেল। চারিদিক ঝর্‌ঝরে পরিষ্কার। ক্রমে হতাশ রোগীদের মুখে প্রফুল্লতা দেখা দিল—চারিদিকে সকলের উৎসাহ জাগিয়া উঠিল—সকলে বলিল, "মিস নাইটিঙ্গেল নিজে সব ভার লইয়াছেন, আর ভয় নাই।" যেখানে অর্ধেকের বেশি লোক বিনা চিকিৎসায় মরিতেছিল, সেখানে এখন শতকরা ৯৮ জন প্রাণে বাঁচিয়া মিস নাইটিঙ্গেলের জয়জয়কার করিতে লাগিল। তাঁহার আর বিশ্রাম নাই, সকলের খবর লইতেছেন, সকলের কাছে কত কথা বলিতেছেন—কতজনকে প্রফুল্ল রাখিবার জন্য কত গল্প করিতেছেন—কতজন লিখিতে পারে না, তিনি তাহাদের চিঠি লিখিয়া দিতেছেন। সাধে কি তাহারা বলিত, "ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল স্বর্গের দেবী, তাঁর ছায়া লাগিলে মানুষ পবিত্র হয়।"

তারপর যখন যুদ্ধ শেষ হইল, সকলে দেশে ফিরিল—তখন ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেলের সম্মানের জন্য বিপুল আয়োজন চলিতে লাগিল। তিনি সে সমস্ত এড়াইয়া ভগ্ন শরীরে চুপচাপ লুকাইয়া দেশে ফিরিলেন। কিন্তু লোকে তাহা শুনিবে কেন? তাহারা তাঁহার জন্য মনুমেন্ট তুলিয়া, লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা উঠাইয়া, তাঁহার নামে শুশ্রূষা শিক্ষার আয়োজন করিয়া, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখাইয়াছে; রাজা প্রজা সকলে মিলিয়া তাঁহার কাছে মাথা নত করিয়াছে; দেশ বিদেশ হইতে কতরকমের সম্মান তাঁহার উপর ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্বয়ং মহারানী ভিক্টোরিয়া বার বার তাঁহার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি যে কাজ করিলে তাহার আর তুলনা হয় না।" ইহার পরেও মিস নাইটিঙ্গেল প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত

সর্বদাই অসংখ্য প্রকার সেবার কাজে আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। এখন এই যে ইউরোপের যুদ্ধে এত 'রেডক্রস' 'এম্বুলেন্স' প্রভৃতির নাম শোন, আহতের সেবার জন্য এত চেষ্টা, এত আয়োজন দেখ, বলিতে গেলে এ সমস্তেরই মূলে ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল।

খোঁড়া মুচির পাঠশালা

পোর্ট্স্মাউথের বন্দরে এক খোঁড়া মুচি থাকিত, তাহার নাম জন পাউন্ডস। ছেলেবেলায় জন তাহার বাবার সঙ্গে জাহাজের কারখানায় কাজ করিত। সেইখানে পনের বৎসর বয়সে এক গর্তের মধ্যে পড়িয়া তাহার উরু ভাঙিয়া যায়। সেই অবধি সে খোঁড়া হইয়াই থাকে এবং কোন ভারি কাজ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। গরিবের ছেলে, তাহার ত অলস হইয়া পড়িয়া থাকিলে চলে না—কাজেই জন অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া এক বুড়া মুচির কাছে জুতা সেলাইয়ের কাজ শিখিতে গেল। তারপর সহরের একটা গলির ভিতরে ছোট একটি পুরাতন ঘর ভাড়া করিয়া সে একটা মুচির দোকান খুলিল।

জনের রোজগার বেশি ছিল না, কিন্তু সে মানুষটি ছিল নিতান্তই সাদাসিধা; সামান্যরকম খাইয়া-পরিয়াই স্বচ্ছন্দে তাহার দিন কাটিয়া যাইত। এমনকি, কয়েক বৎসরের মধ্যে সে কিছু টাকাও জমাইয়া ফেলিল। তখন সে ভাবিল, 'এখন আমার উচিত আমার ভাইদের কিছু সাহায্য করা।' তাহার দাদার এক ছেলে ছিল, সে ছেলেটি জন্মকাল হইতেই খোঁড়া মতন, তাহার পা দুইটা বাঁকা। জন দাদাকে বলিল, "এই ছেলেটির ভার আমি লইলাম।" ছেলেটিকে লইয়া জন ডাক্তারকে দেখাইল। ডাক্তার বলিলেন, 'এখন উহার হাড় নরম আছে, এখন হইতে যদি পায়ে 'লাস্' বাঁধিয়া রাখ, তবে হয়ত সারিতেও পারে।" সামান্য মুচি, 'লাস্' কিনিবার পয়সা সে কোথায় পাইবে? সে রাত জাগিয়া পরিশ্রম করিয়া নিজের হাতে 'লাস্ বানাইল, এবং সেই লাস্ পরাইয়া, যত্ন ও শুশ্রূষার জোরে অসহায় শিশুটিকে ক্রমে সবল করিয়া তাহার খোঁড়ামি দূর করিল।

ততদিনে ছেলের লেখাপড়া শিখিবার বয়স হইয়াছে। পাউন্ডস নিজেই তাহাকে শিক্ষা দিবার আয়োজন করিতে লাগিল। তাহার প্রথম ভাবনা হইল এই যে, একা একা লেখাপড়া শিখিলে শিশুর মনে হয়তো ফূর্তি আসিবে না, তাহার দু-একজন সঙ্গী দরকার। এই ভাবিয়া সে পাড়ার দু-একটি ছেলেমেয়েকে আনিয়া তাহার ক্লাসে ভর্তি করিয়া দিল। দুটি একটি হইতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দেখিতে দেখিতে পাঁচ সাতটি হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহাতেও খোঁড়া মুচির মন উঠিল না—সে ভাবিতে লাগিল, 'আহা, ইহারা কেমন আনন্দে উৎসাহে লেখাপড়া শিখিতেছে; কিন্তু এই সহরের মধ্যে এমন কতশত শিশু আছে, যাহাদের কথা কেহ ভাবিয়াও দেখে না।' তখন সে আরও ছাত্র আনিয়া তাহার ছোট্ট ক্লাসটিকে একটি রীতিমত পাঠশালা করিয়া তুলিল।

যেদিন তাহার একটু অবসর জুটিত, সেইদিনই দেখা যাইত জন পাউন্ডস খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে রাস্তায় রাস্তায় ছেলে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। যত রাজ্যের অসহায় শিশু, যাদের বাপ নাই, মা নাই, যত্ন করিবার কেহ নাই, তাহাদের ধরিয়া ধরিয়া সে তাহার পাঠশালায়

ভর্তি করিত। ছেলে ধরিবার জন্য তাহার প্রধান অস্ত্র ছিল আলুভাজা! প্রথমে এই আলুভাজা খাওয়াইয়া পাউন্ডস রাস্তার শিশুদের ভুলাইয়া আনিত। আলুভাজার লোভে তাহারা পাঠশালায় আসিত, কিন্তু যে আসিত সে আর ফিরিত না। মাস্টারমহাশয়ের কি যে আকর্ষণশক্তি ছিল, আর ঐ অন্ধকার পাঠশালার মধ্যে কি যে মধু ছেলেরা পাইত, তাহা কেহই বুঝিত না; কিন্তু ছাত্রের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিল।

চার হাত চওড়া, বারো হাত লম্বা, সরু বারান্দার মতো ঘর; তাহার মাঝখানে বসিয়া মাস্টারমহাশয় জুতা সেলাই করিতেছেন আর পড়া বলিয়া দিতেছেন, আর চারিদিকে প্রায় চল্লিশটি ছাত্রের কোলাহল শুনা যাইতেছে। কেহ পড়িতেছে, কেহ লিখিতেছে, কেহ অঙ্ক বুঝাইয়া লইতেছে। কেহ সিঁড়ির উপর, কেহ মেঝের উপর, কেহ চৌকিতে, কেহ বাক্সে—আর নিতান্ত ছোটদের কেহ কেহ হয়তো মাস্টারের কোলে—এইরকম করিয়া মহা উৎসাহে লেখাপড়া চলিয়াছে। বাহিরের লোকে ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া অবাক হইয়া এই দৃশ্য দেখিত।

গরীব মাস্টার ছাত্রদের কাছে এক পয়সাও বেতন লইত না—এতগুলি ছাত্রকে সে বই জোগাইবে কোথা হইতে? তাহাকে সহরে ঘুরিয়া পুরানো পুঁথি ছেঁড়া বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে হইত, এবং তাহাতেই ছেলেদের পড়ার কাজ কোনরকমে চলিয়া যাইত। কয়েকখানা স্লেট ছিল, তাহাতেই সকলে পালা করিয়া লিখিত। পাঠশালায় সামান্য যোগ বিয়োগ হইতে ত্রৈরাশিক পর্যন্ত অঙ্ক শিখান হইত। কেবল তাহাই নয়, এই সমস্ত ছেলেমেয়েরা তাহার কাছে কাপড় সেলাই করিতে এবং জুতা মেরামত করিতেও শিখিত। সকলে মিলিয়া তীর ধনুক ব্যাট বল ঘুড়ি লাটাই খেলনা পুতুল প্রভৃতি নানারকম জিনিস নিজেরাই তৈয়ারি করিত। তাহাদের খাওয়া-পরার সমস্ত অভাবের কথাও গরীব মাস্টারকেই ভাবিতে হইত। এই সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া জন পাউন্ডসের উপর কোন কোন লোকের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। তাহারা মাঝে মাঝে গরম কাপড়-চোপড় পাঠাইয়া দিত। সেইসব কাপড় পরিয়া ছেলেমেয়েরা যখন উৎসাহে খোঁড়া মাস্টারের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইত, তখন মাস্টারমহাশয়ের মুখে আনন্দ আর ধরিত না।

এমন করিয়া কত বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল, জন পাউন্ডস বুড়া হইয়া পড়িল, কিন্তু তাহার পাঠশালা চলিতে লাগিল। আগে যাহারা ছাত্র ছিল, তাহারা ততদিনে বড় হইয়া উঠিয়াছে। কতজনে নাবিক হইয়া কত দেশ-বিদেশে ঘুরিতেছে, কতজনে সৈন্যদলে ঢুকিয়া যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইতেছে। নূতন ছাত্রদের পড়াইবার সময়ে এইসব অতি পুরাতন ছাত্ররা তাদের বৃদ্ধ গুরুকে দেখিবার জন্য পাঠশালায় হাজির হইত। তাহারই ছাত্রেরা যে সৎপথে থাকিয়া উপার্জন করিয়া খাইতেছে, এবং এখনও যে তাহারা তাহাদের খোঁড়া মাস্টারকে ভোলে নাই, এই ভাবিয়া গৌরবে আনন্দে বৃদ্ধের দুই চক্ষু দিয়া দরদর করিয়া জল পড়িত।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে নববর্ষের দিনে ৭২ বৎসর বয়সে পাঠশালার কাজ করিতে করিতে বৃদ্ধ হঠাৎ শুইয়া পড়িল। বন্ধুবান্ধব উঠাইতে গিয়া দেখিল, তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। হয়ত তখনও লোকে ভাল করিয়া বোঝে নাই যে কত বড় মহাপুরুষ চলিয়া গেলেন। তাহার পর প্রায় আশি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, এখন ইংলন্ডের সহরে সহরে অসহায় গরীব শিশুদের শিক্ষার জন্য কত ব্যবস্থা, কত আয়োজন; কিন্তু এ সমস্তের মূলে ঐ খোঁড়া মুচির পাঠশালা। সেই পাঠশালায় যাহারা পড়িতে আসিত, কেবল তাহারাই যে জন পাউন্ডসের ছাত্র তাহা নয়—যাঁহারা নিজেদের অর্থ দিয়া, দেহের শক্তি দিয়া, একাগ্র মন দিয়া, অসহায় গরীব শিশুদের শিক্ষা ও উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা অনেকেই

গৌরবের সঙ্গে এই খোঁড়া মুচিকে স্মরণ করিয়া বলিতেছেন, "আমরাও আচার্য জন পাউন্ডসের শিষ্য।"

এই খোঁড়া মুচির নাম সকলের কাছে স্মরণীয় রাখিবার জন্য, তাঁহার ভক্তেরা মিলিয়া তাঁহার একটি পাথরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

সক্রেটিস

সে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা—গ্রীস দেশে এথেন্স নগরের একটি গরীবের ঘরে একটি কুশ্রী ছেলের জন্ম হয়। গরীবের ছেলে, পরনে তার ছেঁড়া কাপড়, দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় কিনা সন্দেহ—সে আবার লেখাপড়া শিখিবে কিরূপে? সে পাথরের মূর্তি গড়িতে পারিত—তাই বেচিয়া এবং অবসরমত লোকের কাছে দুকথা শিখিয়া মানুষ হইতে লাগিল। এমন সময় ক্রাইটো নামে একটি ধনী লোক এই ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করিয়া, তাহার মিষ্ট ব্যবহারে এত খুসী হইলেন যে, তিনি তখনই নিজের খরচে তাহার পড়াশুনার ভাল ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সকলেই ভাবিল, গরীবের ছেলে ভাল লেখাপড়া শিখিয়া, এইবার একটা ভাল চাকুরী বা ব্যবসা করিবে।

এথেন্স নগরে তখন একদল লোক থাকিত, তাহাদের ব্যবসা ছিল পন্ডিতি করা। তাহারা লোকের কাছে পয়সা লইয়া আড্ডা খুলিত এবং সেখানে বড় বড় কথা আওড়াইয়া চুলচেরা তর্ক করিয়া, নানারকম বিদ্যার ভড়ং দেখাইত। তাহাদের বোলচালে ভুলিয়া লোকে মনে করিত, না জানি তাহারা কত বড় পন্ডিত! একটু বয়স হইলেই সেই গরীবের ছেলে এই পণ্ডিত মহলের পরিচয় লইতে আসিলেন। মুখে মিষ্টি মিষ্টি কথা, নিতান্ত ভালমানুষটির মতো আস্তে আস্তে প্রশ্ন করেন, যেন তিনি কিছুই জানেন না—কিন্তু তাঁহার প্রশ্নের ঠেলায় পণ্ডিতের দল অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিতে গিয়া একজন পণ্ডিত এমন নাকাল হইয়া আসিলেন যে, দেখিতে দেখিতে তাঁহার নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। খালি পা, মোটা কাপড় পরা, খাঁদা বেঁটে গরীব লোকটিকে রাস্তায় ঘাটে সকলেই চিনিয়া ফেলিল। তিনি পথে বাহির হইলে সকলে দেখাইয়া দিত 'ঐ সক্রেটিস'।

দেখিতে দেখিতে এইসব মূর্খ পণ্ডিতদের উপর সক্রেটিসের ঘোর অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গেল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'হায়, হায়, এইসব অপদার্থের হাতে পড়িয়া, এথেন্সের ছেলেগুলি একেবারে মাটি হইয়া গেল। ইহারা কেবল কথা কাটাকাটি করিতে শিখিল—কেহ জ্ঞানলাভ করিতে চায় না, মানুষের মতো মানুষ হইতে চায় না,—শুধু লোকের কাছে নাম কিনিতে চায়, ছলে বলে ক্ষমতা জাহির করিতে চায়।' সক্রেটিস তেজের সহিত চারিদিকে বলিতে লাগিলেন, "এমন করিয়া কোন মানুষ বড় হইতে পারে না। কেবল টাকাকড়ি ও যশ-মানের জন্য ছুটাছুটি করিও না, ধর্ম-পথে থাক এবং জ্ঞান লাভ কর—নহিলে তোমরা অধঃপাতে যাইবে।" লোকে অবাক হইয়া গরীবের মুখে এই সকল কথা শুনিত এবং যে একবার আসিত সেই তাঁহার কথায় ও আশ্চর্য ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া যাইত। দেখিতে দেখিতে সক্রেটিসের অনেক বন্ধু ও শিষ্য জুটিয়া গেল। শহরের অনেক বড় বড় লোক পর্যন্ত তাঁহার কাছে যাতায়াত

আরম্ভ করিল। কোন বিদেশী রাজা অনেক টাকার লোভ দেখাইয়া সক্রেটিসকে তাঁহার নিজের সভায় লইতে চাহিলেন। কিন্তু সক্রেটিস বলিলেন, "আমি এ অনুগ্রহ লইয়া আপনার কাছে ঋণী থাকিতে চাহি না। আমার টাকারই বা প্রয়োজন কি? এই এথেন্স সহরে অতি অল্প খরচেই দুবেলা আহার করিয়া থাকা যায়; আর কাছেই ঝরনার জল, তাহার জন্য পয়সা দিতে হয় না। সুতরাং আমার ত কোন অভাব দেখি না।"

সে সময়ে গ্রীস দেশে প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ চলিত। একবার কোন এক যুদ্ধে সক্রেটিসকে পাঠান হইল। যাহারা যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেকেই দেশে ফিরিয়া, সক্রেটিসের আশ্চর্য শক্তির প্রশংসা করিতে লাগিল। ঘোর শীতের সময়ে যখন বরফে সকল দিক ঢাকিয়া ফেলে. লোকেরা কম্বলের জামা গায় দিয়াও শীতে কাঁপিতে থাকে, সক্রেটিস তাহার মধ্যে খালি পায়ে সামান্য কাপড় পরিয়া অনায়াসে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ডেলিয়ামের যুদ্ধে যখন শত্রুপক্ষ সক্রেটিসের দলকে হটাইয়া দিল, তখনকার একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা বলিয়াছেন, সেই বিপদের সময়েও সক্রেটিসের শান্ত চেহারা ও নিশ্চিন্ত হাসিমুখ দেখিয়া এথেন্সের লোকদের মনে আবার সাহস ফিরিয়া আসিল। শত্রুপক্ষের সৈন্যরা চারিদিকে মারধর করিতেছিল কিন্তু সক্রেটিসের কি আশ্চর্য তেজ, তাঁহার কাছে ঘেঁসিতেও কেহ সাহস পায় নাই।

সক্রেটিস নিজে গরীবের গরীব কিন্তু সারাজীবন সকলকে বিনা পয়সায় শিক্ষা দিতেন। এত বড় পণ্ডিত, কিন্তু তাঁহার মধ্যে অহংকারের লেশমাত্র ছিল না। কেহ তাঁহাকে রাগ করিয়া কথা বলিতে শুনে নাই; নিজের সামান্য কর্তব্যটুকুও অবহেলা করিতে দেখে নাই। শত্রুমিত্র সকলের জন্য মুখে তাঁহার হাসিটুকু লাগিয়াই থাকিত। কেহ কড়া কথা বলিলে বা মিথ্যা গালাগালি করিলেও তিনি তাহাতে বিরক্ত হইতেন না। কত দুষ্ট লোকে তাঁহার উপদেশ শুনিতে গিয়া কাঁদিয়া ফিরিত, তাঁহার মুখের একটি কথায় কত অন্যায়, কত অত্যাচার থামিয়া যাইত। দুঃখ বিপদের সময় কতদূর হইতে কত লোকে তাঁহার পরামর্শ শুনিবার জন্য ছুটিয়া আসিত। "যাহা ন্যায় বুঝিব তাহাই করিব" একথা তাঁহার মুখেই শোভা পাইত; কারণ তাঁহার যেমন কথা তেমনি কাজ। এমন সাধু লোককে যে সকলে ভালবাসিবে, ঋষি বলিয়া ভক্তি করিবে তাহাতে আশ্চর্য কি? কিন্তু সক্রেটিসেরও শত্রুর অভাব ছিল না। একদল লোক—কেহ হিংসায় কেহ রাগে কেহ নিজের স্বার্থের জন্য—সর্বদা তাঁহার অনিষ্ট করার চেষ্টা করিত। সক্রেটিসকে সেকথা জানাইলে তিনি তাহা হাসিয়াই উড়াইয়া দিতেন।

একবার সে দেশের শাসনকর্তারা তাঁহাকে হুকুম দিলেন "আমরা অমুককে সাজা দিব, তুমি তাহার খোঁজ করিয়া দাও।" সক্রেটিস তাহাদের মুখের উপর বলিলেন, "আমি অন্যায় কাজে সাহায্য করি না।" শাসনকর্তারা চটিলেন। আর একবার এথেন্সের লোকেরা কয়েকজন সেনাপতির উপর ক্ষেপিয়া, জুলুম করিয়া বিনা বিচারে তাহাদের মারিতে চাহিয়াছিল, একমাত্র সক্রেটিস ছাড়া সে কার্যে বাধা দিতে আর কাহারও সাহস হয় নাই। এই ব্যাপারেও তাঁহার অনেক শত্রু জুটিল! পণ্ডিতের দলও আগে হইতেই ক্ষেপিয়া ছিল। তারপর যখন চারিদিক হইতে নানা শ্রেণীর লোকে সক্রেটিসের কাছে ঘন ঘন যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিল, তখন শাসনকর্তারা ভাবিলেন, ইহার মনে নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে—এ হয়ত কোনদিন এই সকল লোককে ক্ষ্যাপাইয়া একটা গোলমাল বাধাইয়া তুলিবে। তাঁহারা সক্রেটিসকে শাসাইয়া দিলেন, "খবরদার, তুমি এথেন্সের যুবকদের সঙ্গে আর কথাবার্তা বলিতে পারিবে না।" সক্রেটিস তাহাতে ভয় পাইবেন কেন? তিনি পূর্বেরই মতো উৎসাহে সকলকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন—

"যাহারা জ্ঞানের অহংকার করিয়া বেড়ায় তাহারাই যথার্থ মূর্খ, যাহারা অন্যায় করিয়া দেশের আইনকে ফাঁকি দেয়, তাহারা জানে না যে ভগবানের কাছে ফাঁকি চলে না। যে মানুষ খাওয়া-পরায় অল্পতেই সন্তুষ্ট, সহজভাবে সরল কথায় সৎচিন্তায় সময় কাটায়, সেই সুখী—আধপেটা খাইয়াও সুখী; মানুষের নিন্দা অত্যাচারের মধ্যেও সুখী।" এমনি করিয়া ঋষি সক্রেটিস ৭২ বৎসর বয়স পর্যন্ত যুবকের মতো উৎসাহে নিজের কাজ করিয়া গেলেন।

ইহার মধ্যে সক্রেটিসের শত্রুপক্ষ ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার নামে মিথ্যা নিন্দা রটাইয়া এথেন্সের বিচার সভায় তাঁহার বিরুদ্ধে অন্যায় নালিশ উপস্থিত করিল। শত্রুর দল যে যেখানে ছিল সকলে হাঁ হাঁ করিয়া সাক্ষ্য দিতে আসিল—"সক্রেটিস বড় ভয়ানক লোক, সে এথেন্সের সর্বনাশ করিতেছে।" অন্যায় বিচারে হুকুম হইল "সক্রেটিসকে বিষ খাওয়াইয়া মার।" সক্রেটিসের বন্ধুরা বলিলেন, "হায় হায়, বিনা দোষে সক্রেটিসের শাস্তি হইল।" সক্রেটিস হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা কি বলিতে চাও যে আমি দোষ করিয়া সাজা পাইলেই ভাল হইত?"

সক্রেটিসকে কয়েদ করিয়া রাখা হইল, কবে তাঁহাকে বিষ খাওয়ান হইবে সেদিনও স্থির হইল। জেলের অধ্যক্ষ সক্রেটিসের ভক্ত ছিলেন, তিনি বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন সক্রেটিসকে রাতারাতি এথেন্স হইতে সরাইয়া ফেলিবেন; কিন্তু সক্রেটিস তাহাতে রাজি হইলেন না। তিনি বলিলেন, "আমার দেশের লোকে বিচার করিয়া বলিয়াছেন আমার শাস্তি হউক। আমি সে শাস্তিকে এড়াইয়া দেশের আইনকে অমান্য করিতে চাই না।" ক্রমে দিন ঘনাইয়া আসিল। সক্রেটিসের বন্ধুরা কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গেলেন, কেহ কেহ রাগে দুঃখে এথেন্স ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন—মহাপণ্ডিত প্লেটো প্রভৃতি কয়েকটি শিষ্য শেষ পর্যন্ত তাঁহার কাছেই বসিয়া রহিলেন। সক্রেটিসের প্রশান্ত মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নাই, তিনি সকলকে আশ্বাস দিতেছেন, উৎসাহের সঙ্গে বলিতেছেন "দেহ নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু দেহের মধ্যে যে থাকে সে অমর—এই দেহে যখন প্রাণ থাকিবে না, আমি তখনও থাকিব।" একজন শিষ্য বলিলেন "মৃত্যুর পর আপনাকে কোথায় কবর দিব?" সক্রেটিস বলিলেন "যেখানে ইচ্ছা; কিন্তু মৃত্যুর পর আমায় পাইবে কোথায়?" এমন সময় জেলের প্রধান কর্মচারী কাঁদিতে কাঁদিতে বিষের পাত্র আনিয়া ধরিল এবং সক্রেটিসের কাছে ক্ষমা চাহিল। সক্রেটিস তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া, হাসিমুখে বিষ পান করিলেন। তারপর শিষ্যদের সহিত কথা বলিতে বলিতে ক্রমে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার হাত পা অবশ হইয়া আসিল। শেষে মৃত্যু আসিয়া মহাপুরুষের জীবন শেষ করিয়া দিল। সক্রেটিস মরিয়া অমর হইলেন; তাঁহার নাম চিরকালের জন্য পৃথিবীর ইতিহাসে থাকিয়া গেল।

দানবীর কার্নেগী

বড়লোক হবার সখ থাকলেই যে মানুষ বড়লোক হতে পারে না, তার দৃষ্টান্ত গল্পে তোমরা পড়েছ। এখন একটি সত্যকারের বড়লোকের কথা বলব, যিনি গরীব বাপ-মায়ের ঘরে জন্মেও কেবল আপনার চেষ্টায় ও আগ্রহে, জগতের মহাধনী ক্রোড়পতিদের মধ্যে নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডের এক সামান্য পল্লীগ্রামের এক নগণ্য পরিবারে এন্‌ড্রু কার্নেগীর জন্ম হয়। তাঁর বয়স যখন তেরো বৎসর মাত্র তখন তাঁর বাবা উপার্জনের চেষ্টায় সপরিবারে আমেরিকায় চাকরী করতে যান। সেইখানে গিয়েই এক সুতোর কারখানায় তাঁতির মজুর হয়ে, কার্নেগী মাসে সাড়ে বারো টাকা রোজগার করতে আরম্ভ করলেন! এই তাঁর প্রথম রোজগার। তারপর চৌদ্দ বছর বয়সে তাঁর আরেকটু ভাল একটা চাকরী জুটল, তিনি এক টেলিগ্রাফ অফিসের ছোকরা-পিয়নের কাজ পেলেন। এই কাজ তিনি কেমন করে জোগাড় করলেন, সে গল্পটিও চমৎকার।

টেলিগ্রাফ অফিসের দরজায় বিজ্ঞাপন ছিল, "ছোকরা পিয়ন চাই।" তাই দেখে কার্নেগী খোঁজ নেবার জন্য ভিতরে ঢুকলেন। টেলিগ্রাফের কেরানী একটা অচেনা ছোকরাকে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেখেই, হাঁক দিয়ে বললে, "কি চাও?" কার্নেগী বললেন, "বড় সাহেবকে চাই!" কেরানী তেড়ে উঠে বললে, "যাও, যাও, দেখা হবে না।" পরের দিন সকালে কার্নেগী আবার ঠিক তেমনি ভাবে সেখানে গিয়ে হাজির। কেরানী দেখলে সেই ছোকরা আবার এসেছে। সে আবার জিজ্ঞাসা করলে "কি চাও?" জবাব হল "বড় সাহেবকে চাই।" সেদিনও কেরানী তাকে চট্‌পট্‌ ঘর থেকে বার করে দিল। পরের দিন আবার সেই সময়ে সেই ছোকরা এসে হাজির,—বলে "বড় সাহেবকে চাই।" কেরানী ভাবল, ব্যাপারটা কি? আচ্ছা, একবার বড় সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা যাক। বড় সাহেব সব শুনে বললেন, "পাঠিয়ে দাও ত, দেখি ছোকরা কি চায়।" সেইদিনই কার্নেগী টেলিগ্রাফ অফিসের কাজে ভর্তি হলেন। বাপ-মায় ভাবলেন, ছেলে 'চাকরে' হয়ে উঠল—বেশ দু-পয়সা রোজগার করবে।

পিয়নের কাজ করতে করতেই কার্নেগী টেলিগ্রাফের কলকায়দা সব শিখে ফেললেন, আর কিছুদিন বাদেই তিনি সেখানকার রেলস্টেশনের তারওয়ালা বা অপারেটর হয়ে বসলেন। তারপর দেখতে দেখতে ক্রমে টেলি-বিভাগের বড় সাহেব বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হতেও তাঁর বেশি দেরী লাগল না। এই সময় থেকে তিনি রেলগাড়ি আর খনির তেলের ব্যবসা করে খুব টাকা করতে আরম্ভ করলেন। লাভের টাকা আবার নূতন নূতন ব্যবসায় খাটিয়ে তিনি বড় বড় কারবার জমিয়ে তুললেন। তারপর ক্রমে পাঁচ-সাতটা প্রকাণ্ড লোহার কারখানা কিনে ফেলে তিনি নিজে সেইগুলো চালাতে লাগলেন। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স না হতেই তিনি পৃথিবীর মধ্যে একজন নামজাদা লোহার মালিক হয়ে উঠেছিলেন।

এমনি করে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করে তিনি ৫৬ বৎসর বয়সে সব বিষয়কর্ম থেকে অবসর নিয়ে স্কটল্যাণ্ডে সেই তাঁর জন্মস্থানে গিয়ে বসলেন। বললেন, "রোজগার যথেষ্ট করেছি, এখন এই বুড়ো বয়সে আর 'টাকা টাকা' করে ছুটে বেড়ান ভাল দেখায় না। এতদিন যা সঞ্চয় করেছি, এখন দানের মত দান করে তার সদ্ব্যবহার করতে হবে।" সেই থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর দানব্রত পালন করে গিয়েছেন।

কার্নেগীর মতো অথবা তাঁর চাইতেও বড় লোক পৃথিবীতে আরও আছেন—কিন্তু এমন অজস্রভাবে দান আর কেউ করেছেন কিনা সন্দেহ। কত দেশে, কত শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে, কত ছোট ছোট পাঠশালায়, কত বড় বড় কলেজে, তাঁর কীর্তির পরিচয় রয়েছে। শুধু লাইব্রেরি করবার জন্যই নানা জায়গায় তিনি প্রায় বিশ কোটি টাকা খরচ করে গেছেন। স্কটল্যাণ্ডের গরীব ছাত্রদের পড়ার সাহায্যের জন্য তিনি অন্তত তিন কোটি টাকা দান করেছেন।

তাঁর নিজের জন্মস্থান সেই ছোট্ট গ্রামটি আজ বেশ একটি সহর হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে কেবল তাঁর দানের জোরে। এই শহরটির উন্নতির জন্য তিনি সম্পত্তি রেখে গেছেন, তার আয় হয় বছরে চার লক্ষ টাকা। বীরত্বের পুরস্কারের জন্য আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে তিনি দুটি 'Hero fund' বা বীর ভাণ্ডার স্থাপন করে গেছেন; বিপদের সময়ে অন্যের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে যারা নিজেরা আহত ও অকর্মণ্য হয়ে পড়ে, এই ভাণ্ডার থেকে তাদের খাওয়া-পরার সমস্ত খরচ দেওয়া হয়। এমনি করে ছোট বড় যত অসংখ্যরকমের দান তিনি করে গেছেন, সব যদি এক সঙ্গে ধরা যায়, তাহলে তাঁর দানের হিসাব হয় প্রায় একশ কোটি টাকা!

এত টাকা আমাদের ভাল করে কল্পনাই হয় না। হিসাব বলবার সময় 'অযুত লক্ষ নিযুত কোটি অর্বুদ বৃন্দ' সব আমরা গড় গড় করে বলে যাই, কিন্তু সে যে কত বড় অঙ্কের হিসাব তার ধারণা করতে গেলেই মাথায় গোল লেগে যায়। একশ কোটি টাকা কতখানি জান? একজন লোক যদি প্রতি সেকেণ্ডে একটি করে টাকা দান করে, তাহলে একদিনে তার ছিয়াশি হাজার টাকা খরচ হয়ে যায়। কিন্তু এই হিসাবেও একশ কোটি টাকা খরচ করতে তার অন্তত বত্রিশ বৎসর সময় লাগবে—তাও, যদি সারাদিন সারারাত না খেয়ে না ঘুমিয়ে সে কেবল ঐ কাজই করতে থাকে! একশ কোটি টাকা ভাঙিয়ে যদি পয়সা আনাও, তাহলে সেই পয়সা দিয়ে এই কলকাতার মতো গোটা দুই সহরকে একেবারে ঢেকে দেওয়া যাবে। এই ভারতবর্ষের সমস্ত লোক, ছেলে বুড়ো স্ত্রী পুরুষ সবাই মিলে যদি সেই পয়সা কুড়োতে আসে, তাহলে প্রত্যেকে প্রায় দুইশ পয়সা নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবে।

এই কয়েকদিন হল কার্নেগীর মৃত্যু-সংবাদ এদেশে এসেছে। তাঁর জীবনের সঞ্চিত টাকা তিনি প্রায় সমস্তই দান করে গিয়েছেন—তার তুলনায় যা বাকী রয়ে গেছে, সে কেবল সিন্ধুকের মধ্যে এক মুষ্টির মতো।

নোবেলের দান

পাঁচ বৎসর আগে যখন ইউরোপ হইতে সংবাদ আসিল যে, বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নোবেল প্রাইজ' পাইয়াছেন, তখন দেশময় একটা উৎসাহের ঢেউ ছুটিয়াছিল। 'নোবেল প্রাইজ' জিনিসটা কি তাহা অনেকেই জানিত না, তাহারা সে বিষয়ে আগ্রহ করিয়া খোঁজ করিতে লাগিল।

আলফ্রেড বের্নহার্ড নোবেল সুইডেন দেশের একজন রাসায়নিক ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে প্রায় সওয়া তিন কোটি টাকার সম্পত্তি দান করিয়া যান। যাঁহারা বিজ্ঞানজগতে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন, যাঁহারা সাহিত্যে উন্নতি করেন এবং বিশেষভাবে যাঁহারা জগতে শান্তি স্থাপনের সহায়তা করেন, প্রতি বৎসর তাঁহাদের সম্মানের জন্য এই সম্পত্তির আয় হইতে 'নোবেল প্রাইজ' নামে লক্ষাধিক টাকার অর্ঘ্য দেওয়া হয়। যে-কোন দেশের যে-কোন লোক এই অর্ঘ্যলাভের যোগ্য হইলেই তাহা পাইতে পারেন।

এই নোবেল লোকটির জীবনের কাহিনী বড় অদ্ভুত। দুর্বল স্বাস্থ্য লইয়া রুগ্ন ভগ্ন দেহে

তিনি সারা জীবন কাটাইয়াছিলেন। একদিকে তিনি অত্যন্ত ভীরু ও নিরীহ ভালমানুষ ছিলেন, সামান্য দুঃখ কষ্ট বা উত্তেজনায় বিচলিত হইয়া পড়িতেন, কিন্তু অপরদিকে তাঁহার মনের এমন অসাধারণ বল ছিল, ঘোর বিপদের মধ্যে ও রোগের যাতনার মধ্যে তিনি শান্তভাবে কাজ করিয়া যাইতেন। সমস্ত জীবন তিনি বোমা ও বারুদের মশলা লইয়া নানারূপ পরীক্ষা করিয়াছেন। এই পরীক্ষায় যে সকল সময়ে প্রাণটি হাতে করিয়া চলিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন; ইহাতে যে অনেক লোকের প্রাণ গিয়াছে তাহাও তাঁহার জানা ছিল, কিন্তু সে চিন্তা তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারে নাই।

আলফ্রেড নোবেলের পিতা রুশিয়ার যুদ্ধ কারখানার কারিকর ছিলেন। গোলাবারুদ লইয়া তাঁহার কারবার, এবং সেই কাজে বালক নোবেলও তাঁহার সহায় ছিল। কেবল যে যুদ্ধের কাজেই বারুদের ব্যবহার হয় তা নয়। তার একটি মস্ত কাজ, পাহাড় ভাঙা। রেলপথ বসাইবার জন্য এবং রাস্তাঘাট বা সুড়ঙ্গ খুঁড়িবার জন্য অনেক সময়ে পাহাড় ভাঙিয়া সমান করিতে হয়। কোদাল ঠুকিয়া এই কাজ করিতে গেলে অসম্ভবরকম পরিশ্রম ও সময় নষ্ট করিতে হয়। সাধারণ বারুদের সাহায্যে এ কাজ অনেকটা সহজ হয়, কিন্তু বারুদের তেজ সব সময়ে এ কাজের পক্ষে যথেষ্ট নয়। নোবেলের সময়েও অনেক জিনিসের কথা লোকে জানিত, যাহার তেজ বারুদের চাইতেও ভয়ানক—কিন্তু এই সমস্ত জিনিস এত সামান্য কারণে ফাটিয়া যায় যে তাহাকে কাজে লাগাইতে কেহ সাহস পাইত না। কাজ করিতে গিয়া সামান্য একটু গরম বা সামান্য একটু আঁচড় অথবা ধাক্কা লাগিলেই ঘর বাড়ি উড়িয়া এক প্রলয়কাণ্ড বাধিয়া যাইত। নোবেল ডিনামাইট আবিষ্কার করিয়া সে অসুবিধা দূর করেন। ডিনামাইটের শক্তি সাধারণ বারুদের চাইতে আটগুণ বেশি অথচ তাহাকে লইয়া সাবধানে নাড়াচাড়া করিলে কোন ভয়ের কারণ নাই।

ডিনামাইট ছাড়াও তিনি আরও অনেকরকম বারুদের মশলা আবিষ্কার করেন। আজকাল কামানের গোলা ছুঁড়িবার জন্য যে-সকল প্রচণ্ড বারুদ ব্যবহার করা হয় তাহাও নোবেলের আবিষ্কারের ফল। এই সমস্ত সাংঘাতিক জিনিসের কারবারের জন্য নোবেল বড় বড় কারখানা বসাইয়া পৃথিবী জুড়িয়া প্রকাণ্ড ব্যবসা চালাইয়া, তাহাতে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন। একবার একটি কারিকরের অসাবধানতায় সমস্ত কারখানাটি উড়িয়া যায় এবং অনেক লোক মারা পড়ে ও অনেক লক্ষ টাকা নষ্ট হয়। তাহাতেও নোবেলের উৎসাহ দমে নাই—তিনি আবার নূতন করিয়া কারখানা করাইলেন এবং এরূপ দুর্ঘটনা যাহাতে আর না হয়, তাহার জন্য অনেক সুন্দর বন্দোবস্ত করিলেন। সে কারখানা আজও চলিতেছে।

কারখানার ভিতরে যদি ঢুকিয়া দেখ, তাহা হইলে বুঝিবে "সাবধান হওয়া" কাহাকে বলে। যে-সকল স্থানে বিপদের সম্ভাবনা সেখানে প্রত্যেক ঘরের চারিদিকে মাটি উঁচু করিয়া পাহাড়ের মতো দেওয়াল দেওয়া হইয়াছে। ঘরগুলি খুব হাল্কা করিয়া তৈয়ারি, তাহার মেজের উপর পুরু করিয়া চট মোড়া। যাহারা কাজ করে, তাহাদের পায়ে কাপড়ের জুতা—কোথাও কোন শব্দ করিবার নিয়ম নাই। সেখানে আগুন জ্বালান দূরে থাকুক, কারখানার ত্রিসীমানার মধ্যে দিয়াশালাই আনিতে দেওয়া হয় না। কোনরকম লোহার জিনিস সেখানে আনা নিষেধ, কাঁটা পেরেক পর্যন্ত আনিবার উপায় নাই। এইরকমের অসংখ্য নিয়ম নিষেধ মানিয়া তবে কারখানা চালাইতে হয়। ভগ্ন শরীরে এইরকম সাংঘাতিক জিনিসের কারবার করিয়া নিত্য

বিপদের মধ্যে যাঁহার জীবন কাটিল, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুকালে তাঁহার শেষ চিন্তা হইল এই যে, জগতে শান্তি স্থাপনের জন্য, এবং জ্ঞান ও আনন্দের বিস্তারের জন্য উপায় করিতে হইবে। তাহারই ফলে, এই নোবেল প্রাইজ।

কিন্তু কেবল এই দানই নোবেলের শ্রেষ্ঠ দান নয়। ডিনামাইট প্রভৃতি যে-সমস্ত রাসায়নিক অস্ত্র তিনি জগতকে দিয়া গেলেন, সেও বড় সামান্য দান নয়। যুদ্ধের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায় যে, সভ্য মানুষের যে-সমস্ত বড় বড় কীর্তি, তাহার অনেকগুলিই সহজ ও সম্ভব হইয়াছে কেবল নোবেলের ঐ অস্ত্রের গুণে। মাটি উড়াইয়া পাহাড় ফাটাইয়া পাথর সরাইয়া পথঘাট রেলপুল বসান হইতেছে, খাল কাটিয়া নদীর পাড় ভাঙিয়া জলের স্রোতকে নানাদিকে চালান হইতেছে, সমুদ্রের সঙ্গে সমুদ্র জুড়িয়া নূতন নূতন জলপথের সৃষ্টি হইতেছে, খনি ব্যবসায়ী খনি খুঁড়িতে গিয়া পাঁচ মাসের কাজ পাঁচ মিনিটে সারিতেছে, সভ্য দেশের চাষা বিনা লাঙলে সামান্য পরিশ্রমে বড় বড় জমি ফুঁড়িয়া চষিয়া ফেলিতেছে!

নেপোলিয়ান যখন ইটালি বিজয় করিতে চলিলেন তখন সকলে বলিয়াছিল, "কি অসম্ভব কথা! এই দুরন্ত শীতে তুমি সৈন্য লইয়া আল্‌প্‌স্ পাহাড় পার হইবে কিরূপে?" নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন, "There shall be no Alps!" 'আল্‌প্‌স্ পাহাড় থাকিবে না'—অর্থাৎ সে আমায় বাধা দিতে পারিবে না। নেপোলিয়ান আল্‌প্‌স্ পার হইয়া চলিয়া গেলেন। তাহার প্রায় শত বৎসর পরে যখন ফ্রান্স, ইটালি ও সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যে আল্‌প্‌স্ পাহাড় ভেদ করিয়া রেলপথ বসান হইতেছিল, তখন নোবেলও বলিতে পারিতেন, "There shall be no Alps!" লক্ষ যুগের পাহাড়ের বাঁধন একটি রুগ্নদেহ দুর্বল মানুষের বুদ্ধির কাছে পরাস্ত হইয়া ঝরিয়া পড়িল।

আর্কিমিডিস

প্রায় বাইশ শত বৎসর আগে, গ্রীস সাম্রাজ্যের অধীন সাইরাকিউস নগরে আর্কিমিডিসের জন্ম হয়। আর্কিমিডিসের মতো অসাধারণ পণ্ডিত সেকালে গ্রীক জাতির মধ্যে আর দ্বিতীয় ত ছিলই না—সমস্ত পৃথিবীতে তাঁহার সমান কেহ ছিল কিনা সন্দেহ। দিন রাত তিনি আপনার পুঁথিপত্র লইয়া কি যে চিন্তায় ডুবিয়া থাকিতেন, আর অঙ্ক কষিয়া কষিয়া কত যে আশ্চর্য তত্ত্বের হিসাব করিতেন, লোকে তাহার কিছুই বুঝিত না—কেবল দু-দশজন পণ্ডিত লোকে পরম আগ্রহে আদর করিয়া তাহার সংবাদ লইত, আর অবাক হইয়া বলিত, "পণ্ডিতের মতো পণ্ডিত যদি কেউ থাকে, তবে সে হচ্ছে আর্কিমিডিস।"

সাইরাকিউসের রাজা হীয়েরা ছিলেন আর্কিমিডিসের বন্ধু। তিনি কেবলই বলিতেন, "এত বড় পণ্ডিত হইয়া তোমার কি লাভ হইল, যদি লোকে তোমার কদর না বোঝে? তুমি কেবল বিজ্ঞানের বড় বড় তত্ত্ব আর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হিসাব নিয়া থাক; মানুষের কাজে লাগে এমন সব যন্ত্র করিয়া দেখাও—লোকে বুঝুক তুমি কত বড় পণ্ডিত!" বন্ধুর কথায় আর্কিমিডিস মাঝে মাঝে 'কোন জিনিস' গড়িবার দিকে মন দিতেন। তাহার ফলে নানারকম 'স্ক্রু', জল তুলিবার জন্য প্যাঁচাল 'পাম্প', জলে-চালান বাতাসে-চালান কতরকম যন্ত্র প্রভৃতি সৃষ্টি হইল।

পাখা টানিবার জন্য দেয়ালে যে চাকার 'পুলি' খাটান থাকে, সেই পুলি জিনিসটাও আর্কিমিডিসের আবিষ্কার। বড় বড় মালপত্র বোঝাই হইয়া এত যে কলের গাড়ি আর এত যে জাহাজ পৃথিবীময় ছুটিয়া বেড়াইতেছে, আর বড় বড় কারখানায় এত যে ভারি ভারি কলকামান লোহালক্কড় লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে, সবখানেই দেখিবে মাল উঠানোর জন্য 'পুলি' না হইলে চলে না। মূর্খ লোকে যখন আর্কিমিডিসের কলকব্জার পরিচয় পাইল, তখন তাহারাও ভাবিতে লাগিল, 'লোকটা পণ্ডিত বটে।'

আর্কিমিডিসের জীবনের একটি গল্প তোমরা বোধহয় অনেকে শুনিয়া থাকিবে। রাজা হীয়েরো এক সেকরার কাছে একটি সোনার মুকুট গড়াইতে দিয়াছিলেন। সেকরা মুকুটটি গড়িয়াছিল ভালই কিন্তু রাজার মনে সন্দেহ হইল যে, সে সোনা চুরি করিয়াছে এবং সেই চুরি ঢাকিবার জন্য মুকুটের মধ্যে খাদ মিশাইয়াছে। কোন সহজ উপায়ে এই চুরি ধরা যায় কিনা জানিবার জন্য বন্ধু আর্কিমিডিসকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আর্কিমিডিস সব শুনিয়া বলিলেন, "একটু ভাবিয়া বলিব।" ভাবিতে ভাবিতে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। একদিন স্নানের সময়ে কাপড় ছাড়িয়া সবে তিনি স্নানের টবে পা দিয়াছেন, এমন সময় খানিকটা জল উছলিয়া পড়ামাত্র, হঠাৎ সেই প্রশ্নের এক চমৎকার মীমাংসা তাঁহার মাথায় আসিল! তখন কোথায় গেল স্নান! তিনি তৎক্ষণাৎ 'Eureka!' 'Eureka!' (পেয়েছি! পেয়েছি!) বলিয়া রাস্তায় ছুটিয়া বাহির হইলেন।

যে জিনিস পাইয়া তিনি আনন্দে এমন আত্মহারা হইয়াছিলেন, বিজ্ঞানে এখনও তাহাকে "আর্কিমিডিসের তত্ত্ব" বলা হয়। ভারি জিনিসকে জলে ছাড়িলে, তাহার 'ওজন' কমিয়া যায়; কি পরিমাণ কমিবে তাহাও হিসাব করিয়া বলা যায়। কোন হালকা জিনিসকে জলে ভাসাইলে, তাহার খানিকটা ডোবে, খানিকটা ভাসিয়া থাকে। ঠিক কতখানি ডোবে তাহারও হিসাব আছে। আর্কিমিডিসের তত্ত্বে এই সকল কথারই আলোচনা করা হইয়াছে। আর্কিমিডিস রাজাকে বলিলেন, "ঐ মুকুটের ওজন যতখানি, ঠিক সেই ওজনের সোনা লইয়া একটা জলভরা পাত্রে পরীক্ষা করিতে হইবে। পাত্রের মধ্যে মুকুটটা ডুবাইয়া দিলে কতখানি জল উছলিয়া পড়ে, তাহা মাপিয়া দেখুন, তারপর আবার জল ভরিয়া সেই ওজনের একতাল সোনা ডুবাইয়া দেখুন কতটা জল পড়ে। মুকুট যদি খাঁটি সোনার হয়, তবে দুই বারেই ঠিক একই পরিমাণ জল বাহির হইবে। যদি খাদ মিশান থাকে, তবে মুকুটটা সেই ওজনের সোনার চাইতে আয়তনে কিছু বড় হইবে, সুতরাং তাহাতে বেশি জল ফেলিয়া দিবে।"

কোন কোন চশমার কাচ এমন থাকে যে, তাহাতে অনেকখানি সূর্যের আলোককে অল্প জায়গার মধ্যে ধরিয়া আনা যায়। সেইরকম কাচ বেশ বড় করিয়া বানাইলে, তাহার মধ্যে রোদ ধরিয়া আগুন জ্বালান চলে। সরার মতো গর্তওয়ালা আরশি দিয়াও এই কাজটি করান যায়। আর্কিমিডিস এই রকম আরশিও বানাইয়াছিলেন। শোনা যায়, রোমের যুদ্ধ জাহাজ যখন সাইরাকিউস আক্রমণ করিতে আসে, তখন তিনি এইরকম আরশি দিয়া কড়া রোদ ফেলিয়া, তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেন। কেবল তাহাই নয়, রোমীয় সেনাপতি মার্সেলাস যখন সৈন্য-সামন্ত লইয়া সাইরাকিউস আক্রমণ করিতে আসেন, তখন আর্কিমিডিস নগররক্ষার জন্য নানারকম অদ্ভুত নূতন নূতন যুদ্ধযন্ত্রের আয়োজন করিলেন। সে-সকল যন্ত্রের পরিচয় পাইয়া রোমীয় সৈন্য বহুদিন পর্যন্ত নগরের কাছে ঘেঁষিতে সাহস পায় নাই। তাহার পরে কত যুগ যুগ ধরিয়া, দেশে দেশে আর্কিমিডিসের অদ্ভুত কীর্তির কথা লোকের মুখে শোনা যাইত।

রোমীয় সৈন্যেরা সে-সকল যুদ্ধযন্ত্রের যে বর্ণনা দিয়াছে, তাহা পড়িলে বেশ বুঝা যায়, সেগুলি তাহাদের মনে কিরকম ভয়ের সঞ্চার করিয়াছিল। বড় বড় থামের মতো চূড়া হঠাৎ দেয়ালের উপর মাথা তুলিয়া, হুড়হুড় করিয়া শত্রুর উপর রাশি রাশি পাথর ছুঁড়িয়া মারে, আবার পর মুহূর্তেই দেয়ালের পিছনে ডুব মারে। বড় বড় কলের ধাক্কায় কড়ি বড়গা ছুটিয়া শত্রুর জাহাজে গিয়া পড়ে, দূর হইতে প্রকাণ্ড নখাল সাঁড়াশি চালাইয়া শত্রুর জাহাজ উপড়াইয়া আনে। এ সকল দেখিয়া রোমের সৈন্য আর রোমের জাহাজ নগর ছাড়িয়া দূরে হটিয়া গেল। মার্সেলাস বলিলেন, "যুদ্ধ করিয়া সাইরাকিউস দখল করা কাহারও সাধ্য নয়। তোমরা পথ ঘাট আটকাইয়া এইখানেই বসিয়া থাক। নগরের খাদ্য যখন ফুরাইবে, তখন আপনা হইতেই ইহারা হার মানিবে।" প্রায় তিন বৎসর বিনা যুদ্ধে রোমীয়েরা সাইরাকিউসের চারিদিক ঘেরিয়া রাখিল। তারপর নগরের লোকদের যখন না খাইয়া মারা যাইবার মতো অবস্থা হইল, তখন সাইরাকিউস দখল করা সহজ হইয়া আসিল। মার্সেলাস হুকুম দিলেন, "যাও, নগর লুট করিয়া আন। কিন্তু খবরদার, আর্কিমিডিসের কোন অনিষ্ট করিও না।"

আর্কিমিডিস তখন কি একটা হিসাব করিতেছেন, নগরে কোথায় কি ঘটিতেছে, তাঁহার হুঁশও নাই। কতগুলা অঙ্ক ও রেখা কষিয়া তাহারই চিন্তায় তিনি ডুবিয়া আছেন। রোমীয় সৈন্যেরা সেই ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধকে আর্কিমিডিস বলিয়া চিনিতে পারিল না। তাহারা কোলাহল করিতে করিতে ঘরে ঢুকিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু তিনি তাঁহার চিন্তার মধ্যে এমনই তন্ময় হইয়াছিলেন যে, সে কথা তাঁহার কানেই গেল না। তিনি একবার খালি হাত তুলিয়া বলিলেন, "হিসাবে ব্যাঘাত দিও না।" মূর্খ সৈনিক তৎক্ষণাৎ তলোয়ারের আঘাতে তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিল। তাঁহার জীবনের শেষ হিসাব আর সম্পূর্ণ হইল না—তাঁহারই রক্তধারায় সে হিসাব মুছিয়া ফেলিল! কি তত্ত্বের আলোচনায় তিনি এমন করিয়া তন্ময় হইয়াছিলেন, তাহা জানিবারও আর কোন উপায় নাই।

আর্কিমিডিসের মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া মার্সেলাসের দুঃখের আর সীমা রহিল না। তিনি পরম যত্নে আর্কিমিডিসের কবরের উপর অতি সুন্দর সমাধি নির্মাণ করাইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইয়াছিলেন। তাহার পর দুই হাজার বৎসর চলিয়া গেল, মানুষের ইতিহাসে এই বিজ্ঞানবীর মহাপুরুষের নাম এখনও অমর হইয়া আছে।

গ্যালিলিও

সে সাড়ে তিনশত বৎসর আগেকার কথা। ইটালি দেশে পিসা নগরে সম্ভ্রান্ত বংশে গ্যালিলিও-র জন্ম হয়। গ্যালিলিওর পিতা অঙ্কশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন, শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি নানা বিদ্যায় তাঁহার দখল ছিল। কিন্তু তবু সংসারে তাঁহার টাকা পয়সার অভাব লাগিয়াই ছিল। সুতরাং তিনি ভাবিলেন, পুত্রকে এমন কোন বিদ্যা শিখাইবেন, যাহাতে ঘরে দুপয়সা আসিতে পারে। স্থির হইল, গ্যালিলিও চিকিৎসা শিখিবেন।

কিন্তু বাল্যকাল হইতেই গ্যালিলিওর মনের ঝোঁক অন্যদিকে। ডাক্তারি বই পড়ার চাইতে

তিনি কলকজা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেই বেশি ভালবাসিতেন। সকলে বলিত, "ওসব শিখিয়া লাভ কি? যাহাতে পয়সা হয় তাই শিখিতে চেষ্টা কর।" উনিশ বৎসর বয়সে একদিন ঘটনাক্রমে জ্যামিতি বিষয়ে এক বক্তৃতা শুনিয়া, গ্যালিলিও সেইদিন হইতেই জ্যামিতি শিখিতে লাগিয়া গেলেন। কিন্তু বেশিদিন তাঁহার কলেজে পড়া হইল না। তাঁহার পিতার দুরবস্থা ক্রমে বাড়িয়া শেষটায় এমন হইল যে, তিনি আর পড়ার খরচ দিতে পারেন না। কলেজের কর্তারাও দেখিলেন, এ ছোকরা নিজের পড়াশুনার চাইতে জ্যামিতি ও অন্যান্য 'বাজে' বইয়েতেই বেশি সময় নষ্ট করে। বুঝাইতে গেলে উল্টা তর্ক করে, আপনার জেদ ছাড়িতে চায় না। সুতরাং গ্যালিলিওর কলেজে টেকা দায় হইল। তিনি বাড়িতে ফিরিয়া আবার অঙ্কশাস্ত্রে মন দিলেন। তারপর পঁচিশ বৎসর বয়সে অনেক চেষ্টার পর, তিনি মাসিক ষোল টাকা বেতনে সামান্য এক মাস্টারির চাকরী লইলেন।

কিন্তু এ চাকরীও তাঁহার বেশিদিন টিকিল না। কেন টিকিল না, সে এক অদ্ভুত কাহিনী। সে সময়ে লোকের ধারণা ছিল, এবং পণ্ডিতেরাও এইরূপ বিশ্বাস করিতেন যে, যে-জিনিস যত ভারি, শূন্যে ছাড়িয়া দিলে সে তত তাড়াতাড়ি মাটিতে পড়ে। গ্যালিলিও একটা উঁচু চূড়া হইতে নানারকম জিনিস ফেলিয়া দেখাইলেন যে, একথা মোটেও সত্য নয়। সব জিনিসই ঠিক সমান হিসাবে মাটিতে পড়ে। তবে, কাগজ পালক প্রভৃতি নিতান্ত হালকা জিনিস যে আস্তে আস্তে পড়ে তার কারণ এই যে, হালকা জিনিসকে বাতাসের ধাক্কায় ঠেলিয়া রাখে। ঠিক কিরকমভাবে জিনিস কত সেকেন্ডে কতখানি পড়ে, তাহারও তিনি চমৎকার হিসাব বাহির করিলেন। কিন্তু এত বড় আবিষ্কারে লোকে খুশি না হইয়া বরং সকলে গ্যালিলিওর উপর চটিয়া গেল। পণ্ডিতেরা পর্যন্ত গ্যালিলিওর হিসাব প্রমাণ কিছু না দেখিয়াই সব আজগুবি বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। এবং তাহার ফলে ঘোর তর্ক উঠিয়া গ্যালিলিওর চাকরীটি গেল।

যাহা হউক অনেক চেষ্টায় গ্যালিলিও আবার আর একটি চাকরী জোগাড় করিলেন এবং কয়েক বৎসর একরূপ শান্তিতে কাটাইলেন। কিন্তু বিনা গোলমালে চুপচাপ করিয়া থাকা তাঁহার স্বভাব ছিল না। ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে ৪০ বৎসর বয়সে তিনি কোপার্নিকাসের মত সমর্থন করিয়া তুমুল তর্ক তুলিলেন। কোপার্নিকাসের পূর্বে লোকে বলিত "পৃথিবী শূন্যে স্থির আছে—সূর্য গ্রহ চন্দ্র তারা সব মিলিয়া তাহার চারিদিকে ঘুরিতেছে।" কোপার্নিকাস যখন বলেন যে, 'পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে' তখন লোকে তাঁহার কথা গ্রাহ্য করে নাই। সুতরাং গ্যালিলিও যখন আবার সেই মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন আবার একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সে সময়কার পণ্ডিতেরা প্রায় সকলেই গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে—কিন্তু গ্যালিলিও একাই তেজের সহিত তর্ক চালাইয়া সকলকে নিরস্ত করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে গ্যালিলিও দূরবীক্ষণের আবিষ্কার করেন। হল্যান্ড দেশের এক চশমাওয়ালা কেমন করিয়া দুইখানা কাচ লইয়া আন্দাজে পরীক্ষা করিতে গিয়া দৈবাৎ একটা দূরবীক্ষণ বানাইয়া ফেলে। এই সংবাদ ক্রমে ইটালি পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল; গ্যালিলিও শুনিলেন যে, একরকম যন্ত্র বাহির হইয়াছে, তাহাতে দূরের জিনিস খুব নিকটে দেখা যায়। শুনিয়াই তিনি ভাবিতে বসিলেন এবং রাতারাতি জিনিসটার সংকেত বাহির করিয়া, নিজেই একটা দূরবীণ বানাইয়া ফেলিলেন। হল্যাণ্ডের চশমাওয়ালাটি দূরবীণ দিয়া দূরের ঘরবাড়ি দেখিয়াই সন্তুষ্ট ছিল, গ্যালিলিও তাহাকে আকাশের দিকে ফিরাইলেন।

দূরবীণে আকাশ দেখিয়া তাঁহার মনে কি যে আনন্দ হইল, সে আর বলা যায় না।

তিনি যেদিকে দূরবীণ ফিরান, যাহা কিছু দেখিতে যান সবই আশ্চর্য দেখেন। চাঁদের উপর দূরবীণ কষিয়া দেখা গেল, তার সর্বাঙ্গে ফোস্কা! কোন জন্মের সব আগ্নেয় পাহাড় তার সারাটি গায়ে যেন চাক বাঁধিয়া আছে। বৃহস্পতিকে দেখা গেল একটা চ্যাপ্টা গোলার মতো—তার আবার চার চারটি চাঁদ। সূর্যের গায়ে কালো কালো দাগ! ছায়াপথের ঝাপ্‌সা আলোয় যেন হাজার হাজার তারার গুঁড়া ছড়াইয়া আছে। শুক্রগ্রহ যে ঠিক আমাদের চাঁদের মতো বাড়ে কমে, দূরবীণে তাহাও ধরা পড়িল। এমনি করিয়া গ্যালিলিও কত যে আশ্চর্য ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন তাহার আর শেষ নাই। অবশ্য এসব কথাও লোকে বিশ্বাস করিতে চাহিল না—কোন কোন পণ্ডিত গ্যালিলিওর সঙ্গে তর্ক করিতে আসিয়া, তাঁহার দূরবীণ দেখিয়া তবে সব বিশ্বাস করিলেন। কেহ কেহ সব দেখিয়াও বলিলেন, "ওসব কেবল দেখার ভুল—চোখে ধাঁধা লাগিয়া ঐরূপ দেখায়—আসলে আকাশে ওরকম কিছু নাই।" একজন পণ্ডিত দূরবীণ দিয়া বৃহস্পতির চাঁদ দেখিতে সাফ অস্বীকার করিলেন।

ক্রমে কথাটা গুরুতর হইয়া উঠিল। লোকে বলিতে লাগিল গ্যালিলিও এইরকম ভাবে যা-তা প্রচার করিতে থাকিলে লোকের ধর্মবিশ্বাস আর টিকিবে না। পৃথিবী স্থির হইয়া আছে, এ কথাই যদি লোকে বিশ্বাস না করে, তবে কিসে তাহারা বিশ্বাস করিবে? স্বয়ং ধর্মগুরু পোপ আদেশ দিলেন, "তুমি এই সকল জিনিস লইয়া বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করিও না। তোমার যা বিশ্বাস, তা তোমারই থাক। তাহা লইয়া যদি লোকের মনে নানারকম সন্দেহ জন্মাইতে যাও, তবে ভাল হইবে না।" গ্যালিলিও বুঝিলেন যে 'ভাল হইবে না' কথাটার অর্থ বড় সহজ নয়। নিজের প্রাণটি বাঁচাইতে হইলে আর গোলমাল না করাই ভাল। কয়েক বৎসর গ্যালিলিও চুপ করিয়া রহিলেন—অর্থাৎ ঐ বিষয়ে চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁহার মনের রাগ ও ক্ষোভ গেল না। কিছুদিন জোয়ার ভাঁটা ধূমকেতু ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়া, তিনি আবার সেই পৃথিবী ঘোরার কথা লইয়া নাড়াচাড়া আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এবারে 'পৃথিবী ঘোরে' একথা স্পষ্টভাবে না বলিয়া, তিনি তাঁহার বিরুদ্ধদলকে নানারকমে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া সকলকে ক্ষেপাইয়া তুলিলেন। তখন পাদ্রির দল তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনিল যে, গ্যালিলও ধর্মগুরু পোপকে অপমান করিয়াছেন। অভিযোগটা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কিন্তু পাদ্রিদের ধর্মবিচার সভায় গ্যালিলিওর উপর তাঁহার সমস্ত কথা ফিরাইয়া লইবার হুকুম হইল—না লইলে প্রাণদণ্ড। গ্যালিলিওর বয়স তখন প্রায় ৭০ বৎসর। অনেক অত্যাচারের পর তিনি তাঁহার কথা ফিরাইয়া লইলেন। সভায় সকলের সম্মুখে বলিলেন, "আমি যাহা শিক্ষা দিয়াছি, তাহা ভুল বলিয়া স্বীকার করিলাম।" কিন্তু মুখে একথা বলিলেও তাঁহার মন তাহা মানিল না—তিনি পাশের একটি বন্ধুকে দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "অস্বীকার করিলে হইবে কি? এই পৃথিবী এখনও চলিতেছে।"

এইরূপে নিজের জীবনের উপার্জিত সমস্ত সত্যকে অস্বীকার করিয়া, তিনি মনের ক্ষোভে ভগ্নদেহে বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। তারপর যে কয়েক বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন, তাঁহাকে আর বাহিরে কোথাও বড় দেখা যাইত না। নিজে সারাজীবন সাধনা করিয়া যাহা সত্য বুঝিয়াছেন, তাহা প্রাণ খুলিয়া প্রচার করিতে পারিলেন না, এই দুঃখ লইয়াই তাঁহার জীবন শেষ হইল। যদি গ্যালিলিও জানিতেন আজ জগতের লোকে তাঁহার শিক্ষা এমন সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবে, তবে বোধহয় বৃদ্ধের শেষ জীবন এত কষ্টের হইত না।

ডারুইন

ছেলেবেলায় আমরা শুনিয়াছিলাম "মানুষের পূর্বপুরুষ বানর ছিল।" ইহাও শুনিয়াছিলাম যে, ডারুইন নামে কে এক পণ্ডিত নাকি একথা বলিয়াছেন। বাস্তবিক ডারুইন এমন কথা কোনদিন বলেন নাই। আসল কথা এই যে, অতি প্রাচীনকালে বানর ও মানুষের পূর্বপুরুষ একই ছিল। সেই এক পূর্বপুরুষ হইতেই বানর ও মানুষ, এ-দুই আসিয়াছে—কিন্তু সে যে কত দিনের কথা তাহা কেহ জানে না।

তখন হইতেই আমার মনে একটা সন্দেহ ছিল, পণ্ডিতেরা এত খবর জানেন কি করিয়া? তাঁহারা ত সেই প্রাচীনকালের পৃথিবীটাকে চক্ষে দেখিয়া আসেন নাই, তবে তাহার সম্বন্ধে এত সব কথা তাঁহারা বলেন কিসের জোরে? যাহা হউক, আমরা ত আর পণ্ডিত নই, তাই অনেক কথাই আমাদের মানিয়া লইতে হয়। মানিতে হয় যে এই পৃথিবীটা ফুটবলের মতো গোল এবং সে লাট্টুর মতো ঘোরে, আর সূর্যের চারিদিকে পাক দিয়া বেড়ায়—যদিও এসবের কিছুই আমরা চোখে দেখি না। ছেলেবেলায় ভাবিতাম, পণ্ডিতদের খুব বুদ্ধি বেশি, তাই তাঁহারা অনেক কথা জানিতে পারেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি কেবল তাহা নয়। বুদ্ধি ত বটেই, তাছাড়া আরও কয়েকটি জিনিস চাই, যাহা না থাকিলে কেহ কোনদিন যথার্থ পণ্ডিত হইতে পারে না। তাহার মধ্যে একটি জিনিস, ঠিকমতো দেখিবার শক্তি। সাধারণ লোকে যেমন দুই-একবার চোখ বুলাইয়া মনে করে ইহার নাম 'দেখা'—পণ্ডিতের দেখা সেরকম নয়। তাঁহারা একই বিষয় লইয়া দিনের পর দিন দেখিতেছেন, তবু দেখার আর শেষ হয় না। মাথার উপর এত যে তারা সারারাত মিটমিট করিয়া জ্বলে, আবার দিনের আলোয় মিলাইয়া যায়, পণ্ডিতেরা কত হাজার বৎসর ধরিয়া তাহা দেখিতেছেন তবু তাঁহাদের তৃপ্তি নাই। বছরের কোন্ সময়ে কোন্ তারা ঠিক কোন্খানে থাকে, কোন্ তারাটা কতখানি স্থির বা কিরকম অস্থির, তাদের রকমসকম কোন্টার কেমন—এইসবের সূক্ষ্ম হিসাব লইতে লইতে পণ্ডিতদের বড় বড় পুঁথি ভরিয়া উঠে। সেইসব হিসাব ঘাঁটিয়া তাহার ভিতর হইতে কত আশ্চর্য নূতন কথা তাঁহারা বাহির করেন, যাহা সাধারণ লোকের কাছে অদ্ভুত ও আজগুবি শুনায়।

আজ এক পণ্ডিতের কথা বলিব, তাঁহাকে কেহ বুদ্ধিমান বলিয়া জানিত না, মাস্টারেরা তাঁহার উপর কোনদিনই কোন আশা রাখেন নাই—বরং সকলে দুঃখ করিত 'এ ছেলেটার আর কিছু হইবে না।' অথচ এই ছেলেই কালে একজন অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীতে আপনার নাম রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার নাম চার্লস ডারুইন। পড়ার দিকে ডারুইনের বুদ্ধি খুলিত না, কিন্তু একটা বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ আগ্রহ ছিল। সেটি কেবল নানা অদ্ভুত জিনিস সংগ্রহ করা! শামুক ঝিনুক হইতে আরম্ভ করিয়া, পুরাতন ভাঙা জিনিস বা পাথরের কুচি পর্যন্ত নানা জিনিসে তাঁহার বাক্স ও পড়িবার টেবিল বোঝাই হইয়া থাকিত। বালকের এই আগ্রহটা অন্য লোকের কাছে অন্যায় বাতিক বা উপদ্রব বলিয়াই বোধ হইত, কিন্তু তবু কেহ তাহাতে বড় একটা বাধা দিত না। কারণ, ডারুইনের মনটা স্বভাবতই এমন কোমল এবং তাঁহার স্বভাব এমন মিষ্ট ছিল যে সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত।

ছেলেবেলায় পড়ার মধ্যে একটি বই ডারুইন খুব মন দিয়া পড়িয়াছিলেন—তাহাতে পৃথিবীর

নানা অদ্ভুত জিনিসের কথা ছিল। সেই বই পড়িয়া অবধি তাঁহার মনে দেশ-বিদেশ ঘুরিবার শখটা জাগিয়া উঠে। কলেজে আসিয়া ডারুইন প্রথমে গেলেন ডাক্তারি শিখিতে। সে সময় ক্লোরোফর্ম ছিল না, তাই রোগীদের সজ্ঞানেই অস্ত্র-চিকিৎসার ভীষণ কষ্ট ভোগ করিতে হইত। সেই যন্ত্রণার দৃশ্য দেখিয়া করুণহৃদয় ডারুইনের মন এমন দমিয়া গেল যে, তাঁহার আর ডাক্তারি শেখা হইল না। তখন তিনি ধর্মযাজক হইবার ইচ্ছায় স্কটল্যাণ্ড ছাড়িয়া ইংলণ্ডে ধর্মতত্ত্ব শিখিতে আসিলেন। শিক্ষার দশা এবারও প্রায় পূর্বের মতোই হইল—কারণ, বাল্যকালে তিনি গ্রীক প্রভৃতি যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন, এ কয় বছরে তাহার সবই প্রায় ভুলিয়া বসিয়াছেন, ভুলেন নাই কেবল সেই নানা জিনিস সংগ্রহের অভ্যাসটা। কলেজে তাঁহার সহপাঠী বন্ধুরা দেখিত, ডারুইন সুযোগ পাইলেই মাঠে ঘাটে জঙ্গলে পোকামাকড় সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছেন। হয়ত সারাদিন কোন পোকার বাসার কাছে পড়িয়া, তাহার চালচলন স্বভাব সমস্ত যারপরনাই মনোযোগ করিয়া দেখিতেছেন। এই বিষয়ে কেবল নিজের চোখে দেখিয়া তিনি এমন সব আশ্চর্য খবর সংগ্রহ করিতেন, যাহা কোন পুঁথিতে পাওয়া যায় না। বন্ধুরা এইসব ব্যাপার লইয়া নানারকম ঠাট্টা তামাসা করিত, কেহ কেহ বলিত, "ডারুইন পণ্ডিত হইবে দেখিতেছি।" ডারুইন যে পণ্ডিত হইতে পারেন, এটা কাহারও কাছে বিশ্বাসযোগ্য কথা বলিয়া বোধ হইত না।

এইরূপে বাইশ বৎসর কাটিয়া গেল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে "বীগল" নামে এক জাহাজ পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইল—ডারুইন বিনা বেতনে প্রাণিতত্ত্ব সংগ্রহের জন্য তাহার সঙ্গে যাইবার অনুমতি পাইলেন। পাঁচ বৎসর জাহাজে করিয়া তিনি পৃথিবীর নানা স্থান ঘুরিয়া বেড়াইলেন এবং প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ে এমন আশ্চর্য নূতন জ্ঞান লাভ করিলেন যে, তাহা তাঁহার সমস্ত চিন্তা ও জীবনকে একেবারে নূতন পথে লইয়া চলিল। ডারুইন বলেন ইহাই তাঁহার জীবনের সব চাইতে স্মরণীয় ঘটনা।

তারপর কুড়ি বৎসর ধরিয়া ডারুইন এই সমস্ত বিষয় লইয়া গভীরভাবে আলোচনা করিতে লাগিলেন। প্রাচীনকালে যে-সকল জীবজন্তু পৃথিবীতে ছিল, আজ তাহারা নাই, কেবল কতগুলি কঙ্কালচিহ্ন দেখিয়া আমরা তাহার পরিচয় পাই। আজ যে-সকল জীবজন্তু দেখিতেছি, তাহারাও ভুঁইফোঁড় হইয়া হঠাৎ দেখা দেয় নাই—ইহারাও সকলেই সেই আদিমকালের কোন না কোন জন্তুর বংশধর। কেমন করিয়া এ পরিবর্তন হইল? এরূপ পরিবর্তন হইবার কারণ কি? যে গাছের যে ফল তাহার বীচি পুঁতিলে সেই ফলেরই গাছ হয়, তাহাতে সেইরূপই ফল ফলে, আমরা ত এইরূপই দেখি। যে জন্তুর আকার-প্রকার যেমন, তার ছানাগুলাও হয় সেরূপ। শেয়ালের বংশে শেয়ালই জন্মে। শেয়ালের ছানা, তার ছানা, তার ছানা, তার ছানা, এরূপ যতদূর দেখিতে পাই সকলেই ত শেয়াল। তবে এ আবার কোন্ সৃষ্টিছাড়া নিয়ম, যাহাতে এক জন্তুর বংশে ক্রমে এমন জন্তুর জন্ম হয়, যাহাকে আর সেই বংশের সন্তান বলিয়া চিনিবার যো থাকে না? ডারুইন দেখিলেন তিনি যে সমস্ত নূতন তত্ত্ব জানিয়াছেন, তাহার মধ্য হইতেই নানা দৃষ্টান্ত দেখাইয়া এই সকল প্রশ্ন ও সন্দেহের অতি চমৎকার মীমাংসা করা যায়।

যাহারা ওস্তাদ মালী তাহারা ভাল ভাল গাছের 'কলম' করিবার সময়, বা বীজ পুঁতিবার সময় যে-সে গাছের বীজ বা কলম লইয়া কাজ করে না। ভাল গাছ, ভাল ফুল, ভাল

ফল বাছিয়া বাছিয়া, তাহাদের মধ্যে নানারকম মিশাল করাইয়া, খুব সাবধানে পছন্দমত গাছ ফুটাইয়া তোলে। যেগুলা তাহার পছন্দমত নয়, সেগুলাকে সে একেবারেই বাদ দেয়। তাহার ফলে অনেক সময় গাছের চেহারার আশ্চর্যরকম উন্নতি ও পরিবর্তন দেখা যায়। একটা সামান্য জংলি ফুল মানুষের চেষ্টা ও যত্নে আজ সুন্দর গোলাপ হইয়া উঠিয়াছে—নানা লোকে গোলাপের চর্চা করিয়া আপন পছন্দমত নানারূপ বাছাই করিয়া, নানারকম মিশাল দিয়া কত যে নূতনরকমের গোলাপ গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার আর অন্ত নাই। যাহারা ব্যবসার জন্য বা সখের জন্য নানারূপ জন্তু পালে তাহারা জানে যে, কোন জন্তুর বংশের উন্নতি করিতে হইলে, রুগ্ন কুৎসিত বা অকর্মণ্য জন্তুগুলাকে বাদ দিতে হয়। তাহার পর যেরূপ গুণ ও লক্ষণ দেখিয়া বাছিয়া বাছিয়া জোড় মিলাইবে, বংশের মধ্যে সেইসব লক্ষণ ও গুণ পাকা হইয়া উঠিবে। লম্বা শিংওয়ালা ভেড়া চাও ত বাছিবার সময় লম্বা শিং দেখিয়া বাছিবে। তাহাদের যেসব ছানা হইবে, তাহাদের মধ্যে যেগুলার শিং ছোট, তাহাদের বাদ দিবে। এইরূপে ক্রমে লম্বা শিঙের দল গড়িয়া উঠিবে।

ডারুইন দেখিলেন, মানুষের বুদ্ধিতে যেমন নানারকম বাছাবাছি চলে, প্রাণিজগতেও সর্বত্রই স্বাভাবিকভাবে সেইরূপ বাছাবাছি চলে। যারা রুগ্ন যারা দুর্বল মরিবার সময় তাহারাই আগে মরে, যাহারা বাহিরে নানা অবস্থার মধ্যে আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে, তাহারাই টিকিয়া যায়। কাহারও গায়ে জোর বেশি, সে লড়াই করিয়া বাঁচে; কেহ খুব ছুটিতে পারে, সে শত্রুর কাছ হইতে পলাইয়া বাঁচে; কাহারও চামড়া মোটা, সে শীতে কষ্ট সহিয়া বাঁচে; কাহারও হজম বড় মজবুত, সে নানা জিনিস খাইয়া বাঁচে; কাহারও গায়ের রং এমন যে হঠাৎ চোখে মালুম হয় না, সে লুকাইয়া বাঁচে। বাঁচিবার মতো গুণ যাহার নাই সে বেচারা মারা যায়, আর সেই সব গুণ আর লক্ষণ যাহাদের আছে তাহারাই বাঁচিয়া থাকে, তাহাদেরই বংশ বিস্তার হয়, আর বংশের মধ্যে সেইসব বাছা বাছা গুণগুলিও পাকা হইয়া স্পষ্ট হইয়া উঠে। এইরূপ আপনাকে বাঁচাইবার জন্য সংগ্রাম করিতে করিতে, বাহিরের নানা অবস্থার মধ্যে প্রত্যেক জন্তুর চেহারা নানারকমভাবে গড়িয়া ওঠে।

ডারুইন দেখাইলেন, এইরূপে এবং আরও নানা কারণে, আপনা হইতেই এক একটা জন্তুর চেহারা নানারকমে বদলাইয়া যায়। সেই হুঁকার গল্প তোমরা শুনিয়াছ, যার সবই ঠিক ছিল কেবল নল্‌চে আর মালাটি বদল হইয়াছিল? এক একটা জানোয়ারও ঠিক সেইরূপ নল্‌চে মালা সবই বদল করিয়া নূতন মূর্তি ধারণ করে—তখন তাহাকে সম্পূর্ণ নূতন জন্তু বলিয়া ভুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

ডারুইনের কথা বলিতে গেলে দুটি গুণের কথা বিশেষ করিয়া বলিতে হয়—একটি তাঁহার অক্লান্ত অধ্যবসায় আর একটি তাঁহার মিষ্ট স্বভাব। তাঁহার শরীর কোনকালেই খুব সুস্থ ছিল না—জীবনের শেষ চল্লিশ বৎসর সে শরীর একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মনের শক্তি আশ্চর্যরকম সতেজ ছিল। প্রতিদিন ভোরের আগে ঘুম হইতে উঠিয়া তিনি বাগানে যাইতেন—সেখানে ফুল ফল আর মৌমাছি আর প্রজাপতির সঙ্গে পরিচয় করিতে করিতে কোন্‌দিক দিয়া যে তাঁহার সময় কাটিয়া যাইত কত সময়, তাঁহার সে খেয়ালই থাকিত না।

ডারুইনকে যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা বলেন যে, সকলকে প্রাণ দিয়া এমন ভালবাসিতে

আর কেহ পারে না। শুধু মানুষ নয়, পশুপক্ষী নয়, গাছের ফুলটিকে পর্যন্ত তিনি এমনভাবে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন যে, লোকে অবাক হইয়া যাইত। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইলে ইংরাজ জাতি সেই 'অল্পবুদ্ধি' ছাত্রকে পরম আদরে বিজ্ঞানবীর নিউটনের পাশে সমাধি দেন।

পাস্তুর

মানুষের যতরকম রোগ হয়, আজকালকার ডাক্তারেরা বলেন তার সবগুলিই অতি ক্ষুদ্র জীবাণুর কীর্তি। এই জীবাণু বা "মাইক্রোব" (Microbe) গুলিই সকল রোগের বীজ। পথে ঘাটে বাতাসে মানুষের শরীরের ভিতরে বাইরে ইহারা ঘুরিয়া বেড়ায়। আজকালকার চিকিৎসাশাস্ত্রে ইহাদের খাতির খুব বেশি। এই জীবাণুগুলির ভালরূপ পরিচয় লওয়া, ইহাদের চালচলনের সংবাদ রাখা এবং এগুলিকে জব্দ করিবার নানাপ্রকার ব্যবস্থা করা, এখনকার ডাক্তারিবিদ্যার খুব একটা বড় ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার ফলে চিকিৎসাপ্রণালী আশ্চর্যরকম উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই সমস্ত উন্নতি এবং এই নূতন প্রণালীর মূলে ফরাসী পণ্ডিত লুই পাস্তুর। পাস্তুর একা এ বিষয়ে নূতন আবিষ্কার ও নূতন চিন্তা দ্বারা মানুষের জ্ঞান ও চেষ্টাকে যে কতদূর অগ্রসর করিয়াছেন, ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়।

প্রায় ৯৪ বৎসর আগে পাস্তুরের জন্ম হয়। অতি অল্প বয়স হইতেই শিক্ষকদের মুখে তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা শুনা যাইত। সেসময়কার বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের কাছে তিনি বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতেই রসায়নবিদ্যায় তাঁহার খুব নাম শুনা গিয়াছিল। ৪৫ বৎসর বয়সে যখন তিনি অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া প্যারিসে আসেন তখনও লোক তাঁহাকে খুব বড় রাসায়নিক পণ্ডিত বলিয়াই জানিত। কিন্তু দেখিতে দেখিতে তাঁহার চোখ পড়িল আর একটা ব্যাপারের উপর—'জিনিস পচে কেন?' এই প্রশ্ন লইয়া তিনি ভারি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা এবং পুরাতন শিক্ষকেরা ইহাতে ভারি দুঃখিত হইলেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন "পাস্তুরের এমন বুদ্ধি ছিল, চেষ্টা করিলে সে রসায়নশাস্ত্রে কত কি করিতে পারিত; সে কিনা একটা বাজে বিষয় লইয়া সময় নষ্ট করিতে বসিল।"

কিন্তু পাস্তুর ছাড়িবার লোক নহেন। তিনি ভাবিলেন ব্যাপারটা তলাইয়া দেখিতে হইবে। আগে লোকের ধারণা ছিল সব জিনিস বাতাস লাগিয়া 'আপনা-আপনি' পচিয়া যায়। পাস্তুর দেখাইলেন, দুধে একপ্রকার জীবাণু থাকে যাহার জন্য দুধ টকিয়া নষ্ট হইয়া যায়। মাখন যে পচে তাহাও আর একপ্রকার জীবাণুর কাণ্ড। ভাত চিনি বা ফলের রস পচাইয়া যে মদ প্রস্তুত হয়, সেখানেও জীবাণু! নানাপ্রকার জীবাণু বাতাসে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেইজন্য অনেক জিনিস আদুল রাখিলে তাহা শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। পাস্তুর আরও দেখাইলেন যে, খুব গরম লাগাইলে এই জীবাণুগুলি মরিয়া যায়। এইরূপে জীবাণু নষ্ট করিয়া এক টুকরা মাংস বা খানিকটা দুধ একটা শিশির মধ্যে আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দেখা গেল যে, এ অবস্থায় সেগুলি আর পচিতে পারে না। আজকাল লোকে দুধ জমাইয়া টিনে আঁটিয়া বিক্রি করে, নানাপ্রকার ফল চিনির রসে ফুটাইয়া মাসের পর মাস বোতলে পুরিয়া রাখে, কতরকম মাছ মাংস, কতরকম

খাবার জিনিস বাতাসশূন্য পাত্রে করিয়া চালান দেয়। পাস্তুর যদি জীবাণু তাড়াইয়া জিনিস বাঁচাইবার সংকেতটি বলিয়া না দিতেন, তবে এ সকল কিছুই সম্ভব হইত না।

এই সময়ে ফ্রান্সে রেশম পোকার একরকম রোগ দেখা দিয়া, রেশমের কারবারের ভয়ানক ক্ষতি আরম্ভ করিল। পাস্তুর এই ব্যাপারটার সন্ধান করিতে গিয়া দেখিলেন, এই রোগের মূলে একপ্রকার জীবাণু। সেই জীবাণুটাকে নষ্ট করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়া তিনি রোগ দূর করিলেন। ইহার পর পশুপাখির রোগের কথা আপনা হইতেই আসিয়া পড়িল। খেয়ো জ্বরের উৎপাতে দেশের ছাগল গরু উজাড় হয় দেখিয়া তিনি সেই খেয়ো জ্বর দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। খেয়ো জ্বরের জীবাণুর সন্ধান করিয়া তাহার উপর নানারূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। ইহার ফলে তিনি যে চিকিৎসাপ্রণালী আবিষ্কার করিলেন, ডাক্তারমহলে এখনও তাহার জয়জয়কার চলিতেছে।

তিনি বলিলেন, রোগের বীজকে কাহিল করিয়া সেই বীজের টীকা দাও—তাহাতেই রোগ সারিবে। যাহার রোগ হইয়াছে তাহার দেহ হইতে জীবাণু সংগ্রহ করিয়া সেগুলিকে সাবধানে বাড়িতে দাও, তারপর অন্য প্রাণীর দেহে সেই জীবাণুর সাহায্যে রোগ প্রবেশ করাও। এই প্রাণীটি যখন রুগ্ন হইবে এবং তাহার দেহে লক্ষ লক্ষ জীবাণু দেখা দিবে—তাহার শরীর হইতেই টীকার বীজ পাওয়া যাইবে।

পাগলা কুকুরে কামড়াইলে মানুষের 'জলাতঙ্ক' রোগ হয়। এই ভয়ানক রোগের জীবাণুগুলি এতই ছোট যে, সেগুলি অনুবীক্ষণেও দেখা যায় না। কিন্তু পাস্তুর বলিলেন, "চোখে দেখা যাউক আর নাই যাউক, জীবাণু আছেই।" সেই অদৃশ্য জীবাণুর দ্বারা তিনি অন্য প্রাণীর মধ্যে রোগ জন্মাইয়া, টীকার বীজ প্রস্তুত করিলেন। একটি চাষার ছেলেকে নেক্‌ড়ে বাঘে কামড়াইয়াছিল—পাস্তুরের সর্বপ্রথম পরীক্ষা হইল তাহার উপরে। এই বালক যখন বাঁচিয়া গেল, তাহার পর হইতেই পাস্তুরের চিকিৎসাপ্রণালী ডাক্তারমহলে একেবারে পাকা হইয়া পড়িয়াছে। পারিস নগরে পাস্তুরের নামে যে বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, তাহার সম্মুখে এই কৃষক বালকের একটি সুন্দর মূর্তি আছে।

এক সময়ে ডাক্তারেরা মানুষের দেহে একটু ছুরি চালাইতে হইলেই কত ব্যস্ত হইতেন, কিন্তু এখনকার অস্ত্রচিকিৎসক মানুষের হাত পা কাটিতেও আর ইতস্তত করেন না, কারণ তিনি জানেন, রোগের বীজ তাড়াইলেই আর ভয় নাই। তাই এত হাত ধোয়াধোয়ি, ফুটন্ত জলে ছুরি কাঁচি ডুবান, এত সাবান আর এত কার্বলিক এসিড, নির্দোষ তুলা ও ব্যান্ডেজের জন্য এত কড়াকড়ি—দুষ্ট জীবাণু যাহাতে কোন ফাঁকে ঢুকিতে না পারে। যুদ্ধের জায়গায় হাজার হাজার লোক আহত হইতেছে; তাহার শতকরা আশিজন বাঁচিয়া উঠিতেছে কেবল পাস্তুরের প্রসাদে। আজ বিশ বৎসর হইল পাস্তুর মারা গিয়াছেন; ফরাসি জাতি রাজসম্মানে তাঁহার সমাধি দিয়া, সেই সমাধির উপর তাঁহারই নামে বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সেখানে এখনও নূতন নূতন আবিষ্কার চলিতেছে। পাস্তুরের শিষ্যেরা এখন পৃথিবীর চারিদিক ছাইয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এখনও কত লোক কত কীর্তি সঞ্চয় করিতেছে।

পাস্তুরকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "তুমি সারা জীবন ধরিয়া কি দেখিলে এবং কি শিখিলে?" পাস্তুর বলিলেন, "দেখিলাম, এ জগৎব্যাপারের সকলই আশ্চর্য, সকলই অলৌকিক।"

পণ্ডিতের খেলা

সে প্রায় দেড়শত বৎসরের আগেকার কথা, একদিন এক ইংরাজ বুড়ি তাহার জানালা দিয়া দেখিতে পাইল যে, পাশের বাড়িতে বাগানে বসিয়া একজন বয়স্ক লোক সারাদিন কেবল বুদ্বুদ উড়াইতেছে। দুদিন চারদিন এইরকম দেখিয়া বুড়ি ভাবিল লোকটা নিশ্চয় পাগল—তা না হইলে, কাজ নাই কর্ম নাই, কেবল কচি খোকার মতো বুদ্বুদ লইয়া খেলা—এ আবার কোন দেশী আমোদ? বুড়ি তখন ব্যস্ত হইয়া থানায় গিয়া খবর দিল।

যে-লোকটি বুদ্বুদ উড়াইত, পুলিশে তাহার খবর লইতে গিয়া দেখিল, তিনি আর কেহ নহেন, স্বয়ং সার আইজাক নিউটন—যাঁহার মতো অত বড় বিজ্ঞানবীর হাজার বৎসরে দুটি পাওয়া দুষ্কর। বুদ্বুদের গায়ে যে রামধনুর মতো জমকালো রং দেখা যায়, নিউটন তখন তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। নিউটনের পরেও ইয়ং প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতেরা এই অনুসন্ধান লইয়া বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়াছেন, এবং তাহার ফলে, আলোক জিনিসটা যে কি, এ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে।

মেঘের গায়ে রামধনুকের রং দেখিতে যে খুবই সুন্দর তাহাতে আর সন্দেহ কি? দেখিলে সকলেরই মনে কৌতূহল জাগে। শুধু মেঘের গায়ে নয়, আলোকের রঙিন খেলা স্ফটিক পাথর বা কাঁচের ঝাড়ে কেমন করিয়া ঝিকমিক করে, তাহা সকলেই দেখিয়াছি। কিন্তু আমাদের দেখায় আর পণ্ডিতের দেখায় অনেক তফাৎ। নিউটন সেই রঙের খেলাকে নানারকমে খেলাইয়া দেখিলেন, আসল ব্যাপার কি। তারপর সেই একই ব্যাপারের সন্ধান করিয়া কত পণ্ডিত যে কত নূতন তত্ত্ব বাহির করিলেন, তাহার আর অন্ত নাই। কিন্তু আজও তাঁহাদের কৌতূহল মিটে নাই। বর্ণবীক্ষণ (Spectroscope) যন্ত্রে সূর্যের আলোক দেখায় যেন রামধনুকের ফিতা। সেই ফিতার মধ্যে রঙের মালা কেমন করিয়া সাজান থাকে পণ্ডিতেরা হাজাররকম উপায়ে তাহার পরীক্ষা করিয়াছেন। এক একরকম আলোর এক একরকম রঙিন মালা। সূর্যের আলোক বর্ণবীক্ষণে পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে সূর্যের ভিতরকার গোলকটা যেমন গরম তাহার বাইরের আগুনটা সেরকম গরম নয়। সূর্যের আলোর রঙিন ছটায় তাঁহারা এক একটা চিহ্ন দেখেন আর মাপিয়া বলেন, "এটা লোহার জ্যোতি—এটা হাইড্রোজেনের আলো—এইটা গন্ধকের চিহ্ন, এইটা অঙ্গারের রেখা, এইটা ক্ষারের ধাতুর, এইটা চূনের ধাতুর—" ইত্যাদি। তারার আলোর রামধনু ফলাইয়া তাঁহারা বলিতে পারেন, এই তারাটা গ্যাসের পিণ্ড, এই তারাটা জমাট আগুন, এই তারাটা বাষ্পে ঢাকা। এই সমস্ত সংকেত শিখিবার মূলে ঐ রামধনুক দেখিবার কৌতূহল।

নিউ ফাউন্ডল্যান্ডের সমুদ্রকূলে কতগুলা লোক প্রতিদিন ঘুড়ি উড়াইত, আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়িয়া থাকিত। সেখানকার নাবিকেরা এই 'নিষ্কর্মা' লোকেদের ছেলেখেলা দেখিয়া ঠাট্টা তামাশা করিত। তাহারা জানিত না যে ঐ নিষ্কর্মার সর্দারটির নাম মার্কনি—সেই মার্কনি, যিনি বিনা তারে টেলিগ্রাফ পাঠাইবার কল বানাইয়াছেন। তারের সূতায় বাঁধা প্রকাণ্ড ঘুড়ি আকাশে উড়িত, আর একটা লোক সেই তারের সঙ্গে টেলিফোনের কল জুড়িয়া কান পাতিয়া পড়িয়া থাকিত। তারপর একদিন যখন সেই টেলিফোনের কলের মধ্যে টক্‌টক্ শব্দ শোনা

গেল, তখন সকলের আনন্দ দেখে কে! তাহারা জানিত যে ঐ শব্দ আসিতেছে অতলান্তিক মহাসাগরের ওপার হইতে। এমনি করিয়া ইংলন্ড হইতে আমেরিকায় বিনা তারে বিদ্যুতের খবর চলিতে আরম্ভ করিল।

ইংলন্ডের যাঁহারা নামজাদা পণ্ডিত, তাঁহাদের মধ্যে মাইকেল ফ্যারাডের নাম বিশেষ স্মরণীয়। এক দপ্তরীর পুরাতন বইয়ের দোকানে কাজ করিয়া ফ্যারাডে অবসরমত দোকানে বইগুলা পড়িতেন। এমনি করিয়া তাঁহার মনে শিখিবার আগ্রহ জাগিয়াছিল। তারপর এক অজানা ভদ্রলোকের অনুগ্রহে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে ভাল বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার কৌতূহল এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে সেই কৌতূহল মিটাইতে গিয়া তিনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। বিদ্যুতের শক্তিতে কল চালাইবার সংকেত তিনিই আবিষ্কার করেন। বিদ্যুতের কল এখন পৃথিবীতে সর্বত্রই চলিতেছে—বিদ্যুৎ ছাড়া সভ্যদেশের কাজ চলাই অসম্ভব। অথচ ফ্যারাডে যখন সর্বপ্রথমে একটি ছোট চাকাকে বিদ্যুতের বলে ঘুরাইবার সংকেত দেখাইলেন, তখন অনেক লোকেই সেটাকে নেহাৎ একটা তামাসার জিনিসমাত্র মনে করিয়াছিল। কেহ কেহ ফ্যারাডেকে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে এইরকমের খেলনা বানাইয়া তাঁহার মতো পণ্ডিত লোকের লাভ কি? ফ্যারাডে হাসিয়া বলিতেন, "নূতন একটা জ্ঞান লাভ করিলাম, ইহাই ত যথেষ্ট লাভ। আর কোন লাভ যদি নাও হয় তাহাতেই বা দুঃখ কি?"

গ্রামোফোনের কথা জানে না, এমন শিক্ষিত লোক আজকাল পাওয়া কঠিন। কিন্তু শব্দকে যে যন্ত্রের সাহায্যে ধরিয়া রাখা যায়, একথাটা কিছুদিন আগে পর্যন্ত মানুষের কল্পনায় আসে নাই। এডিসন যখন ফনোগ্রাফের আবিষ্কার করেন, তখন তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া তাঁহার কর্মচারীরা কেহ কেহ ভয় পাইয়াছিল। ঘরে মানুষ নাই, তিনি কেবল একটা চোঙার সঙ্গে কথা বলিতেছেন, তারপর চোঙার মুখে কান পাতিয়া কি যেন শুনিতেছেন—এইরকম ব্যাপার তাহারা সর্বদাই দেখিত! তারপর এডিসন যখন তাহাদের ডাকিয়া কলের আওয়াজ শুনাইলেন— তখন কলের মধ্যে বিকৃত গলায় মানুষের মতো শব্দ শুনিয়া তাহাদের ভয়টা ঘোচে নাই কিন্তু এইটুকু বুঝিয়াছিল যে ব্যাপারটা নেহাৎ পাগলের খেলা নয়।

বিলাতের পিল্ট ডাউন নামক স্থানে কতগুলা মজুর মাটি খুঁড়িতেছিল। মাটির মধ্যে মাঝে মাঝে পাথরের টুকরার মতো কিসব জিনিস বাহির হইত, একজন সাহেব সেইগুলা পয়সা দিয়া কিনিয়া লইত। সেগুলা যে প্রাচীন মানুষের চিহ্ন মজুরেরা তাহা জানিত না। তাহারা পয়সার লোভে সেইসব সংগ্রহ করিয়া রাখিত, কিন্তু সাহেবটি পিছন ফিরিলেই তাহারা হাসাহাসি করিত, আর ইঙ্গিত করিয়া বলিত, "লোকটার মাথায় কিছু গোল আছে।" একদিন হঠাৎ খুলির হাড়ের মতো এক টুকরা জিনিস পাইয়া সেই সাহেবের উৎসাহ ভয়ানক চড়িয়া গেল— এবং কিছুদিন বাদে কোথা হইতে এক বুড়া আসিয়া সেই সাহেবের সঙ্গে মিলিয়া মাটি ঘাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। একটার জায়গায় দুটা পাগলকে দেখিয়া মজুরদেরও আমোদ বাড়িয়া গেল। কারণ, ইঁহাদের উৎসাহেব কারণ তাহারা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। দুজনের চেষ্টায় যাহার আবিষ্কার হইল বৈজ্ঞানিকেরা তাহার নাম দিয়াছেন পিল্ট ডাউনের খুলি। ইহা অতি প্রাচীনকালের একটা মানুষের মাথার টুকরা। কেহ কেহ বলেন এত প্রাচীন মানুষের চিহ্ন আর পাওয়া যায় নাই। খুলিটার বয়স লইয়া পণ্ডিতমহলে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইয়াছে। ইহার জন্য সাহেব দুটি ছয় মাস ধরিয়া মাটিতে বসিয়া 'রাবিশ' ঘাঁটিয়াছিলেন!

বনচাঁড়ালের গাছের পাতা আপনা-আপনি কাঁপিতে থাকে। ইহা অনেক লোকেই দেখিয়াছে, কিন্তু আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কৌতূহল ইহাতেই জাগিয়া উঠিল। তিনি যে কতরকম কৌশল খাটাইয়া কতরকম পরীক্ষা করিয়া এই পাতাকে নাচাইয়া দেখিয়াছেন, তাহার যদি খবর লও, তবে বুঝিবে বৈজ্ঞানিকের 'দেখা' আর সাধারণ লোকের দেখায় তফাৎ কিবকম!

'সামান্য' ঘটনা

এক একটা সামান্য ঘটনা থেকে জগতে কত বড় বড় কাণ্ড, কত আবিষ্কার, কত মারামারি, কত যুদ্ধবিগ্রহের আরম্ভ হয়েছে, সে কথা ভাবতে গেলে এক-এক সময় ভারি আশ্চর্য লাগে। আমাদের দেশে পুরাণে এরকম ঘটনার অনেক গল্প আছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর কৌরবদের মধ্যে যখন কেবল অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা আর কৃপাচার্য, এই তিনজন মাত্র বাকি রইলেন, তখন অন্ধকার রাত্রে গাছের তলায় শুয়ে অশ্বত্থামা দেখলেন, একটা পেঁচা এসে কতগুলো ঘুমন্ত কাককে অনায়াসে মেরে রেখে গেল! তাতেই অশ্বত্থামার মনে হঠাৎ এই ফন্দি জাগল যে, 'আমিও ত এমনি করে অন্ধকার রাত্রে পাণ্ডবশিবিরে ঢুকে যোদ্ধাদের মেরে ছারখার করে আসতে পারি।' যেমন মনে হওয়া, অমনি সেইমত কাজে লাগা। সেই রাত্রের ভয়ংকর ব্যাপারের কথা তোমরা মহাভারতে পড়েছ।

ছেলেবেলায় ইংরাজিতে রবার্ট ব্রুসের গল্প পড়েছিলাম। স্কটল্যান্ডের যোদ্ধা রাজা রবার্ট ব্রুস প্রবল শত্রুর কাছে বার বার পরাজিত হয়ে শেষটায় রাজ্যের আশা ছেড়ে দিয়ে এক পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে আছেন; এমন সময় তিনি দেখলেন একটা মাকড়সা একখানি সুতো ধরে বার বার গুহার মুখটাকে বেয়ে উঠবার চেষ্টা করছে আর বার বার পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তবু সে চেষ্টা ছাড়ছে না। অনেক চেষ্টার পর শেষে সে ঠিকমত উঠতে পারল। তা দেখে রাজা রবার্টের মনেও ভরসা এল—তিনি ভাবলেন, আর একবার চেষ্টা করে দেখি। সেই চেষ্টার ফলে তিনি জয়লাভ করে আবার তাঁর রাজ্য ফিরে পেলেন।

বিজ্ঞানবীর নিউটন তাঁর বাগানে বসে দেখলেন, গাছ থেকে একটা ফল মাটিতে পড়ল। ঘটনাটা নিতান্তই সামান্য, কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার ফলাফল বড় সামান্য নয়। নিউটন ভাবতে বসলেন, 'ফলটা মাটিতে পড়ল কেন?' জিনিসমাত্রই শূন্যে ছেড়ে দিলে মাটিতে পড়ে কেন? চারিদিক জুড়ে এত প্রকাণ্ড আকাশ পড়ে আছে, তা ছেড়ে এই পৃথিবীর মাটির উপরেই তার এত ঝোঁক কেন?' ভাবতে ভাবতে তিনি মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্ব আবিষ্কার করে ফেললেন। প্রথম, তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, পৃথিবীটা তার আশেপাশের সমস্ত [জিনিস] টানে। কিন্তু শুধু পৃথিবীই কি টানে? চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র এদেরও কি সে শক্তি নেই? আর শুধু কাছের জিনিসকেই পৃথিবী টানে, অনেক দূর পর্যন্ত কি সে টান পৌঁছায় না? ভাবতে ভাবতে সিদ্ধান্ত হল এই যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রত্যেকটি জড়কণা অপর সমস্ত জড়কণার প্রত্যেকটিকে আকর্ষণ করে। যতদূরেই যাওয়া যায় সে আকর্ষণ ততই ক্ষীণ হয়ে আসে। এই পৃথিবী চন্দ্রকে টানছে, চন্দ্রও পৃথিবীকে টানছে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি পাথর, প্রত্যেকটি মাটির ঢেলা, প্রত্যেকটি ধূলিকণা পর্যন্ত জগতের আর সমস্ত জিনিসকে আকর্ষণ করছে। নিউটন দেখালেন যে, এইভাবে

গণনা করে দেখলে পৃথিবী এই উপগ্রহ প্রভৃতি সকলেরই চলাফিরার ঠিকমত হিসাব পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এত বড় তত্ত্বের আবিষ্কার আর দ্বিতীয় হয়নি বললেও চলে।

একটা মরা ব্যাঙের ঠ্যাঙের নাচন থেকে বিদ্যুৎপ্রবাহের আবিষ্কার হয়। গ্যালভানি (Galvani) নামে এক ইটালিয়ান পণ্ডিত পরীক্ষার জন্য একটা ব্যাং কেটে একটা লোহার শলাকায় ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। খানিক পরে তাঁর স্ত্রী দেখেন, সেই মরা ব্যাঙের ঠ্যাংটা এক-একবার ঝুলে পড়ছে আর এক-একবার হঠাৎ লাফিয়ে উঠছে। তিনি যদি এটাকে ভূতুড়ে ভেবে ভয়ে পালাতেন, তবে তাঁর আর বিদ্যুতের তত্ত্ব আবিষ্কার করা হত না। কিন্তু তিনি ভয় পেলেন না, বরং এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ জানবার জন্য তাঁর কৌতূহল জেগে উঠল। তখন দেখা গেল, এই ব্যাঙের পায়ের নীচে এক টুকরো তামা রয়েছে, তাতে যতবার পা ঠেকছে ততবার মরা ব্যাং নেচে উঠছে। গ্যালভানিও খবর পেয়ে দেখতে এলেন, আর পরীক্ষা করে দেখলেন যে, ওটা বিদ্যুতেরই কাণ্ড। এই যে এখন কত সহরে সহরে বিদ্যুতের কারখানা বসেছে, পাখা চলছে, আলো জ্বলছে, এর গোড়াকার ইতিহাস যদি লিখতে হয় তবে তার মধ্যে ঐ ব্যাঙের নাচনটারও উল্লেখ থাকবে।

ভেড়ার লোম কেটে যে পশম তৈরি হয়, তাকে কাজে লাগাবার আগে তার জট ছাড়িয়ে আঁশ আলগা করা দরকার। এই কাজ আগে হাতে করতে হত, পরে জট ছাড়াবাব কলের সৃষ্টি হওয়াতে এখন কাজটা অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে। যাদের চেষ্টায় এই কলের সৃষ্টি ও উন্নতি হয়, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন হাইলম্যান নামে এক পশমওয়ালা। তিনি একদিন তাঁর মেয়েদের চুল আঁচড়ান দেখে, মনে ভাবলেন 'এইরকম করে চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে পশমের জট ছাড়ান হয় না কেন?' তিনি জট ছাড়াবার জন্য চিরুনির কল করলেন, তাতে পশমওয়ালাদের যে কত সুবিধা হয়ে গেল তা আর বলা যায় না। কিন্তু এর চাইতেও আশ্চর্য হচ্ছে সেলাইয়ের কলের ইতিহাস।

এলিয়াস্ হাউস্ আমেরিকার লোক; তাঁর বাল্যকালের শখ ছিল তিনি সেলাইয়েব কল বানাবেন। সে সময়ে সেলাইয়ের কাজ সমস্তই হাতে করতে হত, কিন্তু হাউস্ ভাবলেন, এতরকম কাজ কলে হচ্ছে, আর সেলাইটা হতে পারবে না কেন? তিনি বহুদিন ধরে এই বিষয় নিয়ে পরীক্ষা করলেন, কিন্তু ছুঁচশুদ্ধ সুতোটাকে কাপড়ের ভিতব দিয়ে পারাপার করাতে গিয়ে তিনি মহা সমস্যায় পড়ে গেলেন। নানারকম ফন্দি খাটিযেও এই কাজটিকে তিনি কলে বাগাতে পারলেন না। তখন, একদিন রাত্রে তিনি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন—এক অসভ্য রাজা তাঁকে বন্দী করে হুকুম দিয়েছে, এখনই আমাকে সেলাইয়ের কল বানিয়ে দাও, যদি না দাও ত তোমায় মেরে ফেলব। স্বপ্নের মধ্যে সেলাইয়ের কল বানানো গেল না। রাজা হুকুম দিলেন 'মার একে'। তখন কতগুলো লোক বল্লম দিয়ে তাঁকে মারতে এল, সেই বল্লমের মুখের ফলকের মাথায় ফুটো। তৎক্ষণাৎ হাউসের ঘুম ভেঙে গেল, তিনি উঠে বসতেই সব প্রথমে তার মনে হল 'বল্লমের মুখের কাছে ফুটো!' তিনি ভাবলেন 'এই ত ঠিক হযেছে! কলেব ছুঁচের পিছনে সুতো না দিয়ে, এইরকম মুখের কাছে সুতো দিলেই ত অনেকটা সহজ হয়ে আসে।' শেষকালে পরীক্ষায় তাই দেখা গেল—সেলাইয়ের কল করবার পক্ষে আর কোনো বাধাই রইল না। এই হল সেলাইয়ের কলের ইতিহাস।

এখানে সামান্য ঘটনাটি একটা স্বপ্ন মাত্র। এর পরে যখন সেলাইয়ের কল দেখবে, তখন এই কথাটি ভেবে দেখো যে, তার আদি জন্মের ইতিহাসের মূল হচ্ছে একটা স্বপ্ন।

জানা-অজানা

(বিবিধরচনা, বাল্যরচনা ইত্যাদি)

5.13 A	36.37 B	14 C	3 D	7.30 38 E
F	1.11.22 26.42 G	H	15.20 28 40 I	J
19 39 K	23.27 L	M	21.25 34 41 N	2 8.16 24 31 35 O
P	Q	10.12.33 R	4.18 S	T
9.17.32 U W	6.29 V	X	Y	Z

একটা ক্রিপ্টোগ্রাম (গুপ্তলিপি) তৈরি করছিলেন সুকুমার। বোধহয় 'সন্দেশ'-এর জন্য। মাঝখানের খোপকাটা বর্গক্ষেত্রটা বাঁদিকে স্পষ্ট করে ছাপা হল। A, B, C, D প্রভৃতি খোপের মধ্যে যে-অঙ্কগুলো দেওয়া আছে সেগুলো যথাক্রমে গুপ্তলিপিতে ওই বর্ণগুলোর স্থানাঙ্ক। A-র খোপে আছে ৫ এবং ১৩—অর্থাৎ, গুপ্তলিপির পঞ্চম ও ত্রয়োদশ স্থানে A বর্ণটি আছে।

সূক্ষ্ম হিসাব

একজন লোককে তাহার বয়স জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। সে তৎক্ষণাৎ কাগজ পেন্সিল লইয়া হিসাব করিয়া বলিল, "আঠার বৎসর তিন মাস ষোল দিন চার ঘণ্টা—কত মিনিট ঠিক বলতে পারলাম না।" যিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন তিনি ত উত্তর শুনিয়া চটিয়াই লাল। বাস্তবিক, আমাদের সকল কাজের যদি এরকম চুলচেরা সূক্ষ্ম হিসাব রাখিতে হয়, তবে হিসাবের খবর লইতেই সমস্ত জীবনটা কাটিয়া যাইত।

মনে কর বাহিরে ভয়ানক ঝড় বহিতেছে। একজন বলিল, "উঃ, ভয়ানক জোরে হাওয়া দিচ্ছে।" যিনি সূক্ষ্ম হিসাব চান তিনি তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিবেন "ভয়ানক জোরটা কিরকম জোর? ঘন্টায় কত মাইল বেগে বাতাস চলছে? একদিকেই যাচ্ছে, না দিক বদলাচ্ছে? কিবকমভাবে বাড়ে কমে?" ইত্যাদি। যাঁহারা মেঘ বৃষ্টি বাতাস লইয়া আলোচনা করেন তাঁহারা এইরকম সব খবর সংগ্রহ করিবার জন্য নানারকম সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কল ব্যবহার করেন। বাহিরে খুব এক চোট বৃষ্টি হইয়া গেল। লোকে দেখিয়া বলিল, "বাস্‌রে, কি ঝমাঝম্ বৃষ্টি।" কিন্তু আমাদের সূক্ষ্ম হিসাবী পণ্ডিতরা হয়ত বলিবেন, "এই বৃষ্টিকে যদি সমানভাবে মাটির উপর ধরিয়া রাখা যাইত তবে ঠিক এক ফুট সাড়ে তিন ইঞ্চি জল দাঁড়াইত।"

শীত গ্রীষ্ম বুঝাইবার জন্য আমরা কতখানি ঠাণ্ডা বা কতখানি গরম তাহাও ভাষায় কতবার বলিতে চেষ্টা করি—যেমন, 'শীতে হাড় জমে গেল; বড্ড শীত; বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে; একটু যেন গরম; বেশ গরম; ভয়ানক গ্রীষ্ম; উঃ, গরমে গা ঝলসে গেল' ইত্যাদি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের কাছে যাও, তিনি চট্ করিয়া বলিয়া দিবেন "আর এত 'ডিগ্রী' ঠাণ্ডা হইলেই বরফের মতো ঠাণ্ডা হইবে" বা "আর এত 'ডিগ্রী' গরম বাড়িলে ফুটন্ত জলের মতো গরম হইবে।" এক ঘটি ঠাণ্ডা জল রহিয়াছে, তুমি তাহাতে এক ফোঁটা গরম জল ফেলিয়া দাও,—কোন তফাৎ বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু এমন যন্ত্র আছে যাহা দ্বারা পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতেরা তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিতে পারিবেন, "এই জলটা একটু গরম হইল।" এখান হইতে পঞ্চাশ হাত দূরে একটা বাতি জ্বালিয়া রাখ আর এখানে বসিয়া যন্ত্রের মুখ তাহার দিকে ফিরাইয়া দাও। অমনি দেখিবে, কলের মধ্যে সূক্ষ্ম কাঁটা সেই গরমেই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

একটি কাগজের ঠোঙায় খানিকটা চাল রহিয়াছে তুমি হয়ত দাঁড়িপাল্লা দিয়া মাপিয়া বলিলে "আধসের চাল।" বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের কাছে যাও, তিনি তাঁহার চমৎকার দাঁড়িপাল্লায় ওজন করিয়া বলিবেন "না, ঠিক আধসের হয়নি। আরও প্রায় দেড়খানা চাল দিলে তবে ঠিক আধসের হবে।"

আমরা কথায় বলি 'চুল চেরা' হিসাব আর মনে করি চুলকে চিরিতে গেলে বুঝি হিসাবটা নিতান্তই সূক্ষ্মরকম হয়। কিন্তু যাঁহারা অনুবীক্ষণ লইয়া কাজ করেন তাঁহারা বলিবেন "চুলটা ত একটা দস্তুরমত মোটা জিনিস। একটা চুলকে হাজার বার চিরলে তবে বলি—"হ্যাঁ, হিসাবটা কতকটা সূক্ষ্ম বটে।" অনুবীক্ষণের সাহায্যে পণ্ডিতেরা যে সকল সূক্ষ্ম জিনিসের খবর রাখেন, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি এতই সূক্ষ্ম যে তাদের একটার কাছে একটা ছোট পিঁপড়া যেন ছারপোকার পাশে হাতীর মতো দেখায়! এক ইঞ্চিকে একশ ভাগ, হাজার ভাগ, লক্ষ ভাগে চিরিয়াও পণ্ডিতদের হিসাবের পক্ষে যথেষ্ট সূক্ষ্ম হয় না। এক চৌবাচ্চা জলের মধ্যে একটা সরিষার মতো ছোট চিনির টুকরা ফেলিয়া দাও। তাহার এক চামচ জলের মধ্যে যতটুকু চিনি থাকে তাহার চাইতেও অল্প পরিমাণ জিনিস পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতেরা সেইসব জিনিস সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য খবর সংগ্রহ করিয়াছেন।

খুব তাড়াতাড়ি 'কাট্' বলিতে চেষ্টা করত। কতক্ষণ সময় লাগে? হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে কথাটা শেষ হইতে প্রায় এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময় লাগে। একটা দ্রুত চলন্ত ট্রেন ততক্ষণে পাঁচ ছয় হাত চলিয়া যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসাবীর কাছে সময়ের এ-হিসাবটা খুবই মোটা। ট্রেনটা এক চুল পরিমাণ নড়িতে যতটুকু সময় লাগে সেইটুকু সময়ের মধ্যে যাহা ঘটিতেছে বৈজ্ঞানিক তাহার সন্ধানও রাখিয়া থাকেন। এইখানে হঠাৎ একটা আলো জ্বালিয়া দেখ, আলোক ছুটিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে এবং তৎক্ষণাৎ লোকে দেখিবে 'এই আলো জ্বলিল?' 'তৎক্ষণাৎ' বলিলাম কিন্তু বৈজ্ঞানিক বলিবেন "তৎক্ষণাৎ নয়, একটু পরে। ওই অনেক দূরে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের কাছে আলো পৌঁছিতে কিছু সময় চাই ত।" যদি জিজ্ঞাসা কর "কতখানি সময় লাগে" তিনি বলিবেন "ট্রেনটা যতক্ষণ এক ইঞ্চি যাবে, আলো ততক্ষণে কলকাতা থেকে ছুটে গিয়ে মধুপুরে হাজির হবে!"

শিকারী গাছ

উপযুক্ত রকম জল মাটি বাতাস আর সূর্যের আলো পাইলেই গাছেরা বেশ খুশী থাকে, আর তাহাতেই তাহাদের রীতিমত শরীর পুষ্টি হয় আমরা ত বরাবর এইরকমই দেখি এবং শুনি। তাহারা যে আবার পোকা মাকড় খাইতে চায়, শিকার ধরিবার জন্য নানারকম অদ্ভুত ফাঁদ খাটাইয়া রাখে এবং বাগে পাইলে পাখিটা ইঁদুরটা পর্যন্ত হজম করিয়া ফেলে, এ কথাটা চট্ করিয়া বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে পৃথিবীর নানা জায়গায় নানা জাতীয় গাছ এই শিকারী বিদ্যা শিখিয়াছে। তাহারা যে সখ করিয়া পোকা খাওয়া অভ্যাস করিয়াছে তাহা নয়, ঠেলায় পড়িয়াই ঐরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছে। অনেক শিকারী গাছের বাস এমন স্যাঁৎসেতে জায়গায় এবং সেই সকল জায়গা গাছের পক্ষে এত অস্বাস্থ্যকর যে সেখানে তাহারা তাহাদের শরীর রক্ষার উপযোগী মাল-মসলা ভাল করিয়া জোগাড় করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায়, দু একটা পোকা, মাছি বা ফড়িং যদি তাহারা খাইতে না পারিত তবে তাহাদের বাঁচিয়া থাকাই মুস্কিল হইত।

আগেই বলিয়াছি, শিকারী গাছ নানারকমের আছে। ইহাদের শিকার ধরিবার জায়গাও নানারকম। কোন কোন গাছের পাতায় মাছি বা পোকা বসিলে পাতাগুলি আস্তে আস্তে গুটাইয়া যায়। মাছি বেচারা কিছুই জানে না, নিশ্চিন্ত মনে পাতার রস খাইতেছিল, হঠাৎ দেখে চারিদিকে ঘেরা, তাহার মধ্যে সে বন্দী! পাতার গায়ে লোমের মতো সরু সরু কাঁটা, তাহারই মুখে আঠার মতো রস লাগান থাকে; সেই রসে আটকাইয়া শিকারের পালাইবার আরও অসুবিধা হয়। শুধু তাহাই নহে, পাতা গুটাইয়া গেলে পরে সেই সকল কাঁটার মুখ হইতে একরকম তীব্র হজমি রস বাহির হয়, তখন পোকাটা যতই ছট্ফট্ করে, ততই আরও বেশি করিয়া রস বাহির হয়। তাহাতেই শিকার মরিয়া শেষে হজম হইয়া যায়। তারপর আপনা হইতেই আবার পাতা খুলিয়া যায়। জলের মধ্যে একরকম গাছ থাকে, তাহার সাদা ফুল; জলের ধারে একধরনের খুব রংচঙে গাছ থাকে, তাহার পাতাগুলির চেহারা কতকটা কদম ফুল গোছের। আর একরকমের গাছ থাকে, তাহাতে ঠিক যেন মোচার খোলের মতো পাতা সাজান। এই সবগুলি এক প্রকারের শিকারী গাছ এবং ইহাদের শিকার ধরিবার কায়দাও প্রায় একরকম। মনে কর একটা মস্ত পোকা ওই

কদম ফুলের মতো গাছটিতে উঠিয়াছে। আর একটু পরেই গাছের পাতাগুলি গুটাইয়া মাঝখানে আসিয়া মিলিবে—একটি ফুটন্ত ফুল মুড়িয়া আবার কুঁড়ি হইয়া গেলে যেমন হয়, সেইরূপ! তখন পোকা বেচারার আর পলাইবার পথ থাকিবে না।

আর একরমের অদ্ভুত গাছ আছে, এক একটা পাতার আগায় গোলাপী রঙের কি একটা জিনিস, তার চারদিকে কাঁটা। এই জিনিসগুলি Fly-trap (মাছি-মারা ফাঁদ)। এক একটা ফাঁদ যেন মাঝখানে কব্জা দিয়া আটকান, বইয়ের মতো খোলে আবার বন্ধ হয়। কোন পোকা হয়ত পাতায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কোন বিপদের চিহ্নও নাই; ঘুরিতে ঘুরিতে সে ওই ফাঁদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত। হয়ত দূরে থাকিয়া তাহার ঐ রংটা খুব পছন্দ হইয়াছিল—তাই সে দেখিতে আসিল ব্যাপারখানা কি। কিন্তু সে ত জানে না যে ফাঁদের গায়ে সরু সুতার মতো কি লাগান রহিয়াছে, তাহাতে ছুঁইলেই ফাঁদ বন্ধ হইয়া যায়! সে যেমন একটি সুতায় পা অথবা ডানা লাগাইয়াছে অমনি—খট্! ফাঁদ ছুটিয়া একেবারে বেমালুম বন্ধ হইয়া গেল। এখানে আর আঠার দরকার নাই, কারণ ফাঁদটি রীতিমত মজবুত এবং খুব চট্‌পট্ কাজ সারে। আর একরকম শিকারী গাছ আছে, তাহাদের শিকার ধরিবার জন্য থলি বা চোঙা থাকে। এই থলি বা চোঙার মধ্যে পোকা বেশ সহজেই ঢুকিতে পারে কিন্তু বাহির হওয়া তত সহজ নয়। ইহাদের ভিতর সরু সরু কাঁটা থাকে—সেগুলির মুখ সব নীচের দিকে, আর তার গায়ে মোমের মতো একরকম কি মাখান থাকে, তাহাতে পোকাগুলি বেশ সহজেই সুড়্ সুড়্ করিয়া পিছলাইয়া নামিতে পারে। কিন্তু উপরে উঠিবার সময় ত আর পিছলাইয়া উঠা যায় না—তা ছাড়া কাঁটার খোঁচাও যথেষ্ট খাইতে হয়। এইসকল থলির তলায় প্রায়ই জল জমিয়া থাকে, পোকা যখন বার বার পালাইবার চেষ্টা করিয়া হয়রান হইয়া পড়ে, তখন সে ওই জলের মধ্যে পড়িয়া মারা যায়। এইসকল গাছে পোকাকে ফাঁকি দিবার এতরকম উপায় থাকে যে ভাবিলে অবাক হইতে হয়। কোনটার মুখে ঢাকনি থাকে; সে ঢাকনির উপব হইতে চাপ দিলে খুলিয়া যায়! কিন্তু ভিতর হইতে ঠেলিলে খোলে না। প্রায় সবগুলিরই মুখের কাছে খুব সুন্দর রঙিন কাজ আর তার চারিদিকে মধু। সেই মধু খাইতে খাইতে পোকা ভিতরের দিকে ঢুকিতে থাকে—যত খায় তত মিষ্টি! শেষে এক জায়গায় গিয়া দেখে তাহার পরে আর মধু নাই—তখন সে ফিরিতে চায়! কিন্তু ফিরিতে আর পারে না। কোন কোন থলির ভিতরে খানিকটা জায়গা স্বচ্ছ মতন—ঠিক যেন সার্‌সি। পোকাগুলি মনে করে এই পলাইবার পথ—আর ক্রমাগত সেই সারসির গায়ে উড়িয়া উড়িয়া হয়রান হইয়া পড়ে। কখন কখন এমনও হয় কোন ছোট পাখি বা ইঁদুর হয়ত জল খাইতে আসিয়া ফাঁদের মধ্যে পড়িয়া যায় এবং আর বাহির হইতে না পারিয়া প্রাণ হারায়!

কাগজ

এমন সময় ছিল যখন মানুষ লিখিতে শিখিয়াছে, কিন্তু কাগজ বানাইতে শিখে নাই। কোন কোন দেশে তখন পাথরে খোদাই করিয়া লিখিবার রীতি ছিল। কেহবা নরম মাটিতে লিখিয়া সেই মাটি পরে পোড়াইয়া ইঁটের টালি বানাইয়া লইত। সেই ইঁটেতেই তাহাদের কাগজের কাজ চলিয়া যাইত। কিন্তু এইরূপ ইঁটের টালি নিয়া লেখাপড়া করা যে বিশেষ অসুবিধার কথা তাহা সহজেই বুঝিতে পার। মনে কর কোন ছাত্র পাঠশালায় যাইতেছে। অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে তিন ঝুড়ি ইঁটের পুঁথি চলিল—আর লিখিবার জন্য এক তাল কাদা। সামান্য কয়েকখানা চিঠি

পাঠাইতে হইলেই প্রাণান্ত পরিশ্রম—মাটি আনরে, জল আনরে, ঠাসিয়া কাদা কররে, চৌকস কররে, টালি বানাওরে, তবে তাহাতে অক্ষর লেখরে, পোড়াওরে, ঠাণ্ডা কররে, মুটে ডাকরে—হাঙ্গামের আর অন্ত নাই।

ইহার চাইতে আমাদের দেশে যে গাছের পাতায় লেখার রীতি অনেকদিন চলিয়া আসিয়াছে সেটা অনেক সহজ এবং সুবিধাজনক। ৬০০০ বছর আগে ইজিপ্টে 'পেপিরাস' গাছের কচি ছাল পিটিয়া থ্যাৎলাইয়া কাগজের মতো একরকম জিনিস তৈয়ার করিত। এই পেপিরাস কথা হইতেই ইংরাজি পেপার (Paper) শব্দটা আসিয়াছে। কিন্তু এই পেপিরাস জিনিসটাকেও ঠিক কাগজ বলা যায় না। কাগজ তৈয়ারির উপায় প্রথম বাহির হইয়াছিল চীনদেশে; কিন্তু চীনারা এই বিদ্যা আর কাহাকেও শিখাইত না। প্রায় বার শত বৎসর হইল কতকগুলি চীনা কারিকর আরবীদের সঙ্গে যুদ্ধে ধরা পড়ে। তাহাদের কাছে আরবের কারিকরেরা কাগজ বানাইতে শিখিয়া লইল, এবং সেইসময় হইতেই এই বিদ্যা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। আরব হইতে ইজিপ্ট, ইজিপ্ট হইতে আফ্রিকার অন্যান্য জায়গায় হয়।

তারপর স্পেন, জার্মানি, ইংলন্ডে সকল জায়গায়ই ক্রমে ক্রমে কাগজের কারখানা দেখা দিল। সে সময়ে ছেঁড়া নেকড়া দিয়া সমস্ত কাগজ তৈয়ারি হইত এবং সেটা আগাগোড়াই হাতে হইত। পরিষ্কার নেকড়াকে ভিজাইয়া একটা দাঁতাল জিনিস দিয়া ঠেঙান হইত; তাহাতে নেকড়াটা ছিঁড়িয়া সুতার আঁশের মতো টুকরা টুকরা হইয়া যাইত। তাহাতে জল মিশাইয়া আরও অনেকক্ষণ পিটিলে কতকটা পাতলা মণ্ডের মতো একটা জিনিস হয়। এই নেকড়ার মণ্ডকে চালনিতে চালিয়া নানারকমে ছাঁকিয়া ঝাঁকাইয়া, লুচির মতো বেলিয়া তবে কাগজ তৈয়ারি হইত। সে সময়ে লোক কাগজটাকে খুব একটা সৌখীন জিনিস বলিয়াই মনে করিত, কিন্তু ক্রমে কাগজের দাম কমিয়া আসিল, কাগজ বানাইবার নানারকম কল বাহির হইল আর কাগজের কাট্‌তি এত বাড়িয়া গেল যে কাগজওয়ালারা দেখিল এত ছেঁড়া নেকড়াই জোগাড় করা সম্ভব নয়। তখন চারিদিকে খোঁজ পড়িয়া গেল, আর কি জিনিস হইতে কাগজ করা যাইতে পারে। প্রথমত স্পেন দেশের এস্পার্টো ঘাসে খুব কাগজ হইত, তারপর ক্রমে দেখা গেল তাহাতেও কুলায় না। সেই হইতে কাগজ বানাইবার জন্য কত জিনিস লইয়া যে পরীক্ষা হইয়াছে তাহা বলা যায় না। আখের ছিব্‌ড়া, কলার খোসা, পাট, খড়, ঘাস, বাঁশ, কাঠ—সুতার মতো আঁশওয়ালা, আখের মতো ছিব্‌ড়াওয়ালা যতরকম জিনিস আছে তার কোনটিই বাকী নাই। মোটের উপর বলা যাইতে পারে কাঠ, এস্পার্টো ঘাস আর পুরাতন নেকড়া ও কাগজ হইতেই আজকাল কাগজ প্রস্তুত হয়।

বোলতা যে চাক বানায় তাহার মধ্যে একটা জিনিস থাকে সেটা ঠিক কাগজের মতো। বোলতারা গাছের শাঁস খায় এবং সেই শাঁসকে চিবাইয়া হজম করিয়া এই কাগজ বাহির করে। আজকাল কাগজের কলেও সেইরূপে কাঠ ঘাস প্রভৃতি জিনিস হইতে নানারকম কাগজ তৈয়ারি হয়। অবশ্য কাগজওয়ালাদের ঐসব জিনিষ বোলতার মতো চিবাইতে হয় না; এ সব কাজই কলে হয়।

যে কাঠ হইতে কাগজ প্রস্তুত হয় সেই কাঠ আসে আমেরিকা ও নরওয়ের জঙ্গল হইতে। জঙ্গলওয়ালারা বড় বড় গাছের গুঁড়ি কাটিয়া কলের মুখে ফেলিয়া দেয়—আর কলের আর এক মাথায় কাঠ কুচি হইয়া বাহির হয়। সেই কুচিকে গুঁড়াইয়া, সিদ্ধ করিয়া পরিষ্কার করিতে হয়, তারপর সেই ক্ষীরের মতো নরম কাঠকে চাপ দিয়া পাতলা পাতলা পাটালি বানান হয়—এবং সেই পাটালি কাগজওয়ালাদের কাছে চালান দেওয়া হয়।

কাগজওয়ালারা এই পাটালিকে আবার জলে ঘুঁটিয়া মণ্ড তৈয়ারি করেন, সেই মণ্ডকে সিদ্ধ করিয়া ঝোলের মতো করেন। এই ঝোল লোহার নলে করিয়া কাগজের কলের মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হয়। কল একদিকে কাঠ, ঘাস বা নেকড়ার ঝোল খাইতে থাকে আর একদিকে ৪/৫ মাইল লম্বা কাগজের থান বাহির করিতে থাকে। সমস্ত দিন রাত কল চলিলে বারো হাত চওড়া আড়াই মাইল লম্বা একখানা কাগজের থান বাহির হয়। তাহার পরে গরম জলের চৌবাচ্চার মধ্যে সেই মণ্ড গুলিয়া ঝোল তৈয়ারি হয়।

ঝোলটা যখন কলের মধ্যে চালান হয় তখন সেটা একটা লম্বা চলন্ত ছাঁক্‌নির উপর পড়ে। ছাঁক্‌নিটা চলিতে থাকে আর মাঝে মাঝে কেমন একটা ঝাঁকানি দেয়, তাহাতে জল ঝরিয়া যায় এবং ঝোল ক্রমে চাপ বাঁধিয়া আসে। এমনিভাবে চলিতে চলিতে ঝোলটা কলের আরেক মাথায় আসিয়া পড়ে—সেখানে লুচি বেলিবার বেলুনের মতো অনেকগুলা 'রোলার' খাটান থাকে। ছাঁক্‌নিটা এইখানে আসিয়া ঝোলটাকে একটা রোলারের গায়ে ছিটকাইয়া দেয়। কিন্তু সে ঝোল আর এখন ঝোল নাই; এখন তাহার চেহারা অনেকটা ভিজা ব্লটিং কাগজের মতো। এতক্ষণে তাহাকে ঠিক কাগজ বলা চলে।

রোলারের গায়ে কাগজ লাগিবামাত্র রোলার তাহাকে টানিতে থাকে। তারপর সেই টানে কাগজও অনেকগুলি রোলারের মধ্যে ঘুরপাক খাইতে থাকে। এমনি করিয়া কাগজকে ক্রমাগত চাপ দিতে হয়, লুচির মতো বেলিতে হয়, ঘষিতে ও পালিশ করিতে হয়, তাহাতেই কাগজ ক্রমে পাতলা ও মোলায়েম হইয়া আসে।

অবশ্য এই সমস্ত কাজই কলে আপনা-আপনি হইতে থাকে। দু-একজন লোক থাকে তারা কেবল দেখে সমস্ত কল ঠিকমত চলিতেছে কিনা। চব্বিশ ঘণ্টা সমান হিসাবে কাজ চলে; কলের এক মাথায় অনবরত ঝোল আসিয়া পড়িতেছে—সেই ঝোল-শুদ্ধ ছাঁক্‌নি কেবলই ছুটিতেছে, ছাঁক্‌নি হইতে জমাটবাঁধা কাগজ ক্রমাগতই রোলারের উপর লাফাইয়া পড়িতেছে, রোলারেরও বিশ্রাম নাই, সেও কাগজ টানিতেছে আর ঠেলিয়া বাহির করিতেছে। দুই চার মাইল কাগজ জমিলেই এক একটা 'লাটাই' ভরিয়া উঠে, তখন "লাটাই" বদলাইয়া আবার নূতন "লাটাই" গলাইয়া দিতে হয়।

লুপ্ত সহর

'লুপ্ত সহর' লিখিলাম বটে—কিন্তু আসলে সে শহর এখনও একেবারে লোপ পায় নাই। সহরের পথঘাট, দোকানপাট এমনকি ঘরের আসবাব পর্যন্ত অনেক জায়গায় ঠিক রহিয়াছে অথচ সে সহর আর এখন সহর নাই—সেখানে লোক থাকে না, কোন কাজ চলে না—মাঝে মাঝে নানা দেশ হইতে লোক আসে কিন্তু সেও কেবল 'তামাসা' দেখিবার জন্য।

পম্পেয়াই—আড়াই হাজার বৎসরের পুরাতন সহর, ইটালির পাগলা পাহাড় ভিসুভিয়াস তাহাতে ছাই চাপা দিয়া আগুন ঢালিয়া একেবারে সহরকে সহর বুজাইয়া দিয়াছিল। প্রায় আঠার শত বৎসর এমনিভাবে সহর চাপা পড়িয়াছিল—সেখানে যে সহর ছিল সেই কথাই লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল—কারণ বাহির হইতে সহরের চিহ্নমাত্র দেখা যাইত না। চাষারা নিশ্চিন্তে চাষ করিত, লোকে স্বচ্ছন্দে চলা-ফিরা করিত, কাহারও মনে হয় নাই যে এই মাটি খুঁড়িলেই প্রকাণ্ড সহর

বাহির হইয়া পড়িবে। তারপর, সে প্রায় একশত বৎসরের কথা, সেই মাটির নিচ হইতে মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব জিনিস বাহির হইতে লাগিল। বাড়ির টুকরা, পাথরের বেদী, বাঁধান রাস্তা এইসকল দেখিয়া তখন লোকের মনে পড়িল দু হাজার বৎসর আগে এইখানে প্রকাণ্ড সহর ছিল।

পম্পেয়াই বড় যেমন-তেমন সহর ছিল না—সেকালের ইতিহাসে লেখে, তিন লক্ষ লোক সে সহরে বাস করিত। জায়গাটা সমুদ্রের ধারে আর খুব স্বাস্থ্যকর, তাই বড় বড় রোমান ধনীরা অনেকে সেখানে থাকিতেন। খুব জমকালো সহর বলিয়া সে সময় পম্পেয়াই-এর খুব নাম ছিল। তাহার বাড়িঘর, পথঘাট, বাগান, সাজসজ্জা বড়লোকের সহরেরই মতো ছিল। ভিসুভিয়াসের যে কোনরকম দুষ্ট মতলব আছে তাহা কেহ তখন জানিত না তাই একেবারে পাহাড়ের গা ঘেঁষিয়া সহর বসান হইয়াছিল।

সহর ধ্বংস হয় ৭৯ খৃষ্টাব্দে। তখন রোমান ধনীরা তাঁহাদের সুন্দর সহরকে সুন্দর করিয়া সাজাইয়া আরামে আলস্যে দিন কাটাইতেছেন—পম্পেয়াই সহর বাবুয়ানায় মত্ত। কোন বিপদের চিহ্ন নাই, তখন বলিতে গেলে পৃথিবীময় রোমান রাজ্য—রোমের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, রোমানদের সঙ্গে শত্রুতা করে কার সাধ্য! লোকে নিশ্চিন্ত আছে কোথাও ভয় নাই! মাঝে মাঝে একটু আধটু ভূমিকম্প হইত, পাহাড়ের ভিতরে গুর গুর শব্দ শোনা যাইত, কিন্তু তাহাতেও লোকের বিশেষ কোন ভয় নাই। কিছুদিন দেখিয়া শুনিয়া সকলেরই সেসব অভ্যাস হইয়া গেল। তারপর একদিন হঠাৎ পাহাড়ের চূড়া ভাঙিয়া কালো ধোঁয়া দম্‌কা হাওয়ার মতো চারিদিকে ছুটিয়া বাহির হইল। সেই ধোঁয়ায় পঞ্চাশ মাইল পথ এমন অন্ধকার হইয়া গেল যে মাটি আর আকাশ তফাৎ করা যায় না। তারপরে খানিকক্ষণ গরম ধূলার তুফান চলিল। ইহার মধ্যে যাহারা শহর ছাড়িয়া পলাইয়াছিল তাহাদের অনেকে বাঁচিতে পারিয়াছিল। কিন্তু সহরের মধ্যে একজন লোকও বাঁচে নাই। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল, ক্রমাগত ভয়ানক বাজ পড়িতে লাগিল। ভূমিকম্প আরম্ভ হইল, বাড়িঘর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, ভিসুভিয়াস সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ফুলিয়া ফুলিয়া শেষটায় ভয়ানক শব্দে ফাটিয়া গেল। পাহাড়ের ভিতর হইতে লক্ষ লক্ষ মণ জ্বলন্ত পাথর ছিটকাইয়া চারিদিকে আগুন বৃষ্টি করিতে লাগিল। ইহার পরেও হয়ত অনেক লোক বাঁচিতে পারিত কিন্তু এখানেই বিপদের শেষ হইল না। ভিসুভিয়াসের ভিতরকার পাথর গরমে গলিয়া ভাঙা পাহাড়ের ফাটল দিয়া সহরের উপর গড়াইয়া পড়িল, সমস্ত সহরটা যেন টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। অনেকে আগুনের ভয়ে সমুদ্রের দিকে পলাইয়াছিল কিন্তু সেখানেও রক্ষা নাই। এই প্রলয় কাণ্ডের মধ্যে সমুদ্র কি স্থির থাকিতে পারে? সে প্রথমটা তীর হইতে পিছাইয়া গেল। দেখিয়া বোধ হইল যেন সমুদ্র আগুনের ভয়ে হটিয়া যাইতেছে। সমুদ্রের জন্তুগুলি শুকনা ডাঙায় পড়িয়া কত যে মারা গেল তাহার ঠিক নাই। কিন্তু সমুদ্র যাইবে কোথায়? একটু পরেই ভূমিকম্পের একটা ধাক্কার সঙ্গে সে আবার আসিয়া পড়িল, এবং নৌকা ঘরবাড়ি পথঘাট যাহা ছিল সমস্ত ভাঙিয়া ভাসাইয়া প্রমাণ করিয়া দিল যে, 'আমিও বড় কম নই।' জল, মাটি, আকাশ—এই তিনের রেষারেষির মধ্যে পড়িয়া দেখিতে দেখিতে দেশটার চেহারা বদলাইয়া গেল। ভিসুভিয়াসের উপরটা আগে ছাদের মতো সমান ছিল—সেই জায়গাটা বাটির মতো গর্ত হইয়া গেল—সেই বাটির মধ্যে আবার একটা নূতন ছুঁচাল চূড়া বাহির হইল। আর পম্পেয়াই?—পম্পেয়াই যেখানে ছিল সেখানে প্রায় ত্রিশ হাত উঁচু পাথর মাটি আর ছাই!

সেই পম্পেয়াইকে আবার এতদিন পরে মানুষে কত যত্নে খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া বাহির করিতেছে। দু হাজার বৎসর আগে মানুষেরা কি খাইত, তাহাদের ঘর বাড়ির বন্দোবস্ত কিরকম ছিল, তাহাদের

হাট বাজার সরাইখানা সভাঘর মন্দির কিরূপ ছিল এখন আমরা চোখের সামনে দেখিতে পাই। ভিসুভিয়াস একদিকে যেমন সহরকে নষ্ট করিয়াছে আর একদিকে আবার সেই ভাঙা সহরকে ছাই চাপা দিয়া এতকাল আশ্চর্যরকম রক্ষা করিয়াছে। খুঁড়িতে খুঁড়িতে কত মানুষের মৃতদেহ পাওয়া যায়—সেগুলি সমস্তই জমিয়া পাথর হইয়া রহিয়াছে। কোন জায়গায় দু-একটি, কোথাও অনেকগুলি লোক একত্র মরিয়া আছে। কোথাও মা অন্ধকারে তাঁহার শিশুকে খুঁজিতে গিয়া মারা পড়িয়াছেন। কাহারও হাতে টাকার থলি, কাহারও হাতে গহনার বাক্স।

চারিদিকে ভয়ের ছবি; লোকে ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে পলাইয়াছে—অন্ধকারে পথ হারাইয়া দিক্‌বিদিক ভুলিয়া পাগলের মতো ছুটিয়াছে। এই গোলমাল ব্যস্ততার ঠিক মধ্যেই এক রোমান প্রহরী ফটকে পাহারা দিতেছিল। আশ্চর্য তাহার সাহস, সে তাহার জায়গা ছাড়িয়া এক পা-ও নড়ে নাই, পালাইবার চেষ্টাও করে নাই। ফটকে থাকিতে হইবে এই তাহার কর্তব্য—সুতরাং 'যো হুকুম!' সে ফটকের সামনে খাড়া থাকিয়াই মারা গেল এবং এইরূপ অবস্থাতেই অস্ত্রশস্ত্র বর্মশুদ্ধ তাহার দেহ পাওয়া গিয়াছে। কর্তব্য-নিষ্ঠার এরূপ আশ্চর্য পরিচয় জগতে খুব কমই পাওয়া যায়।

এখন সেই সহরের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া যাইতে কেমন অদ্ভুত লাগে। অনেক জায়গায় দু হাজার বৎসর আগে যে জিনিসটি যেখানে ছিল এখনও ঠিক তেমনি আছে—এক জায়গায় একটা টেবিলে খাওয়া-দাওয়া চলিতেছিল হঠাৎ লোকে খাওয়া ফেলিয়া পালাইয়াছে—সেই টেবিল সেই খাওয়া তেমনি রহিয়াছে—রুটিটা জমিয়া পাথরের মতো হইয়া গিয়াছে—ছিপি-আঁটা মাটির বোতলে মদ ছিল, সেই মদ পর্যন্ত ঠিক রহিয়াছে! এক জায়গায় হাঁড়িতে কি যেন জ্বাল হইতেছিল—সেই হাঁড়ি এখনও চুল্লির উপর সেইভাবে বসান রহিয়াছে! কোন জায়গায় বাড়ির ইঁট পুড়িয়া ঝামা হইয়া গিয়াছে;আবার কোথাও সাদা টালি, লাল কালো নানারকম পাথরের কাজ, সমস্তই পরিষ্কার রহিয়াছে। একটা দেয়ালের গা'য়ে বিজ্ঞাপন লেখা আছে—

"আসেলিনাস্ ও স্মাইরিনে বলিতেছেন—ফস্কাস্‌কে তোমাদের অলডারম্যান পদে নিযুক্ত কর।" ফস্কাস্ বেচারা এই সম্মান পাইয়াছিল কি না তাহা জানিবার আর কোন উপায় নাই।

ডুবুরি জাহাজ

প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে একজন ফরাসি লেখক একটা গল্প লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এক অদ্ভুত জাহাজের কথা ছিল। সে জাহাজকে মাছের মতো জলের উপর বা নিচ দিয়া যেমন ইচ্ছা চালান যাইত। সে সময়ে লোকের কাছে গল্পটা খুবই অসম্ভব গোছের শুনাইয়াছিল এবং অনেকে গল্পলেখকের 'আজগুবি কল্পনার' খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর এরূপ গল্পে লোকের আশ্চর্য হইবার কথা নয়,—কারণ, বাস্তবিকই ঐরকম জাহাজ এখন অনেকগুলি তৈয়ার হইয়াছে। শুধু ইংলণ্ডেই এখন অন্তত পঁচাশিটা এইরূপ জাহাজ আছে।

জাহাজটা যতক্ষণ জলের উপরে থাকে ততক্ষণ তাহার পিঠে নানারকম মাস্তুল, দড়ি, কলকব্জা ইত্যাদি দেখা যায় কিন্তু জাহাজ ডুব মারিবার আগে এ সমস্ত গুটাইয়া লওয়া হয়। তখন কেবল দুটি চোঙা আর একটি টুপির মতো ঢাকনি জাহাজের উপরে থাকে। ঢাকনিটার গায়ে পুরু কাঁচের সারসি দেওয়া থাকে, তাহার ভিতর দিয়া জাহাজের কাপ্তান বাহিরের সমস্ত দেখিতে পান। জাহাজটা

যতক্ষণ আধ-ডোবা অবস্থায় থাকে ততক্ষণ এইভাবে দেখার কাজ চলিতে পারে, কিন্তু আর কয়েক হাত ডুবিলেই সে পথ বন্ধ। তখন ঐ চোঙা দুটিই চোখের কাজ করে—চোঙার আগায় আয়না ও কাচ শুদ্ধ একটি যন্ত্র বসান থাকে, যন্ত্রটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া চারিদিকে তাকাইতে থাকে—আর জাহাজের কাপ্তান নিচে বসিয়া সেই আয়নার সাহায্যে বাহিরের সমস্ত অবস্থা দেখিতে পান। দশ হাতের নিচে গেলে এই 'দিকবীক্ষণ' যন্ত্রও ডুবিয়া যায়, তখন কেবল আন্দাজে আর কম্পাস্ দেখিয়া জাহাজ চালাইতে হয়।

জাহাজের মধ্যে একটা লোহার চৌবাচ্চা থাকে—চৌবাচ্চাটা খালি থাকিলে জাহাজ জলের উপরে ভাসে কিন্তু চৌবাচ্চাটার মধ্যে জল ভরিলে জাহাজ ভারি হইয়া ক্রমে ডুবিয়া যায়। এইরকমে জল বাড়াইয়া বা কমাইয়া জাহাজকে অল্প বা বেশি ডুবান যায়। তাড়াতাড়ি জল ভরিবার বা খালি করিবার জন্য জাহাজের মধ্যে বড় বড় 'পাম্প'-কল রাখা হয়—তাহার সাহায্যে এক মিনিটের মধ্যে জাহাজকে পঞ্চাশ হাত জলের নিচে ডুবাইয়া দেওয়া যায়। জাহাজের দুই পাশে ও পিছনে মাছের ডানা ও লেজের মতো হাল বসান থাকে, সেইগুলিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জাহাজের মুখ ডাইনে বাঁয়ে উপরে নিচে যেমন ইচ্ছা ফিরান যায়। পিছন দিকে দুইটা পাখার মতো ইস্ক্রুপ ঘুরিতে থাকে তাহাই জল কাটিয়া জাহাজকে চালায়। জাহাজের ভিতরে বড় বড় লোহার বোতলে চাপ দিয়া বাতাস ভরিয়া রাখা হয়। তাহাতে জাহাজের বাতাস অনেকক্ষণ পরিষ্কার রাখিবার সুবিধা হয় এবং অন্যান্য কাজও চালান যায়। ক্রমাগত চব্বিশ ঘণ্টা জলের নিচে থাকিলেও জাহাজের লোকেরা কোনরকম অসুবিধা বোধ করে না। জাহাজে এরূপ বন্দোবস্ত করা যায় যাহাতে একটা জাহাজ কোথাও না থামিয়া চার হাজার মাইল স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারে।

মনে কর আমরা এইরূপ একটা জাহাজের মধ্যে ঢুকিয়াছি—ঢুকিয়াই সকলের আগে চোখে পড়ে—জাহাজের এক মাথা হইতে আর এক মাথা পর্যন্ত কেবল চাকা আর লোহা আর কলকব্জা। চেয়ার টেবিল আসবাবপত্র নাই বলিলেই হয়। সমস্ত জাহাজটা যেন একটা প্রকাণ্ড বৈদ্যুতিক কারখানা; সেই বিদ্যুতে জাহাজ চলে এবং জাহাজের বাতি জ্বালা রান্না করা পর্যন্ত সমস্ত কাজ হয়। জাহাজের কাপ্তান কোথায়? ঐ যে তিনি জাহাজের 'টুপি'র নিচে বসিয়া দিকবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া চারিদিক দেখিতেছেন।

কাপ্তান উপর হইতে হুকুম করিতেছেন আর অন্য একটি কর্মচারী নাবিকদিগের দ্বারা সেই হুকুম তামিল করাইতেছেন। প্রত্যেক লোক তাহার নিজের নিজের জায়গায় প্রস্তুত হইয়া আছে—কখন কি হুকুম আসে! কাপ্তান বলিলেন 'জাহাজ ডাইনে ফিরাও' অমনি একটা চাকা ঘুরাইবা মাত্র জাহাজ ডাইনে ফিরিয়া গেল। 'থাম! টর্পিডোওয়ালা, প্রস্তুত হও।' টর্পিডো কেন? শত্রুপক্ষের জাহাজ দেখা গিয়াছে। টর্পিডো বড় সাংঘাতিক অস্ত্র। একবার বিপক্ষের জাহাজে ভালমত টর্পিডো দাগিতে পারিলে আর দ্বিতীয়বার মারিবার দরকার হয় না। একটা প্রকাণ্ড ছুঁচোবাজির মতো তার চেহারা—তার ভিতরে বারুদ আর অদ্ভুত কল-কারখানা। ডুবুরি জাহাজের সামনেই টর্পিডোর কলখানা—সেই কলের চাবি টিপিলেই টর্পিডো ঘণ্টায় ৪০০ মাইল বেগে ছুটিয়া বাহির হয় এবং বিপক্ষের জাহাজে বা অন্য কোন শক্ত জিনিসে ঠেকিয়া বাধা পাইবামাত্র ভয়ানক শব্দে ফাটিয়া ও জাহাজ ফাটাইয়া এক তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া দেয়। বড় ডুবুরি জাহাজে ৩/৪টি পর্যন্ত টর্পিডো কল থাকে। 'টর্পিডোওয়ালা, প্রস্তুত হও!' হুকুম আসিবা মাত্র তাহারা প্রস্তুত! সকলেই জানিয়াছে বিপক্ষের জাহাজ আসিতেছে—কাহারও মুখে টুঁ শব্দটি নাই। জাহাজের মধ্যে কেবল কলের বন্ বন্ শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নাই।

হুকুম আসিল '৪০ হাত নামাও'—বলিতে বলিতে জাহাজ ডুবিতে লাগিল। একটা কলের

কাঁটা আস্তে আস্তে সরিয়া যাইতে লাগিল—২০ হাত, ২৫ হাত, ৩০ হাত। ৪০-এর দাগে কাঁটা নামিল। এখন আর বাহিরের কিছুই দেখা যায় না। কাপ্তান এখন ঘড়ির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছেন। বিপক্ষের জাহাজটি ঠিক কোনদিকে এবং কত দূরে তিনি খুব ভাল করিয়া তাহার হিসাব লইয়াছেন—তাঁহার জাহাজ কিরকম জোরে চলিতেছে তাহাও তিনি জানেন—সুতরাং তিনি ঠিক বলিতে পারেন কোন্ মুহূর্তে দুই জাহাজে কতখানি তফাৎ থাকিবে। নিঃশব্দে জলের নিচে জাহাজ চলিতেছে—শত্রুজাহাজ কিন্তু তাহার কিছুই জানে না। 'জাহাজ উঠিতে দাও'—আবার কলের কাঁটা নড়িয়া উঠিল—'ত্রিশ হাত, বিশ হাত, দশ হাত—বাস!'—'সম্মুখের টর্পিডো হুঁশিয়ার হও!' এতক্ষণে দিকবীক্ষণ যন্ত্র ভাসিয়া উঠিয়াছে—আবার সব দেখা যাইতেছে। আধ মাইল দূরে শত্রুর জাহাজ—প্রকাণ্ড যুদ্ধজাহাজ। প্রায় ২০টা ডুবুরি জাহাজের সমান। কাপ্তান একমনে হিসাব করিতেছেন জাহাজটা আরেকটু সামনে সরুক, আরেকটু, আরেকটু—বাস! 'ছাড়'! একটা ভয়ানক ধাক্কা লাগিল—ডুবুরি জাহাজ কাঁপিতে কাঁপিতে প্রায় কাৎ হইয়া গেল—হালের নাবিক তাড়াতাড়ি তাহাকে সামলাইয়া লইল। কিন্তু বিপক্ষের জাহাজে যে টর্পিডো লাগিল সে আর তাহা সামলাইতে পারিল না। জাহাজের গায়ে বিশ হাত গর্ত—জাহাজটা মাতালের মতো টলিতে টলিতে গব্ গব্ করিয়া জল খাইতে লাগিল, তারপর মাথা নিচু করিয়া ডিগবাজী খাইয়া দেখিতে দেখিতে এত বড় জাহাজটা ডুবিয়া গেল।

ডুবুরি কিন্তু সেখানে দাঁড়াইয়া থাকে নাই—সে একেবারে ডুব মারিয়া প্রাণপণে ছুটিয়াছে। যতক্ষণ সে তাহার 'চোখ'টুকু মাত্র বাহির করিয়া চোরের মতো আসিতেছিল শত্রুরা তাহাকে দেখিতে পারে নাই, কিন্তু টর্পিডো ছাড়িবামাত্র জল তোলপাড় হইয়া উঠিল—আর সকলেই বুঝিতে পারিল 'ঐ ডুবুরি'। বিপক্ষের কামান হইতে একটি গোলা যদি ডুবুরির ঘাড়ে পড়ে তবে আর তার রক্ষা নাই। শুধু যে যুদ্ধের সময়েই ডুবুরি জাহাজের বিপদের ভয় থাকে তাহা নয়। জলের পথে চলাফিরা করিতে গিয়া তাহার যে কত সময় কতরকম দুর্ঘটনা ঘটে ভাবিলেও ভয় হয়। জলের নিচ হইতে উঠিতে গিয়া হয়ত কোন জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়া গেল। হয়ত কোনখানে এতটুকু ফাঁক, কোথায় কলের কব্জা এতটুকু বেঠিক বসিয়াছে—আর অমনি জাহাজ বিগড়াইয়া একেবারে পাথরের মতো ডুবিয়া গেল—শত চেষ্টায়ও আর তাহাকে উঠান গেল না। এরকম কতবার ঘটিয়াছে এবং কত লোক তাহাতে মারা গিয়াছে! জাহাজ ডুবিয়া গেল; ডুবুরি নামাইয়া দেখা গেল ভিতরে মানুষ বাঁচিয়া আছে, ঠক্ ঠক্ শব্দ করিলে তাহারা ভিতর হইতে সাড়া দেয়, অথচ তাহাদের বাঁচাইবার কোন উপায় নাই। যাহাতে এরকম দুর্ঘটনা না হয়, তাহার জন্য প্রতি বৎসর কত নূতন নূতন বন্দোবস্ত করা হইতেছে এবং জাহাজ ডুবিলেও যাহাতে ভিতরের লোকেরা পালাইয়া আসিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা হইতেছে।

পাতালপুরী

পাতাল দেশটা কোথায় তাহা আমি জানি না। অনেকে বলেন আমেরিকার নামই পাতাল। সে যাহাই হউক, মোটের উপর পাতাল বলিতে আমরা বুঝি যে, আমাদের নিচে একটা কোন জায়গা—আমরা এই যে মাটির উপর দাঁড়াইয়া আছি, তার উপরে যেন স্বর্গ আর নিচে যেন পাতাল!

এখানে যে জায়গার কথা বলিতেছি সেটাকে পাতালপুরী বলা হইল এইজন্য যে সেটা মাটির

নিচে। মাটির নিচে ঘরবাড়ি, মাটির নিচে রেলগাড়ি, মাটির নিচে হোটেল সরাই গির্জা—সমস্ত সহরটাই মাটির নিচে। সহরটা কিসের তৈয়ারি জান? নুনের! আসলে সেটা একটা নুনের খনি। অস্ট্রিয়ার কাছে—মাটির নিচে এই অদ্ভুত শহর। হাজার হাজার বৎসর লোকে এই খনিতে খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া লবণ তুলিয়াছে। এখনও প্রতি বৎসর এই খনি হইতে প্রায় বিশ লক্ষ মণ লবণ বাহির হয়—কিন্তু তবু লবণ ফুরাইবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। মাটির নিচে পঁচিশ মাইল চওড়া ৫০০ মাইল লম্বা লবণের মাঠ। খুঁড়িয়া দেখা গিয়াছে এক হাজার ফুটের নিচেও লবণ।

খনির মধ্যে খানিকটা জায়গায় বড় সুরঙ্গ কাটিয়া পথঘাট করা হইয়াছে তাহার মাঝে মাঝে এক-একটা বড় ঘরের মতো। খনিটা ঠিক যেন একটা সাততালা পুরী, তার নিচের চারতালায় কুলিরা কাজ করে, উপরের তিনতালায় লবণ প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে—সেখানে এখন লোকে তামাসা দেখিতে আসে।

খনির মুখে ঢুকিলেই লবণের সিঁড়ি; সেই সিঁড়ি বাহিয়া লোকে নিচে নামে—কিংবা যদি ইচ্ছা হয় নিচে নামিবার যে কল আছে সেখানে পয়সা দিলেই কলে চড়িয়া নিচে নামা যায়।

প্রথমতালায় অর্থাৎ উপরের তালায়, একটা প্রকাণ্ড সভাঘর। চারিদিকে লবণের দেয়াল, লবণের থাম, লবণের কারিকুরি, তার মধ্যে লবণের ঝাড়লণ্ঠন। এই ঘর দেড়শত বৎসর আগে তৈয়ারি হইয়াছিল। কত বড় বড় লোকে, রাজা-রাজড়া পর্যন্ত, এই সভায় বসিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিয়া গিয়াছেন। সভার এক মাথায় একটা সিংহাসন। একখানা আস্ত লবণের টুকরা হইতে এই সিংহাসন কাটা হইয়াছে।

ঘরের মধ্যে যখন আলো জ্বালান হয়, তখন সমস্ত ঘরটি স্ফটিকের মতো জ্বলিতে থাকে। লাল নীল সাদা কতরকম রঙের খেলায় চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দেয়। লবণ জিনিসটা যে কতদূর সুন্দর হইতে পারে শুধু খানিকটা নুনের গুঁড়া বা কর্‌কচের টুকরা দেখিয়া তাহার ধারণাই করা যায় না।

সভাঘরের খুব কাছেই সেন্ট আন্টনির মন্দির। মন্দিরের মধ্যে আলো বেশি নাই, লবণের থামগুলি আধা-আলো আধা-ছায়ায় আর স্ফটিকের মতো ঝক্‌ঝক্ করে না; এক-এক জায়গায় সাদা মার্বেল পাথরের মতো দেখায়। মন্দিরের ভিতরটায় জাঁকজমক বেশি নাই। চারিদিক নিস্তব্ধ—সভাঘরের হৈ চৈ গোলমাল এখানে একেবারেই পৌঁছয় না।

এখান হইতে দ্বিতীয় তালায় নামিবার জন্য আবার সিঁড়ি—সিঁড়িটা একটা প্রকাণ্ড ঘরের মধ্যে নামিয়াছে। ঘরের ছাদটা একটা গম্বুজের মতো। চারিদিকে বড় বড় কাঠের ঠেকা দেওয়া হইয়াছে তা না হইলে ছাদ ভাঙিয়া পড়িতে পারে। ঘরটা এত উঁচু যে তাহার মধ্যে আমাদের গড়ের মাঠের মনুমেন্টটিকে অনায়াসে খাড়া করিয়া বসান যায়। ঘরের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড লবণের ঝাড়লণ্ঠন, তাহার মধ্যে তিনশত মোমবাতি জ্বালান হয়—কিন্তু তাতেও এত বড় ঘরের অন্ধকার দূর হয় না।

দেড় শত বৎসর আগে এই ঘরেই খনির আড্ডা ছিল। লবণ খুঁড়িতে খুঁড়িতে খনিতে বড় বড় ফাঁক হইয়া যায়। এই ঘরটিও সেইরকম একটি ফাঁক মাত্র। লোকে উপর হইতে লবণ তুলিতে আরম্ভ করে—ক্রমে যতই লবণ ফুরাইয়া আসিতে থাকে [illegible] একতালা দোতালা করিয়া ততই নিচে নামিতে থাকে।

তৃতীয় তালায় নামিয়া কতগুলি ছোটখাট ঘর ও নানা লোকের [illegible] দেখিয়া লবণের [illegible] হোটেল রেলওয়ে স্টেশন ইত্যাদি। সেগুলিও দেখিবার [illegible]

মাটির সাত শত ফিট নিচে একটা লোনা হ্রদ আছে, এমন লোনা জল বোধহয় আর কোথাও নাই। অন্ধকার গুহা, তার মধ্যে ঠাণ্ডা কালো জল—কোথাও একটু কিছু শব্দ হইলে চারিদিকে গম্‌গম্ করিয়া প্রতিধ্বনি হইতে থাকে। সেই জলের উপর লোকে যখন নৌকা চালায় তখন জলের ছপ্‌ছপ্ শব্দ চারিদিক হইতে অন্ধকারে ফিস্‌ফিস্ করিতে থাকে—যেন পাতালপুরীর হাজার ভূতে কানে কানে কথা বলে।

উঁচু বাড়ি

লোকে বলে—'মনুমেন্টের মতো উঁচু!' সেরকম উঁচু বাড়ি দেখলে আমরা বলি 'ইস্! বড্ড উঁচু বাড়ি!' কিন্তু একটিবার আমেরিকায় ঘুরে এস, তারপরে সেই বাড়িই তোমার চোখে নিতান্তই ছোট ঠেকবে। মনুমেন্টের মাথায় অমন আরও দু-চারটা মনুমেন্ট চাপাও, তবে আমেরিকার লোকে বলবে 'হ্যাঁ, কতকটা উঁচু বটে!' নিউ ইয়র্কের একটি বাড়ি পঞ্চান্ন তলা—সাড়ে সাতশ ফুট উঁচু! একটা সাধারণ তিনতলা বাড়ি প্রায় ৪০ ফুট উঁচু—এইরকম উনিশটা বাড়ি একটার মাথায় আরেকটা চাপালে তবে ৭৫০ ফুট উঁচু হয়! আমেরিকার এক একটা সহরে বিশতলা ত্রিশতলা চল্লিশতলা বাড়ির ছড়াছড়ি!—ভাবতে গেলে আমাদের মাথা ঘুলিয়ে যায়।

এক একটি বাড়ি যেন এক একটি সহর। তার মধ্যে কত অফিস কত দোকান কত হোটেল গির্জা ইস্কুল থিয়েটার বায়স্কোপ ডাকঘর সভাসমিতি! বাড়ির এক-এক জায়গায় সারি সারি খাঁচার মতো ঘর—তাতে চড়ে লোকে উঠছে নামছে, বিশ পঁচিশ তলা সিঁড়ি ভেঙে কষ্ট করে উঠতে হয় না। বাড়ির মধ্যে ত্রিশ হাজার লোক—সকলেই ব্যস্ত, চারিদিকে ছুটাছুটি অথচ কোন গোলমাল নেই। বন্দোবস্ত এমন সুন্দর যে কিছু একটা দরকার হলে তার জন্যে হাঁ করে বসে থাকতে হয় না বা বিশ মাইল দূরে ছুটতে হয় না। বাড়িতেই সবরকম দোকান—ঘরে বসে টেলিফোন কর, যা চাও দু মিনিটের মধ্যে ঘরে এসে হাজির।

বাড়িতে ঢুকলে দেখবে শুধু যে মাথার উপরে এতখানি দালান আছে তা নয়—মাটির নিচেও দশ বিশ তলা! সেখানে সূর্যের আলো যাবার উপায় নাই—সারাদিন আলো জ্বেলে কাজ চলে। ওইসব নিচের তলাগুলোতে নানারকম কলকারখানা—ইলেকট্রিক কোম্পানির বড় বড় চাকাওয়ালা কল, বাড়ি গরম রাখবার জন্য বড় বড় 'বয়লার'—বড় বড় ছাপাখানা তাতে সকাল সন্ধ্যা খবরের কাগজ ছাপা হয়।

কোন কোন রাস্তার দুধারে এইরকম দশ বিশ তলা বাড়ির সার চলেছে—তার ছায়ায় রাস্তা যেন অন্ধকার—সেখানে সূর্যের মুখ দেখা যায় না—আকাশ দেখতে হলে ঘাড় বাঁকিয়ে উপরে তাকাতে হয়। কিন্তু যারা একেবারে উপরে ত্রিশতলা বা চল্লিশতলায় থাকে তাদের আলো বাতাসের কোন অভাব হয় না। রাস্তার ধূলা সহরের কুয়াশা অত উঁচুতে পৌছায় না—কাজেই সেখানকার হাওয়া অতি পরিষ্কার।

বাড়িগুলো দেখতে যেমন আশ্চর্য, এগুলি তৈরি করার কায়দাও তেমনি অদ্ভুত। বাড়ি তুলবার আগে প্রায় ১০০/১৫০ হাত গর্ত কেটে ভিৎ খুঁড়তে হয়। যেখানে বাড়ি হবে, তার চারদিকে খুব মজবুত আর খুব উঁচু 'কপিকল' বসায়। সেই কলে বড় বড় লোহার থাম চাপিয়ে থামগুলাকে হিসাবমত ঠিক ঠিক জায়গায় বসান হয়। তারপর থামের গায় লোহার কড়ি বরগা বসিয়ে সেগুলোকে পেরেক স্ক্রু দিয়ে এঁটে দেয়। এমনি করে সমস্ত বাড়িটার একটা কঙ্কাল আগে খাড়া

করা হয়। তারপর ঢালাইকরা পাথুরে মাটির দেওয়াল দিয়ে কঙ্কালটিকে ভরাট করে তাতে দরজা জানালা বসালে পর তখন সেটা বাড়ির মতো দেখতে হয়। যারা এইসকল কাজ করে তাদের যে অনেকখানি সাহস দরকার তা বুঝতেই পার। মাটি থেকে ৪০০ হাত উপরে লোহার বরগার উপর দিয়ে হাঁটাহাটি করা—তার উপরে বসে কাজকর্ম করা, কখন বা উপর নিচ ওঠানামা—এসব যেমন তেমন লোকের কাজ নয়।

রাবণের চিতা

লোকে বলে রাবণের চিতায় যে আগুন দেওয়া হয়েছিল সে আগুন নাকি এখনও নিভান হয়নি—এখনও তা জ্বলছে। কোথায় গেলে সে আগুন দেখা যায় তা আমি জানি না—কিন্তু এমন আগুন দেখা গেছে যা বছরের পর বছর ক্রমাগতই জ্বলছে ; মানুষ তাতে জল ঢেলে মাটি চাপা দিয়ে নানারকমে চেষ্টা করেও তাকে নিভাতে পারেনি।

খনি থেকে কয়লা এনে সেই কয়লা দিয়ে লোকে আগুন জ্বালায়। কিন্তু তা না করে যদি একেবারে খনির মধ্যেই আগুন ধরিয়ে খনিকে খনি জ্বালিয়ে দেওয়া যায় তবে কিরকম হয়? বাস্তবিকই এমন সব কয়লার খনি আছে যার আশেপাশে বারো মাসই আগুন জ্বলে। সেসব খনির লোকেরা সব সময়ে ভয়ে ভয়ে থাকে—কখন সে আগুন খনির মধ্যে এসে পড়ে। কোনদিকে যদি খনির দেয়াল একটু গরম হয় কিংবা খনির কাছে কোন জায়গা যদি বসে-যাবার মতো হয়, তবেই হৈচৈ লেগে যায়—'আগুন আসছে, আগুন আসছে'। খনির একদল লোক আছে তাদের কাজ কেবল আগুন তাড়ান। যেদিক দিয়ে আগুন আসছে বোধ হয়, তারা সেইদিকে ইঁট পাথরের দেয়াল তুলে আগুনের পথ বন্ধ করে দেয়। আগুন তখন বাধ্য হয়ে আর কোন দিক ঠেলে তার পথ করে নেয়। কেমন করে কোথা হতে আগুন আসে তা সব সময়ে বলা যায় না। মাটির নিচে হয়ত বিশ পঁচিশ মাইল জায়গা জুড়ে কয়লার স্তর রয়েছে—কোথাও ১০০ হাত, কোথাও হয়ত পাঁচ হাত মাত্র পুরু। তারই কোনখানে যদি কোন গতিকে আগুন ধরে আর তার আশেপাশে পাহাড়ের ফাটলে যদি বাতাস যথেষ্ট থাকে—তবে সে আগুন একেবারে 'রাবণের চিতা' হয়ে দাঁড়ায়।

খোলা বাতাসে কয়লা যেমন ধূ ধূ করে জ্বলে যায়, মাটির নিচে তেমন হয় না—সেখানে আগুন যেন শামুকের মতো আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে থাকে। যেদিকে তার পথ খোলা, যেদিকে একটু কয়লা আর বাতাস—আগুন একদিনে হোক এক বছরে হোক সেদিকটা দখল করবেই। অনেক দিন আগে একবার ইংলন্ডের একটা গির্জা হঠাৎ বসে যেতে আরম্ভ করল—তার দেয়াল মেঝে সব দেখতে দেখতে হাঁ করে উঠল। ইঞ্জিনিয়ার এসে মাটি খুঁড়ে দেখেন ১২ হাত নিচেই কয়লার স্তর আর তাতে আগুন লেগেছে—কয়লা যতই পুড়ে যাচ্ছে, উপরের মাটিও ততই ধসে পড়ছে। তখন পরামর্শ করে সকলে গির্জার মেঝেটা খুঁড়ে প্রকাণ্ড একটা ফুটো করলেন। সেই ফুটোর মধ্যে প্রায় এক পুকুর জল ঢেলে দেওয়া হল—তারপর মাটি খুঁড়ে লোহার শিক বসিয়ে তার নিচে দেয়ালের গায়ে দেয়াল তুলে সবাই ভাবল, 'এবারে আগুন জব্দ হয়েছে।' কিন্তু সাতাশ বৎসর পরে আবার সেই আগুন কয়লা পুড়িয়ে পুড়িয়ে তিন দিক ঘুরে গির্জার পিছনে এসে হাজির।

অনেকদিন আগে লিভারপুলের কাছে টড্ নদীর ধারে এক কয়লার খনি ছিল। হঠাৎ কেমন করে সেই খনির এক কোণে আগুন লেগে যায়। খনিশুদ্ধ লোক প্রাণপণ চেষ্টা করেও যখন সে আগুন নিভান গেল না, তখন খনির কর্তারা খাল কাটিয়ে টড্ নদীকে খনির মধ্যে ছেড়ে দিলেন। তাতে তখনকার মতো আগুন চাপা পড়ল বটে কিন্তু জলের স্রোত খনির এমন দুরবস্থা করল যে কর্তারা ভয় পেয়ে গেলেন। তারপর যখন কিছুদিন না যেতেই আগুন আবার আর একদিকে এসে উঁকি মারল তখন সকলেই বললেন আগুন নিভাবার চেষ্টা বৃথা—ওকে কোনরকমে ঠেকিয়ে রাখ। যেদিকে আগুন আসবার ভয় সেদিকের কয়লা সরিয়ে ফেল, বড় বড় খাল কেটে দেয়াল তুলে, পথ বন্ধ কর। তাহলেই আগুন আর ছড়াতে পারবে না—ক-দিন বাদে আপনি নিভে যাবে। এইরকমে ছাব্বিশ বছর আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ চলল। একদল লোক কেবল ওই কাজেই দিন রাত লেগে রইল; যারা ছোট ছিল তারা প্রায় বুড়ো হয়ে এল; খনির পাশে দেয়ালের পর দেয়াল উঠল, আগুনের উপর নিচে চারদিকে ঘেরাও হয়ে গেল—কিন্তু আগুন কি থামতে চায়! দেয়াল ভেঙে, পাথর ফাটিয়ে আগুনের শিখা বারবার দেখা দিতে লাগল; আগুন বেড়েই চলল।

একদিকে যেমন আগুন, আর একদিকে জল! পাহাড়ের ফাটল দিয়ে টড্ নদীর জল এসে খনির মধ্যে দিনরাত পড়ত—সেই জল পাম্পকল দিয়ে ক্রমাগত বাইরে ফেলে দিতে হয়। একদিন টড্ নদীতে জোয়ার লেগে উপরের মাটি ধসে গিয়ে কবেকার পুরান এক সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে খনির ভিতরে হুহু করে জল ঢুকল। ভাগ্যিস তখন খনির মধ্যে লোক ছিল না, গোলমাল শুনে তারা সকলে খনির মুখের কাছে দৌড়ে এল। ব্যাপারটা কি বুঝতে কারও বাকী রইল না; সকলেই বলতে লাগল এই জল যদি আগুনে গিয়ে পড়ে, তবে কি হবে? আগুনে জলে যখন দেখা হল তখন কয়েক মিনিট ধরে একটা ভয়ানক গর্জন আর যুদ্ধ চলল—ফুটন্ত জল ফোয়াবার মতো দুশ হাত উঁচু হয়ে এমন জোরে ছুটে বেরুল যে তার ধাক্কায় খনির মুখের কলকব্জা সব কোথায় উড়ে গেল। তারপর দেখতে দেখতে সব চুপচাপ! আগুন ঠাণ্ডা হল আর সঙ্গে সঙ্গে খনির দফাও ঠাণ্ডা।

গিরিধির কাছে একটা কয়লার স্তরে আজ ক-বছর হল আগুন ধরেছে। গরমে মাটি ফাটিয়ে পাহাড় তাতিয়ে সে আগুন এখনও জ্বলছে!

ডুবুরী

জলের তলায় ডুব দিয়ে যাদের কাজ করতে হয় তাদের বলে ডুবুরী। লোকে যে-সকল দামী মুক্তা দিয়ে গহনা বানায় সেই মুক্তাগুলি জন্মায় সমুদ্রের নিচে এক জাতীয় ঝিনুকের মধ্যে। ঝিনুক থেকে একরকম রস বেরিয়ে খোলার মধ্যে ফোড়ার মতো হয়ে জমে থাকে—তাকে আমরা বলি 'মুক্তা'। সবচেয়ে বড় আর ভাল যেসব মুক্তা, সেগুলি জন্মায় একরকম পোকার উৎপাতে। সেই পোকার কেমন বদ অভ্যাস, সে সুবিধা পেলেই ঝিনুকের খোলার মধ্যে ঢুকে ঝিনুক বেচারাকে অস্থির করে তোলে। ঝিনুকও তখন বেশ করে রস ঢেলে দিয়ে তাকে জীয়ন্ত কবর দিয়ে রাখে। সেই পোকার কবরগুলিকে ডুবরীরা সমুদ্রের তলা থেকে কুড়িয়ে আনে, আর সৌখিন লোকে হাজার হাজার টাকা দিয়ে সেগুলি কিনে যত্ন করে তুলে রাখে।

যেসব মুক্তা অল্প জলে থাকে ডুবুরীরা কেবল সেইগুলিকেই আনতে পারে—কারণ বড়জোর দেড়শ হাতের বেশি এ-পর্যন্ত কোন ডুবুরীই নামতে পারেনি। এমন অনেক ডুবুরী আছে যারা শুধু একটা পাথর-বাঁধা দড়ি নিয়ে দম বন্ধ করে প্রায় দেড় মিনিট কি দু-মিনিট ৩০/৪০ হাত জলের নিচে থাকতে পারে। কিন্তু আজকালকার ডুবুরীরা একরকম অদ্ভুত পোশাক পরে জলে নামে। ডুবুরীর পিঠে একটা দড়ি বাঁধা থাকে, তাই টেনে ডুবুরী উপরের লোকদের ইশারা করে আর তারা তাকে উঠায় নামায়। ডুবুরীর মাথায় একটা লোহার মুখোশ—তাতে পুরু কাচের জানালা বসান, তাই দিয়ে সে দেখতে পায়—আর টুপির আগায় একটা নল তা দিয়ে উপর থেকে বাতাস আসে, তবে সে নিশ্বাস ফেলতে পারে। পোশাকটি এমন যে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোনখান দিয়ে এক ফোঁটাও জল ঢুকতে পারে না। ডুবুরীদের পায়ে প্রকাণ্ড ভারি সীসার জুতো আর পিঠেও সীসার বোঝা। জলের নিচে কাজ করার বিপদ অনেকরকম! প্রথম ভয় এই যে যদি পোশাকের মধ্যে কোনরকমে জল ঢুকতে পারে তবে ডুবুরীকে পিষে থ্যাংলা করে ফেলবে। পোশাকটিকে সমস্তক্ষণ বাতাস দিয়ে ফুটবলের মতো পাম্প করে রাখতে হয়—তাহলেই ডুবুরী আর জলের চাপ টের পায় না। ঐ জোরে পাম্প-করা বাতাস যখন পোশাকের মধ্যে ঢোকে তখন ডুবুরীর গায়ের সমস্ত রক্ত আর রস বোতলে-পোরা সোডা ওয়াটারের মতো সেই বাতাস শুষে নেয়। এ অবস্থায় যদি তাকে হঠাৎ উপরে টেনে তোল, তবে সোডার বোতল খুললে যা হয় তার শরীরের মধ্যে তেমনি একটা কাণ্ড চলতে থাকে। এইরকমে কত লোক মারা গেছে। সেইজন্য তুলবার সময়ে খুব সাবধানে আস্তে আস্তে দড়ি টানতে হয় আর মাঝে মাঝে থামাতে হয়। যদি পোশাকটি ভাল করে এঁটে পরা না হয়, আর সীসার বোঝাটি কোনরকম খুলে যায় তবে ডুবুরী তৎক্ষণাৎ বিদ্যুতের মতো ছিট্‌কিয়ে উপরে ভেসে উঠবে; তাতেও তার হাড়গোড় চুরমার হয়ে যেতে পারে। এসব ছাড়া হাঙর বা অন্য জলজন্তুর ভয় ত আছেই। ডুবুরীরা হাঙরের চাইতেও ভয় করে 'অক্টোপাস'কে। পিটার স্নেল একজন নামজাদা ডুবুরী ছিল। সে একবার জলে নামতেই একটা প্রকাণ্ড অক্টোপাস শুঁড়ের মতো আট পা বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। ভয়ে স্নেল পাগলের মতো ছুরি চালাতে চালাতে তার দড়ি ধরে প্রাণপণে টানতে লাগল। অনেক টানাটানির পর যখন তাকে প্রায় আধমরা অবস্থায় উপরে তোলা হল, তখনও জানোয়ারটার কয়েকটা কাটা পা তার গায় লেগে ছিল! তার ওজন প্রায় আধ মণ।

আর একটি জিনিস আছে যাকে ডুবুরী দিয়ে কুড়িয়ে এনে লোকে তার ব্যবসা করে। তাকে আমরা বলি 'স্পঞ্জ' (sponge)—সেই যে ফুটোওয়ালা নরম জিনিস যাতে জল শুষে নেয় আবার চাপ দিলে জল বেরিয়ে যায়। স্পঞ্জ জিনিসটা একরকম অদ্ভুত জলজন্তুর খোলস বা কঙ্কাল বা বাসা—যা ইচ্ছা বলতে পার। সমুদ্রের তলায় স্পঞ্জের দল সার বেঁধে মাটি আঁকড়িয়ে পড়ে থাকে, ডুবুরীরা তাকে সেখান থেকে ছিনিয়ে আনে।

রাউল নামে একজন লোক স্পঞ্জ তুলবার জন্য একরকম ডুবুরী গাড়ি তৈরি করেছেন। দুজন ডুবুরী তার মধ্যে স্বচ্ছন্দে বসতে পারে। স্পঞ্জ দেখবার জন্য গাড়ির সামনে একটা উজ্জ্বল আলো থাকে। গাড়ির নিচে চাকা আর পিছনে দুটা দাঁড়, তাতেই তার চলা-ফিরা চলে। আর সামনে ডাণ্ডার আগায় একটা হাঁ-করা মতন জিনিস আছে—ঐটা দিয়ে স্পঞ্জ আঁকড়ে আনে।

আজকাল ডুবুরীর পোশাকের নানারকম উন্নতি হয়েছে—কোনটার পিঠে বাতাসের বন্দোবস্ত, তার আলাদা নল লাগে না; কোনটার মধ্যে টেলিফোনের কল, উপরের সঙ্গে কথাবার্তা চলে—আর কোনটার এমন সুবিধা আছে যে ডুবুরী ইচ্ছা করলে কারও সাহায্য ছাড়াই উপরে উঠতে পারে।

পার্লামেন্টের ঘড়ি

বিলাতের যে শাসন-সভা, যেখানে সে দেশের খরচপত্র আইনকানুন ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি নানা ব্যাপারের আলোচনা ও ব্যবস্থা করা হয়—তার নাম পার্লামেন্ট। পার্লামেন্টের বাড়ির দুই মাথায় দুই চূড়া—তারই একটার গায়ে মাটি হইতে প্রায় ১২৫ হাত উঁচুতে পার্লামেন্টের ঘড়ি বসান। ঘড়িটা এত বড় যে রাস্তার লোকে এক মাইল দূর হইতে সেই ঘড়ি দেখিয়া অনায়াসে সময় ঠিক করিতে পারে।

রাস্তা হইতেই প্রকাণ্ড ঘড়িটা চোখে পড়ে, কিন্তু বাস্তবিক ঘড়িটা যে কত বড় তাহা বুঝিতে হইলে একটিবার তাহার ভিতরে ঢোকা দরকার। একটি লোহার প্যাঁচান সিঁড়ি ঘুরিয়া ঘড়ির কামরায় ঢুকিতে হয়। ঘড়ির চারিদিকে চারিটি মুখ, এক একটি মুখে এক একটি ঘর, তাতে দোতালা বাড়ির মতো উঁচু ঘষা কাচের জানালা। জানালার বাহিরে ঘড়ির কাঁটা—এক একটা সাড়ে সাত হাত লম্বা। রাত্রে সেই ঘরগুলির মধ্যে জানালার পিছনে অনেকগুলি বড় বড় গ্যাসের বাতি জ্বালাইয়া রাখে, তাহাতে ঘড়ির সমস্ত মুখটা আলো হইয়া উঠে। কিন্তু এই ঘরের মধ্যে ঘড়ির কলকব্জা কিছুই দেখা যায় না। ঘড়ির যে ঘণ্টা বাজে তাহাও এখান হইতে দেখিবার যো নাই—সে সমস্ত ভিতরের আর-একটা ঘরের মধ্যে। ঘণ্টাটি একটি দেখিবার জিনিস। গম্বুজের মতো প্রকাণ্ড কাঁসার ঘণ্টা, তার ওজন সাড়ে তিনশত মণেরও বেশি। প্রথম যখন ঘণ্টাটি তৈয়ারি হইয়াছিল তখন কিছুকাল ব্যবহারের পর সেটা ফাটিয়া যায়; তখন সেটাকে আবার ঢালাই করিয়া নূতন করিয়া গড়া হইল। কিছুদিন পরে নূতন ঘণ্টাতেও ফাটল দেখা দিল। তারপর বছর তিনেক ঘণ্টা বাজান বন্ধ ছিল; পরে হাতুড়িটা বদলাইয়া একটা হালকা, অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ মণ ওজনের হাতুড়ি দেওয়ায় আর ফাটল বাড়িতে পারে নাই। এই বড় ঘণ্টাটি ছাড়া আরও চারিটি ছোট ছোট ঘণ্টা আছে, সেগুলি পনেরো মিনিট অন্তর টুং টাং করিয়া বাজে। 'ছোট' বলিলাম বটে কিন্তু এগুলির এক একটির ওজন ৩০ হইতে ১০০ মণ। ঘড়ির পেন্ডুলামটি প্রায় সাড়ে আট হাত লম্বা, দোলকটির ওজন প্রায় ৪ মণ।

ঘড়িতে দম দেওয়া এক প্রকাণ্ড ব্যাপার। প্রতি সোম বুধ ও শুক্রবার দুইজন লোককে ক্রমাগত কয় ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া এই কাজটি করিতে হয়। ছোট ছোট ঘণ্টাগুলি যতক্ষণ বাজিতে থাকে, সেই ফাঁকে তাহারা একটু বিশ্রাম করিয়া নেয়, আবার মিনিট পনের চাবি ঘুরায়—এইরকম করিয়া সারাটা বিকাল ধরিয়া দম দেওয়া হয়। এই সমস্ত কলকারখানার উপরে, একেবারে চূড়ার আগায়, একটা প্রকাণ্ড বাতি। এই বাতি যখন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে তখন লোকে বুঝিতে পারে, পার্লামেন্টের সভা বসিয়াছে। চূড়ার কাছে উঠিলে আর একটা আশ্চর্য জিনিস দেখা যায়—ঘড়ির কলকব্জার অনেক নিচে একটা জায়গায় দিনরাত একটা প্রকাণ্ড চুল্লি জ্বলিতেছে। চুল্লির আঁচে ঘড়ির ভিতরটা সকল সময় সমানভাবে গরম থাকে; কোথাও এলোমেলো ঠাণ্ডা লাগিয়া কলকব্জা বিগড়াইতে পারে না।

এত বড় ঘড়ি, ইহার জন্য খরচও হইয়াছে কম নয়। ঘড়ির চারটি মুখের জানালায় লেখা কাঁটা ইত্যাদি শুদ্ধ প্রায় আশি হাজার টাকা লাগিয়াছে। ঘণ্টাগুলির দাম প্রায় লক্ষ টাকা—কলকব্জায় ষাট হাজার টাকা। সমস্ত ঘড়িটার মোট দাম প্রায় সওয়া তিন লক্ষ টাকা।

রেলগাড়ির কথা

এমন কত জিনিস আছে যা আমরা সর্বদাই দেখে থাকি এবং তাতে কিছুমাত্র আশ্চর্যবোধ করি না। অথচ, সেই সব জিনিসই যখন প্রথম লোকে দেখেছিল, তখন খুব একটা হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল। প্রথম যে বেচারা ছাতা মাথায় দিয়ে ইংলণ্ডের রাস্তায় বেরিয়েছিল, তাকে সবাই মিলে ঢিল ছুঁড়ে এমনি তাড়াহুড়ো করেছিল যে, বেচারার প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

সার ওয়াল্টার র‍্যালে যখন বিলাতে আলু আর তামাকের প্রচলন করলেন, তখনও তাঁকে রীতিমত নাকাল হতে হয়েছিল। শোনা যায়, তিনি একদিন খুব আরাম করে নিজের ঘরে বসে 'পাইপ' মুখে দিয়ে তামাক টানছিলেন, এমন সময় তাঁর চাকর এসে সেই ব্যাপার দেখে, মনিবের মুখে আগুন লেগেছে মনে করে, একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। কি করবে কিছু বুঝতে না পেরে সে এক বালতি জল নিয়ে সার ওয়াল্টারের মাথায় ঢেলে দিল। আলু খেতেও প্রথমটা লোকে কম আপত্তি করেনি। "আলু ভয়ানক বিষাক্ত জিনিস", "আলু খেয়ে লোক মরে যাচ্ছে", এইরকম সব অদ্ভুত গুজব চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে বহুদিন পর্যন্ত লোকের মনে ভয় জন্মিয়ে রেখেছিল।

কলকাতায় হাওড়ার পোল যখন তৈরি হয়নি, তখন একজন সাহেব বলেন যে নৌকার উপর খিলান ভাসিয়ে এইরকম পোল তৈরি হতে পারে। এ কথাটা সে সময়ে লোকের কাছে এমনই অদ্ভুত ঠেকেছিল যে খবরের কাগজে পর্যন্ত সেই বেচারার নামে নানারকম ঠাট্টা-তামাসা বেরিয়েছিল। অথচ এখন হাজার হাজার লোকে প্রতিদিন পোলের উপর যাওয়া-আসা করছে—সেটা বাস্তবিক একটা অদ্ভুত ব্যাপার কিনা, কেউ সে কথা ভেবে দেখবার অবসর পায় না।

রেলগাড়ির প্রচলনও এমনি করেই হয়েছিল। প্রায় একশ বৎসর আগে জর্জ স্টিফেনসন বাষ্পের জোরে গাড়ি চালিয়ে তাতে লোকের যাতায়াতের ব্যবস্থা করবার প্রস্তাব করেন। তখন সে প্রস্তাবে এতরকম আপত্তি উঠেছিল যে ক্রমে তর্কটা পার্লামেন্ট পর্যন্ত গড়ায়। শেষটায় অনেক ঝগড়াঝাটি গণ্ডগোলের পর, স্টিফেনসনকে নানারকম জেরা করে তারপর অনুমতি দেওয়া হল—"আচ্ছা, তোমার রেলগাড়িটা না হয় একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক!" স্টিফেনসন সহজে জেদ ছাড়বার লোক ছিলেন না—তাই তিনি শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে ছাড়েননি।

এই জর্জ স্টিফেনসনের জীবনের কথা অতি অদ্ভুত। নিতান্ত গরীবের ঘরে যার জন্ম, যে লেখাপড়ার কোনরকম সুযোগ পায়নি এবং ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত কেবল কয়লার খনিতে সামান্য কাজ করেই জীবন কাটিয়েছে, তার মনে এমন আশ্চর্য শক্তি আসে কোথা হতে, ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। স্টিফেনসনেরা ছয় ভাইবোন। বাপ মা অত্যন্ত গরীব, কাজেই ছেলেবেলা থেকেই সব ক-টি ভাইকে টাকা উপার্জনের চেষ্টা করতে হত। তারা নানান কাজ করে একেকজন দিনে প্রায় দু আনা রোজগার করত। খনিতে নানারকম কল-কারখানা থাকে, সেইগুলার উপর জর্জের ভারি নজর ছিল। সুযোগ পেলেই সে সেগুলোকে নেড়েচেড়ে তার ভিতরের কলকজা খুলে দেখত। বইটই কিছুমাত্র না পড়েও কেবল নিজে দেখেশুনে এ-সকল বিষয়ে তার আশ্চর্য দখল জন্মেছিল। সে সময়ে কয়লার খনিতে যে-সকল এঞ্জিন ব্যবহার হত তাদের 'খাড়া এঞ্জিন' বলা যায়—অর্থাৎ সে এঞ্জিন এক জায়গায় খাটান থাকে; তার চাকার সঙ্গে দড়ি, শিকল বা লোহার হাতল জুড়ে গাড়ি টানা, মোট বওয়া, জিনিসপত্র উঠান-নামান প্রভৃতি নানারকম কাজ চালান হয়। সেই সময় হতেই চাকায়-বসান চলন্ত এঞ্জিন গড়বার খেয়াল স্টিফেনসনের মাথায় চেপেছিল।

যাহোক ক্রমে স্টিফেনসনের অবস্থার উন্নতি হতে লাগল। ক্রমে তার সপ্তাহে ১২ শিলিং (নয় টাকা) মাইনে হল—তার উপর জুতা সেলাই করে আর ঘড়ি মেরামত করেও সে কিছু কিছু উপার্জন করতে লাগল। সকলে বলল "জর্জ মস্ত রোজগেরে হয়েছে।" এইভাবে প্রায় ত্রিশ বৎসর কেটে গেল, এর মধ্যেই পাকা এঞ্জিনিয়ার বলে স্টিফেনসনের বেশ একটু নাম হয়েছে।

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ৩৩ বৎসর বয়সে এক খনির মালিককে রাজি করিয়ে স্টিফেনসন তাঁর প্রথম চলন্ত এঞ্জিনের পরীক্ষা করেন। এই এঞ্জিনের সঙ্গে কয়লার গাড়ি জুড়ে দেখা গেল যে ৫০০ মণ কয়লা উঁচু রাস্তায় ঘণ্টায় চার মাইল করে নেওয়া যায়। আগে ট্রামের লাইন বসিয়ে তার উপর লোকেরা গাড়ি ঠেলে নিত, সেই লাইনের উপরই এঞ্জিন বসিয়ে কয়লা চালান হতে লাগল। তারপর বছর খানেকের মধ্যে আরো ভাল দুটি এঞ্জিন তৈয়ারি হল। ক্রমে আশেপাশে আরও কত কয়লার খনিতে স্টিফেনসনের এঞ্জিন চলতে লাগল। এমনি করে আট-দশ বৎসর কেটে গেল।

তখন স্টকটন হতে ডার্লিংটন পর্যন্ত কয়েক মাইল ট্রামের লাইন বসিয়ে ঘোড়ার ট্রাম করবার কথা হচ্ছিল। স্টিফেনসন প্রস্তাব করলেন, ঐ লাইনের উপর এঞ্জিনের গাড়ি চালান হোক। অনেক কথাবার্তা হাঁটাহাঁটির পর, ট্রামের কর্তারা রাজি হলেন। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে এই লাইন যেদিন খোলা হল তখন 'স্টিফেনসনের লোহার ঘোড়া' দেখবার জন্য ভিড় জমে গিয়েছিল। কয়লা আর ময়দায় বোঝাই হয়ে একগাড়ি যাত্রী নিয়ে স্টিফেনসনের এঞ্জিন স্টকটন হতে রওনা হল; স্টিফেনসন নিজে তার ড্রাইভার। গাড়ির আগে আগে কোম্পানির লোক ঘোড়ায় চড়ে নিশান নিয়ে ছুটল! কিন্তু স্টিফেনসন তাঁর এঞ্জিনে পুরো দম দিয়ে এমন ছুটিয়ে দিলেন যে, সে লোকটির আর সঙ্গে যাওয়া হল না। ডার্লিংটনে সমস্ত মালপত্র নামিয়ে সমস্ত ট্রেনটিকে পঙ্গপালের মতো লোক-বোঝাই করে স্টিফেনসন স্টকটনে ফিরে এলেন। না জানি সে সময়ে লোকের মনে কিরকম উৎসাহ হয়েছিল।

কিন্তু এতেও গোলমাল মিটল না। এরপর যখন মানচেস্টার থেকে লিভারপুল পর্যন্ত রেল করবার কথা হল, তখন আবার তুমুল ঝগড়া আরম্ভ হল। রেলগাড়ি জিনিসটাতেই অনেকের আপত্তি; কেউ কেউ তাকে 'শয়তানের যন্ত্র' বলে গাল দিতেও ছাড়েনি। এর মধ্যে আবার অন্য কয়েকটি এঞ্জিনওয়ালা এসে বললেন "আমরা আরো ভাল এঞ্জিন বানিয়েছি—আমাদের উপর ভার দাও।" কেউ বললেন "স্টিফেনসন আবার কোথাকার কে? নাম জানি না, ধাম জানি না— এত বড় কাজের ভার কি যার তার উপর দেওয়া যায়?" তখন চারিদিক থেকে পার্লামেন্টের কাছে দরখাস্ত যেতে লাগল। পার্লামেন্টের হুকুমে সব এঞ্জিন এক জায়গায় আনিয়ে তার পরীক্ষা নেওয়া হল। পরীক্ষায় স্টিফেনসনের এঞ্জিন আর সবকটাকে একেবারে পিছনে ফেলে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল ছুটে সকলের মনে এমন তাক লাগিয়ে দিল যে, যারা ঝগড়া করতে এসেছিল তাদের আর কথাটি কইবার মুখ রইল না। এঞ্জিনওয়ালারা তাদের এঞ্জিনের ঝ্যাক্‌ঝ্যাকানি বন্ধ করে লজ্জায় বাড়ি চলে গেল।

এমনি করে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রীতিমত রেলের চলাচল আরম্ভ হল। তারপর কত এঞ্জিন তৈরি হল, কত দিকে কত রেলের লাইন বসে গেল, গরীবের ছেলে স্টিফেনসন মস্ত ধনীলোক হয়ে গেলেন। কিন্তু জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁর সাঁদাসিধা চালচলন আর সহজ সরল ব্যবহারের কোন পরিবর্তন হয়নি। স্টিফেনসনের একমাত্র ছেলে রবার্টও কালে একজন নামজাদা এঞ্জিনিয়ার হয়েছিলেন; রেলের পোল তৈরি বিষয়ে তাঁর বিশেষরকম সুনাম ছিল।

সূর্যের কথা

সূর্যটা একটা গোল আগুনের পিণ্ড, এ কথা আমরা সকলেই জানি। গোল, সেটা চোখেই দেখতে পারি—আর 'আগুন' কিনা তা একটিবার দুপুর রোদে দাঁড়ালেই আর বুঝতে দেরি লাগে না। পণ্ডিতেরা বলেন, এই পৃথিবীটার মতো তেরো লক্ষ পিণ্ডের তাল পাকালে তবে এই সূর্যের সমান বড় হয়। তাঁরা কেমন করে জানলেন? যাঁরা জরিপ করেন তাঁরা জানেন, খুব দূরের জিনিসকে নানারকমে পরখ করে এমন হিসাব পাওয়া যায় যা থেকে চট্ করে বলা যায় যে জিনিসটা কতখানি দূরে! এই কৌশলটি পণ্ডিতেরা সূর্যের উপর খাটিয়েছেন। পৃথিবীর দুই জায়গায় দুইজন লোক বসে সূর্যটাকে খুব সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন, কোন্ সময়ে সেটাকে আকাশের ঠিক কোন্ জায়গায় দেখা যায় —এবং দুজনের হিসাব মিলিয়ে অঙ্ক কষে বলেছেন যে সূর্যটা এখান থেকে নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে। সে যে কতদূর তা আমাদের কল্পনাতেই আসে না। একটা এঞ্জিন যদি ঘণ্টায় ৬০ মাইল করে ক্রমাগত ছুটে আজ সূর্যের দিকে রওয়ানা হয়, সে ১৭৭ বছর পরে (২০৯৩ খ্রীষ্টাব্দে) সূর্যে গিয়ে পৌছাবে। পণ্ডিতেরা এইসকল মাপ নিয়ে বলছেন যে ঐ সূর্যের পাশে পৃথিবীটাকে বসালে সেটা দেখাবে যেন একটি তরমুজের পাশে একটি মুসুরির ডাল।

সূর্যটা কিসের তৈরি? সূর্যের আলোক পরীক্ষা করে পণ্ডিতেরা বলেন যে, পৃথিবীটা যা দিয়ে তৈরি সূর্যটাও ঠিক তাই দিয়েই তৈরি। তবে, সেইসব মাল-মসলা জমে এখানে যেমন জল মাটি পাথর হয়েছে সেখানে তা হবার যো নেই—কারণ, সেখানকার সর্বনেশে গরমে সব জিনিস সত্য সত্যই আগুন হয়ে উঠে। লোহা শুধু গলে যায় তা নয়, ফুটন্ত জলের মতো টগ্‌বগ্ করে বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। এই ফুটন্ত আগুন আর জ্বলন্ত বাষ্প সূর্যের চারিদিক ঘিরে লক্‌লক্ করতে থাকে। শুধু চোখে মনে হয় সূর্যটা বেশ একটি মোলায়েম গোল জিনিস, তার গায়ে কোথাও আঁচড়ের দাগটি পর্যন্ত নেই। কিন্তু আসলে তা নয়। ভাল দূরবীন দিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, তার সমস্ত গা ভরে আগুনের চিক্‌মিকি খেলছে—আগুনের সমুদ্রে আগুনের ঢেউ, তার মধ্যে বড় বড় আগুনের ডেলা পাগলের মতো ডুবছে আর ভাসছে। তাছাড়া সূর্যের গায়ে প্রায়ই ছোট বড় ফোসকা দেখা যায়—ফোসকাগুলি তত উজ্জ্বল নয়, তাই দেখতে হঠাৎ কালো দেখায়। জলের মধ্যে যেমন বুদবুদ ওঠে সূর্যের গায়ে তেমনি আগুনের ফোসকা ওঠে আর ফেটে পড়ে। এক একটি বুদবুদ মাঝে মাঝে এত বড় হয় যে, কালো কাচ দিয়ে দেখলে সেগুলোকে শুধু চোখেই দেখতে পার। ঐরকম এক একটা বুদবুদের মধ্যে ইচ্ছে করলে, দু-দশটা পৃথিবীকে স্বচ্ছন্দে পুরে রাখা যায়। ঐ ফোসকাগুলি এক একটি আগুনের ঘূর্ণিচক্র, তার চারিদিকে দম্‌কা আগুন ঠেলে উঠছে।

সূর্যের তেজ এত বেশি যে তার চারিদিকে যে আগুনের শিখা ঝড়ের মতো উঠছে আর পড়ছে, সেগুলি আমরা দেখতেই পাই না। সূর্যের যখন পূর্ণগ্রহণ হয়, চাঁদটা মাঝে পড়ে তার চক্‌চকে শরীরটিকে আড়াল করে ফেলে, তখন তাদের চেহারা দেখা যায় আগুনের লক্‌লকে জিভের মতো। শিখাগুলি হাজার হাজার মাইল জুড়ে দপ্ দপ্ করে জ্বলতে থাকে, কখন আগুনের ঝাপটা দিয়ে মিনিটে ছয় হাজার মাইল ছুটে যায়, কখন শান্ত মেঘের মতো সূর্যের গায়ে ভেসে বেড়ায়। এক একটাকে দেখে মনে হয় যেন আগুনের ফোয়ারা উঠছে। তার মধ্যে যদি আমাদের এই পৃথিবীটিকে ছেড়ে দেও, একটি চক্ষের নিমেষে গলে বাষ্প হয়ে কোথায় যে মিলিয়ে যাবে

সে আর খুঁজেই পাবে না। সূর্যের চারিদিকের এই অগ্নিমেঘের স্তরটিকে দিনের আলোতে দেখবার জন্য পণ্ডিতেরা আশ্চর্যরকম উপায় বার করেছেন, তার জন্য তাঁদের এখন আর গ্রহণের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় না।

কিন্তু সূর্যের চারিদিকে আর একটি জিনিস আছে যেটিকে গ্রহণ ছাড়া দেখবার যো নেই—সেটিকে সূর্যের কিরীট (Corona) বলা যায়। পৃথিবীর চারিদিকে যেমন বাতাসের আবরণ সূর্যের চারিদিকেও তেমনি বহুদূর পর্যন্ত এই কিরীটের ঢাকনি। যাঁরা সূর্যের পূর্ণগ্রহণ দেখেছেন তাঁরা বলেন, এমন আশ্চর্য অদ্ভুত দৃশ্য আর কিছু নেই। যখন গ্রহণ সম্পূর্ণ হয়ে আসতে থাকে, চাঁদের কালো ছায়া যখন চোখের সামনে পাহাড় সমুদ্র সব গ্রাস করে ফেলতে থাকে, আকাশের অদ্ভুত ফ্যাকাসে রং আর পৃথিবীর অন্ধকার দেখে, পশু পাখি পর্যন্ত ভয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়; সেই সময়ে সূর্যের তেজ চাপা পড়ে তার আশ্চর্য কিরীটের শোভা দেখা যায়। শুধু এই কিরীটের সুন্দর স্নিগ্ধ আলো দেখবার জন্যই কত লোকে পয়সাকড়ি খরচ করে হাজার হাজার মাইল পার হয়ে গ্রহণ দেখতে যায়। এই কিরীটের চেহারা সব সময়ে এক রকমের থাকে না—কখন সেটা চারিদিকে বেশ সমান ভাবে গোল হয়ে থাকে, কখন তার মধ্যে ভয়ানক ঝড় ঝাপটার লক্ষণ দেখা যায়—কখন তা থেকে লম্বা লম্বা ছটা বেরিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। মোটের উপর বলা যায়, যে সময়ে সূর্যের গায়ে ফোসকা বেশি দেখা যায় সেই সময়ে তার আগুনের শিখাগুলিরও অত্যাচার বাড়ে, আর সেই অত্যাচারে তার কিরীটটিকেও ঘাঁটিয়ে তোলপাড় করে তোলে। আমরা জানি যে পৃথিবীটা ২৪ ঘণ্টায় একবার পাক খায়, তাতেই আমাদের দিনরাত হয়। সূর্যটাকে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সেও ভয়ঙ্কর বেগে লাটুর মতো ক্রমাগত পাক খাচ্ছে—কিন্তু একটি পাক খেতে তার ছাব্বিশ দিন সময় লাগে।

অনেকের বিশ্বাস এই যে, সূর্যটা এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে আছে—আর পৃথিবী গ্রহ চন্দ্র সবাই মিলে ঘুরতে ঘুরতে তার চারিদিক প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু আসলে তা নয়—বিশ্বজগতে কারও স্থির হয়ে বসে থাকবার হুকুম নেই। আমাদের এই পৃথিবী এবং আর সমস্ত গ্রহকে নিয়ে সূর্য ভয়ানক বেগে শূন্যে ছুটে চলেছে। সে কোন্‌দিকে কিরকম বেগে চলছে, তাও পণ্ডিতেরা হিসাব করে ঠিক করেছেন। এই হিসাবে সূর্য ঘণ্টায় প্রায় কুড়ি হাজার মাইল পথ ছুটে চলেছে।

শুনলে হঠাৎ হয়তো মনে হতে পারে, এমন সাংঘাতিকভাবে চলতে গিয়ে হয়ত কোন্‌দিন কোন্ তারার সঙ্গে তার টুঁ লেগে যাবে—কিন্তু সেরকম ভয়ের কোন কারণ নেই। এইসব তারাগুলি এক একটি এত দূরে যে সূর্যটা দশ লক্ষ বৎসর এইভাবে ছুটলেও কোন তারার কাছে পৌঁছাবার সম্ভাবনা নেই। তোমরা হিসাব করে দেখ—এক ঘণ্টায় যদি ২০০০০ মাইল যাওয়া যায় তাহলে দশ লক্ষ বৎসরে কত মাইল? ২০০০০ × ২৪ × ৩৬৫ × ১০০০০০০। তাহলে এক একটি তারা কতখানি দূরে একবার ভাবতে চেষ্টা কর।

ডাকঘরের কথা

সন্দেশের ধাঁধার উত্তরের চিঠিগুলি সেদিন দেখছিলাম। কেউ আধ মাইল দূর থেকে লিখেছে চিঠি, কেউ লিখেছে ১৫০০ মাইল দূর থেকে—কিন্তু ১ পয়সার পোস্টকার্ডে প্রায় সকলেই লিখেছে। ১ পয়সা খরচে ১৫০০ মাইল চিঠি পাঠান, একি কম সস্তা হল? হঠাৎ মনে হতে

পারে অত কম মাশুলে এতদূর চিঠি পাঠাতে ডাকঘরের বুঝি লোকসান হয়; কিন্তু তারা কি ২/১ খানা চিঠি পাঠায়? প্রতিদিন লাখে লাখে চিঠি আর পার্সেল তারা পাঠায়; তাতেই তাদের খরচে পুষিয়ে যায়। ডাকঘরের বন্দোবস্তই বা কি কম আশ্চর্যরকম! তুমি হয়ত কলকাতায় বসে একটা পোস্টকার্ডে চিঠি লিখে ডাকবাক্সে সেটাকে ফেলে দিলে। কিছুক্ষণ পরে ডাকঘরের লোক এসে ডাকবাক্সের চাবি খুলে চিঠিগুলো ডাকঘরে নিয়ে গেল। সেখানে অনেকগুলি লোকে মিলে চিঠির উপরে ডাকঘরের ছাপ মারে, আর এক একটা থলিতে এক একটা রেলে পাঠাবার চিঠিগুলি ভরে ফেলে—যেমন দার্জিলিং মেলে দার্জিলিং, খরসান জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, এইসব জায়গার চিঠি; পঞ্জাব মেলে বর্ধমান, মধুপুর পাটনা, বাঁকিপুর, এলাহাবাদ, দিল্লী, এইসব জায়গার চিঠি। তারপর সব ছোট ডাকঘর থেকে বড় ডাকঘরে থলেগুলি পাঠিয়ে দেয়। সেখান থেকে স্টেশনে চলে যায়। রেলের গাড়ির মধ্যে আবার ডাকঘরের বন্দোবস্ত আছে। সেখানে থলিগুলো খুলে প্রত্যেক জায়গাকার চিঠি আলাদা করে এক একটা খোপে ভরে রাখে। তারপর সব চিঠি বাছা হয়ে গেলে এক-এক জায়গার চিঠি এক একটা আলগা থলিতে ভরে ফেলে। সেখানে যখন রেল পৌঁছায় তখন রেলের ডাকঘর থেকে সেই সেই জায়গার চিঠিগুলো নামিয়ে দেয়। তারপর আবার ডাকঘরে সেই থলি নিয়ে গিয়ে, তার থেকে চিঠি বের করে, বেছে, পিয়ন দিয়ে বাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এত হাঙ্গামার পরেও চিঠি যে ঠিকমত গিয়ে পৌঁছায় এই আশ্চর্য—ক্বচিৎ ডাকঘরের কোন লোকের দোষে হারাতে পারে। পৃথিবীর যে-কোন জায়গার একজন লোকের ঠিকানা খুঁজে বের করে তার ঠিকানায় একখানা চিঠি লিখে দাও; তারপর বাস্, তোমাকে আর ভাবতে হবে না—সেটা ঠিক সেই লোকের কাছে হাজির হবে।

সব সময়ই যে রেলে ডাক যায় তা নয়। রেলে যায়, জাহাজে যায়, ছোট স্টিমারে যায়, নৌকায় যায়, গাড়িতে যায়, মানুষের পিঠে যায়, কুকুরে-টানা গাড়িতে যায়—এমনকি এরোপ্লেনে করে আকাশ দিয়েও যায়। এমন জায়গাও ত আছে যেখানে ডাকঘর নেই। সেখানের ঠিকানাতে চিঠি লিখলেও চিঠি ঠিকই পৌঁছায়। তবে সেখানে চিঠি যেতে কিছু দেরি লাগে। ইউরোপে যেসব সৈন্য যুদ্ধ করছে তাদের কাছেও চিঠি যাবার উপায় আছে। সে যেখানেই থাকুক না কেন তার নাম আর তার সৈন্যদলের নাম, এইটুকু জানলেই লড়াইয়ের ডাকঘরওয়ালারা ঠিক তার কাছে চিঠি কিংবা পার্সেল পৌঁছে দেবে। আমাদের দেশে অনেক জায়গায় 'রানার'-এর ডাকের বন্দোবস্ত আছে। একজন লোক কাঁধে করে চিঠির থলি নিয়ে এক ডাকঘর থেকে অন্য ডাকঘরে পৌঁছে দেয়। হাজারিবাগে আগে ঐরকম বন্দোবস্ত ছিল। তখন অনেক 'রানার' বাঘের মুখে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে। অনেক সময় দুষ্টু লোকে নির্জন রাস্তায় পেয়ে 'রানার'কে মেরে চিঠিপত্র খুলে টাকাকড়ি নিয়ে চলে যায়।

প্রায় ৭০ বৎসর আগে কোন দেশে পোস্টকার্ড অথবা টিকিট ব্যবহারের নিয়ম ছিল না। তখন চিঠিপত্র পাঠাতে অত্যন্ত বেশি খরচ হত। ইংলন্ডের সার রোল্যান্ড হিল প্রথমে টিকিট ব্যবহারের প্রস্তাব করেন। সে সময়ে চিঠির মাশুল এত বেশি ছিল যে গরীব লোকের পক্ষে চিঠি পাওয়া বড় মুশকিলের কথা ছিল। যার কাছে চিঠি যাবে তাকেই মাশুল দিতে হত; আর অনেক সময় মাশুল দিতে না পারায় অনেক গরীব লোককে দরকারি চিঠিও ফিরত দিতে হত। লন্ডন থেকে মাত্র ৪ মাইল দূরে একটা জায়গায় একটা চিঠি পাঠাতে ১৲ টাকারও বেশি খরচ হত। পার্লামেন্ট সভার সভ্যেরা বিনা পয়সায় চিঠি পাঠাতে পারতেন—চিঠির উপর তাঁর একটা নাম সই থাকলেই হল। তাঁরা অনেক সময় তাঁদের বন্ধুদের চিঠির উপরও সই করে দিতেন আর বন্ধুরা সব বিনা পয়সায় চিঠি পাঠাতেন। কেবল চিঠি নয়, অনেক বড় বড় জিনিসও তাঁরা

ঐরকম সই করে বিনা পয়সায় পাঠাতেন। গরীব লোকেরই বড় মুশকিল হত। তারা নিরুপায় হয়ে শেষে নানারকম ফাঁকি দিতে আরম্ভ করল। একজন তার বোনকে বলল যে সে যখন তাকে চিঠি লিখবে তার উপরের ঠিকানার পাশে কতকগুলি চিহ্ন থাকবে; সেই চিহ্ন দেখে বোঝা যাবে সে ভালো আছে কি অসুস্থ হয়েছে। বোনও সেইরকম চিহ্ন দিয়ে তার ভাইকে চিঠি লিখত। চিঠির ভিতরে কিন্তু কেবল সাদা কাগজ। চিঠি যখন পৌঁছাত তখন তার উপরের চিহ্নগুলি দেখে নিয়ে তারা চিঠিটা ফেরত দিত আর বলত, "অত মাশুল দিয়ে চিঠি নেবার ক্ষমতা আমার নেই।" এইরকম আরও কত উপায়ে লোকেরা ডাকঘরকে ঠকাত।

রোল্যান্ড হিল যখন টিকেট ব্যবহারের প্রস্তাব করেন তখন বিলাতের পার্লামেন্ট সভায় ভয়ানক আপত্তি হয়। কিন্তু অনেক খবরের কাগজওয়ালা তাঁর প্রস্তাবের সপক্ষে লেখেন আর সাধারণ লোকেও অনেক সভা সমিতি করে তাঁর হয়ে বলেন। রোল্যান্ড হিল ছেলেবেলায় গরীব লোক ছিলেন; তিনি গরীবের কষ্ট ভাল করে বুঝতেন আর তাদের জন্যে খাটতেও সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর মনে ছিল, ছেলেবেলায় একদিন তাঁকে একটা চিঠির মাশুল জোগাড় করার জন্য রাস্তায় ঘুরে ছেঁড়া কাপড় বিক্রি করতে হয়েছিল। তিনি চিঠি পাঠাবার খরচ সম্বন্ধে অনেক হিসাব করে বললেন, "চিঠি পাঠাবার খরচ অত্যন্ত সামান্য; বেশি খরচ ডাকঘরেরই হয়। আব অনেক চিঠি লোকে নেয় না বলে ডাকঘরের বিস্তর টাকা লোকসান হয়। বড় লোকেরা ত বিনা পয়সাযই অনেক চিঠি পাঠান। এর চেয়ে ভাল বন্দোবস্ত হয় যদি নিয়ম করা যায় যে, চিঠি পাঠাবার আগে মাশুল দিতে হবে। আর মাশুল দেওয়া হয়েছে কিনা বুঝবার জন্য চিঠির উপর একটা টিকিট লাগিয়ে দিলেই হবে। কত মাশুল দেওয়া হল তা টিকিটেই লেখা থাকবে।" অনেক আপত্তির পর পার্লামেন্ট একবার এ উপায়টা পরীক্ষা করতে রাজী হলেন। রোল্যান্ড হিলের উপরেই সব বন্দোবস্তের ভার পড়ল। কয়েক বৎসর পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, এই ডাকটিকিটের বন্দোবস্ত এত সুবিধাজনক যে এর বিরুদ্ধে আর কোন আপত্তিই টেঁকে না। তখন থেকে বিলাতে টিকিটের চল আরম্ভ হল আর দেখতে দেখতে সমস্ত পৃথিবীময় টিকিটের ব্যবহার আরম্ভ হল। ডাকঘরের বন্দোবস্তও রোল্যান্ড হিলের বুদ্ধিতেই অনেকটা হয়েছে।

অসুরের দেশ

যে-জাতি শিল্পে বাণিজ্যে বেশ অগ্রসর, যাহারা লেখাপড়ার চর্চা করে, হিসাব করিয়া পাকা দালান ইমারৎ গাঁথিতে জানে এবং নানারূপ ধাতু ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারে বেশ অভ্যস্ত, মোটের উপর তাহাকে সভ্য জাতি বলা যায়। ইতিহাসের প্রাচীন যুগে যে সকল সভ্য জাতির নাম পাওয়া যায় তাহার মধ্যে একটা জাতির কথা শুনি যাহার নাম অসুর বা আশুর। ইংরাজিতে তাহাকে বলে আসিরিয়া (Assyria)। এই অসুর দেশের নাম প্রাচীন বাইবেল প্রভৃতি পুরাতন পুঁথিতে অনেক স্থানে পাওয়া যায় এবং একশত বৎসর আগে এই দেশের সঙ্গে মানুষের এইটুকু মাত্র পরিচয় ছিল। মানুষ অসুরের দেশ ও তাহার রাজধানী নিনেভের কাহিনী কেবল পুঁথিতেই পড়িয়া আসিত কিন্তু তাহার চেহারা কেহ চোখে দেখে নাই। কারণ, যেখানে সহর ছিল সে স্থানে খোঁজ করিতে গেলে কেবল মাটির ঢিপি আর প্রকাণ্ড ময়দান ছাড়া আর কিছুই দেখা যাইত না।

এই অসুরের সঙ্গে আমাদের পুরাণের অসুরদের কোন সম্পর্ক আছে কিনা তাহা আমি জানি

না। এখন মেসোপটেমিয়ার যেখানে ইংরাজের সহিত তুর্কির লড়াই চলিতেছে তাহার প্রায় তিনশত মাইল উত্তরে প্রাচীন অসুরের দেশ ছিল। ইহা কেবল আন্দাজের কথা নয়—বাস্তবিকই সেখানে ময়দান খুঁড়িয়া মানুষে সেই পুরাতন লুপ্ত সহরকে বাহির করিয়াছে। প্রায় সাড়ে চার হাজার বৎসরের পুরাতন সহর, সেখানে এই অসুর জাতি দু হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়া পরে যুদ্ধ বিগ্রহে একেবারে ধ্বংস পায়। সেও প্রায় আড়াই- হাজার বৎসর আগেকার কথা—তখনও বুদ্ধের জন্ম হয় নাই!

কথায় বলে 'সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।' এক একজন লোক থাকে তাহাদের অন্নবস্ত্রের অভাব নাই, সংসারে বিশেষ কোন দুঃখ নাই অথচ তাহাদের কি যে খেয়াল, তাহারা ঘর বাড়ি ছাড়িয়া একটা কোন হাঙ্গামা লইয়া ব্যস্ত থাকে। উত্তরে দক্ষিণে বরফের দেশে, আফ্রিকার মরুভূমিতে, পাহাড়ের চূড়ায় তাহারা অস্থির হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। এইরূপ মাথা-পাগলা লোকের দ্বারা জগতের অনেক বড় বড় আবিষ্কার হইয়া গিয়াছে। অসুরের রাজ্য আবিষ্কারও এইরূপেই হয়। লেয়ার্ড নামে এক ইংরাজ সিংহলে কি একটা ভাল চাকরি পাইয়া এ দেশে আসিতেছিলেন। সোজা পথে জাহাজে চড়িয়া আসিলেই হইত কিন্তু তাঁহার সখ হইল ডাঙার পথে মেসোপটেমিয়া, পারস্য প্রভৃতি দেখিয়া তিনি এ দেশে আসিবেন।

কিন্তু ওই যে খেয়ালের মাথায় তিনি মেসোপটেমিয়া গেলেন, উহাতেই তাঁহার সব কাজ কর্ম উল্টাইয়া গেল। মেসোপটেমিয়ার উত্তরে বেড়াইবার সময় তাঁহার মনে হইল এই ত সেই প্রাচীন সভ্য জাতির দেশ, এখানে খুঁজিলে কি তাহাদের চিহ্ন পাওয়া যায় না? তাঁহার আর চাকরি করা হইল না—তিনি কতকগুলি মজুর লইয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিলেন! খুঁড়িতে খুঁড়িতে তাঁহার সঙ্গের টাকা-পয়সা সব ফুরাইয়া আসিল, তিনি আবার টাকা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার দেখাদেখি আরও দু-চারটি লোক আসিয়া মাটি-খোঁড়া ব্যাপারে যোগ দিল। তখন তুর্কি রাজকর্মচারীদের মনে সন্দেহ জাগিল, 'এই লোকগুলা খামখা ঘরবাড়ি ছাড়িয়া বিদেশে আসিয়া মাটি কাটিতে চায় কেন? নিশ্চয়ই ইহাদের মনে কোন দুষ্ট মতলব আছে।' সুতরাং তাহারা মাটি-কাটা বন্ধ করিয়া দিতে চাহিল। তারপর যখন মাটির ভিতর হইতে নানারকম অদ্ভুত মূর্তি আর ঘর বাড়ি বাহির হইতে লাগিল তখন এই আশ্চর্য কাণ্ড দেখিয়া সেদেশী মজুরগুলা এমন ঘাবড়াইয়া গেল যে, তাহারাও কাজ করিতে চায় না। ইহার উপর সে দেশে নানারকম হিংস্র জন্তুর অত্যাচার ও জ্বর-জারির উৎপাত ত ছিলই।

যাহা হউক, অনেক পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে—ইংরাজ ও ফরাসি গভর্নমেন্টের সাহায্যে শেষটায় মাটির নীচ হইতে একেবারে অসুরের রাজধানী বাহির হইয়া পড়িল। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। কবে আড়াই হাজার বছর আগে সে সহর ধ্বংস হইয়াছে, লোকজন কোন্ কালে সে দেশ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে অথচ এতদিন পরে তাহাদের সেই পুরাতন কীর্তিগুলি আবার কঙ্কালের মতো মাটির নীচ হইতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে।

সেকালের ইতিহাসে জানা যায় যে, নিনেভে সহর শত্রুর হাতে পড়িয়া আগুনে নষ্ট হয়—তাহার প্রমাণ এখনও চারিদিকে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আগুনেও সব নষ্ট করিতে পারে নাই। এখনও কত মূর্তি, কত কারুকার্য আর পাথরে আঁকা কত ছবি আছে যাহা দেখিলে মনে হয় না যে এগুলি সেই লুপ্ত যুগের জিনিস। সেই সময়ে যে-সকল রং ব্যবহার হইত সেই রঙগুলি পর্যন্ত এক-এক জায়গায় বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। এক একটি ঘরের ছাদ, দেওয়াল প্রভৃতি এমন অবস্থায় আছে যে, সমঝদার লোকে তাহা দেখিয়া বলিতে পারে নূতন অবস্থায় ঘরটি ঠিক কিরকম ছিল। এই সকল ছবি ও মূর্তি দেখিলে বোঝা যায় যে, সে দেশের লোকদের বেশ সৌন্দর্যজ্ঞান ছিল। ছবির মধ্যে লড়াই ও শিকারের ছবিই খুব বেশি—মাঝে মাঝে রাজা-রাজড়ার

ছবিও আছে। ছবি দেখিয়া সে দেশের লোকদের অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক ও চেহারা সম্বন্ধে অনেক খবর জানা যায়। অসুরের দল আর তাহাদের শত্রুর দলের মধ্যে এ বিষয়ে কিরূপ তফাৎ ছিল, তাহাও অনেক ছবিতে পরিষ্কার দেখান হইয়াছে। অসুরেরা বড়ই যুদ্ধপ্রিয় ছিল এবং প্রায়ই অন্যান্য জাতিদের সঙ্গে লড়াই লইয়া ব্যস্ত থাকিত।

অসুরদের কথা বলিতে হইলে তাহাদের ভাষার কথাও বলিতে হয়। সে ভাষায় এখন আর কেহ কথা বলে না, সে দেশের লোকেরা পর্যন্ত তাহার সম্বন্ধে কোনরূপ সংবাদ জানে না— ভাষার একমাত্র চিহ্ন সেকালের অক্ষর। মাটির উপর বাটালি দিয়া তীরের ফলকের মতো অদ্ভুত সব আঁচড় কাটিয়া অক্ষর লেখা হইত। সেই মাটি পোড়াইয়া ইঁটের 'পুঁথি' তৈয়ারি হইত। একশত বৎসর আগে সে অক্ষর পড়িতে পারে এমন লোক পৃথিবীতে ছিল না। অথচ আজকাল পণ্ডিতেরা এইসব আঁচড় পড়িয়া তাহা হইতে কত সংবাদ কত ইতিহাস উদ্ধার করিতেছেন! বিদ্যা বুদ্ধি ও বাণিজ্যে বাবিলনের লোকেরা অসুরদের চাইতে অনেক বেশি অগ্রসর ছিল, সুতরাং তাহাদের ভাষা ধর্ম শিল্প সাহিত্য আইন কানুন প্রভৃতি প্রায় সকল বিষয়েই অসুরেরা বাবিলনের অল্পাধিক অনুকরণ করিত। একটা উঁচু পাহাড়ের গায়ে বাবিলনের অক্ষরের পাশে পারস্যের অক্ষরে লেখা একটা যুদ্ধের বর্ণনা দেখিয়া একজন ইংরাজ পণ্ডিত এই দুয়ের তুলনা করিয়া বাবিলনের অক্ষরের সংকেত বাহির করেন। এইভাবে গ্রীক অক্ষরের সাহায্যে ইজিপ্টের অদ্ভুত ছবিওয়ালা অক্ষরের রহস্য বাহির করা হয়। এই সকল পুরাতন অক্ষরে লেখা ইঁটের পুঁথি, কীর্তিস্তম্ভ বা খোদাই-করা পাহাড় প্রভৃতি হইতে অসুরদের ইতিহাসের অনেক কথা জানা গিয়াছে। অনেক রাজার নাম ও তারিখ, অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনা, ছোট বড় নানা জাতির সহিত সন্ধি ও বিবাদের সংবাদ এ সমস্তই যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। অসুরদের প্রধান অস্ত্র ছিল তীর-ধনুক। তাহারা ঘোড়ায় ও রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিত, সঙ্গে পদাতিক সৈন্যও থাকিত। যেমন যোদ্ধা তেমনি শিকারী। আমাদের দেশের মতো অসুরের দেশেও সেকালের রাজারা মৃগয়া করিতেন। হিংস্র জন্তু নষ্ট করিয়া প্রজাকে রক্ষা করা রাজারই কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইত।

অসুরে রাজাদের বীরত্বের কথা বলিতে গেলে একজনের কথা বিশেষভাবে বলা উচিত, তাঁহার নাম টিগ্‌লাৎ-পিলেসের। তিন হাজার বৎসর আগে ইনি অসুর দেশের রাজা হইয়া নানা দেশ জয় করেন। তাঁহার শাসনে অসুরের রাজ্য ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইনি যখন উত্তরে দিগ্বিজয় করিতে বাহির হন তখন বাবিলনের সৈন্যরা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করে এবং রাজমন্দিরের দেবমূর্তি চুরি করিয়া লইয়া যায়। টিগ্‌লাৎ-পিলেসের ইহার প্রতিশোধের জন্য বাবিলন আক্রমণ করেন ও তাহার রাজধানী পর্যন্ত লুটিয়া অনেকখানি দেশ অধিকার করিয়া ফেলেন। একদিকে যেমন যোদ্ধা, অন্যদিকে টিগ্‌লাৎ-পিলেসের একজন অসাধারণ শক্তিশালী শিকারী ছিলেন। হাতি সিংহ প্রভৃতি ভয়ানক জন্তু তিনি নিজের হাতে তীর, ধনুক ও তলোয়ার লইয়া শিকার করিতেন। তিনি রথে চড়িয়া প্রকাণ্ড দশটা হাতি ও প্রায় আট শত সিংহ শিকার করেন—ইহা ছাড়া পায়ে হাঁটিয়া যে-সকল সিংহ মারেন তাহার সংখ্যাও একশতের উপর হইবে।

টিগ্‌লাৎ-পিলেসের মারা গেলে পর অসুরদের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইয়া পড়ে। তাহাদের প্রকাণ্ড রাজ্য ক্রমেই ছোট হইতে থাকে। প্রায় দুইশত বৎসর পরে আরও কয়েকটি শক্তিশালী রাজার আবির্ভাব হয় এবং ইঁহারা অপর দেশকে জাগাইয়া তোলেন। এই সকল রাজাদের মধ্যে অসুর-নসির-পালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহার রাজত্বকালের নানারূপ চিহ্ন ও পরিচয় খুব প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাতে দেখা যায় যে, ইনি একদিকে যেমন সৌখিন, অপর দিকে যুদ্ধের সময় তেমনি হিংস্র ও নিষ্ঠুর ছিলেন। দেশ-বিদেশের লোক তাঁহার নামে ভয়ে কাঁপিত।

ইঁহার রাজত্বের পর হইতে ক্রমে আবার অসুরদের অবনতি আরম্ভ হয়। তারপর অসুররাজকুলের শেষ যোদ্ধা মহাবীর অসুর-বানি-পালের সময়ে আর একবার এদেশ মাথা তুলিয়া উঠে। উৎসাহের চোটে অসুরেরা একেবারে আফ্রিকায় গিয়া ইজিপ্ট জয় করিয়া ফেলিল—দক্ষিণে আরবের মরুভূমিতে সসৈন্যে হাজির হইল। কিন্তু ইহাই তাহাদের শেষ কীর্তি। ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে সমস্ত জাতি যখন অবসন্ন হইয়া পড়িল তখন প্রবল শত্রুরাও সুযোগ বুঝিয়া চারিদিক হইতে তাহাদের রাজ্য লুটিয়া লইল। অবশেষে পারস্যের দুর্দান্ত সেনাদল আসিয়া তাহাদের রাজধানী ঘিরিয়া ফেলিল। নিনেভে সহরের চারিদিকে প্রকাণ্ড দেওয়াল ঘেরা। এই দেওয়ালের জোরে অসুরেরা তিন বৎসর ধরিয়া তাহাদের প্রাচীন সহরের জন্য লড়াই করিল—কিন্তু অবশেষে হার মানিতেই হইল। তারপর এতদিনের সাধের সহর শত্রুর হাতে পড়িয়া একেবারে ছারখার হইয়া গেল।

কোথায় বা অসুর রাজ্য—আর কোথায় বা সেই অসুর জাতি। দু হাজার বছর সারা দেশ কাঁপাইয়া যাহারা রাজত্ব করিল এখন কেই বা তাহাদের খবর রাখে। অত বড় নিনেভে সহর, সেও মাটির নীচে কবর চাপা পড়িল। এখন আবার লোকে সেই কবর খুঁড়িয়া তাহার কঙ্কাল বাহির করিয়াছে। সেখানে গিয়া দেখ শ্মশানের মতো দেশ, লোক নাই জন নাই, আছে কেবল মৃত শহরের জীর্ণ কঙ্কাল, আর রাত্রের অন্ধকারে সিংহের হুংকার।

নীহারিকা

তোমরা আকাশে 'কালপুরুষ' দেখিয়াছ? এই ফাল্গুন মাসে প্রথম রাত্রে যদি দক্ষিণমুখী হইয়া দাঁড়াও তবে প্রায় মাথার উপর এই 'কালপুরুষ'কে দেখিতে পাইবে, আর একবারটি যদি তাহাকে চিনিয়া রাখ তবে আর কোনদিন ভুলিবে না।

পৃথিবীর যেমন মানচিত্র বা 'ম্যাপ' হয়, আকাশেরও তেমনি মানচিত্র আছে। এইরকমের অনেক মানচিত্রে আকাশের তারার সঙ্গে অনেক অদ্ভুত ছবি আঁকা থাকে; তাহার মধ্যে যদি কালপুরুষ বা Orion-এর ছবি খুঁজিতে যাও, তবে হয়ত দেখিবে একটা হাত-পাশুদ্ধ মূর্তি আঁকা আছে কিন্তু আকাশে খুঁজিলে অবশ্য সেরকম কোন চেহারা পাইবে না—দেখিবে কেবল ঐ তারাগুলি।

আকাশের গায়ে যে এত হাজার হাজার তারা ছড়ান রহিয়াছে, মানুষ অতি প্রাচীন কাল হইতেই তাহার মধ্যে নানারকম ছবি ও মূর্তির কল্পনা করিয়া আসিতেছে। কতগুলা তারা মিলিয়া হয়ত অর্ধচন্দ্রের মতো দেখায়, মানুষে বলিল 'ওটা ধনুকের মতো'; কোনটা হয়ত মুকুট, কোনটা ষাঁড়ের মাথা, কোনটা ভল্লুক, কোনটা যমজ ভাই, কোনটা যোদ্ধা, এইরূপ নানারকম কল্পনার মূর্তিতে সমস্ত আকাশটিকে ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেক সময়েই এ সকল কল্পনাকে নিতান্তই আজগুবি বলিয়া মনে হয় কিন্তু এই কালপুরুষের বেলা বোধহয় কল্পনাটা বেশ খাটিয়াছে। দুই হাত দুই পা আর মাথা সবই মিলিতেছে, তাহার উপর আবার কোমরবন্ধ। তলোয়ারটি পর্যন্ত বাদ যায় নাই। এত কথা যে বলিলাম সে কেবল ঐ তলোয়ারটির জন্য। ঐ 'তলোয়ার'টার দিকে একবার ভাল করিয়া দেখ দেখি; তিনটি তারার মধ্যে মাঝেরটি একটু কেমন কেমন দেখায় না? আর সবগুলি তারা পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে হীরার টুকরার মতো, কিন্তু এটা যেন কেমন একটু ঝাপসা ঠেকে। শুধু চোখে এই পর্যন্ত; কিন্তু দূরবীন দিয়া দেখ, আরও তফাৎ দেখিবে। যত বড়ই দূরবীন

কষো না কেন, আর সব তারাগুলিকে কেবলি ঝিক্‌মিকে হীরার মতো দেখিবে কিন্তু এই 'তারা'টিকে দেখিবে যেন সাদা মেঘের মতো। আকাশে এইরকম মেঘের মতো জিনিস আরও অনেক দেখা যায়—ইহাদের নাম নীহারিকা, ইংরাজিতে বলে Nebula।

পণ্ডিতেরা বলেন, এই নীহারিকাগুলি এককালে তারা হইবে এবং এই তারাগুলাও এককালে নীহারিকা ছিল। আমরা যাহাকে সৌরজগৎ বলি—এই সূর্য এবং গ্রহ উপগ্রহশুদ্ধ তাহার বিশাল পরিবারটি—এই সমস্তই এককালে কোন এক প্রকাণ্ড নীহারিকার মধ্যে খিচুড়ি পাকাইয়া ছিল। সে যে কত বড় ব্যাপার তাহা কল্পনাও করা যায় না। সেই নীহারিকা আকাশের একটা প্রকাণ্ড কোণ জুড়িয়া জ্বলন্ত বাষ্পের মতো দপ্‌দপ্‌ করিয়া জ্বলিত। তাহার মধ্যে না ছিল চন্দ্রসূর্য, না ছিল পৃথিবী।

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কাহারও স্থির হইয়া থাকিবার নিয়ম নাই, একটা কণাপ্রমাণ বস্তু আর একটি কণাকে পাইলে এ উহাকে টানিয়া লয়, দশটা কণা একত্র হইলেই পরস্পরের দিকে ছুটিয়া জমাট বাঁধিতে চায়। সুতরাং এত বড় নীহারিকাটি যে স্থির হইয়া থাকিবে, এমন কোন উপায় ছিল না—সে আপনার ভিতরকার টানাটানির মধ্যে পড়িয়া ঘুরপাক খাইতে লাগিল আর তাহার মধ্যখানে প্রকাণ্ড একটা বাষ্পের টিপি জমাট হইতে লাগিল। এই জমাট টিপিকেই এখন আমরা সূর্য বলি।

কালপুরুষের নীহারিকার চেহারা একবার দেখ—ঐ জমাট মেঘের মতো জিনিসটার ভিতর হইতে কত ডালপালা বাহির হইয়াছে; ঐ ডালপালাগুলি আবার আলগাভাবে জমাট বাঁধিয়া গ্রহ উপগ্রহের সৃষ্টি করিবে। ঘুরন্ত চাকার গা হইতে যেমন করিয়া কাদা ছিট্‌কাইয়া যায়, এক একটা নীহারিকার চক্র হইতে ঠিক সেইরকম জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে। দেখিতে অবশ্য সমস্ত নীহারিকাটি স্থির দেখা যায়—কারণ, জিনিসটা এত দূরে যে ঘণ্টায় লক্ষ মাইল বেগে ছুটিলেও এখান হইতে তাহাকে একেবারে স্তব্ধ দেখা যাইবে।

আকাশে এইরকম নীহারিকা কত যে আছে, তাহার আর অন্ত নাই। কোনটা একেবারে ঝাপসা কুয়াশার মতো, কোনটার মধ্যে সবে একটু জমাট বাঁধিতেছে, কোনটা রীতিমত গোল পাকাইয়া উঠিতেছে। এক একটার চেহারা ঠিক যেন ঘুরন্ত চরকিবাজির মতো, মনে হয় যেন জ্বলন্ত চক্র হইতে আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। আবার এমন নীহারিকাও আছে যাহাকে এখন দেখিতে ঠিক তারার মতোই দেখায়; সে যে এক সময়ে নীহারিকা ছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ এখনও তাহার আশেপাশে অতি ঝাপসা কুয়াশার মতো নীহারিকার শেষ নিশ্বাসটুকু লাগিয়া আছে। সে এত ঝাপসা যে, অনেক সময় খুব বড় দূরবীক্ষণ দিয়াও তাহার কিছুমাত্র ধরা যায় না, ধরা পড়ে কেবল ফটোগ্রাফের প্লেটে।

ফটোগ্রাফের প্লেটে কেমন করিয়া ছবি তোলে দেখিয়াছ ত? ক্যামেরার ভিতর হইতে সে টুক্‌ করিয়া একটিবারমাত্র তোমার দিকে তাকায় আর ঐ এক দৃষ্টিতেই তোমার চেহারার ছাপটুকু নিজের মধ্যে ধরিয়া লয়। সে একবার যাহা ভাল করিয়া ধরে তাহা আর ভুলিতে চায় না। এক মিনিট খুব ঝাপসা জিনিসের দিকে তাকাইলে মানুষের চোখ শ্রান্ত হইয়া পড়ে—সে তখন আর ভাল দেখে না; কিন্তু ফটোগ্রাফের প্লেট যত বেশি করিয়া তাকায় ততই বেশি দেখিতে পায়। এমনি করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাইয়া সে ঐ অন্ধকারের মধ্যেই অনেক আশ্চর্য জিনিসের সংবাদ বাহির করে। এইরকম ফটোগ্রাফ দেখিলে বোঝা যায় যে, সমস্ত আকাশটাই প্রায় নীহারিকায় ঢাকা—আকাশের যেদিকে তাকাও সেইদিকেই নীহারিকার জাল।

মাটির বাসন

মাটির বাসন গড়িতে জানে না, এমন জাতি পৃথিবীতে খুব কমই আছে। নিতান্ত অসভ্য মানুষ যাহারা কাপড় পরিতে জানে না, যাহারা বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের মধ্যেও মাটির বাসনের চল আছে। অতি প্রাচীনকালের মানুষ, যাহারা পাথর শানাইয়া অস্ত্র গড়িত, যাহারা ধাতুর ব্যবহার শিখে নাই, তাহাদের কবর খুঁড়িলে মাটির গেলাস ঘটি বাটি পাওয়া যায়। কেবল তাহাই নয়, এক একটা জিনিসের উপর তাহারা নানারূপ কারুকার্য করিয়া তাহাদের সৌন্দর্যবোধের যে পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে এখনও পর্যন্ত তাহার চিহ্ন মাঝে মাঝে দেখিতে পাই। যাহারা আগুনের ব্যবহার করিতে জানিত না তাহারা মাটির বাসন গড়িয়া রোদে শুকাইয়া লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিত; কোন কোন স্থলে বাঁশের বা পাতার ঝুড়ি বানাইয়া তাহার গায়ে মাটি লেপিয়া বাসন বানান হইত, এরূপও দেখা গিয়াছে।

দশ হাজার বৎসর আগে ইজিপ্ট দেশে যে মাটির বাসন তৈয়ারি হইত, তাহার সুন্দর সুন্দর নমুনা পাওয়া গিয়াছে। বাসনগুলি সমস্তই হাতে গড়া, কারণ, কুমারের চাকে মাটি গড়িবার কায়দা সে সময়ে তাহাদের জানা ছিল না। কিন্তু এ কাজে তাহাদের হাত এমন সাফাই ছিল যে, বড় বড় জালার মতো পাত্রগুলির গড়নেও কোথাও খুঁত ধরিবার যো নাই। বড় বড় জাহাজী নৌকা করিয়া এই সকল বাসন দেশ-বিদেশে চালান হইত এবং তখনকার লোকে আগ্রহ করিয়া তাহা কিনিত। বাসনগুলির উপর চকচকে কালো পালিশ থাকিত, তাহার গায়ে সাদা রঙের কারুকার্য।

মাটির বাসন নানারকমের। সাধারণ 'মেটে বাসন' যাহা অল্প আঁচে পোড়াইলেই চলে, আমাদের দেশে তাহার কিছুমাত্র অভাব নাই। গেলাস, ভাঁড়, সরা, মালসা হইতে আরম্ভ করিয়া কুঁজা, কলসী, জালা পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাইবে। কিন্তু 'সাধারণ মাটির' জিনিসও যে কত সুন্দর হইতে পারে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই নানা দেশের লোকে নানাভাবে তাহা দেখাইয়া আসিতেছে।

আর একরকম মাটির জিনিস হয়, তাহাকে পাথুরে মাটি বলা যায়। এগুলিকে কড়া আগুনে পোড়াইলে পাথরের মতো মজবুত হয় এবং তখন তাহাকে অসংখ্য প্রকার দরকারী কাজে লাগান যায়। বাড়ি বানাইবার টালি, ড্রেনের পাইপ, নানারূপ খেলনা প্রভৃতি কত জিনিস তৈয়ারি হয়। তাহাতে আবার নানারকম রং দেওয়া ও ইচ্ছামত পালিশ ধরান চলে।

সাদা মাটির বাসন হইলেই আমরা অনেক সময়ে তাহাকে 'চীনে মাটি' বলি—কিন্তু আসল চীনামাটি অতি উঁচু দরের জিনিস। চীনে মাটির বাসন এক সময়ে কেবল চীন দেশেই তৈয়ারি হইত। প্রায় সাত শত বৎসর আগে মুসলমান সম্রাট সালাদিনের কাছে চীন সম্রাট কতগুলা উপহার পাঠাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কতগুলা চীনা বাসন ছিল। তেমন বাসন কেহ চক্ষে দেখে নাই। পাতলা ঝিনুকের মতো স্বচ্ছ, ডিমের খোলার মতো হালকা, সে আশ্চর্য বাসনের কথা চারিদিকে রটিয়া গেল।

এই চীনা বাসনের সংকেত শিখিবার জন্য ছয় শতাব্দী ধরিয়া কত লোকে যে কতরকম চেষ্টা করিয়াছে, তাহার আর অন্ত নাই। এই একটি বিদ্যাকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টায় কত লোকে জীবনপাত করিয়াছে এবং তাহার ফলে কেবল এইটুকুমাত্র জ্ঞানলাভ করিয়াছে যে, অমন পাতলা স্বচ্ছ সুন্দর জিনিস করা একেবারেই সহজ নয়। জিনিসটা পাতলা হয় ত স্বচ্ছ হয় না, স্বচ্ছ যদি হয় তবে এমন 'ঠুনকো' যে একটু ধরিতে গেলেই ভাঙিয়া যায়। হয়ত আর সবই ঠিক

হইল কিন্তু উপরের মোলায়েম পালিশটুকু ধরিল না, হয়ত কোথায় একটি চুল বা এক কণা বালি ছিল কিংবা চুল্লির আঁচ ঠিক সমান ছিল না, তাহাতেই বাসনটি পোড়াইবার সময় ফাটিয়া গেল। এইরকম করিয়া লোকে হাজারবার ঠেকিয়া ঠেকিয়া তবে এ বিদ্যা শিখিয়াছে।

গ্রীস প্রভৃতি দেশে এক সময়ে অতি সুন্দর মাটির ঘড়া ও ফুলদানি তৈয়ারি হইত কিন্তু গ্রীক ও রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার পর এই শিল্প নষ্ট হইয়া যায়। ইহার পর বহু বৎসর পর্যন্ত ইউরোপে মাটির জিনিস বলিতে সাধারণ মোটা বাসনপত্রই বুঝিত। তারপর মুসলমানদের দৌলতে যখন এই লুপ্ত শিল্প আবার জাগিয়া উঠে তখন হইতে দক্ষিণ ইউরোপে, বিশেষত ইটালিতে নানারূপ শিল্পের বাসন দেখা দিতে লাগিল। তখনও তাহারা চীনা মাটি গড়িতে পারে নাই বটে কিন্তু মাটির উপর সাদা পালিশ চড়াইয়া তাহার চমৎকার নকল করিতে শিখিয়াছিল। বহুদিন পর্যন্ত এই ব্যবসায় ইটালির একচেটিয়া ছিল।

যাহাদের চেষ্টায় ও যত্নে এই শিল্পের ব্যবসা ইউরোপের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তাহাদের মধ্যে প্যালিসির নাম বিশেষভাবে করা যায়। বার্নার্ড প্যালিসির বাড়ি ছিল ফ্রান্স দেশে। সেখানে ছবি আঁকিয়া, কাচ রঙাইয়া ও জরীপের কাজে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহার দিন যাইত। হয়ত এইভাবেই তাঁহার সারা জীবন কাটিয়া যাইত; কিন্তু একদিন তিনি একখানা 'মাটি'র পেয়ালা দেখিলেন, তেমন জিনিস আর তিনি কখনও দেখেন নাই—বিশেষত তাহার উপর যে পালিশ করা এনামেলের কাজ ছিল, তাহাতেই প্যালিসিকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। প্যালিসি তখন একেবারে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, ঐরকম পালিশের সংকেত না শিখিয়া তিনি ছাড়িবেন না।

সেইদিন হইতে তাঁহার আর অন্য চিন্তা নাই, জীবনের আর কোন কাজ নাই, তিনি কেবল চুল্লি জ্বালাইয়া ভাঙা পাথর আর মাটির মশলা গলাইতেছেন, আর দেখিতেছেন পালিশ ঠিক হইল কিনা। নিজে লেখাপড়া জানেন না, কোনদিন এ ব্যবসা শিখেন নাই, অথচ উৎসাহের তাড়নায় শক্তি সময় ও অর্থ অজস্র ঢালিয়া দিতেছেন—তাহাতে কি যে লাভ হইবে তাহা কেহই বোঝে না। লোকে পাগল বলিতে লাগিল, তাঁহার স্ত্রী বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, বাড়ির লোকে অস্থির হইয়া পড়িল, কিন্তু তাঁহার সে দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। দুই বৎসর হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর তিনশত মাটির পেয়ালা গড়িয়া তাহার উপর নানারকম মশলার প্রলেপ দিয়া তিনি চুল্লিতে চড়াইলেন। চুল্লি জুড়াইলে পর দেখা গেল, একটিমাত্র বাসনের গায়ে অতি চমৎকার সাদা পালিশ ধরিয়াছে! তখন প্যালিসির আনন্দ দেখে কে!

এতদিন পর্যন্ত তিনি চারি ক্রোশ পথ হাঁটিয়া এক ব্যবসায়ীর চুল্লিতে তাঁহার জিনিসগুলা পোড়াইয়া আনিতেন। এখন হইতে তিনি নিজের বাড়িতে একটি চুল্লি বানাইতে সংকল্প করিলেন। ইঁটের পাঁজায় ইঁট কিনিয়া তিনি নিজে তাহা বহিয়া আনিতেন এবং আপনার হাতে সাজাইয়া চুল্লি গড়িতেন। তারপর, চুল্লি খাড়া হইলে তিনি অনেক কাঠ ও কয়লা সংগ্রহ করিয়া চুল্লি জ্বালাইলেন এবং একশত মাটির বাসন বসাইয়া তাহাতে মশলা চড়াইলেন—এই মশলা গলিলে পর বাসনে এনামেলের মতো সাদা পালিশ হইবে। কিন্তু মশলা আর গলিতে চায় না। সারারাত কাটিয়া গেল, তারপর দিন গেল রাত গেল, এমনি করিয়া ছয়দিন ছয়রাত্র চুল্লির পাশে বসিয়া বৃথায় কাটিল। তখন প্যালিসি নূতন মশলা বানাইয়া আবার আগুন চড়াইলেন। প্যালিসির তখন আর দিক্‌বিদিক জ্ঞান নাই। তিনি আহার-নিদ্রা ছাড়িয়া কেবল চুল্লিতে কাঠ যোগাইতেছেন। ক্রমে কাঠ সব ফুরাইয়া আসিল—তিনি বাগানের কাঠের বেড়া ভাঙিয়া আগুনে দিলেন। তাহাও যখন ফুরাইয়া আসিল তখন বাড়ির টেবিল চেয়ার যাহা সম্মুখে পাইলেন সব ভাঙিয়া ভাঙিয়া জ্বালানি

কাঠ করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে সহরের মধ্যে ছুটিয়া বাহির হইয়াছে, আর সকলকে ডাকিয়া বলিতেছে যে প্যালিসি পাগল হইয়া বাড়িঘর ভাঙিয়া ফেলিতেছেন। শুনিয়া সকলে ব্যস্ত হইয়া দেখিতে আসিল, ব্যাপারখানা কি। ততক্ষণে প্যালিসির মশলা গলিয়া চমৎকার সাদা পালিশ হইয়া ফুটিয়াছে—তিনি অতি যত্নে সেগুলিকে ঠাণ্ডা করিয়া বাহির করিতেছেন।

প্যালিসি স্থির করিলেন তিনি তাঁহার আবিষ্কারকে ব্যবসায়ে লাগাইবেন। এক কুমারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তিনি ছয় মাসে তাহাকে দিয়া কতগুলি সুন্দর সুন্দর বাসন গড়াইলেন। কিন্তু সেগুলিতে পালিশ ধরাইবার সময় তাঁহার চুল্লি ফাটিয়া ধূলা ও ঝুল পড়িয়া তাঁহার চমৎকার পালিশ করা বাসনগুলিতে দাগ ধরাইয়া দিল। প্যালিসি কিছু বলিলেন না, বাসনগুলি ভাঙিয়া আবার চুল্লি মেরামত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সে ধৈর্য ও বীরত্বের আর তুলনা হয় না। খোলা বাগানে সারাদিন রোদে ঘামিয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া তিনি চুল্লির তদ্বির করিতেন; বাড়ির বাহির হইলে লোকে তাঁহাকে দেখিয়া হাসাহাসি করিত; সারাদিন পরিশ্রমের পর যখন তাঁহার শরীর মন অবসন্ন হইয়া আসিত, তিনি বাড়িতে ঢুকিবামাত্র চারিদিক হইতে সকলে ঠাট্টা বিদ্রূপ নিন্দা ও অভিযোগ করিত। এতরকম অশান্তির মধ্যে ষোল বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া প্যালিসি আপনার ব্যবসায়কে সফল করিয়া রাজসম্মান লাভ করেন। কিন্তু এখানেও তাঁহার দুঃখের শেষ হয় নাই। ব্যবসায়ে কৃতকার্য হইবার পরেও শেষ বয়স পর্যন্ত তাঁহাকে নানা শত্রুর হাতে অনেক অত্যাচার সহিতে হইয়াছিল। সে-সকল অত্যাচার তিনি যেরূপ তেজের সহিত সহ্য করিয়াছিলেন তাহা প্যালিসির মতো বীরেরই উপযুক্ত। সকল বিষয়ে তিনি যাহা সত্য বুঝিতেন নির্ভিকভাবে তাহা প্রচার করিতেন; এইজন্য তাঁহার নিজের স্বাধীন ধর্মমত বজায় রাখিতে গিয়া তিনি নানারকমে লাঞ্ছিত হন এবং অবশেষে আশি বৎসর বয়সে মৃত্যুভয়কে অগ্রাহ্য করিয়া এক অন্ধকার কয়েদখানায় বন্দী অবস্থায় মারা যান।

ঘুড়ি ও ফানুষ

জলের চাইতে হালকা জিনিস যেমন জলে ভাসে বাতাসের চেয়ে হালকা জিনিস তেমনি বাতাসে ভাসে। আগুনের উপরকার তপ্ত বাতাস সাধারণ ঠাণ্ডা বাতাসের চাইতে অনেক পাতলা; তাই সে উপরে উঠে—আর সেই উপরমুখী স্রোতের টানে যত রাজ্যের কয়লা ধূলা সব শুদ্ধ টেনে তোলে। সেই কয়লা ধূলা শুদ্ধ ময়লা বাতাসের স্রোতকে আমরা বলি ধোঁয়া।

এইরকম হালকা ধোঁয়াকে পাতলা থলির মধ্যে পুরে আমরা তাকে আকাশে ওড়াই—আর সেই কাগজের থলিকে বলি ফানুষ। সেই ফানুষ যদি খুব বড় হয়, আর মজবুত করে তৈরি হয়, তখন তাকে বলি 'বেলুন'।

এ ত গেল হালকা জিনিসের কথা। কিন্তু বাতাসের চাইতে ভারি জিনিসও অনেক সময় আকাশে ওঠে—যেমন ঘুড়ি। চলন্ত বাতাসের কেমন একটা ধাক্কা দিবার শক্তি আছে, সে বড় বড় ভারি জিনিসকেও ঠেলে তোলে। ঘূর্ণী বায়ুর সময়ে বাতাসের জোর যখন খুব বেড়ে ওঠে তখন তার ধাক্কায় ঘরবাড়ি পর্যন্ত উড়িয়ে নেয়। ঘুড়ির সূতায় যতক্ষণ টান থাকে ততক্ষণ আপনা

হতেই বাতাসের ধাক্কায় ঘুড়িকে উপরদিকে ঠেলে রাখে, কিন্তু বাতাস যখন থেমে আসে তখন ঘুড়ির সুতো ধরে ক্রমাগত টান না দিলে সে বাতাসের ধাক্কাও পায় না, কাজেই তার উপর ভর করে উঠতেও পারে না।

ফানুষকে বাড়িয়ে যেমন প্রকাণ্ড বেলুনের সৃষ্টি হয়েছে তেমনি সাধারণ ঘুড়ির 'পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ' হচ্ছে মানুষ তোলা ধাউস ঘুড়ি। এরোপ্লেনের সৃষ্টি হবার আগে লোকে এইরকম ঘুড়িতে চড়ে নানারকম পরীক্ষা করে দেখেছে। এরকম করে শত্রুর চালচলন দেখবার জন্য নানারকম ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এর অসুবিধা এই যে বাতাসের জোর না থাকলে কিছু করবার উপায় নাই। তাছাড়া, ঘুড়ি মাত্রেই এক জায়গায় আটকা থাকে, তার পক্ষে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ান সম্ভব নয়। সুতরাং ঘুড়িই বল আর ফানুষই বল, সকলেই বাতাসের খেয়ালের অধীন।

মানুষ অনেককাল হতেই চায়, পাখির মতো আকাশে উড়তে। কেবল ফানুষে চড়ে বা ঘুড়িতে উঠে হাওয়ার ঠেলায় ভেসে বেড়িয়ে তার মন উঠে না। পাখির নকল করে বড় বড় ডানা বানিয়ে তার সাহায্যে উড়ে বেড়াবার চেষ্টা অনেকদিন হতেই চলে আসছে। হাতে পিঠে ডানা লাগিয়ে লোকে সাহস করে পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়েছে।

আর তাতে কতজনের প্রাণও গিয়েছে। লিলিয়েন্থেল প্রভৃতি যাঁরা এই বিষয়ে বেশ কৃতকার্য হয়েছিলেন তাঁরাও অতিরিক্ত সাহস করতে গিয়ে শেষে মারা পড়েন। তবু লোকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করতে ছাড়েনি। পরীক্ষার ফলে মোটের উপর এইটুকু বোঝা গেছে যে পাখির মতো ডানা ঝাপটিয়ে ওড়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, তবে বাতাস ভাল থাকলে একটু উঁচু জায়গা থেকে আরম্ভ করে অনেক দূর পর্যন্ত হাওয়ায় ভেসে যাওয়া যায়। শুধু ভেসে যাওয়া নয়, অনেক সময় ডাইনে-বাঁয়ে এদিক-ওদিক একটু-আধটু ঘোরা-ফিরাও সম্ভব হয়। এ বিষয়ে আমেরিকার দুটি ভাই—অর্ভিল ও উইলবার রাইট—সকলের চেয়ে বাহাদুরি দেখিয়েছেন। তাঁরা তাঁদের তৈরি ডানার সাহায্যে দশ বিশ মাইল পর্যন্ত অনেকবার ঘুরে এসেছেন। কিন্তু এতে করে উপর থেকে নীচে নামা বেশ সহজ বটে, কিন্তু বাতাস ঠেলে উপরে ওঠা একরকম অসম্ভব বলিলেই হয়। ঘুড়ির যখন সুতো ছিঁড়ে যায় তখন সে পাথরের মতো ধপ্ করে না পড়ে কেমন ভেসে ভেসে হেলে দুলে এগিয়ে পড়ে। নানা কৌশল খাটিয়ে নানারকম আকারের ঘুড়িকে এইভাবে বাতাসে ভাসিয়ে কত হাজাররকম পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে; এবং তার ফলে এটুকু বোঝা গেছে যে, জাহাজ যেমন করে জল কেটে এগিয়ে চলে তেমনি করে যদি বাতাস কেটে ঘুড়িকে ঠেলে নেওয়া যায়, তবে হয়ত তাকে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে চালান যেতে পারে। এই চেষ্টার ফলে যে জিনিস দাঁড়িয়েছে তারই নাম এরোপ্লেন।

এরোপ্লেনের চেহারা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার দরকার নাই, কারণ, তার ছবি তোমরা অনেক দেখেছ। কিন্তু সেটা যে একটা ঘুড়িমাত্র এ কথাটা তার পাখির মতো চেহারা দেখে সব সময়ে মনে আসে না। কিন্তু বাস্তবিক সেটা ঘুড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়। ঘুড়িকে ওড়াতে হলে যেমন সুতো ধরে টানা দরকার, এরোপ্লেনকে ঠিক তেমনি বাতাস ঠেলে কলের জোরে টানতে হয়। সুতরাং ঘুড়িতে যতরকম বদভ্যাস আর কেরামতি দেখা যায়, এরোপ্লেনেও প্রায় সেইরকম। ঘুড়ির মতো সেও বেখাপ্পা 'গোঁৎ' খেতে চায়, হঠাৎ শূন্যের মাঝে কাৎ হয়ে পড়তে চায়, আর এলোমেলো বাতাসে ঘুরপাক খেয়ে উল্টাতে চায়। এতরকম তাল সামলে তবে এরোপ্লেন চালান শিখতে হয়। ঘুড়িতে যদি বেখাপ্পা জোরে হ্যাঁচকা টান দেও তবে সে যেমন ফস্ করে ফেঁসে যেতে পারে, এরোপ্লেনও তেমনি ডানা ভেঙে ধপ্ করে পড়ে

যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। যারা এ বিষয়ে ওস্তাদ, তাদের কাছে এরোপ্লেনের এসব পাগলামি নিতান্তই সামান্য ব্যাপার। তারা ইচ্ছা করেই কত সময় এরোপ্লেনশুদ্ধ শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে তামাসা দেখায়, এরোপ্লেনকে নানারকমে গোঁৎ খাওয়ায়।

ঘুড়ি আর ফানুষে যে তফাৎ, 'এরোপ্লেন' আর 'এয়ারশিপ' বা আকাশ-জাহাজে ঠিক সেই তফাৎ। ফানুষকে অর্থাৎ বেলুনকে ইচ্ছামত এদিক-ওদিক চালাবার চেষ্টাতেই আকাশ-জাহাজের সৃষ্টি। গোল বেলুন বাতাসের উল্টোমুখে চলতে গেলে চ্যাপ্টা হয়ে যায়, তাই তাকে চমচমের মতো ছুঁচাল করে বানায়—তাহলে সে সহজেই বাতাস ফুঁড়ে এগুতে পারে। তার পিছনে হাল ও আশেপাশে মাছের ডানার মতো থাকে—তা দিয়ে জাহাজকে ইচ্ছামত ডাইনে বাঁয়ে উপর নীচে চালান যায়। আর থাকে বিদ্যুতের পাখার মতো মস্ত একটা ঘুরন্ত জিনিস, সেইটার ধাক্কায় বাতাস ঠেলে জাহাজ চলে। এরোপ্লেনেও অবশ্য ঠিক এইরকম পাখা থাকে।

এই যুদ্ধের সময়ে এরোপ্লেন আর এয়ারশিপগুলি কিরকম কাজে লেগেছে তার সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলি। এরোপ্লেনগুলা চলে ব্যস্তবাগীশের মতো ফর্‌ফর্‌ করে, তারা দিন দুপুরে যখন তখন যেখানে সেখানে উড়ে যায় আর নানারকম খবর আনে। দরকার হলে ধাঁ করে শত্রুর শিবিরে বা গোলা-বারুদের গুদামে বা অস্ত্রের কারখানায় দু-দশটা বোমা ফেলে আসে, অথবা বন্দুক দিয়ে শত্রুর এরোপ্লেন বা জাহাজ আক্রমণ করে। এসব ছোটখাট কাজে এরোপ্লেনেই সুবিধা বেশি। দশ বছর আগে বিলাতের লোকেও এরোপ্লেন জিনিসটাকে একটা আশ্চর্য তামাসার ব্যাপার মনে করত, অথচ এখন এই যুদ্ধে কত হাজার হাজার এরোপ্লেন ঘোরা-ফিরা করে—কে তার খবর রাখে?

আকাশ-জাহাজগুলা প্রকাণ্ড গম্ভীর জিনিস, একেবারে ২০/৩০ মণ বোমা নিয়ে ফেরে! তার উপর কামান বন্দুকও সঙ্গে থাকে। তারা আসে যায় অন্ধকার রাত্রে চোরের মতো—দিনের বেলা বেরুতে গেলে তাদের আর রক্ষা নাই—কারণ, অত বড় জিনিসকে গোলা মেরে ফুটো করতে কতক্ষণ? রাত দুপুরে যখন তারা ঘুমন্ত সহরের উপর বোমা ফেলতে থাকে—তখন চারদিক হতে বড় বড় 'Search light'-এর আলোর ধারা আকাশ হাতড়ে তাকে খুঁজে বেড়ায়। একবারটি তার উপর আলো ফেলতে পারলেই যত রাজ্যের কামান তার উপর তাক্‌ করতে থাকে। তারপর চারিদিক হতে এরোপ্লেনগুলা ভিমরুলের মতো ঘিরে আসে! তখন জাহাজটিকে প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়। এরকম অবস্থায় এরোপ্লেনের সর্বদাই চেষ্টা থাকে জাহাজের উপরে উঠবার জন্য। কারণ, উপর থেকে বোমা ফেলে তার পিঠ ভেঙে দেওয়াই হচ্ছে জাহাজ মারবার সব চাইতে ভাল উপায়। ফানুষ জাহাজ যত উঁচুতে যেমন তাড়াতাড়ি উঠতে পারে ঘুড়ির নৌকা তেমন পারে না; কাজেই জাহাজ কাছে আসবার আগে থেকেই এরোপ্লেন অনেকখানি উঠে থাকে—যাতে ঠিক সময়ে সে জাহাজের ঘাড়ের উপর নামতে পারে।

ক্লোরোফর্ম

আমরা মহাভারতে পড়িয়াছি, বিরাট রাজার গৃহে অজ্ঞাতবাসের শেষদিকে অর্জুন কৌরবদলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের মধ্যে তিনি সম্মোহন অস্ত্র মারিয়া শত্রুদলকে অজ্ঞান করিয়া ফেলেন। সম্মোহন অস্ত্রটা কিরূপ তাহা জানি না—কিন্তু আজকালকার ডাক্তারেরা এই বিদ্যাটি

রোগীদের উপর অনেক সময়েই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহার ফলে, রোগীকে অজ্ঞান করাইয়া তাহার হাত পা কাটিয়া ফেলা হয়, অথচ রোগী তাহার কিছুই জানিতে পারে না। ব্যাপারটি অতি সহজ! রোগীর নাকের কাছে খানিকটা ঔষধ ধরিয়া তাহাকে শুঁকিতে দেওয়া হইল—রোগী সেই মিষ্ট গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে বেহুঁশ হইয়া গেল। বাস্‌, তারপর চট্‌পট্‌ ছুরি চালাইয়া কাজ সারিয়া লইলেই হয়।

আফিং খাইলে বা অন্য নানারকম নেশা করিলে মানুষের জ্ঞান থাকে না। একবার একটা মাতাল নেশার ঘোরে খানায় পড়িয়া পা ভাঙিয়া ফেলে। ডাক্তার সেই নেশার অবস্থাতেই তাহার পায়ের উপর অস্ত্র-চিকিৎসা করেন—মাতাল তাহার কিছুমাত্র বুঝিতে পারে নাই। কোন অসুখের যন্ত্রণা যখন রোগীর পক্ষে অসহ্য হইয়া পড়ে ডাক্তারেরা তখন আফিং জাতীয় ঔষধ খাওয়াইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া রাখেন—সে ঘুমে শরীরের সমস্ত বেদনাবোধকে এমন অবশ করিয়া ফেলে যে, রোগী আর কোনরূপ যন্ত্রণা টের পায় না।

কিন্তু ঐরূপভাবে নেশা ধরাইয়া চিকিৎসা করার বিপদ অনেক। একে ত এই সকল ঔষধে শরীরের মধ্যে নানারূপ অনর্থ ঘটাইয়া থাকে, চিকিৎসা শেষ হইবার বহু পরেও ঔষধের নানারূপ উৎপাত চলিতে থাকে। তাহার উপর আবার ঔষধের অভ্যাস একবার ধরিয়া গেলে—তাহাতে রোগীকে একেবারে নেশার মতো পাইয়া বসে। তখন বিনা প্রয়োজনেও রোগী ঐসকল ঔষধের জন্য পাগল হইয়া উঠে—এবং ঔষধের দাস হইয়া সমস্ত জীবনটিকে মাটি করিয়া ফেলে।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ১১৭ বৎসর পূর্বে হাম্‌ফ্রে ডেভি নামে একজন অসাধারণ ইংরাজ পণ্ডিত এক প্রকার 'গ্যাস' লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। ইংরাজিতে ইহাকে 'Laughing Gas' অর্থাৎ হাসাইবার গ্যাস বলা হয়। এই জিনিসটিকে নিশ্বাসের সঙ্গে টানিতে গেলে ঘাড়ে মাথায় কেমন সুর্‌সুর্‌ করিতে থাকে—তাহাতে অনেকের হাসি আসে। ডেভি দেখিলেন, শুধু সুর সুর্‌ করে তাহা নয়, একটু বেশি করিয়া টানিলে মানুষ অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এইরকমভাবে একটুখানি গ্যাস শুঁকাইয়া মানুষকে মিনিটখানেক বেশ আরামে বেহুঁশ করিয়া রাখা যায়। তাহাতে খুব দুর্বল লোকেরও কোন অনিষ্ট হইতে দেখা যায় না। ডেভি বলিলেন, "এই উপায়ে বেশ সহজেই বিনা যন্ত্রণায় ছোটখাট অস্ত্র-চিকিৎসা চলিতে পারে।" দুঃখের বিষয় সে সময়কার অস্ত্র-চিকিৎসকেরা এ কথায় কান দেন নাই। চল্লিশ বৎসর পরে একজন আমেরিকান ডাক্তার এই গ্যাসের সাহায্যে বিনা যন্ত্রণায় একটি রোগীর দাঁত তুলিয়া দেখান যে, ডেভির কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়। সেই অবধি নানারূপ ছোটখাট অস্ত্র চিকিৎসায়, বিশেষত দাঁতের ডাক্তারিতে এই গ্যাসের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে।

কিন্তু সামান্য এক মিনিট সময়ের মধ্যে ত আর রীতিমত অস্ত্র-চিকিৎসা চলে না। সুতরাং অধিকাংশস্থলেই চিকিৎসার যন্ত্রণা দূর করিবার আর উপায় ছিল না। সেই সময়কার রোগীদের কাছে অস্ত্র-চিকিৎসার মতো ভয়ানক জিনিস আর কিছু ছিল কিনা সন্দেহ। যে কয়েদীর প্রাণদণ্ড হইবে সে যেমন করিয়া ফাঁসির কথা ভাবে, রোগী তেমনি করিয়া চিকিৎসার কথা ভাবিত। কবে 'অস্ত্র করা' হইবে, সেই ভাবনায় রোগী আগে হইতেই আধমরা হইয়া থাকিত। প্রায় সকল রোগীকেই ধরিয়া বাঁধিয়া জবরদস্তি করিয়া তবে ছুরি চালাইতে হইত। এইরকম যখন অবস্থা তখন আমেরিকা হইতে সংবাদ আসিল সেখানকার এক ডাক্তার 'ইথার' অর্থাৎ সুরা জাতীয় একপ্রকার ঔষধের সাহায্যে রোগীকে বহুক্ষণ নিরাপদে অজ্ঞান রাখিবার উপায় বাহির করিয়াছেন।

জেমস্‌ সিম্‌সন্‌ নামে একটি উৎসাহী চিকিৎসক সেই সময়ে এডিনবরায় চিকিৎসা করিতেছিলেন। ছাত্র অবস্থায় সেই সময়কার অস্ত্র-চিকিৎসার ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া সিম্‌সন্‌ এক

সময়ে আরেকটু হইলেই ডাক্তারি-ব্যবসায় ছাড়িয়া দিতেন। বিনা যন্ত্রণায় চিকিৎসার কথা শুনিয়া তিনিও পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সিম্‌সনের কয়েকটি বন্ধুও তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। প্রতিদিন রাত্রে কয় বন্ধু মিলিয়া যত রাজ্যের ঔষধ শুঁকিয়া শুঁকিয়া নানারূপে তাহার নিশ্বাস লইয়া দেখিতেন—ঐরকম অবসাদ আসে কিনা! এ বিষয়ে তাঁহাদের কিরূপ উৎসাহ ছিল সে সম্বন্ধে সিম্‌সনের কোন বন্ধু একটি সুন্দর গল্প লিখিয়া গিয়াছেন। ঐ বন্ধুটির বাড়িতে একটি নূতন উগ্র ঔষধ দেখিয়া সিম্‌সন্ তৎক্ষণাৎ জিনিসটা বিষাক্ত কি না তাহার বিচার না করিয়াই তাহা লইয়া পরীক্ষা করিতে উদ্যত হন। কিন্তু বন্ধুটি বাধা দিয়া আগে দুইটা খরগোসের উপর তাহা প্রয়োগ করেন। ফলে দুইটা খরগোসই মারা যায়।

যাহা হউক, অনেকদিন ধরিয়া অনেক পরীক্ষার পর সিম্‌সন্ একদিন এক শিশি ক্লোরোফর্ম আনিয়া হাজির করিলেন। সেইদিন আহারের পর দুটি বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া তিনি পরীক্ষায় বসিলেন। ক্লোরোফর্মের শিশিতে নাক গুঁজিয়া জোরে জোরে নিশ্বাস টানিতে টানিতে তিনজনেই অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। যখন সিম্‌সনের জ্ঞান হইল তিনি দেখিলেন বন্ধু দুটি তখনও মোহের ঘোরে বেহুঁশ হইয়া আছেন। তিনি উৎসাহে বলিয়া উঠলেন, "ইথারের চাইতেও চমৎকার।"

সেইদিন হইতে চিকিৎসকগণ এই সম্মোহন অস্ত্রটিকে আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাহার ফলে অস্ত্র-চিকিৎসার বিভীষিকা সাড়ে পনর আনা পরিমাণ দূর হইয়াছে। পূর্বে যে-সকল অবস্থায় ছুরি ছোঁয়াইতে না ছোঁয়াইতে রোগী যন্ত্রণায় মারা যাইত—সেরূপ সাংঘাতিক ক্ষেত্রেও এখন আর রোগীর সে ভয়ের কারণ নাই।

মরুর দেশে

'মরু' নামটিতেই বলিয়া দেয় যে দেশটি মরা। গাছপালা জীবজন্তু সেখানে বাড়িতে পায় না; মানুষ সেখানে বাস করিতে গেলে দুদিনের বেশি টিকিতে পারে না; এমনি ভয়ানক সে দেশ।

পৃথিবীর 'ম্যাপ' যদি দেখ, দেখিবে আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমে সাহারার প্রান্ত হইতে চীন সাম্রাজ্যের মাঝামাঝি পর্যন্ত বড় বড় দেশ জুড়িয়া Desert (পরিত্যক্ত দেশ) বা মরুভূমি পড়িয়া আছে। তাছাড়া পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই মানুষের আবাসের আশেপাশেই ছোট বড় ফাঁকা দেশ—সেখানে ঘর নাই বাড়ি নাই, আছে খালি বালির মাঠ আর বালির টিপি। মেরুর কাছে সাইবিরিয়া বা গ্রীনল্যান্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশেও এমন সব ফাঁকা জায়গা আছে যেখানে বছরের মধ্যে আট মাস ধরিয়া সারাটি দেশ শ্মশানের মতো পড়িয়া থাকে—কেবল বসন্তের কাছাকাছি একটু-আধটু গাছপালার চেহারা দেখা যায়।

কিন্তু বাস্তবিক 'মরুভূমি' বলিতে কেবল সেইসব দেশকেই বুঝায় যেখানে বারো মাস কেবল বালির স্তূপ ছাড়া আর কিছু দেখিবার যো নাই—যেখানে শুকনা বালি রৌদ্রে তাতিয়া সমস্ত দেশটাকে একেবারে শুকাইয়া রাখে। সারা বছর সেখানে বৃষ্টি নাই—গাছপালার মধ্যে ক্বচিৎ কোথাও একটু সুবিধা পাইয়া হয়ত দু-দশটি মনসা গাছ মাথা তুলিয়াছে। মরুভূমির ধারে কিনারায় হয়ত দু-চারিটা সাপ বিছা বা গিরগিটি মাঝে মাঝে দেখা যায়—কিন্তু যতই ভিতরে যাও ততই দেখিবে জনপ্রাণীর কোন সাড়া নাই। মাছিটা পর্যন্ত সেখানে শুকাইয়া মরে। চারিদিকে কেবল বালি, তার মাঝে জন্তুই বা বাঁচে কি খাইয়া, আর গাছই বা রস পায় কোথায়? মনসা জাতীয়

গাছগুলার পাতা মোটা, তাহাতে রস থাকে অনেক বেশি—আর তাদের ছাল পুরু, তাহাতে রসটাকে তাড়াতাড়ি শুকাইতে দেয় না। তাহারা বালির নীচে সরস মাটিতে প্রাণপণে শিকড় বসাইয়া কোনরকমে বাঁচিয়া থাকে।

মরুভূমির মধ্যে আগাগোড়াই কেবল যদি বালি থাকিত, তবে তাহার ভিতরকার সংবাদ লওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব হইত। কিন্তু বালির নীচেও ত জমি আছে—সেই জমির মধ্যে কত ঝরনা কত জলাশয় বালির চাপে পড়িয়া থাকে, মাঝে মাঝে যেখানে বালির চাপ কম অথবা জলের বেগ খুব বেশি সেখানে সমস্ত চাপ ঠেলিয়া জল একেবারে উপরে উঠিয়া আসে। জলের পরশ পাইয়া তাহার চারিদিকে খেজুর গাছ আর নানারকম লতাপাতা গজাইয়া উঠে; গাছের ছায়ায় ছায়ায় সমস্ত জায়গাটিকে ঠাণ্ডা করিয়া রাখে। দেখিলে মনে হয় যেন এক একটি তীর্থস্থান। এক একটি মরুতীর্থের ধারে ধারে ছোট ছোট গ্রাম বসিয়া যায়—মরুপথের যাত্রীরা পথ চলিতে চলিতে এই সকল জায়গায় আসিয়া বিশ্রাম করে।

বাতাস যেখানে শুকনা, সেখানকার জমি অল্পেই তাতিয়া উঠে আর তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়। সেইজন্য মরুভূমিতে যেমন গরম খুব বেশি, শীতও তেমনি প্রচণ্ড। এক সময়ে যেমন মাটিতে পা ফেলিবামাত্র ফোস্কা উঠিয়া যায়—আরেক সময় হয়ত জল জমিয়া বরফ হইয়া থাকে। দিনের বেলা যেখানে গরমে শরীর ঝলসিয়া যায় রাত্রে সেইখানেই কম্বলের উপর কম্বল চাপাইয়া তবু শীত মানিতে চায় না। এইরূপ শীত গ্রীষ্মের লড়াইয়ের মধ্যে বাতাস বড় একটা স্থির থাকিতে পারে না। যেখানেই গরম বেশি বাতাস সেখান হইতে চিমনির ধোঁয়ার মতো উপরে উঠিতে থাকে। তখন চারিদিক হইতে ঠাণ্ডা বাতাস ঝড়ের মতো ছুটিয়া আসিয়া এক তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া তোলে। মরুপথের বিপদ অনেক—চলিতে চলিতে পথ হারাইলে তৃষ্ণায় মরিতে হয়—চোরা বালির পাহাড় ধসিয়া কত মানুষ প্রাণ হারায়—শীতে জমিয়া গরমে পুড়িয়া কত সময়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। কিন্তু, যতরকম বিপদ আছে তাহার মধ্যে মানুষ সব চাইতে ভয় করে মরুভূমির ঝড়কে। সে ঝড় যে কত বড় সাংঘাতিক ব্যাপার হইতে পারে তাহা চোখে না দেখিলে কল্পনা করা যায় না। দমকা বাতাসের ঝাপ্‌টায় মরুভূমির তপ্ত বালি হু হু করিয়া ছুটিতে থাকে; বাতাসের আঁচে আর বালির ঘষায় সর্বাঙ্গে ফোস্কা পড়িয়া যায়, ধূলায় অন্ধ হইয়া দম আটকাইয়া মানুষগুলা পাগলের মতো ছুটিতে থাকে। তার উপর বাতাসের ঘূর্ণীটানে মরুভূমির বালি যখন পাক দিয়া উঠিতে থাকে তখন সেই বালুস্তম্ভের মুখে যে পড়ে তাহার আর রক্ষা নাই। বালির স্তম্ভে চাপা পড়িয়া কত বড় বড় যাত্রীদল যে মারা গিয়াছে তাহার আর হিসাব নাই।

এত বালি আসিল কোথা হইতে? সাহারা মরুভূমিতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মণ বালি ক্রমাগত উড়িয়া উড়িয়া পশ্চিমে সমুদ্রের মধ্যে গিয়া পড়িতেছে—তবু মনে হয় বালির আর শেষ নাই। সাহারার মধ্যে এবং পুবে উত্তরে আশেপাশে বেলে পাথরের পাহাড়। কোন্ কালে সে স্থানে সমুদ্র ছিল—তাহার নরম বালি জমাট বাঁধিয়া এখনও পাহাড় হইয়া সঞ্চিত আছে। বাতাসে সেই পাহাড়কে রেণু রেণু করিয়া উড়াইয়া মরুভূমির মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে—আবার মরুভূমির বালিকে সেই কোথাকার সমুদ্রের মধ্যে নিয়া ফেলিতেছে। মোটের উপর দেখা যায় যে, বালি ক্ষয় হইতে হইতে ক্রমে সমস্ত মরুভূমিটাই নীচু হইয়া আসিতেছে। এখন যেখানে মরুভূমি দেখা যায় শেষে তাহারই কত জায়গায় মানুষের থাকিবার মতো চমৎকার জমি দেখা দিবে।

মরুভূমির কথা বলিতে গেলেই উটের কথা আসিয়া পড়ে। উটের শরীরটিকে মরুভূমির উপযোগী করিয়াই গড়া হইয়াছে। চ্যাটাল চ্যাটাল পা, তার আষ্টেপৃষ্টে কড়ায় ঢাকা—ঝামা দিয়া ঘসিলেও তাহাতে ফোস্কা পড়ে না। ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই—এক পেট ঘাস খাইয়া তিন দিন

উপোস থাকে—এক ঢোক জল লইয়া সারাদিন পথ চলে। সবদিকে তার সবই ভাল—মন্দের মধ্যে কেবল তার মেজাজটি। আরবদের বিশ্বাস যে উট যদি একবার রাগ করে তবে একদিন হউক, এক বৎসর হউক, সে প্রতিহিংসা না লইয়া ছাড়িবে না। সেইজন্য কোন উটের মেজাজ বিগড়াইতে দেখিলেই তাহারা মাটির উপর নানারকম পোশাক ছড়াইয়া উটকে তাহার মধ্যে ছাড়িয়া দেয়। উট তখন ঐগুলার উপর মনের সুখে লাথি চাঁটি মারিয়া মেজাজ ঠাণ্ডা করে।

মরুর দেশের কথা বলিলাম। এখন মরু সাগরের (Dead Sea) কথা বলিয়া শেষ করি। মরু সাগরটি একটা মাঝারি গোছের হ্রদ—৫০ মাইল লম্বা, ৮/১০ মাইল চওড়া। কিন্তু তাহার মধ্যে কোথাও একটি মাছ বা কোনরকম জলের প্রাণী নাই। সমুদ্রের জলকে শুকাইয়া ঘন করিলে যেরূপ হয়, মরু সাগরের অবস্থা ঠিক সেইরূপ। জল এমন ভারি যে তাহার মধ্যে ডুবিয়া মরিবার ভয় নাই আর এমন লবণাক্ত যে জলে স্নান করিলে সর্বাঙ্গে চাপ বাঁধিয়া নুন জমিতে থাকে।

যুদ্ধের আলো

সেকালে অর্থাৎ পুরাণে যে কালের কথা বলা হয় সেই কালে লড়াইটা হত দিনের বেলায়। ভীষ্মপর্বে দশ দিন ধরে লড়াই হল; প্রতিদিনই দেখি সন্ধ্যা না হতেই শঙ্খধ্বনি করে যুদ্ধ থেমে গেল, তারপর যে যার মতো শিবিরে ফিরে গেল। এইরকম দিনের বেলা লড়াই করে রাত্রে সবাই নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করত। কিন্তু আজকালকার যুদ্ধে এরকম হবার যো নেই। এখন কি দিন কি রাত, কোন সময়েই নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব নয়। শত্রু যে কখন কোন সুযোগে ঘাড়ে এসে পড়বে, তার জন্য সর্বদা সজাগ থাকতে হয়। সৈন্যেরা যুদ্ধ থামিয়ে সবাই মিলে অস্ত্রশস্ত্র গুটিয়ে শিবিরে ফিরে গেল, এরকমটি কোন সময়েই হতে পারে না। কারণ, যুদ্ধক্ষেত্রে সব সময়েই সৈন্য হাজির রাখতে হয়।

কামানেরও বিশ্রাম নেই। রাত্রের অন্ধকারে ঝড়ে বাদলে যখন তখন সে হুংকার দিয়ে উঠছে। তার চোখে দেখবার দরকার হয় না, কেবল ম্যাপ দেখে অঙ্ক কষে হিসাব করে সে গোলা ছুঁড়ছে; দিনে রাতে কোন সময়েই শত্রুকে নিশ্চিন্ত থাকতে দেয় না। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যরা খাদ কেটে তারই মধ্যে হয়ত খোলা ময়দানে কত রাত কাটাচ্ছে। সেখানে সারারাত ধরে কড়া পাহারা বসান আছে—কোনখানে টুঁ শব্দটি হলেই তারা কান খাড়া করে শোনে। কোথাও কোন ভয়ের কারণ দেখলেই ঘণ্টা বাজিয়ে সকলকে সতর্ক করে দেয়—আর আকাশে তারাবাজি ছুটিয়ে চারদিক আলো করে দেখে, শত্রু আসছে কি না!

যেমন ডাঙায় তেমনি জলে—আবার আকাশেও তেমনি। কোথাও দিনের অপেক্ষায় কেউ বসে থাকে না। কত যুদ্ধের জাহাজ সারারাত সমুদ্রের মধ্যে হাঁ হাঁ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার 'Search light'-এর ঝক্‌ঝকে আলো খড়্গের মতো অন্ধকার কেটে চারিদিক খুঁজে বেড়াচ্ছে। সেই আলো যেখানে পড়ে সেখানে যেন একেবারে রাতকে দিন করে ফেলে। সেই আলোর মুখে যদি কোন শত্রুজাহাজ পড়ে তবে তার আর লুকোবার যো নেই। সে যেদিকে যাবে, আলো তার পিছন পিছন ঘুরবে। আর সেই আলোতে পরখ্ করে যুদ্ধজাহাজ তার উপর কামান দাগবে। তখন তার প্রাণভয়ে পালান ছাড়া আর উপায় নেই। অন্ধকার রাত্রে জার্মানদের বোমাওয়ালা 'জেপেলিন' বেলুনগুলো যখন আকাশ বেয়ে চোরের মতো আসতে থাকে তখন তার সাড়া পেলেই

অমনি বড় বড় আলোর ঝাপ্‌টা চারিদিকে ছুটে বেরোয়—আকাশ হাতড়ে খুঁজবার জন্য। যুদ্ধের সময় আলোর ব্যবহারটা যতই ভয়ানক হোক না কেন, তামাসা হিসাবে আলোটা দেখতে ভারি সুন্দর। বড় বড় দরবারী ব্যাপারের সময় দশ বিশটা জাহাজ একসঙ্গে মিলে যখন আলোর খেলা দেখাতে থাকে তখন সে এক চমৎকার দৃশ্য হয়।

কিন্তু জাঁকাল ব্যাপারের কথা যদি বল তবে রাত্রে ডাঙায় লড়াইয়ের সময় যে আলোর খেলা চলে, তার আর তুলনা হয় না। চারিদিকে হাজার হাজার কামান আর বন্দুক, তাদের মুখে মুখে লাল আগুন ঝিক্‌মিক্ করে উঠছে। থেকে থেকে রং বেরঙের তারাবাজি ছুঁড়ে নানারকম সংকেত চলছে। মনে কর, জার্মান খাদের উপর তারা ফুটছে—সাদা লাল, সাদা লাল—তার মানে 'শত্রু সৈন্য এদিকে আসছে—কামান চালাও।' খানিক পরে হয়ত দেখবে, লাল সবুজ লাল সবুজ লাল-সবুজ—জার্মানরা বলছে, 'আমরা কোণঠাসা হয়েছি—শীঘ্র উদ্ধার কর।' মাঝে মাঝে এক একটা বড় বড় 'ফানুষ তারা' আস্তে আস্তে জ্বলতে জ্বলতে চারিদিক আলো করে মাটিতে পড়ছে—সেই আলোতে লড়াই আবার জমে উঠছে। হয়ত আশেপাশে ভাঙাচোরা গ্রামগুলোতে আগুন ধরে এক একদিকে আকাশের গায়ে লাল হয়ে উঠছে। তার উপর, থেকে থেকে শত্রুদের চোখ ধাঁধিয়ে বিদ্যুতের আলোর মতো 'সার্চ লাইট' এসে পড়েছে। উপরে নীচে চারিদিকে বড় বড় গোলা ফাটছে—এক মুহূর্ত আলোর ঝিলিক্, তারপর পাহাড় প্রমাণ ধোঁয়া। আলোয় আঁধারে ছায়ায় ধোঁয়ায় মিলে কি ভীষণ তামাসা!

প্রলয়ের ভয়

পুরাণে আমরা প্রলয়ের কথা পড়েছি। কবে প্রলয় হয়েছিল, আবার কবে হবে, কেমন করে প্রলয় হয়, এইসবের নানারকম বর্ণনাও তাতে আছে। প্রলয়ের সময়ে সমস্ত সৃষ্টি যে জলে ডুবে যাবে এ কথাও বার বার করে বলা হয়েছে। আশ্চর্য এই যে, নানান দেশে নানান জাতির ইতিহাসে প্রলয়ের প্রায় একই ধরনের বর্ণনা আছে। অন্তত এ কথাটা অনেক দেশের অনেক পুরাণেই শোনা যায় যে, একবার প্রলয় হয়ে এই পৃথিবীটা ডুবে গেছিল। তাতে সমস্ত জীবজন্তু প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। পণ্ডিতেরা বলেন, এ কথাটার মধ্যে একটুখানি সত্যিকারের ইতিহাস আছে। যাঁরা ভূতত্ত্ববিদ্ অর্থাৎ যাঁরা পাথর পাহাড় ঘেঁটেঘুঁটে পৃথিবীর পুরান কথার সংবাদ নিয়ে ফেরেন তাঁরা বলেন যে, মানুষের জীবনে বড় বড় রোগের মতো পৃথিবীর জীবনেও এক একটা বড় বড় 'সংকট যুগ' দেখা গিয়েছে। যুগে যুগে বড় বড় দেশের জলবায়ুর পরিবর্তন হয়েছে, গ্রীষ্মের দেশ হিমের হাওয়ায় বরফে ঢেকে গিয়েছে, আর দুরন্ত শীতের দেশে বরফ ঠেলে সবুজ ঘাস আর বনজঙ্গল দেখা দিয়েছে। যেখানে দেশ ছিল সেখানে কত সাগর হয়েছে—আবার, কত কত সাগর ফুঁড়ে নতুন দেশ মাথা তুলেছে। আর, মাঝে মাঝে এক একটা বন্যা এসে পাহাড় ধুয়ে পৃথিবী ধুয়ে দেশকে দেশ সাফ করে দিয়েছে। এইরকম ছোট বড় কত প্রলয় এই পৃথিবীর উপর দিয়ে চলে গিয়েছে—আমরা এখনও পুরাণের মধ্যে, গল্পের মধ্যে তারই একটু আভাস পাই, আর পাহাড়ে পর্বতে পাথরের স্তরে তার নানারকম পরিচয় দেখি।

একজন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, "এই যে সূর্য, এ চিরকাল এমন থাকবে না। একদিন এরও তেজ ফুরিয়ে যাবে—এ-ও তখন নিভে যাবে।" এই কথা শুনে একজন ভীতু-গোছের ভদ্রলোক তাঁকে চিঠি লেখেন যে, "মহাশয়, আপনি যেরকম বিপদের কথা বললেন

তা শুনে আমার বড় ভয় হয়েছে। সেরকম প্রলয়টা কবে হবে, আর আমার ছেলেপিলেদের জন্য তা হলে কিরকম ব্যবস্থা করলে তারা বাঁচতে পারে—আমায় একটু জানাবেন কি?" জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত এর উত্তরে লিখলেন, "আপনার এত ব্যস্ত হবার কোন কারণ নেই—আপনার ছেলেরা যদি লাখ বছরও বেঁচে থাকে, তবু এ সূর্যকে আজ যেমন দেখছে তখনও তেমনই দেখবে—তেজ ফুরাতে আরও অনেক দেরি আছে। সুতরাং আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" লোকে বড় বড় ঝড় বৃষ্টি ভূমিকম্প আগুনের উৎপাত দেখে তা থেকে প্রলয় জিনিসটা কি রকম, তার একটা আন্দাজ করে। বাস্তবিক, ছোটখাট প্রলয় পৃথিবীর উপর দিয়ে সব সময়েই চলেছে। কিন্তু আজ যে প্রলয়ের কথা বলব সেটা কিছু সত্যিকার প্রলয় নয়—লোকে প্রলয়ের হুজুকে যে নানারকম মিথ্যা ভয়ের সৃষ্টি করে, তারই কথা।

অপরিচিত জিনিস দেখলেই তার সম্বন্ধে মানুষের ভয় বিস্ময় বা কৌতূহল জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। যে জিনিস সর্বদাই দেখতে পাই তাতে মন এমন অভ্যস্ত হয়ে যায় যে সেটাতে আর কোনরকম আশ্চর্য বোধ হয় না। মনে কর, এই সূর্য যদি প্রতিদিন না উঠে হঠাৎ এক-একদিন ঐরকম ভয়ানক আগুনের মতো মূর্তি নিয়ে হাজির হত, তাহলে অধিকাংশ লোকেই যে একটা প্রলয়কাণ্ড হবে মনে করে ভয়ে অস্থির হত তা বুঝতেই পার। চাঁদকেও যদি দু-দশ বছরে ক্বচিৎ এক-আধবার দেখা যেত তবে লোকে না জানি কত আগ্রহ করে কত আশ্চর্য হয়ে তাকে দেখত, আর না জানি সেটা আমাদের চোখে কি সুন্দর লাগত।

ধূমকেতুগুলো যদি মাঝে মাঝে এক-আধটা না এসে ঐ চন্দ্র সূর্যেরই মতো নিতান্ত সাধারণ জিনিস হত, তবে তাদের ঐ ঝাপসা ঝাঁটার মতো চেহারা দেখে ভয় পাবার কোনই কারণ থাকত না। কিন্তু তারা কিনা হঠাৎ কেমন করে খবর না দিয়ে আসে যায়, মানুষের কাছে তাই তাদের এত খাতির! পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের লোকেই ধূমকেতুকে একটা অলক্ষণ কিংবা উৎপাত বলে মনে করে। ধূমকেতু যখন আসে তখন যার যা কিছু বিপদ-আপদ সবের জন্যেই ঐ ধূমকেতুকেই লোকে দোষী করে। সে সময়ে রোগ মৃত্যু যুদ্ধ বিদ্রোহ সবই 'ঐ ধূমকেতুর জন্য'। সুতরাং ধূমকেতু এসে পৃথিবী ধ্বংস করবে, এই ভয়টা মানুষের মধ্যে থাকা কিছু আশ্চর্য নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে কত বড় বড় দুর্ঘটনাকে যে মানুষ ধূমকেতুর ঘাড়ে চাপিয়েছে তা আর বলে শেষ করা যায় না। নানা দেশের ইতিহাসে নানা সময়কার ধূমকেতুর যেরকম অদ্ভুত ভয়ংকর সব বর্ণনা পাওয়া যায় তাতেই বোঝা যায় যে লোকে তাদের কিরকম ভয়ের চোখে দেখেছে। আমরা ছেলেবেলায় একবার খবরের কাগজে গুজব শুনেছিলাম যে কোথাকার এক 'পাগলা ধূমকেতু' নাকি পৃথিবীর দিকে আসছে—আর কোন্ জ্যোতিষী নাকি গুণে বলেছেন যে সে অমুক তারিখে এই পৃথিবীকে এমন ঢুঁ লাগাবে যে তখন কেউ বাঁচে কিনা সন্দেহ। এই খবরটা নিয়ে তখন চারিদিকে খুব হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। কয়েক বৎসর আগে যখন 'হ্যালির ধূমকেতু' এসে দেখা দেয় তখন কেউ কেউ গুণে দেখেছিলেন যে ঐ ধূমকেতুর ঝাঁটার মতো লেজটা পৃথিবীর উপর এসে পড়বে। ঐ লেজের বাড়ি খেলে পৃথিবীর অবস্থাটা কি হবে তাই নিয়ে কাগজেপত্রে খানিকটা তর্কবিতর্ক হয়েছিল, কিন্তু সময় হলে দেখা গেল যে তাতে পৃথিবীর ত কিছু হলই না, বরং লেজটাই ছিঁড়ে দু টুকরো হয়ে গেল। সুতরাং ধূমকেতুর ধাক্কা লেগে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার কল্পনাটা কোন কাজের কল্পনা নয়, কারণ ধূমকেতুর লেজটা এমনই অসম্ভবরকম হালকা যে পৃথিবীর সঙ্গে গুঁতোগুঁতি করতে গেলে তারই বিপদ হবার কথা। তবে পণ্ডিতেরা বলেন যে পৃথিবীকে কোনদিন যদি কোন ধূমকেতুর মাথাটার ভিতর দিয়ে যেতে হয় তাহলে অবস্থাটা কেমন হয়, ঠিক বলা যায় না। সম্ভবত তখন খুব একটা জমকালো গোছের উল্কাবৃষ্টি হবে।

উল্কাবৃষ্টি জিনিসটা আমি কখন চোখে দেখিনি, কিন্তু তার যে বর্ণনা শুনেছি সে ভারি চমৎকার। আকাশে মাঝে মাঝে তারার মতো এক একটা কি যেন হঠাৎ ছুট দিয়ে কোথায় মিলিয়ে যায়—দেখে লোকে বলে 'তারা খস্‌ল'; কিন্তু আসলে সে তারা নয়—উল্কা। ঐরকম উল্কা যদি মাঝে মাঝে এক-আধটা না হয়ে একেবারে ঝাঁকে ঝাঁকে হাজারে হাজারে আকাশের উপর দিয়ে ছুটে যায়—তখন তাকে বলে 'উল্কাবৃষ্টি'। এর মতো জমকালো ব্যাপার অতি অল্পই আছে। আমরা আকাশে যেসব গ্রহ-নক্ষত্র দেখি তারা সবাই ভাল মানুষের মতো স্থির হয়ে থাকে, তারা ওরকম পাগলের মতো ছুটাছুটি করে না। সুতরাং হাজার হাজার উল্কাকে অমনভাবে ছুটাছুটি করতে দেখলে হঠাৎ মনে কেমন ভয় হয়—যদি দু-চারটা ঘাড়ে এসে পড়ে, তাহলে অবস্থাটা কিরকম হবে। কিন্তু আসলে তেমন ভয় পাবার কিছুই নেই। উল্কাগুলির প্রায় সমস্তই পৃথিবীতে পড়বার ঢের আগেই বাতাসের ঘষায় আপনা হতেই জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যদি না জ্বলত তবে আমরা তাদের দেখতেই পেতাম না; কারণ, একে তারা অধিকাংশেই নিতান্ত ছোট, তার উপর তাদের নিজেদের কোন আলো নেই; কেবল মরবার সময় যখন তারা আপন "বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে" জ্বলে মরে তখন তার সেই শেষ আলোতে আমরা তাদের একটুক্ষণ দেখি মাত্র। যা হোক, ভয়ের কারণ নাই বা থাকুক একেবারে হাজার হাজার উল্কা পৃথিবীর উপর ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরছে এ কথা ভাবতেও খুব আশ্চর্য লাগে! ব্যাপারটা চোখে দেখতে আরও আশ্চর্য, তাতে আর সন্দেহ কি?

আর-একটি ভয়ানক জমকালো ব্যাপারের কথা না বললে একটা মস্ত কথা বাদ থেকে যায়—সেটি হচ্ছে সূর্যের পূর্ণগ্রহণ। এ জিনিসটি যিনি একবার চোখে দেখেছেন তিনি আর কখনও ভুলতে পারেন না। যখন গ্রহণটা পূর্ণ হয়ে আসতে থাকে, চারিদিক অন্ধকারে ঘিরে ফেলে, চাঁদের প্রকাণ্ড কালো ছায়া দেখতে দেখতে চোখের সামনে পাহাড় নদী সব গ্রাস করে ছুটে আসতে থাকে—যখন বনেব পশু আর আকাশের পাখি পর্যন্ত ভয়ে কেউ স্তব্ধ হয়ে থাকে কেউ চিৎকার করে আর্তনাদ করে তখন মানুষের মনটাও যে ভয়ে বিস্ময়ে কেঁপে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কি? বিশেষত যারা অশিক্ষিত বা অসভ্য, যাদের কাছে সূর্যের এই হঠাৎ-নিভে-যাওয়ার কোনই অর্থ নেই, তারা যে তখন পাগলের মতো অস্থির হয়ে বেড়াবে, এ ত খুবই স্বাভাবিক। তারাও প্রলয় বলতে ঠিক এইরকমই একটা কিছু কল্পনা করে—এমনই একটা অদ্ভুত বিরাট গম্ভীর ব্যাপার—যার ভয়ংকর মূর্তিতে মানুষের মনকে একেবারে দমিয়ে অবশ করে দেয়।

ধূলার কথা

ঘরের দেয়াল মেঝে আসবাবপত্র যতই ঝাড়ি যতই মুছি, খানিকক্ষণ রাখিয়া দিলেই আবার দেখি, যেই ধূলা সেই ধূলা। এত ধূলা আসেই বা কোথা হইতে, আর এ ধূলার অর্থই বা কি?

টেবিলের উপর হইতে খানিকটা ধূলা সংগ্রহ করিয়া অণুবীক্ষণ দিয়া দেখ—তাহার মধ্যে চুন, সুরকি, কয়লার গুঁড়া হইতে সুতার আঁশ, পোকার ডিম, ফুলের রেণু পর্যন্ত প্রায় সবই পাওয়া যাইতে পারে। আরও সূক্ষ্মভাবে দেখিতে পারিলে কত সাংঘাতিক রোগের বীজও তাহার মধ্যে দেখা যাইবে। জানালার ফাঁক দিয়া যে আলোর রেখা ঘরের মধ্যে আসে তাহার মধ্যেও চাহিয়া দেখ, ধূলা যেন কিল্‌বিল্‌ করিতেছে। এই ধূলার মধ্যেই আমরা বাস করি চলি ফিরি, নিশ্বাস

লই। মানুষ যত দূর দেখিয়াছে, যত দূর খুঁজিয়াছে, ধূলার আর শেষ কোথাও নাই। আকাশে খুঁজিয়া দেখ; যত দূর উঠিবে, তত দূর ধূলা—যেখানে মেঘ নাই কুয়াশা নাই, বাতাস যেখানে অসম্ভবরকম পাতলা সেখানেও ধূলার অভাব নাই। সে ধূলা যে কত সূক্ষ্ম তাহা চোখে মালুম হয় না, অণুবীক্ষণের হিসাব দিয়া বুঝিতে হয়। অথচ সে ধূলাও বড় সামান্য নয়—সেই ধূলাই সারাটি আকাশকে নীল রঙে রাঙাইয়া রাখে, সেই ধূলাই উদয়াস্তের সময় সূর্যকিরণকে শুষিয়া এমন আশ্চর্য জমকালো রঙের সৃষ্টি করে। আরও দূরে যাও, পৃথিবী ছাড়িয়া যেখানে আকাশের খোলা ময়দান পড়িয়া আছে সেখানে যাও; দেখিবে, যে নিয়মে গ্রহ চন্দ্র সকলে আপন আপন পথে ঘুরিতেছে সেই একই নিয়মে অতি ক্ষুদ্র ধূলিকণাও আকাশপথে বড় বড় চক্র আঁকিয়া চলিতেছে। এই প্রকাণ্ড পৃথিবী যদি একটি ধূলিকণার মতোই হইত, তবুও সে এমনিভাবে বছরের পর বছর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিত—কে তখন তাহার খবর রাখিত?

এই পৃথিবীর উপর ধূলার যে অদ্ভুত খেলা চলিয়াছে তাহাকে ধূলার খেলা বলিয়া জানে কয়জন? যখন কণায় কণায় বৃষ্টিজল জমিয়া বর্ষাধারা নামিতে থাকে, যখন কুয়াশার ঘনঘটায় চারিদিক ঢাকিয়া ফেলে তখন নিশ্চয় জানিও এ সমস্তই ধূলার কৃপায়। ধূলা না থাকিলে বাষ্পকণা জমিয়া জল হয় না, স্বচ্ছ আকাশে মেঘ কুয়াশার জন্ম হয় না।

সুতরাং ধূলা জিনিসটাকে আমরা যতই আমাদের জিনিস বলিয়া উড়াইয়া দেই না কেন, উৎপাত মনে করিয়া তাহাকে যতই দূর করিতে চাই না কেন, আর তাহার পরিচয় লওয়াটা যতই অনাবশ্যক ভাবি না কেন, আসলে সে বড় একটা সামান্য জিনিস নয়। তোমরা হয়ত বলিবে, 'সামান্য না হউক, জিনিসটা বড় বিশ্রী ও নোংরা।' হাঁ, নোংরা বটে। যখন সে আমার সাফ কাপড় ময়লা করিয়া দেয়, আবার ঘরের মধ্যে যেখানে সেখানে জমিয়া থাকে, যেখানে তাহাকে দিয়া আমার কোন দরকার নাই সেইখানে আসিয়া পড়ে—তখন তাহাকে নোংরা বলি। কিন্তু 'ধূলা' বলিলেই যে একটা নোংরা বিশ্রী কিছু ভাবিতে হইবে, এরূপ মনে করা ঠিক নয়। প্রজাপতির পালক ঝাড়িলে যে ধূলা পড়ে তাহা চোখে দেখিতে অতি সূক্ষ্ম একটুখানি হালকা গুঁড়ার মতো দেখায়—দেখিলে কেহই তাহাকে ধূলা ছাড়া আর কিছুই বলিবে না। কিন্তু অণুবীক্ষণ দিয়া তাহাকে এমনই সুন্দর দেখায়! বাতাসে যে সকল ধূলিকণা ভাসিয়া বেড়ায় তাহার মধ্যেও কত সময়ে কত আশ্চর্যরকমের কারিকুরি দেখা যায়।

গভীর সমুদ্রের তলা হইতে পাঁক ঘাঁটিয়া বা পচা পুকুরের উপরকার ময়লা ছাঁকিয়া যে জীবন্ত ধূলি বাহির হয় তাহার মতো সুন্দর জিনিস খুব অল্পই আছে। এগুলিকে উদ্ভিদ বলিতে পার, কিন্তু উদ্ভিদ বলিতে সাধারণত যেরকম জিনিস মনে করিয়া বসি, এগুলি একেবারেই সেরূপ নয়। ইংরাজিতে ইহাদিগকে ডায়াটম্ (Diatom) বলে—আমরা এখানে তাহাকেই জীবন্ত ধূলি বলিতেছি। এই 'Diatom' কথাটি, ইহার o অক্ষরটির মধ্যে যেটুকু ধরে তাহার চাইতেও কম পরিমাণ ধূলিকে অণুবীক্ষণের সাহায্যে ফটো তুলিয়া দেখিতে পার। জলের উপর শেওলার মতো এই অদ্ভুত জিনিসগুলি কত সময়ে ভাসিতে থাকে। সাধারণ লোকে তাহাকে নোংরা ও বিশ্রী বলিয়া এড়াইয়া চলে, তাহার ভিতরে যে কি আশ্চর্য সূক্ষ্ম কাজ তাহারা সে সংবাদ রাখে না। কিন্তু যাঁহারা এ সকলের চর্চা করেন তাঁহারা যত্ন করিয়া এই ময়লা ঘাঁটিয়া এইসব উদ্ভিদ সংগ্রহ করেন ও তাহাদের চালচলন আকার-প্রকার লক্ষ করিয়া তাহাদের জীবন সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য কথা আমাদের শুনাইয়া থাকেন। ডায়াটম্‌গুলিকে পোড়াইয়া সাফ করিলেও তাহার এই জীবককঙ্কাল সহজে নষ্ট হয় না—এগুলি এমনই মজবুত! ইহাদের আসল বাহার এই কঙ্কালগুলিতেই। জীবন্ত অবস্থায় এই কঙ্কালগুলি সবুজ কোষের মধ্যে ঢাকা থাকে। ইহাদের কারিকুরিগুলা তখন অণুবীক্ষণ

দিয়াও চোখে পড়ে না।

এ পর্যন্ত অন্তত দশ হাজাররকমের ডায়াটম্ পাওয়া গিয়াছে। ছবিকে যত বড় করিবে তাহার গায়ে কারিকুরির মধ্যে ততই আরো আশ্চর্য সূক্ষ্ম কাজ দেখা যাইবে। অনুবীক্ষণে যত বড় করিয়া তাদের দেখানো হইবে, তাহার গায়ে কারিকুরির মধ্যে ততই আরো আশ্চর্য সূক্ষ্ম কাজ দেখা যাইবে।

জীবন্ত অবস্থায় এই ডায়াটম্গুলির মধ্যে আরেকটি অদ্ভুত ব্যবস্থা দেখা যায় এই যে হাত পা কিছুই নাই, অথচ তাহারা চলিয়া বেড়ায়। জলের মধ্যে এমন সুন্দর সহজভাবে তাহারা ঘুরিয়া চলে যে দেখিলে আশ্চর্য লাগে। কি করিয়া যে তাহারা চলে, তাহার কারণ ঠিক করিতে গিয়া বড় বড় পণ্ডিতদের অবধি মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে।

আকাশ আলেয়া

মানুষের বুদ্ধিতে আজ পর্যন্ত কত অসংখ্যরকমের আলোর সৃষ্টি হয়েছে। সেই কাঠেঘষা আগুন থেকে শুরু করে আজকালকার বিদ্যুতের আলো পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে তার নাম করতে গেলেও প্রকাণ্ড তালিকা হয়ে পড়ে। সেই কতরকমের তেলের প্রদীপ, কত শত চর্বি-বাতি, মোমের বাতি, কত অসংখ্য গ্যাসের আলো, বিদ্যুতের আলো, তার হিসাব রাখে কে! মানুষের তৈরি জিনিসে কাজ চলে ভালো, তাতে আর সন্দেহ নাই। রোদের আলো আর চাঁদের আলো আর প্রকৃতির নানা খেয়ালের নানারকমের আলো কেবল এই নিয়ে আজকালকার নিতান্ত অসভ্য মানুষেরও জীবন চলে না। কিন্তু তবু বলতে হয় যে, এই প্রকৃতির রাজ্যে আমরা যতরকমের আলো দেখি, মানুষের তৈরি এইসব আলো তারই অতি সামান্য নকল মাত্র। সূর্যের কথা ছেড়েই দিলাম, আকাশের মেঘে যে বিদ্যুতের আলো চমকায় তার সঙ্গে মানুষের কোন্ 'ইলেকট্রিক্ লাইটের' তুলনা হয়? সামান্য জোনাকি পোকার গায়ে যে আলো জ্বলে যাতে গরম হয় না অথচ আলো হয়, মানুষ তার নকলে 'ঠাণ্ডা আলো' জ্বালাবার জন্য কত চেষ্টা করেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত পেরে ওঠেনি। সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের কিরণ-মুকুট হতে যে অদ্ভুত আলো বেরোয়, তার গম্ভীর শোভায় পশুপাখি পর্যন্ত ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে যায়; মানুষের মাথায় সেরকম আলোর কল্পনাও আসে না।

কিন্তু এই পৃথিবীতে সব চাইতে অদ্ভুত আর সব চাইতে সুন্দর যে আলো সে হচ্ছে মেরু দেশের 'আকাশ আলেয়া' বা 'মেরুজ্যোতি'। তাকে দেখতে হলে উত্তরে কিংবা দক্ষিণে মেরুর প্রদেশে যেতে হয়। সেখানে শীতকালের রাত্রে মেরুর চারিদিকে কয়েকশত মাইল দূর পর্যন্ত আলোর অতি চমৎকার খেলা চলতে থাকে। শুধু এই আলো দেখবার জন্যই প্রতি বৎসর কত দূর দেশের কত শত যাত্রী নরওয়ের উত্তরে দুরন্ত শীতের মধ্যে বেড়াতে যায়।

চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র এদের আলো কেমন স্থির। তারাগুলো অনেক সময়ে মিট্‌মিট্ করে বটে, কিন্তু এলোমেলোভাবে কেউ নড়ে চড়ে বেড়ায় না। কিন্তু 'আকাশ আলেয়া' বাস্তবিক ঐ সুদূর আকাশের জিনিস নয়, তার জন্মস্থান এই পৃথিবীর বাতাসেরই চূড়ার উপরে। বাতাস সেখানে অসম্ভবরকম হালকা, তার উপরে সূর্যের বিদ্যুৎকিরণ পড়ে তাকে চঞ্চল করে 'আকাশ আলেয়া'র

সৃষ্টি করে—সুতরাং 'আকাশ আলেয়া'র চালচলনটাও কিছু অস্থিররকমের। কিন্তু অস্থির বলতে একেবারে বিদ্যুতের মতো দুরন্ত একটা কিছু মনে কর না। তার অস্থিরতা শ্রাবণের তুফান হাওয়ার মতো নয়, বসন্তের ঝিরঝিরে বাতাসের মতো।

'আকাশ আলেয়া'র রং রামধনুর চাইতেও সুন্দর, কারণ সেটা সত্যিকার আলোকশিখা; আলোকটা তার নিজেরই আলো—আর রামধনুর আলো সূর্যের আলোর ধার-করা ছায়া মাত্র। তাছাড়া অন্ধকার আকাশের কালো জমির উপরে রঙের খেলা যেমন খোলে, দিনের বেলায় মেঘের গায়ে তেমন করে খুলতেই পারে না। অতি সুন্দর অতি স্নিগ্ধ হালকা নীল লাল সবুজ রঙের শিখার মতো এই আলো আকাশ জুড়ে খেলা করে। কখন উপরে ওঠে, কখন নীচে নামে, কখন মিনিটে মিনিটে বহুরূপীর মতো রং বদলায়, কখন রঙিন পর্দার মতো দুলতে থাকে, কখন ঘূর্ণার পাকের মতো ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকে, কখন ধূমকেতুর ল্যাজের মতো আকাশের গায় খাড়া থাকে, আবার কখন আলগা হয়ে টুকরো হয়ে আকাশময় ছড়িয়ে পড়ে। এক-এক সময়, বিশেষত শীতের রাতে এই আলোর খেলা এমন সুন্দর হয় যে, ঘন্টার পর ঘন্টা এর তামাসা দেখেও ক্লান্তিবোধ হয় না।

এই পৃথিবীটা একটা প্রকাণ্ড চুম্বকের গোলা—সেই চুম্বকের এক মাথা উত্তরে আর এক মাথা দক্ষিণে, মেরুর কাছে। আর সূর্যটা যেন একটা প্রকাণ্ড বিদ্যুৎশক্তির কুণ্ড—তার মধ্যে থেকে নানারকম আলো আর বিদ্যুতের তেজ আকাশের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে; তার খানিকটা আমরা দেখি, আর অনেকটাই হয়ত দেখি না। পণ্ডিতেরা বলেন, এই সূর্যের বিদ্যুৎছটা আর পৃথিবীর চুম্বকশক্তি আর এই আলেয়ার আলো, এই তিনটির মধ্যে ভিতরে ভিতরে খুব একটা সম্পর্ক দেখা যায়। সূর্যটা কেবল যে পৃথিবীকে আলো দেয় আর গরম রাখে তা নয়; সে নানারকম অদৃশ্য তেজে পৃথিবীকে ভিতরে বাইরে সব সময়েই নানারকমে চঞ্চল করে রাখছে। সূর্যের গায়ে যখন ঘূর্ণির মতো দাগ দেখা যায় তখন পৃথিবীতেও চুম্বকেব দৌরাত্ম্যে দিগ্‌দর্শন যন্ত্রগুলো চঞ্চল হয়ে ওঠে—আর মেরুর আকাশে যেখানে পৃথিবীর এই চুম্বকের মাথা, সেখানে এই আলেয়ার আলো আরো দ্বিগুণ উৎসাহে নূতন বাহার দেখিয়ে খেলা করতে থাকে। এগারো বছর পর পর সূর্যের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ের এক একটা বড় বড় উৎপাত দেখা যায়—ঠিক সেই সময়েই পৃথিবীতেও চুম্বকের উপদ্রব আর আকাশ আলেয়ার বাড়াবাড়ি হয়ে থাকে।

তোমরা জান, পাম্প্‌ দিয়ে ফুটবলে বাতাস পোরা যায়—কিন্তু একরকম উল্টা 'পাম্প্‌' আছে তা দিয়ে বাতাস খালি করে ফেলে। পণ্ডিতেরা এইরকমে বোতলের মধ্যে থেকে বাতাস বের করে সেই ফাঁকা বোতলের মধ্যে বিদ্যুৎ চালিয়ে আকাশ আলেয়ার নকল করতে পেরেছেন। কিন্তু একটা বোতলের মধ্যে আলোর তামাসা আর খোলা আকাশের প্রকাণ্ড শরীরে আলোর খেয়াল-খেলা, এ দুয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ।

আষাঢ়ে জ্যোতিষ

মানুষের বিদ্যায় যেখানে কুলায় না কল্পনা সেখানের অভাব পুরাইয়া লয়। প্রাচীন কালের মানুষ যাহারা চন্দ্র সূর্য মেঘ বৃষ্টি আগুন বিদ্যুৎ দেখিয়া অবাক হইত অথচ কোন ঘটনার কারণ খুঁজিয়া পাইত না, কোন কিছুর মর্ম বুঝিত না, তাহারাও এইসব ব্যাপার সম্বন্ধে নানারকম

কল্পনা করিতে ছাড়ে নাই। সেইসব প্রাচীন কালের কল্পনা কিন্তু কত দেশের কত পুরাণে কত গল্পের আকারে এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কেমন করিয়া সৃষ্টি হইল, তাহার কতরকম কাহিনী লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে, আজও তাহা শুনিলে আমাদের কৌতূহল জাগে। নানান দেশের নানান কাহিনীর মধ্যে সত্য ঘটনা আর কল্পিত কাহিনী এমনভাবে জড়ানো আছে যে, তার কতটুকু সত্য আর কতটুকু মিথ্যা তাহা ঠিক করাই কঠিন।

এই পৃথিবীর সম্বন্ধেই কত গল্প মানুষে বানাইয়াছে। আমাদের দেশেই এক-এক পুরাণে তার এক একরকম ঘটনা। এই পৃথিবীকে শূন্যে রাখিবার জন্য বাসুকীর মাথায় তাহাকে বসান হইল, আবার তাহাতেও লোকের মন ওঠে নাই—মানুষ ক্ষীর সমুদ্রে কচ্ছপের কল্পনা করিয়া সেই কচ্ছপের পিঠে হাতি, হাতির পিঠে বাসুকী শুদ্ধ পৃথিবীকে চাপাইয়াছে। গ্রীস দেশের পুরাণে পৃথিবীটাকে পাতলা চাকতির মতো কল্পনা করা হইয়াছে। সেই অদ্ভুত চাকতি টুকরা টুকরা হইয়া সমুদ্রের মধ্যে ছড়ান রহিয়াছে—সেই সমুদ্রের আর শেষ নাই, কূল কিনারা কোথাও নাই। কোন কোন দেশে এই জগৎটাকে একটা ঢাকনি-দেওয়া সরার মতো মনে করা হইত। চন্দ্র সূর্য শুদ্ধ আকাশটা ঢাকনি আর পৃথিবীটা সরা। এই পৃথিবীর চেহারাটা বর্ণনাই কি কম পাওয়া যায়? তিন কোণা, চার কোণা, টাকার মতো, বাটির মতো, পদ্মের মতো, কতরকমের কল্পনা!

নরওয়ে দেশের পুরাণে বলে এই পৃথিবীটা একটা দৈত্যের মৃতদেহ। পৃথিবীর স্থলের ভাগ তার মাংস, এই সমুদ্রগুলি তার রক্ত, পাহাড়গুলি তার হাড় আর দাঁত আর গাছপালা সব তার গায়ের লোম আর চুলের জটা। সৃষ্টির আদিকাল হইতে অন্ধকার আর শীতের দৈত্যগুলার সঙ্গে আগুন ও আলোর দেবতাদের লড়াই লাগিয়া আছে। দৈত্যযোদ্ধা ঈমিরকে বধ করিয়া দেবতারা তার শরীরটাকে আকাশের একটা প্রকাণ্ড ফাঁকের মধ্যে গুঁজিয়া সেইখানে এই পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন। মনের মতো পৃথিবী গড়িয়া তাঁহারা দৈত্যের মাথার খুলিটা দিয়া আকাশ বানাইলেন, সেই আকাশে দৈত্যের মগজ ছিটাইয়া মেঘের সৃষ্টি হইল। তখন সকলে বলিলেন, এমন সুন্দর পৃথিবী, ইহাকে অন্ধকার রাখা চলে না, ইহার জন্য আলো চাই। তাঁহারা সমস্ত আকাশটার গায়ে আগুন ছিটাইয়া তারপর বড় বড় দুইটা আগুনের গোলা দিয়া চন্দ্র সূর্য গড়িলেন। সেই চন্দ্র সূর্যের চমৎকার রথ গড়া হইল। সল্ (সূর্য) ও মানি (চন্দ্র) দুই মহাবীর হইলেন রথের সারথি।

সমস্তই ঠিক হইল, কেবল দুইটি ভয়ানক দৈত্য নেকড়ে বাঘের চেহারা ধরিয়া কখন যে চন্দ্র সূর্যের পিছনে ছুটিতে লাগিল দেবতারা তাহাদের আটকাইতে পারিলেন না। দৈত্য দুইটার নাম স্কোল্ (ঘৃণা) ও হাটি (বিদ্বেষ)। তাহারা দেবতাদের এই কীর্তি নষ্ট করিবে বলিয়া সেই হইতে আজ পর্যন্ত পিছন পিছন ছায়ার মতো ছুটিয়া চলিতেছে। কখন এক একবার তাহারা একেবারে চন্দ্র সূর্যের ঘাড়ের উপর পড়িয়া তাহাদের গিলিবার উপক্রম করে; তখন স্বর্গে মর্ত্যে—চারিদিকে ভয়ানক কোলাহল করিয়া লোকে হায় হায় করিতে থাকে; সেই কোলাহলের ভয়ে দৈত্যেরা মুহূর্তের জন্য দমিয়া যায় আর চন্দ্র সূর্য ও সেই ফাঁকে আবার ছুটিয়া বাহির হয়। এইরকমভাবে গ্রহণের পর গ্রহণ আসে আর চন্দ্র সূর্যের প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়ে। এমন একদিন আসিবে যখন এই দৈত্য চন্দ্র সূর্যকে একেবারে গিলিয়া হজম করিয়া ফেলিবে তখন প্রলয় আসিয়া সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।

চন্দ্রের একটি ছেলে আর একটি মেয়ে, তাহাদের নাম হিউকি আর বিল্। তাহারা আগে পৃথিবীতে থাকিত। সেই সময়ে তাহাদের নিষ্ঠুর বাপ সারারাত তাহাদের দিয়া জল বহাইত।

সেইজন্য চন্দ্র তাহাদের পৃথিবী হইতে কাড়িয়া নিয়া নিজের বুকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। ঐ যে চাঁদের গায়ে কালো কালো দাগ দেখিতে পাও সেগুলি আর কিছু নয়, হিউকি ও বিল্ তাহাদের মায়ের কোলে ঘুমাইয়া আছে। ইংরাজিতে যে ছেলে ভুলানো ছড়া শুনা যায়—

Jack and Jill went up the hill to
fetch a pail of water.
জ্যাক ও জিল্ জল আনিতে পাহাড়ে উঠিল।

সেই ছড়ার জ্যাক্ ও জিল্ বাস্তবিক এই হিউকি ও বিল্। তাহাদের গল্প নরওয়ে দেশের নাবিকদের মুখে মুখে ইংলণ্ড পর্যন্ত আসিয়া এখন এইরকম দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের দেশের পুরাণেও এইরূপ গল্প আছে—সমুদ্রমন্থনে অমৃত উঠিল, দৈত্যদিগকে ফাঁকি দিয়া দেবতারা সে অমৃত বাঁটিয়া খাইলেন। রাহু দৈত্য লুকাইয়া দেবতাদের সঙ্গে বসিয়া সে অমৃতের ভাগ লইল। চন্দ্র সূর্য রাহুকে ধরিয়া ফেলিলে বিষ্ণু সুদর্শনচক্র দিয়া তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। সেই অবধি রাহুর কাটা মাথা রাগিয়া এক একবার চন্দ্র সূর্যের ঘাড়ের উপর পড়িয়া তাহাদের গিলিবার আয়োজন করে আর তাহাতেই গ্রহণ হয়।

অলংকারের কথা

সুন্দর শরীরটিকে সাজাইয়া আরও সুন্দর করিব, মানুষের এই ইচ্ছাটি পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায়। কিন্তু শরীরটি কিরকম হইলে যে ঠিক সুন্দর হয় আর কেমন করিয়া সাজাইলে যে তাহার সৌন্দর্য বাড়ে এ বিষয়ে নানা জাতির মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ দেখা যায়। আমাদের দেশে সাধারণত সুন্দর পুরুষ বা সুন্দরী মেয়ে বলিতে আমরা যা বুঝি, আফ্রিকার বাসুটো বা হটেন্টট জাতির কাছে তাহার বর্ণনা করিতে গেলে তাহারা হয়ত আমাদের নিতান্তই বেয়াকুব ঠাওরাইবে।

যে ছেলেটা একেবারে ধ্যাপ্সা মোটা, আমাদের দেশের ছেলেরা তাহাকে পাইলে প্রশংসা করা দূরে থাকুক বরং তাহাকে ক্ষেপাইয়া অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার কাছে পলিনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে যেসব অসভ্য জাতি বাস করে, তাহাদের অনেকের মধ্যে মোটা হওয়ার সখটা খুবই বেশি। বিশেষত ছেলেপিলেরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে মোটা না হয় তবে বাপ মায়ের আর দুঃখের সীমা থাকে না। ছেলেদের চাইতে আবার মেয়েদের মোটা হওয়াটা আরও বেশি দরকার। যে সহজে মোটা হয় না তাহাকে জোর করিয়া খাওয়াইবার এবং ঘরে বন্ধ রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। তাহাকে কোনরকম কাজকর্ম করিতে দেওয়া হয় না, পাছে সে খাটিয়া রোগা হইয়া পড়ে।

আফ্রিকার মূর জাতি এবং পারস্য তুরস্ক ও আমেরিকার কোন কোন জাতির পছন্দটা ঠিক ইহার উল্টা। সেখানে মেয়েরা যে যত রোগা হইতে পারে ততই তার কদর বেশি। তাহারা কত কষ্টে কত সাবধানে আহার কমাইয়া, নানারকম পথ্যাপথ্য বিচার করিয়া চলে। একটু মোটা হইবার লক্ষণ দেখা দিলে তাহাদের ভাবনা-চিন্তার আর সীমা থাকে না।

চীন দেশে পা ছোট করিবার জন্য মেয়েরা কত যন্ত্রণা সহ্য করে তাহা তোমরা বোধহয়

জান। তাহারা ছেলেবেলা থেকেই মুড়িয়া বাঁধিয়া পাগুলাকে এমন অস্বাভাবিক অকর্মণ্য ও বিকৃত করিয়া ফেলে যে দেখিলে আতঙ্ক হয়। আবার এমন জাতিও আছে যাহারা হাঁটুর নীচে তাগা আঁটিয়া পা-টাকে জন্মের মতো ফুলাইয়া দেয় আর মনে করে পায়ের চমৎকার শোভা বাড়িয়াছে!

অস্ট্রেলিয়ার কোন কোন জাতি চ্যাপ্টা নাকের ভারি ভক্ত। সে দেশের মায়েরা নাকি খোকাখুকীদের নাকের ডগাগুলি প্রতিদিন চাপিয়া চাপিয়া অল্পে অল্পে দমাইয়া দেয়। ইংরাজ ছেলেমেয়েদের নাক দেখিয়া তাহারা ভারি নাক সিঁটকায়, আর বলে যে, 'ইহাদের বাপ মায়েরা নিশ্চয় ছেলেপিলেদের নাক ধরিয়া টানাটানি করে, নইলে নাকগুলা এমন বিশ্রীরকম বাড়ে কি করিয়া!'

উত্তর আমেরিকার 'রেড ইন্ডিয়ান'দের মধ্যে চ্যাপ্টা কপালের ভারি খাতির। তাহারা ছেলেবেলায় কপালে এমনভাবে পট্টি বাঁধিয়া রাখে যে, কপালটি বনমানুষের কপালের মতো চ্যাপ্টা ও ঢালু হইয়া দাঁড়ায়।

কানটা মাথার পাশে লাগিয়া থাকিবে কি বাদুড়ের মতো আলগা হইয়া থাকিবে এ বিষয়েও মতভেদ দেখা যায়। সুতরাং দেশ বিশেষে ও জাতি বিশেষে কানের উপরেও নানারকম চাপাচাপি ঠেলাঠেলির কৌশল খাটান হয়। শরীরটিকে এইরকমে যতটা সম্ভব গড়িয়া পিটিয়া কোনরকম পছন্দসই করিতে পারিলে তারপরেও তাহাকে সাজাইবার দরকার হয়। সাজাইবার সব চাইতে সহজ উপায় তাহাতে রং মাখান। এই রং লেপিবার সখটি অনেক জাতির মধ্যেই দেখা যায় এবং তাহার রকমারিও অনেক প্রকারের। লাল হলদে সাদা এবং কালো, সাধারণত এই কয়রকম রঙেই সব কাজ চলিয়া থাকে। এই সকল রঙে সমস্ত দেহখানি চিত্র-বিচিত্র করিয়া আঁকিলে দেখিতে কেমন সুন্দর হয় বল দেখি? কেবল যে সৌন্দর্যের জন্যই রং লাগান হয় তাহা নয়, অনেক দেশে লড়াইয়ের সময় বড় বড় যোদ্ধারা নানারকম রং লাগাইয়া অদ্ভুত বিকট চেহারা করিয়া বাহির হয়। রং লাগাইবার কায়দা কানুন আবার এমন হিসাবমত যে তাহাতে জাতি, ব্যবসায়, বংশ প্রভৃতি সমস্ত পরিচয়ই দেওয়া হয়।

কিন্তু রঙের একটা মস্ত অসুবিধা এই যে জীবন্ত চামড়ার উপর তাহাকে পাকা করিয়া মাখান চলে না। স্নান করিতে গেলেই বা বৃষ্টিতে ভিজিলেই সমস্ত ধুইয়া যায়—সুতরাং যাহাদের সখ বেশি তাহারা কাঁচা রং ছাড়িয়া উল্কি আঁকিতে সুরু করিল। উল্কি আঁকা এক বিষম ব্যাপার। শরীরের মধ্যে ক্রমাগত ছুঁচ বিঁধাইয়া বিঁধাইয়া চামড়াব ভিতরে ভিতরে রং ভরিয়া তবে উল্কি আঁকিতে হয়। সৌখিন লোকেরা অল্পে অল্পে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমনকি বৎসরের পর বৎসর এইরূপে শরীরকে রীতিমত যন্ত্রণা দিয়া উল্কি রচনা করে। উল্কি আঁকার ওস্তাদ যাহারা, লোকে মোটা মোটা মাহিনা দিয়া তাহাদের কাছে উল্কি আঁকাইতে যায়। উল্কির কাজ অনেক দেশেই প্রচলিত আছে, কিন্তু এ বিষয়ে জাপানীদের মতো কারিকর আর বোধহয় কোথাও দেখা যায় না।

উল্কির অসুবিধা এই যে, গায়ের রঙটা নিতান্ত ময়লা হইলে তাহার উপর উল্কি ভাল খোলে না। সুতরাং আফ্রিকার নিগ্রো জাতিদের মধ্যে, বিশেষত কঙ্গো অঞ্চলের নিগ্রোদের মধ্যে এবং আরও অনেক দেশের কৃষ্ণবর্ণ লোকেদের মধ্যে উল্কির প্রচলন নাই। তাহাদের মধ্যে উল্কির বদলে একরকম ঘা-মরা দাগের ব্যবহার দেখা যায়, সে জিনিসটা উল্কির চাইতেও সাংঘাতিক। প্রথমত শরীরে অস্ত্র খোঁচাইয়া বড় বড় ঘা বানাইতে হয়, তারপর নানারকম উপায়ে সেই তাজা ঘাগুলিকে অনেকদিন পর্যন্ত জিয়াইয়া রাখিতে হয়। এতরকম কাণ্ড-কৌশলের

পর শেষে ঘা যখন শুকাইয়া উঠে তখন উঁচু উঁচু দাগের মতো তাহার চিহ্ন থাকিয়া যায়। কেবল সৌন্দর্যের খাতিরেই স্ত্রী-পুরুষ সকলে সখ করিয়া এত যন্ত্রণা সহ্য করে! শুনিয়াছি, ইউরোপ ও আমেরিকার কোন কোন সৌখিন মেমসাহেব দাঁতের মধ্যে ফুটা করিয়া তাহাতে হীরা মুক্তা বসাইয়া অলংকারের চূড়ান্ত করিয়া থাকেন।

বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে, অলংকারের সখটা মানুষের এক অদ্ভুত খেয়াল বলিয়া মনে হয়। রসায়নশাস্ত্রে বলে হীরা আর কয়লা, এই দুইটা আসলে একই জিনিস। যে মুক্তার এত আদর সেই মুক্তাও একটা পোকার রস ছাড়া আর কিছুই নয়। সভ্য দেশে সোনা রূপা দিয়া অলংকার গড়ে, কিন্তু অনেক দেশে তামা, লোহা, দস্তা, সীসা পর্যন্ত অলংকার হিসাবে চলিয়া যায়। প্রবাল, নুড়ি, শঙ্খ, কড়ি, হাতির দাঁত, হাঙরের দাঁত, মানুষের হাড়, পাখির পালক, সমুদ্রের শ্যাওলা, কাঁচের পুঁথি, ছেঁড়া ন্যাকড়া, ফলের বীচি, ফুল, পাতা, কাঠ—এমনকি জোনাকি পোকা বা জীবন্ত পাখি ও কচ্ছপ পর্যন্ত দেশ হিসাবে অলংকার বলিয়া আদর পাইয়া থাকে! কিন্তু যতরকম আশ্চর্য অলংকারের কথা শুনিয়াছি তাহার মধ্যে যেটি আমার কাছে সব চাইতে অদ্ভুত ঠেকিয়াছে সেটি হইতেছে টেলিগ্রাফের তার। প্রথম যখন পূর্ব আফ্রিকার নিগ্রো জাতিরা টেলিগ্রাফের নূতন পুরাতন তারগুলি খুব কিনিত তখন তাহার কারণ বুঝা যায় নাই। পরে দেখা গেল, ঐ তারগুলিকে তাহারা মজবুত করিয়া হাতে বা পায়ে প্যাঁচাইয়া সদর্পে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মেয়েদের মধ্যে যাহারা নিতান্ত সৌখিন তাহারা হাত পা ও গলা একেবারে তারে ঢাকিয়া ফেলে। কেহ কেহ এমন মজবুত করিয়া তার বাঁধে যে গায়ের চামড়ায় একেবারে স্ক্রুর মতো দাগ বসিয়া যায়। বর্মাতে কোন কোন জায়গায় মেয়েরা গলায় এমন করিয়া তার জড়ায় যে তাহাতে গলা অস্বাভাবিকরকম লম্বা হইয়া পড়ে।

গলার অলংকারের কথা বলিতে গেলে কঙ্গো প্রদেশের আর এক জাতির কথা মনে পড়ে। তাহাদের মেয়েরা গলায় গোল যাঁতার মতো পিতলের হাঁসুলি পরে, সেগুলি যত বড় আর যত ভারি হয় ততই লোকে বেশি করিয়া বাহবা দেয়। তাহার এক একটা প্রায় আধমণ পর্যন্ত ভারি হইতে দেখা গিয়াছে।

এরপর নাক কানের কথা আর বেশি কি বলিব। আমাদের দেশেই এক-এক সময় নথ বা মাকড়ির যে রকম উৎকট চেহারা হয় তাহা দেখিয়া বিদেশী কেহ যদি হাসে, তবে সেটা কি খুব অন্যায় হয়? নাকের গহনার একটা অদ্ভুত ছবি দেখিয়াছি, তাহাতে একটি মেয়ের নাক ফুটা করিয়া কতগুলা মোটা মোটা কাঠি বসান হইয়াছে। কাঠিগুলা শিকারী বিড়ালের গোঁফের মতো মুখের দুই দিকে বাহির হইয়া রহিয়াছে।

নাক কান ফুটা করিয়া গহনা পরা এ দেশে সকলেই দেখিয়াছ কিন্তু ঠোঁট বা গাল ফুঁড়িয়া অলংকার বসান কোথাও দেখিয়াছ কি? দক্ষিণ আমেরিকার বামন জাতির মধ্যে উপরের ঠোঁটে আংটি গাঁথিবার প্রথা চলিত আছে। গ্রীনল্যাণ্ডের এস্কিমো জাতির মধ্যে এবং উত্তর আমেরিকার কোন কোন স্থানে তলার ঠোঁট চিরিয়া তাহার মধ্যে কাঠের চাকতি গুঁজিয়া রাখা হয়। আফ্রিকার কোন কোন স্থানে ঠোঁট বা গাল ফুটা করিয়া তাহাতে হাতির দাঁতের ছিপি বসাইবার দস্তুর আছে। সৌন্দর্যের জন্য লোকে এত কষ্টও সহ্য করে!

এখন চুলের কথা বলিয়া শেষ করি। নানা ফ্যাশানের চুল ছাঁটা, টেরিকাটা, বাব্‌ড়ি রাখা, ঝুঁটি বাঁধা, এসব ত আমরা সর্বদাই দেখি। কিন্তু কোন মেয়ে যদি মাথায় আঠা লেপিয়া, চুলগুলিকে দড়ির ছড়ের মতো ঝুলাইয়া তাহার উপর লাল রং মাখাইয়া আসে, তবে সেটা কেমন দেখাইবে? কিংবা যদি মাথায় চুনকাম করিয়া চুলগুলাকে একেবারে ইঁটের মতো চাকা বাঁধিয়া রাখে, তাহা

হইলেই বা কেমন হয়? আফ্রিকা দেশে অনেক জায়গায় এরকম জিনিস অহরহই দেখিতে পাওয়া যায়।

গাছের ডাকাতি

ধীর শান্ত ক্ষমাশীল লোকের কথা বলতে হলে আমাদের দেশে গাছের সঙ্গে তার তুলনা দেওয়া হয়—'তরোরিব সহিষ্ণুণা'। গাছের মহত্ত্বের কথা ছেলেবেলায় কত যে পড়েছি এখনও তার কিছু কিছু মনে পড়ে। 'ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাচ্ছায়াং নোপসংহরতি দ্রুমঃ'—যে লোক পাশে বসে গাছের ডাল কাটছে তার কাছ থেকেও গাছ তার ছায়াটুকু সরিয়ে নেয় না। আরও শুনেছি, 'কঠিন অপ্রিয় বাক্য করিলে শ্রবণ, রক্তজবা রাগ ধরে মনুজ লোচন। ইহাদের শিরোপরে লোষ্ট্র নিক্ষেপণে, সুফল প্রদান করে বিনম্র বদনে'। এমন যে শান্ত নিরীহ গাছ সে-ও নাকি আবার অত্যাচার করে! নানারকম কৌশল করে, বিষ ঢেলে, ফাঁদ পেতে, হুল ফুটিয়ে, সঙ্গিন চালিয়ে, গোলা মেরে, সাঁড়াশি বিঁধিয়ে কত উপায়ে যে তারা দৌরাত্ম্য করে তা শুনলে পরে তোমরা বলবে 'গাছের পেটে এত বিদ্যে'!

এর আগে শিকারী গাছের কথা বলেছি। তাতে গাছেরা কেমন করে আশ্চর্য রকম ফাঁদ পেতে পোকামাকড় ধরে খায়, তার গল্প দেওয়া হয়েছিল। তারা নানারকম লোভ দেখিয়ে, রঙের ছটায় মন ভুলিয়ে পোকাদের সব ডেকে আনে; কিন্তু যারা আসে তারা আর ফিরে যায় না। মধু খেতে খেতে কখন যে তারা ফাঁদের মধ্যে গিয়ে পড়ে সেটা তাদের খেয়ালই থাকে না; কখন হঠাৎ টপ্ করে ফাঁদের মুখ বুজে যায়, কিংবা গাছের আঠাল রসে তাদের পা আটকিয়ে যায়, কিংবা ফাঁদের মধ্যে পিছল পথে উঠতে গিয়ে আর উঠতে পারে না তখন বেচারাদের ছট্‌ফটানি সার। এরা মাংসাশী গাছ, পোকামাকড় খেয়ে এরা বেঁচে থাকে তাই প্রাণের দায়ে একটু-আধটু হিংসাবৃত্তি না করলে এদের চলবে কেন?

খোঁজ করলে দেখা যায়, অনেক সময় গাছে গাছেও লড়াই চলে। অল্পে অল্পে দিনের পর দিন নিঃশব্দে সে লড়াই চলতে থাকে। এক জায়গায় দশ বিশটা গাছ থাকলেই তাদের মধ্যে কিছু না কিছু রেষারেষি বেধে যায়। সকলেই চায় প্রাণ ভরে আলো আর বাতাস পেতে—সুতরাং যারা প্রবল তারা গায়ের জোরে সকলকে ঠেলেঠুলে বেড়ে ওঠে আর দুর্বল বেচারিরা আড়ালে অন্ধকারে শুকিয়ে মরে।

এক-একরকম গাছ থাকে তাদের কেমন অভ্যাস, তারা অন্য গাছের গায়ে পড়ে পাক দিয়ে উঠে তারপর তাদের চিপ্‌সে মারে। এক-এক সময় দেখা যায়, একটা গাছ সিন্ধবাদের বুড়োর মতো আর একটা গাছের ঘাড়ে চেপে রয়েছে। গাছের অন্য বিদ্যা যেমনই থাক, সে ত হনুমানের মতো লাফাতে পারে না, তাহলে সে অন্যের ঘাড়ে চড়ল কি করে? চড়তে হয়নি, ঐ ঘাড়ের উপরেই তার জন্ম হয়েছে। ঐখানে কবে কোন্ পাখি এসে ফলের বীজ ফেলে গেছে, সুবিধা পেয়ে সেই বীজ এখন ডালপালা মেলে, মাটি পর্যন্ত শিকড় ঝুলিয়ে প্রকাণ্ড গাছ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে নীচের গাছটার খুবই আপত্তি থাকবার কথা, কিন্তু আপত্তি থাকলেই বা শোনে কে? যেখানে সেখানে জন্ম নিয়ে বেড়ে ওঠায় এক একটি গাছের বেশ বাহাদুরি দেখা যায়। আমাদের দেশের অশ্বত্থ গাছ এ বিষয়ে একেবারে পাকা ওস্তাদ। ছাদে দালানে পোড়ো মন্দিরে অন্য গাছের ঘাড়ে,

কারখানার চিমনির চূড়ায়, যেখানে তাকে সুযোগ দেবে সেখানেই সে মাথা বাঁচিয়ে বেড়ে উঠবে। বটগাছের জন্মও অনেক সময়ে অন্য গাছের ঘাড়ের উপর হয়—সেইখানে বাড়তে বাড়তে সে যখন বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয় তখন নীচের গাছটিকে সে অল্পে অল্পে ফাঁস দিয়ে চেপে মারে। এইরকম করে সে বড় বড় তালগাছকেও কাবু করে ফেলতে পারে।

আর একদল গাছ আছে তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সব সময় তৈরি থাকে, পাছে কেউ তাদের অনিষ্ট করে। শুকনা বালির দেশে মনসা গাছের বাড়তি খুব বেশি। মনসা গাছের পুরু ছাল, তার মধ্যে জলভরা নরম শাঁস, তাতে ক্ষুধাও মেটে তৃষ্ণাও দূর হয়। কিন্তু মনসা গাছের গা-ভরা কাঁটা, জানোয়ারের সাধ্য কি তার কাছে ঘেঁষে। গরু ছাগলে কত সময়ে ক্ষুধার তাড়ায় কাঁটার কথা ভুলে গিয়ে মনসা গাছে মুখ দিতে গিয়ে নাকে মুখে কাঁটার খোঁচা খেয়ে রক্তাক্ত হয়ে পালিয়ে আসে। মনসা জাতীয় গাছ নানারকমের হয়; কোনটা ছোটখাট, তার পুরু পুরু চ্যাটাল পাতা, কোনটার পাতা নেই একেবারে থামের মতো খাড়া, কোনটার চেহারা ঝোপের মতো, কোনটা ভুট্টার মতো, কোনটা চল্লিশ হাত লম্বা কোনটা বড় জোর এক হাত কি দেড় হাত। কিন্তু এক বিষয়ে সবাই সমান, সকলের গায়ে সজারুর মতো কাঁটা। কোনটার কদমফুলের মতো সুন্দর চেহারা, দেখে হাত দিতে ইচ্ছে হয়—কিন্তু একটিবার হাত দিলেই বুঝবে কেমন মজা।

এই গাছগুলির কাঁটা এক-এক সময়ে এমন সরু হয় যে, হঠাৎ দেখলে বোঝা যায় না—কিন্তু ধরতে গেলে একেবারে ঝাঁকে ঝাঁকে কাঁটা চামড়ার মধ্যে ফুটে যায়। কাঁটাওয়ালা গাছ নানারকমের আছে, তার মধ্যে কোন কোনটি শুধু কাঁটাতেই সন্তুষ্ট নয়, তারা কাঁটার মধ্যে বিষ ভরে রাখে। তাতে কাঁটার খোঁচা আর বিষের জ্বালা দুটোই বেশ একসঙ্গে টের পাওয়া যায়। আবার দু-একটার কাঁটা নিতান্তই সামান্য—সরু শুঁয়ার মতো কিন্তু তাদের বিষ বড় তেজাল। বিছুটির পাতা অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে মনে হয় যেন অসংখ্য হুল উঁচিয়ে আছে—তাতে হাত দিবা মাত্র তার আগাটুকু ভেঙে গিয়ে ভিতর থেকে বিষাক্ত রস বেরিয়ে আসে। এক-এক জাতীয় বিছুটি আছে—তাদের বিষে অসহ্যরকম যন্ত্রণা হয় এবং সপ্তাহ ভরে তার জের চলে। এক সাহেব একবার এইরকম এক বিছুটি ঘাঁটতে গিয়ে তারপর নয় দিন শয্যাগত ছিলেন। তিনি বলেছেন যে বিছুটি লাগবার পর সারাদিন তাঁর মনে হত যেন তপ্ত লোহা দিয়ে কে তার হাড়ের মধ্যে ঘা মারছে।

'ওল খেয়ো না ধরবে গলা'—এ কথা আমিও জানি তোমরাও জান; কিন্তু জঙ্গলের ধারে যখন বুনো ওলের নধর সবুজ পাতাগুলো ছড়িয়ে থাকে, তা খেলে যে গলা ধরবে এ কথা গরু ছাগলে কি করে জানবে? এইসব পাতার মধ্যে ছুঁচের চাইতেও সরু অতি সূক্ষ্ম দানা থাকে, সেইগুলি গলায় জিভে ফুটে মুখের অবস্থা সাংঘাতিক করে তোলে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপে একরকম বেত পাওয়া যায় তার পাতা খেলে গলা ফুলে কথা ত বন্ধ হয়ই, অনেক সময় দম বন্ধ হয়ে যেতে চায়। শুনা যায়, সেখানকার নিষ্ঠুর দাসব্যবসায়ীরা এই পাতা খাইয়ে ক্রীতদাসদের শাসন করত। এই বেতের নাম বা Dumb Cane বা 'বোবা বেত'।

আত্মরক্ষার জন্যেই অধিকাংশ গাছে নানারকমের ফন্দি-ফিকিরের আশ্রয় নেয়। কিন্তু কেবল নিজেকে বাঁচিয়েই সকলে সন্তুষ্ট নয়, বংশরক্ষার জন্যেও তাদের যেসব উপায় খাটাতে হয় সেগুলিও এক-এক সময় কম সাংঘাতিক নয়। অনেক গাছের ফল বা বীজ দেখা যায় যেন কাঁটায় ভরা। এইরকম কাঁটাওয়ালা নখওয়ালা ফল সহজেই নানা জানোয়ারের গায়ের চামড়ায় লেগে এক জায়গায় ফল আর এক জায়গায় গিয়ে পড়ে। তাতে জানোয়ারের অসুবিধা খুবই হতে পারে—কিন্তু গাছের বংশ বিস্তারের খুব সুবিধা হয়। এক একটা ফলের কাঁটার সাজ অনাবশ্যকরকমের

সাংঘাতিক বলে মনে হয়। দক্ষিণ আমেরিকায় একরকম ফল হয় সে ফল মানুষে খায় না, তার গুণের মধ্যে তার প্রকাণ্ড দুইটি বঁড়শির মতো শিং আছে, তার একটি কোন জন্তুর গায়ে বিঁধলে তার সাধ্য কি যে ছাড়িয়ে ফেলে। অনেক সময় দেখা গিয়েছে, এই ফলের কামড় ছাড়াতে গিয়ে গরু ছাগল বা হরিণের মুখের মধ্যে বঁড়শি আটকে গিয়েছে। পোষা জন্তু হলে মানুষের সাহায্যে সে উদ্ধার পেয়ে যায়, কিন্তু বনের জন্তু নিরুপায়। তারা কেবল অস্থির হয়ে পাগলের মতো ছুটে বেড়ায়—তাতে আধ-খোলা ফলের ভিতরকার বিচিগুলো চারিদিকে ছিটিয়ে পড়বার সুযোগ পায়, কিন্তু নিরীহ জন্তুর প্রাণটি যায়। এই ফলকে সে দেশের লোকে 'শয়তানের শিং' বলে।

এর চাইতেও ভয়ানক হচ্ছে আফ্রিকার সিংহ-মারা ফল। আঁকড়শির মতো চেহারা, তার চারিদিকে 'বাঘনখা' ফলের মতো বড় বড় নখ। নখের গায়ে ভীষণরকম কাঁটা, তাদের এক-এক মুখ এক-এক দিকে—একটাকে ছাড়াতে গেলে আর একটা বেশি করে বিঁধে যায়। প্রতি বছর সে দেশে হাজার হাজার হরিণ, ভেড়া আর ছাগল এইভাবে জখম হয়। যেখানে নখ বসে সেখানে ঘা হয়ে পচে ওঠে, তাতে ফল যদি খসে যায় তাহলে কতক রক্ষা; না হলে শেষটায় প্রাণ নিয়ে টানাটানি। স্বয়ং পশুরাজ সিংহও যে এর হাত থেকে সকল সময়ে নিস্তার পেয়ে থাকেন তা নয়। এর জন্যে সিংহের প্রাণ দিতে হয়েছে এমনও দেখা গিয়েছে।

আর এক রকম গাছ আছে, তাদের ফল পাকলে ফেটে যায় আর ভিতরের বিচিগুলো সব ছিটিয়ে পড়ে। কোন কোন গাছে এই বীজ ছড়ান কাজটি বেশ একটু জোরের সঙ্গে হয়। এক বাঁদরের গল্প শুনেছি, সে খুব বাহাদুরি করে গিলার গাছে বসে বসে মুখ ভ্যাংচাচ্ছিল। গিলার ফল হয় বড় বড় সিমের মতো—সেগুলো পেকে পটকার মতো আওয়াজ করে ফেটে যায় আর চারিদিকে গিলা ছিটায়; বাঁদর ত সে খবর রাখে না, সে আরাম করে ল্যাজ ঝুলিয়ে বসে খুব একটা উৎকটরকম দুষ্টুমির ফন্দি আঁটছে; এমন সময় ফট্ করে গিলা ফেটে তার কানের কাছে চাঁটি মেরে গেল। বাঁদরটা হঠাৎ হাত পা ছেড়ে পড়তে পড়তে সামলে গেল—তারপর দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ফিরে দেখে কেউ নেই। এরকম অদ্ভুত কাণ্ড দেখে তার ভয় হল, না কি হল, তা জানি না—কিন্তু সে এক লাফে সেই যে পালাল, একেবারে বিশ ত্রিশটা গাছ না ডিঙিয়ে আর থামল না। দক্ষিণ আমেরিকায় একরকম ফল আছে, সে এই বিদ্যাতে গিলার চাইতেও ওস্তাদ। তার ফলগুলো ফাটবার সময় বন্দুকের মতো আওয়াজ করে আর তার ভিতরকার বিচিগুলো এমন জোরে ছুটে যায় যে ভালো করে তার চোট লাগলে মানুষ পর্যন্ত জখম হতে পারে।

ছেলেবেলায় একরকম গাছের গল্প পড়েছিলাম, তারা নাকি মানুষ ধরে টেনে খায়। কিন্তু আজকাল পণ্ডিতেরা এ কথা বিশ্বাস করেন না—কারণ, অনেক খোঁজ করেও সে গাছের কোনরকম প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যে গাছ পোকামাকড় খায়, সে সুযোগ পেলে পাখিটা বা ইঁদুরটা পর্যন্ত হজম করতে পারে। কিন্তু সে যদি মানুষ পর্যন্ত খেতে আরম্ভ করে তাহলে ত আর রক্ষা নেই।

কয়লার কথা

আমি এক টুকরো কয়লা। রাস্তার ধারে পড়ে আছি, কেউ আমার খবর নেয় না। একটি ছোট্ট ছেলে তার মার সঙ্গে যেতে যেতে খপ্ করে আমায় কুড়িয়ে নিল। দেখে মা বললেন, "আরে, ছি ছি—নোংরা! ওটা ফেলে দাও।" ছেলেটা অমনি আমায় তাচ্ছিল্য করে ফেলে গেল।

দেখে রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলতে লাগল। হায়রে! আমার যদি কথা কইবার শক্তি থাকত, একবার আচ্ছা করে শুনিয়ে দিতাম।

কি শোনাতাম? কেন, আমার বয়সের কথা, আমার বংশের কথা, আমার গুণের কথা। সে কথা এখন কি আর তোমরা বিশ্বাস করবে?

হাজার হাজার বছর আগে যখন তোমরা কেউ ছিলে না, তোমাদের মতো দু-পেয়ে জন্তুরা যখন পৃথিবীর উপর সর্দারী করতে শেখেনি, আমি তখন ছিলাম ভীষণ বড় জঙ্গলের প্রকাণ্ড গাছের মধ্যে। তোমরা যাকে বল 'বনস্পতি' আমি ছিলাম সেইরকম জাঁকাল গাছের জ্যান্ত ডাল। কত যুগের পর যুগ আমরা সেখানে ছায়া দিয়েছি, কত অদ্ভুত পাখি আমার উপর বসে বিশ্রাম করেছে, কত বিদ্‌ঘুটে জন্তু সেই গাছের আশেপাশে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু অমন যে বিরাট জঙ্গল সেও কি চিরকাল টিকতে পারে? এমন দিন এল, যখন আর সে জঙ্গলের চিহ্নমাত্র রইল না। যেখানে জঙ্গল ছিল সেখানে ছাই ভস্ম ধূলা বালির চাপের নীচে, ভিজা মাটি আর বৃষ্টির জলে মরা কাঠ পচতে লাগল। কত পথ-হারান নদীর স্রোত কত কাদামাটি জঞ্জাল এনে তার উপরে ফেলে গেল; কত ভূমিকম্পে কত আগুনের উৎপাতে সেই জমি কতবার ধসে পড়ল, কতবার ফেঁপে উঠল; কত পাহাড়-গলা পাথর এসে কত নতুন জমি তৈরি হল, তার উপরে নতুন মাঠ, নতুন বন, নতুন প্রাণীর খেলা চলল। আমরা যুগ যুগ ধরে তারই তলায় পচতে পচতে চাপে আর গরমে পাথর হয়ে জমে উঠলাম। এমনি যে কত হাজার বছর ছিলাম, তার কি আর হিসাব রেখেছি? সেখানে মাটির নীচে কবরের মধ্যে বাইরের কোন খবর পৌঁছায় না— বাইরের কেউ তার খবর জানে না।

তারপর একদিন শুনলাম কিসের শব্দ—কে যেন কি ঠুকছে। দিনের পর দিন রোজই ঠুকছে— খটাখট্ ঠকাঠক্ খটাং খটাং। ডাইনে বাঁয়ে চারিদিকে সেই একই শব্দ। শব্দ কাছে আসতে আসতে একদিন একেবারে আমারই সামনে এসে পড়ল—দেখলাম, তোমাদেরই মতো কতগুলো অদ্ভুত দু-পেয়ে জন্তু আমাদের সব ঠুকে ঠুকে কেটে নিচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম আমাদের কাজ বুঝি ফুরিয়েছে—এখন থেকে চিরটা কাল বুঝি এমনিভাবেই কাটাতে হবে। কিন্তু দেখলাম, তা নয়। আমাদের নেবার জন্যই এরা খেটেখুটে রাস্তা কেটে নেমে এসেছে।

তারপর বাইরে এসে দেখলাম, পৃথিবী আর সে পৃথিবী নাই। সেসব গাছপালা নাই, সেসব জীবজন্তু নাই—যেদিকে তাকাই কেবল দেখি এই দু-পেয়ে জন্তুর আশ্চর্য সব কাণ্ডকারখানা। তুমি ছোক্‌রা, বড় যে আমায় তাচ্ছিল্য করে কথা কইছ, তুমি জান আমার খাতির কত? আমারই এই কালো রূপকে রাঙিয়ে নিয়ে তোমার ঘরের আগুন জ্বলে, আমার গুণেই রেল চলে, স্টিমার চলে, কলকারখানা সবই চলে। এই কলকাতার রাস্তায় গ্যাসের বাতি, বলি, এ গ্যাস আসে কোথা হতে? কয়লা চুঁয়ে জ্বালানি গ্যাস হয়—আর হয় এমোনিয়া আর তেল-কয়লা—যাকে তোমরা বল Coalter।

শুধু কি তাই? ঐ এমোনিয়া দিয়ে কত যে কাজ হয়, প্রতি বছর কত হাজার মণ গাছের সার তৈরি হয় তোমরা কি তার খবর রাখ? তারপর ঐ যে আলকাতরার মতো চট্‌চটে কালো নোংরা জিনিস, যাকে তেল-কয়লা বললাম—তা থেকে রাসায়নিক পণ্ডিতেরা কত যে আশ্চর্য জিনিস বানিয়েছেন, তাদের নাম করতে গেলেও প্রকাণ্ড পুঁথি হয়ে যায়। কত আশ্চর্য সুন্দর রং, ছবির রং, কাপড়ের রং, কালীর রং; কত নতুন নতুন সুগন্ধ, এসেন্সে ফুলের গন্ধ, সিরাপে ফলের গন্ধ; কত ডাক্তারি ওষুধপত্র—পোকা মারবার, রোগের বীজ মারবার কত অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র; কত

নূতন নূতন যুদ্ধ সামগ্রী, কত বোমার মশলা, কত বারুদের মশলা; আর ছোটবড় কত যে নকল জিনিস তার আর অন্তই নাই। এ সবই সম্ভব হচ্ছে কেবল আমার জন্যই, অথচ তোমরা ত আমায় খাতির করবে না—কারণ, আমি যে কয়লা, আমি যে নোংরা ময়লা কালো রাস্তার কয়লা।

জাহাজ ডুবি

সমুদ্রে চলিতে চলিতে প্রতি বৎসরই কত জাহাজ ডুবিয়া মরে। কেহ মরে ঝড় তুফানে, কেহ মরে ঢেউয়ের ঝাপ্‌টায়, কেহ মরে পাহাড়ের গুঁতায়, আর কেহ মরে অন্য জাহাজের ধাক্কা লাগিয়া—যুদ্ধের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। এইরকম কত উপায়ে জাহাজ মরিতেছে তাহার ঠিকানাই নাই। এইসকল জাহাজের মধ্যে কত সময় কত লাখ লাখ টাকার জিনিস থাকে, সেগুলি সমুদ্রের তলায় পড়িয়া নষ্ট হইবে—ইহা কি মানুষের সহ্য হয়? বিলাতে বড় বড় ব্যবসাদার কোম্পানি আছে, তাহারা ডোবা-জাহাজ হইতে মাল উদ্ধার করে। এই কাজকে Salvage বলে। ইহাতে তাহারা এক-একসময় অনেক টাকা লাভ করিয়া থাকে। গভীর সমুদ্রে জাহাজ ডুবিলে তাহাকে আর বাঁচাইবার উপায় থাকে না; কিন্তু জল যদি খুব বেশি না হয় তবে অনেক সময় একেবারে জাহাজকে-জাহাজ উঠাইয়া ফেলা যায়।

জাহাজ উঠাইবার নানারকম উপায় আছে। এক উপায়, তাহার সঙ্গে বাতাসপোরা বড় বড় বাক্স বাঁধিয়া তাহাকে হালকা করিয়া ভাসাইয়া তোলা। আর এক উপায়, তাহার চারিদিকে দেয়াল ঘিরিয়া সেই দেয়ালের ভিতরকার সমুদ্রকে 'পাম্প্‌' দিয়া শুকাইয়া ফেলা। রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় জাপানীরা যখন পোর্ট আর্থার দখল করে তখন সেখানকার বন্দরে রুশেরা কতগুলা জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছিল। জাপানীরা দেয়াল তুলিয়া সমস্ত বন্দরের মুখ আঁটিয়া দেয়; তারপর বড় বড় কল দিয়া বন্দরের জল সেঁচিয়া ফেলিতেই জাহাজগুলা বাহির হইয়া পড়িল। জাপানীরা সেই জাহাজ আবার মেরামত করাইয়া কাজে লাগাইয়াছে।

একবার স্পেন হইতে কিছু দূরে একটি জাহাজ জখম হইয়া ডুবিতে আরম্ভ করে। জাহাজের কাপ্তান দেখিল স্পেন পর্যন্ত পৌঁছিবার আগেই জাহাজ ডুবিয়া যাইবে। জাহাজের নীচেকার খোলে হাজার মণ লবণ বোঝাই রহিয়াছে—সকলে মিলিয়া সারাদিন লবণ ফেলিলেও তাহার কিছুই কম্‌তি হইবে না। তাই তিনি হুকুম দিলেন, "জাহাজ ছাড়িতে হইবে, নৌকা নামাও।" এমন সময় এক সালভেজ কোম্পানির জাহাজ আসিয়া হাজির—তাহারা আসিয়াই ব্যাপার দেখিয়া জাহাজ ডুবিবার আগেই তাহা কিনিতে চাহিল। লবণ-জাহাজের কাপ্তান বলিল, "মাঝ সমুদ্রে জাহাজ ডুবিলে কিনিয়া লাভ কি?" সালভেজ কাপ্তান বলিল, "জাহাজ ডুবিতে দিব না।" শুনিয়া লবণের কাপ্তান হাসিয়া বলিল, "আমি ত জাহাজ ছাড়িয়াই দিব—তুমি কিনিতে চাও আমার আপত্তি কি?" জাহাজ কিনিয়াই নূতন কাপ্তান তাহাতে জল বোঝাই করিতে লাগিল—পুরাতন নাবিকেরা বলিল, "আহা কর কি? একেই জাহাজ ডুবিতেছে, আবার জল চাপাইতেছ? তুমি পাগল নাকি?" কাপ্তান কোন কথা না বলিয়া লবণের মধ্যে ক্রমাগতই জল ঢালিতে লাগিল। তারপর সমস্ত লবণ জলে গুলিয়া সেই লবণ-গোলা জলে পাম্প বসাইয়া হুড়্‌হুড়্‌ করিয়া জল সেঁচিয়া ফেলিল। জাহাজ হালকা হইয়া ভাসিয়া উঠিল। পুরাতন কাপ্তান ব্যাপার দেখিয়া আহাম্মক বনিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল।

আশ্চর্য আলো

আজকাল সহরে সহরে বিদ্যুতের আলো দেখা যায়। জাহাজে রেলগাড়িতে সবখানেই 'বিজলীবাতি'র আমদানি হইয়াছে। জল জোগাইবার জন্য রাস্তায় যেমন নল বসান হয়, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পাঠাইবার জন্য সেইরকম লোহা বা তামার তার খাটাইতে হয়। জলের কারখানায় বড় বড় দমকলের চাপে জল ঠেলিয়া উঁচুতে তোলে, সেই তোলা-জল সহরের নল বাহিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। বিদ্যুতের ব্যবস্থাও কতকটা সেইরকম—বিদ্যুতের কারখানায় বড় বড় কলে বিদ্যুৎ জমাইয়া রাখে, আর সেই বিদ্যুৎ আপনার চাপে তারের পথ ধরিয়া বহু দূর পর্যন্ত ছুটিয়া যায়। নলের মুখ বন্ধ থাকিলে যেমন জল আর চলে না, তেমনি তার কাটিয়া দিলে বা কোনখানে তারের জোড় খুলিয়া গেলে বিদ্যুতেরও চলার পথ বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু জলের চাপ যদি খুব বেশি হয়, তবে সে অনেক সময়ে সকল বাধা ঠেলিয়া আপনার পথ করিয়া লয়—জলের তোড়ে রাস্তাঘাট ভাসাইয়া বিষম কাণ্ড উপস্থিত করে। সেইরকম বিদ্যুতের প্রবল স্রোত যদি সহজ পথ না পায় তবে সেও আকাশ চিরিয়া জোর করিয়া আপনার পথ কাটিতে জানে। ঝড়ের সময়ে আকাশ ফুঁড়িয়া মেঘে মেঘে বিদ্যুতের হাসাহাসি চলে, সেই পথহারা বিদ্যুৎ পৃথিবীর ঘাড়ে পড়িলে যে ভয়ানক কাণ্ড হয় তাহারই নাম 'বাজ পড়া'। নর্দমা কাটিয়া যেমন জল সরায়, বুদ্ধিমান মানুষে তেমনি বাড়ির পাশে লোহার শিক খাড়া করিয়া বিদ্যুতের জন্য সহজ পথ করিয়া রাখে।

পণ্ডিতেরা বোতলের ভিতরে এইরকম বিদ্যুৎ ছুটাইয়া অনেক আশ্চর্য পরীক্ষা করিয়াছেন। বোতলটাকে খালি করিয়া তাহার মধ্যে বিদ্যুৎ চালাইলে অতি অদ্ভুত রঙিন আলোর খেলা দেখা যায়। কেবল রঙের খেলা নয়, পণ্ডিতেরা তাহার মধ্যে এমন সব আশ্চর্য কান্ড দেখিতে পান যে তাহার আলোচনার জন্যই কত লোকে সারাজীবন ভরিয়া খাটিতেছেন।

বোতলকে 'খালি' করার কথা বলিলাম কিন্তু তাহার অর্থ কি? সাধারণত, আমরা যাহাকে 'খালি বোতল' বলি তাহা মোটেও খালি নয়, কারণ, তাহার ভিতরটা আগাগোড়াই বাতাসে পোরা। সেই বাতাসকে কলে চুষিয়া বাহির করিলে যাহা থাকে পণ্ডিতেরা তাহাকে বলেন Vacuum অর্থাৎ ফাঁকা আকাশ। এইরকম একটা বোতলের দুই দিকে তার জুড়িয়া তাহার মধ্যে বিদ্যুতের ঝিলিক্ চালাইলে দেখা যায় যে সেই ফাঁকা বোতলের মধ্যে বিদ্যুতের এক নূতন চেহারা বাহির হয়। বিদ্যুতের তেজ স্নিগ্ধ জ্যোতির মতো বোতলের এক মাথা হইতে আর এক মাথায় ছড়াইয়া পড়ে, আর বোতলের ভিতরটা আশ্চর্য সুন্দর আলোয় ভরিয়া জ্বল্ জ্বল্ করিতে থাকে।

দেখিবার জিনিস এবং শিখিবার জিনিস ইহার মধ্যে এত আছে যে সেসব কথা আজ আর বলিবার সময় নাই, কেবল একটা আশ্চর্য ব্যাপারের কথা এখানে বলিব। তাহার কথা তোমরা অনেকে হয়ত শুনিয়াছ—তাহার নাম "রঞ্জেনের আলো" বা X-Ray (অজানা আলো)। ফাঁকা বোতলের মধ্যে বিদ্যুতের আঘাতে এই আশ্চর্য আলোর জন্ম হয়। কাঁচ ফুড়িয়া সেই আলো বাহিরে চলিয়া আসে, কিন্তু তাহাকে চোখে দেখা যায় না।

কোন কোন জিনিস আছে, তাহারা নানারকম তেজ শুষিয়া সেই তেজে আবার আপনি আলো দিতে থাকে। একরকম পাথর দেখা যায়, তাহারা দিনের আলোক জমাইয়া রাখে আর অন্ধকারে জ্বল্জ্বল্ করে। রাত্রে সময় দেখিবার জন্য আজকাল একরকম ঘড়ি কিনিতে পাওয়া যায়, তাহার কাঁটা ও সময়ের অঙ্কগুলা আপনার আলোয় টিম্‌টিম্ করিয়া জ্বলিতে থাকে। আজকাল যুদ্ধেও এইরূপ মশলা-মাখান একপ্রকার রঙের ব্যবহার হয়; যেখানে শত্রুর ভয়ে ভালরকম আলো জ্বালিবার

উপায় নাই সেখানে এই জ্বলন্ত রঙের চিহ্ন আঁকিয়া নানারকম সংকেত জানান হয়, অন্ধকারে পথ দেখাইয়া চলাফেরার সুবিধা করা হয়।

ফাঁকা বোতলের ঐ অদৃশ্য তেজ ধরিবার জন্যও নানারকম মশলা পাওয়া যায়। একটা পর্দার উপর সেই মশলা মাখাইয়া তাহাকে ঐ বিদ্যুৎ-পোরা বোতলের কাছে আনিলেই পর্দাটা আলো হইয়া ওঠে। বোতলটাকে কালো কাগজে মুড়িয়া ফেল, তবুও পর্দা জ্বলিতে থাকিবে। বোতলের উপর কাঠের বাক্স চাপা দেও—কাঠ ভেদ করিয়া সে অদৃশ্য আলো মশলার পর্দাকে জ্বালাইয়া তুলিবে। কিন্তু বিদ্যুৎ চালান একটিবার বন্ধ করিয়া বোতলের তেজ নিভাইয়া দাও, সেই সঙ্গে পর্দার আলোও নিভিয়া যাইবে। পর্দার সামনে যদি একখানা লোহার টুকরা ধর, তাহা হইলেও যেখানে লোহার আড়াল পড়িয়াছে সেইখানে পর্দা জ্বলিবে না—কারণ বোতলের আলো লোহার ভিতর দিয়া যাইতে পারে না। একটা পয়সা আনিয়া পর্দার সামনে ধর, তাহারও পরিষ্কার গোল ছায়া পড়িবে। এইরকম পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, পর্দার উপর হাড়ের ছায়া পড়ে কিন্তু মাংস বা চামড়ার কোন ছায়া পড়ে না।

এইজন্য পর্দার সামনে তোমার জামাশুদ্ধ হাতখানা ধরিলে তোমার জামাও দেখিবে না আর নধরপুষ্ট মাংস-ভরাট আঙুলও দেখিবে না—দেখিবে কতগুলো হাড়ের ছায়া।

একটি কাঠবিড়ালের ছবি তোল। ছবিতে হাড়গোড় সবই উঠিবে—অথচ অমন জমকালো ল্যাজটির চিহ্নমাত্র থাকিবে না। জ্যান্ত জীবের এরকম কঙ্কালছায়া সর্বপ্রথম দেখেন রঞ্জেন বা রন্ট্গেন সাহেব (Rontgen), তিনিই ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ ২২ বৎসর আগে ঐরূপ জ্বলন্ত পর্দার সাহায্যে এই আলো আবিষ্কার করেন। প্রথম যখন তিনি পর্দার সামনে হাতের আড়াল দিয়া দেখেন তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে কতগুলা হাড়ের ছায়া দেখিবেন। তাই হঠাৎ আপনার 'হাড্ডিসার' ছায়া দেখিয়া তিনি ভারি আশ্চর্যবোধ করিয়াছিলেন।

তামাসা হিসাবেও এটা একটা দেখিবার মতো ব্যাপার, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কাঠের বাক্সের মধ্যে চামড়ার ব্যাগ, কাগজ কলম, হাড়ের বোতাম, ছুঁচসুতা, চাবি ভরিয়া একবার পর্দার আলোর সামনে ধর—কাঠের বাক্স ছায়াতে কাঁচের মতো স্বচ্ছ দেখাইবে আর তাহার ভিতরকার ছুঁচ চাবি আর কলমের মুখটা স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়িবে। বোতামের দিকে ছায়া দেখা যাইবে কিন্তু কাগজ সুতা বা চামড়ার ব্যাগ খুঁজিয়া পাওয়া মুস্কিল হইবে—অথচ ব্যাগের ভিতর যদি টাকা পয়সা থাকে তাহারও পরিষ্কার ছায়া পড়িবে।

কিন্তু পণ্ডিতেরা কেবল তামাসা দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন না, তাঁহারা ইহার নিয়ম-কানুন বাহির করিয়া ব্যাপারটাকে অনেকরকম কাজে লাগাইয়াছেন। ডাক্তারেরা এই আলোকের সাহায্যে রোগীর দেহ পরীক্ষা করিতেছেন, নানারকম কৌশল করিয়া জ্যান্ত মানুষের বুকের ধুক্‌ধুকানি আর পাকস্থলীর হজমক্রিয়া দেখিতেছেন, শরীরের ভিতরে কোথায় হাড় ভাঙিল, কোথায় গুলি লাগিল, কোথায় উৎকট রোগের সঞ্চার হইল, সব চোখে দেখিয়া তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। আজকালকার যুদ্ধে কত হাজার হাজার আহত সৈন্যকে এই আলোকে পরীক্ষা করিয়া আঘাতের রকমটা স্পষ্ট বুঝিয়া তাহার চিকিৎসা করা হইতেছে। ব্যবসা বাণিজ্যে নানা জিনিসের ভেজাল ধরিবার জন্য ও নানারকম খুঁৎ পরীক্ষার জন্যও এই আলোর ব্যবহার হয়। প্রথম যাঁহারা এই সকল পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, এ আলো কি সাংঘাতিক জিনিস! অদৃশ্য আলোয় ক্রমাগত কাজ করিতে করিতে অনেকের চোখ অন্ধ হইয়াছে, হাতে সাংঘাতিক ঘা হইয়া হাতটি নষ্ট হইয়াছে, এমনকি কেহ কেহ প্রাণ পর্যন্ত দিয়াছেন। এমন সর্বনেশে আলো!

তোমাদের কাহারও মনে কি এমন অহংকার আছে যে তোমার চেহারাটি খুব সুন্দর? যদি থাকে, তবে একটিবার এই আলোতে ঐ মুখখানির ফটো তুলাইয়া দেখ। তাহা হইলে বোধহয় আর রূপের দেমাক থাকিবে না।

পিরামিড

ইংরাজিতে Seven Wonders of the World বা পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্য কীর্তির কথা শুনিতে পাই। ইজিপ্টের পিরামিড তার মধ্যে একটি। 'একটি' বলিলাম বটে কিন্তু আসলে পিরামিড একটি নয়, অনেকগুলি। ইজিপ্টের নানা জায়গায় ঘুরিলে হয়ত একশ গণ্ডা পিরামিড খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। কিন্তু তাহার মধ্যে অধিকাংশই ভাঙা ইঁট পাথরের স্তূপমাত্র। বাস্তবিক দেখিবার মতো নামজাদা পিরামিড খুব অল্পই আছে, তাহাদের মধ্যে কাইরো নগরের কাছে যে তিনটি পিরামিড সেইগুলিই সকলের চাইতে আশ্চর্য।

আশ্চর্য বলি কিসে? প্রথম আশ্চর্য তার বিপুল আয়তন। সব চাইতে বড় যে পিরামিড, যাহাকে চেয়প্স্ বা খুফুর পিরামিড বলে সেটি প্রায় সাড়ে তিনশ হাত উঁচু! একটা সাধারণ তিনতলা বাড়ির দশ গুণ। দূর হইতে দেখিলে মনে হয় একটা ইঁটের পাঁজা—তাহার গায়ে কোন কারুকার্য নাই, গঠনের কোন বিশেষত্ব নাই। দেখিয়া বিশেষ কোন সম্ভ্রমের উদয় হয় না। কিন্তু একটিবার কাছে গিয়া তাহার নিচে দাঁড়াইয়া দেখ, কি বিরাট কাণ্ড। এক-একটি ইঁট এক-একটি প্রকাণ্ড পাথর—তার মধ্যে নিতান্ত ছোট যেটি, তাহার ওজন ৫০ মণের কম হইবে না। আর খুব বড় বড়গুলা এক-একটি হাজার দেড় হাজার মণ।

কত পাথর! চারিদিকে চাহিয়া দেখ কেবল পাথরের উপর পাথর। না জানি কত বৎসর ধরিয়া কত সহস্র লোকের প্রাণপণ পরিশ্রমে এত পাথর একত্র করিয়া এমন স্তূপ গড়িয়াছে। ভাবিতে গেলে মাথা ঘুরিয়া যায়। প্রায় একশত বিঘা জমির উপরে এই প্রকাণ্ড জিনিসটাকে দাঁড় করান হইয়াছে। এই কলিকাতা সহরের সমস্ত ঘরবাড়ি ভাঙিয়া যদি পিরামিড গড়িতে যাও দেখিবে তাহাতেও মালমসলায় কুলাইবে না—সমস্ত সহর স্তূপাকার করিয়াও অত বড় পিরামিড গড়িতে পারিবে না। অথচ এমন অসম্ভব কাজও মানুষ করিয়াছে। নীল নদীর ওপার হইতে পাহাড় কাটিয়া মানুষ পাথর আনিয়াছে, সেই পাথর নৌকায় তুলিয়া নদী পার করিয়াছে, তারপর দুই মাইল পথ সেই পাথর টানিয়া লইয়াছে, আর ধাপে ধাপে সেই পাথর সাজাইয়া প্রকাণ্ড পিরামিড গড়িয়াছে।

সে কি আজকার কথা! প্রায় ছয় হাজার বৎসর হইল, রাজা চেয়প্স্ ভাবিয়াছিলেন নিজের গোরস্থান বানাইয়া পৃথিবীতে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া যাইবেন, সেই কল্পনাই ৩০ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে পিরামিডের মূর্তি ধরিয়া দাঁড়াইল।

এই ছয় হাজার বৎসরে পিরামিডের চেহারা অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছে। আগে তাহার উপরে সাদা পাথরের পালিশ করা ঢাকনি ছিল, এখন কেবল দু-এক জায়গায় তাহার একটু-আধটু চিহ্নমাত্র বাকি আছে। একটা পিরামিডের চূড়ায় এখনও সেকালের সেই সাদা ঢাকনিটি লাগিয়া আছে, তাহাতে দেখা যায় যে ছয় হাজার বৎসর আগে পিরামিডের চেহারা কেমন মোলায়েম ছিল। এখন আর তাহার সে চেহারা নাই, চারিদিকে পাথরের ধাপ বাহির হইয়া

পড়িয়াছে—চেষ্টা করিলে তাহার সাহায্যে পিরামিডের গা বাহিয়া চূড়ায় উঠা যায়। এমন দুরবস্থা না হইবে বা কেন? অন্তত দু-তিন হাজার বৎসর ধরিয়া লোকে এই পিরামিডের পাথর খসাইয়া সেই পাথরে নিজেদের ঘরবাড়ি মসজিদ বানাইয়াছে। পিরামিডের কাছাকাছি যত কোঠা দালান তাহার মধ্যে কতগুলা যে এইরূপ চোরাই মালে তৈরি তাহার আর সংখ্যা নাই।

ছয় হাজার বৎসর আগেকার মানুষ, তাহারা কেমন করিয়া এত বড় বড় পাথর সাজাইয়া এমন পিরামিড গড়িল একালের মানুষ ভাবিয়া তাহার কিনারা পায় না। তবে সেকালের গ্রীক লেখক হেরোডোটস এ-বিষয়ে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে পিরামিড বিষয়ে মোটামুটি অনেক সংবাদ পাওয়া যায়।

তাহাতে দেখা যায় যে নদীর ওপার হইতে পিরামিডের ভিত্তি পর্যন্ত পাথর বহিবার জন্য প্রায় ২০০০ হাজার হাত লম্বা, ৪০ হাত চওড়া এক রাস্তা বানাইতে হইয়াছিল। রাস্তাটা আগাগোড়া পালিশ-করা পাথরের তৈরি, তার একদিক প্রায় ৩২ হাত উঁচু, আর-একদিকে ক্রমে ঢালু হইয়া নদী পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। এক লক্ষ লোক ক্রমাগত দশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া এই রাস্তা বানাইয়াছিল। যতক্ষণ রাস্তা বানান হইতেছিল, ততক্ষণ আর-একদল লোকে পাহাড়ে জমি ভাঙিয়া পিরামিডের ভিত্তি সমান করিতেছিল। সেই ভিত্তির উপর আশ্চর্য কৌশলে ঘর বসাইয়া তাহারই চারিদিকে রাজার সমাধি-মন্দির তৈরি হইয়াছে।

হেরোডোটস বলেন, পিরামিড শেষ করিতে আরও ২০ বৎসর লাগিয়াছিল। কত অসংখ্য ক্রীতদাস কত হাজার হাজার প্রজা মিলিয়া এই কাজে লাগিয়াছিল তাহার আর হিসাব পাওয়া যায় না। কিন্তু একটি যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে সে অতি চমৎকার। এক সময়ে পিরামিডের গায়ে আয়-ব্যয়ের একটা ফর্দ লেখা ছিল—তাহারই একটুখানি হেরোডোটসের সময় পর্যন্ত টিকিয়াছিল। তাহাতে দেখা যায় যে মজুরদের জন্য পেঁয়াজ রসুন আর মূলা এই তিন জিনিসেরই খরচ লাগিয়াছিল প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা। এখন ভাবিয়া দেখ সমস্ত পিরামিডটাতে না জানি কত কোটি কোটি টাকা খরচ হইয়াছিল। শোনা যায় রাজা ইহার জন্য তাঁহার যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিয়া একেবারে সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিজের ধনরত্ন যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহার প্রায় সমস্তই তাঁহার সঙ্গে কবরের মধ্যে সমাধিস্থ করা হইয়াছিল। কিন্তু আজ তাহার কিছুই বাকি নাই, আছে কেবল শূন্য কবরের কতগুলা ভাঙা পাথর মাত্র। ভিতরে মূল্যবান যাহা কিছু ছিল মানুষে লুঠ করিয়া তাহার আর কিছু রাখে নাই। পিরামিডের ভিতরটা কিরকম, অনেকদিন পর্যন্ত তাহা জানিবার কোন উপায় ছিল না, এমনকি উহা বাস্তবিকই সমাধিস্তম্ভ কিনা, সে-বিষয়ে নানারকম তর্ক শোনা যাইত। কিন্তু এখন মানুষে আবর্জনা সরাইয়া তাহার ভিতরে ঢুকিবার সুড়ঙ্গ পথ বাহির করিয়াছে। ভিতরের ব্যবস্থাও অতি আশ্চর্য।

পিরামিডের গোড়ার কাছেই একটা নীচমুখী সুড়ঙ্গ—সেটা খানিক দূরে গিয়া দুমুখো হইয়া গিয়াছে। একটা মুখ মাটির নীচে একটা খালি ঘর পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে—আর-এক মুখ উপরের দিকে উঠিয়াছে। সেদিকে রানীর কবরঘর—তার উপর প্রকাণ্ড সিঁড়ি, তার পরে রাজার সমাধি। সমাধির উপরে আবার পাঁচতলা ঘর। তাছাড়া আরও ছোটখাট ঘর আছে, ঘরের মধ্যে বাতাস আনিবার জন্য বড় বড় লম্বা লম্বা নলের মতো সুড়ঙ্গ আছে—আর আছে কতগুলা বড় বড় পাথর যাহার কোন অর্থ পাওয়া যায় না।

কেবল প্রকাণ্ড জিনিস বলিয়াই যে পিরামিডের সম্মান করি তাহা নয়—যাহারা পিরামিড গড়িয়াছে, ওস্তাদ কারিকর হিসাবেও তাহারা নমস্কারযোগ্য। বড় বড় পাথরকে অদ্ভুত কৌশলে তাহারা এমন নিখুঁতভাবে জোড়া দিয়াছে যে, আজও সেই জোড়ের মুখে একটি ছুঁচ ঢুকাইবার

মতোও ফাঁক হয় নাই। যে চতুষ্কোণ জমির উপরে পিরামিড বানান হইয়াছে, তাহার প্রতেকটি কোণ সূক্ষ্ম হিসাবে মাপিয়া সমান করা হইয়াছে, চতুষ্কোণের চারটি দিক এমন নিখুঁতভাবে সমান, যে নিপুণ জরীপের হিসাবে তাহাতে দু আঙুল পরিমাণও তফাৎ পাওয়া যায় না। ঘড়ির কলের মতো এমন সূক্ষ্ম হিসাব ধরিয়া যে জিনিস খাড়া করা হইল, তাহার ওজন ১৯০,০০০,০০০, উনিশ কোটি মণ! এই ভারতবর্ষের অর্ধেক লোককে যদি দাঁড়িপাল্লায় চাপাও তবে এইরকম একটা ওজন পাইতে পার।

যাহারা পিরামিড বানাইল, তাহারা কিরকম লোক ছিল? তাহাদের চালচলন পোশাক পরিচ্ছদ বাড়িঘর আচার-ব্যবহার এসবই বা কিরকম ছিল? জানিতে ইচ্ছা হয় না কি? যাঁহারা পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত, কেবল প্রাচীনকালের খবর খুঁজিয়া ফেরেন, তাঁহারা ইজিপ্টের মাটি খুঁড়িয়া তাহার ভিতর হইতে সেই কোন্‌কালের ইতিহাসকে টানিয়া বাহির করিয়াছেন। কত ঘরবাড়ি, কত আসবাবপত্র, কত অদ্ভুত ছবি, কত মোমে আঁটা মৃতদেহ, Mummy তাহার আর অন্ত নাই। ইজিপ্টে মৃতদেহ রক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল, সে অতি আশ্চর্য। মৃতদেহকে পরিষ্কার করিয়া নানারকম মশলা মাখাইয়া মোমজামার ফিতা দিয়া এমন করিয়া মোড়া হইত যে হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া সে দেহ আর পচিতে পারিত না। ফিতার উপর ফিতা, প্যাঁচের উপর প্যাঁচ ! এক-একটি রাজার মৃতদেহ মুড়িতে পাঁচ দশ মাইল ফিতা অনায়াসেই খরচ হইয়া যাইত। তাহার মধ্যে দেহগুলি কাঠ হইয়া শুকাইয়া থাকিত, কিন্তু পচিত না। এইরূপে অতি প্রাচীনকালের ইতিহাসে যে-সকল রাজার নাম শোনা যায় তাহাদেরও অনেকের আস্ত দেহ পাওয়া গিয়াছে।

ইজিপ্টের আর-একটি জিনিস তাহার 'ছবির ভাষা'। তাহাদের মনের কথাগুলি ভাষার অক্ষরে না লিখিয়া তাহারা ছবি আঁকিয়া বুঝাইয়া দিত। ইহাতে কত সুবিধা হইয়াছে বুঝিতেই পার। 'রাজা যুদ্ধ করিতে গেলেন' ইহা ভাষায় না বলিয়া যদি জলজ্যান্ত ছবি আঁকিয়া দেখাই তবে এ কথাটুকু ত বলা হয়ই, সঙ্গে সঙ্গে রাজা কিরকম পোশাক পরিতেন, কিরকম রথে চড়িতেন, কিরকম অস্ত্র লইতেন, তাহাও বোঝাইয়া দেওয়া যায়। বাস্তবিকই এই সমস্ত ছবি আর ঘর বাড়ির চিত্র দেখিয়া সেকালের ইজিপ্টকে কল্পনার চোখে বেশ পরিষ্কার করিয়া দেখা সম্ভব হয়।

দক্ষিণ দেশ

কলম্বসের আগে লোকে আমেরিকার কথা জানিত না—সে সময়ে লোকে তিনটিমাত্র মহাদেশের কথা জানিত। আমেরিকা আবিষ্কারের পর প্রায় একশত বৎসর পর্যন্ত আর কোন নূতন মহাদেশের কথা শুনা যায় নাই। ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে এক পর্টুগীজ নাবিক আসিয়া বলে যে ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ অঞ্চলে সে এক প্রকাণ্ড নূতন দেশ দেখিয়াছে। তার পাঁচ বৎসর পরে স্পেন দেশের এক জাহাজের কাপ্তান বলে সেও নাকি ঐ দেশের কাছ দিয়া আসিয়াছে। তারপর বহুদিন পর্যন্ত ওলন্দাজ নাবিকদের মুখে ঐ দেশের কথা মাঝে মাঝে শুনা যাইত। কেহ কেহ সেই নূতন দেশে যাইবার চেষ্টায় জাহাজডুবি হইয়া মারা যায়। দু-একজন দেশে ফিরিয়া বলে "দেশটা একেবারে ফাঁকা—দেখিবার কিছু নাই।"

১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে টাসমান নামে এক সাহসী ওলন্দাজ নাবিক এই নূতন দেশের সন্ধানে বাহির হন। তিনি অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে একটা দ্বীপে গিয়া জাহাজ ভিড়াইলেন, তাঁহারই নামে সেই দ্বীপের

নাম হইয়াছে টাসমানিয়া। দ্বীপটাকে তিনি দ্বীপ বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই—তিনি ভাবিলেন, এই সেই প্রকাণ্ড নূতন দেশ। দুঃখের বিষয় দ্বীপটা তাঁহার ভাল করিয়া দেখা হয় নাই। একদল নাবিক লইয়া তীরে নামিতেই তাঁহারা দেখিলেন একটা গাছের গায়ে কতগুলা খাঁজ কাটা রহিয়াছে। অস্ত্রের দাগ দেখিয়া তাঁহারা বুঝিলেন এখানে মানুষ আছে। তিন হাত সাড়ে তিন হাত অন্তর এক-একটি খাঁজ দেখিয়া নাবিকেরা ভাবিল ঐ খাঁজে খাঁজে পা দিয়া যাহারা গাছে চড়ে তাহাদের পা নিশ্চয়ই সাংঘাতিক লম্বা, সুতরাং তাহারা নিশ্চয়ই রাক্ষস। রাক্ষসের ভয়ে তাহাদের আর নূতন দেশ দেখা হইল না। টাসমানের পর যাহারা নূতন দেশ দেখিতে আসে তাহারা সকলেই হল্যান্ড দেশের লোক—তাহারা সে দেশের নাম দিল 'নূতন হল্যান্ড'। ইহার প্রায় ৫০ বৎসর পরে ড্যাম্পিয়ার নামক এক ইংরাজ অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে জাহাজ লাগাইলেন। সে এক আশ্চর্য সুন্দর জায়গা। তীরে নামিতেই তাজা ফুলের গন্ধে তাঁহাদের মনটা খুশি হইয়া উঠিল। সবুজ গাছগুলি ফুলে ফুলে রঙিন হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে রং-বেরঙের নানান পাখি উড়িয়া উড়িয়া ফিরিতেছে। তাহারা ডাঙায় নামিয়া চারিদিক ঘুরিয়া কত অদ্ভুত দৃশ্য আর তাহার চাইতেও কত অদ্ভুত জন্তু দেখিতে পাইলেন। একটা জন্তু, তার ইঁদুরের মতো মুখ, প্রায় মানুষের মতো বড়—সে দুই পায়ে ভর দিয়া বিশ হাত লম্বা লাফ দেয়। তোমরা জান সে জন্তুর নাম কাঙারু, কিন্তু সে-সময়ে অমন জন্তু কেহ দেখে নাই। সে দেশের মানুষদের তিনি দেখিলেন—রোগা লম্বা, সরু সরু হাত পা আর কুচ্‌কুচে কালো। তাহারা কাপড় পরিতে জানে না; গাছের ছাল পরিয়া থাকে।

ড্যাম্পিয়ারের পর আরও প্রায় আশি বৎসর কেহ সে দেশের বড় একটা খবর লয় নাই। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আবার আর একজন ইংরাজ নাবিক তাহার সন্ধান করিতে বাহির হইলেন। ইঁহার নাম কাপ্তান কুক। কাপ্তান কুকের মতো অমন সাহসী নাবিক সেকালে খুব কমই ছিল। তিনি জাহাজে করিয়া কত যে নূতন দেশের সন্ধানে ঘুরিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা করিতে গেলেও প্রকাণ্ড পুঁথি হইয়া যায়। কাপ্তান কুক প্রথম যেখানে গেলেন সেটা অষ্ট্রেলিয়া নয়, সেটাকে এখন নিউজিল্যান্ড বলা হয়। নিউজিল্যান্ডের চারিদিক ঘুরিয়া তিনি দেখিলেন একটা প্রকাণ্ড দ্বীপ—আসল মহাদেশটা আরও পশ্চিমে। তারপর নিউজিল্যান্ড ছাড়িয়া উনিশ দিন পরে তিনি 'নূতন হল্যান্ডে' উপস্থিত হইলেন। অনেক ঘুরিয়া একটা সুবিধামত জায়গায় জাহাজ ঠেকাইতেই চারিদিক হইতে কতগুলা কাদামাখা অদ্ভুত লোক আসিয়া ভীড় করিয়া দাঁড়াইল। তারপর নাবিকেরা যখন জাহাজ হইতে ডাঙায় নামিবার চেষ্টা করিল তখন তাহারা বল্লম ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল। জাহাজ হইতে কতগুলা ফাঁকা আওয়াজ করিতে তাহারা একটু ভয় পাইল, কিন্তু তাহাতে কেহ মরিল না দেখিয়া আবার তাহাদের সাহস ফিরিয়া আসিল। তখন একটা লোকের পায়ে ছর্‌রা মারিতেই তাহারা ভয় পাইয়া পলাইল।

জাহাজ মেরামতের জন্য কাপ্তান কুককে কিছুদিন সেখানে থাকিতে হইল। এই সময়ের মধ্যে নাবিকেরা সে দেশী লোকদের সঙ্গে বেশ ভাব করিয়া লইয়াছিল। জাহাজ মেরামত হইলে কাপ্তান কুক তীর ধরিয়া ধরিয়া উত্তর দিক পর্যন্ত ঘুরিয়া দেখিলেন। নূতন দেশের সমস্ত পূর্ব দিকটাতে ইংরাজের অধিকার ঘোষণা করিয়া তিনি তাহার নাম রাখিলেন 'নিউ সাউথ ওয়েলস'। তারপর কথা হইল এই নূতন দেশটা লইয়া কি করা যায়। ইংরাজ গভর্নমেন্ট বলিলেন, "যে সকল কয়েদী অপরাধীদের দ্বীপান্তরে তাড়ান আবশ্যক, তাহাদের ঐখানে চালান করিয়া দাও।" তখন এগারটি জাহাজ বোঝাই করিয়া কয়েদী পাঠান হইল। তাহাদের পাহারার জন্য সৈন্য গেল; শাসন ব্যবস্থার জন্য সরকারী কর্মচারী গেল, স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া দলে দলে ডাক্তার নাবিক মজুর গেল।

কাপ্তান ফিলিপ হইলেন এই দলের গভর্নর বা শাসনকর্তা। তাঁহারা সুবিধামত জায়গা খুঁজিয়া সেইখানে কাঠের ঘর বাড়ি বসাইয়া বেশ ছোটখাট একটি সহর পত্তন করিলেন।

কাপ্তান ফিলিপ সে দেশী লোকদের মনে সদ্ভাব জাগাইবার জন্য নানারকম চেষ্টা করিয়াও তাহাদের ভয় ও সন্দেহ দূর করিতে পারেন নাই। ভাল ভাল বকশিস দিয়া নানারকম লোভ দেখাইয়া তিনি ২/১ জনকে অনেকটা বশ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে বেন্নিলনি নামে একজন ছোকরাকে তিনি নিজের বাড়িতে আনিয়া কয়েকদিন খুব আমোদে রাখিয়াছিলেন। বেন্নিলনি যখন তাহার লোকদের কাছে ফিরিয়া গেল তখন তিনি অনেকরকম উপহার লইয়া একদিন তাহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। দুঃখের বিষয় একজন সে দেশী লোকের সঙ্গে 'হ্যান্ডশেক' করিতে যাওয়ায় সে হঠাৎ কেমন ভুল বুঝিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া কাঁধের কাছে বল্লম বিঁধাইয়া দেয়। বেন্নিলনির যত্নে ও সাহায্যে সেবার তিনি বাঁচিয়া গেলেন। ইহার পর হইতে বেন্নিলনি তাঁহার খুব ভক্ত হইয়া উঠিল এবং ক্রমে সে দেশী লোকদের সঙ্গে অনেকটা বনিবনাও হইয়া গেল।

এমনি করিয়া নূতন দেশে ইংরাজের উপনিবেশ আরম্ভ হইল। কথা ছিল মাঝে মাঝে বিলাত হইতে জাহাজে করিয়া রসদ আসিবে, তাহাতে তাহাদের খাবার কষ্ট ঘুচিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইংলন্ড হইতে জাহাজ আসিয়া পৌঁছিতে অসম্ভব রকম বিলম্ব হইয়া গেল। সহরের চাল ময়দা শাক সবজী গরু ছাগল সব ফুরাইয়া আসিল। গভর্নর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক লোকেই দিনে তিন ছটাক ময়দার রুটি, দুই ছটাক মাংস আর এক ছটাক চালের ভাত খাইয়া সপ্তাহের পর সপ্তাহ কোনরকমে দিন কাটাইতে লাগিল।

তাহাতেও যখন খাদ্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় একদিন তিন জাহাজ বোঝাই করিয়া রসদ আসিয়া হাজির হইল। এইরকম কষ্টের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ায় ইংরাজ রাজ্যের পত্তন হইল। তাহার পর আরও কত লোক সেদেশে আসিতে আরম্ভ করিল; কেহ চাষবাসের জন্য, কেহ খনি খুঁড়িবার জন্য। কেহ দেশ আবিষ্কারের জন্য কেহ কেবলমাত্র চাকুরী খুঁজিবার জন্য। একটা সহর ছিল দেখিতে দেখিতে দুই চার দশটা সহর জাগিয়া উঠিল। ততদিনে তাহার 'নিউ হল্যান্ড' নাম ঘুচিয়া নূতন নাম হইয়াছে, অস্ট্রেলিয়া বা 'দক্ষিণ দেশ'।

অস্ট্রেলিয়ার মাঝখানে অনেকটাই সে সময়ে অজানা দেশ ছিল। বড় বড় মরুভূমি, সেখানে কি আছে তাহা অনেকদিন পর্যন্ত কেহ জানিত না। ওই সকল অজানা দেশে যাইবার জন্য অনেক লোকে চেষ্টা করিত লাগিল। এই সকল ভ্রমণবীরের বীরত্ব-কাহিনী শুনিলে অবাক হইতে হয়। ফিল্‌ডার্স আর বাস্‌ নামক দুই ইংরাজ ছোকরা নানা জায়গায় ঘুরিয়া অনেক নূতন স্থানের সংবাদ আনিয়াছিল। একটা সামান্যরকমের নৌকায় চড়িয়া তাহারা নদীতে ও সমুদ্রে পাড়ি দিয়া ফিরিত। ফিল্‌ডার্স বড় আমুদে লোক ছিল, সে একবার কতগুলা সে দেশী লোকের হাতে পড়ে। তাহাদের ভাবগতিক মোটেই সুবিধামত ছিল না, তাই তাহাদের খুশী রাখিবার জন্য সে নানারকম কাণ্ড করিয়াছিল; এমনকি শেষটায় রসিকতা করিয়া তাহাদের কয়েকজনের দাড়ি পর্যন্ত কাঁচি দিয়া ছাঁটিয়া দিয়াছিল। তাহাতে সেই লোকেরা নাকি ভারী খুশী হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিল।

অস্ট্রেলিয়ার অজানা দেশে যাওয়া বড়ই বিপদের কথা। লোকের অত্যাচার আর মরুভূমি ত আছেই, তাহার উপর মাঝে মাঝে এমন চোরা মাটি যে তাহার উপর চলিতে গেলে পাঁকে ডুবিয়া মরিতে হয়। সে দেশের নদীগুলাও কেমন বেয়াড়া, তাহাদের মতিগতির যেন কিছুই স্থির নাই। লেফটেনান্ট অক্সলি এক জায়গায় প্রকাণ্ড নদী দেখিয়াছিলেন, সে নদীতে বান আসিয়া তাঁহাকে অনেকবার নাকাল করিয়াছিল। ছয় বৎসর পরে কাপ্তান স্টার্ট্‌ সেইখানে গিয়া দেখেন খট্‌খটে শুক্‌না ডাঙা, তাহার মাঝে মাঝে ছোটখাট বিলের মতো—নদীর চিহ্নমাত্র নাই!

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে আয়ার নামে এক সাহেব অস্ট্রেলিয়ার মাঝখানে অজানা দেশটা দেখিবার জন্য বাহির হন। তিনি দক্ষিণ হইতে উত্তরে চলিতেছিলেন—দিনের পর দিন চলিয়া কেবল লাল বালি আর শুকনা হ্রদ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পান নাই। তারপর তিনি পশ্চিমমুখে গিয়া সেদিকেও সামান্য কাঁটাঝোপ ছাড়া আর কোন গাছ পাইলেন না। জলের কষ্ট এত বেশি যে চল্লিশ দিনে তিনি দেড়শত মাইল পথও যাইতে পারেন নাই—বার বার জলের জন্য ফিরিতে হইত। অন্য কোনও লোক হইলে সেইখানে উৎসাহ নিভিয়া যাইত, কিন্তু আয়ার বলিলেন, সমুদ্র না পাওয়া পর্যন্ত এইভাবে চলিব, না হয় মরিব। লোকজন সকলে বিদায় লইল, সঙ্গে রহিল কেবল ব্যাকস্টার নামে সাহেব আর তিনটি দেশী লোক। চলিতে চলিতে মরুভূমির ধূলায় তাঁহাদের চোখ অন্ধপ্রায় হইয়া আসিল, জলের কষ্ট অসহ্য হইয়া উঠিল, তাঁহাদের ঘোড়াগুলি একে একে পড়িয়া মরিল, সঙ্গের ছাগল-ভেড়াগুলিও দুর্বল হইয়া মরিতে লাগিল, তার উপর কোথা হইতে একরকম মাছি আসিয়া দেখা দিল, তাহার কামড়ের যন্ত্রণায় সর্বাঙ্গ জ্বলিতে থাকে। খাবার জিনিস যখন ফুরাইয়া আসিল, তখন সঙ্গের দুটি লোক ব্যাকস্টারকে মারিয়া খাবার চুরি করিয়া পলাইল। একজনমাত্র দেশী লোক সঙ্গে লইয়া আয়ার চলিতে লাগিলেন। একটি ঘোড়া তখনও বাঁচিয়াছিল, তাঁহারা সেইটিকে মারিয়া তাহার কাঁচা মাংস খাইলেন। সেই মাংসও যখন পচিয়া উঠিল তখন কেবল এক-এক মুঠা ময়দা জলে গুলিয়া তাহাতেই একদিনের আহার চালাইতে লাগিলেন। শেষটায় এমন দিন আসিল যখন ময়দাও ফুরাইয়া গেল। সেদিন খালি পেটে ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহারা এক অজানা সমুদ্রের ধারে আসিয়া দেখেন কোথা হইতে এক জাহাজ আসিয়াছে। আর কতগুলি ফরাসী নাবিক নৌকায় করিয়া তীরে আসিয়া উঠিয়াছে। আয়ার অবাক, নাবিকেরাও অবাক! এমনি করিয়া মরিতে মরিতে আয়ার বাঁচিয়া গেলেন।

আয়ারের পর ডাক্তার লাইকহার্ড ঐ মরুভূমি পার হইতে গিয়া দলেবলে মারা পড়েন। কাপ্তান স্টার্ট আর একবার চেষ্টা করিতে গিয়া অন্ধ হইয়া যান। ম্যাকডুয়াল স্টুয়ার্ট দুইবার চেষ্টা করিয়া দুইবারই মরিতে মরিতে বাঁচিয়া আসেন। আরও অনেকে আধ পথ সিকি পথ গিয়া আর যাইতে পারে নাই। তারপর বার্ক আর উইলস্ এক প্রকাণ্ড দল লইয়া বাহির হন। মরুভূমির মাঝখানে একটা হ্রদ পর্যন্ত গিয়া তাহার ধারে আড্ডা বসান হইল এবং বার্ক আর উইলস্ আর দুইজন ইংরাজকে সঙ্গে লইয়া আরও অগ্রসর হইয়া চলিলেন। তাহারা গিয়াছিলেন ভালই কিন্তু ফিরিবার সময় খাবার ফুবাইয়া গিয়া তাঁহাদের বিপদ ঘটিল। তাঁহারা যতদিনের হিসাব করিয়াছিলেন, পথে নানা গোলমাল হইয়া তাহার তিন চারগুণ সময় লাগিয়া গেল।

আড্ডায় ফিরিতে যখন আর চার দিন মাত্র বাকি তখন ঐ চারজনের মধ্যে একজন অবসন্ন হইয়া মারা গেল। বাকী তিনজন এত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহাকে কবর দিতে তাহাদের সমস্ত দিন লাগিল। এই দেরীতেই তাহাদের সর্বনাশ হইল। চারদিন পরে কোনওরকমে পথ পার হইয়া যখন আড্ডায় পৌঁছিল তখন দেখিল সেখানকার লোকজন তার কয়েক ঘন্টা পূর্বেই তাহাদের আশা ছাড়িয়া দিয়া সে আড্ডা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। হায়! হায়! আর কয়েক ঘন্টা আগে আসিলেই তাহাদের এ সর্বনাশ হইত না। তিনজনেই তখন অবসন্ন—আর চলিবার শক্তি নাই। তাহারা কোনওরকমে উঠিয়া বসিয়া হামাগুড়ি দিয়া চলিতে লাগিল—যদি দলের দেখা পায়। এরকম করিয়া আর কতদিন চলা যায়। খানিক পথ গিয়া উইলস্ এক গাছতলায় শুইয়া পড়িল। সেই তার শোয়া। একে নিজের

কষ্ট, তার উপর বন্ধুর এই অবস্থা—বার্ক আর কিং পাগল হইয়া আহার খুঁজিতে বাহির হইল। কোনরকমে দুই মাইল গিয়া বার্কও পথের পাশে মরিয়া পড়িল। তারপর কিং একাই ঘুরিতে ঘুরিতে এক জায়গায় সে দেশী খাবারের সন্ধান পাইয়া বাঁচিয়া গেল। পরে যখন আড্ডার লোকেরা তাহাদের উদ্ধারের জন্য লোক পাঠাইল, তখন তাহারা দেখিল একটা নদীর ধারে ছেঁড়া ময়লা কাপড়-পরা পাগলের মতো চেহারা, ধূলামাখা জটা চুল একটি লোক বসিয়া আছে—অনেক কষ্টে তাহারা চিনিতে পারিল, এই লোকটি কিং।

ভূমিকম্প

দুপুরবেলায় দিব্য আরামে শুইয়া বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় দুরদুর দুরদুর করিয়া ঘরবাড়ি কাঁপিয়া উঠিল, ঝাড়-লণ্ঠন পাখা সব দুলিতে লাগিল, তারপর খাট চৌকি সবশুদ্ধ খটাখট্ করিয়া এমন ঝাঁকানি লাগাইয়া দিল যে, আর নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করা সম্ভব হইল না। ততক্ষণে চারিদিকে লোকজনের ছুটাছুটি আরম্ভ হইয়াছে, শাঁখ কাঁসর ঘন্টার শব্দ শুনা যাইতেছে আর সকলেই বলিতেছে 'ভূমিকম্প, ভূমিকম্প'। পরের দিন কাগজে ভূমিকম্পের নানারকম বর্ণনা বাহির হইল—কেমন করিয়া বড় বড় গির্জার চূড়াগুলি দুলিতে দুলিতে পড়ো-পড়ো হইয়াছিল, কেমন করিয়া হাইকোর্টের জজসাহেব হইতে উকিল ব্যারিস্টার পেয়াদা পর্যন্ত সবাই ছুটিয়া বাহির হইয়াছিল, কেমন করিয়া দোকানের বাবুরা আর আপিসের বড় বড় সাহেবরা দোকানপাট কাগজপত্র সব ফেলিয়া রাস্তায় ছুটিয়া বাহির হইয়াছিল ইত্যাদি অনেক কথা। আর জানা গেল এই যে, কেবল যে কলিকাতাতেই ভূমিকম্প হইয়াছে তাহা নয়, বাংলার নীচুজমি হইতে আসামের পাহাড় পর্যন্ত সব জায়গাতেই সেই এক কাঁপুনি!

শাস্ত্রে যে বলে পৃথিবীটা স্থির আর 'অচলা', পণ্ডিতেরা সে কথা অনেকদিনই মিথ্যা প্রমাণ করিয়াছেন। পৃথিবী যে শূন্যের মধ্যে প্রকাণ্ড চক্র আঁকিয়া সূর্যের চারিদিকে ছুটিয়া চলে এবং চলিতে চলিতে লাটিমের মতো ঘুরপাক খায়, এ সকল কথা আমরা সকলেই জানি। সে চলুক আর ঘুরুক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই—কারণ সেটা আমরা টের পাই না, কিন্তু মাঝে মাঝে সে আবার গা-ঝাড়া দেয় কেন? পাহাড় পর্বত কাঁপাইয়া, জমি জাঙ্গাল ফাটাইয়া, বাড়ি ঘর দুয়ার উল্টাইয়া এ আবার কেমন উপদ্রব? সেদিন যে ভূমিকম্প হইল, সে ত নেহাৎ সামান্যরকমের। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এ দেশে যে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতে অনিষ্ট করিয়াছিল আরও অনেক বেশি। সেবারে পূর্ববাংলায় আর আসামে অনেক লোক মারা পড়িয়াছিল এবং কলিকাতা শহরেও বড় বড় কোঠা দালান ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। আর রেলপুল টেলিগ্রাফের থাম কত যে নষ্ট হইয়াছিল তাহার আর সংখ্যা নাই।

'ভূমিকম্প' মানে মাটির কাঁপুনি। এ কাঁপুনি ত বলিতে গেলে রোজই কতবার করিয়া হইতেছে। রাস্তা দিয়া দমকল ছুটিয়া গেল, ঘোড়সোয়ার পল্টন গেল, মাটি গুম্ গুম্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। এমনকি একজন মোটা লোক যদি সিঁড়ি দিয়া খুব উৎসাহ করিয়া নামিতে যায়, তাহাতেও বাড়ির ভিতরে ছোটখাটরকমের 'ভূমিকম্প' হয়। যদি বেশ সূক্ষ্মরকম যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ, তবে পাশের ঘরে বিড়াল হাঁটিয়া গেলে এই ঘরে তাহার চলা-ফিরার সাড়া পাইবে। কিন্তু ভূমিকম্প বলিতে আমরা এরকম কাঁপুনি বুঝি না। মাটির ভিতর হইতে যে ধাক্কা আসে, মাটির তলে তলে যাহা বহুদূর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে, তাহারই নাম ভূমিকম্প। কোথায় খাসিয়া পাহাড়ের

মধ্যে মাটির নীচে কোন্ গভীর তলে একটু নাড়াচাড়া পড়িয়াছে আর সমস্ত বাংলা দেশটা ভূমিকম্পের ধাক্কায় কাঁপিয়া উঠিয়াছে। সিমলা পাহাড়ে আর লঙ্কা দ্বীপে পর্যন্ত কম্পনলিপি যন্ত্রে (Seismograph) তার স্পষ্ট সাড়া পাওয়া গিয়াছে। বাস্তবিক, যাঁহারা এইসকল সূক্ষ্ম যন্ত্রের হিসাব লইয়া কারবার করেন, তাঁহারা বলেন প্রায় প্রতিদিনই পৃথিবীর নানাস্থানে ছোট বড় নানারকমের ভূমিকম্প চলিতেছে। কয়েক বছর আগে যখন আমেরিকার সানফ্রান্সিসকো নগরে বড় ভূমিকম্প হইয়াছিল তখন এখানকার যন্ত্রে তাহা ধরা পড়িয়াছিল। কম্পনলিপি যন্ত্রের কাঠি একটা কাগজের উপর সাদা আঁচড় কাটিয়া চলে। যতক্ষণ ভূমিকম্পের গোলমাল না থাকে ততক্ষণ সে বারবার সোজারকমের রেখা টানিয়া যায়, কিন্তু মাটির তলায় কোথাও যদি ভূমিকম্পের ছোঁয়া লাগে, অমনি কলের কাঠি বিগড়াইয়া হিজিবিজি আঁচড় কাটিতে আরম্ভ করে।

বাহির হইতে এই মাটির দিকে চাহিয়া দেখ, মনে হয় তাহার মতো অটল স্থির আর কিছুই নাই। চারিদিকে সমুদ্রের অশান্ত ঢেউ খ্যাপার মতো লাফালাফি করিতেছে, মাথার উপরে চঞ্চল বাতাস দিনরাত ছুটিয়া মরিতেছে, কিন্তু পৃথিবী—সে ধীর গম্ভীর নিশ্চল। বড় বড় গাছপালা হইতে সামান্য ঘাসটা পর্যন্ত তাহার গায়ে শিকড় বসাইয়া তাহার বুক ফুঁড়িয়া বাহির হইতেছে—পৃথিবী তাহাতে আপত্তিও করে না, বাধাও দেয় না। কিন্তু, কেবল বাহিরের মূর্তি না দেখিয়া যদি একবার গভীর মাটির নীচে ঢুকিতে পার তবে বুঝিবে তার ভিতরটায় কেমন তোলপাড় চলিতেছে। সেখানে গেলে মনে হইবে পৃথিবীর বুকের ভিতর যেন আগুন জ্বলিতেছে; যতই তার ভিতরে ঢুকি ততই গরম। সেই গরমে পাথর পর্যন্ত গলিয়া যায়, তুমি আমি ত এক মুহূর্তেই ঝামা হইয়া পুড়িয়া যাইব।

পৃথিবীর এই মাটির খোলসটি আগাগোড়া সমান নয়। কত লক্ষ লক্ষ যুগ নানারকম পাথর স্তরের পর স্তর সাজাইয়া তবে এই খোলস গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত কঠিন স্তর আগুনে গরম হইয়া, চাপে কঠিন হইয়া, দিনরাত ঠেলাঠেলি করিতেছে। কোথাও পাথর গলিয়াছে, জল ফুটিয়া বাষ্প হইয়াছে, তাহারা বাহির হইবার পথ চায়; কোথাও মাটির নীচে বড় বড় ফাটল রহিয়াছে, পাশের মাটি উপরের চাপে তাহার মধ্যে ধসিয়া পড়ে; কোথাও নীচেকার গরমের ঠেলায় উপরের মাটি ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠে। দিন রাত যুগের পর যুগ এইরকম চাপাচাপি ঠেলাঠেলি চলিয়াছে। গরমে বাষ্প আর গলিত পাথর যদি বাহির হইবার সহজ পথ না পায় তবে তাহারা অনায়াসেই একটা ভূমিকম্প বাধাইয়া তুলিতে পারে। আগ্নেয়গিরির উৎপাতের কথা তোমরা শুনিয়াছ। এইসব পাহাড়ের উৎপাত সকলের চাইতে সাংঘাতিক হয় সেই সময়ে যখন পাথর জমিয়া তাহার মুখ বন্ধ হইয়া যায়। তখন তাহাদের ভিতরের আগুন আর বাহির হইবার পথ পায় না, কেবল তাহার চাপ জমিয়া জমিয়া ভিতরে ভিতরে গুমরাইতে থাকে। ভিসুভিয়াসের অত্যাচারে পম্পিয়াই শহর ধ্বংস হইবার আগে এইরকম একটা কাণ্ড হইয়াছিল। সে সময়ে পাহাড় দেখিতে বেশ শান্ত ছিল, কিন্তু ক্রমাগত কয়েক বৎসর ধরিয়া গুম্ গুম্ শব্দ শুনা যাইত, মাঝে মাঝে এক-এক জায়গায় মাটি কাঁপিয়া উঠিত, আর ঘন ঘন ভূমিকম্প হইত। কিন্তু সে সময়ে মানুষ বুঝিতে পারে নাই যে এই সমস্তই পাহাড় ফাটাইবার আয়োজন। এইরূপে ভিতরের চাপ জমিয়া জমিয়া এমন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে যে পাহাড় আর তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না—জ্বলন্ত পাথর পাহাড় ভেদ করিয়া ফোয়ারার মতো ছুটিয়া বাহির হয়। এইরকম ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে কতবার ঘটিয়াছে তাহার আর সংখ্যা নাই।

এক একটা আগুনের পাহাড়কে অনেকদিন চুপচাপ থাকিতে দেখিয়া কত সময়ে লোকে মনে করে তাহার ভিতরকার আগুন মরিয়াছে—কিন্তু আবার যখন সে কুম্ভকর্ণের মতো ভয়ংকর

মূর্তিতে জাগিয়া উঠে তখন মানুষের আতঙ্কের আর সীমা থাকে না। এইরকম যত উৎপাতের কথা শুনা গিয়াছে, তাহার মধ্যে ক্রাকাতোয়ার অগ্নিকাণ্ডই সকলের চাইতে ভয়ানক। সুমাত্রা ও যবদ্বীপের মাঝামাঝি একটা দ্বীপ আছে তাহারই নাম ক্রাকাতোয়া। সেই দ্বীপের মধ্যখানে প্রকাণ্ড পাহাড় ছিল—এককালে তাহার মাথায় আগুন দেখা যাইত। দুই শত বৎসর ধরিয়া সেই পাহাড় একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া বিশ্রাম করিতেছিল, এই সুযোগে তাহার চারিদিকে গাছপালা গজাইয়া রীতিমত বনজঙ্গল দেখা গিয়াছিল। এক সময়ে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। সে কম্প এক একটি বড় সামান্য নয়, কারণ সমুদ্র পার হইয়া অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত মাঝে মাঝে তাহার ধাক্কা পৌঁছাইত। তিন বৎসর ভূমিকম্পের পর সহস্র কামান গর্জনের মতো ভীষণ শব্দে পাহাড় ভেদ করিয়া আগুন আর গরম বাষ্পের প্রকাণ্ড স্তম্ভ বাহির হইল। সেই স্তম্ভ সাত মাইল উঁচু হইয়া চারিদিকে গরম ধূলা ছাই আর পাথর ছিটাইতে লাগিল। এইরূপ তিন মাস পাথর বৃষ্টি করিয়াও পাহাড়ের তেজ কমিল না। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ আগস্ট সন্ধ্যার পর সমুদ্র হইতে জাহাজের নাবিকেরা দেখিয়াছিল, পাহাড়ের চারিদিকে লাল ধোঁয়ার আকাশ ঘিরিয়া রহিয়াছে, তাহার মধ্যে আগুনের গোলা ছুটিতেছে, বিদ্যুৎ চমকাইতেছে এবং ঘন ঘন বাজ পড়িতেছে। তাহার পরদিন ভোরবেলা একশত মাইল দূরে বাটাভিয়া শহরে গরম ধূলার বৃষ্টি হইল এবং তাহার কয়েক ঘণ্টা পরেই অসম্ভব ভয়ংকর শব্দে ক্রাকাতোয়ার প্রকাণ্ড পাহাড় আকাশে উড়িয়া গেল। আট মাইল ডাঙা বেমালুম শূন্যে মিলাইয়া গেল, গভীর সমুদ্র আসিয়া তাহার স্থান দখল করিল। সেই শব্দের ধাক্কা তিন হাজার মাইল দূর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল, আকাশ তোলপাড় করিয়া সমস্ত পৃথিবীময় বাতাসের ঢেউ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। হাজার হাজার মণ পাথর চূর্ণ হইয়া ধূলার মতো আকাশের দিক্‌দিগন্তে ভাসিয়া গিয়াছিল এবং পৃথিবীর সকল দেশে উদয়াস্তের সময় আশ্চর্য রঙের খেলা দেখাইয়াছিল।

এখানেও তাহার শেষ হয় নাই; পাহাড় ফাটিবার সময় সমুদ্রের ভিতর পর্যন্ত আগুন ঢুকিয়াছিল এবং ভীষণ ভূমিকম্পে সমুদ্রকে তোলপাড় করিয়া তুলিতেছিল। তাহার উপর যখন পাহাড় উড়িয়া সমুদ্রের মধ্যে গিয়া পড়িল তখন সমুদ্র একেবারে প্রলয়মূর্তি ধারণ করিয়া, ফুলিয়া পাহাড় সমান উঁচু হইয়া ডাঙার উপর ছুটিয়া পড়িল। শহর গ্রাম ঘর বাড়ি গাছপালা পলকে কোথায় ভাসিয়া গেল। এই দুর্ঘটনার ফলে প্রায় চল্লিশ হাজার লোক মারা পড়ে, অনেক জাহাজ ডুবিয়া যায়, আর সুণ্ডা প্রণালীর চেহারা একেবারে বদলাইয়া যায়। সমুদ্রের ঢেউ এমন বেগে আসিয়াছিল যে একটা জাহাজকে পাওয়া যায় সমুদ্র হইতে তিন মাইল দূরে শুকনা ডাঙার উপরে। ইহার তুলনায় আমাদের সেদিনকার ভূমিকম্পটাকে অবশ্য নিতান্তই সামান্য ব্যাপার বলিতে হইবে। তাহার সঙ্গে অগ্নিবৃষ্টি, পাহাড়বৃষ্টি বা সমুদ্রের ঢেউ এসব কোন হাঙ্গামা ছিল না।

পৃথিবীর মাটি কোঁকড়াইয়া বড় বড় পাহাড় পর্বতের সৃষ্টি হয়। সেইসব পাহাড় উঠিবার সময়ে মাটির স্তরগুলাকে বাঁকাইয়া ফাটাইয়া ভাঙিয়া ওলট-পালট করিয়া দেয়। যে মাটি সমানভাবে শোয়ান ছিল তাহাকে খাড়া করিয়া ঝুলাইয়া দেয়। কঠিন পাথরকে ঠেলিয়া নরম মাটির মধ্যে বসাইয়া দেয়, নরম মাটিকে চাপ দিয়া পাথরের ফাটলে ফোকরে ঢুকাইয়া দেয়, পাথরের গায়ে পাথরকে পিষিয়া ভাঙিতে চায়। এইরূপে সমস্ত মিলিয়া এমন চাপাচাপি করিয়া থাকে যে, কোথাও একটুকু স্তর খসাইতে গেলে সমস্ত পাহাড়শুদ্ধ টলমল করিয়া উঠে। এই সকল কাণ্ড প্রতি মুহূর্তেই চলিয়াছে। ধীরে ধীরে যুগের পর যুগ পাহাড়ের স্তর সরিয়া সরিয়া একদিন হয়ত একেবারেই বেসামাল হইয়া টলিয়া পড়িল; নরম মাটির ভিতর পাহাড় বসিতে বসিতে একদিন হঠাৎ পিছলাইয়া ধসিয়া গেল; দুই দিকের উল্টা চাপে ফুলিতে ফুলিতে একদিন পাহাড়ের দেমাক ফাটিয়া চৌচির

হইল, এইরকমে বহুদিনের ঠাসাঠাসি ঠেলাঠেলি এক একদিন হঠাৎ ভূমিকম্পের আকারে গা-ঝাড়া দিয়া বাহির হয়।

ভূমিকম্পের ধাক্কা মাটির ভিতর দিয়া ঢেউয়ের মতো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। সেই ঢেউয়ের আঘাতে কেমন করিয়া পৃথিবী টল্‌মল্‌ করিতে থাকে, তাহার সামান্য একটু নমুনা তোমরা দেখিয়াছ। তাহাতে ঘরবাড়ি ভাঙিয়া পড়ে, পথঘাট ফাটিয়া যায়, রেলের লাইন মোচড়াইয়া বাঁকিয়া যায়। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকায় কুইটো শহরে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহাতে শহরের কোন কোন জায়গায় মানুষগুলিকে ফুটবলের মতো ছুঁড়িয়া দিয়াছিল। তাহার একশত বৎসর পূর্বে পোর্টরয়ালের ভূমিকম্পে বাজারের ভিড়কে ছিটাইয়া নীচে বন্দরের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছিল। লিসবনের ভূমিকম্পে নদীতে বান ডাকিয়া শহরের অসংখ্য লোককে ডুবাইয়া দিয়াছিল। কয়েক বৎসর আগে সানফ্রান্সিসকো শহরে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল সে কেবল বাড়ি-ঘর ফেলিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, গ্যাসের নল আর বিদ্যুতের তার ভাঙিয়া জড়াইয়া সে শহরে আগুন লাগাইয়া দেয়। সে এমন সর্বনেশে আগুন যে শহরের সমস্ত দমকল মিলিয়াও তাহাকে কিছুমাত্র জব্দ করিতে পারে নাই। তারপরে শহরের কর্তারা বোমাবারুদ ফাটাইয়া আগুনের আশেপাশে অনেকগুলি বাড়ি উড়াইয়া দিয়া মনে করিলেন আগুন আর ছড়াইতে পারিবে না। কিন্তু আগুন প্রায় সিকি মাইল ফাঁকা জমি টপ্‌কাইয়া শহরের আর একদিকে ফুটিয়া বাহির হইল। যাহা হউক, খানিক বাদে বাতাসের মুখ ঘুরিয়া গেল তাই রক্ষা, তাহা না হইলে শহরের চিহ্নমাত্র থাকিত কিনা সন্দেহ।

ভূমিকম্পে অনেক সময়ে পাখিরা ব্যস্ত হইয়া উড়িতে থাকে। ডাঙার জন্তু ছুটাছুটি আর চিৎকার করিতে থাকে। একটা হাতির কথা শুনিয়াছি, সে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের বড় ভূমিকম্পের সময়ে প্রথমটা অবাক হইয়া চারিদিকে তাকাইতেছিল, তারপর কাঁপুনি যখন বাড়িয়া উঠিল তখন সে প্রাণপণে চার পা ছড়াইয়া মাটি আঁকড়াইয়া চিৎকার করিতে লাগিল। গল্প শুনিয়াছি, একটা বাড়ির পাঁচিলের উপরে দুইটি বিড়াল মুখামুখি বসিয়া সুর ভাঁজিতেছিল, এমন সময়ে ভূমিকম্পের ধাক্কায় দুইজনকেই পাঁচিল হইতে ফেলিয়া দেয়। সঙ্গীতচর্চায় হঠাৎ এরকম বাধা পাইয়া তাহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিবার জোগাড় করিতেছিল, এমন সময়ে পাঁচিল ভাঙিয়া দু-চারখানা ইঁট পড়িতেই তাহাদের যুদ্ধের উৎসাহ থামিয়া গেল। আর এক নাবিকের পোষা টিয়াপাখির গল্প শুনিয়াছি, সে আশ্চর্যরকম কথা বলিতে পারিত। একবার ভূমিকম্পে সে খাঁচাশুদ্ধ ঘরচাপা পড়িয়াছিল। পরে শোনা গেল ভাঙা ঘরের তলা হইতে কে যেন চিৎকার করিয়া গালাগালি করিতেছে। তখন ইঁট সরাইয়া দেখা গেল, পাখিটা খাঁচার মধ্যে এক জায়গায় কোণঠাসা হইয়া বসিয়া আছে, আর বলিতেছে "বড় গরম, বড় গরম"।

মানুষের কথা

জগতে কাহারও স্থির থাকিবার হুকুম নাই। জ্যোতির্বিদ বলেন, "চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র পৃথিবী সমস্তই চলিতেছে।" জড় বিজ্ঞানের পণ্ডিত বলেন, "প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে তাহার অতি সূক্ষ্ম অণুপরমাণু পর্যন্ত ছুটাছুটি করিতেছে।" ভূতত্ত্ববিদ বলেন, "এই পৃথিবীকে আজ যেমন দেখিতেছি, চিরদিন সে এমন ছিল না এবং পরেও এমন থাকিবে না—তাহার চেহারা পর্যন্ত যুগের পর যুগ বদলাইয়া চলিয়াছে।" সুতরাং মানুষ যে চিরকাল মানুষ ছিল না, সে যে ক্রমে এইরকম ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহা কিছুই আশ্চর্য কথা নয়। কোন্ আদিম কালের কোন্ জন্তু কেমন করিয়া

ক্রমে মানুষের মতো হইয়া উঠিল, তাহার সমস্ত ইতিহাস জানিবার কোন উপায় নাই। যতটুকু জানা যায় তাহাতে মানুষের সঙ্গে বানরের, বিশেষত 'বনমানুষের' জ্ঞাতি সম্পর্কটাই স্পষ্ট হইয়া ওঠে।

চোখে দেখিতে মানুষ ও বানরের চেহারার মধ্যে যেমন মিল দেখিতে পাই তেমনি কতগুলা তফাৎ বুঝিতে পারি, যাহার দরুণ বানরকে বানর বলিয়া বোঝা যায়। একটা মানুষের আর একটা গরিলার কঙ্কাল পাশাপাশি লইয়া দেখিবে শরীরের গড়ন মোটামুটি একইরকমের; একইরকম ভাবে হাড়ের পরে হাড় সাজাইয়া কাঠাম দুটিকে দাঁড় করান হইয়াছে। বাঘ সিংহ বা গরু ঘোড়ার কঙ্কাল যদি ইহার পাশে বসাও তবে কখনই এতটা মিল দেখিতে পাইবে না। কিন্তু এতটা মিল থাকিলেও দুয়ের মধ্যে তফাৎটাও বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়। গরিলার হাত প্রকাণ্ড লম্বা এবং মজবুত কারণ তাহাকে গাছে গাছে ফিরিতে হয়, চলিতে-ফিরিতে তাহাকে হাতের ব্যবহার করিতে হয়। গরিলার পায়ের পাতা ঠিক হাতেরই মতো অর্থাৎ বলিতে গেলে তাহার চারিটাই হাত। তাহার শরীরে যে অসাধারণ শক্তি, তাহার পাঁজরের হাড়গুলা দেখিলেই সেটা বেশ বোঝা যায়। তারপর মাথার খুলিটা—গরিলার দাঁত এবং চোয়াল খুবই মজবুত কিন্তু আসল মাথাটুকু অর্থাৎ মগজের জায়গাটুকু মানুষের তুলনায় খুব ছোট। মানুষকে বুদ্ধি খাটাইয়া বাঁচিতে হয়, তাই তাহার মগজ বাড়িয়া মাথাটাকে বড় করিয়া তুলিয়াছে। আরও কতগুলা সূক্ষ্ম তফাৎ আছে পণ্ডিতেরা যাহাকে খুব গুরুতর বলিয়া মনে করেন, যেমন হাঁটুর হাড়। মানুষ যে পায়ের পাতার উপর খাড়া হইয়া চলে এবং গরিলা যে সামনের হাত দুটিতে ভর রাখিয়া কুঁজা হইয়া চলে, হাঁটুর হাড় দেখিয়াই পণ্ডিতেরা তাহা বলিয়া দিতে পারেন।

মানুষ কতদিন হইল এ পৃথিবীতে আসিয়াছে অর্থাৎ কতদিন হইল সে 'মানুষ' হইয়াছে, তাহা পণ্ডিতেরা এখনও ঠিক করিতে পারেন নাই। সকলের চাইতে পুরাতন মানুষের চিহ্ন যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের চোয়ালের হাড় আর মুখের ভিতরকার গড়ন দেখিয়া মনে হয় তাহারা কথা বলিতে জানিত না। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার ডুবয় যবদ্বীপে প্রাচীন জন্তুর কঙ্কাল খুঁজিতে গিয়া একটা মানুষের কয়েক টুকরা কঙ্কাল খুঁড়িয়া তোলেন। সেটা মানুষের কঙ্কাল কি বানরের কঙ্কাল, সে বিষয়ে প্রথমে একটু সন্দেহ ছিল—কারণ তাহার মগজকোষটি বানরের চাইতে অনেকটা বড় হইলেও আজকালকার সভ্য মানুষের তুলনায় খুবই ছোট এবং কপালটাও বানরের মতো চ্যাপ্টা। তাহার দুইটা দাঁত পাওয়া গিয়াছিল, সে দুইটা দেখিলে গরিলার দাঁতের কথাই মনে হয়। কিন্তু তাহার উরুর হাড় দেখিয়া স্পষ্ট বোঝা গেল যে সে মানুষের মতো খাড়া হইয়া চলিত। এই প্রাচীন মানুষটির অর্থাৎ জন্তুটির নাম দেওয়া হইয়াছে বানর-মানুষ। ইহার চাইতে প্রাচীন কোন মানুষের কঙ্কাল আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

ইউরোপে সেকালের মানুষের যে-সকল চিহ্ন পাওয়া যায়, এই বানর-মানুষের তুলনায় তাহাদের খুব প্রাচীন বলা চলে না। কিন্তু তাহারাও এক-একজন প্রায় পাঁচ লক্ষ বৎসর আগেকার মানুষ। ধনুকের মতো বাঁকা ছোট ছোট পা, বানরের মতো উঁচু উঁচু ভ্রূ, একটু-আধটু কথা বলিতে পারে—সেইসব মানুষ এখন পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়াছে। এইসব মানুষের চেহারা কেমন ছিল তাহা এই সকল কঙ্কাল হইতেই কতকটা বোঝা যায়।

মানুষ যখন সভ্য হয় নাই, যখন সে অস্ত্র গড়িতে বা আগুন জ্বালাইতে শিখে নাই, তাহারও অনেক আগে সে এমন বিদ্যা শিখিয়াছিল যাহা মানুষ ছাড়া অন্য কোনও পশুর জানা নাই। সেই বিদ্যাটি খাড়া হইয়া চলিবার বিদ্যা। কেবলমাত্র পায়ের সাহায্যেই যখন সে চলিতে শিখিল তখন

হইতে তাহার হাত দুইটা ছাড়া পাইল। সেই সময় হইতে সে হাত দুটাকে যে কতরকম কাজে লাগাইয়াছে এবং কত কৌশল শিখিয়াছে, তাহার আর অন্ত নাই।

সেইসব মানুষেরা যে-সকল চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে পরিষ্কার দেখা যায় যে, হাতের ওস্তাদি কেমন করিয়া যুগের পর যুগ বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রথম যে মানুষ অস্ত্রের ব্যবহার করিতে শিখে, তাহার অস্ত্র ছিল গাছপাথর জানোয়ারের শিং ও হাড়। এই অতি প্রাচীন মানুষটি যদি অস্ত্রশস্ত্রের আরও উন্নতি করিতে পারিত, তবে হয়ত সে আরও কিছুকাল টিকিয়া থাকিত। কিন্তু পাথরের অস্ত্রওয়ালা মানুষের সঙ্গে সে পাল্লা দিয়া পারে নাই। প্রাচীনকালের নানারকম পাথরের অস্ত্র পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই পাওয়া গিয়াছে। সব চাইতে পুরান যেগুলি সেগুলিকে হঠাৎ দেখিয়া অস্ত্র বলিয়া বুঝা যায় না, কারণ সে সময়ে এক-এক টুকরা পাথরকে ঠুকিয়া ঠুকিয়া নিতান্তই মোটা রকমের, উবড়োখাবড়ো অস্ত্র গড়া হইত। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া এইরকম অস্ত্রের সাহায্যে তাহারা পৃথিবীতে শিকার করিয়া ফিরিয়াছিল। যে-সকল পর্বতের গুহায় তাহারা বাস করিত সেই গুহার মধ্যে পাথরে আঁচড় কাটিয়া তাহারা যে-সকল ছবি আঁকিত, তাহারও চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। সেই ছবিগুলি দেখিলে তোমরা হয়ত হাসিবে—কারণ আজকালকার পাঁচ-সাত বৎসরের শিশুও অমন ছবি আঁকিতে পারে। কিন্তু পণ্ডিতেরা এই সমস্ত ছবি দেখিয়া সেই গুহাবাসী মানুষদের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য খবর জানিতে পারিয়াছেন। এই মানুষদের গায়ে লম্বা লম্বা লোম হইত, তাহাদের চেহারা ছিল কতকটা এস্কিমোদের মতো, তাহারা চাষবাস জানিত না, বেদে জাতির মতো নানা স্থানে ঘুরিত আর দল বাঁধিয়া শিকার করিত। সম্ভবত ইহাদের অনেকেই কাঁচা মাংস খাইত এবং কেহ কেহ হয়ত মানুষ খাইতেও কোন আপত্তি বোধ করিত না। ইহার পর আরও বুদ্ধিমান একরকম মানুষ দেখা দিল যাহারা পাথর-কাটা বিদ্যায় রীতিমত কারিকর হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের অস্ত্রগুলি খুব সমান ও ধারাল এবং রীতিমত শান দিয়া পালিশ করা। তার উপর ইহারা মাটির বাসন গড়িতে, চাষবাস করিতে, কাপড় বুনিতে ও গরু ছাগল প্রভৃতি জন্তু পুষিতেও শিখিয়াছিল। ইহারা যেখানে যাইত সেইখানেই সেই প্রাচীন যুগের আনাড়ি মানুষকে তাড়াইয়া মারিয়া শেষ করিত। বলিতে গেলে, পাথরের যুগের এই নূতন মানুষটি হইতেই সভ্যতার ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে।

মেঘবৃষ্টি

বর্ষাকালে রাস্তায় বাহির হইবার আগে আমরা আকাশের পানে তাকাইয়া দেখি তাহার ভাবগতিক কিরূপ—মেঘ আছে কিনা, বৃষ্টির সম্ভাবনা অথবা ঝড় দেখা যায় কিনা। কিন্তু মেঘ কিরূপে জন্মায়, আকাশে কিভাবে থাকে, মেঘের আকার-প্রকার এবং চালচলন কিরূপ সে কথা ভাবিবার অবসর তখন আমাদের থাকে না।

মেঘের জন্মের কথা বোধহয় তোমরা সকলেই জান। পৃথিবীর খাল, বিল, পুকুর, নদী, সমুদ্রের জল গরমে বাষ্প হইয়া আকাশে মিশিয়া যায়; সেই বাষ্প জমিয়া খুব ছোট ছোট জলকণার সৃষ্টি হয়। এইসকল জলকণার স্তূপকেই আমরা বলি মেঘ। মনে হইতে পারে যে জলকণা ত বাতাসের চেয়ে ভারি; তাহা হইলে মেঘ কেমন করিয়া শূন্যে থাকে? বাস্তবিক মেঘ সর্বদাই নীচে নামিতে চেষ্টা করে। কখনও বাতাসের ঠেলায় উপরে উঠিতেও পারে, কিন্তু নীচে নামাই তাহার স্বভাব। যে মেঘের জলকণার আকার যত বড় সে মেঘ তত তাড়াতাড়ি নীচে নামে। জলকণাগুলি আকারে

বেশি বড় হইয়া গেলে বৃষ্টির আকারে মাটিতে পড়ে। খুব উঁচুতে যে মেঘ থাকে, তাহাতে অনেক সময়ে জলকণাগুলি জমিয়া বরফের কণা হইয়া থাকে। এই মেঘ আবার নীচে গরম বাতাসের মধ্যে নামিলে সেই বরফ গলিয়া জলকণা হইয়া যায়। ঠাণ্ডা দেশে এই বরফকণাই তুষার বৃষ্টি হইয়া মাটিতে পড়ে।

অনেক সময় উপরের মেঘ বৃষ্টি হইয়া মাটিতে পৌঁছাইবার আগেই বাষ্প হইয়া মিলিয়া যায়। কাজেই মেঘ আসিলেই যে বৃষ্টি পড়িবে, এ কথা বলা যায় না। শীতের দেশে মাঝে মাঝে একটা বড় মজার জিনিস দেখা যায়। মেঘের জলকণা খুব ঠাণ্ডা হইয়া নীচে নামিতে নামিতে হঠাৎ কোন গাছপালা অথবা অন্য কোন জিনিসের গায়ে বরফ হইয়া জমিয়া যায়।

মেঘ বৃষ্টি ও ঝড় বাতাসের খবর রাখিবার জন্য সকল সভ্য দেশেই বড় বড় সরকারী অফিস আছে। ইংরাজিতে তাকে বলে মিটিয়রলজিক্যাল (Meteorological) আফিস। এই সমস্ত আফিসের কাজ কেবল মেঘ বাতাস ইত্যাদির নানারকম মাপ-জোখের হিসাব লওয়া। সে কিরকম হিসাব? কোন্‌খানে কত গরম তাহার হিসাব, কোন্‌খানের বাতাস কতখানি ভিজা বা শুকনা তাহার হিসাব; কোন্‌খানে বাতাসের চাপ কিরূপ, বাতাস কতটা হাল্কা বা কতটা ভারি, তাহার হিসাব; বাতাস কতখানি জোরে কোন্‌দিকে চলিতেছে, কোন্‌খানে কতখানি বৃষ্টি পড়িল, কিরকম মেঘ দেখা দিল, তাহার হিসাব।

বাতাস যখন চলে তখন তাহাকে বলে 'হাওয়া', হাওয়া যখন ছোটে তখন তাহার নাম 'ঝড়'। বাতাস আবার চলা-ফিরা করে কেন? গরম লাগিলে বা জলের বাষ্প মিশিলে বাতাস ছড়াইয়া হাল্কা হইয়া উপর দিকে ভাসিয়া উঠে। তখন তাহার চাপ কমিয়া খানিকটা জায়গা যেন ফাঁকা হইয়া উঠিতে চায়। কিন্তু ফাঁকা হইবার যো নাই, চারিদিকের চাপে আশপাশ হইতে বাতাস ছুটিয়া সেই হাল্কা জায়গাটাকে দখল করিতে চায়, তাহাতেই বাতাসের চলাচল হয়। বাতাস যখন যেদিকে চলে, সে তখন মেঘগুলিকে শুদ্ধ সেদিকে টানিয়া লইতে থাকে। এইরকম টানাটানির মধ্যে পড়িয়া এক একটা মেঘের এক একরকম চেহারা হইয়া উঠে। যাঁহারা এ-বিষয়ে আলোচনা করিয়া থাকেন তাঁহারা মেঘের চেহারা দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে পারেন। খুব উঁচুতে ৫/৬ মাইল উপরে যে মেঘ থাকে তাহার চেহারা অতি হাল্কা সূক্ষ্ম চামরের মতো। সে মেঘে বৃষ্টি হয় না, সে মেঘ নীচে নামিতে গেলেই গরম বাতাসে শুকাইয়া মিলাইয়া যায়।

তারপর দু মাইল চার মাইল উঁচুতে ছিটান তুলার মতো বা চষাক্ষেতের মতো যেসব সাদা সাদা মেঘ দেখা যায়, তাহাতেও হঠাৎ বৃষ্টি পড়িবার কোন আশঙ্কা নাই। এই সমস্ত মেঘ যখন সূর্যাস্তের সময়ে লম্বা লম্বা স্তর বাঁধিয়া আকাশের গায়ে শুইয়া থাকে তখন তাহার উপর সূর্যের আলো পড়িয়া কি আশ্চর্য সুন্দর রঙের খেলা দেখা যায়, তাহা সকলেই দেখিয়াছ। বিদ্যুতের যে মেঘ তাহার চেহারাটা খুব গম্ভীর ও জমকালো হয়, সে যেন রাগে ফুলিয়া পাহাড়ের মতো উঁচু হইয়া উঠিতে থাকে কিন্তু বৃষ্টি নামিতে আরম্ভ করিলেই সে দেখিতে দেখিতে শান্ত হইয়া যায়। তখন সে বৃষ্টি মেঘ হইয়া ধোঁয়ার প্রলেপের মতো আকাশের গায়ে লেপিয়া যায়।

বিদ্যুৎ যখন চমকায় তখনই মনে হয় 'এইবার বাজ পড়ার শব্দ শুনিব'—এবং অনেক সময়ই সে শব্দ শোনা যায়। বিদ্যুৎ চমকাইলে বাতাসটা কিরকম তোলপাড় হইয়া উঠে, ওই আওয়াজটা হইতেই তাহা বুঝিতে পার। বিদ্যুতের ঝলক ছুটিবামাত্র চারিদিকে গরম বাতাস ঠিক্‌রাইয়া পড়ে, আবার সেই চোট্‌ সামলাইতে গিয়া চারিদিকের বাতাস ছুটিয়া কড়্‌কড়্‌ শব্দে টক্কর বাধাইয়া বসে। তাহার পরেও খানিকক্ষণ পর্যন্ত বারবার বহু দূরের মেঘ হইতে গুড়্‌গুড়্‌ করিয়া সেই শব্দের প্রতিধ্বনি আসিতে থাকে।

মিটিয়রলজিক্যাল আফিস থাকাতে বৃষ্টি বাদল সম্বন্ধে নানারকম খবর আমরা আগে হইতে জানিতে পারি। 'ঝড় আসিতেছে' এই খবর সময়মত জানিতে পারিলে মানুষে সাবধান হইয়া তাহার জন্য প্রস্তুত থাকিতে পারে। মনে কর, খবর আসিল—এখান হইতে দুই শত মাইল দূরে একটা বড় ঝড় খুব বৃষ্টি লইয়া ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে এইদিকে আসিতেছে। সে যদি বরাবর ঐভাবে এই মুখেই আসে এবং আসিতে আসিতে তাহার বৃষ্টি যদি ফুরাইয়া না যায়, অথবা যদি মাঝে কোথাও গরম শুকনা বাতাসে তাহার মেঘ শুকাইয়া না ফেলে, তবে চার ঘণ্টা পরে এখানে বৃষ্টি হইবে।

মিটিয়রলজিক্যাল আফিসে বড় বড় মানচিত্রে সর্বদাই চারিদিকের খবর আঁকিয়া রাখা হয়। বাতাসের চাপ, বাতাসের গতি, বাতাসের বেগ, বাতাসের উত্তাপ, বাতাসের ভিজা ভাব ও মেঘবৃষ্টি, সব খবর সেই মানচিত্রের গায়ে স্পষ্ট রেখা টানিয়া দেখান হয় এবং বাতাসের ভাবগতিক যেমন ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলাইতে থাকে, মানচিত্রের উপরেও সেই সমস্ত পরিবর্তনের হিসাব ক্রমাগত বদলাইয়া দেখান হয়।

বেগের কথা

যে লোক সৌখিন, সামান্য কষ্টেই কাতর হইয়া পড়ে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় 'ফুলের ঘায় মূর্ছা যায়।' রঘুবংশে আছে যে দশরথের মা ইন্দুমতী সত্যসত্যই ফুলের ঘায়ে কেবল মূর্ছা নয়, একেবারে মারাই গিয়াছিলেন। ইন্দ্রের পারিজাতমালা আকাশ হইতে তাঁহার গায়ে পড়ায় তাঁহার মৃত্যু হয়। প্রথম যখন এই বর্ণনাটা শুনিয়াছিলাম তখন ইহাকে অসম্ভব কল্পনা বলিয়া বোধ হইয়াছিল; কিন্তু এখন ভাবিয়া দেখিতেছি ইহা নিতান্ত অসম্ভব কিছু নয়।

তাল গাছের উপর হইতে ভাদ্রমাসের তাল যদি ধুপ্ করিয়া পিঠে পড়ে তবে তার আঘাতটা খুবই সাংঘাতিক হয়; কিন্তু ঐ তালটাই যদি তাল গাছ হইতে না পড়িয়া ঐ পেয়ারাগাছ হইতে এক হাত নীচে তোমার পিঠের উপর পড়িত, তাহা হইলে এতটা চোট্ লাগিত না। কেন লাগিত না? কারণ, বেগ কম হইত। কোন জিনিস যখন উঁচু হইতে পড়িতে থাকে তখন সে যতই পড়ে ততই তার বেগ বাড়িয়া চলে। যে হাড়ের টুকরাটি দোতলা হইতে একতলায় মানুষের মাথায় পড়িলে বিশেষ কোনই অনিষ্ট হয় না—সেইটিই যখন চিলের মুখ হইতে পড়িতে পড়িতে অনেক নীচে প্রবল বেগে আসিয়া নামে তখন তাহার আঘাতে মানুষ রীতিমত জখম হইতে পারে। ফুলের মালাটিকেও যদি যথেষ্ট উঁচু হইতে ফেলিয়া দেওয়া যায় তবে তাহার আঘাতটি যে একেবারেই মোলায়েম হইবে না, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

ঘূর্ণী বায়ুর সময় সামান্য খড়কুটা পর্যন্ত যে ঝড়ের বেগে গাছের ছালে বিঁধিয়া যায়, ইহা অনেক সময়েই দেখা যায়। একটা নরম মোমবাতিকে বন্দুকের মধ্যে পুরিয়া গুলির মতো করিয়া ছুটাইলে সে যে পুরু তক্তা ফুটা করিয়া যায়, ইহাও মানুষে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে। বন্দুকের গুলি জিনিসটা আসলে খুব মারাত্মক নয়; হাতে ছুঁড়িয়া মারিলে তাহাতে চোট্ লাগিতে পারে, কিন্তু সে চোট্ খুব সাংঘাতিক হয় না। কিন্তু সেই জিনিস যখন বন্দুকের ভিতর হইতে বারুদের ধাক্কায় প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া বাহির হয় তখন আস্ত মানুষটাকে এপার-ওপার ফুঁড়িয়াও তাহার রোখ থামিতে চায় না।

জলের কল হইতে যে-জলধারা পড়িতে থাকে, তাহার মধ্যে আঙুল চালাইয়া দেখ—যেটুকু

বাধা বোধ করিবে তাহা নিতান্তই সামান্য। কিন্তু ঐরকম সরু একটি জলের ধারা যখন খুব প্রবল বেগে ছুটিয়া বাহির হয় তখন মনে হয় সে যেন লোহার মতো শক্ত—তখন তাহাকে কুড়াল দিয়াও কাটা যায় না। ফ্রান্সের একটা কারখানায় চারশত হাত উঁচু পাহাড় হইতে জলের স্রোত আনিয়া তাহার জোরে কল চালান হয়। সেই জল যখন এক আঙুল মোটা একটি নলের ভিতর হইতে ভীষণ তোড়ে বাহির হয়—তখন তাহাতে তলোয়ার দিয়া কোপ মারিলে তলোয়ার ভাঙিয়া খান্ খান্ হইয়া যায়। এমনকি, বন্দুকের গুলিও তাহাকে ভেদ করিতে পারে না—তাহাতে ঠেকিয়া ঠিক্‌রাইয়া পড়ে। আমেরিকার কোন কোন কারখানার নর্দমা দিয়া যে-জল পড়ে, তাহার উপর কুড়াল মারিয়া দেখা গিয়াছে, জলের মধ্যে কুড়াল বসে না—জলের এমন বেগ!

চলন্ত জিনিস মাত্রেরই এইরূপ একটা ধাক্কা দিবার ও বাধা দিবার শক্তি আছে। পণ্ডিতেরা বলেন, জগতে যা কিছু তেজ দেখি, যে কোন শক্তির পরিচয় পাই, সমস্তই এই চলার রকমারি মাত্র। বাতাসে ঢেউ উঠিল, অমনি শব্দ আসিয়া কানে আঘাত করিল—আকাশে তরঙ্গ ছুটিল, অমনি চোখের মধ্যে আলোর ঝিলিক্ জ্বলিল। কেবল তাহাই নয়, প্রত্যেক ধূলিকণার মধ্যে কোটি কোটি পরমাণু ছুটাছুটি করিতেছে। ভিতরের এই ছুটাছুটি বাড়িলেই সব জিনিস গরম হইয়া উঠে। যখন ঠাণ্ডা হয়, তেজ কমিয়া আসে তখন বুঝিবে এই পরমাণুর ছুটাছটি ঢিমাইয়া পড়িতেছে।

যে-জিনিসটা ছুটিতে চায় তাহাকে বাধা দিলে সে গরম হইয়া ওঠে। তাহার বাহিরের বেগ বন্ধ হইয়া তখন ভিতরে পরমাণুর বেগকে বাড়াইয়া তোলে। বন্দুকের গুলিটা লোহায় লাগিয়া থামিয়া গেল—হাত দিয়া দেখ, এত গরম যে হাতে ফোস্কা পড়িবে। একটা শক্ত জিনিসের উপর ক্রমাগত হাতুড়ি মার, হাতুড়ির বেগ যতবার বাধা পাইবে ততই দেখিবে হাতুড়িটা গরম হইয়া উঠিতেছে—আর যাহার উপর আঘাত করিতেছে, তাহাকেও গরম করিয়া তুলিতেছে। রেলগাড়ি যখন লোহার রেলের উপর দিয়া যায় তখন চাকার সঙ্গে রেলের ঘষা লাগিয়া সে ক্রমাগত বাধা পাইতে থাকে। ট্রেন চলিয়া যাইবার পর যদি রেলের উপর হাত দিয়া দেখ, দেখিবে লোহাগুলি বেশ গরম হইয়া উঠিয়াছে। ট্রেন যখন স্টেশনে আসিয়া থামে, তখন তাহার চাকায় হাত দিলে দস্তুরমত গরম বোধ হয়।

কেবল যে কঠিন জিনিসেই বাধা দেয় তাহা নয়, বাতাসের মতো হাল্কা জিনিসেরও বাধা দিবার শক্তি আছে। খুব বড় একটা পাখা লইয়া জোরে চালাইতে গেলে বেশ বোঝা যায় যে বাতাসের ঠেলা লাগিতেছে। তোমরা নিশ্চয়ই উল্কা দেখিয়াছ। মাঝে মাঝে আকাশে যে তারার মতো জিনিসগুলি হঠাৎ কোথা হইতে বোঁ করিয়া ছুট্ দিয়া পালায়, সেগুলিই উল্কা। উল্কাগুলি এই পৃথিবীরই মতো ভীষণভাবে ঘণ্টায় পঞ্চাশ হাজার বা লক্ষ মাইল বেগে ছুটিতে থাকে। বাহিরের আকাশ তাহাকে বাধা দেয় না, কিন্তু দৈবাৎ যদি সে পৃথিবীর বাতাসের মধ্যে আসিয়া পড়ে অমনি বাতাস তাহাকে বাধা দিতে থাকে। এই বাধাতেই তাহার বেগ কমিয়া যায়, সে গরমে জ্বলিয়া আগুন হয়। সেই আগুনকে ছুটিতে দেখিয়া আমরা বলি 'ঐ উল্কা পড়িল।'

পৃথিবীর তুলনায় উল্কাগুলি নিতান্তই ছোট। তাই তাহাদের ধাক্কায় পৃথিবীর কোন ক্ষতি হয় না, উল্কাগুলিই মরিয়া শেষ হয়। কিন্তু দুইটা বড় বড় পৃথিবী যদি এইরকম ছুটাছুটি করিয়া ধাক্কা লাগায় তবে কাণ্ডটা কিরকম হয়! মানুষের কল্পনা তাহার ধারণাই করিতে পারে না। দুইটার মধ্যে যখন ধাক্কা লাগে তখন তাহাদের প্রচণ্ড বেগ বাধা পাইবামাত্র জ্বলিয়া আগুন হইয়া বাহির হয়। সেই আগুন হইতে পাহাড়-প্রমাণ স্ফুলিঙ্গ চারিদিকে হাজারে হাজারে ছুটিয়া যায়। দেখিতে দেখিতে দুই পৃথিবীর শেষ চিহ্ন ঘুচিয়া গিয়া কেবল লক্ষ লক্ষ মাইল জুড়িয়া আগুনের শিখা জ্বলিতে থাকে। এরূপ ঘটনা যে একেবারেই হয় না তাহা নয়; কিছুদিন আগে যে 'নূতন তারা' দেখা

গিয়াছিল তাহাও এইরূপ একটা লুপ্তবেগের আগুনমাত্র। কবে ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ কিনারে এই আগুন জ্বলিয়াছিল; তাহারই জ্বলন্ত কিরণ আকাশে তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিতে ছুটিতে এতদিনে আমাদের চোখে আসিয়া আঘাত করিয়া গেল। সেই যে আলোকের বেগ, তাহার কাছে আর সমস্ত বেগই হার মানিয়া যায়। কামানের গোলা এত যে প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া যায়, তাহার গতিও আলোকের গতির তুলনায় যেন রেলগাড়ির কাছে শামুকের চলার মতো।

আগুন

আজকালকার সভ্য মানুষ, যাহারা দিব্য আরামে ঘরে বসিয়া দিয়াশালাই ঠুকিয়া আগুন জ্বালায়, তাহারা ভাবিয়াই দেখে না যে এই আগুন মানুষের কত তপস্যার ধন। যে-আগুন বনে জঙ্গলে দাবানল হইয়া জ্বলে, যে-আগুন আগ্নেয় পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় জিভ মেলিয়া ধুঁকিতে থাকে— সেই আগুনকে মানুষ যখন আপনার শক্তিতে জ্বালাইতে শিখিল, সেইদিন মানুষ এমন বিদ্যা শিখিল যাহা মানুষ ছাড়া আর কেহ জানে না। চক্‌মকি পাথর ঠুকিয়া বা কাঠে কাঠে ঘষিয়া সেই সে কোন্ কালের আদিম মানুষ আগুন জ্বালাইবার উপায় বাহির করিয়াছিল, আজও পৃথিবীর কত অসভ্য জাতি ঠিক সেই উপায়ে প্রতিদিন আগুন জ্বালিতেছে। এই কাজ করিতে কৌশল ও পরিশ্রম দুয়েরই দরকার হয়। কাঠের মধ্যে কাঠ ঘুরাইয়া আগুন জ্বালিবার প্রথা আমাদের দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল—বেদে এবং পুরাণে তার কথা অনেক স্থানে, দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকবার এইভাবে আগুন জ্বালান বড় সহজ কথা নয়, সেইজন্য একবার আগুন জ্বালান হইতে তাহাতে বার বার কাঠ-কুটা শুক্‌না পাতা ইত্যাদি দিয়া সেই আগুনকে বাঁচাইয়া রাখা দরকার হইত। কেবল আমাদের দেশে নয়, এইরকম আগুন রক্ষার আয়োজন রোম গ্রীস ইজিপ্ট প্রভৃতি সকল দেশেই ছিল। অনেক সময়ে রীতিমত মন্দির গড়িয়া পুরোহিত রাখিয়া এই আগুনের তদ্বির করা হইত। লোকে সেই সকল মন্দির হইতে প্রতিদিন আগুন লইয়া আসিত এবং সকলে মিলিয়া আগুনের সম্মান ও পূজা করিত।

আগুন না থাকিলে মানুষের অবস্থা কি হইত? আগুন ছিল তাই মানুষ শীতের মধ্যেও টিকিতে পারিয়াছে, কত হিংস্র জন্তুর হাত হইতে আপনাকে বাঁচাইতে পারিয়াছে, রান্না করিতে শিখিয়াছে, মাটি পোড়াইয়া বাসন গড়িতে শিখিয়াছে, লোহা তামা প্রভৃতি ধাতুকে কাজে লাগাইতে শিখিয়াছে। সহরে গ্রামে ঘরের আশেপাশে সর্বদা যেসব জিনিস কাজে লাগে, তাহার দিকে চাহিয়া দেখ, আগুন না হইলে তাহার কোন্‌টা তৈয়ারি করা সম্ভব হইত? মাটির হাঁড়ি, কাঁসার বাসন, সোনা রূপার অলংকার এসব ত ছাড়িয়াই দিলাম। জুতাটি যে পায়ে দিয়াছ, তাহার কাঁটাগুলি ত লোহার, ঐ জুতা সেলায়ের জন্য লোহার ছুঁচ দরকার হইয়াছিল ত? আগুন না থাকিলে তাহা সম্ভব হইত কিরূপে? ঘরে এত যে সাবান সুগন্ধি ওষুধপত্র ব্যবহার কর, তাহার মালমশলার জন্য কত কারখানায় কত চুল্লি জ্বালিতে হয় তাহা একবার ভাবিয়া দেখ ত। রাত্রে যে আলো জ্বালাইয়া পড়াশুনা কর, সেই আলোটুকু যদি না থাকিত তবে কেমন অসুবিধা হইত বল দেখি। আর ঐ যে কাচের চশমা পর, কাচের 'থার্মমিটার' দিয়া জ্বর মাপ, আর অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণ প্রভৃতি অসংখ্য কাচের যন্ত্র ব্যবহার কর, ক্ষার চূণ ও বালি আগুনে না গলাইলে সে কাচ আসিত কোথা হইতে? আগুন ছাড়া পৃথিবী যদি কল্পনা করিতে চাও ত এই সমস্ত জিনিস বাদ দিতে হয়—এই সমস্ত জিনিসের সাহায্যে মানুষ জ্ঞান বিজ্ঞান ও সভ্যতায় যাহা কিছু উন্নতি লাভ করিয়াছে সে সমস্ত

লোপ করিতে হয়; আর মানুষকে কল্পনা করিতে হয় সেই আদিমকালের অসভ্যের মতো—যাহারা ফলমূল ও কাঁচা মাংস খাইয়া, গাছের ছাল বাকল ও জানোয়ারের চামড়া পরিয়া, গাছ পাথরের অস্ত্রে সাজিয়া, গাছে জঙ্গলে গুহা গহ্বরে লুকাইয়া ফিরিত। সে সময়ের পৃথিবীতেও কাঠ ছিল, কয়লা ছিল, আগুন জ্বালিবার মালমশলা সবই ছিল। ছিল না কেবল আগুন—ছিল না কেবল সেই জ্ঞানটুকু যাহাতে আগুন জ্বালিবার সংকেতটি জানা যায়। সেই মানুষ, আর এখনকার এই মানুষ! এ দুয়ের মধ্যে এত যে প্রকাণ্ড তফাৎ দেখিতেছ, তাহার প্রধান কারণ এই আগুনের আবিষ্কার!

আমাদের দেশে আগুনকে বলে 'সর্বভুক'। একবার যদি সে জিভ মেলিয়া বাহির হইল, তবে তাহার ক্ষুধার আর শেষ নাই—সে তখন সব খাইয়া উজাড় করিতে পারে। আগুনকে যদি তুষ্ট করিতে চাও, কাজে লাগাইতে চাও, তবে তাহার ক্ষুধা মিটাইবার খোরাক দেওয়া চাই। কাগজ দাও, খড় দাও, কাঠ দাও, কয়লা দাও, তেল ঘি কেরোসিন যাহা সে হজম করিতে পারে তাহাই দাও—একটা কোন খোরাক না জোগাইলে সে জ্বলিতে পারে না। আগুন জ্বালিবার জন্য মানুষে প্রতি বৎসর কত বন জঙ্গল উজাড় করে, মাটির ভিতরে ঢুকিয়া কত লক্ষ লক্ষ মণ কয়লা খুঁড়িয়া তোলে, কত বড় বড় ব্যবসা ফাঁদিয়া কেরোসিন প্রভৃতি খনির তেল দেশ-বিদেশে চালান দেয়, কত মোম চর্বি ঘি তেল খরচ করিয়া ঘরে ঘরে বাতি জ্বালায়, তাহার হিসাব লইতে গেলে অবাক হইতে হয়। আজকালকার নিতান্ত অসভ্য যে মানুষ—লঙ্কা দ্বীপের ভেদ্দা বা আফ্রিকার 'বুশম্যান'—তাহারাও আগুনের ব্যবহার জানে। অতি প্রাচীনকালে আগুন-ছাড়া মানুষ যাহারা ছিল তাহারা সে আগুনওয়ালা মানুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়া টিকিতে পারিত না, এ কথা সহজেই বোঝা যায়। শীতের অত্যাচারে, শত্রুর অত্যাচারে, হিংস্র জন্তুর অত্যাচারে—নানারকম বিপদে আপদে আগুনের সাহায্য না পাইলে আজকালকার এই মানুষ আজ কোথায় থাকিত, কে জানে? হয়ত মানুষ জাতিটারই পৃথিবী হইতে লোপ পাইবার জোগাড় হইত।

হিংস্র জন্তু পোষ মানিলেও তাহার হিংস্রতা একেবারে দূর হয় না। সেইজন্য সর্বদা সতর্ক থাকিতে হয়, কখন তাহার হিংসা বুদ্ধি জাগিয়া উঠে। আগুনকে বাগ মানাইতে গিয়াও মানুষকে পদে পদেই এইরকম বিপদে পড়িতে হইয়াছে। আমরা একবার শিলং পাহাড়ে গিয়াছিলাম; সেখানে পাহাড়ের গায়ে লম্বা লম্বা দাগ দেখিয়া দূর হইতে ভাবিয়াছিলাম, ওগুলি বুঝি পাহাড়ে উঠিবার রাস্তা। পরে কাছে গিয়া বুঝিলাম ওগুলি রাস্তা নয়, জঙ্গলের মাঝে মাঝে চওড়া ফিতার মতো ফাঁকা জমি;—ঠিক যেন পাহাড়ের মাথার উপর ক্ষুর চালাইয়া খালের মতো করিয়া চাঁচিয়া রাখিয়াছে। শুনিলাম, আগুনের ভয়ে নাকি ওরকম করা হইয়াছে; কোথাও আগুন লাগিলে, ঐ ফাঁকা জায়গা পর্যন্ত আসিয়া আগুন আর ছড়াইতে পারে না। আমেরিকার বড় বড় Prairie বা ঝোপজমিতে কেবল ঝোপজঙ্গল ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না—সেখানে আগুন লাগিলে এক-এক সময়ে ব্যাপার ভারি মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়। সে আগুন এমন হু হু করিয়া ছড়াইয়া পড়ে যে মানুষে অনেক সময়ে ঘোড়া ছুটাইয়াও তাহার হাত এড়াইয়া পলাইতে পারে না।

এসব ত গেল বাহিরের আগুনের কথা। মানুষের ঘরে ঘরে সংসারের কাজের জন্য প্রতিদিন যে আগুনের দরকার হয়, সেই আগুন যখন এক একবার ছাড়া পাইয়া ঘরবাড়ি সহর গ্রাম সব খাইয়া শেষ করে, তাহাও কি কম সাংঘাতিক! কখন কাহার অসাবধানতায় আগুন ছড়াইয়া সর্বনাশ উপস্থিত হয়, তাহার জন্য কতরকমে মানুষকে সতর্ক হইতে হয়। বড় বড় সহরে দমকলের স্টেশন থাকে, আগুন নিভাইবার জন্য কত লোকলস্কর ও কতরকম আয়োজন রাখিতে হয়। বড় বড়

দমকল, যাহা হইতে জলের ফোয়ারা ছুটিয়া আগুনের মধ্যে গিয়া পড়ে; তিনতলা চারতলার সমান লম্বা লম্বা মই, যাহাকে দূরবীণের মতো গুটাইয়া রাখা যায়; আর বড় বড় মোটর বা ঘোড়ার গাড়ি, যাহাতে আগুনের জায়গায় চট্‌পট্ ছুটিয়া যাওয়া যায়; আর আগুন লাগিলে পর আগুনের আফিসে তাড়াতাড়ি খবর পৌঁছাইবার জন্য নানারকম ব্যবস্থা। টেলিফোনের আফিসে একটিবার 'ফায়ার!' ('Fire') বলিয়া খবর দাও, অমনি মুহূর্তের মধ্যে আগুনস্টেশনের সাড়া শুনিবে— 'কোথায় আগুন?' বাস্! এক মিনিটের মধ্যে ঢং ঢং শব্দে দমকল ছুটিয়া বাহির হইবে। সে শব্দ শুনিলে রাস্তার গাড়ি ঘোড়া মোটর সাইকেল সব শশব্যস্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া দেয়। যাহারা আগুনের পল্টনে কাজ করে, তাহাদের শিক্ষা এবং সাহস দুই দরকার। ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহাদের বীরত্বের অনেক আশ্চর্য কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়।

বড় বড় আগুনের দৃশ্য একদিকে যেমন ভয়ানক, আর একদিকে তেমনি সুন্দর। আগুনে সহর বাড়ি পুড়াইয়া কত মানুষের সর্বনাশ করে, তাহাতে মানুষ হাহাকার করে, আবার সেই আগুনেরই প্রচণ্ড গম্ভীর তেজ দেখিয়া বিস্ময়ে মানুষ অবাক হইয়া থাকে। এম্‌ডেন (Emden) নামে জার্মানদের একটা যুদ্ধ জাহাজ কয়েকদিন বঙ্গসাগরে ভারি উৎপাত করিয়াছিল। সেই জাহাজের একটা গোলা মান্দ্রাজের একটা প্রকাণ্ড কেরোসিনের চৌবাচ্চায় পড়িয়া সমুদ্রের ধারে যে অগ্নিকাণ্ড লাগাইয়াছিল 'তামাসা' হিসাবে সে দৃশ্য নাকি অতি চমৎকার হইয়াছিল! আর কেরোসিনের জন্ম যেখানে,—সেখানে ব্যবসার জন্য খনি খুঁড়িয়া, কূয়া বসাইয়া, কেরোসিনের হ্রদ বিল ও আর বর্ণনা হয় না! পেটুক আগুন তখন মনের মতো খোরাক পাইয়া উল্লাসে লক্ষ লক্ষ মণ কেরোসিন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে থাকে তখন ব্যাপারটি যে কেমন হয়, তাহার আর বর্ণনা হয় না। পেটুক আগুন তখন মনের মতো খোরাক পাইয়া উল্লাসে লক্ষ লক্ষ জিভ মেলিয়া ধোঁয়ার হুঙ্কার ছাড়িয়া স্বর্গ মর্ত্য গ্রাস করিতে চায়। তাহার কাছে লঙ্কাকাণ্ডই বা কি আর খাণ্ডব দাহনই বা লাগে কোথায়।

লাইব্রেরি

লাইব্রেরি মানে পুস্তকাগার বা কেতাবখানা—অর্থাৎ সেখানে বই রাখা হয়। আজকাল আমাদের দেশে সহরে গ্রামে নানা জায়গায় ছোট বড় নানারকম লাইব্রেরি দেখা দিয়েছে, সুতরাং লাইব্রেরি জিনিসটা যে কিরকম সেটা আর কাউকে বুঝিয়ে দেবার দরকার নাই।

পৃথিবীর বড় বড় লাইব্রেরির নাম করতে গেলে লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরির নামটা নিশ্চয় করা উচিত। এই লাইব্রেরিতে সকল দেশের সকল সময়ের এবং সকল রকমের বই সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। আসিরিয়া বা অসুর দেশের রাজা অসুর-বানি-পালের আড়াই হাজার বছরের পুরনো লাইব্রেরি খুঁড়ে সেখান থেকে প্রায় বিশ হাজার ইঁটের পুঁথি এখানে এনে রাখা হয়েছে। তাতে তীরের ফলকের মতো খোঁচা-খোঁচা সব অক্ষর; সেই অক্ষর বুঝবার জন্য কত বড় বড় পণ্ডিতকে কত বছরের পর বছর ভাবতে হয়েছে। তাতে আসিরিয়া দেশের জ্যোতিষ পুরাণ ইতিহাস আইন আর ধর্মকর্মের কথা আছে, গল্পের বই কবিতার বই আছে, এমনকি লাইব্রেরির ক্যাটালগ বা বইয়ের ফর্দ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। তার চাইতেও অনেক পুরাতন পুঁথি কিছু কিছু আছে,

সেগুলি বেবিলনিয়ার ভাষায় লেখা। তার মধ্যে একখানা পুঁথি প্রায় ৬ হাজার বছর আগেকার! পেপিরস গাছের নরম ছালের উপর ছবির অক্ষরে লেখা ইজিপ্টের পুঁথিও সেখানে অনেক আছে।

ভারতবর্ষের নানান ভাষার পুঁথি, যে-ভাষা এখন কেউ পড়তে পারে না সেই সব অজানা ভাষার পুঁথি, চীনেদের হিজিবিজি অক্ষরের সেই আদ্যিকালের পুঁথি, আফ্রিকা আমেরিকার অদ্ভুত ভাষার পুঁথি, পাথরে খোদাই করা পুঁথি, তামা লোহা ইঁট কাঠের পুঁথি, কাগজ কাপড় রেশম পশম চামড়া বাকলের পুঁথি, হাতের লেখা হাজার হাজার পুঁথি, আর লক্ষ লক্ষ ছাপান পুঁথি—ঐ এক লাইব্রেরির মধ্যে এই সমস্ত জিনিস পাওয়া যায়। লাইব্রেরিতে যে বইয়ের ফর্দ রয়েছে সেই ফর্দ লিখবার জন্যই প্রায় দেড় হাজার প্রকাণ্ড বড় বড় খাতার দরকার হয়েছে।

এই লাইব্রেরিতে পড়বার জন্য পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ থেকে বড় বড় পণ্ডিতেরা পড়বার ঘরে প্রতিদিন আসা-যাওয়া করেন। তাঁদের দরকারমত বই, বলবামাত্র চট্‌পট্ এনে দেবার জন্য দু-তিনশ কেরাণী কর্মচারী সমস্তক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরি প্রায় দুশ বছরের পুরনো। অক্সফোর্ডের বডলিয়ান লাইব্রেরির বয়স প্রায় পাঁচশ বছর। তার আট লক্ষ ছাপান বই আর একচল্লিশ হাজার হাতের লেখা পুঁথির মধ্যে এমন অনেক জিনিস আছে যা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। বিশেষত প্রথম যখন মুদ্রাযন্ত্র হয়, সেই সময়কার ছাপান বইয়ের এমন চমৎকার সংগ্রহ আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। পারিসের জাতীয় লাইব্রেরি (Bibliotheque Nationale) কেবল যে বয়সে ৭০০/৮০০ বৎসর তা নয়, তার আয়তনও লণ্ডনের লাইব্রেরির চাইতে বেশি ছাড়া কম নয়। এই লাইব্রেরিতে প্রায় ত্রিশ লক্ষ ছাপান বই, হাতের লেখা এক লক্ষ পুঁথি, আড়াই লক্ষ মানচিত্র আর দশ লক্ষ ছবি সংগ্রহ করা হয়েছে। পুবদেশীয় প্রাচীন পুঁথির, অর্থাৎ এসিয়ার নানা অঞ্চলের পুঁথির নানারকম, দৃষ্টান্ত এখানে যেমন আছে, পৃথিবীর আর কোথাও তেমন নাই।

কিন্তু লাইব্রেরির চূড়ান্ত কাণ্ড যদি দেখতে হয় তবে আমেরিকায় যাওয়া দরকার। সেখানে ঠিক বৃটিশ মিউজিয়াম বা পারিস্ লাইব্রেরির মতো অত বড় লাইব্রেরি না থাকতে পারে কিন্তু যেগুলি আছে সেগুলিও বড় সামান্য নয়। আর তাদের বন্দোবস্ত এমন চমৎকার যে পৃথিবীর আর কোথাও তেমন সুন্দর ব্যবস্থা দেখা যায় না। লাইব্রেরি যত বড়ই হোক, বইয়ের সংখ্যা দশ লাখই হোক কি বিশ লাখই হোক, যে-কোন বই চাইবামাত্র ঠিক দু-মিনিটের মধ্যে যদি হাজির না হয় তবেই লাইব্রেরির দুর্নামের কারণ হয়। বই পেতে হলে কেবল তার নাম কিংবা নম্বরটি জানাতে হয়; অমনি লাইব্রেরিতে টেলিফোন করে দেয় আর দেখতে দেখতে তারের গাড়ি চড়ে বই এসে পড়বার ঘরে হাজির হয়। আমেরিকা কুবেরের দেশ, লক্ষপতি ক্রোড়পতি মহাজনের দেশ। লাইব্রেরির জন্য সে দেশে টাকার অভাব হয় না। সাধারণ লোকের ব্যবহারের জন্য আমেরিকার যুক্তরাজ্যে যেসব বড় বড় লাইব্রেরি আছে তেমন লাইব্রেরি পৃথিবীর আর কোথাও নাই। বস্টন পাবলিক লাইব্রেরিতে লোকে টাকা জমা দিয়ে বই পড়তে নেয়। এইরকমে প্রতিদিন কত বই আসছে যাচ্ছে বই-বিলির খাতায় তার হিসাব থাকে। সেই হিসাবে দেখা যায় যে এক বৎসরে পনের লক্ষ বার সেখানে বই বিলি করা হয়েছে!

পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে জাঁকাল লাইব্রেরি হচ্ছে আমেরিকান কংগ্রেস লাইব্রেরি। এই লাইব্রেরির বাড়িটার জন্যই সওয়া দুকোটি টাকা খরচ হয়েছে। লাইব্রেরিতে চল্লিশ লক্ষ বই রাখার মতো জায়গা রয়েছে। লাইব্রেরির তদ্বিরের জন্য প্রতি বৎসর দশ বিশ লাখ টাকা মঞ্জুর করা হয়। ঘর বাড়ি আলমারি আসবাবপত্র সব এমনভাবে তৈরি যে আগুনে ভূমিকম্পে ঝড় বিদ্যুতে তার কোন অনিষ্ট করতে পারে না। এমনকি, বইগুলো যাতে পোকায় না কাটতে পারে তার

জন্য মোটা মোটা মাইনে দিয়ে লোক রাখা হয়—তাদের কাজ হচ্ছে কেবল পোকা ধ্বংস করবার জন্য নানারকম ব্যবস্থা করা।

একালের মতো প্রাচীনকালেরও অনেক বড় লাইব্রেরির নাম শোনা যায়। আসুর-বানি-পালের লাইব্রেরি আর বেবিলনিয়ার লাইব্রেরির কথা আগেই বলা হয়েছে। তার চাইতেও আধুনিক সময়ে অর্থাৎ প্রায় দু হাজার বছর আগে গ্রীকদের আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির নাম খুব শোনা যেত।

এই লাইব্রেরির উপর রাজাদের খুব অনুগ্রহ ছিল, তাঁরা নানারকমে তার সাহায্য করতেন। বিদেশী জাহাজে যদি কখনও পুঁথি পাওয়া যেত, তাহলে সেই পুঁথিগুলো রেখে তার নকল দিয়ে জাহাজকে বিদায় করা হত। ভয় দেখিয়ে বা লোভ দেখিয়ে নানা দেশ থেকে নানারকমের পুঁথি নিয়ে আসা হত। এথেন্সে দুর্ভিক্ষের সময়ে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে শস্য জোগান হয়েছিল এবং তার দাম হিসাবে এথেন্সের ভাল ভাল সরকারী বই আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরিতে ভর্তি করা হয়েছিল। গ্রীকদের এই লাইব্রেরিটির সঙ্গে রোমানদের পার্গেমাম লাইব্রেরির ভারি রেষারেষি ছিল। রোমানরা তাদের লাইব্রেরি বাড়াবার জন্য লোকের উপর অত্যাচার করত, জবরদস্তি করে যার তার পুঁথি কেড়ে নিয়ে যেত, এমনকি গ্রীকদের লাইব্রেরি থেকে লোক ভাগিয়ে নেবার জন্য সর্বদাই চেষ্টা করত।

সে সময়ে কাগজের সৃষ্টি হয়নি, খালি পেপিরসের ছালকে পিটিয়ে লম্বা লম্বা 'রোল্' বা থান তৈরি হত। সেইগুলোতে লিখে লাটাইয়ের মতো গুটিয়ে লাইব্রেরিতে বই বলে জমা করা হত। রোমানদের জব্দ করবার জন্য গ্রীকেরা এই পেপিরসের চালান বন্ধ করে দেয়! রোমানরা তখন অনেক চেষ্টা করে চামড়া থেকে একরকম পাতলা কাগজের মতো জিনিস (পার্চমেন্ট) তৈরি করে তাই দিয়ে পুঁথি বানাতে শেখে।

নৌকা

আমি একজন ছেলের কথা জানিতাম, সে কখনও নৌকা দেখে নাই। ইংরাজি বইয়ে সে ছবি দেখিয়াছিল এবং নৌকা যে জলে ভাসে এটুকুও তাহার জানা ছিল; কিন্তু সত্যিকারের নৌকা কখনও সে চোখে দেখে নাই। আশা করি সন্দেশের পাঠক-পাঠিকাদের এমন কেউ নাই যাহাকে, নৌকা জিনিসটা কিরূপ, তাহা বুঝাইয়া বলা দরকার। এই আমাদের দেশেই নদী নালায় খালে বিলে কত রকম-বেরকম নৌকা দেখা যায়। ভারি ভারি বজরা, ছোট ছোট ডিঙি, লম্বা লম্বা ছিপ্—এক একটা এক-একরকম।

গাড়ি তৈয়ারি করিবার আগেই বোধহয় মানুষ নৌকা তৈয়ারি করিতে শিখিয়াছিল। এখনও অনেক অসভ্য জাত দেখা যায়, তাহারা গাড়ি ঘোড়ার ব্যবহার জানে না কিন্তু নৌকা বানাইতে জানে। তাহার কারণ, ডাঙায় মানুষ যেমন ইচ্ছা হাঁটিয়া যাইতে পারে, গাড়ি চড়িবার দরকার সে বোধ করে না, সে কথাটা তাহার মাথায়ও আসে না। কিন্তু নৌকা না হইলে জলের মধ্যে কতটুকুই বা যাওয়া আসা চলে? সেইজন্য মানুষের এমন একটি জিনিসের দরকার যাহা জলে ভাসে এবং যাহার উপর চড়িয়া এদিক ওদিক চলা ফিরা করা যায়।

সব চাইতে সহজ নৌকা কলার ভেলা! তোমরা হয়ত তাহাকে নৌকা বলিতেই আপত্তি করিবে; কিন্তু তাহাতে নৌকার কাজ যে চমৎকার চলিয়া যায়, এ কথা স্বীকার

করিতেই হইবে। তবে যদি তুমি সৌখিন লোক হও আর কাপড়-চোপড় কিংবা হাত-পা ভিজাইতে তোমার আপত্তি থাকে, তাহা হইলে আট দশটা ভেলার উপর মাচা বাঁধিয়া তুমি অনায়াসে একটু আরাম করিয়া বসিতে পার। আর ভেলারই বা দরকার কি? চার কোণে চারটি কলসী বা জালা বাঁধিয়া লইলেই ত চমৎকার হয়। কিন্তু সাবধান! কোথাও গুঁতা লাগিয়া যদি ফুটা হইয়া যায়, তবেই কিন্তু বিপদ! একটা বড়রকমের গামলা পাইলে তাহাতেও নৌকার কাজ বেশ ভালরকমেই চলিতে পারে।

আমি এগুলি কিছুই কল্পনা করিয়া বলিতেছি না।

যতরকমের বর্ণনা দিলাম সবরকমের নৌকারই রীতিমত ব্যবহার হইতে দেখা যায়। পেরু প্রভৃতি অনেক দেশে এবং অষ্ট্রেলিয়ার দ্বীপপুঞ্জে ভেলার উপর লতাপাতা ও ডালপালা দিয়া মাচা খাটান হয় অথবা খড়ের গদি বানাইয়া বসিবার চৌকি বানান হয়। মেসোপটেমিয়ার লোকেরা এখনও গোল গোল গামলায় চড়িয়া বড় বড় নদী পার হইয়া যায়। জলের উপর মাচা ভাসাইবার জন্য বড় বড় জালাও সে দেশে ব্যবহার করে।

অনেক দেশেই বড় বড় গাছের গুঁড়ি লম্বালম্বি চিরিয়া তার মাঝখানটা ফাঁপা করিয়া নৌকা বানান হয়। যাহারা অস্ত্রের ব্যবহার জানে তাহারা চেরা গাছের পেট কুরিয়া খোল বানায়। যাহাদের সে বিদ্যাও নাই তাহারা কাঠের মাঝখানটা পোড়াইয়া পোড়াইয়া গর্ত করিয়া ফেলে। কিন্তু বোধহয়, বেশির ভাগ নৌকাই আল্‌গা তক্তা জোড়া দিয়া বানাইতে হয়।

পুরীর সমুদ্রে জেলেরা যে কাটামারন ব্যবহার করে, কোন সভ্যদেশের কোন নাবিক তাহাতে চড়িয়া সমুদ্রে নামিতে সাহস পাইবে কিনা সন্দেহ। কতগুলি আল্‌গা কাঠ নারকেলের দড়ি দিয়া বাঁধিয়া তাহারা নৌকা বানায় আর সেই নৌকায় চড়িয়া এক মাইল দেড় মাইল পর্যন্ত সমুদ্রে অনায়াসে চলিয়া যায়।

সমুদ্রে ব্যবহারের জন্য অনেক জাহাজের সঙ্গে বড় বড় নৌকা লওয়া হয়। হঠাৎ জাহাজের কোন বিপদ হইলে লোকেরা জাহাজ ছাড়িয়া নৌকায় করিয়া সমুদ্রে নামে। এই সমস্ত নৌকাকে Life boat অর্থাৎ 'প্রাণ-বাঁচান নৌকা' বলে। জাহাজ বেশিরকম জখম হইলে অনেক সময় নৌকা নামান অসম্ভব হয়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বার্থ সাহেব একরকম হালকা নৌকা বানাইয়াছেন, তাহাকে মুড়িয়া রাখা যায় এবং জলে ফেলিয়া দিলে আপনি ভাসিতে থাকে। নাবিকেরা তখন তাহার আশেপাশে সাঁতরাইয়া জলের মধ্যেই নৌকা খাটাইয়া ফেলে।

এইবার আমাদেরই দেশের একটা অদ্ভুত 'নৌকা'র কথা বলিয়া শেষ করি। ভিস্তিওয়ালা আস্ত জন্তুর চামড়া দিয়া যে 'মশক' বানায়—সেই যে যাহার মধ্যে সে জল পুরিয়া রাখে—তাহা দেখিয়াছ ত? ঐরকম প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মশকে বাতাস ভরিয়া ফুটবলের মতো ফুলাইয়া পঞ্জাব অঞ্চলের লোকে অনেক সময় নদী পার হইয়া থাকে। নৌকাটির চেহারা কিরকম বীভৎস হয়, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে।

ব্যস্ত মানুষ

অসভ্য মানুষ যে কাজ নিজের হাতে করে, সভ্য মানুষে তারই জন্যে কলকব্জার ব্যবহার করে। গ্রীষ্মকালের এই যে গরম যার জন্য কতকাল ধরে লোকে নানারকম হাত-পাখার ব্যবহার করে এসেছে, এই গরমে কলে-চালান বিদ্যুতের পাখা না হলে আর আজকালকার মানুষের মন

ওঠে না। যে মানুষ এক সময় পায়ে হেঁটে দেশ দেশান্তর ঘুরে বেড়াত সেই মানুষ এখনকার যুগে গাড়ি-ঘোড়া চড়েও সন্তুষ্ট নয়, কত সাইকেল মোটর ট্রাম রেল, কত বাষ্প বিদ্যুতের কারখানা করে তবে তার চলাফেরা করতে হয়। এক সময় দিনে পঞ্চাশ মাইল গেলে সে ভাবত 'খুব এসেছি'। এখন এরোপ্লেনে চড়ে ঘণ্টায় ১০০ মাইল গিয়েও সে বলছে, 'এখনও হয়নি'।

এইসকল কলকব্জার দৌলতে একদিকে মানুষের সুখ হয় আরাম হয়, সময় আর পরিশ্রম বাঁচে, আর একদিকে হাঙ্গামাও বাড়ে, নূতন নূতন বিপদেরও কারণ দেখা দেয়। কলকারখানার চিম্‌নির ধোঁয়ায় সহরের বাতাসকে বিষাক্ত করে মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট করে; রাস্তায় মোটরের উৎপাতে নিরীহ পথিক চাপা পড়ে; জলে স্থলে আকাশে নানারকম নূতন দুর্ঘটনায় নূতন নূতন ভয়ের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তবু লাভ-লোকসানের হিসাব করে মানুষ সর্বদাই বলে 'লাভের চেয়ে লোকসান অনেক কম'। একশ বছর আগে এখান থেকে বিলাত যেতে তিন মাস চার মাস, কখনও বা আরও বেশি সময় লাগত। এখন ১৬/১৭ দিনে যাওয়া যায়। এরোপ্লেনের বন্দোবস্ত হলে ৪/৫ দিনে যাওয়া যাবে। কিন্তু সে বন্দোবস্ত হতে না হতে এখনই ভাবতে বসেছে, তার চাইতেও ভালো ব্যবস্থা সম্ভব কি না অর্থাৎ আজকে কলকাতায় ভাত খেয়ে বেরুলাম, কাল রাত্রে লণ্ডনে গিয়ে ঘুমোলাম, এইরকম বন্দোবস্ত হয় কিনা!

একখানা বাড়ি বানাতে কত সময় লাগে? এখন আমেরিকায় শুনতে পাই, সাত দিনের মধ্যে নাকি বাড়ি তৈরি হয়ে যায়। যারা তৈরি করে তাদের নমুনা-মতো নক্সা পছন্দ করে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বেড়াও—আট দশ দিন বাদে ঘুরে এসে দেখবে, তোমার জন্যে দিব্যি দোতলা দালান তৈরি হয়ে আছে। ঢালাই-করা পাথর জমিয়ে এইসব বাড়ি তৈরি হয়। ঢালাই করবার জন্যে নানারকম তৈরি-ছাঁচ মজুত রাখতে হয়। বাড়ি করতে হলে আগে ছাঁচগুলো খাটিয়ে এক একটা ফাঁপারকমের কাঠাম তৈরি হয়। তারপর সেই ছাঁচের ভিতরে পাথুরে মশলা ঢেলে দেয়। দুই দিনের মধ্যে মশলা জমে পাথর হয়ে যায়। এইরকমে এক একখানা আস্ত দেয়াল, আস্ত ছাদ বা মেজে তৈরি করে তারপর সেগুলোকে কল দিয়ে তুলে খাটিয়ে বসালেই বাড়ি হয়ে গেল।

এমনি করে মানুষ একদিকে কাজের সময়টাকে খুব সংক্ষেপ করে আনছে আর একদিকে দূরের জিনিসকে সে আর দূরে থাকতে দিচ্ছে না। পৃথিবীর এ-পিঠে আমরা বসে আছি, আর বারো হাজার মাইল দূরে ও-পিঠের মানুষরা আমেরিকায় বসে কি করছে, প্রতিদিন তার খবর পাচ্ছি। কোথায় যুদ্ধ হল, কোথায় জাহাজ ডুবল, কোথায় মানুষের কি নূতন কীর্তির কথা জানা গেল, অমনি 'সাত সমুদ্র তের নদী' পার হয়ে দেশবিদেশে খবর ছুটল—আমরা সকালে উঠে দিব্যি আরামে নিশ্চিন্তে বসে খবরের কাগজে তার সংবাদ পড়লাম। কিন্তু এতেও কি মানুষের মন ওঠে? মানুষে চেষ্টা করছে, খবরের সঙ্গে সঙ্গে তার ছবি শুদ্ধ টেলিগ্রামে পাঠাতে। 'চেষ্টা করছে'ই বা বলি কেন—সত্যি করেই টেলিগ্রামে ছবি পাঠাবার যন্ত্র তৈরি হয়েছে। এই যন্ত্রের এক মাথায় ছবি বসিয়ে তার উপর গ্রামোফোনের মতো ছুঁচের কলম বুলিয়ে যায়, আর ২০০/২৫০ মাইল দূরে আরেক মাথায় সেই ছবির অবিকল নকল উঠে যায়। কয়েক বৎসর আগে বিলাতের 'ডেইলি মিরার' কাগজের জন্যে লন্ডন থেকে ম্যানচেস্টার (প্রায় ২০০ মাইল দূর) এইরকম করে ছবি পাঠান হয়েছিল। সেই সময়ে এই ছবি পাঠাতে প্রায় ১৫ মিনিট লেগেছিল। আজকাল এর চাইতেও কম সময়ে আরও ভাল ছবি পাঠাবার যন্ত্র তৈরি হয়েছে। হয়ত আরও কয়েক বছর পরে বিলাত থেকে এদেশে ছবি পাঠাবার এইরকম বন্দোবস্ত হতে পারবে। ততদিনে হয়ত বিলাতের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলবারও ব্যবস্থা হবে। তোমরা যদি কেউ সে সময়ে বিলাত যাও, তাহলে এ দেশের বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথা বলা ত চলবেই, তারা তোমার চেহারা দেখতে চাইলে অমনি

ছবি তুলিয়ে টেলিগ্রাম করলেই তোমার সেই দিনকার টাট্‌কা ছবি দেখতে দেখতে এসে পড়বে।

একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক একরকম দ্রুত ডাকের যন্ত্র বানিয়েছেন, তাতে চিঠি-বোঝাই গাড়িগুলো তার-বাঁধান বিদ্যুতের পথের উপর উড়ে উড়ে চলে। এই উড়ুক্কু গাড়ি নাকি ঘণ্টায় ৩০০ মাইল বেগে ছুটতে পারে। পঞ্চাশ মণ ওজনের একটা গাড়িকে অনায়াসেই শূন্যে ঝুলিয়ে পার করা যায়। আজকালকার ডাকের গাড়ি এখান থেকে বর্ধমান যেতে না যেতেই এই গাড়ি একেবারে কাশীতে গিয়ে হাজির হবে।

পরিশ্রমের কাজ কিংবা কুলিমজুরের হাতের কাজ, যার জন্যে খুব বেশি বুদ্ধি খরচ করতে হয় না, সেগুলো না হয় কলে করা গেল। কিন্তু যাতে মাথা ঘামিয়ে বুদ্ধি খরচ করে পদে পদে হিসাব করতে হয়, তেমন কাজ কি কলে হতে পারে? হাঁ, তাও পারে—যেমন, অঙ্কের কল বা পাটিগণিত যন্ত্র। এই যন্ত্রে বড় বড় অঙ্কের যোগফল আপনা থেকেই বলে দেয়। বড় বড় কারখানার জমাখরচের হিসাব এই কলের সাহায্যে চট্‌পট্‌ বার করে ফেলা হয়। কলের মধ্যে কাগজ বসিয়ে ঠিক 'টাইপরাইটারে'র মতো চাবি টিপে টিপে অঙ্কগুলো লিখে যাও—তারপর ডানদিকের হাতলখানা চেপে দিলেই আপনা থেকেই তার যোগফল কাগজের উপর ছাপা হয়ে যাবে। মানুষে হিসাব করতে গিয়ে অনেক সময়ে ভুল করে, তাড়াতাড়িতে বড় বড় পণ্ডিত লোকেরও গোল বেধে যায়—কিন্তু কলের কাজ একেবারে নির্ভুল। অঙ্কটা যদি ঠিকমত দেওয়া হয়, কলের জবাবটাও ঠিক হবেই। কারণ কল কখন অন্যমনস্ক হয় না—তার হুঁসিয়ারির কোন ত্রুটি হয় না। বড় বড় ব্যাঙ্কের হিসাব রেখে রেখে যারা পাকা হয়ে গেছে, এই কলের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে তারা পর্যন্ত হার মেনে যায়। তাদের কাজ অর্ধেকটুকু বা সিকিটুকু হতে না হতেই কলের কাজ শেষ হয়ে যায়, আর সেটা ঠিক হল কিনা তাও দু-বার করে মিলিয়ে দেখবারও দরকার হয় না।

সমুদ্র বন্ধন

মানুষ টেলিগ্রাফের কৌশল যখন আবিষ্কার করল, সে প্রায় একশ বছরের কথা। সেই সময় থেকে এই পৃথিবীটার আষ্টেপৃষ্টে খুঁটি মেরে তার বসিয়ে মানুষ দেশ বিদেশে খবর চালাচালি করবার ব্যবস্থা করে আসছে। তারের পথ দিয়ে বিদ্যুতের খবর চলে; সেই তার মানুষ যেখান দিয়েই নিতে পেরেছে—সেখান দিয়েই খবর চলবার পথ খুলে গিয়েছে। কেবল ডাঙায় নয়, গভীর সমুদ্রের ভিতর দিয়েও হাজার হাজার মাইল তার পৃথিবীর এপার-ওপার জুড়ে ফেলেছে। সমুদ্রের মধ্যে খোঁটা বসাবার যো নাই, এমন কিছু নাই যার সঙ্গে তার বেঁধে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়—কাজেই সেখানে টেলিগ্রাফের তার বসাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে তারের দুই মাথা ডাঙায় রেখে বাকী সমস্ত তারটিকে জলের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া।

সত্তর বৎসর আগে যখন এইরকমভাবে ইংলন্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের তারের যোগ করবার প্রস্তাব হয়েছিল তখন লোকে সেটাকে পাগলের প্রস্তাব বলে ঠাট্টা করেছিল। অথচ এখন তার চাইতে বড় বড়, একটি নয়, দুটি নয়, অন্তত দু হাজার টেলিগ্রাফের লাইন সমুদ্রের নীচে বসান হয়েছে। মানুষের যত বড় বড় কীর্তি আছে তার মধ্যে এই সমুদ্রবন্ধনের কীর্তিটা বোধহয় কারও চাইতে কম আশ্চর্য নয়। এর জন্য মানুষকে যে কতরকম বাধাবিপদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে তা আর বলে শেষ করা যায় না। ইংলন্ড আর ফ্রান্সের মধ্যে ২৫/৩০ মাইল সমুদ্রের ফারাক; সে

সমুদ্রও খুব গভীর নয়। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে যখন অনেক হাজার টাকা খরচ করে এইটুকু সমুদ্রের মধ্যে তার ফেলা হল আর সেই তার দিয়ে এপার-ওপার খবর চলাচল হল—তখন টেলিগ্রাফ কোম্পানির মধ্যে খুবই উৎসাহ হয়েছিল। কিন্তু সে উৎসাহ চব্বিশ ঘন্টার বেশি থাকেনি। কারণ, একটা দিন যেতে না যেতেই জেলে-জাহাজের জালের টানে তারের লাইন ছিঁড়ে নিয়ে খবর আসা বন্ধ হয়ে গেল। পরের বছর আবার দুই লক্ষ টাকা খরচ করে অনেক কষ্টে আরো মোটা আর মজবুত তার বানিয়ে নূতন লাইন বসান হল। সেই তারে অনেকদিন বেশ কাজ চলবার পর লোকের মনে বিশ্বাস হল যে—হ্যাঁ, ছোটখাট সমুদ্রের মধ্যে তার বসান চলতে পারে।

পরের বৎসর ইংলন্ড ও স্কটলন্ড থেকে আয়ার্লন্ড পর্যন্ত টেলিগ্রাফের লাইন বসাবার জন্য তিনবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তিনবারই সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। দুবার জোয়ার-ভাঁটার বিষম টানে পাহাড়ের গায়ে আছাড় খেয়ে খেয়ে তারের লাইন ভেঙেচুরে ভেসে গেল। আর তৃতীয়বারে তারের জাহাজ সমুদ্রের ওপারে পৌঁছবার আগেই সব তার ফুরিয়ে গেল—তারের আগাটা সমুদ্রেই পড়ে গেল—আয়ার্লন্ড পর্যন্ত আর পৌঁছলই না। যা হোক. চতুর্থবারের চেষ্টায় আইরিশ সমুদ্রের ভিতর দিয়ে নিরাপদে তারের লাইন বসান হল। তারপর দেখতে দেখতে পাঁচ দশ বছরের মধ্যে ইউরোপ আমেরিকায় অনেক দেশেই সমুদ্রের ভিতরে, পঁচিশ পঞ্চাশ বা একশ মাইল পর্যন্ত লম্বা তার বসান হয়ে গেল। তখন ইংলন্ডের এক টেলিগ্রাফ কোম্পানি সাহস করে বলল, "আমরা অতলান্তিক মহাসাগরের ভিতর দিয়ে ইংলন্ড থেকে আমেরিকা পর্যন্ত টেলিগ্রাফের তার বসাব।"

লোকে বলল, 'সে কি কথা! অতলান্তিকের ওপার যে দু হাজার মাইল দূর! সেখানকার সমুদ্র যে তিন মাইল গভীর! সমুদ্রের নীচটা উঁচুনীচু পাহাড়ের মতো, তাতেই যে হাজার মাইল তার খেয়ে যাবে! অসম্ভব লম্বা তার, অসম্ভবরকম ভারি করাতে অসম্ভব খরচ—সবই অসম্ভব!" কিন্তু টেলিগ্রাফ কোম্পানির যাঁরা পাণ্ডা তাঁরা কোমর বেঁধে বসলেন, অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে। কোম্পানির মূলধন হল পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। একুশ হাজার মাইল লম্বা তামার তারকে দড়ির মতন পাকিয়ে পাকিয়ে, তার উপর আঙুলের মতো পুরু করে রবারের প্রলেপ দিয়ে, তার উপর সাড়ে তিন লক্ষ মাইল লোহার তার পেঁচিয়ে টেলিগ্রাফের লাইন তৈরি হল। এই সমস্ত তার যদি একটানা সোজা করে বসান হত, তাহলে পৃথিবীটাকে প্রায় চোদ্দবার পাক দিয়ে বেঁধে ফেলা যেত— কিংবা এখান থেকে চাঁদ পর্যন্ত পৌঁছান যেত! লাইনের ভিতরকার তামার তারটুকু দিয়েই বিদ্যুৎ চলে; রবারের কাজ কেবল বিদ্যুৎটাকে তারের মধ্যে আটকে রাখা। লোহার প্যাঁচাল তারটুকু হল বর্ম। ওটা না থাকলে পাহাড়ের ঘষায় স্রোতেব ধাক্কায় জলজন্তুর উৎপাতে দুদিনে তার নষ্ট হয়ে যায়—গভীর জলে লাইন বসাতে গিয়ে আপনার ভারে তার আপনি ছিঁড়ে যায়। সমস্ত লাইনটির ওজন হল সত্তর হাজার মণ।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে দুই জাহাজ বোঝাই তার আমেরিকার দিকে রওনা হল। তারের এক মাথা আয়ার্লন্ডের তীরের উপর রেখে কোম্পানির জাহাজ পশ্চিম মুখে তার ফেলতে ফেলতে চলল। বড় বড় চৌবাচ্চার মধ্যে তারের কুণ্ডলী জড়ান রয়েছে। ক্রমাগত ঘষায় ঘষায় তারের লাইন গরম হয়ে ওঠে, তাই চৌবাচ্চায় জল ভরে রাখতে হয়। জাহাজের উপর 'ব্রেক' বসান, তাতে তারটাকে প্রয়োজনমত টেনে ধরে—পাছে হড়্‌হড়্ করে সব তার বেরিয়ে যায়। জাহাজ যদি ঘন্টায় পাঁচ মাইল যায়, তাহলে সমুদ্রের উঁচুনীচু হিসাব বুঝে, ঘন্টায় ৬ মাইল কি ৭ মাইল তার ছাড়তে হয়। আবার বেশি টান পড়লে পাছে তার ছিঁড়ে যায় সেজন্য তারের 'টান্' মাপবার জন্য একটা যন্ত্র আছে। টান বেশি হলেই ব্রেক ঢিলা করে দেয়। তারের ভিতর দিয়ে দিনরাত ডাঙার সঙ্গে জাহাজের সংকেত চলতে থাকে। হঠাৎ কোথাও তার ছিঁড়ে গেলে

বা জখম হলে অমনি সে সংকেত বন্ধ হয়ে যায়। তাহলেই জাহাজের লোকেরা বুঝতে পারে কোথাও কিছু গোলমাল হয়েছে। তখন আবার তার গুটিয়ে গুটিয়ে, সেই জখম জায়গা পর্যন্ত ফিরে গিয়ে, নষ্ট লাইন মেরামত করতে হয়।

এমনি সমস্ত আয়োজন করে কোম্পানির জাহাজ রওনা হল। কিন্তু পাঁচ মাইল যেতে না যেতেই হঠাৎ কোথায় টান লেগে তারের লাইন ছিঁড়ে গেল। তখন ফিরে এসে তীরের দিক থেকে সমস্ত তারটিকে টেনে টেনে, তার ভাঙা মুখ বার করে তার সঙ্গে নূতন তার জুড়ে জাহাজ আবার পশ্চিমে চলল। দু-তিন দিন নিরাপদে চলতে চলতে প্রায় চারশ মাইল তার বসাবার পর হঠাৎ ব্রেক কষাবার দোষে তার ছিঁড়ে আড়াই মাইল গভীর সমুদ্রে তলিয়ে গেল। জাহাজের লোকে হতাশ হয়ে বন্দরে ফিরে চলল, কোম্পানির সাড়ে তিন লক্ষ টাকার মাল (৪০০ মাইল তার) সমুদ্রের নীচেই পড়ে রইল।

পরের বৎসর আবার নূতন করে চেষ্টা আরম্ভ হল। এবার স্থির হল এই যে, সমুদ্রের মাঝখানে দুই জাহাজের তারের মুখ একত্র করে তারপর দুই জাহাজ দুই দিকে তার বসিয়ে চলবে—একটা যাবে আমেরিকার দিকে, আরেকটা আয়ার্লন্ডের দিকে। মাঝ সমুদ্রে যাবার পথে এমন ঝড় উঠল যে তেমন ঝড় খুব কমই দেখা যায়। সপ্তাহ ভরে ঝড়ের আর বিরাম নাই। তারের ভারে বোঝাই জাহাজ ঝড়ের ধাক্কায় ডোবে-ডোবে অবস্থায় সমুদ্রের মধ্যে নিরুপায় হয়ে মাতালের মতো টলতে লাগল। অনেক কষ্টে প্রাণ বাঁচিয়ে ষোল দিন পর তারা মাঝ সমুদ্রে হাজির হল। তারপর এর-লাইন ওর-লাইনে জুড়ে দিয়ে তারা দুইজনে দুই মুখে চলল। তারের ভিতর দিয়ে এক জাহাজ থেকে আরেক জাহাজ পর্যন্ত বিদ্যুতের সংকেত চলছে—কিন্তু চল্লিশ মাইল পার না হতেই হঠাৎ সংকেত বন্ধ হয়ে গেল, এক জাহাজ থেকে আরেক জাহাজের কোন সাড়াই পাওয়া যায় না। আবার দুই জাহাজ মুখোমুখি হয়ে তারের সঙ্গে তার জুড়ে দুই দিকে ছুটল। এবারের দৌড় একশ মাইল। তারপরেই আর সাড়া শব্দ নাই—আবার কোথায় লাইন ফেঁসে গেছে! আরম্ভেই দুই-দুইবার ব্যাঘাত পেয়ে আর নানারকমে নাকাল হয়ে জাহাজ আবার নিরাশ হয়ে ফিরে এল। 'লাভের মধ্যে, কোম্পানির মাল, দরিয়ামে ঢাল।'

এইবার কোম্পানির উৎসাহ প্রায় নিভে এসেছিল। অনেকেই পরামর্শ দিলেন যে, এ অসম্ভব কাজের পিছনে আর অনর্থক টাকা নষ্ট করা উচিত নয়। কোম্পানির বড় বড় পাণ্ডারা পর্যন্ত বলতে লাগলেন, এখন তারের লোহালক্কর সব বিক্রি করে টেলিগ্রাফ কোম্পানির কারবার বন্ধ করে দেওয়াই ভাল। কেবল দু-একজন উৎসাহী লোক বলল যে, তারা এখনও হার মানতে প্রস্তুত নয়। শেষটায় সেই দু-একজনেরই বিশেষ চেষ্টায়, সেই বছরেই আর-একবার প্রাণপণ আয়োজন করে, অনেকরকম হাঙ্গামার পর আয়ার্লন্ড থেকে আমেরিকা পর্যন্ত নিরাপদে লাইন বসান হল—টেলিগ্রাফ কোম্পানির জয়-জয়কার পড়ে গেল। তখন এদেশের সিপাহী বিদ্রোহ সবেমাত্র শেষ হয়েছে—কিন্তু সে খবর তখনও আমেরিকায় পৌঁছায়নি। বিদ্রোহের জন্য কানাডা থেকে দুই দল ইংরাজ সৈন্য এ দেশে আসবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। তারের লাইন বসান হতেই ইংলন্ড থেকে খবর গেল, 'সৈন্য পাঠাবার দরকার নাই।' ঐ খবর যদি না যেত তাহলে মিছামিছি সৈন্য পাঠিয়ে, গভর্নমেন্টের অন্তত সাত লক্ষ টাকা খামখা বাজে খরচ হয়ে যেত। এই কথাটা প্রচার হওয়াতে টেলিগ্রাফ কোম্পানির খুব বিজ্ঞাপন হয়ে গেল। সমুদ্র পার করে টেলিগ্রাফ পাঠাবার সুবিধা যে কি, মানুষকে তা বোঝাবার জন্য আর বেশি ব্যাখ্যা বা বক্তৃতার দরকার হল না। তুমুল উৎসাহে টেলিগ্রাফ কোম্পানির ব্যবসার আরম্ভ হল।

কিন্তু হায়! কয়েক সপ্তাহ যেতে না যেতেই টেলিগ্রাফের সাড়া ক্ষীণ হতে হতে একদিন

একেবারেই সব বন্ধ হয়ে গেল—এপারের বিদ্যুৎ আর ওপারে পৌঁছায়ই না। এত সাধের টেলিগ্রাফ-লাইন, তার কিনা এই অকাল মৃত্যু—তিন মাসও তার আয়ু হল না। পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করে বললেন যে, তারের মধ্যে যে বিদ্যুৎ চালান হয়েছে—সেই বিদ্যুতের তেজ খুব বেশি হওয়াতেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

তারপর সাত বৎসর গেল আবার নূতন করে লাইন বসাবার আয়োজন করতে। অনেকরকম আলোচনা আর পরীক্ষার পর, আরও মজবুত করে নূতন তার তৈরি হল। সেই তারের লাইন প্রশস্ত এক জাহাজে করে সমুদ্রে পাঠান হল। জাহাজ ৪৪ মাইল সমুদ্র পার হতেই বোঝা গেল, তারের মধ্যে কোথাও গলদ রয়ে গেছে। সেটা খুঁজে মেরামত করে তারপর ৭০০ মাইল পর্যন্ত বিনা উৎপাতে গিয়ে আবার এক মারাত্মক গলদ। আবার অনেক মাইল তার গুটিয়ে নিয়ে তারপর এক জায়গায় প্রকাণ্ড জখম পাওয়া গেল। সেইটুকু দেখে মেরামত করতে প্রায় দশ ঘন্টা সময় নষ্ট হল। প্রায় ১২০০ মাইল যাবার পর আবার সেইরকম বাধা। আবার সেই গভীর সমুদ্র থেকে তার টেনে তুলে, কোথায় দোষ আছে খুঁজে বার করে মেরামত করতে হবে। কিন্তু এবারে মাইলখানেক তার গুটিয়ে তুলতেই বাকী তারটুকু চোখের সামনেই পট্ করে ছিঁড়ে জলের মধ্যে ফস্কে পড়ল।

জাহাজের কর্তারা পরামর্শ করলেন, আঁকড়ষি দিয়ে ঐ তার তুলতে হবে। প্রকাণ্ড লোহার শিকলের আগায় অদ্ভুত নখ-ওয়ালা যন্ত্র ঝুলিয়ে, তাই দিয়ে নাবিকেরা সমুদ্রের তলায় হাতড়াতে লাগল। একবার মনে হল আঁকড়ষিতে তার আঁক্‌ড়িয়েছে—অমনি টানাটানির ধূম পড়ে গেল। প্রায় আড়াই মাইল গভীর সমুদ্র, তার নীচ পর্যন্ত শিকল নেমেছে, সে শিকল গুটিয়ে তোলা কি সহজ কথা! এক হাত দু হাত, দশ হাত বিশ হাত, একশ হাত দুশ হাত, এমনি করে প্রায় মাইলখানেক শিকল তুলবার পর তারে-গাঁথা আঁকড়ষি-শুদ্ধ দেড়মাইল শিকল ছিঁড়ে জলের মধ্যে অন্তর্ধান। তখন মোটা শনের দড়ি দিয়ে আবার সমুদ্রের মধ্যে নূতন করে আঁকড়ষি ফেলা হল। তিন চারদিন ক্রমাগত চেষ্টার পর আবার তারের লাইন আঁকড়িয়ে পাওয়া গেল। কিন্তু এবারেও তুলবার সময় তারের ভারে দড়িদড়া সব ছিঁড়ে আঁকড়ষিটা জলের ভিতর তলিয়ে গেল। তারপর আরও দুইখানা আঁকড়ষি এইরকমে হারিয়ে জাহাজের শিকল দড়ি সব প্রায় শেষ করে ইংলন্ডের জাহাজ ইংলন্ডেই ফিরে চলল।

এতদিনের আশা ভরসার পর এইরকম দুঃসংবাদ! কিন্তু মানুষের প্রতিজ্ঞার কি জোর! পরের বৎসর (১৮৬৬) সেই জাহাজ আবার নূতন তার বোঝাই করে নূতন উৎসাহে সমুদ্রে বেরুল—দুই সপ্তাহের মধ্যে সে জাহাজ সারা সমুদ্র লাইন বসিয়ে আমেরিকার টেলিগ্রাফ স্টেশন পর্যন্ত তার জুড়ে ফেলল। তখনকার আনন্দের কথা বর্ণনায় শেষ করা যায় না। কোম্পানির একজন এঞ্জিনিয়ার সে সময়ে লিখেছিলেন "যখন তার বসান শেষ হল, তোপের গর্জন আর মানুষের আনন্দধ্বনির মধ্যে জাহাজের নাবিকেরা পাগলের মতো চীৎকার করতে লাগল, তখন গৌরবে আমারও শরীরের রক্ত প্রবল বেগে আমার বুকের মধ্যে তোলপাড় করছিল। কতগুলো লোক লাইনের তার ধরে নেচে নেচে গাইতে লাগল। কেউ কেউ পাগলের মতো তারটাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগল। চোখের জলে আনন্দের কোলাহলে হাসিকান্না সব মিশিয়ে সকলে মিশে মহোৎসব লাগিয়ে দিল।"

এখানেও তাদের উৎসাহের শেষ হয়নি। সেই জাহাজ আবার ফিরে গিয়ে ১৮ দিন ধরে অজানা সমুদ্রের ভিতর হাতড়িয়ে, আগেরবারের সেই হারান লাইন উদ্ধার করে, সেই লাইনকেও আমেরিকা পর্যন্ত পৌঁছে দিল। এতদিনে, প্রায় চার কোটি টাকা নষ্ট করবার পর, কোম্পানির কারবারের পাকা প্রতিষ্ঠা হল।

শনির দেশে

কেউ যদি বলে যে, এই পৃথিবীর বাইরে যেখানে বলবে, সেখানে নিয়ে তোমাদের তামাশা দেখিয়ে আনবে—তাহলে তোমরা কোথায় যেতে চাও? আমি জানি, সেরকম হলে আমি নিশ্চয় শনিগ্রহে যেতে চাইব। পৃথিবীর আকাশে আমরা শুধু চোখে যতটুকু দেখতে পাই, তাতে মনে হয় যে, সব চাইতে সুন্দর জিনিস হল চাঁদ। সেখানে একবার যেতে পারলে আর কিছু না হোক, এই পৃথিবীটাকে কেমন মস্ত আর জমকালো চাঁদের মতো দেখায়, সেটা নিশ্চয়ই একটা দেখবার মতো জিনিস। কিন্তু শনিগ্রহে যাবার পথে সেটা আমরা দেখে নিতে পারব।

যাক, মনে কর যেন শনিগ্রহে যাত্রা করাই স্থির হল। মনে কর এমন আশ্চর্য আকাশ-জাহাজ তৈরি হল যাতে পৃথিবী ছেড়ে, পৃথিবীর বাতাস ছেড়ে ফাঁকা শূন্যের ভিতর দিয়ে চলে যাওয়া যায়। তোমার বয়স কত? দশ বৎসর? বেশ! তাহলে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে আমরা স্বপ্ন-জাহাজে রওনা হলাম শনিগ্রহে যাবার জন্য। আমাদের জাহাজটা মনে কর খুব দ্রুত এরোপ্লেনের মতো ঘন্টায় ১০০ মাইল বা ১২৫ মাইল করে চলে।

আমরা আকাশের ভিতর দিয়ে হু হু করে চলেছি আর পৃথিবীর ঘর বাড়ি সব ছোট হতে হতে একেবারে মিলিয়ে যাচ্ছে। বড় বড় সহর, বড় বড় নদী সব বিন্দুর মতো, রেখার মতো হয়ে আসছে। এই গোল পৃথিবীর গায়ে পাহাড় সমুদ্র, দেশ মহাদেশ ক্রমে সব অতি নিখুঁৎ মানচিত্রের মতো দেখা যাচ্ছে। ঐ ফ্যাকাশে হলদে মরুভূমি, ঘন সবুজ বন, ঐ ছেয়ে-নীল সমুদ্র, ঐ সাদা সাদা বরফের দেশ। নভেম্বর মাসে আমরা, এখান থেকে চাঁদ যতদূর, ততদূর চলে গিয়েছি। এক বছরে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে আমরা প্রায় দশ লক্ষ মাইল এসে পড়েছি। পৃথিবী থেকে চাঁদটাকে যেমন দেখি এখন পৃথিবীটাকে ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে। হিমালয় পাহাড়কেও আর পাহাড় বলে ভাল বোঝাই যাচ্ছে না। চাঁদের যেমন অমাবস্যা পূর্ণিমা হয়, দিনেদিনে কলায় কলায় বাড়ে কমে, পৃথিবীরও ঠিক তেমনি। এমনি করে বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে, কিন্তু কই? শনিগ্রহ ত একটুও কাছে আসছে বলে মনে হয় না। শুনেছিলাম সে এক প্রকাণ্ড গ্রহ, তার চারিদিকে আংটি ঘেরা। কিন্তু তোমার ত বিশ বছর বয়স হল, গোঁফদাড়ি বেরিয়ে গেল, এখনও ত সে সবের কিছুই দেখা গেল না! ঐ লাল রঙের মঙ্গলগ্রহটা যেন একটুখানি কাছে এসেছে, কিন্তু সেও ত খুব বেশি নয়। আমাদের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতটি বলছেন, মঙ্গল পর্যন্ত পৌঁছতে আরও চল্লিশ বৎসর লাগবে। ও হরি! তাহলে শনিতে পৌঁছব কবে? শনি পর্যন্ত যেতে লাগবে প্রায় আটশ বৎসর। তাহলে উপায়? একমাত্র উপায়, আরও বেগে যাওয়া। আরও পাঁচ গুণ দশ গুণ বিশ গুণ বেগে কামানের গোলার মতো বেগে ঘন্টায় দু হাজার মাইল বেগে ছুটতে হবে। তাই ছোটা যাক্।

আরও দুই বৎসরে মঙ্গল পর্যন্ত এসে পড়া গেল। ওখানে গিয়ে একবার নামলে মন্দ হত না। ঐ লম্বা লম্বা আঁচড়গুলো সত্যিকারের খাল কিনা, ওখানে সত্যি সত্যি বুদ্ধিমান জীব কেউ আছে কিনা, একটিবার খবর নেওয়া যেত। কিন্তু আমাদের ত অত অবসর নেই, যেমনভাবে চলছি এমনি করে চললেও শনিতে পৌঁছতে আরও অন্তত চল্লিশ বৎসর লাগবে। সুতরাং সোজা চলতে থাকি!

মঙ্গলের পথ পার হয়ে এখন বৃহস্পতির দিকে চলেছি। মাঝে মাঝে ছোট বড় গোলার মতো ওগুলো কি সামনে দিয়ে হস্ করে ছুটে পালাচ্ছে? কোনটা দশ মাইল, বিশ মাইল, কোনটা

একশ মাইল বা দুশ মাইল চওড়া—আবার কোনটা ছোটখাট ঢিপির মতো বড়, কোন কোনটা সামান্য গুলি-গোলার মতো। এরা সবাই গ্রহ। যে নিয়মে বড় বড় গ্রহরা সূর্যের চারিদিকে চক্র দিয়ে ঘোরে—এরাও প্রত্যেকেই, এমনকি যেগুলি ধূলিকণার মতো ছোট সেগুলিও, ঠিক সেই নিয়মেই নিজের নিজের পথে নিজের নিজের তাল বজায় রেখে সূর্যের চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়।

এমনি করে ছুটতে ছুটতে আরো দশ বৎসর কেটে গেল, ছোট ছোট গ্রহগুলি আর যেন দেখাই যায় না। পৃথিবী সূর্যের আশেপাশে মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে। সূর্যও দেখতে অনেকখানি ছোট্ট হয়ে গেছে—সেই পৃথিবীর সূর্য আর এ সূর্য যেন ফুটবলটার কাছে একটি ক্রিকেট বল। ক্রমে আরও আট দশ বছর ছুটে, গ্রহরাজ বৃহস্পতির চক্র পথের সীমানায় এসে হাজির হওয়া গেল। কোথায় পৃথিবী আর কোথায় বৃহস্পতি! ৩৬৫ দিনে পৃথিবীর এক বৎসর—কিন্তু বৃহস্পতি যে প্রকাণ্ড পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, সেই পথে একবার পাড়ি দিতে তার প্রায় বারো বৎসর সময় লাগে। ধোঁয়ায় ঢাকা প্রকাণ্ড শরীর—তার মধ্যে হাজারখানেক পৃথিবীকে অনায়াসেই পুরে রাখা যায়। অথচ এই বিপুল দেহ নিয়েই গ্রহরাজকে লাটিমের মতো ঘোরপাক খেতে হচ্ছে। এ কাজটি করতে পৃথিবীর ২৪ ঘন্টা সময় লাগে, কিন্তু বৃহস্পতির দশ ঘন্টাও লাগে না। বৃহস্পতির চারিদিকে সাত-আটটি চাঁদ—তার মধ্যে চারটি বেশ বড় বড়—তিনটি আমাদের চাঁদের চাইতেও বড়।

বৃহস্পতির এলাকা পার হয়েছি। শনির আলো ক্রমে আরও উজ্জ্বল হয়ে আসছে—ক্রমে বোঝা যাচ্ছে যে, তার চেহারাটা ঠিক অন্য গ্রহের মতো নয়। মনে হয় কেমন যেন লম্বাটে মতন—দুপাশে যেন কি বেরিয়ে আছে। আরও কাছে গিয়ে দেখ তার গায়ের চমৎকার আংটিটা ক্রমে পরিষ্কার হয়ে উঠছে। পৃথিবী থেকে ছোটখাট দূরবীণ দিয়ে যেমন দেখেছি এখন শুধু চোখেই সেইরকম দেখতে পাচ্ছি। আংটিটা বাসনের কানার মতো, উকিলের শাম্‌লার ঘেরের মতো—খুব পাতলা আর চওড়া। শনিগ্রহকে আমরা যে দেখি, সব সময়ে ঠিক একরকম দেখি না—কখন একটু উঁচু থেকে, কখন একটু নিচু থেকে; কখন আংটির উপর দিকটা, কখন তার তলাটা, কখন সামনে ঝোঁকা, কখন পিছন-হেলান। যখন ঠিক খাড়াভাবে আংটির কিনারা থেকে দেখি, তখন আংটিটাকে দেখি সরু একটি রেখার মতো—এত সরু যে খুব বড় দূরবীণ না হলে দেখাই যায় না।

প্রায় চল্লিশ বৎসর হল আমরা পৃথিবী ছেড়েছি—এখন আর আট-দশ বৎসব গেলে আমরা শনিতে পৌঁছব। ততদিনে তোমার চুল দাড়ি গোঁফ সব পেকে যাবে—তুমি ষাট বছরের বুড়ো হয়ে যাবে। শনিকে অনেকখানি ডাইনে রেখে আমরা ছুটে চলেছি। শনিও ঘুরতে ঘুরতে এগিযে ঐ বাঁয়ের দিকে ছুটে আসছে, আর কয়েক বৎসর পরে সে ঠিক আমাদের সামনে এসে হাজির হবে। সেও কিনা সূর্যের প্রজা, কাজেই সূর্যের চারদিকে তাকেও প্রদক্ষিণ করতে হয়। কিন্তু আমাদের ঊনত্রিশটা বছরেও তার একটা পাক পুরো হয় না।

যাক্—এতদিনে পথের শেষ হয়েছে; আমরা শনিগ্রহের উপরে এসে পৌঁছেছি। 'আংটি'টার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ, আকাশের উপর দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত যেন আলোর খিলান গেঁথে দিয়েছে। খিলানের মধ্যে খিলান, তার মধ্যে ঝাপসা আলোর আরেকটি খিলান। তার উপর আবার শনিগ্রহের ছায়া পড়েছে। সূর্যের এই প্রকাণ্ড রাজত্বের মধ্যে যতদূর যাও, এমন দৃশ্য আর কোথাও দেখবে না—আমাদের পৃথিবীর দূরবীণের দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত যায়, এমন জিনিস আর দ্বিতীয় কোথাও পাওয়া যায়নি।

আকাশে কত চাঁদ! একটি নয়, দুটি নয়, একেবারে আট-দশটা চাঁদ—ছোট বড় মাঝারি নানারকমের। সওয়া দশ ঘন্টায় এখানকার দিন রাত—ঘুমের পক্ষে ভারি অসুবিধা। দিনটিও

তেমনি—পৃথিবীর রোদ এখানকার চাইতে একশ গুণ কড়া। পৃথিবী থেকে সূর্যকে যদি চায়ের পিরিচের মতো বড় দেখায়, তবে এখান থেকে তাকে দেখায় আধুলিটার মতো। যখন তখন চন্দ্রগ্রহণ আর সূর্যগ্রহণ ত লেগেই আছে; তার উপর আবার থেকে থেকে চাঁদে চাঁদেও গ্রহণ লেগে যায়, এক চাঁদ আর-এক চাঁদকে ঢেকে ফেলে। এখানকার জন্য যদি পঞ্জিকা তৈরি করতে হয়, তবে তার মধ্যে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কেবল গ্রহণের হিসাব লিখতেই কেটে যাবে।

আংটিগুলি যেন অসংখ্য চাঁদের ঝাঁক—ছোট ছোট টিপির মতো, পাথরের ভেলার মতো, কাঁকড়ের কুচির মতো লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি চাঁদ কেউ কারও গায়ে ঠেকে না, আশ্চর্য নিয়মে প্রত্যেকে নিজের পথে শনিকে প্রদক্ষিণ করছে। আর সমস্তে মিলে আশ্চর্য সুন্দর আংটির মতো চেহারা হয়েছে।

এখন অসুবিধার কথাটাও একটু ভাবা উচিত। গরম বাতাস আর ধোঁয়ার ঝড় ত এখানে আছেই—তার উপর সব চাইতে অসুবিধা এখানে দাঁড়াবার মতো ডাঙা পাবার যো নাই—ডাঙা খুঁজতে গেলে অনেক হাজার মাইল গভীর গরম ধোঁয়াটে মেঘের সমুদ্রের মধ্যে ডুব দিতে হবে। সেই মেঘের মধ্যে জীবজন্তু কেউ বাঁচতে পারে কিনা খুবই সন্দেহ। সুতরাং এখন কি করার উপায় দেখতে হবে।

এসেছিলাম কামানের গোলার মতন বেগে—কিন্তু তার চাইতে তাড়াতাড়ি চলা যায় কি? আলো চলে সব চাইতে তাড়াতাড়ি—প্রতি সেকেন্ডে প্রায় এক লক্ষ নব্বই হাজার মাইল। তাহলে সেইরকম বেগে আলোর সওয়ার হয়ে ছোটা যাক্। পৃথিবীতে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে? এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিট।

লোহা

যে সমস্ত জিনিস মানুষে সর্বদা ব্যবহার করে, আজ যদি হঠাৎ তাহার কোনটির অভাব পড়িয়া যায়, তাহা হইলে ঠিক বোঝা যায়, কোন্ জিনিসটার যথার্থ মূল্য কতখানি। সোনা রূপা মণি মুক্তা সব যদি হঠাৎ একদিন পৃথিবী থেকে লোপ পায়, তবে অনেক সৌখিন লোকে হা-হুতাশ করিবে—মানুষের টাকা-পয়সার কারবারের বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইবে, রূপার অভাবে ফটোগ্রাফের ব্যবসা প্রায় বন্ধ হইয়া আসিবে এবং ছোটখাট অনেকরকমের অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। কিন্তু তবু মানুষের জীবনযাত্রার কোন ব্যাঘাত হইবে না। বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা যেমন চলিতেছিল, অনেকটা সেইরকমই চলিতে থাকিবে। কিন্তু তেমনিভাবে যদি লোহার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তবে অবস্থাটা আরও মারাত্মক হইবে। মানুষের কলকারখানা রেল পুল জাহাজ প্রভৃতি, সভ্য দেশে যাহা কিছু না হইলে চলে না, তাহার সমস্তই বন্ধ হইয়া আসিবে। মানুষের যে-কোন অস্ত্র বা যে-কোন যন্ত্র বল—বড় বড় কামান, এঞ্জিন বা মোটর হইতে লাঙল কোদাল কাঁটা পেরেক পর্যন্ত—সবটাতেই লোহার দরকার হয়। যার মধ্যে লোহা নাই এমনও অসংখ্য জিনিস তৈয়ারি করিবার সময়ে লোহার যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। যে জিনিসে তাহারও দরকার হয় না, যেমন অনেক ডাক্তারি ওষুধ, সেখানেও অনেক সময়েই কয়লার চুল্লি জ্বালিতে হয় এবং সেই কয়লা ভাঙিয়া উঠাইবার জন্য খনিতে লোহার কোদাল আর অনেক কলকব্জার দরকার হয়। মানুষের সকলরকম কাজে যে সমস্ত তৈজস বা বাসনপত্রের দরকার হয়, তাহার সমস্তই খনিজ জিনিসের তৈয়ারি। সেই সমস্ত জিনিস সংগ্রহ করিয়া তাহাকে কাজের উপযোগী

করিয়া গড়িতেও লোহার দরকার হয়। ঘরের দরজা জানালা, কড়ি বরগা, আসবাবপত্র, এ সমস্ত কাঠের তৈয়ারি হইতে পারে, কিন্তু সেই কাঠকে কাটিয়া চিরিয়া চাঁচিয়া ঘষিয়া দরকারমত গড়িয়া লইবার জন্য পদে পদেই লোহার কুড়াল করাত র‍্যাঁদা বাটালি প্রভৃতি যন্ত্রের দরকার হয়।

পৃথিবীতে এমন দেশ নাই যেখানে লোহা পাওয়া যায় না। পথে ঘাটে, মাটিতে জলেতে, খুঁজিতে গেলে সর্বত্রই লোহা পাওয়া যায়। অথচ এক সময়ে লোকে লোহার ব্যবহার জানিত না, লোহা তৈয়ারি করিতে পারিত না। জল লাগিলে লোহায় মরিচা ধরিয়া যায়; লোহাধাতু আর লোহার মরিচা, দুটা এক জিনিস নয়। কিন্তু মরিচা বা 'লৌহমল' নানারকমে 'শোধন' করিয়া তাহা হইতে আবার খাঁটি লোহা বাহির করা যায়। যে সমস্ত খনিজ জিনিস হইতে লোহা তৈয়ারি করা হয়, সেগুলিও এইরকম মরিচা-জাতীয় জিনিস, অনেক 'হাঙ্গামা' করিয়া তাহাদের শোধন না করিলে তাহা হইতে লোহা বাহির হয় না। সোনা রূপা ও তামা অনেক সময়ে খাঁটি ধাতুর আকারেও পাওয়া যায় এবং খনিজ অবস্থায় তাহাদের শোধনও লোহার চাইতে অনেক সহজ। সেইজন্য তামা প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার শিখিবার পরেও মানুষ অনেকদিন পর্যন্ত লোহা বানাইবার কৌশল বাহির করিতে পারে নাই।

একবার যদি কোথাও কোন লোহা বানাইবার কারখানায় যাও, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে লোহার মতো সামান্য জিনিসের জন্যও মানুষকে কতখানি চিন্তা পরিশ্রম ও হাঙ্গামা করিতে হয়। আমাদের দেশে সাক্‌চিতে টাটা কোম্পানির লোহার কারখানা আছে—সেখানে প্রতি বৎসর হাজার হাজার মণ লোহা আর ইস্পাত তৈয়ারি হয়। প্রকাণ্ড চিমনির মতো বড় বড় পাথরের চুল্লি, তাহার মধ্যে সারাদিন সারারাত আগুনের আর বিশ্রাম নাই। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, রাবণের চিতার মতো সে আগুন জ্বলিতেই থাকে। একবার আগুন নিভিয়া গেলেই হাজার হাজার টাকার চুল্লি ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইবে। তাই দিনরাত সেখানে কাজ চলিতেছে, চিমনির মুখ দিয়া আগুনের লাল জিভ সারাক্ষণ আকাশকে রাঙাইয়া তুলিতেছে। মাঝে মাঝে চুল্লির ঢাকনি খুলিয়া, গাড়ী-বোঝাই কয়লা-মিশান লৌহ খনিজের মশলা চুল্লির মধ্যে ঢালিয়া দেয়—একেবারে বিশ ত্রিশ বা একশ-দুশ মণ। চুল্লির মধ্যে সেই সমস্ত মশলা গলিয়া পুড়িয়া তরল লোহা হইয়া জমিতে থাকে। মাঝে মাঝে চুল্লির নর্দামা দিয়া লোহার ময়লা 'গাদ' বাহির করিয়া দিতে হয়। দরকারমত শোধন হইলে পর পাশের একটা নল খুলিয়া তরল লোহা ঢালিয়া ফেলিতে হয়।

পৃথিবীতে যত লোহার কারখানা আছে, তাহাতে প্রতি বৎসর তিনশ কোটি মণ লোহা তৈয়ার হয়। এবং বছর বছর ইহার পরিমাণ বাড়িয়াই চলিয়াছে। লোহা নানারকমের হয়। যে লোহা ঢালাই করিয়া সাধারণত কড়ি বরগা শিক প্রভৃতি তৈয়ারি হয় আর যে ইস্পাত লোহা ক্ষুর বা তলোয়ারের জন্য ব্যবহার হয়, এ দুয়ের মধ্যে অনেকখানি তফাৎ। সাধারণ চুল্লির মধ্যে যে লোহা তৈয়ারি হয়, তাহা একেবারে খাঁটি লোহা নয়; আমরা যতরকম লোহা সর্বদা ব্যবহার করি, তাহার কোনটাকেই ঠিক খাঁটি লোহা বলা যায় না। এইসব লোহার সঙ্গে অল্প বা বেশি পরিমাণে অঙ্গার বা কয়লা, গন্ধক, ফস্‌ফরাস্ প্রভৃতি নানরকম জিনিসের মিশাল থাকে এবং সেই মিশালের জন্য লোহার রূপ গুণ নানারকম হইয়া যায়। কোনটা নরম, কোনটা শক্ত, কোনটা সহজে ঢালাই হয়, কোনটা বেশ দলিয়া পিটিয়া নানারকম করা যায়, কোনটা স্প্রিং-এর মতো বাঁকান যায়, কোনটা বাঁকাইতে গেলে ভাঙিয়া যায়, কোনটাকে নানারকমে তাতাইয়া এবং নানা কৌশলে ঠাণ্ডা করিয়া ইচ্ছামত মজবুত করা যায়, কোনটাকে চমৎকার শান দেওয়া বা পালিশ করা যায়।

এক একরকম কাজের জন্য এক একরকম লোহা। আজকাল ভাল ইস্পাত ও উঁচুদরের লোহা করিতে হইলে আগে খাঁটি কাঁচা লোহা তৈয়ারি করা হয়। তারপর তাহার সঙ্গে ঠিক দরকারমত অন্য কোন ধাতু বা কয়লা প্রভৃতি মিশাইয়া আবার সমস্তটা গলাইয়া একসঙ্গে জ্বাল দিয়া লইতে হয়। প্রথম কাজটির জন্য বিশেষরকম চুল্লির দরকার হয়—তাহার গঠন এবং ভিতরকার বন্দোবস্ত সাধারণ চুল্লির মতো নয়। একটা প্রকাণ্ড পিপার মতো জিনিস—তাহার মধ্যে পাঁচশ বা হাজার মণ মশলা ধরে; সেই পিপার তলার দিকে আগুন জ্বালাইয়া, তাহার ভিতর দিয়া ঝড়ের মতো দম্‌কা বাতাস চালাইয়া দেওয়া হয়। বাতাসের ঝাপটায় আগুনের শিখা প্রকাণ্ড জিভ মেলিয়া পিপার মুখ হইতে ছুটিয়া বাহির হয়। লোহার মশলা আগুনের তেজে গলিয়া পুড়িয়া যতই বিশুদ্ধ হইয়া আসিতে থাকে, আগুনের রংও সেই সঙ্গে বদলাইয়া আসিতে থাকে। প্রথমে বেগুনি, তারপর ক্রমে লাল হলদে সাদা হইয়া, শেষে যখন ঘোর নীল রং দেখা দেয় তখন আগুনের তেজ নিভাইয়া, প্রকাণ্ড পিপাটিকে কলে ঘুরাইয়া কাৎ করিয়া, তাহার ভিতর হইতে তরল কাঁচা লোহা ঢালিয়া ফেলা হয়। তারপর ওজনমত নানা জিনিসের মিশাল দিয়া সেই লোহাকে নানা কাজের উপযুক্ত করিতে হয়।

এখানেও কি হাঙ্গামার শেষ আছে? সেই লোহাকে আরও কতবার অগ্নিপরীক্ষায় ফেলিয়া, কত দুরমুষ কলে সাংঘাতিকভাবে দলিয়া পিষিয়া, কতরকমের উৎপাত সহাইয়া তবে তাহাকে ভারি ভারি কঠিন কাজে লাগান চলে।

পৃথিবীর শেষ দশা

সংসারে কোন জিনিসই চিরকাল একভাবে থাকে না—তা সে ছোটই হউক, আর বড়ই হউক। এই যে প্রকাণ্ড পৃথিবীটা যাহার উপর তোমার আমার মতো কোটি কোটি জীব এমন নিশ্চিন্তে বসিয়া দিন কাটাইতেছে, এই পৃথিবীটাও চিরকাল এমন ছিল না। এক সময়ে— সে কত লক্ষ বৎসর আগেকার কথা তাহা জানি না—এই পৃথিবী এমন গরম ছিল যে, জীবজন্তু থাকা ত দূরের কথা, ইহার উপর বৃষ্টি পড়িবারও যো ছিল না। উপরের আকাশে বৃষ্টি জমিয়া নীচে পড়িতে না পড়িতে শূন্যেই বাষ্প হইয়া মিলাইয়া যাইত। যখন আরেকটু ঠাণ্ডা হইল তখন তেমন তেমন বৃষ্টি হইলে তাহা পৃথিবীতে আসিয়া পড়িত কিন্তু জল দাঁড়াইবার উপায় ছিল না। বৃষ্টিধারা ডাঙায় নামিবামাত্র টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিত এবং চারিদিক গরম ধোঁয়ায় ঢাকিয়া আকাশের জিনিস আকাশেই ফিরিয়া যাইত। তখন দেখিবার কেহ ছিল না, শুনিবার কেহ ছিল না; ফুটন্ত বৃষ্টিধারার অবিশ্রাম গর্জনের মধ্যে ধোঁয়ায় ভরা আকাশ যখন পৃথিবীর উপর ঘনঘন বিদ্যুতের চাবুক মারিত তখনকার সে ভয়ংকর দৃশ্য কল্পনা করাও সহজ কথা নয়।

তাহারও পূর্বে এক সময়ে পৃথিবীটা প্রকাণ্ড আগুনের পিণ্ডমাত্র ছিল। তখন তাহার শরীরটি ছিল এখনকার চাইতে প্রায় লক্ষগুণ বড়। বেশ একটি ছোটখাট সূর্যের মতো সে আপনার প্রচণ্ড তেজে আপনি ধক্‌ধক্‌ করিয়া জ্বলিত। তাহারও পূর্বেকার অবস্থা কেমন ছিল, সে কথা পণ্ডিতেরা আলোচনা করিয়াছেন। যাহা হউক, মোট কথা এই যে, পৃথিবীর বয়স অনেক হইয়াছে। মানুষের

বয়স বাড়িয়া যখন সে বৃদ্ধ হইতে চলে তখন তাহার শরীরের তেজ কমিয়া যায়, গায়ের রক্ত ঠাণ্ডা হইয়া আসে। পৃথিবীর এটা কোন্ বয়স? সে কি এখন প্রৌঢ় বয়স পার হইতেছে? ভাবিবার কথা বটে। পৃথিবীর শেষ বয়সটা কিরকম হইবে, তাহার পক্ষে বার্ধক্যই বা কি আর মৃত্যুই বা কি, তাহার বিচার করা দরকার।

মানুষের মরিবার নানারকম উপায় আছে। কেহ অল্পে অল্পে বৃদ্ধ হইয়া মরে, কেহ বা তাহার পূর্বেই মরে, কেহ বহুদিন রোগে ভুগিয়া মরে, কেহ দুর্ঘটনায় হঠাৎ মরে। পৃথিবীর বেলায় মৃত্যুটা কিরকমে ঘটিবে তাহা কে জানে? যদি বৃদ্ধ হইয়া পৃথিবীকে অল্পে অল্পেই মরিতে হয় তবে কোন্ অবস্থাকে তাহার মৃত্যুর অবস্থা বলিব? যখন জীবজন্তু থাকিবে না, মেঘ বাতাস থাকিবে না, নদী সমুদ্র থাকিবে না, পৃথিবী শুকাইয়া চাঁদের মতো কঙ্কালসার হইয়া পড়িবে তখন বলা যাইবে 'পৃথিবীটা মরিয়াছে'। সেরকম হইবার কোন লক্ষণ দেখা যায় কি? যায় বৈ কি! পৃথিবী যখন শূন্যে ছুটিয়া চলে তখন সে বাতাসটাকেও তাহার সঙ্গে সঙ্গে লইয়া চলে বটে, কিন্তু তবু কিছু বাতাস চারিদিকে ছিটাইয়া পড়ে; তাহা শূন্যে উড়িয়া যায় আর পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে না। সেই বাতাসের মধ্যে যেটুকু জল বাষ্প হইয়া থাকে তাহাও এইরূপে আকাশে ছড়াইয়া পড়ে। এইভাবে যাহা নষ্ট হয় তাহার পরিমাণ খুবই সামান্য; কিন্তু সামান্য লোকসানও যদি ক্রমাগত লক্ষ লক্ষ বৎসর চলিতে থাকে তবে শেষে তাহার হিসাবটা খুবই মারাত্মক হইয়া পড়ে। নদী ও সমুদ্রের মধ্যে যে জল আছে ডাঙার মাটি তাহাকে প্রতিদিনই অল্পে অল্পে শুষিয়া লইতেছে এবং তাহাতেও জলটা দিন দিনই কমিয়া আসিতেছে; সুতরাং আজ না হউক, হাজার বৎসরে না হউক, জল বাতাস সব একদিন শেষ হইবেই। তখন মেঘ থাকিবে না, কুয়াশা থাকিবে না, রামধনুকের শোভা, উদয়াস্তের রঙের খেলা কিছুই থাকিবে না—কেবল নিস্তব্ধ নির্জন শ্মশানের মতো পৃথিবীর মৃত কঙ্কাল পড়িয়া থাকিবে।

কিন্তু দিনের পর রাত, রাতের পর দিন, এই যে আলো আঁধারের অবিশ্রাম খেলা, ইহাও কি চিরকাল থাকিবে না? না, তাহাও থাকিবে না। মোটামুটি আমরা যে দিনরাতের হিসাব ধরি সেই দিনরাতের হিসাবও ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। জোয়ার ভাঁটার আঘাত পৃথিবীকে প্রতিদিনই সহিতে হয়, জলের সঙ্গে ডাঙার ঘষাঘষি প্রতিদিনই বাধিয়া থাকে; তাহার ফলে, পৃথিবীর ঘোরপাকের বেগ ক্রমেই ঢিলা হইয়া পড়িতেছে। পাঁচ লক্ষ বৎসরে দিনরাতের পরিমাণ এক সেকেণ্ড বাড়িয়া যাইবে এবং ক্রমেই আরো বেশি করিয়া বাড়িবে। শেষে এমন দিন আসিবে যখন এক পাক ঘুরিতে তাহার এক বৎসর লাগিবে। চাঁদ যেমন তাহার একই মুখ পৃথিবীর দিকে রাখিয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, তাহার উল্টা পিঠ আমাদিগকে দেখিতেই দেয় না, পৃথিবীও ঠিক তেমনি করিয়াই ক্রমাগত একইভাবে সূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাহার চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে। বুধ ও শুক্রগ্রহের আজকালকার অবস্থা ঠিক এইরূপ। এ অবস্থায় যেখানে রাত সেখানে বারো মাসই রাত, যেখানে দিন সেখানে বারো মাস দিনের আর শেষ নাই। একদিক রোদে পুড়িয়া ঝলসিয়া ঝামা হইয়া যায়, আর একদিন শীতে জমিয়া এমন কন্‌কনে ঠাণ্ডা যে বাতাস জমিয়া বরফ বাঁধিয়া যায়! শেষ বয়সে, যতদিন সূর্যের তেজ থাকিবে, ততদিন এইরকম করিয়াই পৃথিবীর দিন চলিবে। তারপর সূর্যও যখন নিভিয়া যাইবে তখনও অন্ধকারে আকাশের গায়ে কত লক্ষ লক্ষ তারার আলো এমনি করিয়াই চাহিয়া থাকিবে, কিন্তু বহুদূরের সেই জ্যোতিতে আলো-হারা সূর্যকে আর খুঁজিয়াই পাওয়া যাইবে না, পৃথিবী ত কোন্ ছার।

পৃথিবীর মৃত্যুর কি আর কোন উপায় নাই? হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া তাহার জীবনটা কি নষ্ট হইতে পারে না? ধূমকেতুকে এক সময়ে লোকে বড়ই ভয় করিত। নয় বৎসর আগে এই পৃথিবীটা যখন 'হ্যালি'র ধূমকেতুর ল্যাজের ভিতর ঢুকিয়া গিয়াছিল তখন আগে হইতেই কত লোকে ভয় পাইয়াছিল, কত লোকে বলিয়াছিল যে এইবার পৃথিবীর আর রক্ষা নাই! কিন্তু তবু পৃথিবীর ত কোন ক্ষতি হয় নাই, বরঞ্চ ধূমকেতুর ধোঁয়াটে ল্যাজটাই ছিঁড়িয়া শূন্যে উড়িয়া গিয়াছে। এইরূপে কত ধূমকেতু কত উল্কাবৃষ্টির হাত হইতে সে কতবার বাঁচিয়া আসিল; কিন্তু ধূমকেতুর চাইতে ভারি একটা কিছুর সহিত যদি তাহার ধাক্কা লাগে তাহা হইলে অবস্থাটা খুবই সাংঘাতিক হইতে পারে। সুতরাং সেই 'একটা কিছু' আসা সম্ভব কি না, আর আসিলে কি হইবে, তাহার একটু খবর লওয়া যাক্।

পৃথিবীর দেহের বাঁধন ও চালচলন এমন হিসাব-মাফিক সুন্দর নিয়মে বাঁধা যে, হঠাৎ কিছু উলট্‌পালট্ হওয়া সম্ভব নয়। ভূমিকম্প ঝড়বৃষ্টি অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি যেসব ব্যাপারকে আমরা খুব ভয়ানক মনে করি, পৃথিবীর গায়ে সেগুলি সামান্য আঁচড় বা ফোস্কার মতো। চন্দ্র সূর্য গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি সকলকেই অতি আশ্চর্য নিয়মের বাঁধনে নিরাপদ করিয়া বাঁধা হইয়াছে। সুতরাং বাহির হইতে একটা কোন উপদ্রবকে হাজির না করিলে সূর্যের এই প্রকাণ্ড সংসারটির বাঁধন ভাঙা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। সূর্যদেব সপরিবারে শূন্যের ভিতর দিয়া ঘণ্টায় চল্লিশ হাজার মাইল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন—কিন্তু আকাশের কূল কিনারা নাই; লক্ষ লক্ষ বৎসর ক্রমাগত ছুটিয়াও তিনি যে কোনদিন কোন তারার উপর গিয়া পড়িবেন, এমন আশঙ্কার কোন কারণ এ পর্যন্ত দেখা যায় নাই। কিন্তু, চোখে দেখা যায় না এমনও ত অনেক বিপদ থাকিতে পারে। আকাশে যত তারা আছে তাহাদের সকলেরই যে আলো আছে এমন নয়। যাহাদের আলো নিভিয়া গিয়াছে আমরা তাহাদের কোন খবর পাই না। সেইরূপ কোন তারা যদি অন্ধকার পথে চলিতে চলিতে সূর্যের উপর আসিয়া পড়ে, তবে অবস্থাটা কেমন হইবে? সেটা যে একেবারেই ভাল হইবে না, তাহা বুঝিতেই পার।

তেমন একটা তারা যদি আসে তবে সে সূর্যের রাজ্যের সীমানায় আসিবার পূর্বেই নেপচুন প্রভৃতি বহু দূরের গ্রহগুলির চালচলন বিগড়াইতে আরম্ভ করিবে। পণ্ডিতেরা ব্যস্ত হইয়া হিসাব করিতে বসিবেন, উপদ্রবটা কত বড়, কত দূরে এবং কোন্‌দিকে। সূর্যের আলোয় সেই অন্ধকার তারা ক্রমে স্পষ্ট হইয়া উঠিবে, ক্রমে সে সৌরজগতের ভিতরে আসিয়া পড়িবে। ততদিনে বড় বড় গ্রহেরা পর্যন্ত তাহাদের বহুদিনের অভ্যস্ত চাল ভুলিয়া বেচাল চলিতে আরম্ভ করিবে। একদিকে সূর্য আর একদিকে নূতন অতিথি, এই দোটানায় পড়িয়া পৃথিবী টল্‌মল্ করিতে থাকিবে। জোয়ারের বিপুল টানে নদীর জল ফুলিয়া উঠিবে, সাগরের তরঙ্গ ভীষণ বেগে পৃথিবীর উপর ছুটিয়া পড়িবে, ভূমিকম্পে পাহাড় পর্বত ধসিয়া পড়িবে, বহুদিনের ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি আবার জাগিয়া সহস্র মুখে আগুন ফুঁকিতে থাকিবে। আর জীবজন্তুর হাহাকার ডুবাইয়া ঝড়ের বাতাস পাগলের মতো ছুটিয়া ফিরিবে। তারপর যখন সূর্যে তারায় সংঘর্ষ বাধিবে তখনকার অবস্থা কল্পনা করাও অসম্ভব। মুহূর্তের মধ্যে এক সূর্য কোটি সূর্যের তেজ ধারণ করিবে সূর্যের আগুন অসম্ভব বেগে সমস্ত গ্রহ চন্দ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। আবার সেই আদিকালের নীহারিকার মতো জ্বলন্ত বাষ্পের আগুন সমস্ত সৌরজগতের আকাশ জুড়িয়া জ্বলিতে থাকিবে। তারপর কত যুগযুগান্তর পরে তাহার ভিতর

হইতে আবার নূতন সূর্য বাহির হইয়া নূতন উৎসাহে নূতন সংসার পাতিয়া বসিবে। এ পৃথিবী তখন না থাকুক, আবার নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি হওয়াই বা বিচিত্র কি?

ইহার মধ্যে অসম্ভব কিছুই নাই। সেদিন যে হঠাৎ নূতন তারা দেখা গিয়াছিল, তাহাও সুদূর আকাশে এইরূপ কোন দুর্ঘটনার সামান্য একটু নমুনা মাত্র। আমাদের এই ছোট জগৎটুকুর মধ্যে যদি তেমন কোন প্রলয় আসিয়া পড়ে, তবে বিপদের সম্ভাবনা বুঝিবার পর সমস্ত শেষ হইতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর সময় লাগিবে। সুতরাং অন্তত আরও চল্লিশটা বছর তোমরা সকলেই খুব নিশ্চিন্ত থাকিতে পার।

কাঁচ

এক ছিল সওদাগর। সে গেল বাণিজ্য করতে। প্যালেস্টাইনের তীরের কাছে নদীর মুখে তার ছোট্ট জাহাজটি বেঁধে সে তার লোকজন নিয়ে ডাঙায় নামল, আর সেখানেই বালির উপর আগুন জ্বেলে রান্না করতে বসল। হাঁড়ি বসাবার জন্য পাথর পাওয়া গেল না, কাজেই তাদের সঙ্গে যে সোডা-ক্ষারের পাটালি ছিল (যে সোডা দিয়ে বাসন সাফ করে) তারই কয়েকটার উপর তারা হাঁড়ি চড়াল। রান্না খাওয়া সব যখন শেষ হয়েছে, তখন তাদের সোডা-পাথরের চাক্তিগুলো তুলতে গিয়ে দেখলে তার চিহ্নমাত্র নেই-আছে কেবল স্বচ্ছ পাথরের মতন কি একটা জিনিস যা তারা আর কখন চোখে দেখেনি। এমনি করে নাকি কাঁচের আবিষ্কার হয়েছিল। সেই থেকে আজ পর্যন্ত বালির সঙ্গে ক্ষার গলিয়ে লোকে কাঁচ তৈরি করে আসছে।

কলার 'বাসনা' পুড়িয়ে যে ছাই হয়, তার মধ্যে ক্ষার থাকে—তাকে বলে পটাশক্ষার। সোডা পটাশ চূন এই সমস্তই নানারকমের ক্ষার। চুল্লির আঁচে শুধু বালি কখনও গলে না; কিন্তু তার সঙ্গে চূন-পাথর আর ক্ষার মিশিয়ে জ্বাল দিলে সব গলে এক হয়ে যায়, আর ঠাণ্ডা হলে কাঁচ হয়ে জমে থাকে।

প্রথম প্রথম মানুষে যে কাঁচ ব্যবহার করত, সে কেবল সৌখিন জিনিস হিসাবে। কাঁচ তৈরি করবার সময় তার সঙ্গে নানারকম ধাতুর মশলা মিশিয়ে তাতে নানারকম রং ফলান যায়। সেই সমস্ত রঙিন কাঁচের পুঁথিমুক্তো এক সময়ে লোকে অসম্ভব দামে কিনে নিত। বহুমূল্য রত্ন বলে দেশ বিদেশে তার আদর হত। সে সময়ে কাঁচ তৈরীর সংকেত খুব অল্প লোকেই জানত; আর তারা কাউকে সেসব শেখাত না। কিন্তু তবু দুশ পাঁচশ বা হাজার বছরে সেসব গোপন কথাও অল্পে অল্পে ফাঁস হয়ে যেতে লাগল। ক্রমে এশিয়া থেকে ইউরোপের নানা স্থানে এ বিদ্যার চলন হতে লাগল। বুদ্ধিমান রোমানেরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কাঁচ তৈরিতে এমন উন্নতি করে ফেলল যে, কয়েক শ বছরের মধ্যেই কাঁচের সারসি, বাসন, প্রদীপ-দান প্রভৃতি মানুষের—অন্তত ধনী লোকদের—নিত্য ব্যবহারের জিনিস হয়ে দাঁড়াল।

এখন আমরা যে সমস্ত ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার কাঁচ সদা সর্বদা ব্যবহার করি, তিনশ বছর আগে সেরকম কাঁচ তৈরিই হত না। সে সময়কার কাঁচ হত ময়লাগোছের, তার মাঝে মাঝে ঘোলাটে দাগ থাকত। তার উপরেই রং ফলিয়ে, কৌশলে তার দাগের সঙ্গে দাগ মিলিয়ে ওস্তাদ কারিকরেরা আশ্চর্য সুন্দর সব জিনিস গড়ত। কিন্তু নিখুঁৎ সাদা কাঁচ

যে কাকে বলে, সে তারা জানতই না। প্রায় তিনশ বছর আগে ইংলণ্ডের কয়েকজন উৎসাহী লোকের চেষ্টায় একরকম চমৎকার কাঁচ তৈরি হয়, সেই থেকেই কাঁচের ব্যবসার চূড়ান্ত উন্নতির আরম্ভ। তার আগে কাঠের চুল্লিতে কাঁচ তৈরি হত, এই ইংরাজেরাই সকলের আগে কয়লার চুল্লি ব্যবহার করলেন। এঁরা সমুদ্রের পানা পুড়িয়ে, তা থেকে পটাশ বার করে, সেই পটাশের মধ্যে খাঁটি চক্‌মকি পাথরের গুঁড়ো আর সীসা-ভস্ম মিশিয়ে জলের মতো স্বচ্ছ নূতনরকমের কাঁচ তৈরি করলেন। তখন হতে সেই কাঁচের সারসি, সেই কাঁচের আরসি, সেই কাঁচের যন্ত্র বাসন চশমা দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সৌখিন ধনীর সখের কাঁচ সাধারণ লোকের ঘরাও জিনিস হয়ে উঠল।

লোহা না থাকলে মানুষের সভ্যতার শক্তি যেমন খোঁড়া হয়ে যায়, কাঁচ না থাকলেও বিজ্ঞানের বুদ্ধিও সেইরকম কানা হয়ে পড়ে। এই তিনশ বছরের মানুষ তার জ্ঞানের পথে যা কিছু উন্নতি ও আবিষ্কার করেছে, কাঁচ না থাকলে তার প্রায় বারো আনাই অসম্ভব হত। কাঁচ ছিল তাই দূরবীণ হতে পেরেছে; কাঁচ ছিল তাই অণুবীক্ষণের জন্ম হয়েছে। আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের আশ্চর্য রহস্য, গাছপালা কীট-পতঙ্গের গঠন কৌশল, অসংখ্য রোগবীজের সঙ্গে স্বাস্থ্যের নিত্য লড়াই, অতি বড় ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব আর অতি সূক্ষ্ম অণুপরমাণুর ইতিহাস—এ সমস্তই মানুষ জানতে পারছে কেবল কাঁচের কৃপায়। গ্রহনক্ষত্রের আলোক দেখে পণ্ডিতে তার মালমশলার বিচার করেন, তার ভূত-ভবিষ্যৎ কত কি বলেন,—তার জন্যও কাঁচের বর্ণবীক্ষণ যন্ত্র চাই। ফটোগ্রাফার ছবি তোলেন, তার জন্য কাঁচের লেন্স চাই। বৈজ্ঞানিকের ঘরে ঘরে কাঁচের থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার, আরো নানারকম কত যন্ত্র আর কত 'মিটার'। মোট কথা, কাঁচের ব্যবহার যদি মানুষে না জানত তবে আজও তার সভ্যতার ইতিহাস অন্তত তিনশ বছর পেছিয়ে থাকত।

নানারকম কাজের জন্য নানারকম কাঁচ তৈরি হয়। তা থেকে কাজের জিনিস গড়বার উপায়ও নানারকম। সামান্য একটা গেলাস বোতল চিম্‌নি বা কাঁচের নল বানাবার জন্য কত যে কায়দা কৌশলের দরকার হয়, তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। একটি কারিকর একটা লোহার নলে করে খানিকটা গলা কাঁচ নিয়ে, তার মধ্যে ফুঁ দিয়ে, তাকে নেড়ে ঝেড়ে দুলিয়ে ঝুলিয়ে চট্‌পট্‌ কত যে আশ্চর্য জিনিস গড়তে পারে, সে একটা দেখবার মতো ব্যাপার। নলের মুখটা চুল্লিতে-চড়ান তরল কাঁচের মধ্যে ডুবিয়ে তুললে নলের আগায় খানিকটা গলা কাঁচ উঠে আসে। তখন সেই নলের মধ্যে ফুঁ দিলে কাঁচটা গোল বুদ্বুদের মতো ফাঁপা হয়ে ফুলে ওঠে। নরম থাকতে থাকতে সেই বুদ্বুদটাকে লোহার টেবিলের উপর ইচ্ছামত চাপ দিয়ে চ্যাপ্টা করা যায়; অথবা গড়িয়ে ডিমের মতন বা হুঁকোর মালার মতন লম্বাটে করে দেওয়া যায়। কোন জিনিস গড়তে গড়তে, তার খানিকটা জায়গা আগুনে তাতিয়ে আবার যদি ফুঁ দেওয়া যায় তাহলে সেই তাতান জায়গাটুকু গম্বুজের মতো ফুলে উঠতে থাকে। কিংবা যদি সেটাকে নরম অবস্থায় ঝুলিয়ে ধরে আস্তে আস্তে ঘোল-মউনির মতন পাক দেওয়া যায়, তাহলে যেখানটা নরম সেটা চিমনির ডাঁটা বা নলের মতন লম্বা হয়ে ঝুলে পড়ে। গোল জিনিসের গোড়ায় একটু নল বানিয়ে, তারপর আগার দিকটা গরম করে ফুঁয়ের জোরে ফাটিয়ে দিলে খাসা একটি বোতলের মুখ বা কলকে তৈরি হয়। এই সমস্ত নানারকম জিনিসের গায়ে আবার খানিক নরম কাঁচ লাগিয়ে ইচ্ছামত হাতল বা পায়া গড়ে দেওয়া যায়। এসব শিখতে যা সময় লাগছে, গড়তে গেলে ওস্তাদ লোকের তার চাইতেও কম সময় লাগে।

এইরকম অনেক জিনিসই আজকাল কলে তৈরি হয়। তার কতক গড়ে ঢালাই করে, কতক বানায় কল দিয়ে বাতাস ফুঁকে, আবার কতকগুলো তৈরি হয় নরম কাঁচের উপর অস্ত্র চালিয়ে।

সাধারণ সরাসরি কাঁচ সমস্তই আগে অনেক হাঙ্গাম করে হাতে গড়ে তৈরি হত। এখনও প্রতিদিন হাজার হাজার সারসি সেইরকমে তৈরি হয়। তার জন্য প্রথমে ঘাড়-কাটা বোতলের মতো মস্ত মস্ত চোঙা বানিয়ে, তারপর সেইগুলোকে কেটে চিরে, নরম করে, চেপ্টিয়ে ছোটবড় সারসি তৈরি হয়। কিন্তু খুব বড় বড় আরসি আর ভারি ভারি আসবাবী আয়নাগুলি প্রায় সমস্তই হয় ঢালাই করে। চুল্লির তরল কাঁচ গামলার মতো প্রকাণ্ড হাতায় করে তুলে একটা মস্ত টেবিলের উপর ঢেলে দিতে হয়। তারপর প্রকাণ্ড 'রোলার' দিয়ে সেই গরম কাঁচকে ক্রমাগত বেলে এবং দলে, শেষে পালিশ-করে ঘষে সমান করতে হয়।

সব চাইতে ভাল আর দামী যে কাঁচ সেগুলো দরকার হয় বিজ্ঞানের কাজে। তা দিয়ে দূরবীণ হয়, ফটো তুলবার 'লেন্স' হয়, হাজাররকম যন্ত্র তৈরি হয়। এইসব কাজের জন্য যে কাঁচ লাগে, সে কাঁচ একেবারে নিখুঁৎ হওয়া দরকার। তার আগাগোড়া সমান স্বচ্ছ হওয়া চাই। জলের মধ্যে নুন ফেললে সে নুন যেমন গলে গিয়ে সমস্তটা জলের মধ্যে সমানভাবে ছড়িয়ে থাকে, ঠিক তেমনি করে কাঁচের সমস্ত মশলাগুলি সব জায়গায় ঠিক সমানভাবে সমান ওজনে মিশে যাওয়া চাই। তা যদি না হয়, কাঁচের মধ্যে কোথাও যদি অতি সামান্য একটুখানিও দাগী বা ঘোলা থেকে যায়, তাহলেই আর তা দিয়ে কোন সূক্ষ্ম কাজ চলতে পারবে না। সুতরাং এই কাঁচ তৈরি করবার সময় খুব সাবধান হতে হয়। কয়লা বা গ্যাসের চুল্লির উপর পাথুরে মাটির বাসনের মধ্যে অল্প আঁচে একটু একটু করে কাঁচের মশলা জ্বাল দিতে হয়। দশ বারো ঘণ্টা জ্বাল দেবার পর, চুল্লির আঁচ বাড়িয়ে দিয়ে খুব কড়া আঁচের তাপে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা রাখতে হয়। তারপর 'asbestos' বা রেশমী পাথরের পোশাক-পরা মজুরেরা পাথরের ডাণ্ডা দিয়ে সেই তরল গরম কাঁচটাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্রমাগত ঘুঁটতে থাকে। একে আগুনের মতো গরম, তার উপর এই ভীষণ পরিশ্রম— এক মিনিট থামবার যো নেই। মজুরের পর মজুর আসে, তারা ঘেমে হাঁপিয়ে হয়রান হয়ে পড়ে, তাদের ঘাড়ে পিঠে ব্যথা হয়ে যায়, আবার তাদের জায়গায় নূতন মজুর আসে। ক্রমে চুল্লির আগুনও আস্তে আস্তে কমে আসতে থাকে—কাঁচটাও অল্পে অল্পে ঠাণ্ডা হয়ে জমে আসতে থাকে। এই সময়ে খুব সাবধান হওয়া দরকার। তাড়াতাড়ি জুড়িয়ে গেলে সবটা কাঁচ ঠিক সমানভাবে জমতে পারে না—এলোমেলোভাবে জমাট বেঁধে কাঁচের মধ্যে নানারকম 'টান' ধরে যায়: সে দোষ চোখে দেখা না গেলেও কাজের সময় ধরা পড়ে। সাধারণ কাঁচের জিনিসও তৈরি করার সময়ে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করে ফেললে ঠুনকো হয়ে যায়, নাড়তে-চাড়তে সহজেই ভেঙে যায়। তাই, কাঁচ যখন জমে আসতে থাকে তখনই চুল্লির চারদিকে ইঁটের দেওয়াল দিয়ে সব বুজিয়ে দিতে হয়;তার মধ্যে চুল্লির আগুন আস্তে আস্তে নিভে যায়। কাঁচটাও পাঁচদিন দশদিন বা পনেরদিন ধরে অল্পে অল্পে জমাট বেঁধে ঠাণ্ডা হয়ে আসে। তারপর দেওয়াল ভেঙে পাথুরে বাসন ভেঙে ভিতরকার কাঁচ বার করে আনে। সে কাঁচ যদি আস্ত থাকে তাহলে কাঁচওয়ালার খুব ভাগ্য বলতে হবে। প্রায়ই সেগুলো আট দশ টুকরো হয়ে ভাঙা অবস্থায় বেরোয়—তার মধ্যে ভাল ভাল টুকরোগুলো বেছে নিতে হয়।

বড় বড় দূরবীণের জন্য দু হাত তিন হাত বা তার চাইতেও চওড়া নিখুঁৎ কাঁচের চাক্তির দরকার হয়। সেরকম কাঁচ করবার মতো কারিকর পৃথিবীতে খুব কমই আছে। পৃথিবীর যত বড় বড় দূরবীণ তার প্রায় সমস্তগুলিরই কাঁচ ঢালাই হয় ফ্রান্সের একটিমাত্র কারখানায়। সেখানে গরম পাত্রে গরম কাঁচ ঢেলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ আস্তে আস্তে চুল্লি জুড়িয়ে, নানারকম তোয়াজ করে, তারপর কাঁচখানাকে বার করা হয়। তবু প্রায়ই দেখা যায় কাঁচ ফেটে চৌচির হয়ে আছে। এইরকমে বার বার ঢালাই করে, বার বার ভেঙে যায়। হয়ত বিশ-ত্রিশবার চেষ্টা করে তারপর একখানি

নিখুঁৎ কাঁচ বেরোয়। এইজন্যেই সে কাঁচের এত দাম; এক একখানি কাঁচের জন্য হয়ত দশ বিশ হাজার বা লাখ দুই লাখ টাকা দাম লেগে যায়! আমেরিকার একটি প্রকাণ্ড দূরবীণের জন্য সাড়ে পাঁচ হাত চওড়া একখানি কাঁচের দরকার; তার জন্য যত টাকাই লাগুক তারা তা দিতে প্রস্তুত। আজ তেরো বছর ধরে সেই কাঁচ ঢালাই করবার চেষ্টা চলছে—কিন্তু এই এতদিন পরে সবে সেদিন মাত্র শোনা গেল যে, সে কাঁচ নাকি ঢালাই হয়ে আমেরিকায় আসছে। কাঁচখানির ওজন হবে একশ কুড়ি মণ আর তার দাম নাকি প্রায় দশ লক্ষ টাকা!

শরীরের মালমশলা

এখানে একটা বাক্স আছে। বাক্সটা কাঠের তৈরি। শুধু কাঠ? না, তাতে লোহার কব্জা আর তালা, আর চারধারে পিতলের কাজ আছে। আর কি আছে? আর তার গায়ে চক্‌চকে গালা বার্নিশ আছে। সামনে ঐ একটা বাড়ি তৈরি হচ্ছে। কি দিয়ে তৈরি হচ্ছে? ইঁট কাঠ লোহা চুন সুরকি বালি সিমেণ্ট রং তেল, এইরকম সব জিনিস। এই সমস্ত হল তার মালমশলা। যারা বাড়ি বানায় তারা হিসাব করে বলতে পারবে, এতে অমুক জিনিস এতখানি আন্দাজ লেগেছে—তার বাজার দাম এত। আচ্ছা—সামনে একটা মানুষ বসে আছে—বল ত কিসের তৈরি মানুষ? কিসের তৈরি, তার একটু নমুনা শুনবে?

দু মণ ওজনের একটি মানুষের শরীরের মধ্যে হিসাব করলে একমণ জল পাওয়া যাবে—বেশ বড় বড় তিন-চার কলসী জল। তার শরীরে যতরকম গ্যাস বাষ্প বা বাতাস আছে তা যদি আলগা করে বার করতে চাও, তাহলে এত গ্যাস বেরোতে পারে যে তার জন্য ১২ হাত লম্বা ১২ হাত চওড়া ৮ হাত উঁচু একটা ঘর লাগবে। তার মধ্যে এমন অনেকখানি গ্যাস পাবে বাজারে যার দাম আছে—বিক্রি করতে পারলে প্রায় টাকা দশেক পাওয়া যায়।

ঐ ওজনের একজন সাধারণ মানুষের গায়ে যত চর্বি আছে তা দিয়ে এক পোয়া ওজনের প্রায় গোটা ত্রিশেক মোমবাতি তৈরি হতে পারে। তাছাড়া খাঁটি অঙ্গার বা মূল-কয়লা এত পাওয়া যাবে যে তা দিয়ে দশ হাজার পেন্সিলের শিষ তৈরি হতে পারে। বারো সের পাথুরে কয়লার মধ্যেও অতখানি অঙ্গার থাকে না।

খোঁজ করলে একটা শরীরের মধ্যে থেকে প্রায় কুড়ি চামচ নুন আর দু-তিন মুঠো চিনি অনায়াসেই বার করা যেতে পারে।

যে সমস্ত জিনিস না হলে শরীর টিঁকতে পারে না তার একটি হচ্ছে লোহা। এই যে রক্তের রং দেখছ, টক্‌টকে লাল, শরীরে লোহা কম পড়লেই সে রং ফ্যাকাসে হয়ে যায়, মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে, কঠিন ব্যারাম দেখা দেয়। তখন মানুষকে লোহা-মেশান ওষুধ খাওয়াতে হয়। শরীরে যে লোহার মশলা থাকে, ইচ্ছা করলে তা থেকে লোহা ধাতু বার করে খাঁটি শক্ত লোহা বানান যায়। একজন সুস্থ মানুষের শরীর থেকে যে পরিমাণ লোহা বেরোয় তা দিয়ে এরকম মোটা একটি পেরেক তৈরি হতে পারে যে, একটা আস্ত মানুষকে অনায়াসে সেই পেরেক থেকে টাঙিয়ে রাখা যায়।

মানুষের শরীরে যে হাড় থাকে তা থেকে দুটি জিনিস খুব বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়—চুন আর ফস্‌ফরাস্। চুন দিয়ে কত কাজ হয়, তা সকলেই জান। ফস্‌ফরাস্ দিয়ে দেশলাইয়ের

জ্বালানি মশলা তৈরি হয়, আর ইঁদুর মারবার সাংঘাতিক বিষ তৈরি হয়। অনেক ওষুধেও ফস্‌ফরাসের ভাগ থাকে। হাড় পুড়িয়ে জমির সঙ্গে মেশালে যে চমৎকার সার হয় সে-ও ঐ ফস্‌ফরাসের গুণে। একটি মানুষের শরীর থেকে যে পরিমাণ খাঁটি ফস্‌ফরাস্ বার করা যায় তা খাওয়ালে অন্তত পাঁচশ মানুষ মারা পড়বে। দেশলাই বানালে তাতে প্রায় আট লক্ষ দেশলাইয়ের মশলা হবে।

অতিকায় জাহাজ

সৌখিন ধনীদের জন্য আর বড় বড় ব্যবসায়ীদের জন্য যে সমস্ত জাহাজ অতলান্তিক মহাসাগরের খেয়া পারাপার করে, তেমন বড় জাহাজ পৃথিবীর আর কোথাও নাই। কি করে খুব তাড়াতাড়ি সাগর পার করা যায় আর আরামে পার করা যায়, আর একসঙ্গে অনেক লোককে বিনা কষ্টে পার করা যায়, তার জন্য বড় বড় জাহাজ-কোম্পানিদের মধ্যে রেষারেষি চলে। এক একটা জাহাজও নয়, যেন এক একটা সহর, রাজা-রাজড়ার থাকবার মতো সহর। তারই খুব বড় দু-একটির নমুনা দেওয়া হয়েছে।

জাহাজের সাঁতার-ঘরটি দেখা যাক। মধ্যেকার চৌবাচ্চাটি হচ্ছে ২২ গজ লম্বা আর ১৮ গজ চওড়া। এ ছাড়া নানারকম স্নানের ঘর, তুর্কী হামাম, ফোয়ারা-স্নান প্রভৃতির আলাদা বন্দোবস্ত আছে। ১২ তলা জাহাজ, তার মাঝিমাল্লা যাত্রী সব নিয়ে লোকসংখ্যা ৫০০০ হবে। পাঁচটি জাহাজ লম্বালম্বি সার বেঁধে দাঁড়ালে, এক মাইল পথ জুড়ে বসবে।

একটি জাহাজের এক সপ্তাহের খোরাক হল ২২টা ট্রেন বোঝাই কয়লা—এক একটা ট্রেনে সাড়ে আট হাজার মণ। জাহাজের মানুষগুলোর খোরাকের হিসাবও বড় কম নয়। এক এক যাত্রায় পশুমাংস ৭০০ মণ, পাখির মাংস ১৫০ মণ, মাছ ১২৫ মণ, ডিম ৪৮,০০০, আলু ১,৬০০ মণ, তরিতরকারি ৪০০ মণ, টিনের সবজি ৬,০০০ টিন আর কফি ও চা ৯০ মণ লাগে। তাছাড়া ফল দুধ কোকো চকোলেট ইত্যাদিও সেইরকম পরিমাণে।

জাহাজের মধ্যে বড় বড় খানাঘর চা-ঘর ইত্যাদি ত আছেই তাছাড়া নানারকম হোটেল সরাই-এর অভাব নেই। ধোপা, নাপিত, ফুলের দোকান, ছবির দোকান, মিঠাই-এর দোকান, প্রকাণ্ড থিয়েটার ও নাচঘর এসবও জাহাজের মধ্যেই পাবে। উঠবার জন্য লিফ্‌ট্ বা চলতিঘর। ইচ্ছা করলে আর টাকা থাকলে, সেখানে আল্‌গা বাড়ি ভাড়ার মতো করে থাকা যায়—একবারের (অর্থাৎ ৫ দিনের) বাড়িভাড়া ধর ১৫,০০০্। এক একটি জাহাজ করতে খরচ হয় প্রায় দু-তিন কোটি টাকা।

আকাশপথের বিপদ

'জলে কুমির ডাঙায় বাঘ'। মানুষের যখন পালাবার পথ থাকে না তখন লোকে এইরকম বলে। কিন্তু আজকালকার লোকে আকাশ দিয়েও পালাতে জানে। তা বলে সেইখানটাই কি মানুষের পক্ষে নিরাপদ? যুদ্ধের সময়ে সেটা যে খুব সুবিধার জায়গা নয় তা তোমরা জান, কিন্তু অন্য সময়ে? জলের জন্তু অনেক আছে যার ভয়ে মানুষ পালায়; ডাঙায়ও তেমনি শত্রুর অভাব নেই।

কিন্তু আকাশের পাখিকেও কি মানুষের ভয় করে চলা দরকার? মাঝে মাঝে দরকার বই কি! বছর ছয়েক আগে আলপ্‌স্ পাহাড়ের কাছে এক সাহেব এরোপ্লেন করে অনেক উঁচুতে উড়ছিলেন। পরিষ্কার দিন, ঝড় বাতাসের চিহ্নও নেই, কোথাও ভয়ের কোন কারণ দেখা যায় না। এর মধ্যে হঠাৎ কলের ভীষণ ভন্‌ভন্ শব্দের উপর চিলের চিৎকারের মতো একটা কর্কশ শব্দ শোনা গেল—আর সেই সঙ্গে প্রকাণ্ড এক ঈগল পাখি সাহেবের মুখের উপর ডানার ঝাপটা লাগিয়ে, দুই পায়ের নখ দিয়ে তার মাংস ছিঁড়ে নেবার জোগাড় করে তুলল! একবার নয় দু-বার নয়, পাঁচ-সাত বার ঘুরে ঘুরে সে সাহেবকে তার রাগখানা জানিয়ে গিয়েছিল। সাহেবের গায়ের জামা থেকে সে বেশ দুই-এক খাবল কাপড়ও তুলে নিয়েছিল, গায়েও যে দু-চারটা আঁচড় লাগায়নি, এমন নয়।

তারা আলপ্‌স্ পাহাড়ের রাজবংশী ঈগল, যুগের পর যুগ আকাশের মেঘের উপর সকলের চাইতে উঁচু নীল ময়দানের হাওয়া এতদিন তারাই কেবল খেয়ে আসছে। সেখানে আর কোন পাখিরও যাওয়ার সাধ্য নেই। কাজেই পৃথিবীর মানুষকে অতটা দূর স্পর্ধা করতে দেখে তার ত রাগ হবারই কথা।

যুদ্ধের সময়ে কেউ কেউ প্রস্তাব করেছিলেন যে, দলে দলে ঈগলপাখি পুষে শত্রুর এরোপ্লেনের উপর ছেড়ে দিলে মন্দ হয় না। সেরকমের পরীক্ষাও নাকি করা হয়েছিল। যারা এরোপ্লেন চালায় তাদের চোখে মস্ত গোল চশমা থাকে। ঐরকম চশমাধারী মূর্তি গড়ে, যদি তার উপর ঈগল পাখিকে রোখ্ করতে শেখান যায়, তাহলেই সময় বুঝে তাকে কোন এরোপ্লেনের উপর লেলিয়ে দিলেই চলবে। কিন্তু একবার ছাড়া পেলে পর সে শত্রু মিত্র চিনবে কি করে, সেটাই হচ্ছে ভাববার কথা।

আকাশের পথে কোন বিপদ উপস্থিত হলে সব চাইতে মুশকিল এই যে, চট্ করে কোথাও পালাবার পথ থাকে না। শূন্যে উঠে দু-তিন মাইল উঁচুতে উড়তে উড়তে হঠাৎ যদি বেলুন বা এরোপ্লেনে আগুন ধরে যায় তখন চট্ করে ডাঙায় নামবে তার আর উপায় থাকে না। জাহাজ হলেও না হয় জলে ঝাঁপ পাড়া যায়, হালকা শোলার কোমরবন্ধ এঁটে কোনরকমে সাঁতার কেটে পালান যায়। জাহাজ ডুবলেও 'লাইফ্‌বোট' ভাসিয়ে প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব। কিন্তু আকাশযাত্রীর উপায় কি?

বড় বড় বেলুন যখন আকাশে ওঠে তখন অনেক সময় তার গায়ে গোটান ছাতার মতো একটা প্রকাণ্ড জিনিস ঝোলান থাকে—সেটাকে বলে প্যারাসুট্। হঠাৎ বিপদে পড়লে, বা চট্ করে নামবার দরকার হলে বেলুনবাজ তার কোমরে প্যারাসুটের দড়ি জড়িয়ে বেলুন থেকে লাফ দিয়ে পড়বে। অমনি ছাতাটা খুলে গিয়ে প্রকাণ্ড গোল হয়ে ফুলে উঠবে, আর তাতেই পড়বার চোট্ সামলিয়ে যাবে। কিন্তু এরোপ্লেন থেকে সেরকম ছাতা ঝুলান সম্ভব নয়; তাতে চলবার বাধা হয় আর ছাতার দড়িদড়া কোথাও কলকব্জায় আটকে গেলে সেও এক সাংঘাতিক বিপদ। তাই আজকাল এরোপ্লেনে ব্যবহারের জন্যে নতুনরকম প্যারাসুট তৈরি হয়েছে। সেটাকে পোশাকের মতো করে পরতে হয়। ছাতাটাকে চমৎকারভাবে কলে পাট করে ফিতে দিয়ে কোমরের সঙ্গে বাঁধে। ফিতেগুলোও আবার কতরকম কায়দামাফিক ভাঁজ করে করে গুটিয়ে রাখতে হয়। তারপর দরকারের সময় হাত পা মেলে লাফ দিলেই হল।

সেকালের কীর্তি

পঞ্চাশ বছর আগেকার লোকের যেরকম চাল চলন ছিল তার কথা বলতে গেলে আমরা বলি 'সেকেলে ধরন'। একালের মানুষ আমরা, এইটুকু সময়ের তফাৎ দেখলেই বলি 'একাল আর সেকাল'।—আর সেকালের মানুষদের ভারি একটা কৃপার চক্ষে দেখবার চেষ্টা করি। আহা! সেকালের মানুষ, তারা কিছুই দেখল না; তারা না চড়ল এরোপ্লেন, না দেখল বায়োস্কোপ, না শুনল গ্রামোফোনের গান, না খেল বিদ্যুৎ-পাখার হাওয়া, টেলিফোনের কথাবার্তা আর বিলাতের টেলিগ্রাফ এসব আশ্চর্য ব্যাপার কিছুই তারা জানল না। আরও আগেকার কথা ভাব, একশ দেড়শ বা দুশ বছরের কথা—তখন কোথায় বা কলের জাহাজ, কোথায় বা রেলের গাড়ি আর কোথায় বা সাগর-জোড়া টেলিগ্রাফের তার? তখনকার মানুষ ফটোও তোলে না, ডাকটিকিটের ব্যবহারও জানে না, এমনকি সাইকেলও চড়ে না। আরও খানিক পেছিয়ে দেখবে, ছাপাখানা বা খবরের কাগজেরও নাম-গন্ধ পর্যন্ত পাবে না।

দুশ বা পাঁচশ বছরে যদি এতখানি তফাৎ হয়, তাহলে দশ বিশ বা পঞ্চাশ হাজার বছর আগে না জানি কেমন ছিল! সেই বুনো গোছের মানুষ, যার ঘর নাই, বাড়ি নাই, গুহার মধ্যে থাকে; যে লিখতে জানে না, পড়তে জানে না, হয়ত খালি অল্পস্বল্প কথা বলতে শিখেছে; কাপড় জামা পর্যন্ত তৈরি করতে পারে না, বড় জোর জানোয়ারের চামড়া বা গাছের বাকল জড়িয়ে থাকে। এমন যে মানুষ, তাকে কি আর পূর্বপুরুষ বলে কেউ খাতির করতে চায়? বল দেখি?

কিন্তু যখন ভেবে দেখি যে, ঐরকম বেচারা মানুষ, গাছ পাথর ছাড়া কোন অস্ত্র যার সম্বল নাই, সে কি করে সেই সময়কার বড় বড় দুর্দান্ত জন্তুগুলোকে ঠেকিয়ে রাখল, তখন ভারি আশ্চর্য বোধ হয়, আর মানুষটার সম্বন্ধেও মনে একটু একটু সম্ভ্রম আসে।

ইউরোপের নানাদেশে পাহাড়ের গহ্বরের মধ্যে প্রাচীন গুহাবাসীদের নানারকম চিহ্ন পাওয়া যায়; তা থেকে সেইসব মানুষের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য খবর পাওয়া যায়। এক একটা গুহার মধ্যে মানুষের হাড়ের সঙ্গে আরও অনেকরকম জন্তুর হাড় পাওয়া যায়। তা দেখে বোঝা যায় যে, ঐসব গুহার মধ্যে মানুষ ছাড়া অন্য অন্য জন্তুরাও থাকত, মানুষ এসে তাদের তাড়িয়ে গুহা দখল করেছে। আবার অনেক সময়ে হয়ত এমনও হয়েছে যে, তাদেরই অত্যাচারে মানুষকে গুহা ছেড়ে পালাতে হয়েছে।

সেকালের গুহা-ভল্লুক, খড়্গদন্ত বাঘ, লোমশ গণ্ডার, মহাশৃঙ্গী হরিণ, অতিকায় হস্তী এরাই ছিল মানুষের প্রধান সঙ্গী, শিকার ও শত্রু। পণ্ডিতেরা গুহার ভিত্ খুঁড়ে স্তরের পর স্তর মাটি পরীক্ষা করে দেখেছেন। এক-এক স্তরের এক একরকম ইতিহাস। খুঁড়তে খুঁড়তে কোথাও হয়ত দেখবে, এক জায়গায় খালি গণ্ডারের হাড়, তার নীচের স্তরেই মানুষের তৈরি অস্ত্রশস্ত্রের চিহ্ন—অর্থাৎ সেখানে আগে মানুষ ছিল, তারপর তারা গণ্ডারের অত্যাচারে পালিয়েছে। পোলাণ্ডের এক গুহার মধ্যে প্রায় হাজারখানেক অতি প্রকাণ্ড ভালুকের হাড় পাওয়া গিয়েছে—তার মধ্যে অনেক জন্তুই আজকাল পাওয়া যায় না।

মানুষের চিহ্নের মধ্যে কঙ্কাল আর অস্ত্রশস্ত্রই বেশি। খুব শক্ত চক্‌মকি পাথরকে নানারকমে ঠুকে আর শান দিয়ে সে সমস্ত অস্ত্র তৈরি হত। খুঁটিনাটি ঘরাও কাজের জন্য হাড়ের অস্ত্রও ব্যবহার হত। আর তাছাড়া ভালরকম একটা গাছের ডাল, কিংবা অতিকায় হস্তীর পায়ের হাড় পেলেও ত বেশ একটি উঁচুদরের মুগুর তৈরি হতে পারে। ঐ সময়কার মানুষে তীর ধনুকের

ব্যবহার জানত কিনা সন্দেহ; কারণ আজ পর্যন্ত ধনুকের কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি; কাঠের জিনিস কিনা, বেশি দিন টেঁকে না। দু একটা অস্ত্র দেখে মনে হয় যেন তীরের ফলক, কিন্তু সেগুলো বর্শার মুখও হতে পারে। আজকালকার বড় বড় শিকারীদের যদি এইরকমের অস্ত্র নিয়ে সুন্দরবনে বাঘ শিকার করতে বলা হয় তবে তারা যে খুব উৎসাহ প্রকাশ করবে, এমন ত বোধ হয় না; অথচ কেবল এইসবের জোরেই গুহাবাসীরা সকলরকম সাংঘাতিক জন্তুকে শিকার করত।

সে যে মানুষ, অর্থাৎ বুদ্ধিমান জীব, ঐ অস্ত্রগুলোই তার প্রমাণ। তাছাড়া সে যে আগুনের ব্যবহার জানত, তার প্রমাণ, গুহার মধ্যে কাঠ-কয়লা আর ছাইয়ের চিহ্ন। তাই নয়, তার আসবাবের সঙ্গে মোটা মোটা হাড়ের ছুঁচ পাওয়া গিয়েছে, সুতরাং গুহাবাসীদের মেয়েরা তাদের চামড়ার কাপড় সেলাই করতে জানত। কি দিয়ে সেলাই করত? বোধহয় চামড়ার কিংবা তাঁতের ফিতে, নাহয় গাছের তন্তু দিয়ে। কে জানে, হয়ত তাদের মধ্যেও নানারকম বাহার দেওয়া পোশাকের ফ্যাসান ছিল। কিন্তু তাদের সব চাইতে বড় কীর্তি হচ্ছে এই যে, তারা ছবি আঁকতে পারত। সেগুলো হচ্ছে পৃথিবীর আদিম ছবি, গুহার দেওয়ালের উপর লাল মাটি আর ভুষা কালি দিয়ে আঁকা। মাঝে মাঝে দু একটা মাটির মূর্তি আর হাড়ে পাথরে বা হাতীর দাঁতের উপর নানারকম চেহারার নকশা। প্রায় সমস্তই জানোয়ারের ছবি; হরিণ, ঘোড়া, বাইসন, হাতী এইসব।

চীনের পাঁচিল

চীনদেশের রাজা ছিলেন চীন্-শিঃ-হোয়াংতি। 'চীন্' মানে আদি রাজা,—যার আগে আর কেউ রাজা ছিল না। আসলে কিন্তু তাঁর আগে অনেক রাজা ঐ চীনদেশেই রাজত্ব করে গিয়েছেন; কারণ, হোয়াংতি যে সময়ে রাজা ছিলেন, সে হল মোটে দু হাজার বছর আগেকার কথা। তার আগে যাঁরা রাজা ছিলেন তাঁদের নাম ধাম, রাজত্বের তারিখ, বংশপরিচয়, আর বড় বড় কীর্তির কথা সমস্তই ইতিহাসের পুঁথিতে লেখা ছিল। কিন্তু হোয়াংতি বললেন, "তা হলে চলবে না। আমি হলাম আদি রাজা 'চীন'—আমার আগে আর কোন রাজা-টাজার নাম থাকলে চলবে না। এখন থেকে নতুন করে আবার সব ইতিহাস আরম্ভ হবে।"

এই বলে তিনি হুকুম দিলেন, সেকালের ইতিহাসের যত পুঁথি যেখানে পাও সব খুঁজে এনে পুড়িয়ে ফেল। রাজার হুকুমে চারিদিক থেকে রাশি রাশি হাতের লেখা পুরান বই জড়ো করে পোড়ান হল।

কিন্তু শুধু বই পোড়ালে কি হবে? দেশের যাঁরা পণ্ডিত লোক, তাঁরা ত সেসব বই পড়েছেন; এতদিন কিরকমভাবে দেশের কাজকর্ম হয়ে এসেছে তাও তাঁরা সব জানেন। রাজার এসব খামখেয়াল তাঁরা পছন্দ করবেন কেন? কাজেই আবার হুকুম হল, মারো সব সেকেলে পণ্ডিতদের! অমনি খুঁজে খুঁজে বড় বড় পণ্ডিতদের ধরে এনে মেরে ফেলা হল।

কিন্তু এত কাণ্ড করেও রাজা যেরকম চেয়েছিলেন তেমনটি হল না। রাজা যখন মারা গেলেন তখন দেখা গেল এখানে সেখানে দু-চারটি বুড়ো বুড়ো পণ্ডিত তখনও বেঁচে আছেন, প্রাচীনকালের কীর্তিকথা আইনকানুন সব তাঁদের মুখস্থ। তারপর সেকালের পুঁথিপত্র যা ছিল তাও দেখা গেল সব পোড়ান হয়নি। এমনকি, পুরান একটা বাড়ির ভেতর থেকে আস্ত একটা লাইব্রেরিই বেরিয়ে গেল—যার মধ্যে আগেকার রাজা-রাজড়াদের অনেক কথাই লেখা রয়েছে। সুতরাং, রাজা

হোয়াংতি কেবল নামেই আদি রাজা হয়ে রইলেন; মাঝে থেকে খালি কতগুলো বই নষ্ট করাই সার হল, আর কয়েকশ নিরীহ পণ্ডিত মিছামিছি প্রাণ হারালেন। আর হোয়াংতি রাজার দুর্বুদ্ধির জন্য ইতিহাসে তাঁর দুর্নাম থেকে গেল।

জবরদস্তি করে রাজামশাই নাম কিনতে গিয়ে ঠকে গেলেন, কিন্তু আর-একদিকে সত্যি সত্যি তিনি এমন একটা কীর্তি রেখে গিয়েছেন যার জন্য আজও তাঁর নাম লোকে মনে করে রেখেছে। সেই কীর্তিটি হচ্ছে চীনদেশের রাজ্য-ঘেরা পাঁচিল। মানুষ যেমন করে তার দালানদুর্গ বা ক্ষেতবাগান দেয়াল দিয়ে আর বেড়া দিয়ে ঘেরে ঠিক তেমনি করে তিনি তাঁর রাজ্যের উত্তর আর পশ্চিম দিকে প্রকাণ্ড পাঁচিলের ঘেরাও দিয়েছিলেন। পুব সীমানার সমুদ্র থেকে উত্তরের পাহাড় পর্যন্ত, পাহাড়ের উপর দিয়ে পশ্চিমের মরুভূমি পর্যন্ত, উঁচুনীচু আঁকাবাঁকা, দেড় হাজার মাইল লম্বা প্রকাণ্ড দেয়াল। এমন আশ্চর্য বড় দেয়াল পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

চীন সাম্রাজ্যের মধ্যে যে জায়গাটুকুকে ইংরাজিতে 'চায়না' বলা হয়, সেইটুকু হচ্ছে আসল চীনদেশ। মাঞ্চু আর তাতার জাতীয় দস্যুরা এই চীনদেশের লোকেদের উপর ভারি অত্যাচার করত। থেকে থেকে হঠাৎ দল বেঁধে এসে লোকের টাকাকড়ি ফল শস্য সব লুঠপাট করে তারা পালিয়ে যেত। তাদের ঠেকাবার জন্যই এই প্রকাণ্ড পাঁচিল। ভিতরে মাটির বাঁধ, বাইরে ইঁট পাথরের গাঁথুনি, তার মাথার উপর টালিবাঁধান রাস্তা, পাঁচিলের উপর দিয়ে লোকজন গাড়ি ঘোড়া সব যাতায়াত করে। এক-এক জায়গায় এমন চওড়া যে পাঁচ-সাতটা উটের গাড়ি অনায়াসে পাশাপাশি চলতে পারে। কোথাও দেয়ালের গায়ে প্রকাণ্ড ফটক, কোথাও সিঁড়ির মতো ধাপকাটা, কোথাও প্রহরীদের প্রকাণ্ড উঁচু পাহারা ঘর। এমনি করে পাঁচিলের পথ চলেছে। পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠা নামা করতে করতে, কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্বতের চুড়োয় ওঠে, আবার কত নদীর ধারে সমান জমিতে নেমে এসেছে।

দু হাজার দুশ বছর তার বয়স। সে যদি কথা বলতে পারত, তাহলে তার এই বুড়ো বয়সে কত আশ্চর্য কথাই শুনতে পেতাম। কত যুগের পর যুগ এই দেয়ালের বুকের উপর দিয়ে কত দেশ-বিদেশের লোক আসা-যাওয়া করেছে—কেউ ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য, কেউ চুরি ডাকাতির জন্য, কেউ দলে-বলে রাজ্যজয়ের জন্য। তুর্কি, তাতার, মোঙ্গল, মাঞ্চু, চীন, কার অস্ত্রের কত বিক্রম ঐ দেয়াল তার সাক্ষী। কত রাজার কত রাজবংশের কত অদ্ভুত কাহিনী, কত সুখ দুঃখের ইতিহাস! হোয়াংতি রাজার বংশের বা 'হান্' বংশের প্রতাপের কথা—যার ভয়ে তুর্কি তাতাররা জব্দ হয়ে ছিল। তারপর অরাজক দেশে অশান্তির যুগ—যখন ঘরে শত্রু বাইরে শত্রু, তার মধ্যে রাজায় রাজায় লড়াই। তারপর 'তাং' রাজাদের দিগ্বিজয়ের কথা—তাঁরা যুদ্ধ জয় করতে করতে পারস্য আর কাস্পিয়ান থেকে কোরিয়ার শেষ পর্যন্ত রাজ্য দখল করে বসেছিলেন। তারপর ছোটখাট রাজাদের ইতিহাস পার হয়ে 'সুং' বংশের কত কীর্তির কথা—কত বড় বড় কবি, কত বড় বড় পণ্ডিত, আর চারিদিকে জ্ঞান বিজ্ঞানের কত আলোচনা।—সে সময়ে প্রথম ছাপার কল তৈরি করে মানুষে সকলের প্রথম পুঁথির লেখা ছাপতে সুরু করেছে। তারপর কেবলি যুদ্ধবিগ্রহ—মোঙ্গল সেনাপতি চেঙ্গিস খাঁ-র কাছে চীনেদের বার বার লাঞ্ছনা,—আর শেষে কুবলাই খাঁ-র আমল থেকে একশ বছর ধরে চীনদেশে মোঙ্গলদের রাজত্ব। শুধু চীনদেশ কেন, এশিয়ার পূর্বকূল থেকে ইউরোপে হাঙ্গারি রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত তাদের প্রচণ্ড শাসন! তারপর 'মিং' বংশের সৌখিন চীন রাজাদের রাজত্ব আর শিল্প বাণিজ্যের কাহিনী। আজও পাঁচিলের কাছে কাছে তাঁদের সমাধি দেখতে পাওয়া যায়—তার চারিদিকে বড় বড় পাথরের মূর্তি কবর পাহারা দিচ্ছে। তারপর ক্রমে মাঞ্চুদের হাতে চীনের দুর্দশা—আর মাঞ্চু রাজাদের হুকুমে চীনাদের টিকি রাখার নিয়ম

আরম্ভ। সেই থেকে এই বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মাঞ্চু বংশের তা-ৎচিং বা 'অতি শুদ্ধ' রাজাদের রাজত্ব চলে এসেছে।

বুড়ো পাঁচিল এখন মরতে বসেছে। এত যুগ যুগ ধরে তার উপর কত যে চোট গিয়েছে, কত ভাঙা গড়া মেরামত, কত তালির উপর তালি! আর হাজার দু হাজার বছর পরে হয়ত তার চিহ্ন খুঁজে বার করতে হবে। এখনই কত জায়গায় ইঁট পাথর সব ধসে পড়ছে—মস্ত মস্ত ফাটল দিয়ে আগাছা আর জংলি ফুল গজিয়ে উঠছে। আগেকার যুগে শত্রু ছিল যারা তাদের হয়ত বা দেওয়াল দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যেত, কিন্তু এখনকার শত্রু যারা তাদের কামান গোলার সামনে দেয়ালের বাঁধ করবে কি? তাই দেয়ালের আর তেমন যত্নও নেই, চিকিৎসাও নেই। অনেক জায়গায় দেয়ালের পথ দিয়ে চলাফেরার সুবিধা হয় তাই সেইসব জায়গায় এখনও লোকে দেয়ালের যত্ন করে, বছর বছর মেরামত করে। এত ভেঙেচুরে তবুও যা রয়েছে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এক ইজিপ্টের পিরামিড ছাড়া সেকালের মানুষের তৈরি এত বড় কীর্তি আর পৃথিবীর কোথাও নেই।

চাঁদমারি

সৈন্যেরা যেখানে বন্দুক ছুঁড়তে শেখে, সেখানে এক তক্তার উপরে মস্ত চাঁদের মতো একটা গোল চক্র আঁকা থাকে, তার উপর নিশান করে সৈন্যেরা গুলি চালায়। লোকেরা তাকে 'চাঁদমারি' বলে। কেন বলে তা ঠিক জানি না, বোধহয় ওখানে 'চাঁদ'কে মারে বলে তার নাম চাঁদমারি।

আমেরিকার এক মাতাল গোলন্দাজের গল্প শুনেছিলাম, সে বনের মধ্যে গাছের আড়ালে আলো জ্বলতে দেখে সেই আলোর উপর তাক করে কামানের গোলা চালাচ্ছিল। এমন সময় তার কাপ্তান এসে বললেন "ব্যাপার কি? কামান দাগছ কিসের জন্য?" গোলন্দাজ বললে, "ঐ যে সামনে বনের মধ্যে কারা আলো জ্বলিয়েছে, ওদের আলো ফুটো করে দিচ্ছি।" কাপ্তান বললেন, "ওরে হতভাগা! ওটা যে চাঁদ উঠছে, দেখতে পাসনে?" তখন গোলন্দাজের হুঁস হল সে তাকিয়ে দেখল যে এতক্ষণ সে চাঁদটাকে ফুটো করবার আশায় গুলি চালাচ্ছিল!

পৃথিবীর বাইরে আকাশের গায়ে যে সমস্ত আলো আমরা দেখতে পাই, যাদের চন্দ্রসূর্য গ্রহনক্ষত্র বলি তাদের মধ্যে চাঁদটাই সবচেয়ে কাছে। কিন্তু হিসাব করলে দেখি, সেও বড় কম নয়—প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল। মানুষের সব চাইতে ভয়ানক যে কামান, তার গোলা গিয়ে পড়ে ষাট মাইল দূরে। বড় বড় কামানের মুখ থেকে অসম্ভব বেগে গোলা ছুটে বেড়ায়, কিন্তু তবুও সে পৃথিবীর টান ছাড়িয়ে যেতে পারে না। প্রথমে তার যতই তেজ থাকুক, শেষটায় ক্রমে নিস্তেজ হয়ে সেই পৃথিবীতেই ফিরে আসে। কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন, একটা সাধারণ বড় কামানের গোলাকে যদি আরও পাঁচ দশগুণ বেগে খাড়া আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া যায়, তাহলে সে আর কোনদিন ফিরে আসবে না,—একেবারে পৃথিবীর এলাকার বাইরে শূন্যের মধ্যে ছুটে বেরিয়ে যাবে। গোলাটাকে যদি হিসাবমত চাঁদের দিকে তাক করে ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহলে সে চাঁদের গায়ে গিয়ে টুঁ মেরে পড়বে। কতখানি জোরে, কিরকমভাবে গোলা ছুঁড়লে সে ঠিক চাঁদে গিয়ে পড়বে, তাও হিসাব করে বলে দেওয়া যায়।

এক ফরাসী লেখক চাঁদে যাওয়ার সম্বন্ধে একটা চমৎকার গল্প লিখেছিলেন। তাতে কয়েকজন লোককে একটা প্রকাণ্ড গোলার মধ্যে পুরে চাঁদের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল। একটা পাহাড়ের মধ্যে প্রকাণ্ড কামান গেঁথে গোলা ছুঁড়বার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গল্পের আর সব মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু গোলা যখন ছুটে বেরোল তখনও যে ভিতরের মানুষগুলো বেঁচে রইল, এটা কিছুতেই সম্ভব হয় না।

আজকাল শুনতে পাই, কামানের গোলার চাইতে চাঁদে হাউই ছুঁড়ে মারা নাকি অনেক বেশি সহজ। আমেরিকার একজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত অধ্যাপক গডার্ড সাহেব একরকম আশ্চর্য নূতন ধরনের হাউই বানিয়েছেন। তার ভিতরে এমন অদ্ভুত কৌশলে বারুদ-মশলা পোরা থাকে যে, সে বারুদ একবারে সমস্তটা ফাটে না—থেকে থেকে একবার বারুদ ফুটে ওঠে আর তার ধাক্কায় হাউই ক্রমাগত এগিয়ে চলে। প্রথম ধাক্কাতেই হাউই অনেক দূর পর্যন্ত যায়, তারপর যেই তেজ থেমে আসতে থাকে, অমনি আবার দ্বিতীয় ধাক্কা এসে লাগে। সেটার বেগ কমতে না কমতেই আবার তৃতীয় ধাক্কা। এমনি করে নিজের ভিতরকার বারুদের কাছে বারবার ধাক্কা খেয়ে খেয়ে সে হাউই অসম্ভব উঁচুতে উঠে যায়।

গডার্ড সাহেবের তৈরি চার সের ওজনের একটা হাউই অনায়াসে দুশ মাইল উঁচুতে উঠতে পারে। আর বারুদশুদ্ধ ১৬ মণ ওজনের ঐরকম একটা হাউই বানিয়ে যদি আকাশের দিকে ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহলে সে হাউই আর ফিরে আসবে না। বারুদ ফুরাবার আগেই সে এতদূর গিয়ে পড়বে যে পৃথিবী তাকে আর কিছুতেই ফিরিয়ে আনতে পারবে না। তখন তার বেগ আর কমবে না; সে নিজের বেগে সোজা নিজের পথে যুগের পর যুগ ছুটে চলতে থাকবে—যদি পথের মধ্যে চাঁদ কিংবা অন্য কোন গ্রহ কিংবা আর কিছুতে তাকে টেনে না নেয়। গডার্ড সাহেব বলেন, এইরকমের একটা হাউইকে চাঁদের দিকে ছেড়ে দিলে সে নিশ্চয়ই চাঁদে গিয়ে পৌঁছাবে। হাজার পাঁচেক টাকা হলেই নাকি এইরকম একটা হাউই বানান যেতে পারে। চাঁদের অন্ধকার দিকটায় যদি হিসেব করে হাউই ফেলা যায়, আর হাউইয়ের মধ্যে যদি এমন মশলা দেওয়া থাকে যে চাঁদের গায়ে ঠেকবামাত্র তাতে বিদ্যুতের আলোর মতো চোখ ঝলসান আগুন জ্বলে ওঠে, তাহলে পৃথিবীতে বসে দূরবীণ দিয়ে সেই আলোর ঝিলিক্ দেখে পণ্ডিতেরা বলতে পারবেন—'ঐ হাউই গিয়ে চাঁদের গায়ে পড়ল।'

আরও অনেকখানি বড় করে যদি চাঁদমারি হাউই বানান যায়, আর তার মধ্যে দুচারজন মানুষ থাকবার মতো ঘরের ব্যবস্থা করা যায় আর বড় বড় চোঙায় ভরা বাতাস আর কিছুদিনের মতো খাবার খোরাক যদি সঙ্গে দেওয়া যায়, তাহলে মানুষও চাঁদে বেড়াতে যেতে পারবে না কেন? চাঁদে লেগে হাউই যাতে চুরমার হয়ে না যায়, তার জন্য নানারকম বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। ফিরে আসবার সময় পৃথিবী-মুখো করে হাউই ছাড়বার মতন ব্যবস্থাও সহজেই করা যায়। এর মধ্যেই নাকি কোন কোন উৎসাহী লোকে খুব সাহস করে গডার্ড সাহেবকে লিখেছেন যে, চাঁদে যাওয়ার জন্য যদি লোকের দরকার হয়, তাহলে তাঁরা যেতে রাজি আছেন। কেউ কেউ নাকি তার জন্য টাকাও দিতে চেয়েছেন। কিন্তু গডার্ড সাহেবের সেরকম কোন মতলব নেই।

যা হোক মানুষের খেয়াল চাপলে মানুষ সবই করতে পারে। হয়ত তোমরা সব বুড়ো হবার আগেই শুনতে পাবে যে চাঁদের দেশের প্রথম যাত্রীরা চাঁদে যাবার জন্য রওনা হয়েছে। তারা যদি গিয়ে ফিরে আসতে পারে, তাহলে কত যে আশ্চর্য অদ্ভুত কাহিনী তাদের কাছে শুনতে পাবে, তা এখন কল্পনা করাও কঠিন।

বায়োস্কোপ

ঘরের বাইরে ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি হচ্ছে। চেয়ে দেখ, খাড়া খাড়া রেখার মতো বৃষ্টির ধারা পড়ছে। এক একটি ধারা এক একটি বৃষ্টির ফোঁটা; কিন্তু ফোঁটাগুলো মোটেই ফোঁটার মতো দেখাচ্ছে না—দেখাচ্ছে ঠিক লম্বা লম্বা আঁচড়ের মতো। একটা দড়ির আগায় একটা পাথর বেঁধে যদি খুব তাড়াতাড়ি ঘোরাতে পার তাহলে দেখতে মনে হবে, যেন আস্ত একটা চাকা ঘুরছে। কিন্তু তা বলে পাথরটা ঘুরবার সময় ত আর সত্যি করে চাকার মতো হয়ে যায় না! তবে এরকম দেখায় কেন?

অন্ধকার রাত্রে আকাশের গা দিয়ে যখন উল্কা ছুটে যায় তখন তাদেরও দেখায় ঠিক ঐরকম একটানা লম্বা দাগের মতো। উল্কাটা জ্বলতে জ্বলতে যে পথ দিয়ে ছুটে গেল, মনে হয় যেন সেই পথের সমস্তটা গা অনেকখানি এক সঙ্গে জ্বলতে দেখলাম। কিন্তু আমরা জানি, উল্কাটা সত্যি সত্যি একই সময়ে ততখানি লম্বা জায়গা জুড়ে ছিল না। সেটা আগে এখানে, পরে ওখানে, তারপর সেখানে, এমনি করে ক্রমাগত ছুটে চলেছে—কিন্তু সে খুব তাড়াতাড়ি চলছে বলে মনে হয় যেন একই সময়ে তাকে এখানে ওখানে সেখানে দেখতে পাচ্ছি। বৃষ্টির ফোঁটার বেলাও তেমনি হয়। এইমাত্র তাকে দেখছি মাটির থেকে বিশ হাত উঁচুতে; কিন্তু এই দেখাটুকু মন থেকে মুছতে না মুছতে সেই ফোঁটাটা একেবারে মাটি পর্যন্ত নেমে পড়ছে। তাই মনে হচ্ছে যেন একই সময়ে বিশ হাত উঁচু থেকে মাটি পর্যন্ত সমস্তটা জায়গা জুড়েই ফোঁটাটাকে দেখতে পাচ্ছি।

এইরকম পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, চোখ দিয়ে আমরা যা দেখি, চোখের দেখা শেষ হলেও তাকে আমাদের মন খানিকক্ষণ পর্যন্ত ধরে রাখে। সে অতি অল্প সময়—এক সেকেন্ডের পাঁচ ভাগের এক ভাগ, অথবা তার চাইতেও কম।

মনে কর, একটা ছবির দিকে তুমি তাকিয়ে আছ। আমি মাঝে থেকে তোমার চোখের সামনে আড়াল দিলাম, তুমি আর সে ছবি দেখতে পারছ না। যদি আড়াল সরিয়ে নেই, অমনি আবার দেখতে পাবে। যদি বারবার আড়াল দেই আর বারবারই সরাই, তাহলে মনে হবে, ছবিটা বারবার দেখা যাচ্ছে আর বারবার অদৃশ্য হচ্ছে। কিন্তু এই কাজটি যদি খুব তাড়াতাড়ি করতে পারি, অর্থাৎ মনে কর প্রতি সেকেন্ডে যদি দশবার আড়াল পড়ে আর দশবার দেখতে পাও, তাহলে আর আড়াল-দেওয়া টের পাবে না। মনে হবে আগাগোড়াই স্থিরভাবে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ। প্রথম যে ছবি দেখছ, তার জের ফুরোতে না ফুরোতে দ্বিতীয়বারের ছবিটা এসে পড়ছে; এই দ্বিতীয়বারের 'রেশটুকু' থাকতে থাকতেই আবার তৃতীয়বারের ছবিটা চোখে পড়ছে। তাই মনে হয়, আগাগোড়াই সমান দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু ছবিটা যদি আগাগোড়া একইরকম না থেকে ক্রমাগত বদলিয়ে যেতে থাকে? মনে কর, একটা সং খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর ক্রমে সে কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ছে, তারপর মাথা নীচু করে ঠ্যাং দুটোকে ঘুরিয়ে, কেমন ডিগবাজী খেয়ে, শেষটায় আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ছবিগুলো যদি খুব তাড়াতাড়ি একটার পর একটা ঠিকমত তোমার চোখের সামনে ধরে দেওয়া যায়, তাহলে তোমার মনে হবে সত্যি সত্যি যেন ছবিতে সঙটা ডিগ্‌বাজী খাচ্ছে।

আজকাল যে সহরে সহরে, এমনকি পাড়াগাঁয়ে পর্যন্ত লোকেরা বায়োস্কোপ দেখে তার সংকেতও এইরকম। খুব চট্‌পট্‌ করে যদি কোন চলতি জিনিসের অনেকগুলো ফটো নেওয়া হয়—আর তারপর যদি সেই ফটোগুলোকে তেমনি তাড়াতাড়ি, সেকেন্ডে ১০/১২টা করে পরপর চোখের সামনে ধরে দেখান হয়, তা হলেই বায়োস্কোপ দেখান হল। মনে কর, বায়োস্কোপে তোমার

ভাত-খাওয়ার ছবি নেওয়া হচ্ছে। তাহলে কিরকম হবে?—প্রথম ছবিতে হয়ত তুমি ভাতের গ্রাস ধরেছ, তোমার মুখটা তখনও বোজা আছে। দ্বিতীয় ছবিতে থালা থেকে তোমার হাত উঠছে, মুখটাও একটু খুলতে চাচ্ছে। তৃতীয় ছবিতে হাতখানা আরও উঠছে, মুখেও বেশ ফাঁক দেখা দিয়েছে। তারপর হাতটা ক্রমেই মুখের কাছে এগিয়ে আসছে আর মুখের হাঁ-টাও বেশ বড় হয়ে আসছে। তারপর হাত গিয়ে মুখে ঠেকছে, তারপর মুখের মধ্যে গ্রাস ঢুকছে ইত্যাদি।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে প্রথম যে বায়োস্কোপের ছবি তোলা হয়েছিল, সেই ছবি তুলবার জন্য চব্বিশটা ফটোগ্রাফের কল পর পর সাজান হয়েছিল আর প্রত্যেকটা কলের সামনে এক একটা সূতো এমনভাবে টেনে বাঁধা হয়েছিল যে একটা ঘোড়া কলের সামনে দিয়ে যেতে গেলেই সূতো ছিঁড়ে যাবে, আর ক্যামেরাতে ঘোড়ার ফটো উঠে যাবে। আজকালকার বায়োস্কোপ-কলের বন্দোবস্ত এরকম নয়। তাতে একটা লম্বা ফিতের উপর পর পর হাজার হাজার ছোট ছোট ফটো তোলা হয়। এক একটা ছবি ওঠে আর ফিতেটা এক-এক ঘর সরে যায়। এমনি করে প্রত্যেক সেকেন্ডে দশ-বারোটা করে ফটো তোলা হয়—ঘণ্টায় প্রায় চল্লিশ হাজার!

এমন কলও তৈরি হয়েছে যাতে প্রতি সেকেন্ডে পাঁচ হাজার ফটো তোলা যায়। এইরকম তাড়াতাড়ি ফটো তুলে তারপর যদি দেখাবার সময়ে বেশ ধীরে ধীরে সাধারণ বায়োস্কোপের ছবির মতো দেখান হয় তাহলে খুব দ্রুত ঘটনার ছবিও বেশ স্পষ্ট করে সহজভাবে দেখবার সুবিধা হয়। একটা সাবানের বুদ্বুদের ভিতর দিয়ে বন্দুকের গুলি ছুটে গেলে বুদ্বুদটা কিরকম করে ফেটে যায় তাও দেখান যায়। চোখে দেখলে এই ব্যাপারটা হঠাৎ এক মুহূর্তে শেষ হয়ে যায়,—বন্দুক ছুটল আর বুদ্বুদ ফাটল, এইটুকুই খালি বোঝা যায়।

যে-ব্যাপারটা ঘটতে অনেক সময় লাগে তাকেও বায়োস্কোপের ছবিতে খুব অল্প সময়ের মধ্যে চট্‌পট্ ঘটিয়ে দেখান যায়। ফুলগাছের টবে সবেমাত্র অঙ্কুর গজাচ্ছে, সেই অঙ্কুর থেকে গাছ হবে, সেই গাছ বাড়বে, তাতে কুঁড়ি ধরবে, তারপর ফুল ফুটবে—বসে বসে দেখতে গেলে কতদিন সময় লাগে! বায়োস্কোপে যদি তার ছবি তোল, এক-এক দিনে দশ বারোটা বা পঁচিশ ত্রিশটা করে—আর দেখবার সময় চট্‌পট্ দেখিয়ে যাও,—তাহলে দেখবে যেন চোখের সামনেই দেখতে দেখতে গাছ গজিয়ে বেড়ে উঠছে আর ফুল ফুটছে!

ভুঁইফোঁড়

কেঁচোরা যে মাটি ফুঁড়ে চলে তা তোমরা সকলেই জান, কিন্তু কেমন করে চলে জান কি? কেঁচোর শরীরটা একটা লম্বা ফাঁপা চোঙের মতো, তার দুইদিকেই ফুটো। একদিক দিয়ে কেঁচো মাটি গিলতে থাকে, আর-একদিক দিয়ে সেই মাটি সরু সুতোর মতো হয়ে ক্রমাগত বেরিয়ে যায়। এমনি অদ্ভুতরকম করে মাটি খেয়ে খেয়ে আর সরিয়ে সরিয়ে কেঁচোরা মাটির মধ্যে ঢোকে।

কেঁচোর বিদ্যেটাকে আজকাল মানুষও শিখে নিয়েছে! মানুষে ভারি ভারি কেঁচো-কল বানিয়ে, তা দিয়ে মাটির মধ্যে বড় বড় সুড়ঙ্গ কেটে ফেলে। ইউরোপ আমেরিকার অনেক সহরের তলায় মাটির নীচে যে সমস্ত রেল রাস্তার সুড়ঙ্গ থাকে, সেগুলোর অধিকাংশই কেঁচো-কল দিয়ে কাটান হয়।

কেঁচো-কল কিরকম জান? প্রকাণ্ড মজবুত লোহা-বাঁধান নলের মতো জিনিস, তার মধ্যে ভারি ভারি কলকব্জা। নলের মাথাটা কলের ধাক্কায় ক্রমাগত জমাট মাটির মধ্যে ঢুঁ মেরে এগিয়ে চলতে চায়। মাটি আর সরবার পথ পায় না, কাজেই সে হাঁ-করা চোঙার ভিতর দিয়ে নলের

মধ্যে ঢুকে কলের পিছন দিকে বেরিয়ে এসে জমতে থাকে। এমনি করে কেঁচো-কল এগিয়ে চলে আর আপনি আপনি সুড়ঙ্গ কাটা হয়ে যায়। কলের সঙ্গে সঙ্গে লোকজন সব চলতে থাকে, তারা ক্রমাগতই মাটি সরায়, রেল বসায়, আর সুড়ঙ্গের ভিতরটাকে মজবুত লোহায় মোড়া পাকা গাঁথ্‌নি দিয়ে বাঁধিয়ে দেয়। বড় বড় এক একটা কেঁচো-কল এক-এক দমে পাঁচ-ছয় হাত এগিয়ে যায়, তারপর আবার কলকব্জা গুটিয়ে দম নিতে থাকে। এমনি করে নরম মাটিতে সারাদিনে হয়ত একশ হাত সুড়ঙ্গ কাটে।

লন্ডন সহরের পঁচিশ ত্রিশ বা চল্লিশ হাত নীচেকার মাটি খুবই নরম। কেঁচো-কলের ঠেলায় পড়লে সে মাটি কচ্‌কচ্‌ করে কেটে যায়। কিন্তু মাটি যদি ইঁটের মতন শক্ত হয়—যদি পাথরের মধ্যে সুড়ঙ্গ কাটা দরকার হয়—তাহলে আর কেঁচোকলের শক্তিতে কুলায় না। তখন অন্যরকম ভুঁইফোঁড় কলের ব্যবস্থা করতে হয়। মাটি কাটার চাইতে পাথর কাটার হাঙ্গামা অনেক বেশি। কতরকম সাংঘাতিক কল দিয়ে পাথরকে কেটেকুটে খুঁড়েফুঁড়ে খুঁচিয়ে পিটিয়ে তবুও যখন পারা যায় না,—যখন যন্ত্রের মুখ ক্রমাগতই ভোঁতা হয়ে যায়, কলের ফলা বারেবারেই ভাঙতে থাকে, সারাদিন পরিশ্রমের পর সুড়ঙ্গ পাঁচ হাত এগোয় কিনা সন্দেহ—তখন বোমাবারুদ ফুটিয়ে, পাথর উড়িয়ে পথ করতে হয়। এমন পরিশ্রমের কাজ খুব কমই আছে। এক একটা ছোটখাট পাহাড় কেটে সুড়ঙ্গ বসাতে কত সময়ে বছরের পর বছর কেটে যায়।

লন্ডনের যে সুড়ঙ্গ-রেল, তাকে সেদেশে 'টিউব' (Tube) বলে। সহরের মাঝে মাঝে টিউব স্টেশন থাকে, সেখানে ঢুকে টিকিটঘরের জানালা দিয়ে টিকিট কিনতে হয়, অথবা টিকিট-কলে এক পেনি বা দু পেনি ফেলে দিয়েও টিকিট নেওয়া যায়। তারপর একটা লিফ্‌ট বা চল্‌তিঘরে ঢুকতে হয়, সেখানে টিকিট দেখে। চল্‌তিঘর বোঝাই হলেই লোহার দরজা বন্ধ করে দেয় আর ঘরশুদ্ধ সবাই একটা খাড়া পাতকুয়ার মতো সুড়ঙ্গ বেয়ে মাটির মধ্যে অন্ধকারে নামতে থাকে। পাঁচ তলা বা সাত তলা বাড়ির সমান নীচে নামলে পর পাতকুয়ার তলায় স্টেশনের প্লাটফরম পাওয়া যায়। সেখানে চারিদিকে বিদ্যুতের আলো। দু-মিনিট পরে পরে একটা করে ট্রেন আসে, আর আধ মিনিট করে থামে। এক একটা ট্রেনে লম্বা লম্বা পাঁচ-সাতটা গাড়ি, প্রত্যেক গাড়ির সামনে পিছনে লোহার ফটক। ফটকের পাশে লোক বসে থাকে, তারা 'আর্লস্‌ কোর্ট' 'পিক্যাডিলি' 'হোবর্ণ' বলে সব স্টেশনের নাম ডাকে আর ফটক খুলে দেয় আর লোকেরা সব হুড়্‌হুড়্‌ করে ওঠে আর নামে।

ট্রেনের বন্দোবস্ত এমন আশ্চর্য, কোথাও বিপদের ভয় নেই। সামনে যদি কোথাও ট্রেন আটকিয়ে থাকে, তাহলে পিছনের ট্রেন আপনা থেকেই থেমে পড়বে। ট্রেনের ড্রাইভার বা চালক যদি হঠাৎ মরেও যায়, তবুও ট্রেন স্টেশনের ধারে এসে দাঁড়িয়ে যাবে। পাতালপুরীর ট্রেন, সেখানে বাতাস চলবার ব্যবস্থা খুব ভাল করেই করতে হয়। বড় বড় দমকলের হাওয়া দিয়ে সমস্ত টিউবটাকে সারাক্ষণ ভরিয়ে রাখতে হয়। ট্রেনগুলি সব বিদ্যুতে চলে, তাতে আগুনও জ্বলে না, ধোঁয়াও ছাড়ে না।

অনেক সময় নদীর তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ বসাবার দরকার হয়। নদী যদি খুব বড় আর খুব গভীর হয়, তাহলে তার তলা দিয়ে মাটির মধ্যে সুড়ঙ্গ নেওয়া এক ভীষণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় এ কাজটিকে সহজ করার জন্য এক চমৎকার কৌশল খাটান হয়। আগে ডাঙার উপর সুড়ঙ্গ বানিয়ে, তারপর সেই সুড়ঙ্গ ভাসিয়ে নদীর মধ্যে ঠিক জায়গায় নিয়ে ডুবিয়ে দেয়। তাতে হাঙ্গামও কমে, খরচও বাঁচে, কাজও হয় খুব তাড়াতাড়ি।

বড় বড় সহরের বড় বড় কাণ্ড। ঘোড়া মোটর রেল ট্রাম ত সারাদিনই লোকে ভর্তি, তার উপর ডাক পার্সেল মাল মোটেরও অন্ত নাই। রাস্তার উপরেও যেমন, নীচেও তেমন—উপরেই

বরং হৈ চৈ, মাটির নীচে সব ঘড়ির কাঁটার মতো নিয়ম বাঁধা। এক আমেরিকার শিকাগো সহরেই সুড়ঙ্গের রেলগাড়িতে প্রতিদিন সাড়ে সাত লক্ষ মণ মাল পারাপার করে। সেখানকার বড় বড় দোকানের আর গুদামখানার নীচের তলায় সুড়ঙ্গ থাকে, একেবারে মাটির নীচে রেলের লাইন পর্যন্ত। তারা মালপত্র সব সেখান দিয়ে সহরের তলায় তলায় চালান করে।

কথা হচ্ছে, কলকাতায় এইরকম ভুঁইফোঁড় সুড়ঙ্গের রেল বসান হবে। তা যদি হয়, তখন আর বর্ণনা ক'রে বোঝাবার দরকার হবে না, টিকেট কিনে চড়ে দেখলেই পারবে,—আর মনে করবে, এ আর একটা আশ্চর্য কি? এখন কলকাতার সহরে মোটরগাড়ি দেখলে কেউ ফিরেও তাকায় না; কিন্তু আমার বেশ মনে পড়ছে, এক সময়ে সামান্য একটা বাইসাইকেল দেখবার জন্য আমরা কিরকম উৎসাহ করে দৌড়ে আসতাম।

মামার খেলা

মামা বললেন, "আয়, একটা নূতন খেলা খেলবি আয়।" শুনে সবাই দৌড়ে এসে ঘিরে বসল,—"কি খেলা, মামা?"

মামা বললেন, "এ খেলার নিয়ম খুব সহজ, কিন্তু খেলতে হলে খুব হুঁশিয়ার হওয়া চাই। নিয়ম হচ্ছে এই যে, সবাই যেমন ইচ্ছা কথা বলতে পারবে, কিন্তু এক একটা অক্ষর বাদ দিয়ে।" সবাই বললে, "সে আবার কিরকম?"

মামা—এই মনে কর, যেন 'ক' বলব না—এমন কোন কথাই বলব না, যার মধ্যে কোথাও 'ক' আছে। যেমন—কলা, কৃপণ, হাল্কা, বাক্স এসব কিছুই বলতে পারব না। পটলা অমনি চট্ করে বলে উঠল, "এ আর মুস্কিল কিসের? ওসব না বললেই হল।"

মামা বললেন, "না বললে ত হলই, কিন্তু না বলে পারিস কিনা একবার দেখ ত।"

পটলা—আচ্ছা বেশ,—এই দেখ, আমি 'ক' বলব না—

মামা—আচ্ছা আয় দেখি, আমার সঙ্গে গল্প কর আমিও 'ক' বলব না। এই খেলা আরম্ভ হচ্ছে,—ওয়ান টু থ্রি। —হ্যাঁরে পটলা, তুই এখন বোধোদয় পড়িস্?

পটলা—বোধোদয়! সে ত কোন কালে—ঐ যা! 'ক' হয়ে গেল। আচ্ছা দাঁড়াও,আবার বলছি। বোধোদয় আমি অনেকদিন হল—

হারু, বিশু, কালু—আঁ্যা! 'অনেক' বললে যে!

পটলা—ও তাই ত! আচ্ছা বলছি—বোধোদয় আমার বহুৎ দিন হল শেষ হয়েছে—এখন চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ পড়ছি।

মামা—বেশ বেশ, খুব বলেছিস। পড়াশুনো বেশ চলছে ত? না রোজ মাস্টার মশাই মার লাগান?

পটলা—ইস্! তা বৈ—বাস্ রে, বড্ড সামলে গেছি। না মারবেন কেন?—দুত্তরি! এ ছাই খেলা।

হারু—আমি খেলব মামা—আমি 'ল' বলব না।

মামা—বলবিনে? আচ্ছা আমি এক্ষুনি বলাচ্ছি তোকে। আমিও 'ল' বাদ দিলাম—ওয়ান টু থ্রি। হ্যাঁরে হারু, তুই মাথা মুড়িয়েছিস কেন?

হারু—ওটা—ওটা নাপিতে কামিয়ে দিয়েছে।

মামা—নাপিত কামড়িয়ে দিয়েছে কেন?

হারু—না, কামড়িয়ে নয়—কামিয়ে।

মামা—ও, কামিয়ে? কি দিয়ে? কাস্তে দিয়ে?

হারু—না, ক্ষুর দিয়ে—

মামা—বেশ, বেশ। তা কিরকম করে কামায় একটু বুঝিয়ে দে ত, সবাই শুনুক।

হারু—এই একটা বাটির মধ্যে খানিকটা—ঐ যা! দাঁড়াও বলছি—খানিকটা Water দিয়ে তারপর একটা চামড়ার উপর ক্ষুর ঘষে ঘষে ধার দিয়ে, কচ্‌কচ্‌ করে—হুঁ—কচ্‌কচ্‌ করে—

পটলা—কচ্‌কচ্‌ করে চালিয়ে দিল।

বিশু—বুলিয়ে গেল। না, তাহলেও হয় না—

হারু—কচ্‌কচ্‌ করে সব সাবাড় করে দেয়।

মামা—বেশ, বেশ, এই ত চমৎকার হচ্ছে। হুঁশিয়ার থাকা চাই আর চট্‌পট্‌ কথা জোগান চাই। আচ্ছা, তোর বড়দা আসবে কবে?

হারু—(মাথা চুলকাইয়া) এই—আজকের দিনের পরের দিন।

মামা—দুপুরের ট্রেনে বুঝি?

হারু—না, বিকেল—ঐ যা! 'ল' হয়ে গেল।

কালু—আমি খেলব। আমি 'য' বলব না!

মামা—তার চেয়ে বল না, হয়ে ময়ে 'ক্ষ' বলব না? সব গোলমাল চুকে যায়।

কালু—তাহলে কোনটা বলব না বলে দাও।

মামা—আচ্ছা, 'ন' বলিসনে। আয় দেখি—ওয়ান টু থ্রি—খেলাটা বুঝতে পেরেছিস ত?

কালু—হ্যাঁ।

মামা—কিরকম বুঝেছিস বল ত—

কালু—খুব ভাল।

মামা—(ভ্যাংচাইয়া) খুব ভাল। তুই কথা বলতে শিখেছিস কবে থেকে?

কালু—ছেলেবেলা।

মামা—আর এই বুড়োবেলায় বুঝি বোবামি শিখেছিস?

কালু—দ্যুৎ!

মামা—এটা দেখি আচ্ছা ট্যাটা—মুখ বুজেই থাকবে। ওরে, একটু কথা-টথা বল, চুপ করে থাকলে কি খেলা হয়?

কালু—(অনেক ভাবিয়া) মামা, তুমি কি খাও?

মামা—তোমার মাথা খাই। গাধা কোথাকার! বলি ঝগড়ার সময় কি তুই ঘাড় গুঁজে চুপ করে থাকিস্‌?

কালু—উঁহু।

মামা—কি করিস তাহলে?

কালু—ঝগড়া করি।

মামা—(চটিয়া) ঝগড়াটা কিরকম শুনি—(জিভ কাটিয়া) হ্যাঁ, কিরকম বল ত।

অমনি সকলের তুমুল চীৎকার—"'ন' বলেছে—মামা 'ন' বলেছে—মামা কালুর সঙ্গে হেরে গিয়েছে।

মামা বললেন, "যা! তোদের আর খেলাটেলা কিছু শেখাব না—তোরা বেজায় ফচ্‌কে হয়েছিস।"

ডাকের কথা

মাস্টারমশাই ইতিহাস পড়াতে পড়াতে বললেন, "শের সা ঘোড়ার ডাকের সৃষ্টি করেছিলেন।" একটি ছেলে অমনি জিজ্ঞাসা করল, "তার আগে কি ঘোড়ায় ডাকত না?" মাস্টারমশাই হো-হো করে হেসে উঠলেন আর বললেন, "ঘোড়ায় ডাকত বটে, কিন্তু ডাক বইত না।" তখন ছেলেটি বুঝতে পারল যে 'ডাক' মানে এখানে গলার 'ডাক' নয়,—এ হচ্ছে চিঠির ডাকের কথা। এখনও অনেক দেশে ঘোড়ার ডাক চলছে; কিন্তু প্রায় সব দেশেই তার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি ডাক পাঠাবার বন্দোবস্ত হয়েছে।

মানুষের স্বভাবই এই যে, সে যত পায় তত চায়। রেলের সৃষ্টি হওয়ার পর আমরা শত শত মাইল দূরের চিঠিও একদিনেই পেয়ে যাই; কিন্তু সেখানে যদি একদিনের দেরি হয়, তাহলেই আমরা অনেক সময় বিরক্ত হই।

শুধু যদি রেলে আর জাহাজে করেই ডাক নেওয়া হত তাহলে ত আর কোন ভাবনাই ছিল না। কিন্তু, তা ত আর হবার যো নাই। সব জায়গায় রেলও চলে না; জাহাজও সব জায়গায় যায় না। সেসব জায়গায় যে কতরকমে ডাক যায়, তা আর কি বলব! মানুষে ত পিঠে করে ডাক নিয়ে যায়ই—তাকে 'রানার' বলে—তাছাড়া, ঘোড়ার পিঠেও ডাক যায়। এ ছাড়া কতরকমের গাড়ি করে যে ডাক যায় তাই বা কি বলব! ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ি, উটের গাড়ি, মানুষে-টানা গাড়ি, ঠেলা গাড়ি;—আরো কতরকমের গাড়ি! মোটর গাড়িও হয়েছে আজকাল। গাড়ি ছাড়া নৌকা করেও ডাক যায়;—ডিঙি, ডোঙা, পানসি, সাম্পান, বজরা—আরো কতরকমের। যেখানে নৌকা চলে না অথচ জল পার হতে হয়, কিংবা এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে যেতে হয়, সেখানে অনেক সময় দড়ি কিংবা তারে ডাকের থলি ঝুলিয়ে পার করে। যে-পারে থলিটা পাঠাতে হবে, সে-পারে একটু নিচু জায়গায় দড়ি কিংবা তার বাঁধে; এপারে বেশ উঁচু জায়গায় বাঁধে। থলিটাতে একটা বড় কড়া লাগিয়ে দিয়ে দড়ির ভিতরে সেই কড়া পরিয়ে দেয়। তারপর, দড়িটা টান করে ধরলে থলিটা আপনা থেকেই সড়্‌সড়্‌ করে গড়িয়ে ও-পারে চলে যায়।

যেসব দেশে মোটেই রেলগাড়ি চলে না, সেখানেই বড় মুস্কিল। তুর্কিস্থানে রেল নাই; সেখানে শত শত মাইল পথে কেবল ঘোড়ার ডাকই চলে। দেশের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় যদি কোন চিঠি পাঠাতে হয়, তাহলে প্রায় দেড় মাস সময় লাগে! তোমরা হয়ত ভাবছ, 'এমন দেশও আছে এখন?' কিন্তু, এ কথা একবার ভেবে দেখ না কেন যে, এর চেয়েও খারাপ অবস্থা আছে অনেক দেশের—ডাকের বন্দোবস্তই নাই সেসব জায়গায়।

এ ত গেল একদিকের কথা। আরেকদিকে দেখ, কত তাড়াতাড়ি ডাক পাঠাবার বন্দোবস্ত হচ্ছে আজকাল! রেলে ডাক পাঠিয়েও সন্তুষ্ট নয়;—এখন এরোপ্লেনে পাঠাবার বন্দোবস্ত হচ্ছে অনেক দেশে। তাতে এত তাড়াতাড়ি ডাক যাবে যে এখনকার সঙ্গে তুলনাই হয় না। রেলগাড়ি খুব তাড়াতাড়ি চললেও গড়পড়তা ঘণ্টায় ৫০/৬০ মাইলের বেশি প্রায়

যায় না। কিন্তু এরোপ্লেন অনায়াসেই ঘণ্টায় ১০০ মাইলের বেশি যায়। তাছাড়া, এরোপ্লেন একেবারে সোজা রাস্তা ধরে চলে—তার জন্য আর রাস্তা তৈরি করতে হয় না;—কোন বাধাই নাই তার। আমেরিকাতে আজকাল নিয়মমত এরোপ্লেনে ডাক যায়। ভারতবর্ষের এক কোণা থেকে আরেক কোণায় ডাক যেতে যত সময় লাগে কয়েক বৎসর পর হয়ত সেই সময়ের মধ্যেই বিলাতের ডাক এদেশে এরোপ্লেনে পৌঁছে যাবে।

কাঠের কথা

কেউ কেউ হয়ত বলবে, "দূর ছাই! কাঠের কথা আবার শুনব কি? ভারি ত জিনিস, তাই নিয়ে আবার কথা!" তা বলতে পার কিন্তু কাঠ যে মানুষের কাজের পক্ষে কত বড় দরকারী জিনিস, তা একবার ভেবে দেখেছ কি? এখন না হয় সভ্য মানুষে কয়লা, কেরোসিন, গ্যাস বা ইলেকট্রিক চুল্লির ব্যবহার শিখেছে; কিন্তু তার আগে ত জ্বালানি কাঠ না হলে মানুষের রান্নাবান্না কলকারখানা কিচ্ছুই চলত না, শীতের দেশে মানুষের বেঁচে থাকাই দায় হত। এই ত কিছুকাল আগেও কাঠের জাহাজ না হলে মানুষে সমুদ্রে যেতে পারত না, কাঠের কড়ি বরগা থাম না হলে তার ঘর বাড়ি তৈরি হত না।

বলতে পার, এখন ত এ সবের জন্য কাঠের ব্যবহার কমে আসছে। তা সত্যি! এমনকি, ঘরের দরজা জানালা আসবাবপত্র পর্যন্ত যে ক্রমে কাঠের বদলে অন্য জিনিস দিয়ে তৈরি হতে থাকবে তাতেও কোন সন্দেহ নাই। আর পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই হয়ত দেখবে, ঘরে ঘরে নানারকম ঢালাই-করা মেটে পাথরের আসবাবপত্র! কিন্তু তবুও দেখা যায় যে খুব 'সভ্য' জাতিদের মধ্যেও কাঠের ব্যবহার ক্রমেই বেড়ে চলছে, কমবার লক্ষণ একটুও দেখা যায় না। প্রতি বৎসরে এত কোটি মণ কাঠ মানুষে খরচ করে এবং তার জন্য এত অসংখ্য গাছ কাটতে হয় যে অনেকে আশঙ্কা করেন, হয়ত বেহিসাবী যথেচ্ছ গাছ কাটতে কাটতে কোন্ দিন পৃথিবীতে কাঠের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হবে! এরকম যে সত্যি সত্যিই হতে পারে, তার প্রমাণ নানা দেশে পাওয়া গিয়েছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এক সময়ে এমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বন ছিল আর তাতে এত অসংখ্য গাছ ছিল যে লোকে বলত এ দেশের কাঠ অফুরন্ত—এরা সমস্ত পৃথিবীময় কাঠ চালান দিয়েও কোনদিন এত গাছ কেটে শেষ করতে পারবে না। কিন্তু সে দেশের লোকে এমন বে-আন্দাজ ভাবে এর মধ্যে বন জঙ্গল সব কেটে প্রায় উজাড় করে ফেলেছে যে এখন তারা নিজেরাই অন্য দেশ থেকে কাঠ আমদানী করতে বাধ্য হচ্ছে।

প্রতিদিন জাহাজ বোঝাই করা লক্ষ লক্ষ মণ কাঠ সাগর পার হয়ে নানা দেশ হতে নানা দেশে চলেছে। এত কাঠ লাগেই বা কিসে, আর আসেই বা কোথা থেকে? কানাডা রুশিয়া নরওয়ে ভারতবর্ষ অস্ট্রেলিয়া—কত জায়গা থেকে কাঠ চলেছে ইউরোপ আমেরিকার বড় বড় বন্দরের দিকে। যেখানেই নূতন রেলের লাইন হচ্ছে সেখানেই লাইনের নীচে দিবার জন্য ভারি ভারি কাঠের 'স্লিপার' চাই—যেখানেই মাটির নীচে খনি খোঁড়ার কাজ চলছে সেখানেই খনির দেয়ালে ছাদে ঠেকা দিবার জন্য বড় বড় কাঠের গুঁড়ি কাঠের

থাম দরকার হচ্ছে। ইউরোপের বড় বড় সহরে রাস্তা বাঁধাবার জন্য কত অসংখ্য কাঠ ইঁটের মতো চৌকো করে কেটে বসান হচ্ছে।

কিন্তু কাঠকে কাজে লাগাবার জন্য আজকাল এর চাইতেও অনেক অদ্ভুত উপায় বের করা হয়েছে। কাঠ থেকে যে কাগজ তৈরি হয়, তা বোধ হয় তোমরা সকলেই জান। যত খবরের কাগজ দেখ সে সমস্তই কাঠের কাগজে ছাপা। কেবল কাগজ তৈরির জন্যই প্রতি বৎসর প্রায় দশ কোটি মণ কাঠের দরকার হয়। কাঠওয়ালারা কাঠকে পিটিয়ে থেঁৎলিয়ে সিদ্ধ করে একটা অদ্ভুত জিনিস বানায়, তার নাম 'উড্‌পাল্প' (Wood-pulp)। বাংলায় 'কাঠের আমসত্ত' বললে বর্ণনাটা নেহাৎ মন্দ হয় না। কাগজওয়ালারা নানা দেশ থেকে এই অপরূপ আমসত্ত কিনে এনে তা দিয়ে কাগজ বানায়। আগে এইরকমে কেবল সাধারণ সস্তা এবং খেলো কাগজই তৈরি হত কিন্তু আজকাল কাঠকে নানারকম প্রক্রিয়ায় ধুয়ে এমন পরিষ্কার এবং বিশুদ্ধ করা হচ্ছে যে তা থেকে খুব উঁচু দরের ভাল কাগজ পর্যন্ত তৈরি হতে পারে।

কাঠের মধ্যে প্রধান জিনিসটি হচ্ছে সেলুলোস্ (Cellulose); কাঠকে বিশুদ্ধ করা মানে এই জিনিসটিকে খাঁটি অবস্থায় বের করা। পরিষ্কার সাদা তুলো দেখেছ ত? সেই তুলোও সেলুলোস্ ছাড়া আর কিছুই নয়। তুমি যে ধুতি পরে আছ সেও হচ্ছে সেলুলোসের ধুতি। আর এই যে 'সন্দেশ' পড়ছ এটাও সেলুলোসের সন্দেশ—তার সঙ্গে খানিকটা ভেজাল জিনিস মেশান আর তার উপরে কালির ছোপ। কাঠ থেকে যে সেলুলোস্ বেরোয় তাতে তুলোর মতো আঁশ থাকে না কিন্তু তা থেকে খুব সস্তায় অনেক আশ্চর্য জিনিস তৈরি হচ্ছে। সেলুলোস্‌কে রাসায়নিক উপায়ে বদলিয়ে একরকম আঠাল জিনিস তৈরি হয়, তা থেকে টেনে সুতোর মতো সেলুলোসের আঁশ বার করা যায়। এই উপায়ে ইউরোপে প্রতি বৎসর ২০ লক্ষ মণ 'নকল রেশম' তৈরি হয়। তার চেহারা অনেক সময়ে আসল রেশমের চাইতেও সুন্দর হয়। এই 'রেশম' দেশ বিদেশে চালান দেওয়া হয়—আর কত সৌখিন লোকে সেই রেশমের পোশাক পরে বেড়ায়। তারা জানেও না তারা কাঠের পোশাক পরেছে!

এই সেলুলোস্ থেকে নাকি খুব সস্তায় খাঁটি 'স্পিরিট্', অর্থাৎ আল্‌কোহল (Alcohol) বা সুরাসার প্রভৃতি অনেক জিনিস তৈরি হতে পারবে। তখন মানুষের কলকারখানা এঞ্জিন মোটর জাহাজ সব নাকি কাঠের স্পিরিট জ্বালিয়ে চালান হবে। অনেক হাজাররকম ওষুধপত্র আরক প্রভৃতি তৈরি করবার কাজে এই সুরাসার না হলে চলে না; রাসায়নিক কারখানায় এমন দরকারী জিনিস খুব কমই আছে। সুতরাং কাঠের কুচি আর করাতের গুঁড়ো থেকে যদি এমন জিনিসটাকে সস্তায় পাওয়া যায় তবে তাতে যে কতদিকে মানুষের কতরকম সুবিধা হবে সে আর বলে শেষ করা যায় না। শোনা যায়, শীঘ্র নাকি বাজারে কাঠের চিনি বেরোবার সম্ভাবনা আছে। নকল চিনি নয়, সত্যিকারের চিনি।

এতক্ষণ আমরা কাঠের গুণ ব্যাখ্যা করেছি, এখন তার জীবনচরিতের একটু পরিচয় নেওয়া যাক। পৃথিবীর নানা দেশে যত কাঠ আমদানী হয় তার মধ্যে কানাডার কাঠই সব চাইতে বেশি। সে দেশে শীতকালের গোড়াতেই গাছ কাটা আরম্ভ হয়। তারপর যখন বরফ পড়ে পথঘাট সব পিছল হয় তখন সেই পিছল পথের উপর দিয়ে গাছের গুঁড়িগুলোকে টেনে নিয়ে নদীর ধারে কিংবা রেলের লাইনে নিয়ে হাজির করে। যে বৎসর খুব তাড়াতাড়ি শীত পড়ে যায় কিংবা খুব অতিরিক্ত বরফ পড়ে, সে বৎসর তাদের

ভারি কষ্ট। একে শীতের কষ্ট, তার উপর আবার নরম বরফের মধ্যে দিয়ে কাঠ টানবার কষ্ট। কাঠ নেবার বন্দোবস্ত এক-এক জায়গায় এক-একরকম, পথ ঘাটের অবস্থা বুঝে কোথাও ঘোড়ায়-টানা বা গরুতে-টানা গাড়িতে করে কাঠ নেয়; কোথাও গাছের গুঁড়িগুলো ভারি ভারি মজবুত তক্তার উপর চাপিয়ে সেই তক্তা হিড়্‌হিড়্ করে টেনে নিয়ে যায়; কোথাও গুঁড়িগুলোকে একটার পর একটা মালার মতো সাজিয়ে বেঁধে, সেই কাঠের মালা টেনে নেওয়া হয়। সঙ্গে লোক থাকে, তারা কেবল দেখে, যেন কোনটা কিছুতে আটকিয়ে না যায়। অনেক জায়গায় কাঠ নেবার জন্য রীতিমত রেলের লাইন পাতা হয়; আবার কোন কোন জায়গায় পিছল বরফের উপর বিনা লাইনেই এঞ্জিন চলে! সে এঞ্জিনের সামনে চাকা নাই, 'স্লেজ্' গাড়ির মতো দুদিকে দুটো বাঁকান লোহার ধনুক-দণ্ড।

এমনি করে তারা জঙ্গলের গাছ কেটে এনে রেলের লাইন বা নদীর ধারে এসে হাজির হয়। তারপর গাছের গুঁড়িগুলোকে কারখানায় নিয়ে কেটে চিরে তক্তা বানিয়ে চালান দিতে হবে। নদীতে যদি বেশ স্রোত থাকে তাহলে এমন জায়গায় কারখানা বসান হয় যে, কাঠগুলোকে ভাসিয়ে দিলে তারা আপনা-আপনি গিয়ে কারখানায় হাজির হবে। সেখানে কারখানার লোকেরা তাদের ঠেকিয়ে বড় বড় লগি দিয়ে কারখানার ভিতরে নিয়ে পুরবে। কিন্তু সব জায়গায় সেরকম সুবিধামত নদী পাওয়া যায় না। হয়ত কোন নদীতে তেমন স্রোত নেই, কিংবা তাতে ওরকম কাঠ ছেড়ে দেবার হুকুম নেই; সেখানে মস্ত মস্ত কাঠের ভেলা বানিয়ে সেই ভেলাগুলোকে জাহাজে টেনে কারখানায় নিতে হয়।

স্রোতে কাঠ ভাসিয়ে দেওয়া যে সব সময়ে বড় সহজ কাজ, তা মনে কর না। অনেক সময়ে মাঝ পথে নদীর বাঁকে কাঠে কাঠে লেগে এমন জমাট বেঁধে যায় যে আবার রীতিমত হাঙ্গামা করে তাদের জট ছাড়িয়ে না দিলে কাঠ আর চলতে পারে না। এ কাজে বিপদ খুবই; অনেক সময়ে হঠাৎ কাঠের জমাট খুলে গিয়ে এমন হুড়্‌হুড়্ করে ভেসে আসে যে, তার সামনে পড়ে অনেক মানুষের প্রাণ যায়। কারখানায় এলে পর সেখানকার লোকেরা কাঠগুলোকে এক-এক করে কারখানার মুখের মধ্যে পুরে দেয়, আর সেখানে করাতকলে কাঠগুলো আপনা-আপনি কেটে চিরে তক্তা হয়ে বেরিয়ে আসে। একদিকে ক্রমাগত গাছের গুঁড়ি ঢুকছে, আর-একদিকে ক্রমাগত কাটা তক্তা বেরিয়ে আসছে।

হাওয়ার ডাক

একটা সরু চোঙার মধ্যে ঢিলাভাবে একটা ছিপি বসাইয়া চোঙার মধ্যে ফুঁ দিলে ছিপিটা হাওয়ার ঠেলায় ছুটিয়া বাহির হয়। যদি মুখে ফুঁ না দিয়া পাম্প-কলের দমকা হাওয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে বেশ একটু ভারি জিনিসকেও অনেক দূর পর্যন্ত ঠেলিয়া দেওয়া যায়। বিলাতের কোন কোন বড় দোকানে এই উপায়ে ছোটখাট জিনিস দোকানের নানা স্থানে পাঠান হয়। খুচরা টাকাপয়সা দোকান বিভাগ হইতে আফিসবিভাগে পাঠাইতে হইলে সেগুলি একটি সরু চোঙার মধ্যে ভরিয়া, সেই চোঙাটিকে একটা লম্বা নলের মুখে পুরিয়া দেয়। তারপর একটা হাতল চাপিয়া দিলেই নলের মধ্যে দম্‌কা বাতাস ঢুকিয়া

চোঙাটাকে একেবারে আফিস পর্যন্ত ঠেলিয়া দেয়। আফিস হইতে দোকানের প্রত্যেক বিভাগের সঙ্গে এইরকম নলের যোগ থাকে। কোন গোলমাল হাঙ্গামা নাই, লোকজনের ছুটাছুটি নাই,—মুহূর্তের মধ্যে কাজ শেষ।

প্রায় কুড়ি বৎসর আগে একজন ফরাসি এঞ্জিনিয়ার বলিয়াছিলেন যে, এইরকম নলের সাহায্যে বড় বড় সহরের নানা স্থানে ডাক চালাচালি করিতে পারিলে খুব সুবিধা হয় এবং তাহাতে টেলিগ্রাফের মতো তাড়াতাড়ি কাজ হওয়া সম্ভব। আজকাল ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক বড় বড় সহরে এইরূপ হাওয়ার ডাকের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সহরের মধ্যখানে একটা বড় আফিস, তাহার চারিদিকে সহরের নানা স্থান পর্যন্ত নলের শাখা; কোন কোন নল তিন চার মাইল পর্যন্ত লম্বা হয়। মনে কর, আমরা প্যারিস সহরে আছি; তোমার যদি আমার কাছে কোন জরুরী চিঠি পাঠাইবার দরকার হয় তাহা হইলে প্রথমে তোমাকে ডাকঘরে গিয়া একরকম পাৎলা পোস্টকার্ড কিনিতে হইবে। এই কার্ডের দাম অবশ্য সাধারণ পোস্টকার্ডের চাইতে কিছু বেশি; কিন্তু টেলিগ্রাফ করিতে যে মাশুল লাগে, সে হিসাবে নিতান্তই সামান্য। সেই কার্ডে চিঠি লিখিয়া নলঘরের বাক্সের মধ্যে চিঠি পোস্ট করিতে হয়। অধিকাংশ স্থানে মেয়েরাই সেখানকার কাজ করে। তাহাদের একজন আসিয়া তোমার চিঠিখানা লইয়া সেটিকে একটি চোঙার মধ্যে পুরিয়া দিবে। চোঙাটি রবার ও বনাত দিয়া মোড়া এবং এমনভাবে তৈরি যে সেটাকে হাওয়ার নলের ভিতর ঢুকাইয়া দিলে চোঙার মুখ ও নলের মাঝে একটুকুও ফাঁক থাকে না—ফাঁক থাকিলে হাওয়া বাহির হইয়া যায় এবং তাহাতে হাওয়ার জোর কমিয়া যায়। চোঙাটিকে নলের মধ্যে ভরিয়া নলের মুখ বন্ধ করিয়া একটা হাতল ঘুরাইয়া দিলেই পাম্পকলের হাওয়ায় তাহাকে বড় আফিসে পৌঁছাইয়া দিবে। সেখানকার লোকেরা আবার সেটাকে অন্য একটা নলের মধ্যে পুরিয়া, আমার বাড়ি যে পোস্টাফিসের এলাকায় সেই পোস্টাফিসে চালান করিয়া দিবে। তারপর যেমন করিয়া টেলিগ্রাফ বিলি হয় তেমনি করিয়া সেই চিঠি আমার বাড়িতে বিলি করা হইবে। তোমার নিজের হাতের লেখা চিঠি টেলিগ্রাফের মতন তাড়াতাড়ি এবং তাহার চাইতে অনেক সস্তায় আমার বাড়িতে আসিয়া হাজির হইবে।

কলকব্জা থাকিলেই তাহা বিগ্‌ড়াইবার সম্ভাবনা থাকে; নলের দৈবাৎ যদি কোথাও চোঙা আটকাইয়া যায় তাহা হইলে কি হইবে? সেইরূপ অবস্থায় মাটি খুঁড়িয়া নল পরীক্ষা করিতে হয় এবং দরকার হইলে নল মেরামত করিয়া দোষ সারাইতে হয়। কিন্তু দুই মাইল বা চার মাইল লম্বা নল, তাহার কোন্ জায়গাটিতে মাটি খুঁড়িতে হইবে তাহা বুঝিবে কিরূপে? তাহা বাহির করিবার একটা চমৎকার উপায় আছে। এ সকল ডাকঘরে এমন বন্দোবস্ত থাকে যে, চোঙা চলিতে চলিতে কোথাও আট্‌কাইয়া গেলে তাহা তৎক্ষণাৎ টের পাওয়া যায়—কোথাও কোথাও তখনই একটা ঘণ্টা বাজিয়া ওঠে। তখন পাম্প্ কলের হাওয়া বন্ধ করিয়া নলের মুখের কাছে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করা হয়। খানিকক্ষণ পরে সেই আওয়াজ যখন চোঙায় লাগিয়া ফিরিয়া আসে তখন নলের মুখে একটা প্রতিধ্বনি শোনা যায়। চোঙা যত দূরে থাকে, প্রতিধ্বনি আসিতে ততই বেশি দেরী হয়। বন্দুকের শব্দ ও তাহার প্রতিধ্বনি, এই দুয়ের মধ্যে কতটুকু সময়ের তফাৎ হইতেছে, তাহা দেখিলেই হিসাব করিয়া বলা যায় যে কতখানি দূরে চোঙা আট্‌কাইয়াছে। তা বলিয়া মনে করিও না যে যখন-তখন বুঝি এরূপ ভাবে চোঙা আট্‌কাইয়া যায়। ফিলাডেলফিয়ার সহরে প্রথম দু-তিন বৎসরের মধ্যে কেবল একবারমাত্র এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। তখন ঐরূপ

প্রতিধ্বনির সাহায্যে হিসাব করিয়া যে জায়গায় খুঁড়িতে বলা হয়, তাহার দু-এক হাতের মধ্যেই চোঙাটাকে পাওয়া যায়। দেখা গেল যে, মাটি বসিয়া যাওয়াতে নলটা এক জায়গায় জখম হইয়াছে এবং সেইখানে চোঙা আট্‌কাইয়া রহিয়াছে।

চিঠি যখন নলের ভিতর দিয়া ভীষণ বেগে ছুটিয়া যায় তখন কেবল যে তাহার পিছন হইতে হাওয়ার ধাক্কা দেওয়া হয় তাহা নহে। কোন জিনিস ছুটিতে গেলেই সম্মুখের বাতাস তাহাকে বাধা দিয়া তাহার বেগ কমাইয়া দেয়। এইজন্য নলের সম্মুখ দিকেও একরকম পাম্প্‌কল যোগ করিয়া দেওয়া হয়; তাহাতে সম্মুখের বাতাসকে টানিয়া বাহির করিয়া দেয় এবং সেই টানে চলন্ত চোঙা আরও জোরে চলিতে থাকে। আজকাল আমেরিকার কোন কোন সহরে এই উপায়ে কেবল চিঠি নয়, ছোটখাট পার্সেল পর্যন্ত চালান দেওয়া হইতেছে। সেখানে সহরের রাস্তার নীচে খুব বড় বড় নল বসান থাকে, তাহার ভিতর প্রায় একমণ ওজনের একটি লোহার চোঙাকে খুব দ্রুত ডাক গাড়ির চাইতেও অনেক বেশি বেগে ছুটাইয়া দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত এই সকল হাওয়ার ডাক কেবল সহরের মধ্যেই কাজ করিতেছে, কিন্তু কালে এই উপায়ে এক সহর হইতে দূরের অন্য সহর পর্যন্ত ডাক পাঠাইবার ব্যবস্থা হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়। কয়েক মাইল পর পর এক একটি পাম্প্ কলের স্টেশন বসাইয়া হাওয়ার নলে অনেক দূর পর্যন্ত খুব তাড়াতাড়ি ডাক পাঠান যাইতে পারে।

হেঁয়ালি নাট্য

ইংরাজিতে একরকম খেলা আছে, তাকে বলে 'শ্যারাড্' (Charade)। এ খেলা খেলতে হলে এমন কয়েকটি লোক দরকার যারা অন্তত একটু-আধটু অভিনয় করতে পারে। তারপর এমন একটি কথা নিয়ে অভিনয় করতে হবে যাকে ভাগ করলে দু-তিনটা কথা হয়, যেমন Handsome (Hand ও Some বা sum) অথবা Carpet (Car বা cur ও pet)। অভিনয়ের প্রথম দৃশ্যে কথার প্রথম অংশটি, দ্বিতীয় দৃশ্যে দ্বিতীয় অংশটি, তৃতীয় দৃশ্যে সমস্ত কথাটি বুঝিয়ে দিতে হবে; যাঁরা দর্শক থাকবেন তাঁরা সব দেখেশুনে বলবেন, কোন্ কথাটি নিয়ে অভিনয় করা হল। যদি কোন কথার তিনটি অংশ থাকে—যেমন হাঁস পা-তাল, তাহলে অবশ্য চারটি দৃশ্যে অভিনয় করতে হবে। বাংলাতেও 'শ্যারাড্' বা 'হেঁয়ালি নাট্য' হতে পারে; একটা বাংলা দৃষ্টান্ত দিলে বোধহয় কথাটা পরিষ্কার হয়। মনে কর 'বৈঠক' কথাটা নিয়ে অভিনয় হচ্ছে।

প্রথম দৃশ্য—'বই'। একজন লোক দিনরাত খালি বই নিয়ে ব্যস্ত, কেবলই বই পড়ছে। তার চারিদিকে রাশি রাশি বই ছড়ান রয়েছে দেখে বন্ধুরা বিরক্ত হয়ে বলছে "তোমার ও পোড়া বইগুলো একটু রাখ দেখি। চল একটু হাওয়া খেয়ে একবার নরুবাবুর বৈঠকে যাই।" লোকটি অগত্যা রাজি হয়ে বলল, "আচ্ছা, তোমরা এগোও, আমি এইটা শেষ করেই আসছি।"

দ্বিতীয় দৃশ্য—'ঠক্'। একটি ছোট্ট বইয়ের দোকান, তার সামনে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক বইওয়ালাকে ভীষণ গালাগালি দিচ্ছেন। বলছেন, "চোর বাট্‌পাড় ঠক্ জোচ্চোর, আগাম

টাকাটা নিয়ে এখন বই দেবার বেলায় ফাঁকি দিচ্ছ।" বইওয়ালা বলে, "সে কি মশাই! কার কাছে টাকা দিলেন?" ভদ্রলোক চটেমটে খুব খানিক শাসিয়ে চলে গেলেন। এমন সময়ে সেই বই-পড়া লোকটি এসেছে; বইওয়ালা তাকে একটা বহুকালের পুরোন পুঁথি দেখাল—তার অনেক দাম। লোকটি বইখানা কিনে বলল, "বইটা একটু কাগজে জড়িয়ে বেঁধে দাও ত।" বইওয়ালা "দিচ্ছি" বলে বইখানা নিয়ে তার বদলে কতগুলো বাজে বটতলার বই বেঁধে দিয়ে বলল, "এই নিন মশাই।" বই-পড়া লোকটি তখন হাঁ করে অন্য বই দেখছিল, সে কিছুই টের পেল না, বইয়ের প্যাকেট নিয়ে চলে গেল।

তৃতীয় দৃশ্য—'বৈঠক'। নরুবাবুর বৈঠকে বসে বন্ধুরা বলাবলি করছে, "আরে, অমুক কি আমাদের বৈঠক একেবারে ছেড়ে দিল নাকি?" একজন বললে, "না, সে আজ আসবে বলেছে।" এমন সময় বই হাতে সেই লোকটির প্রবেশ। সকলের মহা উৎসাহ! একজন বললে, "এত দেরী হল যে?" "আর ভাই, পথে একটা কেতাব কিনতে গিয়ে দেরী হয়ে গেল"—বলেই বইয়ের ব্যাখ্যা আর প্রশংসা। সকলে দেখতে চাইল,—আর কাগজের মোড়ক খুলতেই বেরোল কতগুলো ছেঁড়া নোংরা বটতলার বই। ভদ্রলোক অপ্রস্তুত—সকলের হাস্যকৌতুক—ইত্যাদি।

হেঁয়ালি অভিনয় করতে হলে কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হয়।—

(১) যে দৃশ্যে যে কথার অভিনয় হচ্ছে তাতে অন্তত একবার সেই কথাটা বলা দরকার। তা বলে বারবার বেশি স্পষ্ট করে বলাটাও ঠিক নয়।

(২) যে কথাটার অভিনয় হচ্ছে তার সঙ্গে কিছু অন্য কথা আর অবান্তর অভিনয়ও কিছু কিছু থাকা দরকার। না হলে কথাটা নেহাৎ সহজে ধরা পড়ে যেতে পারে।

(৩) দৃশ্যগুলি বেশি বড় না হয়। ছোট ছোট তিনটি দৃশ্য হলেই ভাল।

হেঁয়ালি নাট্যের উপযোগী কথা বাংলায় অনেক আছে; যেমন—'জলপান' 'বন্ধন' (বন + ধন) 'কারখানা' 'আকবর' (আক + বর) 'বৈকাল' 'যমালয়' (জমা + লয়) ইত্যাদি।

আর-একরকম হেঁয়ালি অভিনয় আছে, তাকে বলে Dumb charade অর্থাৎ বোবা শ্যারাড্। সে খেলায় কথা বলে না, শুধু বায়োস্কোপের মতো হাত-পা নেড়ে কথাগুলোর অভিনয় করে।

আহ্লাদী মিনার

মানুষ যখন ঘরবাড়ি তৈরি করে, তখন যত্ন করে মাটাম ধরে দেখে, বাড়ির দেয়ালটেয়াল সব ঠিক খাড়া ভাবে গাঁথা হচ্ছে কিনা। তুমি যদি কাৎ করে তোমার বাড়ি বানাও, তবে লোকে হয় তোমাকে পাগল বলবে, নাহয় ভাববে লোকটা আনাড়ি। অনেক পুরনো বাড়ি আছে যার দেয়ালগুলো দেখলেই বোঝা যায় যে, বাড়ি আর এখন খাড়া নেই,—একদিকে হেলে পড়েছে। বেশি কাৎ হয়ে গেলে সে বাড়ি ভেঙে ফেলতে হয়; তা না হলে সেটা কোন্ দিন আপনা থেকে ঘাড়ের উপর ভেঙে পড়তে পারে।

কিন্তু ইটালির পিসা সহরে একটি প্রকাণ্ড মিনার বা স্তম্ভ আছে, সেটা এমন কাৎভাবে তৈরি যে দেখলে মনে হয়,—এই বুঝি হুড়্মুড়্ করে সব আছাড় খেয়ে পড়ল। অথচ ৮০০ বৎসর ধরে সে এইরকম আহ্লাদীর মতো হেলেই আছে—তার পড়বার কোন মতলব আছে বলে মনে হয় না। মিনারের আশেপাশে তার সমবয়সী কত যে বাড়ি ভেঙেচুরে লোপ পেয়ে গেছে, তার আর সংখ্যা নাই। ভেনিস সহরের লোকেরা একটা চমৎকার স্তম্ভ বানিয়েছিল; তাই দেখে তাদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যই পিসার লোকেরা এই স্তম্ভটি বানায়। ভেনিসের স্তম্ভটি কয়েক বৎসর হল ভেঙে পড়ে গেছে কিন্তু এটি এখনও বেশ চমৎকার অবস্থায় আছে—ভাঙবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। এই হেলান মিনারটির উপর থেকে মাটাম ঝোলালে দেখা যায় যে, তার চূড়োটা প্রায় ১৩ ফুট হেলে পড়েছে! এমন অদ্ভুত বাঁকা স্তম্ভ বা দালান পৃথিবীর আর কোথাও নাই।

মিনারটি যখন তৈরি করতে আরম্ভ করা হয়, তখন অবশ্য তাকে খাড়া করে বানাবারই কথা ছিল; কিন্তু খানিকটা তৈরি হবার পর একদিকের মাটি বসে যাওয়ায় খাড়া দালান কাৎ হয়ে পড়ল। তখন কেউ কেউ বললেন, "এখানে দালান তোলা চলবে না—ভাল জমি দেখে আবার নতুন করে তৈরি করতে হবে।" কিন্তু অনেক আলোচনার পর শেষটায় স্থির হল যে, "ঐরকম ট্যারচা ভাবেই স্তম্ভ তৈরি করা হবে। হরেকরকম খাড়া মিনার ত সব দেশেই আছে; কিন্তু পিসার এমন একটি স্তম্ভ হবে যেমনটি আর কোথাও নাই।" বড় বড় রাজমিস্ত্রী সর্দারেরা বলল, "হাঁ, ঐরকম কাৎ করেই আমরা মিনার স্তম্ভ বানিয়ে দেব।" এমন কায়দায় আগাগোড়া হিসাব করে মিনার গাঁথা হয়েছে যে তার সমস্তটা ভার স্তম্ভের ভিতর দিকেই পড়েছে। মিনারটা দেখতে যতই পড় পড় গোছের মনে হোক না কেন, বাস্তবিক পড়বার দিকে তার কোন ঝুঁকি নাই।

মিনারটি দেখতেও অতি সুন্দর,—তার আগাগোড়া মার্বেল পাথরে ঢাকা। প্রতি বৎসর নানা দূর দেশ থেকে বহু লোকে এই স্তম্ভ দেখবার জন্য পিসা সহরে যায়। পিসা সহরটি আরও নানা কারণে প্রসিদ্ধ। এই সহরে বিজ্ঞানবীর মহাপণ্ডিত গ্যালিলিওর জন্ম হয়। সে প্রায় ৩০০ বৎসর আগেকার কথা। এই গ্যালিলিওই বলেছিলেন যে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, এবং তার জন্য সেকালের মূর্খ পাদ্রিদের হাতে তাঁকে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল।

এই হেলান মিনারের উপর থেকে গ্যালিলিও 'ভারি জিনিসের পতন' সম্বন্ধে কতগুলি পরীক্ষা করেন। এখনও বিজ্ঞানের বইয়ে সেই সমস্ত পরীক্ষার কথা আলোচনা করা হয়। সে সময়ে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, যে জিনিস যত ভারি, শূন্যে ছেড়ে দিলে সে জিনিস তত তাড়াতাড়ি মাটিতে পড়ে। ২০০০ বৎসর আগে মহাপণ্ডিত আরিস্টট্‌ল্ এ কথা বলে গিয়েছিলেন, সুতরাং সকলেই তা বিশ্বাস করত। তিনি বলেছিলেন যে একটা লোহার গোলা যদি আর একটার চাইতে দশ গুণ ভারি হয়, তাহলে দুটোকে এক সঙ্গে ছেড়ে দিলে একটা আর একটার চাইতে দশ গুণ তাড়াতাড়ি মাটিতে পড়বে। গ্যালিলিও বললেন "তা কখনই হতে পারে না। দুটোই একসঙ্গে সমান বেগে পড়বে।" গ্যালিলিওর কথা শুনে পণ্ডিতেরা ক্ষেপে গেলেন। তাঁরা বললেন, "লোকটার আস্পর্ধা দেখ! আরিস্টট্‌লের মতো অত বড় পণ্ডিতের উপর আবার টিপ্পনী কাটতে চায়।" গ্যালিলিও বললেন, "অত রাগারাগিতে দরকার কি? এস, আমি পরীক্ষা করে দেখাচ্ছি। আমার কথা হাতে-কলমে প্রমাণ করতে না পারলে তখন তোমরা যা ইচ্ছা তাই বল।"

তারপর একদিন গ্যালিলিও পরীক্ষা দেখাবার জন্য পিসা বিদ্যালয়ের যত অধ্যাপক আর যত ছাত্র সকলের সাক্ষাতে এই আহ্লাদী মিনারের সাততলার উপর উঠলেন। সেখানে উঠে তিনি দু হাতে দুটো লোহার গোলা নিলেন—একটার ওজন আধ সের আর একটার পাঁচ সের। গোলা দুটিকে তিনি ঠিক একসঙ্গে ছেড়ে দিলেন আর সকলের সামনে ঠিক একসঙ্গে তারা মাটিতে পড়ল। গ্যালিলিও আবার বললেন, "তোমরা যে কেউ এসে পরীক্ষা করে দেখতে পার—দুটো গোলা দুরকম ওজনের হলেও ঠিক একসঙ্গে মাটিতে পড়বে।" কিন্তু মানুষের কতরকমই দুর্বুদ্ধি হয়। পণ্ডিতেরা বললেন, "এ হতভাগার কথা আমরা কেউ শুনব না। মহাপণ্ডিত আরিস্টট্‌ল্‌ যা বলেছেন তার উপর আর কথা নেই।" পিসা সহরময় ঘোর আন্দোলন আরম্ভ হল। গ্যালিলিওর বক্তৃতায় আর তেমন ছাত্রই হয় না; যারা যায় তারাও খালি গোলমাল বাধায়, দুয়ো দুয়ো করে, আর ঠাট্টা করে হাততালি দেয়।

লোকের উৎপাতে শেষটায় গ্যালিলিওকে তাঁর জন্মস্থান ছাড়তে হল। একটা সত্য কথা বলবার জন্য মানুষের কি শাস্তি! যা হোক, পরে তার জন্য গ্যালিলিওর সম্মান ত বাড়লই সঙ্গে সঙ্গে পিসার প্রসিদ্ধ মিনারটিও আরও প্রসিদ্ধ হয়ে উঠল।

আদ্যিকালের গাড়ি

আমার বেশ মনে আছে, ছেলেবেলায় রাস্তায় কেউ সাইকেল চড়ে গেল, আমরা ছুটোছুটি করে দেখতে যেতাম, আর মনে করতাম ভারি একটা অদ্ভুত জিনিস দেখছি। এখন কলকাতার রাস্তা দিয়ে সাইকেল, মোটর সাইকেল, নানারকম মোটর গাড়ি, ইলেকট্রিক ট্রাম এইসব কত যে যাচ্ছে তার ঠিকানাই নাই। এইসব দেখে দেখে এখন পুরনো হয়ে গিয়েছে; এমনকি মাথার উপর দিয়ে এরোপ্লেন উড়ে গেলেও লোকে আর তেমন ব্যস্ত হয়ে ফিরে তাকায় না।

দু-চারশ বছর আগেকার একটা মানুষকে যদি হঠাৎ আজকালকার কোন বড় সহরের রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহলে সে যে কিরকম আশ্চর্য হয়ে যাবে তা সহজেই বুঝতে পার; কিন্তু আমাদের মতো একালের কোন সহরে মানুষ যদি হঠাৎ সেই সময়কার সহরের মধ্যে গিয়ে পড়ে, তাহলে তার কাছেও সেটা কম অদ্ভুত ঠেকবে না। অন্য সহরের কথা ছেড়েই দিলাম, এত যে বড় লন্ডন সহর, কয়েকশত বছর আগে তার যেরকম দুরবস্থা ছিল তা শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়। সহরের রাস্তাগুলো ছিল উঁচু নীচু, রাত্রে বাতি জ্বলে না, গাড়ি ঘোড়ার চল নাই, চোর ডাকাতের ভয়ে লোকে সন্ধ্যার পর বাড়ি থেকে বেরোতে সাহস পায় না। সে সময় সহরে দু-দশ জন বড়লোক ছাড়া কারও গাড়ি চড়বার উপায় ছিল না।

প্রথম যারা কতগুলো ভাঙাচোরা গাড়ি জোগাড় করে সাধারণ লোকেদের জন্য ঠিকে গাড়ির ব্যবসা চালাবার চেষ্টা করেছিল, সহরের লোকেরা ত তাদের উপর চটেই গেল। টেমস্‌ নদীর মাঝিরা পর্যন্ত বলতে লাগল যে সাধারণ লোকেরা যদি গাড়ি চড়বার সুবিধা পায়, তাহলে সবাই গাড়ি চড়তে চাইবে,—কেউ আর নদী দিয়ে নৌকো করে যাতায়াত

করতে চাইবে না, মাঝিদের ব্যবসা মাটি হবে। এমনকি ইংলন্ডের রাজা প্রথম চার্লস স্বয়ং হুকুম দিলেন যে এরকম গাড়ি যেন আর বেশি তৈরি না হয়, কারণ তাহলে সহরের রাস্তাগুলো একেবারে মাটি হবে। রাস্তাটা যে মেরামত করে ভাল করা উচিত, সে খেয়াল কারও মাথায় এল না। যা হোক, রাজার নিষেধ এবং মূর্খদের গোলমাল সত্ত্বেও ঠিকে গাড়ির সুবিধা বুঝতে লোকের খুব বেশিদিন সময় লাগেনি।

'ঠিকে গাড়ি' বলতে যদি আজকালকার গাড়ির মতো কিছু একটা বুঝে নাও, তাহলে নিতান্তই ভুল বুঝবে। কত অদ্ভুত রকমের গাড়ি যে সে সময় দেখা যেত তা চোখে না দেখলে বর্ণনা করে বোঝান শক্ত। গাড়ির ভিতরে, বাইরে, ছাতে এবং পিছনে যত লোক ঠাসা যায়, এক একটা গাড়িতে তত লোক চড়ত। গাড়িতে চড়বার জন্য রীতিমত মই লাগাতে হত। গাড়িতে স্প্রিং ট্রিং কিছুই থাকত না, খালি একটা কাঠের ফ্রেমের উপর কয়েকটা কাঠের খোপ বসিয়ে পেরেক আর চামড়া দিয়ে এঁটে দেওয়া হত। নিতান্ত গরীব যারা, অথবা যারা সহরের বাইরে থাকত তাদের পক্ষে এরকম গাড়িও অনেক সময় জুটত না, তাদের জন্য আজকালকার গরুর গাড়ির মতো একরকম গাড়ি তৈরি হত তার উপরে তাঁবুর মতো ছাউনী দেওয়া; আর ভিতরে প্রায় ৩০/৪০ জন লোককে পুরে দেওয়া যায়, এইরকম বড় করে গাড়ি তৈরি হত। আট দশটা ঘোড়ায় অত্যন্ত ঢিমে তেতালা চালে সেই গাড়ি সহর থেকে সহরে টেনে নিয়ে যেত। আজকাল যেরকমের গাড়িকে বাস্ (Bus) বলে, একশ বছর আগে তার সৃষ্টিই হয়নি।

বাইসাইকেল জিনিসটা নিতান্তই আজকালকার। প্রথম যারা বাইসাইকেল তৈরী করেছিল, তাদের এক একটা গাড়ির যে কি অদ্ভুত চেহারা হত যে দেখলে আমাদের হাসি পায়। কোনটা অসম্ভবরকম উঁচু, কোনটায় চড়তে হলে সোয়ারকে হাতল ধরে ঝুলে থাকতে হয়; কোনটার আবার এমনি বন্দোবস্ত যে কল চালাতে হলে সোয়ারকেও সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে হয়। এইরকম খানিকক্ষণ দৌড়লে গাড়ি যখন বেশ জোরে চলতে থাকে তখন সে তার পা দুটো গুটিয়ে নেয় আর সাইকেলটা আপনি আপনি খানিক দূর পর্যন্ত গড়গড় করে চলে যায়। গাড়ির বেগ যেই কমে আসে, অমনি আবার পা ঝুলিয়ে ছুটতে হয়। এই সমস্ত অদ্ভুত সাইকেলের কোনটারই বিশেষ চল হয়নি। চল হবেই বা কেন? যদি একটু আরাম করে বসে গাড়ি চড়তে না পারলাম, তাহলে গাড়ি চড়ে লাভ কি?

প্রথম যখন রেলগাড়ি চলতে আরম্ভ করে তখন নিয়ম ছিল যে গাড়ির আগে আগে একজন ঘোড়সোয়ার নিশান নিয়ে ছুটবে আর চেঁচিয়ে সকলকে সাবধান করে দেবে। সে রেলগাড়ি যে কেমন চলত তা এর থেকেই বুঝতে পারছ। সে সময় থার্ডক্লাস গাড়িগুলোর চালচুলো কিছুই থাকত না। একটা মস্ত কাঠের তক্তাকে বাক্সের মতো চারিদিকে ঘেরাও করে, তার মধ্যে কতগুলো বেঞ্চি রেখে দেওয়া হত; লোকেরা তার মধ্যেই ঠাসাঠাসি করে কোনরকমে দাঁড়িয়ে বসে জায়গা করে নিত।

খুব সৌখিন লোকেরা নিজেদের গাড়ি শুদ্ধ ট্রেনে গিয়ে চাপতেন। ষাট বৎসর আগে ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপ যখন ইংলন্ডে যান তখন তাঁর জন্যও এইরকম ব্যবস্থা করা হয়েছিল। একখানা চমৎকার ল্যান্ডো গাড়ি একটা খোলা রেলগাড়ির উপর চাপিয়ে সেই ল্যান্ডোতে করে তাঁকে লন্ডনে আনা হয়েছিল।

রেলগাড়ি চলবার সঙ্গে সঙ্গেই মোটর গাড়ি চালাবার চেষ্টা আরম্ভ হয়। সেসব গাড়ি স্টিমে চালান হত আর তার চেহারা আজকালকার কোনরকম মোটর গাড়ির মত একেবারেই নয়।

নকল আওয়াজ

তোমরা অনেকে 'হরবোলা' দেখেছ। হরবোলা নানারকম শব্দের নকল করে—পাখির ডাক, গরু, ছাগল, ভেড়ার ডাক, বাঘের ডাক, ঘোড়ার ডাক;—এরকম নানা আওয়াজের অবিকল নকল করে দেখিয়ে তারা পয়সা উপার্জন করে। হরবোলা নামে একরকম পাখি আছে, সেও নানারকম আওয়াজের নকল করতে অতি সহজেই শেখে।

'হরবোলা' ছাড়াও একদল লোক আছে যারা নানারকম শব্দের নকল করে। তারা কিন্তু মুখে আওয়াজ করে না, কোন জন্তু কিংবা পাখির শব্দও নকল করে না, তাদের কাজই হচ্ছে অভিনয়ের সময় আড়াল থেকে নানারকম শব্দের নকল করে অভিনয়টাকে সত্যি ঘটনার মতো দেখাতে চেষ্টা করা। ঝড়-বৃষ্টির শব্দ, বাজপড়ার শব্দ, রেলের শব্দ, ঘোড়ার শব্দ, পায়ের শব্দ, বন্দুকের আওয়াজ, বাঘ সিংহের ডাক,—এইসবের আশ্চর্যরকম নকল এরা করতে পারে। অনেক মাথা খাটিয়ে সামান্য যন্ত্রের সাহায্যে এরা কতরকমের শব্দ নকল করে।

দূরে হুড়মুড় করে একটা গাছ ভেঙে পড়ল! —শব্দটা এল আড়াল থেকে। অভিনয়ের মঞ্চের পেছন থেকে একটি লোক সেই আওয়াজটা করছে। তার যন্ত্রে একটা হাতল ঘোরাচ্ছে আর কতগুলো কাঠের ডাণ্ডা খট্‌খট্ করে একটা বড় কাঠের গায়ে গিয়ে লাগছে;—তাতেই মড়্‌মড়্ গাছ ভাঙার শব্দের অবিকল নকল হচ্ছে।

উঃ, কি জোরে বৃষ্টি হচ্ছে! ঐ শোন তার শব্দ! পট্—পট্—পট্—পট্—জলের ফোঁটা পড়ছে! কেমন করে ঐ শব্দ হচ্ছে জান?—প্রকাণ্ড একটা ঢাকের মতো জিনিসের মধ্যে কয়েকটা মটরদানা ভরে সেটাকে একটি লোক আস্তে আস্তে ঘোরাচ্ছে। মধ্যে একটি পর্দা দেওয়া আছে, ঢাকটা ঘোরালেই সেই পর্দার উপর মটরদানাগুলো পট্ পট্ করে ঠিক্‌রে গিয়ে লাগে আর বৃষ্টির ফোঁটার আওয়াজের মতো শোনায়।

কড়্‌কড়্ শব্দে বাজ পড়ছে! উঃ, কি ভয়ানক শব্দ! প্রাণটা হাতে নিয়ে যেতে হবে! কিন্তু গোড়ায়ই গোলমাল;—আওয়াজটাই নকল। দুটি লোক আড়ালে থেকে একটা প্রকাণ্ড চৌকোণা ঢাকের উপর মস্ত বড় দুটো কাঠের হাতুড়ি পিটছে আর ঐরকম বাজ পড়া আওয়াজ শোনা যাচ্ছে!

দুম্ করে বন্দুকের আওয়াজ হল,—ঝুপ্ করে একজন লোক পড়ে গেল আর দুজন লোকে ধরাধরি করে তাকে নিয়ে এল। যে গুলি করেছে সে কি নিষ্ঠুর! মানুষ খুন করতে কি তার একটুও বাধে না? আসলে কিন্তু ব্যাপারটা কিছুই নয়। বন্দুকও নাই, গুলিও করেনি কেউ, চোটও লাগেনি কারো! আওয়াজটা যে শোনা গিয়েছিল সেটা আড়াল থেকেই এসেছিল। একজন লোক একটা চামড়ার গদির উপর জোরে একটা মোটা বেতের বাড়ি মারতেই ঠিক বন্দুকের আওয়াজ বেরিয়েছিল, আসলে সব ফাঁকি!

বন্দুকের গুলিতে একজন ত চিৎপটাং! যিনি গুলি মারলেন তিনিও বেগতিক দেখে ঘোড়ায় চেপে চম্পট দিলেন। কি করে জানলে ঘোড়ায় চড়ে পালালেন তিনি?—ঐ শোন ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। এ-ও কি ভুল হতে পারে কখনও? কিন্তু, এ-ও যে ভুল! ঘোড়া-টোড়া কিছুই নাই; শুধু একটি লোক আড়াল থেকে ঐরকম আওয়াজ করছে। তার যন্ত্রপাতিও কিছু নাই;—কেবল দুখানা খুরের আকারের কাঠে দুখানা

নাল লাগিয়ে নিয়ে সে দুটোকে একটা পাথরের উপর ঠক্ ঠক্ করে তালে তালে ঠুকছে!

এইরকমের আরো কত আওয়াজ যে কতরকমে এরা নকল করে, তা আর কি বলব! যে ঘরে এইসব আওয়াজের যন্ত্রপাতি থাকে সেটাকে রীতিমত একটা কারখানাঘরের মতো দেখায়। চারিদিকেই নানারকম কল-কব্জা,—কোনটা হাতে চালায়, কোনটা বিদ্যুতের সাহায্যে চলে, কোনটা আবার চাবিতেও চলে। যারা এসব যন্ত্র ভেবে ভেবে বার করে, তারা বেশ রোজগার করে থাকে।

আশ্চর্য প্রহরী

বড় বড় রাজা রাজড়া বা লাট বেলাট যখন সমারোহ করে বেড়াতে বেরোন তখন তাঁদের সঙ্গে কতগুলি 'বডি-গার্ড' বা 'শরীররক্ষক' ঘোড়ায় চড়ে যায়। তারা যখন নিশান উড়িয়ে বাহার দিয়ে চলে, তখন দেখতে বেশ জমকাল দেখায়; কিন্তু অনেক সময়েই দেখা যায়, এ ছাড়া তাদের আর বিশেষ কিছু কাজ করবার থাকে না। বছরের পর বছর কেটে যায় কিন্তু কারও শরীর রক্ষা করবার জন্য তাদের কোন ডাক পড়ে না।

আমাদের শরীরে কোথায় কি হচ্ছে তাই নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন, তাঁরা বলেন, তুমি আমি রাম শ্যাম সকলের সঙ্গেই—এরকম দু-দশটা নয়, একেবারে লাখে লাখে—'বডি-গার্ড' ঘুরে বেড়াচ্ছে। দিনরাত তারা সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে, দিনরাত ছুটোছুটি করে পাহারা দিচ্ছে, শত্রুর সঙ্গে লড়াই করবার জন্য দিনরাত প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। শত্রু ধরবার জন্য এত ব্যস্ততা কেন? এত শত্রুই বা কোথায়? শত্রু চারিদিকেই। আকাশে বাতাসে রোগের বীজ সব কিল্‌বিল্ করে উড়ে বেড়াচ্ছে। তারা নিশ্বাসের সঙ্গে নাক দিয়ে, গলা দিয়ে একেবারে ফুস্‌ফুসের ভিতর পর্যন্ত ঢুকে যাচ্ছে, আর কতরকম জ্বরজারি সর্দিকাশির হাঙ্গামা বাধাচ্ছে। জলের সঙ্গে, দুধের সঙ্গে, নানা রকম খাবারের সঙ্গে প্রতিদিন হাজার হাজার রোগের বীজ শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। কোথাও একটু ঘা হলে বা কেটে গেলে সেই ফাঁক দিয়ে কত সাংঘাতিক ব্যারামের বীজ অনায়াসে ভিতরে ঢুকে অনর্থ বাধাবার চেষ্টা করছে। যদি বাঁচতে হয় তাহলে এই সমস্ত শত্রুদের ঠেকিয়ে রাখা দরকার। তাই, ধূলিকণার চাইতেও সূক্ষ্ম যে শত্রু, যাকে দেখতে হলে অণুবীক্ষণ লাগাতে হয়, তার সঙ্গে সারাদিন লড়াই করবার জন্য শরীরের মধ্যে আশ্চর্যরকম সূক্ষ্ম ব্যবস্থা করা রয়েছে।

আমাদের শরীরটা এমনভাবে তৈরি যে তার যেখানেই কাটো সেখানেই রক্ত বেরোয়। কোথাও একটা ছুঁচের সমান সরু জায়গা খুঁজে পাবে না যার মধ্যে খোঁচা দিলে রক্ত গড়ায় না। শরীরে যতক্ষণ প্রাণ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত রক্তটা ক্রমাগত শরীরময় ছুটোছুটি করে বেড়ায়। তাও এলোমেলোভাবে ছুটবার হুকুম নাই; ঠিক তালে তালে, সারদিন সারা বছর সারাজীবন তাকে পথ ধরে ধরে চলতে হয়—এক মুহূর্ত বিশ্রাম করবার উপায় নাই। এইভাবে সর্বদা তাকে চালাবার জন্য শরীরের মধ্যে আশ্চর্য 'পাম্প'কল বসান আছে। বুকের মাঝখানে যে জায়গাটা সর্বদা ধুক্‌ধুক্ করে, যাকে আমরা 'হার্ট' বা হৃৎপিন্ড বলি, সেইটে হচ্ছে আমাদের পাম্পকল।

ঘরে ঘরে কলের জল পেতে হলে তার জন্য সহরের এক-এক জায়গায় স্টেশন করে প্রকাণ্ড কলকারখানা বসাতে হয়; সেই স্টেশনের সঙ্গে বড় বড় 'পাইপ' জুড়ে সহরময় জল চালাবার ব্যবস্থা করতে হয়; তারপর সেই মোটা পাইপের গায়ে সরু মোটা মাঝারি নানারকম নল লাগিয়ে ঘরে ঘরে জল আনতে হয়। শরীরের রক্ত চলবার ব্যবস্থাটাও অনেকটা এইরকমের। হৃৎপিন্ডটা হল আমাদের কলের স্টেশন। শরীরের মোটা মোটা শিরাগুলি সেই স্টেশন থেকে বেরিয়ে

চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—ঠিক যেন রাস্তার নীচে জলের পাইপ! তাদের গা থেকে আবার সরু সরু নলের মতো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা বেরিয়ে সমস্ত শরীর ছেয়ে ফেলেছে—সুতোর মতো সরু, চুলের মতো সরু, তার চাইতেও আরও অনেক সরু। বুকের ধুক্‌ধুকানির তালে তালে শরীরের রক্ত শিরার ভিতর দিয়ে চলতে থাকে। চলতে চলতে যায় কোথায়? আর কোথাও যাবার যো নাই, বার বার সেই হৃৎপিন্ডের মধ্যেই ফিরে আসতে হয়।

আমরা যতক্ষণ বেঁচে থাকি ততক্ষণ শরীরটা ক্রমাগত ক্ষয় হতে থাকে। যত বেশি কাজ করি, যত বেশি চিন্তা করি, যত বেশি কথা বলি, যতই নড়িচড়ি, চলি ফিরি, শরীর ততই বেশি বেশি ক্ষয় হতে থাকে। কয়লা না পোড়ালে যেমন এঞ্জিন চলে না তেমনি শরীরকে ক্ষয় না করলে শরীরের কাজ হয় না। কিন্তু কেবলই যদি ক্ষয় হতে থাকে তাহলে শরীর টিক্‌বে কি করে? সেজন্য শরীরকে রোজ নিয়মিত খাবার যোগাতে হয়। সেই খাওয়া হজম হলে, শরীরের রক্ত তাকে নানা কৌশলে চারিদিকে বয়ে নিয়ে সবরকমের ক্ষয় দূর করে। শরীর শুধু যে ক্ষয় হয় তা নয়; কয়লা পুড়লে যেমন ধোঁয়া বেরয়, ঝুল জমে আর ছাই পড়ে থাকে তেমনি শরীরের ক্ষয়ের দরুণ নানারকমের দূষিত আবর্জনা শরীরের সর্বত্র জমে উঠতে থাকে। সেই আবর্জনা দূর করাও রক্তের কাজ। হৃৎপিন্ডের ভিতর থেকে যে পরিষ্কার টাট্‌কা লাল রক্ত বেরিয়ে আসে সেই রক্ত যেখানে যায় সেখানকার ময়লা সাফ করতে করতে শেষটায় নিজেই ক্রমে ময়লা হয়ে পড়ে। সেই ময়লা দূষিত রক্ত আবার হৃৎপিন্ডের মধ্যে ফিরে এসে ফুসফুসের তাজা বাতাস খেয়ে টক্‌টকে তাজা হয়ে ওঠে।

এক ফোঁটা রক্ত যদি অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখ তাহলে দেখতে দেখাবে কালো কালো চ্যাপ্টা মতো। ঐ গোল গোল জিনিসগুলির আসল রং লাল। ঐগুলির জন্য রক্তের রং লাল দেখায়—তা না হলে রক্তের কোনও রং নাই। এই লাল দানা বা 'কণিকা'গুলি এক একটা এত ছোট যে এক ফোঁটা রক্তের মধ্যে ওরকম লাখে লাখে কণিকা ভেসে বেড়ায়। এই লাল জিনিসগুলোর ফাঁকে ফাঁকে সাদা মতন কি দেখা যাচ্ছে; সেইগুলিই হচ্ছে শরীরের প্রহরী বা 'বডি-গার্ড'। লাল দানাগুলি কেবল কুলি আর ধাঙড়ের কাজ করে বেড়ায়। শরীরের ময়লা সাফ করা, শরীরকে ধুয়ে মুছে বাতাস খাইয়ে তাজা রাখা, এ সবই হচ্ছে ঐ লাল কণিকাদের কাজ। কিন্তু শত্রুর সঙ্গে যখন লড়াই করতে হয় তখন ডাক পড়ে ঐ সাদা প্রহরীদের।

যেমনি শরীরে রোগের বীজ ঢোকে অমনি চারিদিকে সাড়া পড়ে যায়। আর প্রহরীরা দলে দলে রক্তের স্রোতে ভেসে এসে রোগের সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে দেয়। টপাটপ্‌ রোগের বীজ খেয়ে ফেলতে থাকে। লড়াই যখন সঙ্গীন হয় তখন দলে দলে প্রহরী মরতে থাকে, আবার নূতন প্রহরীর দল দ্বিগুণ উৎসাহে লড়তে আসে। এরকম ছোট ছোট লড়াই শরীরের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই চলছে। মানুষের রোগ যখন সাংঘাতিক হয়, যখন প্রহরীরা কিছুতেই আর রোগের বীজগুলোর সঙ্গে লড়াই করে পেরে ওঠে না তখন মানুষের প্রাণ নিয়ে টানাটানি হয়। যখন রোগের বীজ ক্রমেই শরীরটাকে দখল করতে থাকে তখন শরীরময় হৈচৈ পড়ে যায়,—'আরো প্রহরী পাঠাও, আরো প্রহরী পাঠাও।' শরীরের কারখানায় তখন লাখে লাখে শ্বেত কণিকা তৈরি হতে থাকে। শরীরের মরণ-বাঁচন অনেকটা তাদেরই হাতে।

মনে কর তোমার হাতে এক জায়গায় একটুখানি কেটে গেছে; যেখানে কাটে সেখান দিয়ে ত রক্ত বেরোবেই কিন্তু ক্রমাগতই যদি রক্ত বের হতে থাকে, তাহলে সে ত বড় মারাত্মক কথা—তাই শরীর প্রথমেই চেষ্টা করে রক্ত থামাতে। রক্ত থামাবার উপায়টিও বড় চমৎকার; রক্তটা বাইরে এসে আপনা থেকেই কাটা ঘায়ের মুখে ছিপির মতো জমাট বেঁধে যায়। তখন সেই জায়গাটা

যদি অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখ তাহলে দেখবে হাজার হাজার লাল কণিকা তার মধ্যে তাল পাকিয়ে মরে আছে। সাদা প্রহরীরাও ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে না; তারা সব ছুটে এসে মরা লাল কণিকাগুলিকে খেয়ে খেয়ে সাফ করতে থাকে, আর কাটা চামড়ার জায়গায় নূতন চামড়া গজাবার ব্যবস্থা করতে থাকে। কাটা ঘায়ের মুখটি হচ্ছে রোগের বীজ ঢুকবার খোলাপথ; যদি তেমন তেমন বীজ সেখান দিয়ে ঢুকতে পারে, তাহলেই শীঘ্র শীঘ্র ঘা শুকাবার পক্ষে মুস্কিল হয়, সামান্য একটা ঘা পেকে বা পচে উঠে বিষম কাণ্ড বাধিয়ে তোলে। তখন প্রহরীদের খাটুনিও খুব বেড়ে যায়। ঘা পাকলে তা থেকে যে পুঁজ বেরোয় তার মধ্যে দেখা যায় অসংখ্য শ্বেতকণিকা মরে আছে, আর তার মধ্যে রোগের বীজাণু কিল্‌বিল্‌ করছে।

আকাশবাণীর কল

একজন বক্তা, তার তিন লক্ষ শ্রোতা! একজন কথা বলছে, বক্তৃতা করছে গান গাইছে বাজনা বাজাচ্ছে আর তিন লক্ষ লোক তার প্রত্যেকটি কথা প্রত্যেকটি সুর পরিষ্কার করে শুনতে পাচ্ছে! কথাটা শুনতে কেমন অসম্ভব শোনায় না? কিন্তু আমেরিকার বড় বড় সহরে এরকম আজকাল প্রতিদিনই ঘটছে। আরো আশ্চর্য এই যে, এই তিন লক্ষ লোক, যারা সকলে মিলে বক্তৃতা শুনছে তারা সব এক জায়গায় বসে থাকে না; কেউ দুই মাইল চার মাইল, কেউ বিশ মাইল, পঁচিশ মাইল দূরে, যে যার ঘরে আরাম করে বসে বক্তৃতা শোনে। এমনকি দেড়শ দুশ মাইল দূর থেকেও লোকের বক্তৃতা শুনবার কোনও বাধা নাই। দশ বছর আগেও এরকম হওয়া সম্ভব বলে লোকে মনে করতে পারত না। কিন্তু আজকাল বিনা তারের টেলিফোন হওয়াতে এসব সম্ভব এবং সহজ হয়েছে।

তুমি যখন কথা বল তখন তোমার গলার আওয়াজ চারিদিকের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। যতদূর পর্যন্ত সে আওয়াজ যায় ততদূর পর্যন্ত বাতাসে নানারকম ঢেউ খেলিয়ে যায়। মোটা গলার বড় বড় ঢেউ, সরু গলার ছোট ছোট ঢেউ। চেঁচিয়ে বললে বাতাসে জোরে জোরে ঢেউয়ের ধাক্কা লাগে, আস্তে বললে সে ঢেউ বাতাস ঠেলে বেশি দূর এগোতেই পারে না। কিন্তু যেমন করেই কথা বল আর যত জোরেই বল, খানিক দূর পর্যন্ত গিয়ে সে ঢেউ আপনি মিলিয়ে যাবে। তারপরে আর তোমার আওয়াজ পৌছবে না।

যে কলের সাহায্যে গলার আওয়াজকে, অথবা অন্য যে কোনও রকম শব্দকে অনেক দূর পর্যন্ত পাঠিয়ে দেওয়া যায় তার নাম 'টেলিফোন'। আজকাল অনেক বড় বড় সহরে টেলিফোন কল দেখতে পাওয়া যায়। লোকে একটা হাতলের মতন জিনিস কানে লাগিয়ে তার চোঙের ভিতর কথা বলে, আর অনেক দূরের লোক সেইরকম আর একটা কল কানে দিয়ে সে কথা শুনতে পায়। দুজনের মধ্যে খালি সরু তারের যোগ। সেই তারের ভিতর দিয়ে সারাক্ষণ বিদ্যুৎ চলে, আর সেই বিদ্যুতের স্রোত শব্দের ঢেউগুলোকে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় পৌছে দেয়। এই উপায়ে অনেক মাইল পর্যন্ত শব্দ পাঠান সম্ভব হয়।

কিন্তু গোড়ায় যে টেলিফোনের কথা বলা হয়েছে, যাতে তিন লক্ষ লোক একসঙ্গে টেলিফোনের আওয়াজ শুনতে পায়, তাতে তার-টার কিছুরই দরকার হয় না। তা যদি দরকার হত, তাহলে ভেবে দেখ কত লক্ষ মাইল তার বসাতে হত আর তার জন্য কত হাজার হাজার টাকা খরচ করতে হত। তার বদলে এখন কেবল ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা খরচ করলেই তুমি তোমার

ঘরে বসে বহু দূরের কথা ও গান-বাজনা অনায়াসে শুনতে পার।

আমেরিকায় এই সমস্ত টেলিফোনের কল তৈরি করা আজকাল একটা মস্ত ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা কল তৈরি করে তারা সহরের একটা কোনও জায়গায় গান বাজনা ও বক্তৃতার স্টেশন বসায়। সেখানে বড় বড় কল থাকে, সেই কলের চোঙের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তারা বক্তৃতা করে, গায়কেরা গান গায়। বাতাসে যেমন সর্বদাই শব্দের ঢেউ খেলছে; আকাশেও তেমনি আলোর তরঙ্গ, বিদ্যুতের তরঙ্গ সর্বদাই খেলে বেড়াচ্ছে। স্টেশনের কলগুলির কাজ হচ্ছে সমস্ত কথা ও সুরগুলিকে ধরে তা থেকে বিদ্যুতের তরঙ্গ সৃষ্টি করে তাকে আকাশময় ছড়িয়ে দেওয়া। বিদ্যুতের ঢেউগুলি শব্দের বাহন হয়ে চারিদিকে হাজার হাজার মাইল ছড়িয়ে পড়ে। সে শব্দ কানে শোনা যায় না, কারণ সে আর বাতাসের ঢেউ নয়, সে এখন বিদ্যুতের তরঙ্গ। সেই বিদ্যুতের তরঙ্গ যখন তোমার বাড়িতে তোমার টেলিফোনের যন্ত্রে এসে আঘাত করে তখন সে আবার শব্দের ঢেউ হয়ে তোমার কানের ভিতরে কথা ও সুরের সৃষ্টি করে। স্টেশনের যন্ত্রের সামনে যে কথা ও যেমন সুর শোনান হয় ঠিক সেই কথা তেমনি সুরে অতি পরিষ্কারভাবে তুমি ঘরে বসেই শুনতে পারবে।

প্রতিদিন কোন্ সময়ে কি হবে তা সব আগে থেকে ঠিক করে দেওয়া থাকে। যেমন মনে কর, বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে, সকাল বেলা আটটা থেকে নটা পর্যন্ত খবর শোনান হবে। সেই সময়ে যদি টেলিফোনে কান দিয়ে থাক তাহলে শুনতে পাবে যে একজন লোক পরিষ্কার গলায় সেদিনকার সব খবর শোনাচ্ছে। তার আগের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যত দেশ থেকে যতরকমের খবর এসেছে, একে একে সব বলে যাচ্ছে। কোথায় যুদ্ধবিগ্রহ হল, কোথায় বড় বড় মন্ত্রিসভায় কি কি পরামর্শ স্থির হল, কোথায় কতরকমের কি দুর্ঘটনা ঘটল, এই সমস্ত খবর বলছে; তারপর ক্রিকেট, ফুটবল, ঘোড়দৌড় আর নানারকম খেলা ও আমোদের কথা বলছে; তারপর হয়ত নানারকম জিনিসের বাজার দর আর নানারকম ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বলছে। সকলের শেষে সেদিন কখন কি কি হবে তাও জানিয়ে দিচ্ছে—যেমন "আজ তিনটের সময় ঘোড়দৌড়ের ফল বলা হবে," "পাঁচটার সময় অমুক বিষয়ে অমুক বক্তৃতা করবেন," "সাতটা থেকে আটটা অমুক অমুক গাইয়ের গান শোনান হবে, তারপর এক ঘণ্টা নাচের বাজনা হবে," "নটার সময় ছোট ছেলেদের জন্য গল্প শোনান হবে।" আমেরিকায় এরই মধ্যে নানা সহরে সবশুদ্ধ কয়েক হাজার স্টেশন বসান হয়েছে। সেইসব স্টেশনের শ্রোতাদের সংখ্যা যে কত, তা এ থেকেই বুঝতে পারবে যে এক নিউইয়র্ক সহরেই তিন লক্ষের বেশি শ্রোতা প্রতিদিন বিনা তারে টেলিফোন শোনে।

অনেকগুলো স্টেশন মিলে যখন একসঙ্গে আকাশে ঢেউ ছড়াতে থাকে তখন অনেক লোকের একসঙ্গে কথা বলার মতো একটা ভয়ানক গোলমালের সৃষ্টি হতে পারে; সেইজন্য স্টেশনওয়ালারা নিজেদের মধ্যে একরকম বন্দোবস্ত করে নিয়েছে যে এক-এক স্টেশন থেকে খালি এক-একরকম ঢেউ ছাড়া হবে। আকাশে যে বিদ্যুতের তরঙ্গ ওঠে তাকে স্টেশনওয়ালাদের ইচ্ছামত ছোট বা বড় করা যায়। যেমন একটা স্টেশন থেকে যদি একশ হাত লম্বা ঢেউ ছাড়া হয় তাহলে তার পাশের স্টেশন থেকে নব্বুই হাত কি একশ দশ হাত লম্বা ঢেউ ছাড়তে পারে, কিন্তু একশ হাত ঢেউ ছাড়বার হুকুম তাদের নেই। শ্রোতারা যে টেলিফোনের কল ব্যবহার করে তাতে এমন বন্দোবস্ত থাকে যে সে কল খালি একরকম বিদ্যুতের ঢেউয়েতেই সাড়া দিবে। বেহালার কানে মোচড় দিয়ে যেমন তারের সুর অনেকটা নামান বা চড়ান যায় তেমনি টেলিফোনের শব্দ ধরবার যন্ত্রটিকেও নানরকম ঢেউয়ের তালে চড়িয়ে বা নামিয়ে বাঁধা যায়। মনে কর তোমার টেলিফোনের কল এখন যেভাবে বাঁধা আছে তাতে একশ হাত ঢেউওয়ালা স্টেশনের শব্দ শোনা যেতে পারে।

কিন্তু তুমি বিজ্ঞাপনে দেখলে, আজ সন্ধ্যার সময় নব্বুই হাত ঢেউয়ের স্টেশনেতে খুব বড় কোনও ওস্তাদ গান করবে; তুমি ইচ্ছা করলে তোমার কলের বাঁধন বদলিয়ে তাতে নব্বুই হাত তরঙ্গ ধরে সেই স্টেশনের গান শুনতে পার। যারা এইসব টেলিফোনের কল ব্যবহার করে কেবল তাদের জন্য এর মধ্যেই নানারকম খবরের কাগজ আর মাসিকপত্র বের হতে আরম্ভ করেছে। তাতে কোথায় কোন্ নূতন স্টেশন হচ্ছে, কখন কোথায় কি হবে, টেলিফোন কলের কি কি নতুন উন্নতি হচ্ছে, এই সমস্ত খবর থাকে। তাছাড়া কলওয়ালাদের নানারকম বিজ্ঞাপন থাকে; আর টেলিফোনের কল সম্বন্ধে আর তার ব্যবহার সম্বন্ধে নানারকম উপদেশ থাকে।

সাধারণত যেসব টেলিফোনের কল ব্যবহার হয়, তাতে কানের উপর চাক্তির মতো বা চোঙার মতো টেলিফোনের মুখ বসিয়ে আওয়াজ শুনতে হয়। যতজন শ্রোতা ততগুলো চোঙা বা চাক্তি দরকার। কিন্তু আর একটু বেশি টাকা খরচ করলে আর একরকমের টেলিফোনের কল পাওয়া যায় যাতে গ্রামোফোনের চোঙার মতো একটা মস্ত চোঙার ভিতর দিয়ে পরিষ্কার আওয়াজ বেরোতে থাকে। পাঁচ সাতজন বা বিশ পঞ্চাশজন লোকে একসঙ্গে বসে সেই আওয়াজ শুনতে পারে।

বিনা তারের টেলিফোন হওয়াতে মানুষের যে কতদিকে কতরকম সুবিধা হচ্ছে তা আর বলে শেষ করা যায় না। ছোট্টখাট্ট টেলিফোনের কলটি তোমার পকেটে করে সঙ্গে নিয়ে যাও, পথের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা একটা বাতি বা থাম কিংবা টেলিগ্রাফ পোস্টের গায়ে কলের তার ঠেকিয়ে নিলেই কতরকম আওয়াজ শুনতে পারবে। যদি নিজের বাড়িতে কিংবা আপিসে একটি ছোটখাট ঢেউ পাঠাবার স্টেশন বসাও তাহলে বাড়ির লোকে বা আপিসের লোকে যখন ইচ্ছা তোমায় খবর পাঠাতে পারবে। তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পার যে, যেখানেই থাক না কেন, হঠাৎ বিশেষ কোনও দরকার পড়লে কিংবা কোনও বিপদ-আপদ ঘটলে তখনি তোমার কাছে তার খবর পৌঁছাতে পারবে।

এমনি করে "যে গান কানে যায় না শোনা," যে গান আকাশের তরঙ্গে চড়ে বিদ্যুতের মতো বেগে চারিদিকে ছুটে বেড়ায়, সেই অশব্দ গানকে আকাশময় ছড়িয়ে দিয়ে মানুষ আবার তাকে কলের মধ্যে ধরে আকাশের ভাষা ও আকাশের সুর শুনছে। আমাদের দেশে গল্পে ও পুরাণে যে আকাশবাণীর কথা শুনতে পাই,—এও যেন সেই আকাবাণীর মতো। কোথাও কোন আওয়াজ নাই, জনমানুষের সাড়া নাই, অথচ কলের মধ্যে কান দিলেই শুনি আকাশময় কত কণ্ঠের কত ভাষা, কত বিচিত্র গান আর কত যন্ত্রের সুর!

যদি অন্যরকম হত

এই পৃথিবীটাকে জন্মে অবধি আমরা যেমন দেখে আসছি সে যে বরাবর ঠিক সেরকম ছিল না তা তোমরা সবাই জান। এখন সে যেমনটি আছে চিরকাল তেমনটিও থাকবে না। আমরা এখন তার যেরকম চেহারা দেখছি সেরকম না হয়ে যদি সে অন্যরকম হত, যদি তার শনির মতো আংটি থাকত কিংবা বৃহস্পতির মতো দশ বারোটা চাঁদ থাকত তাহলে আরও কত অদ্ভুত কাণ্ড দেখতে পেতাম। চাঁদ যেমন বারো মাসে তার একই পিঠ পৃথিবীর দিকে ফিরিয়ে থাকে, ও পিঠে কি আছে তা আমাদের দেখতে দেয় না বুধগ্রহ ঠিক তেমনি করে সারা বছর সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। পৃথিবী যদি তেমনি করে কেবল একটা দিকই সূর্যের দিকে ঘুরিয়ে রাখত—

তাহলে ব্যাপারটা কি হত একবার ভাব দেখি। একদিকে চিরকালই রোদ, চিরকালই গরম, একটু জুড়োবার অবসর নাই, সব মরুভূমি, সব ফেটে চৌচির! আর-একদিকে কেবলই রাত, কেবলই ঠাণ্ডা আর কেবলই বরফ! জীব-জন্তুর সাধ্য কি যে তেমন ঠাণ্ডায় বা তেমন গরমে পাঁচ মিনিটও বেঁচে থাকে। এই দুইয়ের মাঝখানে যেখানে বার মাস কেবলই সন্ধ্যা, যেখানে সূর্য অস্তও যায় না, উদয় হতে চায় না, কেবল আকাশের সীমান্তের কাছে উঁকিঝুঁকি মারে সেখানে হয়ত কষ্টেসৃষ্টে জীব-জন্তুরা টিকে থাকতে পারে, গাছপালা যদি থাকে তবে তাও ওই সন্ধ্যের দেশটুকুতেই থাকবে।

এক জায়গায় মাটি যদি গরম হয় আর তার কাছেই আশেপাশে যদি তার চাইতেও ঠাণ্ডা জায়গা কোথাও থাকে তাহলে গরম জায়গার হাওয়া হাল্কা হয়ে উপরদিকে উঠতে থাকে, আর চারিদিকের ঠান্ডা বাতাস এসে সেই জায়গা দখল করতে থাকে। এমনি করে ছোট বড় ঝড়ের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর একটা দিক যদি আগুনের মতো গরম আর একদিক বরফের চাইতেও ঠান্ডা হত তাহলে সারা বছর ধরে যে ভীষণ ঝড়ের সৃষ্টি হত, তার কাছে এই পৃথিবীর বড় বড় তুফানগুলো নিতান্তই ছেলেখেলা। সুতরাং পৃথিবীর যে এখনও চাঁদের মতো বা বুধগ্রহের মতো দশা হয়নি সেটা আমাদের পক্ষে খুবই সৌভাগ্যের কথা বলতে হবে। কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন যে পৃথিবীর দিনগুলো ক্রমেই লম্বা হয়ে আসছে। এখন প্রায় চব্বিশ ঘণ্টায় একদিন হয় কিন্তু লক্ষ লক্ষ বছর পরে দিনগুলো বাড়তে বাড়তে ক্রমে ক্রমে ৩৬৫ গুণ লম্বা হয়ে আসবে অর্থাৎ এক বছরে পৃথিবীর একদিন হবে তখন উপরে যেরকম বর্ণনা করা হয়েছে পৃথিবীর ঠিক সেইরকম দশা হয়ে আসবে।

যদি বাতাস না থাকত তাহলে পৃথিবীর কি অবস্থা হত? জীব-জন্তু সব যে মরে যেত সে ত সহজেই বোঝা যায় কিন্তু পৃথিবীর চেহারাটা হত কিরকম? গাছপালা না হওয়ার দরুণ চেহারার যে পরিবর্তন হত সেটা একরকম কল্পনা করে নেওয়া যায়—কিন্তু তাছাড়াও আরো অনেক অদ্ভুত পরিবর্তন হত। বাতাস না থাকলে মেঘ, বৃষ্টি, ঝড় বা হাওয়ার চলাচল এ সব কিছুই থাকত না। পাহাড় ধসে পড়লেও তার শব্দ শোনা যেত না। যে জলের উপর সর্বদা চঞ্চল ঢেউ খেলতে থাকে সেই জল আশ্চর্যরকম স্থির হয়ে থাকত আর তার মধ্যে সব জিনিসের ছায়া পড়ত একেবারে আয়নার মতো পরিষ্কার। কিন্তু তাও বেশি দিন হবার যো থাকত না। বাতাসের চাপ না থাকলে জল খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়; সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই পৃথিবীর সব জল বাষ্প হয়ে আকাশময় ছড়িয়ে পড়ত। পৃথিবীর সাধ্য থাকত না যে সেই জলকে মেঘের আকারে বা কুয়াশার আকারে আটকিয়ে রাখে। সেই বাতাসহীন পৃথিবীর উপর যখন রোদ এসে পড়ত তখন দেখতে দেখতে পৃথিবী গরম হয়ে উঠত, আবার রোদ পড়লেই গরম মাটি চট্‌পট্ জুড়িয়ে ঠান্ডা হয়ে যেত।

আর একটা কাণ্ড হত এই যে, পৃথিবীর চারিদিকের সমস্ত ধুলো আর বাতাসে ভেসে ভেসে বেড়াতে পারত না; সব এসে পৃথিবীর গায়ের উপর জমে থাকত। ধুলো অতি সামান্য জিনিস কিন্তু ঐ ধুলোটুকু না থাকার দরুণ সমস্ত আকাশের চেহারা একেবারে বদলিয়ে যেত। আমাদের এই আকাশে যখন সূর্য ওঠে তখন সমস্ত আকাশ আলো হয়ে যায়। আকাশের যেখানেই তাকাও সেখানেই আলো। রাত্তিরের তারাগুলো সে আলোয় কোথায় যে চাপা পড়ে যায় তাদের আর খুঁজেই পাওয়া যায় না। অমন যে ঝক্‌ঝকে চাঁদ সেও আলোর তেজে ফ্যাক্‌শা হয়ে যায়। কিন্তু ধুলো যদি না থাকত তাহলে এসব কিছুই হওয়া সম্ভব হত না। যেখানে সূর্য থাকত শুধু সেইটুকুই ঝক্‌ঝকে আলো আর তার চারিদিকেই ঘুট্‌ঘুটে কালো আকাশ, সেই আকাশের গায়ে দিন দুপুরে তারাগুলো সব ফুটে থাকত। আর সূর্যের চেহারাও আশ্চর্যরকম বদলিয়ে যেত। সূর্যের চারিদিকে যে আগুনের খোলস আর আলোর কিরীট থাকে, পূর্ণগ্রহণের সময় ছাড়া যা এখন চোখে দেখবার

উপায় নাই, সেসব তখন শুধু চোখেই যখন-তখন দেখা যেত। একটা ঝক্‌ঝকে গোল পিণ্ড, তার গা থেকে আগুনের শিখাগুলো লক্‌লকে জিব বার করে লাফাচ্ছে আর তার চারদিকে অতি সুন্দর স্নিগ্ধ সবুজ আলো রঙের খেলা দেখিয়ে বহুদূর পর্যন্ত চঞ্চল হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

যা হোক, এ সমস্তই কল্পনার কথা। আসল কথা এই যে, পৃথিবী যেমন আছে আরও বহুকাল সে তেমনি থাকবে এবং সেটা তোমার পক্ষেও ভাল, আমার পক্ষেও ভাল—আমাদের হাজার হাজার বছর পরে যারা জন্মাবে তাদের পক্ষেও ভাল।

জলস্তম্ভ

স্রোতের জলে যে-জিনিস ভাসে, স্রোত যেদিকে যায় সে-ও সেইদিকে ভেসে চলে। জলের মধ্যে যদি দুটো স্রোত পাশাপাশি দুইদিকে চলতে থাকে তাহলে দুটো উল্টো টানের মাঝে পড়ে একটি ঘূর্ণিপাকের সৃষ্টি হয়। ঘূর্ণিপাকের মধ্যে যা-কিছু এসে পড়ে সবই পাকের সঙ্গে চক্রের মতো ঘুরতে থাকে।

জলে যেমন, বাতাসেও তেমনি। যদি একসঙ্গে দুটো বাতাসের স্রোত পাশাপাশি দুই মুখে চলতে থাকে তাহলেই বাতাসের মধ্যে একটি ঘোরপাক তৈরি হয়। খড়কুটো ধুলোবালি ধোঁয়া, যা কিছু সেই ঘোরপাকের মধ্যে পড়ে সব চর্কিবাজির মতো ঘুরতে থাকে। যদি দুই মুখেই বাতাসের বেশ জোর থাকে তাহলে সেই ঘোরপাক থেকে সাংঘাতিক ঘূর্ণিবায়ুর জন্ম হতে পারে। যেদিকে বাতাসের জোর বেশি, ঘূর্ণিবায়ু ঘোরপাক খেতে খেতে সেইদিকে ছুটে চলে। ছোটখাট ঘূর্ণিবায়ু তোমরা বোধহয় সকলেই দেখেছ। হঠাৎ কোথা থেকে বাতাস উঠল আর সেই সঙ্গে খানিকটা ধুলো আর কাগজ আর শুকনো পাতা ঘুরতে ঘুরতে উড়তে লাগল। এইরকম তামাসা অনেক সময়েই দেখা যায়। কিন্তু এই ঘূর্ণি বায়ুই যখন আবার খুব বড় আকার নিয়ে দেখা দেয় তখন তার চেহারা অতি সাংঘাতিক হয়।

ঘূর্ণিপাকের চক্র যখন নিচের দিকে নামতে থাকে তখন যদি সেই ঘুরন্ত বাতাসের চেহারাটা দেখতে পেতাম তাহলে দেখতাম ঠিক যেন একটা প্রকাণ্ড চুড়োওয়ালা টুপি উল্টো করে ঝুলিয়ে রেখেছে। জলে যে ঘূর্ণিপাক হয়, তার মাঝখানটায় যেরকম গর্ত হয় তেমনি এরও মাঝখানটা ফাঁপা। টুপির চুড়োটা যতই লম্বা হতে হতে মাটির কাছ পর্যন্ত নামে ততই নিচের সমস্ত হাল্কা জিনিসকে ঐ ফাঁপা জায়গাটুকুর মধ্যে শুষে নিতে থাকে।

'হাল্কা জিনিস' বললাম বটে, কিন্তু তেমন তেমন ঘূর্ণিবায়ু হলে তার কাছে প্রায় সব জিনিসই হাল্কা হয়ে যায়। খাটবিছানা বাড়ির চালা, এসব ত উড়ে যায়ই, পাঁচ-সাতজন মানুষ শুদ্ধ আস্ত মোটর গাড়ি পর্যন্ত শুকনো পাতার মতো ঘোরপাক খেয়ে শূন্যে উঠে পড়ে।

অনেক সময়ে বাতাসের জল জমে ঘূর্ণিবায়ুর থলিটির মধ্যে জড় হতে থাকে। কিন্তু সে জল বৃষ্টি হয়ে নামতে পারে না, একেবারে হাজার হাজার মণ জল অন্ধকার মেঘের মতো আকাশে ঝুলে ঘুরপাক খেতে থাকে। বড়বড় বিল বা নদী কিংবা সমুদ্রের উপরেই সাধারণত এইরকম হয়। তখন কেবল যে উপরের বাতাস কালো থলির মতো হয়ে নিচের দিকে নামতে থাকে তা নয়; নিচের জলও চুড়োর মতো উঁচু হয়ে ঘুরতে ঘুরতে উপরদিকে উঠতে থাকে। নিচেকার চুড়োটি যখন উপরের ঘুরন্ত মেঘের সঙ্গে মিলে যায় তখনই বড় বড় থামের মতো জলস্তম্ভের সৃষ্টি হয়। তখন দেখতে মনে হয়, যেন জল থেকে আকাশ পর্যন্ত এক একটা প্রকাণ্ড থাম জলের উপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে।

নৌকোই বল আর জাহাজই বল, সে যত বড় আর যত মজবুতই হোক না কেন, জলস্তম্ভের মধ্যে পড়লে আর রক্ষা নাই। জাহাজের কাছে জলস্তম্ভ উপস্থিত হলে তার ঘূর্ণিটান এড়িয়ে চলা জাহাজের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, ঘূর্ণিজলের স্তম্ভ তেমনি করে জাহাজকে টেনে নেয়। স্তম্ভের ভিতরে ঢুকলে জাহাজের লোকদের আর কিছু করবার উপায় থাকে না। জাহাজ বন্‌বন্ করে ঘুরতে থাকে—অনেক সময় জল ছেড়ে শূন্যে উঠে যায়--চারিদিকে ভোঁ-ভোঁ শব্দে কানে তালা লেগে যায়, অন্ধকারে আর জলের ঝাপ্টায় কিছু দেখবার সাধ্য থাকে না।

তারপর স্তম্ভ যখন ভীষণ শব্দে ফেটে যায় তখন হচ্ছে আসল বিপদ। একেবারে হাজার মণ জল বাজ পড়ার মতো আওয়াজ করে মাথার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জাহাজ-টাহাজ সব চুরমার করে দেয়। সমুদ্রের জল তার ধাক্কায় বহুদূর অবধি তোলপাড় হয়ে ওঠে। বহুদূরের জাহাজ পর্যন্ত তার সাংঘাতিক ঢেউয়ে টল্‌মল্ করতে থাকে।

কিছুদিন আগে আমেরিকার এক সাহেব কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে এক প্রকাণ্ড মোটরে চড়ে একটা বিলের ধার দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন আকাশ থেকে একটা কালো মেঘের মতো কি যেন ঘুরতে ঘুরতে নিচের দিকে নেমে আসল, আর বিলের উপর থেকে খানিকটা জল ছিট্‌কে উঠে তার সঙ্গে মিলে একটা স্তম্ভের মতো হয়ে গেল। দেখতে দেখতে স্তম্ভটা বিলের উপর দিয়ে তেড়ে এসে মোটরগাড়ির উপর পড়ে, গাড়িটাকে সোঁ করে শূন্যে তুলে, পাহাড়ের উপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। গাড়ির আরোহীরা কেউ মবল, কেউ সাংঘাতিক জখম হল আর প্রকাণ্ড গাড়িখানা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

যদি সর্বদাই যখন তখন এরকম বড় বড় জলস্তম্ভ দেখা দিত তাহলে সেটা খুবই ভয়ের কথা হত; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে এরকম সচরাচর দেখা যায় না। তেমন বড় জলস্তম্ভ অতি অল্পই দেখা যায় আর তাও থাকে অতি অল্প সময়।

বুমেরাং

এই পৃথিবীতে যারা সভ্য জাতি বলে পরিচিত তাদেব সভ্যতার মোটামুটি পরিচয় হচ্ছে এই যে, তারা চাষবাস করতে জানে, আগুনের এবং নানারকম ধাতুর ব্যবহার জানে, নানারকম জিনিসকে নিজের কাজে লাগাতে জানে, পাকা ঘর দালান গড়তে জানে, আর মনটাকে নানারকম জ্ঞানের সন্ধানে নিযুক্ত করতে জানে। এসব যারা জানে না তাদের আমরা বলি অসভ্য জাত। এই হিসাবে, পৃথিবীর সব চাইতে অসভ্য জাতিদেব নাম করতে হলে অস্ট্রেলিয়ার আদিম বর্বর জাতির কথা উল্লেখ করতে হয়। তারা কাপড় বানাতে জানে না, ধাতুর ব্যবহার ত দূরের কথা, সামান্য মেটে বাসন পর্যন্ত তৈরি করতে জানে না, চাষবাসের কোনও খবরই রাখে না; কাঁচা মাংস আর বুনো গাছের ফল বা শিকড় খেয়ে ঘুরে বেড়ায়। সামান্য লতাপাতার ছাউনি ছাড়া আর কোনওরকম ঘরবাড়ির খবর তারা রাখে না; এক থেকে দশ পর্যন্ত গুণতে বললে মাথায় তাদের গোল বেধে যায়।

এমন যে অসভ্য জাত, তারাও কিন্তু একটি বিদ্যায় এমন ওস্তাদ যে, সে বিদ্যা পৃথিবীর অতিবড় সভ্য জাতিরাও আজ পর্যন্ত শিখে উঠতে পারেনি। সে বিদ্যাটি হচ্ছে বুমেরাং অস্ত্রের ব্যবহার। অস্ত্র বললাম বটে, কিন্তু তা বলে খুব একটা জটিল বা মারাত্মক কিছু মনে করে বস না। বুমেরাং জিনিসটি হচ্ছে এক টুকরা বাঁকান কাঠ মাত্র। সেই কাঠের একপিঠ সমান আর-

একপিঠ গোল মতো উঁচু করা, অনেকটা হকি খেলার লাঠির মতো। যে পিঠটাকে সমান বললাম তাও একেবারে সমান নয়। ভাল করে দেখলে দেখা যায়, সেটাও কেমন একটু ঢেউ খেলান মতন, কোথাও সামান্য উঁচু কোথাও সামান্য নীচু। বুমেরাঙের চেহারা নানারকম হয়।

এখন বুমেরাঙের ব্যবহারের কথা বলি। এই অস্ত্রের সাহায্যে সে দেশী লোকেরা তাদের প্রতিদিনের শিকার সংগ্রহ করে। লড়াইয়ের সময়েও এই অস্ত্রই তাদের প্রধান সম্বল। ওস্তাদ লোকেরা যখন এই অস্ত্র ছুঁড়ে মারে তখন অস্ত্রের চালচলন এমন অদ্ভুতরকমের হয় যে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। অস্ত্র ছুঁড়ে মারলে তা কখনও সোজাসুজি সামনের দিকে ছুটে যায় না। খানিক দূর গিয়েই নানারকম উল্টোবাজি খেতে থাকে, গোঁৎ খেতে খেতে আকাশে উঠে যায়, আবার অনেক সময়ে সোঁ করে ওস্তাদের কাছেই পালটে ফিরে আসে। প্রকাণ্ড গাছের আড়ালে শত্রু বা শিকার লুকিয়ে আছে, ওস্তাদ শিকারী গাছের আরেক দিকে থেকেই এমন কায়দায় বুমেরাং ছুঁড়ল যে, সে অস্ত্র গাছ এড়িয়ে প্রকাণ্ড চক্র দিয়ে ঘুরে শত্রু বা শিকারের গায়ে গিয়ে পড়ল।...

যুদ্ধের জন্য, শিকারের জন্য বা তামাসার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের বুমেরাং তৈরি হয়। যুদ্ধে যেসব অস্ত্রের ব্যবহার হয় সেগুলি ছুঁড়ে মারলে আর ফিরে আসে না। শিকারের বুমেরাংগুলি এমনভাবে তৈরি যে দৈবাৎ যদি শিকার ফস্‌কে যায় তাহলে অস্ত্র আপনি শিকারীর কাছে ফিরে আসে। তামাসার বুমেরাংগুলি এমনভাবে বানায় যে ছুঁড়লে পর খুব সুন্দর বা খুব অদ্ভুতভাবে নানারকম কায়দা খেলিয়ে অস্ত্র আপনার ও ওস্তাদের বাহাদুরী দেখায়।...

আশ্চর্য এই যে, এইসব অস্ত্র কেন যে ঐরকমভাবে চলে, তার সঠিক হিসাব আর নিয়মকানুন বার করতে গিয়ে মহা মহা পণ্ডিতেরাও অনেক সময় হার মেনে যান; অথচ পৃথিবীর অসভ্যতম জাতির কারিকরেরা সারা বছর ধরে এইসব অস্ত্র নিখুঁৎভাবে গণ্ডায় গণ্ডায় তৈরি করছে আর অসভ্য ওস্তাদেরা তার অব্যর্থ ব্যবহার দেখিয়ে সভ্য মানুষকে তাক্ লাগিয়ে দিচ্ছে। কেমন করে তাদের মগজে এমন বিদ্যা প্রবেশ করল, কোথা থেকে এমন অস্ত্রের সন্ধান পেয়ে এমন করে শিখল, তার উত্তর কেউ জানে না।

ছাপাখানার কথা

ছেলেবেলায় একটা ছাপাখানা দেখতে গিয়েছিলাম। দেখলাম একটা লোহার কল রয়েছে, সেটাকে তারা 'প্রেস' বলে। তার পাশে একটা কালি—মাখান টেবিল আর অন্য একটা টেবিলে একতাড়া কাগজ। প্রেসের সামনের দিকে একটা লোহার তক্তার উপর অনেকগুলো উঁচু উঁচু অক্ষর বসান রয়েছে। একটা ছেলে একটা মোটা 'রুল' দিয়ে টেবিলের কালি নিয়ে সেই অক্ষরগুলোতে মাখাচ্ছে। আর একজন লোক সেই তক্তার সঙ্গে আঁটা একটা ফ্রেমের উপর কাগজ বসিয়ে, কাগজ শুদ্ধ ফ্রেমটাকে মুড়ে সেই অক্ষরগুলোর উপর ফেলে দিচ্ছে। তারপর একটা হাতল ঘুরিয়ে সেইগুলোকে একেবারে প্রেসের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আর-একটা প্রকাণ্ড হাতল টেনে দিচ্ছে। তারপর হাতল ছেড়ে দেওয়া তক্তা টেনে বার করা, কাগজ খুলে নেওয়া, আবার কালি দেওয়া, কাগজ দেওয়া ইত্যাদি। এইরকম ক্রমাগত চলছে আর প্রত্যেকবার এক-একখানা ছাপা হচ্ছে; এমনি করে ঘণ্টায় ২০০/৩০০ করে ছাপা হয়। ব্যাপারটা আমার কাছে ভারি আশ্চর্য লেগেছিল। কিন্তু এ সব প্রেস এখন আমাদের দেশেও নিতান্ত 'সেকেলে' হয়ে গেছে।

আজকালকার কোন বড় ছাপাখানায় যদি যাও, প্রেসের রকমারি দেখে অবাক হয়ে যাবে।

তার অধিকাংশ কলে চলে, আগাগোড়াই তার কলে কাজ হয়। প্রথম যে কলের প্রেস দেখেছিলাম সেকথা আমার এখনও মনে আছে। প্রেসটাকে দর্জির সেলাই কলের মতো পায়ে চালাতে হয়। সেটা যখন চলে তখন বোধহয় যেন একবার হাঁ করছে, একবার মুখ বুজছে। যে প্রেস চালায় সে ঐ হাঁ-করা প্রেসের মধ্যে তার কাগজ বসিয়ে দেয়, আর প্রেসটা সেই কাগজের উপর অক্ষরের 'টাইপ' দিয়ে এক কামড় বসিয়ে দেয়—তাতেই ছাপা হয়ে যায়! কালির জন্য ভাবতে হয় না; প্রেসের মাথায় কতগুলো রুল বসান আছে, সেগুলো কালি মেখে তৈরি হয়ে থাকে, সেই প্রেসটা হাঁ করে, আর প্রেসম্যান তার কাগজ বদলিয়ে দেয় অমনি রুলগুলো সুরুৎ করে সেই উঁচু উঁচু অক্ষরগুলোর উপর কালি মাখিয়ে পালায়! পায়ে না চালিয়ে প্রেসের সঙ্গে মোটর জুড়ে দিলে মোটরেই প্রেস চালাতে পারে।

কিন্তু পড়বার বই বা মাসিক কাগজপত্র ছাপবার জন্য যেসব বড় বড় প্রেস থাকে, সেগুলো আরও কট্‌মটে। তাতে একটা প্রকাণ্ড লোহার চোঙা থাকে, তার গায়ে কাগজ ঠেলে দিলে সে আপনি কাগজ টেনে নেয়। একটা লোহার টেবিল মতো থাকে, তার উপর টাইপ বসান; সেই টেবিলটা টাইপশুদ্ধ ছুটাছুটি করে। একবার রুলের তলা দিয়ে ছুটে কালি মেখে এসে আবার কাগজ-জড়ান 'চোঙার' নীচ দিয়ে গড়াতে গিয়ে চোঙাটাকে চেপে ঘুরিয়ে কাগজের গায়ে ছাপ মেরে দেয়। ছাপা হয়ে গেলে কাগজটাকে হাতে করে সরিয়ে নিতে হয় না—প্রেসটা আপনি তাকে ঠিক জায়গায় এনে ফেলে দেয়। এমনি করে ঘন্টায় ২০০০/৩০০০ বেশ সহজেই ছাপা যায়।

কিন্তু ছাপাখানা কি ভয়ানক ব্যাপার হতে পারে তা যদি তুমি দেখতে চাও তবে খুব বড় খবরের কাগজওয়ালাদের কাছে গিয়ে দেখ। সেখানে প্রেসের ঘরে ঢুকতেই মনে হবে যেন কানে তালা লেগে গেল। প্রেসের ভন্‌ভন্ শব্দে নিজের চেঁচানি নিজেই শুনতে পাবে না। কল এত তাড়াতাড়ি চলে যে, কখন কি করে ছাপা হচ্ছে কিছু বুঝবার যো নেই। এমন প্রেসও আছে, যাতে বারো পৃষ্ঠা খবরের কাগজ প্রতি ঘণ্টায় এক লাখ করে ছাপা হয়। যদি প্রেসটার ভিতর ভাল করে তাকিয়ে দেখ, দেখবে একদিকে একটা লোহার ডাণ্ডায় প্রায় ৪/৫ হাত চওড়া কাগজের ফিতে জড়ান—ফিতাটা লম্বায় হয়ত ২/৩ মাইল হবে। প্রেসের মধ্যে পর পর কতগুলো প্রকাণ্ড লোহার চোঙা ভয়ানক জোরে বন্‌বন্ করে ঘুরছে— আর সেই সঙ্গে হুড়্‌হুড়্ করে কাগজের 'ফিতে' টেনে নিয়ে, তার উপর ছেপে যাচ্ছে। মাইলকে মাইল কাগজ চোখের সামনে দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যাচ্ছে। বিলাতে একটা বড় খবরের কাগজ (Daily Mail) ছাপতে প্রতি সপ্তাহে ৩০০ মণ কালি আর দশ হাজার মাইল কাগজ খরচ হয়।

এতে একদিনে যা ছাপা হবে, দেড়শ বছর আগেকার কাঠের প্রেসে এক বছরেও তা পেরে উঠত না।

কাপড়ের কথা

ঐ যে জামাটা তুমি গায়ে দিয়েছ, ওর কাপড়টা তৈরি করতে লোককে কত হাঙ্গাম করতে হয়েছে, তুমি কি একবার ভেবে দেখেছ? তূলার ক্ষেতে যখন তূলা হল, তখন কত লোকে এসে সেই সব তূলা গাছ থেকে তুলে নিয়ে এক জায়গায় জড় করল। কলে সেই তূলার বীচি পরিষ্কার করে তাকে গাঁটে বেঁধে ফেলল। তারপর সেই তূলা কত দেশবিদেশে ঘুরে, কাপড়ের কলে এসে হাজির হল।

আমি একদিন একটা কাপড়ের কল দেখতে গিয়েছিলাম। সেটা খুব বড় কল নয়—তার

চেয়ে অনেক বড় কল আমাদের দেশে আছে। কিন্তু তারই সব কাণ্ড-কারখানা দেখলে অবাক হয়ে থাকতে হয়। প্রকাণ্ড এক তিনতলা বাড়ি,—তার ছাদে অনায়াসে একটা ফুটবল খেলার জায়গা হতে পারে। প্রথমেই গেলাম তিনতলায়। সেখানে একটা প্রকাণ্ড বাষ্পে-চালান কপিকল আছে; তুলার চালান এলে প্রথমেই গাঁটগুলি কপিকলে করে তিনতলায় তোলা হয়। তারপর গাঁট খুলে তুলা কলে পরিষ্কার করা হয়। সেই কলে তুলাকে ঝেড়ে আছড়িয়ে দম্‌কা হাওয়ায় উড়িয়ে ধূলা, বালি, বীচি, খড়, কুটো সমস্ত বার করে ফেলে, তারপর সেই পরিষ্কার তুলায় চাপ দিয়ে—আর একটা কলে মোটা মোটা লেপের মতন তৈরি হয়। সেই 'লেপ'গুলি তারপর দোতলায় চালান করে। সেখানে সেই 'লেপ' থেকে সূতা কাটা হয়। সে এক বিরাট ব্যাপার। প্রথমে অনেকগুলো কলে সেই 'লেপ' থেকে জাহাজ বাঁধা দড়ির মতো মোটা দড়ি তৈরি হয়। তারপর আর একটা কলে সেই দড়ি থেকে টেনে মোটা সূতা বার করা হয়। এমনি করে কলের পর কল—তাতে সূতা ক্রমেই খুব সরু হয়ে আসে। এ ঘরের কল-কারখানা বড়ই অদ্ভুত। চারিদিকে প্রকাণ্ড লম্বা লম্বা কল সারি সারি সাজান, তার প্রত্যেকটাতে হাজার হাজার লম্বা 'নলি' (সূতা পাকাবার জন্য ছোট ছোট কাঠের 'লাটাই') বন্‌বন্ করে ঘুরছে আর সূতা পাকান হচ্ছে। তাছাড়া কলকব্জা যে কতরকম চলছে তার আর কথাই নাই। দেখলে চোখে ধাঁধা লেগে যায়, কিন্তু কারখানার কোথাও একটু গোলমাল দেখতে পাবে না। যে যার কাজ করছে আর সব কল ঠিক চলছে। সূতা কাটা হয়ে গেলে, তৈরি সূতার 'নলি'গুলো আর একটা কলের কাছে নিয়ে যায়। এটা হচ্ছে কাপড়ের 'টানা' দেবার কল। 'টানা' কাকে বলে জান? কাপড়ে লম্বালম্বিভাবে যে-সূতা থাকে তাকে 'টানা' বলে, আর চওড়াভাবে যে সূতা থাকে তাকে 'পড়েন' বলে। এই টানা দেবার কল বড় আশ্চর্য। হাজার হাজার নলি থেকে সূতা টেনে একটা চিরুনির মতো জিনিসের ভিতর দিয়ে গলিয়ে নিয়ে একটা রোলারে জড়ায়। কল চলতে চলতে যদি একটাও সূতা ছিঁড়ে যায়, অমনি আপনি-আপনি 'ঢং' করে ঘণ্টা বেজে ওঠে আর কল থেমে যায়। সেই সূতাটা জোড়া দিলে তবে কল চলবে। একসঙ্গে অনেক থান কাপড়ের টানা দেওয়া হয়ে থাকে। টানার সূতায় রোলার ভর্তি হয়ে গেলে সেই রোলারটাকে একতালায় চালান করা হয়। সেখানে কলে সূতায় মাড় দেওয়া হয়। সূতায় মাড় মাখান, বেশি মাড় চেঁচে ফেলে দেওয়া, বাতাস দিয়ে তাড়াতাড়ি সূতাকে শুখান,—এসবই কলে হয়। তারপর তাঁতে চড়াবার জন্য সেই সূতাকে গুছিয়ে ঠিক করে। একে বলে 'ব' তোলা। এ-কাজটা হয়ে গেলে তারপর কাপড় বোনা হয়। আগের সব কাজ যত সহজে কলে হয়, কাপড় বোনা তত সহজে হয় না। 'টানা'র সূতার টান যদি একটু বেশি হয়ে যায়, অমনি পট্ করে সূতা ছিঁড়ে যায়। তখনই তাঁত থামিয়ে সূতা জোড়া দিতে হয়।

তাঁত যখন চলে তখন বড় মজার দেখায়। টানার সূতা উঠছে আর নামছে, আর তার ফাঁকের ভিতর দিয়ে 'পড়েনে'র সূতার 'মাকু' ঠক্ ঠক্ করে ছুটে যাচ্ছে আর আসছে, ঠিক যেন একটা ইঁদুর দৌড়াচ্ছে। কাপড় বোনা হয়ে গেলে, তাকে মেজে ঘসে মোলায়েম করে, সুন্দর করে ভাঁজ করে, ছাপ লাগিয়ে, তারপর তাকে বাজারে পাঠান হয়। মোলায়েম করার কলটি বড় মজার। দুটা ফাঁপা রোলার গায়ে গায়ে লাগান রয়েছে, তার মাঝখান দিয়ে কাপড়টা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ফাঁপা রোলারের ভিতর ফুটন্ত জলের বাষ্প চালিয়ে দিয়ে রোলার দুটোকে খুব গরম করা হয়, তারপর আস্তে আস্তে সে দুটোকে ঘোরান হয়। তখন কাপড়টাও গরমে আর চাপে খুব মোলায়েম হয়ে বেরিয়ে আসে। তারপর সেই কাপড় ভাঁজ করার কলে নিয়ে যায়। সেই কলের দুটো হাত আছে, তা দিয়ে কাপড়টাকে চটপট ভাঁজ করে ফেলে। তারপর প্যাক করার ঘরে সেই কাপড়ে ছাপ মেরে, তাকে বেঁধে, কাগজ মুড়ে বাজারে পাঠাবার জন্য তৈরি করে রাখে।

এ সব ত নিতান্ত সাধারণ কাপড়ের কথা হল। যদি রঙিন বা ছিটের কাপড় হয়, তবে তার জন্য ধোলাই করা, সূতায় রং দেওয়া, নক্‌শা তোলা, ইত্যাদি আরো নানারকম হাঙ্গামের দরকার হয়।

মজার খেলা

একবার একটা মজার দৌড় খেলা দেখিয়াছিলাম। কতগুলা লোককে বড় বড় ছালার মধ্যে গলা পর্যন্ত ভরিয়া মাঠের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে—কে আগে যাইতে পারে। কয়েকজন অত্যন্ত সন্তর্পণে অদ্ভুত ভঙ্গিতে পেঙ্গুইন পাখির মতো হেলিয়া দুলিয়া চলিতেছে, আর কয়েকজন মাটিতে পড়িয়া একেবারে 'কুমড়ো গড়ান' গড়াইতেছে! মাঠশুদ্ধ লোক একেবারে হাসিয়া অস্থির! ফ্রান্সে একটি 'মোটা মানুষের সমিতি' আছে; অন্তত সাড়ে তিন মণ ওজন না হইলে তাহাতে ভর্তি হওয়া যায় না। তাহারা একবার মোটা লোকদের জন্য দৌড় খেলার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। যাহাদের ওজন পাঁচ মণের কম হইবে না— এমন অনেক লোকে তাহাতে দৌড়াইয়াছিল। সে দৌড় আমি দেখি নাই কিন্তু তাহার যে ফটো দেখিয়াছি, সে অতি চমৎকার—দেখিলে না হাসিয়া থাকা যায় না।

বহুকাল আগে একটা বিলাতি পত্রিকায় এইরকম কতগুলি অদ্ভুত মজার খেলার কথা পড়িয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটা ছিল খাওয়ার পাল্লা। কতগুলি রেকাবি সম্মুখে লইয়া সকলে টেবিলের কাছে বসিয়াছে; 'এক-দুই-তিন' বলিতেই তাহাদের পাতে একেবারে উনান হইতে সাংঘাতিক গরম 'চপ্‌' ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কাঁটা চামচ নাই, খাবারে হাতও লাগাইতে পারিবে না—এখন যে আগে খাইতে পারিবে তাহারই জিৎ! যে লোকটা জিতিয়াছিল সে প্রথমেই মাথা দিয়া ঢুঁ মারিয়া চপ্‌টাকে চ্যাপ্টাইয়া জুড়াইবার সুবিধা করিয়া লইয়াছিল। মাথায় চুল আছে, তাই সহজে গরম লাগে না। আর একটা খেলাতে কোন ফল কিংবা অন্য কোন খাবার সূতায় বাঁধিয়া ঠিক নাকের সামনেই ঝুলাইয়া রাখা হয়। যে হাত না দিয়া সকলের আগে পরিষ্কার করিয়া খাওয়া শেষ করিবে তাহার জিৎ। কাজটা শুনিতে বেশ সহজ, কিন্তু কাজে তেমন সহজ নয়। সূতাটা শূন্যে ঝুলিতেছে, মুখ ঠেকাইতে গেলে সেটা আরও দুলিতে থাকে।

একটা গল্প পড়িয়াছিলাম যে এক জায়গায় খেলা হইতেছিল, কে কত উৎকট মুখভঙ্গী করিতে পারে। একজনের উপর ভার ছিল, তিনি বিচার করিয়া বলিবেন, কাহার মুখের ভঙ্গী সকলের চাইতে বিশ্রী ও বিদ্‌ঘুটে। খেলার জায়গায় এক বেচারা তামাসা দেখিতেছিল, তাহার মুখখানা বাস্তবিকই কদাকার। বিচারক তাহাকে দেখাইয়া বলিলেন, "আমাদের মধ্যে ইনি 'ফার্স্ট প্রাইজ' পাইবার যোগ্য!" সে লোক আশ্চর্য হইয়া বলিল, "আমি ত এ খেলায় যোগ দিই নাই।" বিচারক গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তাই নাকি? তা, আপনি কোন চেষ্টা না করিয়াই ফার্স্ট হইয়াছেন। আপনি থাকিতে প্রাইজ আর কেউ পাইতে পারে না!" লোকটি প্রাইজ পাইয়া খুসী হইবে কি দুঃখিত হইবে, তাহা বুঝিতে পারিল না।

ঘরে বসিয়া অনেকজনে মিলিয়া খেলা যায় এমন দু-একটা খেলার কথা বলি। কতগুলা খেলা আছে তাহাতে বেশ চট্‌পটে এবং সতর্ক হওয়া দরকার। তার মধ্যে একটা খেলা এই—একজন লোক বেশ ধীরে ধীরে একটি গল্প বলিয়া বা পাঠ করিয়া যাইবে। সেই গল্পটি এমন

হওয়া চাই যে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি বেখাপ্পা কথা থাকে। অর্থাৎ এক জায়গায় যেরকম বলা হইয়াছে, আর এক জায়গায় তার উল্টারকম কথা থাকিবে। যেমন, এক ভদ্রলোকের বর্ণনা দেওয়া গেল তার মাথা ভরা টাক, তারপরে আর এক জায়গায় হয়ত বলা হইল যে তিনি আয়নার সামনে বাহার করিয়া টেরি ফিরাইতেছেন। এইরকম গল্পের একটি নমুনা দেওয়া গেল—

"রবিবার, শ্রাবণের কৃষ্ণা চতুর্থী। সন্ধ্যার আকাশ দেখিতে দেখিতে মেঘে ঢাকিয়া আসিল দেখিতে দেখিতে মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। গৃহহীন পিতৃমাতৃহীন যোগেশচন্দ্র আফিসের বেশে বিনা ছাতায় ভিজিতে ভিজিতে নির্জন পথ দিয়া চলিতেছেন—সঙ্গে ট্রামের পয়সাটি পর্যন্ত নাই। স্কুল কলেজ হইতে ছুটি পাইয়া ছাত্রগণ কোলাহল করিয়া ছুটিতেছে—যোগেশচন্দ্রের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি ভিড় ঠেলিয়া চলিতেছেন, আর ভাবিতেছেন কতক্ষণে পৌঁছিব। একে শীতকাল, তার উপর গায়ে কেবল শত ছিন্ন পাতলা ফুটবলের সার্ট, যোগেশচন্দ্র কাঁপিতে কাঁপিতে আপনার গৃহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এমন সময় কে যেন ডাকিয়া উঠিল "অন্ধ নাচারকে ভিক্ষা দেও।" যোগেশচন্দ্র দেখিলেন এক হস্তপদহীন ভিখারী কাতরভাবে ভিক্ষা চাইতেছে। দেখিয়াই তাঁহার মনে দয়ার উদয় হইল। তিনি পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া ভিখারীর হস্তে গুঁজিয়া দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং ভিজা জুতা ও ছাতা বারান্দায় রাখিয়া গিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। পতন শব্দে তাঁহার বাপ মা 'হায় হায়' করিয়া ছুটিয়া আসিলেন।"

ইহার মধ্যে কি কি ভুল আছে বাহির কর ত? খেলিবার সময় কতগুলা কাগজ পেন্সিল দিয়া সকলকে বসাইয়া দিবে এবং ধীরে ধীরে দুইবার গল্পটি পাঠ করিয়া শুনাইবে। তারপর দু-তিন মিনিট সময় দিবে, তাহার মধ্যে যে সবচাইতে বেশি ভুল ধরিতে পারিবে, সেই বাহাদুর। অনেকটা এই ধরনেরই আর একটা খেলা আছে, তাহাতে কথা মনে রাখার উপর হারজিত নির্ভর করে। একটা কোন জিনিসের খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়া তারপর সকলকে বলিতে হয় সমস্ত বর্ণনাটা শুনিয়া আবার মন হইতে লিখিয়া দাও। যেমন একজন মানুষের কথা বলিলাম,—তাহার বয়স পঁচিশ হইবে, চোখে কালো চশমা, মাথার সামনের দিকে টাক, খোঁচা খোঁচা ভুরু ও ঝাঁটার মতো গোঁফ, দাড়ি কামান, মোটা বেঁটে চেহারা, হাতে একটা সবুজ ক্যাম্বিসের ব্যাগ, গলায় পশমের গলাবন্ধ, গায়ে কালো গরম কোট, তার পকেটে লাল রুমাল, হাতে একটা বাঁশের ছাতা, পায়ে প্রকাণ্ড বুট্ জুতা, কানে শোনেন কম, চলেন খোঁড়াইয়া—তার উপর গলার আওয়াজখানা ভিজা ঢাকের মতো। এখন এইটুকু ধীরে ধীরে দুবার পড়িয়া তারপর বেশ ভাবিয়া লিখ ত—দেখিবে একটুকু বর্ণনার মধ্যে হয়ত কিছু কিছু ভুল হইয়া যাইবে।

এইবার অন্যরকমের আর-একটি খেলার কথা বলি যাহা শুনিতে খুব সহজ শোনায় কিন্তু কাজে ভারি শক্ত। একখানা আয়নার সামনে একটা কাগজ—আয়নার ছায়া দেখিয়া কাগজে কিছু আঁকিবার অথবা লিখিবার চেষ্টা করিয়া দেখ। ভারি একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়। হাতটা যেন কিছুতেই বাগ মানিতে চায় না। অনেক লোককে দেখাইতে হইলে একটা বোর্ডের উপর বেশ বড় করিয়া একটা সহজ 'V' আঁকিয়া, সকলকে বল বোর্ডের দিকে না তাকাইয়া কেবল আয়নার ছায়া দেখিয়া তাহার উপর দাগ বুলাইতে! বিশেষত যাঁহারা খুব ভাল 'ড্রয়িং' জানেন বলিয়া প্রশংসা পান তাঁহাদের ধরিয়া এই সামান্য কাজে লাগাইয়া বেশ জব্দ করিতে পার।

এবারে আর একটা মজার কথা বলিয়া শেষ করিব। বারো আঙুল লম্বা দুখানি ঝাঁটার কাঠিকে মোড়াইয়া দুটি ইংরাজি 'V' তৈয়ারি কর। তারপর আর-একটি লম্বা কাঠির উপর তাহাদের চড়াইয়া, একখানা সমান ব্লটিং বা অন্য কোন খস্‌খসে কাগজের উপর ধরিয়া রাখ। A-দুটি যেন ভিতরের দিকে হেলিয়া থাকে। হাতটাকে একেবারে আলগা রাখিও যেন কিছুর উপর ভর করিয়া

না থাকে। তাহা হইলে দেখিবে আস্তে আস্তে ঝাঁটার কাঠি দুইটা কাছাকাছি আসিতেছে। তোমার হাত যতই কাঁপিবে, সে কাঁপুনি যতই সামান্য হোক না কেন, কাঠিটা ততই কাগজের ঘষায় ঘষায় ভিতরদিকে সরিতে থাকিবে।

আজব জীব

কি ভাই সন্দেশ, বড় যে দেখেও দেখছ না? আমায় চেন না বুঝি? তোমার ঘরের কাছেই আমায় কত দেখেছ তবু পরিচয় জান না? আচ্ছা তাহলে পরিচয় দেই।

আমায় এখন যেরকম দেখছ আগে কিন্তু সেবকম ছিলাম না। এখন কেমন দু পায়ে ভর দিয়ে চলে বেড়াই; তখন অন্য অন্য জন্তুরা যেমন চার পায়ে চলে আমিও তেমনি করে চলতাম। তোমাদের এই ডাল ভাত মাছ মাংস এসব কিছুই খেতে পাবতাম না। তখন আমার পায়ে একরকম ধাতুর তৈরি বেড়ি আটকান ছিল, হাতেও সেইরকম ছিল।

আমাদের বাসা তুমি দেখেছ—কেমন অদ্ভুত বল দেখি? খানিকটা কাঠ আর পোড়ামাটি, লোহা বালি আর মাটির গুঁড়ো, এইরকম সব জিনিস দিয়ে আমরা বাসা বানাই। বাসায় ঢুকবার আর বের হবার জন্যে, আলো আর বাতাস আসবার জন্যে বাড়ির গায়ে নানা জায়গায় ফাঁক থাকে, ইচ্ছা করলে সে ফাঁকগুলো বন্ধ করে দেওয়া যায়।

আমরা অনেকরকম জিনিস খাই। নানারকম ফলমূল শিকড়, এ সব ত খাই-ই, তার উপর আমাদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে নানারকমের ঘাসের বীজ। আমরা সেইসব যত্ন করে সংগ্রহ করে তা থেকে কতরকমের যে খাদ্য বানাই, শুনলে অবাক হবে। একরকম জন্তু আছে, আমরা তার দুধ খেতে খুব ভালোবাসি। তাই অনেক সময়ে সেইরকম জন্তু ধরে এনে আমাদের বাড়িতে বেঁধে রাখি। একরকম গাছ হয় দেখতে অনেকটা বাঁশের মতো, আমরা তাব থেকে রস বার করে সেই রস জমিয়ে খেতে খুব ভালোবাসি।

আমরা কি পারি জান? কোন কোন ফলে লম্বা লম্বা আঁশ থাকে, সেই আঁশের জট ছাড়িয়ে আঁশগুলোকে পাকিয়ে তা থেকে আমরা নানারকম জাল বুনি। অন্যান্য আঁশাল জিনিস থেকেও এরকম জাল বোনা যায়। পোকার বাসা, জানোয়ারের লোম, কতরকম জিনিস থেকে যে আঁশ সংগ্রহ হয়, আমিও তার সব খবর জানি না। এই আমার গায়ে দেখ না কতরকম জালের টুকরা জোড়া দিয়া আমার মা কেমন সুন্দর গা ঢাকনি বানিয়েছেন। এইরকম জালের মধ্যে চাপ চাপ আঁশ ভরে তার উপর শুতে যা আরাম!

আমাদের মধ্যে নানারকম অদ্ভুত প্রথা দেখতে পাওয়া যায়। যারা আমাদের চাইতে বড় তাদের সঙ্গে দেখা হলে আমরা সামনের দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে দুটো হাত একসঙ্গে ওঠাই ও নামাই—না হয় মাটি পর্যন্ত হাত নামিয়ে একেবারে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ি। কেন করি তা আমি বলতে পারি না।

কি বললে? তবু চিনতে পারছ না? ভাবছ আমি কোথাকার অদ্ভুত জীব? তা নয় গো তা নয়। আমি আফ্রিকার হটেন্‌টট্‌ও নই, মালয় দেশের বনমানুষও নই, আমি নিতান্তই তোমাদের বাঙালির ঘরের ছেলে—সন্দেশের পাঠক। পরিচয়টা ভুল হয়েছে বলছ? আর একটিবার মন দিয়ে পড়ে দেখ, আগাগোড়া সমস্তই ঠিক বলা হয়েছে দেখতে পাবে।

সূর্যের রাজ্য

সূর্য নানারকমে আমাদের পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব করে। পৃথিবীর গতির একটা কেমন ঝোঁক আছে, সে যদি কোনরকম সুবিধা পাইত তবে নিশ্চয়ই ছুটিয়া পথছাড়া হইয়া কোথায় সরিয়া পড়িত। কিন্তু তাহা হইবার যো নাই; সূর্যের আকর্ষণীশক্তি তাহাকে বেশ মজবুত করিয়া টানিয়া রাখিয়াছে এবং পৃথিবীও অগত্যা বাধ্য হইয়া সূর্যের চারিদিকে ঘোরপাক খাইতেছে। পৃথিবী ছাড়া আরও কতকগুলি প্রকান্ড গোলক সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। এইগুলিকে গ্রহ বলে। এই গ্রহগুলির মধ্যে আবার কয়েকটি সঙ্গী বা উপগ্রহ আছে। এই উপগ্রহগুলির কাজ গ্রহের চারিদিকে ঘোরা। যেমন পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ। এইসকল গ্রহ, উপগ্রহ এবং অনেক উল্কা ও ধূমকেতু ইত্যাদি লইয়া সূর্যের রাজ্য।

রাজ্যের কর্তা সূর্য; সুতরাং তাহার খবরটা আগে লওয়া আবশ্যক। আমরা এখান হইতে সূর্যকে একটা উজ্জ্বল গোলার মতো দেখি। আর সেটা যে নিতান্ত ঠান্ডা নয়, তাহাও বেশ বুঝিতে পারি। সূর্য এখান হইতে নয় কোটি মাইলেরও বেশি দূরে; কিন্তু এত বড় সংখ্যা আমাদের কল্পনায় আসে না। আলো এত দ্রুত চলে যে, এক সেকেন্ডে সাতবার পৃথিবীর চারিদিকে পাক দিয়া আসিতে পারে। কিন্তু তবু সূর্যের আলো পৃথিবীতে আসতে সাড়ে সাত মিনিট সময় লাগে! সূর্যটা যে খুবই মস্ত, তাহা না বলিলেও চলে। তের লক্ষটা পৃথিবী একত্র করিলে তবে সূর্যের সমান বড় একটা গোলক তৈয়ারী হইতে পারে।

আমরা সূর্যের যতটুকু দেখি, উহাই তাহার সমস্ত নহে। উহা ছাড়া তাহার চতুর্দিকে জ্বলন্ত বাষ্পের একটা আবরণ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আছে; কিন্তু সেটা তত উজ্জ্বল নহে বলিয়া সূর্যের প্রখর তেজে আমরা তাহার কিছুই দেখিতে পাই না। সূর্যের যখন পূর্ণ গ্রহণ হয়, অর্থাৎ চন্দ্র যখন সূর্যের ও আমাদের পৃথিবীর মাঝে আসিয়া সূর্যকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলে, তখন এই বাষ্পীয় আবরণ অতি চমৎকার দেখা যায়। এইজন্যে জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতরা পূর্ণ গ্রহণ দেখিবার সুযোগ ছাড়েন না। আজকাল বর্ণবীক্ষণ যন্ত্রের (Spectroscope) সাহায্যে দিবালোকেই এ সকল বিষয়ের চর্চা করা সম্ভব হইয়াছে। সূর্য যেরূপ প্রচন্ড তেজে জ্বলিতেছে, তাহা আমাদের কল্পনা করা অসম্ভব। তাহার গরমের তুলনায় আমাদের কয়লার আগুন ত ঠান্ডা! সেখানে আগুনের ঝড় ঘূর্ণীপাকের মতো অনবরত ঘুরিতেছে। সেই ফুটন্ত সমুদ্র তোলপাড় করিয়া অবিশ্রান্ত অগ্নিপ্রবাহ চলিতেছে। জ্বলন্ত শিখা চারিদিকে রক্তজিহ্বার ন্যায় লাফাইয়া উঠিতেছে এবং দেখিতে দেখিতে শতসহস্র মাইল ছড়াইয়া পড়িতেছে।

প্রধান গ্রহের সংখ্যা আটটি; চারিটি বড়, আর চারিটি ছোট। আমাদের পৃথিবী কনিষ্ঠ গ্রহের মধ্যে গণ্য। সূর্যের নিকটতম গ্রহের নাম বুধ, তাহার পর শুক্র, তাহার পরে পৃথিবী, তাহার পরে মঙ্গল—এই চারিটিই ছোট গ্রহ। ইহার মধ্যে পৃথিবীই সর্বাপেক্ষা বড়; শুক্র প্রায় পৃথিবীর সমান, মঙ্গল পৃথিবীর আট ভাগের এক ভাগ এবং বুধ পৃথিবী ও চন্দ্রের মাঝামাঝি। মঙ্গল সকল সময় সূর্যের কাছে কাছেই ফিরে, সুতরাং তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া সচরাচর ঘটে না। শুক্র অথবা 'শুকতারা' যখন সূর্যোদয়ের পূর্বে পূর্বদিকে অথবা সূর্যাস্তের পশ্চিমদিকে ঝলমল করিতে থাকে তখন তাহার উজ্জ্বল জ্যোতির কাছে সকল গ্রহ নক্ষত্রই ম্লান বোধ হয়। শুধু চোখে মঙ্গল গ্রহকে একটা লালচে রঙের তারার মতো বোধ হয়। এই গ্রহের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য কথা জানিবার আছে। ইহার উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর কাছে সাদা বরফ দেখা যায় এবং সেই বরফ গ্রীষ্মকালে কমে ও শীতকালে বাড়ে, সুতরাং মঙ্গলে জল আছে, এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া এই গ্রহের

গায়ে খুব সরু সোজা সোজা লম্বা লম্বা অনেক দাগ দেখা যায়। এই দাগগুলি এলোমেলোভাবে ছড়ান নাই; বরং ইহা দেখিয়া স্বভাবতঃই মনে হয়, ঐ লম্বা রাস্তার মতো জিনিসগুলি ইচ্ছাপূর্বক বুদ্ধি খাটাইয়া নির্মান করা হইয়াছে। ইহা হইতে অনেকে অনুমান করিতেছেন যে, মঙ্গলে বুদ্ধিমান জীব থাকা সম্ভব, হয়ত তাঁহারা জলের সুবন্দোবস্তের জন্য বড় বড় খাল কাটিয়াছেন, সেই খালের দুধারে গাছপালা হওয়ায় আমরা সেগুলিকে লম্বা লম্বা রেখার মতো দেখি। মঙ্গলের দুটি চাঁদ আছে, সেগুলি এতই ছোট যে, খুব বড় দুরবীক্ষণ ছাড়া তাহাদের দেখাই যায় না। ইহার একটি এত তাড়াতাড়ি মঙ্গলের চারিদিকে ঘুরিয়া আসে যে, মঙ্গলের এক দিনে (সাড়ে চব্বিশ ঘণ্টায়) তাহার দুইবার উদয় ও দুইবার অস্ত হয়। মঙ্গলের পর অনেকগুলি খুব ছোট ছোট গ্রহ আছে, সেগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। এই গ্রহগুলির পরেই বৃহস্পতি।

বৃহস্পতি ইহাদের মধ্যে প্রধান। ইহার আয়তন প্রায় সাড়ে বারো শত পৃথিবীর সমান। এ পর্যন্ত ইহার সাতটি চাঁদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু সাধারণ দুরবীক্ষণে চারিটির বেশি দেখা যায় না। এই চারিটি চন্দ্রই আমাদের চাঁদের চাইতে বড়। বৃহস্পতি খুব বড় হইলেও এত তাড়াতাড়ি ঘুরে যে, প্রায় দশ ঘণ্টায় তাহার এক দিন হয়। এত তাড়াতাড়ি ঘোরার দরুণ তাহার মাঝখানটা বেশ ফুলিয়া উঠিয়াছে, সুতরাং বৃহস্পতিকে গোল না দেখাইয়া কতকটা বাদামী ধরনের দেখায়। বৃহস্পতির গায়ে সকল সময়েই কাল মেঘের মতো টান দেখা যায়।

বৃহস্পতির পরেই শনি। ইহা আয়তনে বৃহস্পতির অর্ধেক। এই গ্রহের একটা আশ্চর্য বিশেষত্ব এই যে, ইহার চারিদিকে একটা আংটির মতো কি দেখা যায়। "আংটি"টা বেশি পুরু নয়, কিন্তু খুব চওড়া। ভাল দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে দেখা যায়, আংটিটার মাঝে মাঝে ফাঁক আছে, যেন কয়েকটা আংটি পর পর একটার ভিতর আরেকটা সাজান রহিয়াছে। এ পর্যন্ত ইহার দশটি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কয়েকটি আমাদের চন্দ্রের অপেক্ষাও বড়।

এ পর্যন্ত যে গ্রহগুলির কথা বলা হইল, ইহার সকলগুলিই শুধু চোখে বেশ উজ্জ্বল দেখায়। সেইজন্য অতি পুরাতন কাল হইতেই মানুষ ইহাদের কথা জানে। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে সার্ উইলিয়াম হার্শেল তাঁহার স্বহস্তনির্মিত দূরবীক্ষণের সাহায্যে এক নূতন গ্রহ আবিষ্কার করেন। তাহার নাম রাখা হইল ইউরেনাস্। ইউরেনাস্ আয়তনে শনি অপেক্ষা ছোট এবং এ পর্যন্ত ইহার চারটি চন্দ্র আছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ইউরেনাসের আবিষ্কারের পর দেখা গেল যে, তাহার গতিবিধির মধ্যে একটা কেমন গোলমাল আছে। গণনার যে সময়ে ইউরেনাসের যে স্থানে থাকিবার কথা, উহা ঠিক স্থানে থাকেন না। ইহা হইতেই গণনা করিয়া দুইজন পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ইউরেনাসের বাহিরে এক গ্রহ আছে, তাহারই আকর্ষণে ইহার চলাফিরার এরূপ ব্যাতিক্রম হয়। তাঁহারা গণিতের সাহায্যে নির্দেশ করিলেন যে, অমুক দিন, অমুক স্থানে দূরবীক্ষণ দিয়া খুঁজিলে গ্রহটিকে পাওয়া যাইবে। এইরূপে নেপচুনের আবিষ্কার হইল। নেপচুনের আয়তন ইউরেনাসের মতো। ইহার একটি চাঁদ আছে।

এই সকল গ্রহ উপগ্রহ ছাড়া সূর্যরাজ্যে কতকগুলি ধূমকেতু ও উল্কারাশি আছে। এই ধূমকেতুগুলির চালচলন দেখিয়া বোধ হয় যে, ইহারা বাস্তবিক এ রাজ্যের লোক নয়। বাহির হইতে আসিয়াছিল, এই রাজ্যের ভিতর দিয়া যাইতে গিয়া কি করিয়া সূর্যের টানে ধরা পড়িয়াছে। প্রতি বৎসরই কত ধূমকেতু সূর্যের রাজ্যের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়, তাহারা অধিকাংশ সহজেই সূর্যের হাত এড়াইয়া যায়, খালি কখনও দু-এক বেচারা নিতান্ত বেগতিক কোন গ্রহের কাছে গিয়া পড়ায় আর সামলাইয়া উঠিতে পারে না। তখন তাহারা বাধ্য হইয়া সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে।

সূর্য হইতে নেপচুনের দূরত্ব পৃথিবী হইতে সূর্যের দূরত্বের একত্রিশ গুণ এবং সেই সুদূর প্রদেশেই এ রাজ্যের সীমা।

একটি বর

একটি অন্ধ ভিখারি রোজ মন্দিরে পূজা করতে যায়। প্রতিদিন ভক্তিভরে পূজা শেষ করে মন্দিরের দরজায় প্রণাম করে সে ফিরে আসে; মন্দিরের পুরোহিত সেটা ভাল করে লক্ষ করে দেখেন।

এইভাবে কত বৎসর কেটে গেছে কেউ জানে না। একদিন পুরোহিত ভিখারিকে ডেকে বললেন, "দেখ হে! দেবতা তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। তুমি কোন একটা বর চাও। কিন্তু, মনে রেখো,—একটিমাত্র বর পাবে।"

ভিখারি বেচারা বড় মুস্কিলে পড়ল। কি চাইবে, কিছুতে আর ঠিক করতে পারে না। একবার ভাবল, দৃষ্টি ফিরে চাইবে; আবার ভাবল, টাকাকড়ি চাইবে; আবার ভাবল, আত্মীয়স্বজন ছেলেপিলে দীর্ঘ জীবন এইসব চাইবে কিছুতেই আর ঠিক করতে পারে না। তখন সে বলল, "আচ্ছা, আমি কাল ভাল করে ভেবে এসে বর চাইব। এখন কিছুতে ঠিক করতে পারছি না, কি চাই।"

অনেক ভেবেচিন্তে সে মনে মনে একটা ঠিক করে নিল। তারপর মন্দিরে গিয়ে পুরোহিতকে বলল, "পুরুত ঠাকুর! আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি;—আপনি আমার বড় উপকার করলেন। যে একটি বরের কথা বলেছেন সেটি এখন আমি চাইব;—মনে রাখবেন, একটিমাত্র বর আমি চাচ্ছি। আমি এই বর চাই যে মরবার আগে যেন আমার নাতিকে ছয়তলা বাড়ির মধ্যে বসে সোনার থালায় পায়স খেতে স্বচক্ষে দেখে যেতে পারি।"

এই এক বরে ভিখারি চোখের দৃষ্টি ফিরে পেল ধনজন পেল, ছেলেপিলে, নাতিনাতনি পেল, দীর্ঘজীবন পেল।

ব্যাঙের সমুদ্র দেখা

(জাপানী গল্প)

গ্রামের ধারে কবেকার পুরান এক পাতকুয়োর ফাটলের মধ্যে কোলাব্যাং তার পরিবার নিয়ে থাকত। গ্রামের মেয়েরা সেখানে জল তুলতে এসে যেসব কথাবার্তা বলত কোলা ব্যাঙ তার ছেলেদের সেইসব কথা বুঝিয়ে দিত—আর ছেলেরা ভাবত 'ইস্!' বাবা কত জানে!'

একদিন সেই মেয়েরা সমুদ্রের কথা বলতে লাগল। ব্যাঙের ছানারা জিজ্ঞাসা করল—"হ্যাঁ বাবা! সমুদ্র কাকে বলে?" ব্যাঙ খানিক ভেবে বলল, "সমুদ্র? সে একরকম জন্তুর নাম।" তখন একটা ছানা বলল—"ওরা যে বলছিল সমুদ্র খুব ভয়ানক বড় হয়, আর তার মধ্যে অনেক অনেক জল থাকে—আর লোকেরা সাঁতর কেটে তা পার হতে পারে না।" তখন কোলা ব্যাঙ মুশকিলে পড়ল। সে গাছপালা দেখেছে, বাড়িঘর দেখেছে—মানুষ কুকুর ঘটি বাটি নানারকম জিনিসপত্র সব দেখেছে, আর ছেলেবেলায় অনেকরকম জিনিসের গল্প শুনেছে। কিন্তু সমুদ্রের কথা ত কখন শোনেনি! তখন সে ভাবল সমুদ্রের কথা একটু খোঁজ করে দেখতে হবে।

পরদিন সকালে উঠেই কোলা ব্যাঙ তার ছাতা পোঁট্‌লা নিয়ে বলল, "আমি সমুদ্রের সন্ধান

করতে যাচ্ছি।" তার গিন্নী কত কাঁদল, ছেলেরা নানারকম সুর করে তাকে বারণ করল কিন্তু কোলা ব্যাঙ বলল, "না, এতে আমার জ্ঞানলাভ হবে—তোমরা বাধা দিও না।" এই বলে সে পাতকুয়ো থেকে উঠে একটা মাঠের দিকে চলল। ব্যাঙ বাইরে এসেই দেখল মানুষ কুকুর গরু তারা কেউ তার মতো লাফিয়ে চলে না—তাই দেখে সে ভাবল 'লাফিয়ে চললে সবাই আমায় বেকুব ভাববে।' এই ভেবে সে হেঁটে হেঁটে চলতে লাগল। কিন্তু অমন করে চলে ত তার অভ্যাস নেই—খানিক দূর গিয়েই তার ভারি পরিশ্রম বোধ হল।

মাঠের ওপারে আর এক গ্রামের কাছে এক গর্তের মধ্যে মেটে ব্যাঙদের বাসা ছিল। মেটে ব্যাঙেরাও সমুদ্রের কথা শুনেছে, তাই তাদের মধ্যে একজন বেরিয়েছে সমুদ্রটা দেখতে। মাঝপথে দুই ব্যাঙের দেখা হল। কোলা ব্যাঙ বলল, "আমি ফাটলকুয়োর কোলা ব্যাঙ, যাচ্ছি সমুদ্রে।" মেটে ব্যাঙ বলল, "আমি মেঠো-মাটির ব্যাঙ, আমিও যাচ্ছি সমুদ্রে।" তখন তাদের ভারি ফূর্তি হল।

কিন্তু সমুদ্রে যাবার পথ ত তারা জানে না। মাঠের মধ্যে একটা মস্ত ঢিপি ছিল; মেটে ব্যাঙ বলল, "ওর উপরে উঠে দেখি ত কিছু দেখা যায় কিনা।"

এই বলে তারা অনেক কষ্টে সেই ঢিপির উপর চড়ে সেখান থেকে একটা গ্রাম দেখতে পেল। মেটে ব্যাঙ বলল, "আরে দূর ছাই! এরকম ত ঢের দেখেছি! আমার বাড়ির কাছেই ত অমন আছে।" কোলা ব্যাঙ বলল, "তাই ত! আমিও ছেলেবেলা থেকে ওরকম কত দেখেছি। সব জায়গাই দেখছি একরকম। মিছামিছি আমরা হেঁটে মরলাম।"

তখন তারা ভারি বিরক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গেল। কোলা ব্যাঙ তার ছানাদের বলল, "সমুদ্র টমুদ্র কিছু নেই—ওসব মিছে কথা!"

মানুষের বাসা

এক এক দেশের মানুষ, তার এক এক রকম ঢং।

খাওয়া-পরা, চলন-চালন, আদবকায়দা, সবটাতেই তার আলাদা রকম। ঘিয়ে ভাজা লুচি বা মিঠাই তোমার মুখে বেশ রোচে; কিন্তু বর্মার লোককে ঘিয়ের জিনিস খেতে দাও, সে ওয়াক্ থু করে বমি করতে চাইবে। আর সে যদি উল্টে তার প্রিয় খাদ্য ঙাপ্পি (অর্থাৎ মাটিতে পোঁতা পচা মাছ) এনে তোমায় খাওয়াতে চায় তা হলে তোমার দুরবস্থা হবে তার চাইতেও বেশি। ব্যাঙের ঠ্যাং, আরসোলার আচার, ফড়িং ভাজা বা কেঁচোর চচ্চড়ি তোমায় দিলে, অমনি তুমি ঘেন্নায় নাক সিটকাবে; কিন্তু এমনও দেশ আছে যেখানে লোকে এসব জিনিসও আদর করে খায়। দু'জন পরিচিত লোকের সাক্ষাৎ হলে আমাদের দেশে দু'হাত তুলে নমস্কার করে, বিলাতে হাত বাড়িয়ে 'হ্যান্ডশেক' করে, চীনমুলুকে বুকের কাছে হাতটি রেখে মাথা নুইয়ে 'কৌ তৌ' করে, আর কেউ কেউ আছে তারা এগিয়ে আসে নাকে নাক ঘষবার জন্য।

সব বিষয়েই যখন এত তফাত তখন বাড়ি বানাবার কায়দাটাও যে নানারকমের হবে, সেটা কিছুই আশ্চর্য নয়। হাতের কাছে মানুষ যে সব মালমশলা পায় সাধারণত তাই দিয়েই সে বাড়ি বানায়। এই মালমশলার তফাতেই যে বাড়ি-ঘরের কত রকমাবি হয় তার আর অন্ত নেই। আমাদের এই ভিজে জমির দেশে নরম মাটিরও অভাব নেই, বাঁশঝাড়েরও অভাব নেই; সুতরাং বাঁশের বেড়া আর কাদার প্রলেপ, তার উপরে খড়ের চালা—এই হচ্ছে আমাদের দেশে বাড়ি বানাবার

সাধারণ রীতি। কত যুগ যুগান্তর ধরে যে এ দেশের মানুষ এমনি কায়দায় বাড়ি বানিয়ে আসছে তা কে বলতে পারে?

কোন আদিমকালে মানুষের পূর্বপুরুষ নাকি গাছের ডালে আর পাহাড়ের গুহার মধ্যে বাসা করত। আজও নিউ-গিনিতে গিয়ে দেখ, সেখানকার লোকেরা গাছের ডালে ঘর বানিয়ে তার মধ্যে বসবাস করছে। তাদের ঘরে ঢুকতে হলে লম্বা লম্বা মই লাগিয়ে গাছের আগায় চড়তে হয়। এশিয়া মাইনরে কাপাডোসিয়ার পাহাড়ে গিয়ে দেখ, উইটিপির মতো চুড়োওয়ালা পাহাড়ের গায়ে ফোকর কেটে মানুষ সব ঘরবাড়ি তৈরি করেছে। কত পুরুষ ধরে যুগের পর যুগ মানুষ সেখানে বাস করে আসছে। কেবল থাকবার মতো ঘর কেটেই তারা সন্তুষ্ট হয়নি, পাহাড় খুদে খুদে কত রকমের কত কারুকার্য করে তারা ঘরগুলিকে সুন্দর করে তুলবার চেষ্টা করেছে। তারই মধ্যে আবার এখানে সেখানে একালের মানুষ এসে একালের কায়দায় দালান ইমারত গেঁথে তুলেছে।

উত্তরমেরুর কাছে এস্কিমোদের দেশে গাছপালা নেই, নরম মাটিরও খুবই অভাব। সেখানে আছে খালি চাপচাপ বরফ আর মাঝে মাঝে পাথরের স্তূপ। তাই দিয়ে আর জানোয়ারের চামড়া দিয়ে এস্কিমোরা বাড়ি বানায়। গ্রীষ্মকলে যেমন তেমন চামড়ার ছাউনি হলেই চলে, কিন্তু শীতকালে ঘরগুলিকে রীতিমত বরফের ইট বানিয়ে মজবুত করে গড়তে হয়। ঘরগুলির চেহারা হয় ঠিক যেন গম্বুজের মতো। একে মেরু দেশের শীত, তার উপর বরফের বাড়ি!—শুনতে মনে হয় না জানি সে বাড়ি কী অসম্ভব ঠাণ্ডা। কিন্তু বাইরের কন্‌কনে ঠাণ্ডার তুলনায় বরফ-ঘরের ভিতরকার ঠাণ্ডা কিছুই নয়। সে দেশে মাসের পর মাস যখন রাত্রি চলে, সেই হচ্ছে শীতের সময়। শীত পড়বার আগে থেকে তারা নানারকম শিকারের মাংস সংগ্রহ করে ঘরের কাছে বরফ গাদার নিচে পুঁতে রেখে দেয়। সারাটা শীত তারা ঘরের মধ্যে শুয়ে বসেই কাটিয়ে দেয়। সে দেশে তরিতরকারি
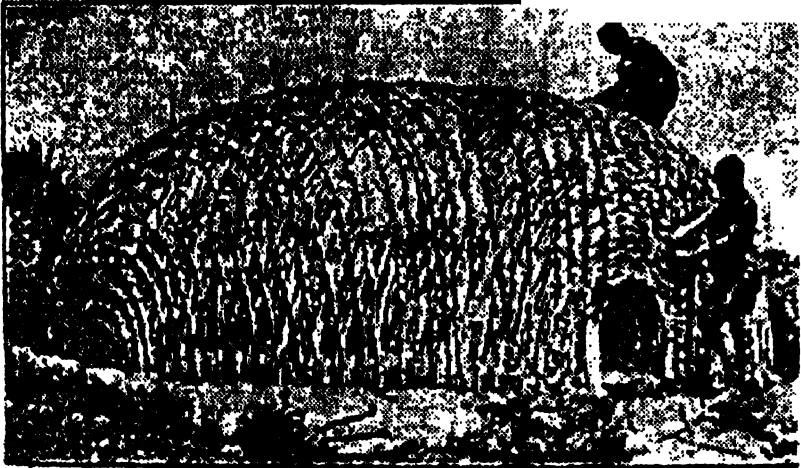
জুলুরা বাড়ি বুনছে

মেলে না; কাজেই তাদের আমিষ খেয়েই থাকতে হয়। আমরা যেমন মেটে ঘর বানাই, আফ্রিকা দেশের মাসাইরাও দের তেমনি মেটে ঘর বানায়। কিন্তু তাদের বানাবার কায়দা একেবারেই অন্যরকম। খালি কতকগুলো মাটির দেওয়াল, তার গায়ে ফোকর কাটা, আর উপরে কোনও রকমের একটুখানি গাছের ডালপালা আর মাটির আস্তর দিয়ে ঢাকা। সে দেশে বোধ হয়

বৃষ্টিবাদলের অত্যাচার নাই। আমাদের দেশে হলে অমন বাড়ি দু'দিনে ধুয়ে গলে সাফ হয়ে যেত। এঁদের অলঙ্কারের মধ্যে প্রধান অলঙ্কার হচ্ছে লোহার তার। সেইগুলো গলায় জড়িয়ে এঁরা সাজসজ্জার চূড়ান্ত করে বসে থাকেন। এই অলঙ্কারগুলি তাদের এমনি প্রিয় যে সে দেশের সাহেব বাসিন্দারা বাড়ির চারদিকে তারের বেড়া দিতে ভরসাই পায় না। মাসাইরা রাত্রে এসে অলঙ্কারের জন্য সে তার চুরি করে নেয়। এমন কি, টেলিগ্রাফের তার পর্যন্ত সে দেশে মাইলকে মাইল চুরি হতে দেখা গিয়েছে।

মাসাইদের দেশ ছেড়ে আর খানিক দক্ষিণে গেলেই জুলু আর বেচুয়ানার নিগ্রোদের বাড়ি। বেচুয়ানার ঘরগুলি ঠিক যেন ঘেরাটোপ দেওয়া ছাতার মতো, তার আগায় আবার মন্দিরের টিকির মতো চুড়ো দেওয়া। সে দেশের লোকেরা তাদের বাড়িগুলিকে ঝেড়ে মুছে ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার করে রাখে। দূর থেকে সে দেশের গ্রামগুলি যেমন সুন্দর দেখায় আর কোনও নিগ্রো জাতির গ্রাম সে রকম দেখায় কি না সন্দেহ।

সকলের শেষ একটি ছবিতে জুলুদের বাড়ি তৈরি দেখানো হয়েছে। এ বাড়িগুলি বড় বড় ধামার মতো বুনে বুনে তৈরি করতে হয়। বেতের বুনট করা বাড়ি, তার উপর চমৎকার ঘাসের ছাউনি। এরা বাড়ির আশেপাশে লম্বা লম্বা থামের আগায় নানারকম অদ্ভুত মূর্তি সাজিয়ে রাখে। কোনওটা ভূত তাড়াবার জন্য, কোনওটা দুষ্টু শত্রুদের জাদু করে জব্দ করবার জন্য, আর কোনওটাতে কেবল তাদের ইতিহাস আর বংশ পরিচয়। জুলুরা খুব শিকারী জাতি, তাই শিকার করা জন্তুর মাথা আর ছাল তাদের ঘরে বাইরে ঝোলানো থাকে। তার মধ্যে মাঝে মাঝে দুটো একটা মানুষের মাথাও কি না থাকে সে কথা বলতে পারি না।

আমরা মানুষের নানারকম বাসার অতি সামান্যই কিছু নমুনা দিলাম। আর কত রকমের বাসা আছে সে সবের কথা বলাই হ'ল না। সেই যারা বারোমাস নদীতে থাকে, যাদের নৌকাই ঘর আর নৌকাই বাড়ি; সেই কতরকম যাযাবর বা বেদে, জাত, যারা বারোমাস এখানে সেখানে তাঁবু খাটিয়ে সারাজীবন ঘুরে বেড়ায়; সেই প্রাচীনকালের বিলবাসীরা, যারা ডাঙা ছেড়ে জলের মধ্যে মাচা বেঁধে বাড়ি বানাত; তাদের কথা বলতে গেলে এবারে আর কুলাবে না।

অদৃশ্য শত্রু

কথায় বলে, 'বলে নারি, কলে মারি'। অর্থাৎ গায়ের জোরে যাকে মারতে না পারি, তাকে কল-কৌশলে মারি। এ কথা মানুষের খুবই সাজে, কারণ মানুষ কল-কৌশল দিয়ে পৃথিবীর সব শক্তিকে জয় করেছে। সামান্য পশুপাখি তো দূরের কথা;—আগুন, বিদ্যুৎ, জল, বাতাস, এই সবের শক্তিকে মানুষ অনায়াসে কাজে লাগাচ্ছে।

কিন্তু, এত বাহাদুরির মধ্যেও মানুষ ছোটর কাজেই জব্দ হচ্ছে। সামান্য কীটপতঙ্গ রোগের বাহন হয়ে মানুষকে যেমন জব্দ করেছে আর করছে, এমন আর কিছুতেই পারেনি। মানুষের এত বুদ্ধি, এত ক্ষমতা, কিন্তু সামান্য কীটপতঙ্গের উৎপাত দূর করা তার পক্ষে এক বিষম সমস্যা হয়েছে। তোমরা অনেকেই জান যে, মশা ম্যালেরিয়া আনে। মশার রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণু থাকে; এই জীবাণু মশার কামড়ের সঙ্গে আমাদের রক্তে মিশে যায়। জীবাণুর একটা বদঅভ্যাস আছে যে, সে তাড়াতাড়ি সংখ্যায় বেড়ে যেতে থাকে। দেখা যায় যে একটা জীবাণু কোনও রকমে শরীরে প্রবেশ করতে পারলে, তার থেকে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই হাজার হাজার জীবাণু

জন্মাতে পরে। ছবিতে একটা জীবাণুকে খুব বড় করে দেখানো হয়েছে, (আসলে, জীবাণু চোখে দেখা যায় না)। বাঁয়ে তার প্রথম অবস্থা দেখ—যেন ঠিক একটি বল। কিছুক্ষণ বাদে তার চেহারা একটা পান্তুয়ার মত লম্বা হয়ে গেল। তারপর দেখ, মাঝখানটা সরু হয়ে গেল;—তারপরে সেটা ভেঙ্গে দুটো জীবাণুর সৃষ্টি হলো। এই দুটো জীবাণু আবার ঠিক ওইভাবে ভেঙে ৪টা হয়ে গেল।
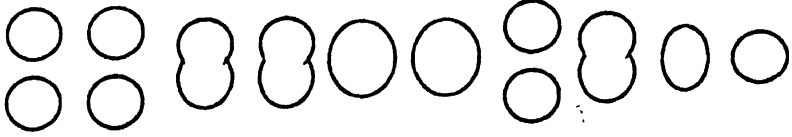
একটি জীবাণু ভেঙে চারটে হল

এই পরিবর্তন হতে এক ঘন্টার বেশি সময় লাগেনি। এখন ভেবে দেখ, সকালে কারও রক্তে যদি একটা জীবাণু ঢোকে, দুপুর বেলার মধ্যে তার শরীরে কতগুলি জীবাণু জন্মাবার সম্ভাবনা হয়। প্রথম ঘন্টার শেষে ৪টা জীবাণু; দ্বিতীয় ঘন্টার শেষে ৪×৪=১৬; তৃতীয় ঘন্টার শেষে ১৬×৪=৬৪; চতুর্থ ঘন্টার শেষে ৬৪×৪=২৫৬; পঞ্চম ঘন্টার শেষে ২৫৬×৪=১০২৪; ষষ্ঠ ঘন্টার শেষে ১০২৪×৪= ৪০৯৬! এইভাবে বেড়ে চললে একদিনে কী অবস্থা ভেবে দেখ!

ম্যালেরিয়ার বাহন যে মশা তার নাম 'এনোফিলিস্'। আরেক জাতের মশা আমেরিকায় আছে, তার নাম 'স্টেগোমিয়া'। এই 'স্টেগোমিয়া' মশা ভীষণ 'হলদে-জ্বর'-এর (Yellow fever) বাহন। আমেরিকার পানামা খাল যখন প্রথম কাটা শুরু হয় তখন এই 'হলদে-জ্বর' এর উপদ্রবে শত

ঘুম-রোগের মাছি

প্লেগের পিষু

শত মজুর, কারিগর, ইঞ্জিনিয়ার অল্পদিনের মধ্যেই মারা যান। তার ফলে, বহু বৎসর এই পানামা খাল কাটার কাজই বন্ধ ছিল। পরে, ডাক্তারেরা অনেক পরীক্ষা করে বের করেন যে, 'স্টেগোমিয়া' মশাই এই হলদে জ্বরের বাহন;—এর কামড়েই হলদে জ্বর হয়। পণ্ডিতেরা দেখলেন, এই মশাকে মারা যত সহজ, তার থেকে সহজ হচ্ছে 'জলের পোকা' (Larva) অবস্থায় থাকার সময়ে সেই

পোকাকে মারা;—কারণ, জলে কেরোসিন ফেলে দিলে, কিংবা অন্য কোন কোন জিনিস জলে মিশিয়ে দিলে জলের পোকার মৃত্যু নিশ্চয়। এইভাবে খাল-ডোবা সব তাঁরা মশাশূন্য করলেন। তারপর ঝোপ-জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করালেন। তার ফলে সেই দেশ হলদে জ্বরের হাত থেকে রক্ষা পেল; পানামা খালও নির্বিঘ্নে কাটা হয়ে গেল।

আফ্রিকার উগান্ডা দেশের 'ঘুম-রোগ' (Sleeping sickness) বড় মারাত্মক। এর হাত থেকে বাঁচা বড়ই কঠিন। এই রোগের বাহনও এত রকমের মাছি। এই মাছি সেই দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ আর গরু-ঘোড়ার প্রাণ নাশ করেছে। সেই দেশের লোকের পক্ষে এই মাছির কামড় তত মারাত্মক হয় না, কিন্তু বিদেশির পক্ষে এই মাছির কামড় একেবারে মারাত্মক। এই মাছির একটা ছবি বড় আকারে দেওয়া হল। মাছি কেবল রোগের বাহন;—রোগের কারণ হলো এক জাতের জীবাণু। ইঁদুরকে আমরা প্লেগ-রোগের বাহন বলি, কিন্তু, ইঁদুর নিজে প্লেগের বাহন নয় তার গায়ে এক রকমের পিষু-পোকা জন্মায়, তারই শরীরে প্লেগের জীবাণু থাকে। এই পিষু ইঁদুরকে কামড়ালে ইঁদুরের প্লেগ হয়। একটা পিষুর ছবি খুব বড় আকারে দেওয়া হয়েছে। এর চেহারাটাও দেখতে ভয়ানক-গোছেরই। জীবাণু যে কেবল পোকার কামড়ের থেকেই আমাদের শরীরে আসে তা' নয়। মাছিরা নোংরা জায়গায় বসে শরীরে অনেক জীবাণু বয়ে এনে খাবারে, বাসনে, কাপড়ে ছড়িয়ে দেয়; বাতাসে কত জীবাণু ভেসে এসে নিঃশ্বাসে নাকে যায়, খাবারে পড়ে; বেড়াল, কুকুর প্রভৃতি কত জন্তুর শরীরে জীবাণু থাকে; রাস্তায় কতো নোংরার মধ্যে জীবাণু থাকে, সেগুলো আমাদের জুতোর সঙ্গে ঘরে চলে আসে;— এই রকম কত শত উপায়ে জীবাণুরা সর্বদাই আমাদের অনিষ্ট করবার আয়োজন করছে। সর্বদা পরিষ্কার থাকলে জীবাণুর হাত থেকে অনেকটা রক্ষা পাওয়া যায়। জীবাণু এত ছোট যে চোখে তা দেখা যায়ই না—ভাল অনুবীক্ষণ ছাড়া আর কিছুরই সাহায্যে দেখা যায় না। সব জীবাণুই যে মানুষের অনিষ্ট করে তা' নয়। অনেক জীবাণু আবার আমাদের কাজেও লাগে। দুধ থেকে যে দই হয়, সে এক রকম জীবাণুর সাহায্যে। আরও নানা রকম কাজেও জীবাণুর সাহায্য নেওয়া হচ্ছে—যেমন সিরকা তৈরি করায়, বার্লি থেকে মল্ট্ নামে একরকম উপকারী খাওয়ার-জিনিস তৈরি করায়, ইত্যাদি।

চীনে মাটির বাসন

এক সাহেবের একটি খুব দামি মাটির ফুলদানি ছিল—সেটা চীনদেশের তৈরি। একদিন সেই ফুলদানি কেমন করে জানি ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সাহেব বড় দুঃখ করতে লাগলেন। শেষটায় ফুলদানির টুকরাগুলি আস্তে আস্তে কুড়িয়ে নিয়ে যত্ন করে আঠা দিয়ে জোড়া দিয়ে, খুব সাবধানে বাক্সবন্দি করে চীন দেশে পাঠিয়ে দিলেন; সঙ্গে একখানা চিঠি লিখে দিলেন যে, ঠিক ওই রকমের আরেকটি ফুলদানি তাঁকে তৈরি করে দিতে হবে। কয়েক মাস বাদে চীন দেশ থেকে একটা বাক্স তাঁর কাছে এসে হাজির। সাহেবের আনন্দ আর ধরে না; তাঁর ফুলদানি এসেছে। কিন্তু খুলে যা দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষুস্থির। তিনি লিখেছিলেন ঠিক নমুনার মতন ফুলদানি বানাতে, তাই চীনে কারিগর নমুনার মতো ফুলদানি তৈরি করে পাঠিয়েছে—যেখানে যা ভাঙা বা ফাটার দাগ ছিল, যেখানে যেমন দোষ ছিল, সব অবিকল নকল করেছে!

ওপরের গল্পটি সত্যি বলে শোনা গেছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, চীনেমাটির বাসন বানাতে চীনেরা কত বড় ওস্তাদ। 'চীনে'-মাটি নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, ওই জিনিসের আদিস্থান চীন রাজ্যে। বাস্তবিকই চীনেরা প্রায় ১৭০০ বৎসর আগে চীনে মাটির বাসন বানাতে জানত। ইউরোপের লোক তখনও এ জিনিসের ব্যবহার শেখেনি; এর অনেক বৎসর পরে ইউরোপে চীনে বাসনের চল হয়েছে।

হাজার বৎসর আগে চীনেরা যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, যে উপায়ে চীনে মাটির বাসন বানাত, আজও সেই যন্ত্রপাতি দিয়ে সেই উপায়েই তারা কাজ করছে। এক 'চিন-তে-চেন' শহরেই প্রায় দু'লক্ষ লোক চীনেমাটির বাসনের কারখানায় অথবা দোকানে কাজ করে। সেখানে চীনে মাটিরই রাজ্য—চারিদিকে কুমোরের চাকা ঘড়ঘড় ঘুরছে, বাসন পোড়াবার উনুনের ধোঁয়া উঠছে, আর হাজারে হাজারে লোক বাসন তৈরি করছে। এক একটা রাস্তায় কেবলই চীনে-বাসনের দোকান।

শহরের কাছেই নদী, তার ওপারেই চীনেমাটির পাহাড়। সেখান থেকে ইটের মতো চাকতি কেটে নৌকা বোঝাই করে এপারে নিয়ে আসে। এই চাকতি ভেঙে গুঁড়ো করে, ছেঁকে নিয়ে, জলের সঙ্গে মিশিয়ে ঠাসা-ময়দার মতো তালপাকিয়ে নেয়। তারপর সেই তালপাকানো মাটির ওপর দাঁড়িয়ে, তাকে পা দিয়ে আচ্ছা করে ঠেসে নেয়। সেই ঠাসা মাটি নিয়ে কুমার তার চাকায় নানারকমের বাসন গড়ে। চীনে কুমারেরা বাসন গড়তে বড় ওস্তাদ। মোটা বাসন তাদের কাছে খেলার জিনিস;—ডিমের খোলার মতো পাতলা, এমন কি কাগজের মতো পাতলা বাসনও তারা বানাতে পারে! কাগজের মতো পাতলা কেবল পিরিচ কিংবা থালা ছাড়া আর কিছু বানানো যায় না।

বাসন গড়বার পর ওস্তাদ চিত্রকরেরা তার গায়ে নানারকম দাগ, নকশা কিংবা ছবি এঁকে দেয়। এই কাজের জন্য খুব ভাল কারিগর অনেক আছে, যারা অতি চমৎকার ছবি আঁকতে জানে। চেয়ারে বসে, হাঁটুর ওপর বাসনটি রেখে, তুলি দিয়ে এরা বেশ তাড়াতাড়ি ছবি আঁকে।

এরপর বাসনটিকে পোড়াবার বন্দোবস্ত করতে হয়। পোড়াবার উনুনে দেবার আগে, বাসনের গায়ে একটা পালিশের মসলা লাগাতে হয়। এই কাজটি করবার রকমটা একটু অদ্ভুত। বাসনটিকে একটা গোল টেবিলের ওপর বসানো হয়; সেই টেবিলটাকে আস্তে আস্তে পা দিয়ে ঘোরানো যায়। একজন কারিগর একটা পাত্রে করে পালিশের মসলা নিয়ে (মসলাটা জলের মতো তরল) একটা বাঁশের চোঙায় খানিকটা মসলা তার থেকে তুলে নেয়। তারপর বাঁশের চোঙায় ফুঁ দিয়ে, সেই মসলা বাসনের গায়ে লাগায় আর পা দিয়ে আস্তে আস্তে টেবিল সুদ্ধ বাসনটাকে ঘোরায়। এইভাবে সমস্তটা বাসনের গায়ে সমানভাবে মসলা লেগে যায়। তারপর, বাসনটাকে একটা তন্দুরের মতো উনুনে ভরে দিয়ে, জোর আগুনে পুড়িয়ে নিলেই বাসন তৈরি হয়ে গেল।

গড়া এবং পোড়ানোর কাজ করতে গিয়ে অনেক বাসন ভেঙে যায়; গড়ার পরও অনেক বাসন ভাঙে। সেইসব ভাঙা বাসন ফেলবার জায়গা একটা দেখবার জিনিস। 'চিন-তে-চেন' শহরে ভাঙা বাসনের রীতিমতো একটা পাহাড়ের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রবন্ধ

(বাংলা ও ইংরেজী দুটো)

ভাষার অত্যাচার

হাতের কাছেই যাহা থাকে, যাহাকে লইয়া অহরহ কারবার করিতে হয়, তাহার যথার্থ মূল্য ও মর্যাদা সম্বন্ধে খুব একটা স্পষ্ট অনুভূতি আমাদের মধ্যে অনেক সময়েই দেখা যায় না। এই দেহটাকে মাটির উপর খাড়া ভাবে দাঁড় করাইয়া রাখা যে কতটা অচিন্তিত নৈপুণ্যের পরিচায়ক ও প্রতিমূহুর্তে তাহার পতনের সম্ভাবনাকে অক্লেশে এড়াইয়া চলায় গণিতের কত জটিল তর্ক যে পদে পদেই অতর্কিতে মীমাংসিত হইয়া যায়, তাহার বিস্তৃত হিসাব লইতে গেলে এ ব্যাপারের গুরুত্ববোধে হয়তো আমাদের চলাফেরার স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ঘটিত।

তেমনি, কতকগুলি কৃত্রিম অযৌক্তিক ধ্বনির সংযোগে কেমন করিয়া যে আমার মনের নাড়ীনক্ষত্র সমস্ত দশজনের কাছে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তাহার সূত্রান্বেষণ করিতে গেলে মনে হইতে পারে যে এতবড় আজগুবি কাণ্ড বুঝি আর কিছু নাই। 'গাধা' শব্দটা উচ্চারণ করিবামাত্র দশজন লোকে কোনো চতুষ্পদবিশিষ্ট সহিষ্ণু জীবের কথা ভাবিতে লাগিল। নিমন্ত্রিতের পেটে যে ক্ষুধানল জ্বলিতেছে তাহা কেহ দেখে নাই; কিন্তু সে 'লুচি' 'লুচি' বলিয়া বাতাসে একটা তরঙ্গ তুলিবামাত্র চক্রাকার ঘৃতপক্ক দ্রব্য বিশেষ দেখিতে-দেখিতে তাহার পাতে হাজির! অথচ এ সকলের কোনো ন্যায়সঙ্গত সাক্ষাৎ কারণ দেখা যায় না; কারণ নামের সঙ্গে নামীর সাদৃশ্য বা সম্পর্ক যে কোথায়, তাহা আজ পর্যন্ত কেহ নির্দেশ করিতে পারে নাই। সুতরাং বলিতে হয়, ভাষা জিনিসটা গোড়া হইতেই একটা কৃত্রিমতার কারবার। কিন্তু তাই বলিয়া ভাষার ব্যবহারে কেবা নিরস্ত থাকে।

সুবিধার খোঁজ করিতে গেলেই তাহার আনুষঙ্গিক দু-চারটা অসুবিধা স্বীকার করিতেই হয়। সুবিধার খাতিরে আজ একটা জিনিসকে স্বীকার করিয়া লইলে দুদিন বাদে সে-কিছু না কিছু অন্যায় দাবি করিবেই। কার্যের সুব্যবস্থার জন্যই লোকে নানারূপ কার্যপ্রণালী ও নানারূপ নিয়মতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু কার্যত অনেক সময়ে তাহার ফল দাঁড়ায় ঠিক উল্টা। যেটা উপলক্ষ থাকা দরকার সেইটাই একটা প্রধান লক্ষ্য হইয়া নূতন কতগুলি অসুবিধার কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। সমাজের এক-একটা বিধিব্যবস্থা মূলত সুযুক্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেও, কালক্রমে অন্যায় রকম ব্যাপকতা ও ঔদ্ধত্য লাভ করিয়া তাহারা কিরূপে পুরুষপরম্পরায় মানুষের সহজবুদ্ধির ঘাড়ে চাপিয়া বসে, আমাদের দেশে তাহার ব্যাখ্যা বা দৃষ্টান্তের আড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন। যে কারণে মানুষ শাস্ত্রব্যবস্থার উদ্দেশ্যকে ছাড়িয়া তাহার অনুশাসন লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে, ঠিক সেই কারণেই মানুষের চিন্তা আপনার উদ্দিষ্ট সার্থকতাকে ছাড়িয়া কতগুলি বাক্যের আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে চায়। এ অবস্থায় বাক্য যে মাথায় চড়িয়া বসিবে তাহাতে বিচিত্র কি?

সব জিনিসেরই একটা সোজা পথ বা শর্টকাট খুঁজিবার চেষ্টা মানুষের একটা অস্থিমজ্জাগত দুর্বলতা। কোনো একটা চিন্তাধারার আদ্যোপান্ত অনুসরণরূপ দুরূহ কার্যকে সংক্ষেপে সারিবার জন্য আমরা মোটামুটি কতগুলি শ্রুতি বা আপ্তবাক্যের আশ্রয় লইয়া মনে করি ঐ সকল তত্ত্বের সহিত যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইল। ডারউইনের ইভোলিউশন থিওরি বা অভিব্যক্তিবাদ জিনিসটা যে কি, সেটা অনুসন্ধান করা আবশ্যক বোধ করি না। কিন্তু ইভোলিউশন বা অভিব্যক্তি কথাটাকে আমরা খুব বিজ্ঞের মত গ্রহণ করিয়া বসি, এবং আবশ্যক হইলে ও-বিষয়ে সাবধানে দু-চারটা মতামত যে ব্যক্ত করিতে না পারি এমন নয়।'

কথায় বলে, "ঘোড়া দেখলে খোঁড়া হয়।" ভাষারূপ বাহনটার খাতিরে চিন্তা যে কেমন করিয়া পঙ্গুত্বলাভ করে তার দৃষ্টান্তের ছড়াছড়ি চারিদিকেই। যে-কোনো জটিল জিনিসকে কতগুলি

পরিচিত নামের কোঠায় ফেলিয়া লোকে মনে করে বিষয়টার একটা নিষ্পত্তি করা গেল। ইংরিজি গীতাঞ্জলি পাঠ করিয়া একজন ইংরেজ আকাশ-পাতাল ভাবিয়া অস্থির যে এই লেখাগুলিকে তিনি কোন পর্যায়ভুক্ত করিয়া কি ভাবে দেখিবেন! পরে যখন তাঁহার খেয়াল হইল যে এগুলিকে মিস্টিক্ আইডিয়ালিজিম্ বা ঐরূপ একটা কিছু বলা যাইতে পারে তখন তাঁহার সমস্ত উৎকণ্ঠা দূর হইল এবং তিনি এমন একটা নিশ্চিন্ততার ভাব প্রকাশ করিলেন যেন তাঁহার আর কিছু বুঝিতে বাকি নাই।

এক-একটা কথা আসে অতি নিরীহভাবে চিন্তার বাহনরূপে। কিন্তু চিন্তার আদর তো চিরকাল সমান থাকে না; সুতরাং তাহার আসনচ্যুতি ঘটিতে কতক্ষণ? বাহনটা কিন্তু অত সহজে হটিবার নয়; সে তখন একাই চিন্তার ক্ষেত্রে দাপাদাপি করিয়া আসন জমাইয়া রাখে। ইহাকেই বলি ভাষার অত্যাচার। ভাষা ভাববাহন কার্যেই নিযুক্ত থাকুক; সে আবার চিন্তার আসরে নামিয়া আপনার জের টানিতে থাকিবে কেন? শঙ্করাচার্যের অদ্বৈততত্ত্বে 'মায়া' শব্দটার অর্থ কি, আমরা হয়তো কোনকালে ভুলিয়া বসিয়াছি কিন্তু ঐ 'মায়া' শব্দটা আমাদের ছাড়ে নাই। সংসারকে এইভাবে 'কিছু নয়' বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত কি না, সে বিষয়ে আলোচনা করিবার সময় বাস্তবিক কি ভাবে কি করিতে বলা হইয়াছে সেকথা ভাবিবার অবসর হয় না। কতগুলি শব্দ শুনি যাহার অর্থ বা ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের চিন্তার যোগ অতি সামান্য অথচ আমাদের ধারণা এই যে কথাগুলির মধ্যে খুব এক-একটা গভীর চিন্তা নিহিত আছে। তাহার উপর এক-একটি শব্দ আবহমানকাল হইতে নিরঙ্কুশভাবে চলিত থাকিলে কালক্রমে তাহার মধ্যে স্বভাবতই এমন একটা চূড়ান্ত মীমাংসার ভড়ং প্রকাশ পায় যে শব্দের মোহে পড়িয়া আমরা কথাগুলিকেই নাড়াচাড়া করি আর মনে করি খুব একটা উচ্চচিন্তার আলোড়ন চলিতেছে। একটি প্রবীণ গোছের ভদ্রলোক কৃষ্ণলীলার সমর্থনের উদ্দেশ্যে তর্ক করিতেছিলেন। তাঁহার যুক্তি প্রণালীটা এইরূপ—সত্ত্ব রজ তম এই তিন-গুণাশ্রিত পুরুষ তিন রকম ভাবাপন্ন সুতরাং তিনের সাধনমার্গ ও অধিকারভেদ তিন প্রকার। সুতরাং নিম্নস্তরের অবিদ্যাশ্রিত আদর্শের দ্বারা সাত্ত্বিকী-প্রকৃতির আশ্রয়ীভূত নিত্যমুক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিচার করিলে চলিবে কেন!—ইত্যাদি। প্রতিপক্ষ বেচারা বাক্যজালে আবদ্ধ ও প্রত্যুত্তর দানে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া ছটফট করিতে লাগিলেন। সগুণ-নির্গুণ পুরুষপ্রকৃতি প্রাণ কারণ শব্দব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি শব্দঘটার সাহায্যে নিজ-নিজ বক্তব্যের মধ্যে গাম্ভীর্য সঞ্চয়ের জন্য অনেকেই সচেষ্ট, কিন্তু শব্দের মধ্যে যে ভাবটুকু ছিল, সে কোনকালে খোলস ছাড়িয়া পলাইয়াছে কে তাহার খবর রাখে? ঐ এক-একটা কথায় আমরা যে পরিমাণে অভ্যস্ত হইয়া পড়ি, তাহাকে যতবার এবং যতসহজে মুখস্থ বুলির মতো আওড়াইতে থাকি, চিন্তাও ততই প্রমাদ গণিয়া একপা-দুইপা করিয়া হাঁটিতে থাকে। কে অত পরিশ্রম করিয়া লুপ্তচিন্তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে! শব্দের গায়ে চিন্তার ছাঁটছুট যাহা লাগিয়া থাকে তাহাই যথেষ্ট, বাকিটুকু তোমার রুচি ও কল্পনা অনুসারে পুরাইয়া লও। ছাতার নিচে চটি চলিতেছে দেখিয়া লোকে বুঝিত বিদ্যাসাগর চলিয়াছেন। আমরা দেখি ভাষার ছাতা আর চটি, জীবন্ত বিদ্যাসাগরকে আর দেখা হয় না।

এক-একটা কথার ধুয়া আমাদের স্বাভাবিক চিন্তাশক্তিকে আড়ষ্ট করিয়া দেয়। মানুষের যে কোনো আচার-অনুষ্ঠান চালচলন বা চিন্তা-ভঙ্গীর প্রতি কটাক্ষ করিয়া লোকে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কি সনাতন ধর্মবিধিকে উড়াইয়া দিতে চাও?" এবং সনাতন ধর্মের নজীরকে অর্থাৎ ঐ "সনাতন" শব্দটার নজীরকে এমন অকাট্যভাবে মনের সম্মুখে দাঁড় করায়, যেন ইহার উপর আর কথা বলা চলে না। তখন যাহা কিছু যথেষ্ট জীর্ণ ও পুরাতন তাহাই আমাদের কাছে সনাতনত্বের দাবী করে এবং আমাদের কল্পনায় সনাতনধর্ম জিনিসটা যে কোনো বিধি নিয়ম আচার অনুষ্ঠানাদির

সমারোহ সজারুবৎ কণ্টকাকীর্ণ হইয়া ওঠে। কারণ, এই সকল শোনা কথায় আমারা এতই অভ্যস্ত যে ইহাদের এক-একটা মনগড়া অর্থ আমাদের কাছে আপনা হইতেই দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সেটাকে আবার ঘাঁটাইয়া দেখা আবশ্যক বোধ করি না। শাস্ত্রে 'ত্যাগ' বলিতে কি-কি ছাড়িতে উপদেশ দেয় তাহা বুঝি আর নাই বুঝি আমরা ঐ ত্যাগ শব্দটার সঙ্গে ছাড়ার সংস্কারটুকুকে ধরিয়া রাখি। অমুক সংসার ছাড়িয়া পলাইয়াছেন, তিনি ত্যাগী; অমুক এত টাকা দান করিয়াছেন, তিনি ত্যাগী; অমুক এই অনুষ্ঠানে শক্তি ও সময় নষ্ট করিয়াছেন, তিনিও ত্যাগী। কর্মফলাসক্তি কিছুমাত্র কমিল না, দেহাত্মবুদ্ধির জড় সংস্কার ঘুচিল না, প্রভুত্বের অভিমান ও অহঙ্কার গেল না; অথচ শাস্ত্রবাক্যেরই দোহাই দিয়া 'ত্যাগের মাহাত্ম্য' প্রমাণিত হইল। এইজন্য এক-একটা কথা-সংশ্লিষ্ট চিন্তাকে মাঝে-মাঝে আঘাত দিয়া জাগাইয়া দিতে হয়। কারণ, চিন্তা সে নিজগুণে যতই বড় হউক না কেন, আর দশজনের মনে নিত্য নূতন খোরাক না পাইলে তাহার ক্ষয় অনিবার্য। 'জাতীয়ভাব' 'ভারতীয় বিশেষত্ব' 'হিন্দুত্বের ছাঁচ' প্রভৃতি নাম দিয়া আজকাল যে জিনিসটাকে আমরা শিল্পে সাহিত্যে অশনে বসনে প্রয়োগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি, তাহার স্বরূপলক্ষণাদির বিষয়ে আমাদের ধারণা যতই অস্পষ্ট হউক না কেন, তাহাতে ঐ-ঐ শব্দনির্দিষ্ট বিষয়গুলির প্রতি আমাদের আস্থা ও সম্ভ্রমের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় না। সেটা হয়তো ভালোই, কিন্তু দশদিক হইতে যথেষ্ট মাত্রায়, অথবা যথার্থভাবে আঘাত না খাওয়ায় জিনিসটা যে ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে বোধহয় যে ঐ শব্দগুলিকে একবার বিশেষ রকমে ঘাঁটাইয়া দেখা আবশ্যক।

আমার চিন্তাকে কতগুলি শব্দের ঘাড়ে চাপাইয়া দিলাম বলিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। সে চিন্তাতরঙ্গে ভবিষ্যৎ ইতিহাস তাহাতেই আমার অজ্ঞাতসারে কতকগুলি শব্দের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়ে। শব্দের অর্থ তো চিরকাল একভাবে থাকে না, পরে একসময়ে হয়তো এক-একটা শব্দের অর্থ লইয়াই মারামারি বাধিয়া যাইবে, আমার চিন্তার সদ্গতি হওয়া তো দূরের কথা। ঋগ্‌বেদের একটি ঋকের অর্থ রমেশবাবু প্রভৃতি এইরূপ করেন—

"বৃষ্টিজল শব্দ করিয়া পড়িল এবং (মেঘ বায়ু ও কিরণ) এই তিনের যোগে গাভীরূপী পৃথিবী বিশ্বরূপী (অর্থাৎ শস্যাচ্ছাদিত) হইল"—ইত্যাদি।

পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের মতে ইহারই অর্থ—

"পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, সূর্যশক্তি এই ঘুরানকার্যে নিযুক্ত আছেন: এই শক্তিসকলের মধ্যস্থলে গর্ভদেবতা অটলভাবে স্থির রহিয়াছেন"—ইত্যাদি। ["আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ"]

এখানে এক-একটি শব্দের অর্থবাহুল্যই এইরূপ ব্যাখ্যা বিপর্যয় ঘটাইয়াছে। আবার, পুরাণাদি বর্ণিত রূপগুলিকে নিংড়াইয়া বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব নিষ্কাশনের চেষ্টায় যে ইহা অপেক্ষাও গুরুতর অর্থবিভ্রাট ঘটিয়া থাকে, তাহা সকলেই জানেন। একই কথার অর্থ তোমার-আমার কাছে একরকম আর অন্য দশজনের কাছে অন্যরকম, এরূপ ঘটিলে ভাষার উদ্দেশ্যই পণ্ড হইয়া যায়। তত্ত্ব জিনিসটা যখন কবিত্বের খাতিরে রূপকের মধ্যে একেবারে হাত পা গুটাইয়া বসে, অথবা সে যখন 'হিং টিং ছটের' আকার ধারণ করে, তখন ভবিষ্যদ্বংশের কল্পনায় সে অতি সহজেই কাব্য বা ইতিহাস বা বৈজ্ঞানিক গবেষণা, যাহা-ইচ্ছা-তাহাই হইয়া দাঁড়ায়।

একে তো ভাষার অর্থভেদ সর্বদাই ঘটিতেছে তাহার উপর নিজের পছন্দমতো অর্থ বাহির করিবার দিকে মানুষের স্বভাবতই একটু আধটু নজর থাকে। ইহার মধ্যে আবার যদি ইচ্ছাপূর্বক বা স্পষ্টই খানিকটা ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা রাখিয়া দেওয়া হয়, তবে মানুষের বুদ্ধি এ অনর্থ ঘটাইবার সুযোগ ছাড়িবে কেন? সেকালে রোমীয় ধর্মশাসনের বিধি-অনুসারে অবিশ্বাসী ধর্মদ্রোহীর জন্য

এই মর্মে একটা ব্যবস্থা দেওয়া হইত, "ইহাকে আঘাত করিও না, কিন্তু বিনা রক্তপাতে ইহার দুর্মতির প্রতিবিধান কর।" এ কথাটার অর্থ করা হইত "ইহাকে আঘাত করিও না, কিন্তু বিনা রক্তপাতে ইহার দুর্মতি প্রতিবিধান কর।" এ কথাটার অর্থ করা হইত "এ ব্যক্তিকে পোড়াইয়া মার!" এইরূপে অশ্বত্থামার নিধনসংবাদে 'ইতিগজ' সংযোগের ন্যায়, ব্যক্তভাষায় অব্যক্ত অভিপ্রায়ের স্বগত উক্তিটা ভাষার অর্থকে যে কখন কোনমুখে ফিরাইয়া দেয় তাহা অনেক সময়ে নির্ণয় করা কঠিন।

ভাষা যে কেবল চিন্তাকে বিপথে ঘোরাইয়া বা তাহার আসন দখল করিয়াই ক্ষান্ত হয়, তাহা নহে; সে এক-এক সময়ে উদ্যোগী হইয়া আমাদের অজ্ঞতার উপর পাণ্ডিত্যের রঙ ফলাইতে থাকে। নিতান্ত সামান্য বিষয়েরও প্রকাণ্ড সংজ্ঞানির্দেশ করিয়া, অথবা যাহার সম্বন্ধে কিছুই জানি না তাহারও একটা নামকরণ করিয়া, আমাদের বিজ্ঞতার ঠাট-বজায় রাখে এবং আমাদের পাণ্ডিত্যের অভিমানকে নানারূপ ছেলেভুলানো কথার সাহায্যে আশ্চর্য রকমে জাগাইয়া রাখে। একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনো একটা জিনিস হয়তো আপাতদৃষ্টিতে সাক্ষীগোপালের কাজ করে মাত্র, অথচ তাহার উপস্থিতিটা কেন যে সেই ক্রিয়া নিষ্পত্তির সহায়তা করে, বৈজ্ঞানিক তাহার কারণ খুঁজিয়া পান না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ছাত্র যখন এই ব্যাপারটাকে 'ক্যাটালিটিক একশন্' নাম দিয়া ব্যাখ্যা করে তখন সে হয়তো মনেই করে না যে এখানে ঐ শব্দটার আড়ালেই একটা প্রকাণ্ড অজ্ঞতার ফাঁক রহিয়াছে। আফিং খাইলে ঘুম আসে কেন, এ প্রশ্নের উত্তরে মানুষ এক সময়ে সোমনিফেরাস্ প্রিন্সিপলস্ বা নিদ্রোৎপাদিকা শক্তির কল্পনা করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিত কিন্তু নিদ্রোৎপাদিকা শক্তির গুণে নিদ্রা আসে এ ব্যাখ্যা আর এখনকার যুগে ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রাহ্য হয় না; কারণ কেবল ভাষার উলট-পালটে যে যুক্তির প্রতিষ্ঠা হয় না, এ তত্ত্বটা এ ক্ষেত্রে নিতান্তই স্পষ্ট দেখিতে পাই। কিন্তু সৃষ্টিরহস্যের মূলে 'মায়া' বা 'অবিদ্যার' কল্পনা ঠিক এই শ্রেণীভুক্ত না হইলেও উহা যে আদৌ একটা ব্যাখ্যা বা মীমাংসা নয়, মূল প্রশ্নেরই স্পষ্টতর পুনরুক্তি মাত্র এবং এই নামকরণে যে কেবল আমাদের চিন্তার পরাজয়কেই স্বীকার করা হয়, একথা অনেকেই ভাবিয়া দেখেন না। বিজ্ঞানের এক-একটি সিদ্ধান্ত বা 'ল' আওড়াইয়া আমরা মনে করি খুব একটা কার্যকারণ-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইল। অমুক কাজটা অমুক 'ল' অনুসারে সম্পন্ন হইল; 'এ্যকর্ডিং টু নিউটন'স্ থার্ড ল অফ মোশন', নিউটনের গতিবিষয়ক তৃতীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সমান হইল। বলা বাহুল্য আইনটার খাতিরে কাজটা নিষ্পন্ন হয় না। কার্যতঃ, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার তুল্যতা দেখা যায় বা এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। 'অমুক সিদ্ধান্ত অনুসারে হয়' বলায় নূতন কিছুই বলা হইল না, কেবল সিদ্ধান্তকে তত্ত্বের সঙ্গে মিলাইয়া দেখা গেল। তেমনি, আলোকতত্ত্বের বর্ণনায় 'ট্রান্সভার্স্ ভাইব্রেসনস্ অফ দি লিউমিনিফেরাস্ ইথার' বলায় চিত্তের চমক লাগিতে পারে; কিন্তু তাহাতে যে আমার আলোকচৈতন্যের কোনোরূপ মীমাংসা হয় না, এ কথাটা শিক্ষিত লোকেও অনেক সময়ে ভুলিয়া যায়।

ভাষার একটা বিশেষ সুবিধা ও অসুবিধা এই যে, চিন্তার আদ্যোপান্ত ইতিহাস বহন করিতে সে বাধ্য নয়। বড়-বড় তত্ত্বগুলিকে সে এক-একটা সংক্ষিপ্ত নাম বা সূত্রের আকারে ধরিয়া রাখিতে পারে। জ্যামিতিতে বিন্দু কল্পনার আবশ্যক হইলে, প্রত্যেকবার বলিতে হয় না যে—"এমন একটি অতিক্ষুদ্র দেশাংশ গ্রহণ কর যাহার আয়তন-কল্পনা সম্ভব নয় কিন্তু অবস্থান নির্দিষ্ট হইতে পারে।" বিন্দু শব্দটার উল্লেখ করিলেই এই সকল চিন্তার ছায়া মনের মধ্যে আপনা হইতেই জাগিয়া উঠে। সেইরূপ অনেক জটিল তত্ত্ব আছে যাহাকে গোটাতত্ত্বের আকারে প্রত্যেকবার আওড়ানো চলে না। অথচ তাহাকে সংক্ষেপে দু-চারিটা কথায় সারিতে গেলেও বিপদের সম্ভাবনা। বিশেষতঃ,

আত্মতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে এক-একটা কথার সঙ্গে মানুষের সঙ্গত অসঙ্গত নানাপ্রকার সংস্কার এমনভাবে জড়িত থাকে যে এক-একটা শব্দ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের অলক্ষিতে এক-একটা ব্যক্তিগত সংস্কারের প্রতিষ্ঠা করা হয়। ধর্ম বলিতে, আত্মা বলিতে, হাজার লোকে হাজার রকম অর্থ করে, অথচ এই কথাগুলি লইয়া লোকে এমনভাবে মারামারি করে যেন অর্থ সম্বন্ধে আর কোনো মতান্তর নাই।

এক ইংরেজ ভদ্রলোক বাইবেলের একটু উক্তি তুলিয়া বলিতেছিলেন, "তোমরা তো বিশ্বাস কর যে এই সংসারটা কেবল 'ফ্লেস' নয়, জড়ের ব্যাপার নয়, ইহার মধ্যে স্পিরিট আছে।' আমি অতর্কিতে কথাটাকে স্বীকার করায় তিনি ভারি খুশি হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমরা ওরিয়েন্টাল (প্রাচ্য) লোক কিনা, তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি আছে। তোমাদের পক্ষে প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস করা খুব স্বাভাবিক।" তখন বুঝিলাম তিনি স্পিরিট বলিতে ভূতপ্রেত ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না।

জগতের কাছে দাঁড়াইতে গেলে চিন্তামাত্রকেই কতগুলি শব্দকে বিশেষভাবে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইতে হয়। কোনো-কোনো স্থলে এই যোগটা এত ঘনিষ্ঠ হইয়া দাঁড়ায় যে শব্দটাকে বাদ দিয়া চিন্তাটাকে ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। বৈষ্ণবতত্ত্বের আলোচনা করিতে গেলেই লীলারস ভক্তি ভক্ত ভগবান প্রভৃতি কতগুলি শব্দকে একেবারেই বাদ দেওয়া চলে না। পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশতত্ত্বের আলোচনা করিতে গেলেই হেরিডিটি, ভেরিয়েশন, স্ট্রাগল্ ফর এক্সিস্টেন্স্, ন্যাচারাল সিলেকশন্, (উত্তরাধিকার, পরিবর্ত, জীবন-সংগ্রাম, যৌননির্বাচন) প্রভৃতি কথাগুলি অপরিহার্যরূপে আসিয়া পড়ে। কথাগুলিকে না বুঝিয়া গ্রহণ করায় তো বিপদ আছেই, বুঝিয়া গ্রহণ করিলেই যে বিপদ একেবারে কাটিয়া যায় তাহাও নহে। মনের এক-একটি চিন্তাকে কতগুলি শব্দের আটঘাটের মধ্যে বাঁধিয়া দিলে সে চিন্তার পথ ভবিষ্যৎ যাত্রীর পক্ষে অনেকটা সুগম হইতে পারে; কিন্তু চিন্তাটাও ক্রমে প্রণালীবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং অনেক সময়ে দেখা যায় যে পরবর্তী যুগে যাঁহারা সেইসকল তত্ত্বের পূর্ণ মীমাংসা করিতে আসেন, তাঁহারা গোড়াতেই দু-একটা কথার বাঁধ ভাঙিয়া লইতে বাধ্য হন। যে বিষয়কে বা মতকে সাধারণ কথায় তত্ত্বের মতো করিয়া বুঝাইতে গেলে মনে তেমন কোনো সম্ভ্রমের উদয় হয় না, সে-ই যখন দু-একটা বহুজনস্বীকৃত শব্দের ধ্বজা উড়াইয়া আসে তখন তাহার মর্যাদা ও গুরুত্ব যেন অসম্ভব রকম বাড়িয়া যায়। শব্দের আধিপত্য তখন আমাদের কাছে নানারূপ অসঙ্গত দাবী করিতে থাকে। ক্রমে হয়তো সেই ব্যাপারটাই যদি কেহ অন্যরূপ ভাষায় বা অন্য কোনো দিক হইতে ব্যক্ত করিতে আসে, সেই পরিচিত শব্দগুলির অভাবে তাহা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য হইয়া ওঠে। অথবা কাহারও চিন্তা ঠিক সেই-সেই শব্দ-নির্দিষ্ট পথে না চলিলেই মনে হয় যেন তাহা না জানি কোন অদ্ভুত পথে চলিয়াছে। হয়তো আর দশজন লোকের চিন্তার মধ্যে সেই পরিচিত প্রচলিত শব্দগুলির ঠিক যথাযথ স্থান নির্ণয় করাটা তখন ভারি একটা আবশ্যকীয় ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। মনের এইপ্রকার সংস্কারই মানুষের কাছে সর্বদা 'হাঁ-কি-না' 'এটা-না-ওটা' 'মানো-কি-মানো না' গোছের একটা প্রশ্ন দাঁড় করায়। নিরীহ ধর্মার্থীর কাছে সে ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করে, "তুমি দ্বৈতবাদী না অদ্বৈতবাদী?" অথচ সে বেচারা হয়তো কোনো একটা বিশেষ বাদের পক্ষ হইয়া লড়াই করিবার কোনো প্রয়োজনই অনুভব করে না, হয়তো তাহার মনের কথাটাকে ঐরূপ একটা তত্ত্বের মারামারির আকারে প্রকাশ করা তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আমাদের রাজনৈতিক মত নির্ণয়ের জন্য এক সময় জিজ্ঞাসা করা হইত, "তুমি মডারেট না একস্ট্রিমিস্ট্" এই প্রশ্নই যেন রাজনীতির প্রকাণ্ডতম সমস্যা আর ইহার মধ্যেই যেন রাজনৈতিক শ্রেণী-বিভাগের নিগূঢ়তম সঙ্কেত নিহিত রহিয়াছে। মডারেট একস্ট্রিমিস্ট্ (মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী) লিবারেল কন্সারভেটিভ (উদারপন্থী ও রক্ষণশীল) ক্যাথলিক প্রোটেস্টান্ট

(প্রাচীনপন্থী ও প্রতিবাদপন্থী) প্রভৃতি কথার দ্বন্দ্ব একেবারে নিরর্থক না হইলেও, ইহার ফলে কতগুলি সাময়িক মতবৈষম্য অযৌক্তিক দ্বৈততত্ত্বের আকার ধারণ করিয়া এক-একটি বিরোধকে চিরস্থায়ী করিবার পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। আপাতবিরুদ্ধ কথার মূলে যে সমন্বয়তত্ত্ব নিহিত থাকে ভাষার বিরুদ্ধতা সে তত্ত্বটাকে গোপন করিয়া রাখে। এদেশে জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ, কর্ম ও বৈরাগ্যের বিরোধ, প্রেম ও অনাসক্তির বিরোধ, কতক-পরিমাণে শব্দবৈষম্যমূলক কৃত্রিম দ্বন্দ্বেরই পরিচায়ক। যাঁহারা দুর্ভাগ্যক্রমে এইসকল কথার ঘোর-ফেরের মধ্যে আটকাইয়া যান তাঁহাদের, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, একটা না-হয় অপরটার পর্যায়ে পড়িতেই হয়।

মানুষে প্রশ্ন করে, "তুমি জাতীয়তা জিনিসটা বিশ্বাস কর কিনা" "তুমি হিন্দুত্বকে মানো কিনা" আর সঙ্গে-সঙ্গে একটা হাঁ-না গোছের জবাব প্রত্যাশা করে। বাস্তবিক কিন্তু অনেক স্থলেই পাল্টা প্রশ্ন ছাড়া আর কোনো জবাব সম্ভব হয় না, নতুবা কোন-কোন অর্থে কি-কি কথা কতদূর স্বীকার করি বা না করি তাহার একটা বিস্তৃত ফর্দ দিতে হয়। আগে শুনি তুমি যাহাকে জাতীয়তা বল সেটার লক্ষণ কি? হিন্দু বা হিন্দুত্ব বলিতে তুমি কি-কি জিনিস বুঝিয়া থাক? তবে তো বলিতে পারি তোমার জাতীয়তাকে, তোমার হিন্দুত্বকে আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত কিনা। আমি অমুক জিনিসটাকে মানি আর অমুকটাকে মানি না, এক নিঃশ্বাসে একথা বলিয়া ফেলা কার্যত যেমন সহজ তেমনি মারাত্মক। জগতের অর্ধেক মারামারি কেবল কথারই মারামারি। আমার অমুক ধর্ম বাস্তবিক কি বলেন তাহাও আমি জানি না, আর তোমার যথার্থ বক্তব্য ও আদর্শ কি তাহারও ধার ধারি না, অথচ তোমার কাছে উত্তর দাবী করি তুমি অমুক ধর্মটা মানো কিনা অর্থাৎ ঐ শব্দসংসৃষ্ট আমার সংস্কারগুলিকে মানো কিনা! পুরাণে লেখে গন্ধর্বেরা বাক্যভোজী, তাহারা নাকি শব্দ আহার করিয়া থাকে। এক হিসাবে, গন্ধর্বশ্রেণীর জীব আমাদের মধ্যে বড় কম নয়। কিন্তু অর্থই যে বাক্যের সার এবং অর্থটাকে সম্যকরূপে পরিপাক না করিলে শব্দটা যে মনের পুষ্টি-সাধনের অন্তরায় হইয়া উঠিতে পারে এই সহজ কথাটা আমাদের মনে থাকে না বলিয়াই চিন্তার কুপুষ্টিজনিত নানারকম রোগের সৃষ্টি হয়। বিচারবুদ্ধির পাদুকাস্পর্শে বাক্যমাত্রসার প্লীহাজীর্ণ সংস্কারগুলির অপঘাত-মৃত্যুর আশঙ্কা করিয়া আমরা এক-একটা শিখানো বুলিকে অতিরিক্ত যত্নের সঙ্গে যুক্তিতর্ক সন্দেহের কবল হইতে বাঁচাইয়া রাখি। "বিশ্বাসে পাইবে বস্তু তর্কে বহুদূর" বলিয়া প্রাণপণে তর্ক করি এবং বিশ্বাস করিতে চেষ্টা করি যে 'বস্তু'কে পাইতে আর অধিক বিলম্ব নাই।

ভাষা যে নিজের অর্থ গৌরবেই সত্য, একথা ভুলিয়া সে যখন কেবলমাত্র শব্দগৌরবে বড় হইতে চায়, তাহার অত্যাচার অনিবার্য। চিন্তা কোনোদিনই শব্দের দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে ও সম্যকরূপে ব্যক্ত হইতে পারে না। সেইজন্যই এক-একটা সত্যকে পঞ্চাশবার পঞ্চাশরকম ভাষায় পঞ্চাশদিক হইতে দেখা আবশ্যক হয়। কিন্তু তবু দেখা যায় যে সত্যের মূলে প্রবেশ করিতে হইলে আর ভাষা পাওয়া যায় না, অথবা এমন ভাষা পাওয়া যায় না যাহা সত্যানভিজ্ঞের কাছে তত্ত্বকে ব্যক্ত করিতে পারে। অদ্বৈততত্ত্বের কথা নির্বিকল্প সমাধির কথা বলিয়াও এবং "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানা সমুদ্রে অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপং বিহায়" ইত্যাদি রূপকের ব্যবহার করিয়াও ঋষিরা বলিতেছেন, "এ সকল তত্ত্বকে প্রকাশ করা যায় না, ইহা ভাষায় জানাজানি হইবার বিষয়ই নহে।" বুদ্ধদেব নির্বাণ তত্ত্বের কথা আজীবন বলিয়া গেলেন কিন্তু "নির্বাণ কি" এ প্রশ্নের সোজাসুজি কোনো উত্তরই দিলেন না। আমরা কিন্তু এ-সকল কথাকে ভাষার মজলিশে টানিয়া অহরহই মারামারি করিয়া থাকি।

ভাষার আশ্রয় লইয়া যে কোনো অপকর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহাকেই যদি ভাষার অত্যাচার বলা যায়, তবে ভাষা-ঘটিত আরো অনেকপ্রকার অত্যাচারের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমার

কার্যটা তোমার মনঃপূত না হইলে তুমি যে সকল বাক্য ব্যবহার কর, সেও এক হিসাবে ভাষার অত্যাচার। অনিচ্ছুক ছাত্রকে পণ্ডিতমহাশয় যখন শাসন অনুশাসনের দ্বারা সংস্কৃত পড়িতে বাধ্য করেন ছাত্র নিশ্চয়ই তাহাকে ভাষার অত্যাচার বলিবে। তোমার ক্ষুধার সময়ে বা ব্যস্ততার মুহূর্তে তোমার কাছে দর্শনের তত্ত্ব বা কবিত্বের কথা আওড়াইতে গেলে তুমিও বলিবে—ভাষার অত্যাচার। ভাষা যখন বন্ধন ছিঁড়িয়া বি-ইউ-টি বাট পি-ইউ-টি পুট ইত্যাদিবৎ বৈষম্যের সৃষ্টি করে অথবা সে যখন রুশিয়ার মানচিত্রে বসিয়া তোমার উচ্চারণ শক্তির পরীক্ষা করিতে থাকে, সেও একরূপ ভাষার অত্যাচার বৈ কি! আর সর্বশেষে, এই প্রবন্ধটিকে আরো বিস্তৃত করিয়া ফেনাইতে গেলে তাহাও অত্যাচার বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

ক্যাবলের পত্র

শ্রীমান বাঞ্ছারাম উন্নতিশীলেষু—

তুমি যে আমার কোনো চিঠি পাওনি তার একটা কারণ এই যে আমি তোমায় চিঠি লিখিনি। কারণ ছাড়া যখন কার্য হয় না, তখন চিঠি না লেখবারও অবিশ্যি একটা কারণ থাকা উচিত। তবে কিনা, চিঠি না-লেখাটাকে কার্য বলে ধরা যায় কিনা, সেটা একটু ভাবা দরকার। কিছু না করাটাও যদি একটা কাজ হয়, তবে তোমরা পৃথিবীতে কেজো মানুষ আর অকেজোমানুষ বলে যে একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছ সেটা একেবারেই মিথ্যে হয়ে পড়ে। তোমরা করেছ বলছি এইজন্যে যে ও দ্বন্দ্বটিকে আমি বরাবরই অস্বীকার করে এসেছি। আমার ধারণা এই যে, আমসত্ত্ব হলেই যেমন আমের আমসত্ত্ব, তেমনি মানুষ মানেই কাজের লোক। ক্রিয়া এবং অস্তিত্ব এ দুটোর মধ্যে তফাতটা কেবল কৃ-ধাতু আর অস্ ধাতুর তফাত, আর ব্যাকরণ মতে সব ধাতুই ক্রিয়াবাচক। "আমি আছি" এই তত্ত্বটিকে ফুটিয়ে বলার নাম কার্য এবং প্রাণের স্বাভাবিক ধর্মই এই যে সে আপনাকে প্রকাশ করে, অর্থাৎ ফুটিয়ে বলে। জলকে ফোটাতে হলে তাকে আগুনে চড়িয়ে গরম করতে হয় কিন্তু তাই বলে ফুলকে ফোটাবার পক্ষে ও উপায়টি খুব প্রশস্ত নাও হতে পারে। জীবনটাকে কাজের মধ্যে নিয়ে যাঁরা চব্বিশ ঘণ্টা টানাটানি করেন, তাঁরা এই সহজ কথাটি বোঝেন না যে, ওতে করে জীবনটা ফুটে বেরোয় না, কেবল প্রাণটাই ছুটে বেরোয়।

উপনিষদ বলেছেন আত্মা অব্যয়, আর ব্যাকরণেও দেখতে পাই যে অব্যয়ের রূপ নেই। কিন্তু জীবনের একটা রূপ আছে, সেটা হচ্ছে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ। কেন না, জীবনের ক্রিয়া সমাপ্ত হলেই মৃত্যু এবং মৃত্যুটা আর যাই হোক সেট' জীবন নয়। অসমাপিকা হলেও ক্রিয়াপদটি অকর্মক নয়, কারণ ওর একটি উদ্দিষ্ট কর্ম আছে এবং সেই কর্মটিই হচ্ছে আর্ট। রোসো, আগেই তর্ক কর না। আর্ট কাকে বলছি সেইটে আগে বুঝবার চেষ্টা কর। তুমি বলতে চাচ্ছ যে বিজ্ঞান পলিটিক্স্ বা ফিলসফি প্রভৃতি ভারি-ভারি কর্মগুলো কি কর্ম নয়? আমার মতে ওগুলো হচ্ছে ক্রিয়ার উপসর্গ মাত্র। "উপসর্গস্য যোগেন" ক্রিয়ার অর্থ যে ওলট-পালট হয়ে যায়, এটা ব্যাকরণের বিজ্ঞতা এবং সংসারের অভিজ্ঞতা এই দুই তরফেরই সাক্ষী। জীবনের ক্রিয়ার উপর ওরা মোচড় দেয়, কিন্তু কোথাও আঁচড় দিতে পারে না। জীবনের উপর আঁচড় দেওয়া অর্থাৎ আপনার ছাপ এঁকে দেওয়া, অর্থাৎ এককথায় নতুন করে রূপ সৃষ্টি করা, এই জিনিসটাই হচ্ছে আর্ট অর্থাৎ ব্যর্গসঁ যাকে বলেছেন ক্রিয়েটিভ ইভোলিউশন।

আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি যে বাঙলা দেশে কেউ ব্যাকরণ পড়ে না এবং পড়তে জানে না। অর্থাৎ আমাদের দেশে রসবোধ ছাড়াও আর একটি বোধের বিশেষ অভাব রয়েছে, সেটা ঐতিহাসিক বোধ নয়, সেটা হচ্ছে মুগ্ধবোধ। তার কারণ, আমাদের দেশে ইতিহাসের মালমশলা নিয়ে যাঁরা কারবার করেন, মাল এবং মশলার পার্থক্য তাঁরা বোঝেন না। ব্যাকরণের মধ্যে তাঁরা ভাষাতত্ত্বের মশলা দেখেন কিন্তু ইতিহাসের মাল দেখতে পান না। অথচ এটা অস্বীকার করবার জো নেই যে ও বস্তুটি হচ্ছে জাতীয় খোশখেয়ালের আস্ত একটি তোষাখানা। সকলেই জানি, ইংরেজের সঙ্গে আমাদের সব চাইতে বড় তফাৎ হচ্ছে আকারের তফাত। অর্থাৎ তারা আত্ম সর্বস্ব আর আমরা আত্ম সর্বস্ব; ওদের টাকা মাত্র ভরসা, আমাদের টাক মাত্র ফরসা। ইংরেজের ব্যাকরণে ও আচরণে ফাস্ট পারসন্ হচ্ছেন আমি এবং আমরা। কিন্তু আমাদের দেশে ব্যাকরণটাও বেদাঙ্গ, সুতরাং তাতে পরমার্থ না থাকুক পরমার্থতত্ত্বের কোনো অভাব নেই। তাই আমাদের প্রথম পুরুষ হচ্ছেন ইনি এঁরা তাঁরা। এর মধ্যে দীনতা থাকলেও কোনো রকম হীনতা নেই, কারণ আমি-ব্যক্তিটিকে আমরা বরাবর উত্তম-পুরুষ বলেই প্রচার করে আসছি। এইখানেই ওদের সঙ্গে আমাদের আসল তফাত। ওরা অহঙ্কারী বলেই স্বার্থপর হয়ে থাকে, আর আমরা পরার্থপর বলেই অহঙ্কার করতে পারি।

অধ্যাপক কিউম্‌রে তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন যে, মিথ্যেটাই হল সাহিত্যের আসল সৃষ্টি— কেন না, সত্যকে কেউ সৃষ্টি করতে পারে না। কেবল এইটুকু না বলে তিনি আরো বলতে পারতেন যে, আর্টের উদ্দেশ্যই হচ্ছে যেটা সৃষ্টিছাড়া সেইটেকে সৃষ্টি করা। বিজ্ঞানের সব সত্যিই যে সত্যি এইটে দেখানোই হচ্ছে বিজ্ঞানের ব্যবসা। সত্যিটার যে কোনো সত্তা নেই আর মিথ্যেটা যে মিথ্যে নয়, এইটেই হচ্ছে দর্শনের সাক্ষী। কেবল আর্টের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সত্য-মিথ্যার স্বত্বসাব্যস্তের কোনো বালাই নেই, কেন না সাহিত্য হচ্ছে সত্য-মিথ্যার সব্যসাচী। অর্থাৎ এক কথায় বিজ্ঞান না পড়েই বোঝা যায়, দর্শন পড়লেও বোঝা যায় না, আর সাহিত্যের বেলা বোঝাপড়ার কোনো প্রয়োজনই হয় না। একেই আমি বলেছিলুম, "সাহিত্যের অনাসক্তি।" দুর্ভাগ্যক্রমে কথাটা কারও প্রাণে লাগেনি অর্থাৎ কানে লাগেনি। কেন না, আমাদের দেশের বয়ঃপ্রাপ্ত পণ্ডিতেরাও পড়াশোনা করেন না, তাঁরা কেবল লেখাপড়াই করে থাকেন। আর তাতে করে যে জিনিসটা গজায় সেটা আক্কেল নয়, সেটা হয় টাক নয় টিকি, অর্থাৎ হয় নাস্তিকতা নয় অদ্বৈতবাদ।

দেখ কোথাকার জল কোথায় গড়িয়ে পড়ল। কথা বলবার একটা মস্ত অসুবিধে এই যে বেশি কথা বললে কেউ শুনতে চায় না, আবার অল্পের মধ্যে সংকীর্ণ করে বললেও কেউ বুঝতে পারে না। এ সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে, অল্প কথার মধ্যে যতটা বাহুল্য থাকে, বেশি কথায় ততটা থাকে না। তাই সাহিত্যের একটা বড় কাজ হচ্ছে সামান্য কথাকে চালিয়ে-চালিয়ে অর্থাৎ এক্‌সারসাইজ করিয়ে, তার বাহুল্য নষ্ট করা। এক্ষেত্রে যাঁরা সংযমের উপদেশ দিতে আসেন, তাঁদের এই সহজ তত্ত্বটি বুঝিয়ে বলা একেবারেই অসম্ভব যে সাহিত্যের শব্দকে মেরে ভাষাকে জব্দ করা যায়, কিন্তু একাজটি সম্যকরূপে যমের উপযুক্ত হলেও তাকে সংযম বলা চলে না।

আমাদের গুরুমশাইরা বলেন যে ভাষাটার বাড়াবাড়ি হলে তার গুরুত্ব থাকে না, কেন না তাতে করে ভাষাটা হয় ভাসা-ভাসা, অর্থাৎ হাল্কা। ও সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, ভাষার মধ্যে যে জিনিসটা যথার্থই ভাসে; অর্থাৎ আপনাকে প্রকাশ করে, তাকে ডুবিয়ে দিলে যে ডোবা সাহিত্যের, অর্থাৎ বোবা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, তাকে শোভন বলা আর মূর্খ বলা একই কথা, কেন না সে "কিঞ্চিন্ন ভাষতে"। ওর মধ্যে আরেকটু কথা আছে, সেটা আজ পর্যন্ত কাউকে বলতে শুনলুম না। সে কথাটা এই যে, যে-টাকা বাজে সেই টাকাই চলে, যেটা বাজে না সেটা

অচল; সুতরাং সাহিত্যের বাজারে বাজে কথাই চলে ভালো অর্থাৎ সেই কথাটাই চলে যার শব্দের জোর আছে। তুমি ভাবছ এটা নেহাত বাজে কথা। তা হওয়া খুবই সম্ভব, কেন না কথাটা সত্যি।

আমার একটি প্রবন্ধে আমি বলেছিলুম যে, সাহিত্যের উক্তির মধ্যে যুক্তি থাকলেই তার মুক্তি হয় না, তাতে সাহিত্যের বিস্তার হতে পারে কিন্তু তার নিস্তার হওয়া সম্ভব নয়। সম্প্রতি আমি এই কথাটির একটি চমৎকার উদাহরণ আবিষ্কার করেছি। "পল্লী সাহিত্য" বলে একটা কথা আমি অনেকদিন ধরে শুনে আসছি কিন্তু ও বস্তুটা যে কি তা আমার জানা নেই, অর্থাৎ কাল পর্যন্ত জানা ছিল না। সেইজন্য কাশীরাম পণ্ডিতের পল্লীসাহিত্য প্রবন্ধটি আমি আগ্রহ করে অর্থাৎ নিজের পয়সা খরচ করে কিনে এনেছিলুম। কিন্তু প্রবন্ধটি পাঠ করে আমার এই ধারণা জন্মেছে যে. ওতে করে আসল যে কথাটি বলা হচ্ছে, সেটা ওর মধ্যে কোথাও বলা হয়নি। বলা কথাটির অর্থই হচ্ছে কিছু কথা বলা, কিন্তু কথার উপর অসামান্য বলপ্রয়োগ করলেই যে বলা কাজটি খুব ভালো করে সম্পন্ন হয়, আমার অন্তত এরকম বিশ্বাস নেই। সাহিত্যকে তাজা করবার জন্য পণ্ডিতমশাই যে রকম তেজ প্রকাশ করেছেন, তাতে তাঁর প্রবন্ধটিকে পল্লীসাহিত্য না বলে মল্লীসাহিত্য অর্থাৎ মেয়েলি কুস্তির সাহিত্য বলা উচিত ছিল কেন না, ওর মধ্যে প্রতাপের চাইতে প্রলাপের মাত্রাই বেশি।

পণ্ডিতমশাই বলতে চান যে সাহিত্যটাকে শহরের বদ্ধবাতাসে আবদ্ধ না রেখে, তাকে "সহজ সুস্থ পল্লীজীবনের সংস্পর্শে আনা প্রয়োজন" অর্থাৎ তাকে ঘন-ঘন হাওয়া খেতে পাড়াগাঁয়ে পাঠানো দরকার। পণ্ডিতমশাই বলেন, "আমি মনে করি ইহা অতি উত্তম প্রস্তাব।" প্রস্তাবের মাঝখানে "আমি মনে করি" বলে উত্তম পুরুষের অবতারণা করলেই যে প্রস্তাবটা উত্তম হয়ে পড়ে এরকম যুক্তির জন্য ন্যায়শাস্ত্রে অনেক উত্তম-মধ্যমের ব্যবস্থা আছে। পণ্ডিতমশাই ভরসা করেন যে তাঁর ব্যবস্থামতো চললে পরে সাহিত্যের ভাব এবং ভাষা হৃষ্ট এবং পুষ্ট হবে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ঠিক তার উল্টো। শহুরে সাহিত্যিকে গ্রামের হাওয়া খাইয়ে গ্রাম-ফেড করে পুষতে গেলে যে জিনিসটা পুষ্টিলাভ করে, সেটা "গ্রামার" নয়, সেটা হচ্ছে গ্রাম্যতা।

ব্যর্গসঁ বলেছেন, মানুষের হাত পা কাটলেও সে বেঁচে ওঠে, কিন্তু তার মুড়োটা কেটে ফেললে আর সে বাঁচতে পারে না। মাথাটা যে ঘাড়ের উপর থাকে, ঘাড়ের পক্ষে তা আপত্তিকর সন্দেহ নেই। কিন্তু ও বস্তুটি যদি ওখানে না থাকত তা হলে তাতে করে দেহটা লঘু হলেও আপত্তিটা আরো গুরুতর হত। কতগুলো ইংরিজি পড়া মাথাকে বাংলা সাহিত্যের ঘাড়ের উপর বসতে দেখে, পণ্ডিতমশাই তার মুণ্ডপাত করতে চান, কিন্তু এটা তিনি ভেবে দেখেননি যে তাতে করে তাঁর নিজের প্রবন্ধকেই তিনি কবন্ধ করে ফেলছেন। যাহোক এ প্রবন্ধের একটা গুণ আছে, সেটা আমি অস্বীকার করিনে, সেটা এই যে, সাহিত্য বলতে পণ্ডিতমশাই কি বোঝেন সেটা না বুঝলেও, তিনি কি না-বোঝেন সেটা ওতে খুব স্পষ্ট করেই বোঝা যায়।

আমার কোনো-কোনো সমালোচক বলেন যে, আমার ভাষাটা খুব প্রাঞ্জল নয়। তার অর্থ বোধ হয় এই যে, আমার লেখা পড়লে তাঁদের প্রাণটা জ্বলে কিন্তু জল হয় না। তাই শুনলুম সেদিন একজন আক্ষেপ করে বলেছেন যে আমার কথাগুলো নাকি "সহজ বুদ্ধিতে বোঝা যায় না।" বোঝা যে যায় না এই কথাটুকু একেবারে বৈজ্ঞানিক সত্য, কেননা সংসারের কোনো বোঝাই আপনা থেকে যায় না, তাকে কষ্ট করে বয়ে নিতে হয়। কিন্তু সহজ বুদ্ধি বস্তুটা যে কি, সেটা আমি আজ পর্যন্ত ভেবে উঠতে পারলুম না। আমার বরাবর ধারণা এই যে, বুদ্ধি জিনিসটাই সহজ অর্থাৎ ও বস্তুটি ভগবান যাকে দেন তাকে জন্মের সঙ্গেই দিয়ে দেন। এবিষয়ে যাঁদের কিছু কমতি আছে তাঁরা বোধহয় এইটে বোঝেন না যে ঐ অভাবদোষটা তাঁদের স্বভাবদোষ।

চিরন্তন প্রশ্ন

একটা চিরন্তন প্রশ্নের বোঝা বহন করিয়া মানুষ সংসারে বিচরণ করিতেছে। প্রশ্নটা যে কি, তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর বা সুযোগ অতি অল্প লোকেরই জোটে অথচ সকলেরই মনে এ সম্বন্ধে একটা ভাসা ভাসা অনুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহার মনে প্রশ্নটা একটা সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে এবং যিনি ভরসা করিয়া তাহার একটা উত্তর দাবি করিতে পারেন জগতের চিন্তাসম্পদের হিসাবে তিনিই কৃতী লোক।

সেই একই অব্যক্ত প্রশ্ন ঘুরিয়া ফিরিয়া শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে ও ধর্মজগতে নানা ভাবে নানা আকারে জাগিয়া উঠিতেছে। সেই একই প্রশ্নের তাড়নায় মানুষের চিন্তা বিচিত্র জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়া বিচিত্র রকম উত্তরের প্রত্যাশায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মানুষ, যদি স্বচ্ছন্দ পশু-জীবনের নিশ্চিন্ততার মধ্যে তৃপ্ত থাকিতে পারিত তবে এ প্রশ্নের আদৌ কোনো প্রয়োজন হইত না কিন্তু সর্বত্রই দেখা যাইতেছে যে, তাহার দৈনিক জীবনযাত্রার আয়োজন করিতে গিয়াও, তাহাকে পদে-পদেই তাহার একান্ত প্রয়োজনীয় আহার নিদ্রা স্বাচ্ছন্দ্যের অতিরিক্ত ব্যাপার সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হয়। যে যেপথেই চলি না কেন, যে যতই চিন্তাহীন, সাধনবিমুখ, সংসারাসক্ত জীবনযাপন করি না কেন প্রশ্নটার হাত কেহই সম্পূর্ণরূপে এড়াইতে পারে না। জানিয়া হউক, না জানিয়া হউক, জীবনের সফলতার ভিতর দিয়া, না হয় জীবনের ব্যর্থতার ভিতর দিয়া, আমাদের সকল অন্বেষণ বারবার সেই একই প্রশ্নে আসিয়া ঠেকিতেছে এবং আমরা সকলেই আমাদের প্রত্যেকের সাধ্য ও অবস্থামতো চিন্তা ও আচরণের দ্বারা জগতে তাহার এক-একটা স্পষ্ট বা অস্ফুট জবাব রাখিয়া যাইতেছি।

শিল্পে ও কাব্যে, ধর্ম ও বিজ্ঞান জগতে, মানুষের সকল প্রকার সাধনা-ক্ষেত্রে, আমরা দেখিতে পাই এক-একটা প্রশ্ন থাকিয়া-থাকিয়া অনিবার্যরূপে জাগিয়া ওঠে। মানুষ তাহার প্রাত্যহিক সাধনা ও কর্তব্যানুসরণে ব্যাপৃত থাকিয়াও এক-একবার অস্থির হইয়া জিজ্ঞাসা করে, "আমার লক্ষ্য কি?" "এ অন্বেষণের শেষ কোথায়?" শিল্পীর অন্তর্নিহিত রসানুভূতি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তাঁহাকে শিল্পসাধনায় প্রবৃত্ত করে, জ্ঞানপিপাসা মিটাইবার জন্যই বৈজ্ঞানিক নব-নব জ্ঞানের অন্বেষণে ধাবিত হন, সংসারী মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় ও সুখাসক্তির লালসায়, প্রেমের আকর্ষণে বা সমাজ সংগ্রামের পেষণে সহজেই কত বিচিত্র কর্তব্যের মধ্য দিয়া চালিত হয় অথচ এই সকল অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রয়াসের মূলে যে কি একটা অপূর্ব রহস্য নিহিত আছে, মানুষ কিছুতেই তাহা ভুলিতে পারে না। জ্ঞান প্রেম ও সৌন্দর্যের সন্ধানে মানুষ নিরন্তরই ছুটিতেছে অথচ সেই সঙ্গে-সঙ্গেই প্রশ্ন করিতেছে, "কোথায় চলিয়াছি," "এ কিসের আকর্ষণ!" ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এক অজানা স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি, কেবল এই জ্ঞানটুকু লইয়াই মানুষ তৃপ্ত থাকিতে পারে না, "কোথায় চলিয়াছি" "কেন চলিয়াছি" এ প্রশ্নও সঙ্গে-সঙ্গেই চলিয়াছে। অনেক সময়ে আমরা মনে করি বুঝিবা আমাদের জ্ঞানগত কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্যই এই সকল প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করিতেছি; সেইজন্য প্রশ্নটাকে অবান্তর জ্ঞান করিয়া আমরা অনেক সময়ে তাহাকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করি। কিন্তু প্রশ্ন আর আমাদের ছাড়িতে চাহে না। কার্যত দেখা যায় আমাদের জীবনের সকল প্রশ্ন সকল সমস্যার মূলে এইরূপ একটা প্রশ্ন নিহিত রহিয়াছে। যখনই কোনো নৈতিক বা সামাজিক প্রশ্ন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হই, "কি করিব?" "কেন করিতেছি?" এই প্রশ্ন যখনই মনের মধ্যে উদিত হয়, তখনই দেখি সঙ্গে

-সঙ্গেই আর একটা প্রশ্ন ছায়ার মতো ঘুরিতেছে, "আমি কে?" "এই জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য কি?" "আমার জ্ঞান, আমার অনুভূতি, আমার ভালো-লাগা না-লাগার মধ্যে কি রহস্য লুক্কায়িত আছে?" হাতের কাছে এই সকল প্রশ্নের কোনো উপস্থিত মীমাংসা না পাইয়া মানুষ অনেক সময়ে অসহিষ্ণু হইয়া ওঠে। মানুষ মনে করে, এ আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিয়া লাভ কি? এবং গোড়ায় প্রশ্নটাকে একেবারে বাদ দিয়া একটা কোনো আপাত-যুক্তিসিদ্ধ মীমাংসার সঙ্গে আপস করিয়া লইতে চায়। ইহা হইতেই "জগতের কল্যাণ" "দি গ্রেটেস্ট্ গুড অফ্ দি গ্রেটেস্ট্ নাম্বার" "দি প্রোগ্রেস অফ্ হিউম্যানিটি" ইত্যাদি কতকগুলি যুক্তিসাপেক্ষ সংস্কারের উপর মানুষের সমগ্র ধর্ম ও কর্মনীতির প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও অদম্য প্রশ্নকে নিরস্ত করিবার কোনো উপায় দেখা যায় না। কারণ এই সকল সূত্রকে কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিলেই প্রশ্ন ওঠে, "কল্যাণ কি?" "গুড কি?" "প্রোগ্রেস কি?" এবং তাহার সঙ্গে-সঙ্গেই চিরপুরাতন প্রশ্ন আবার জাগিয়া উঠে। সকল ক্ষেত্রেই মানুষের চিন্তা দ্বারে-দ্বারে আঘাত করিয়া ফিরিতেছে, "এ প্রশ্নের সমাধান কোথায়?" এবং বার-বার একই উত্তর পাইতেছে, "অন্বেষণ করিয়া দেখ।"

কোথায় অন্বেষণ করিব? কিসের অন্বেষণ করিব? অন্বেষণ তো নিরন্তরই চলিয়াছে কিন্তু আমাদের অন্বেষণ মূল প্রশ্নে আসিয়া ঠেকিতেছে কই? বাস্তবিক আমাদের অন্বেষণ প্রশ্নেরই অন্বেষণ—প্রশ্নকে যখন ঠিক ধরিতে পারি তখন উত্তর পাইতে আর বিলম্ব হয় না। মানুষের চিন্তা, মানুষের সাধনা, মানুষের সামাজিক-রাজনৈতিক সকল প্রকার প্রয়াসের মধ্যে প্রশ্নটাকে বারবার নানাদিকে নানা বিচিত্ররূপে জাগিয়া উঠিতে দেখা যায়। যাহার মধ্যে প্রশ্ন এরূপে জাগে তাহার নিকট অন্বেষণের একটা পথ খুলিয়া যায়, কিন্তু সে পথ যে দেখে নাই তাহার অন্বেষণ কেবল একটা অস্থির অনিশ্চিততার মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়ায়, "এই পাইলাম" "এই যে আলো" "এই আমার পথ" বলিয়া যেকোনো একটা অবান্তর আপাততৃপ্তিকর উপায় ও মীমাংসাকে আশ্রয় করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে চায়। সেই জন্যই আমাদের সাধনা পদে-পদেই লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। আমরা চাই শাশ্বত আনন্দ, খুঁজি সংসারের সুখ, চাই জীবন্ত সত্য, খুঁজি শাস্ত্রবাণী ও পণ্ডিতের প্রমাণ, চাই জ্ঞান ভক্তি, খুঁজি কল্পনা ও ভাবুকতা। "যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।" কিন্তু যদি কোথাও ঠিক মতোই চাই এবং মনের মতোই পাই, তবেই কি প্রশ্নটা মিটিয়া যায়? আমরা অনেক সময়ে তাহাই মনে করি। প্রশ্ন যে সকল ক্ষেত্রেই সকল অবস্থাতে বিচিত্ররূপী অনন্তরূপী, আমরা অনেক সময়েই তাহা ভুলিয়া যাই। যখন যেরূপ উত্তর পাই মনে করি "ইহাই শেষ উত্তর, ইহাই চরম মীমাংসা।" তাহাতেই তৃপ্ত হইয়া প্রশ্নটাকে একেবারে ঝাড়িয়া মিটাইয়া ফেলিতে চাই। কিন্তু প্রশ্ন তাহাতে নিরস্ত হইবে কেন?

জীবন সমস্যার সহিত সংগ্রামে মানুষ সহজে পরাস্ত হইতে চায় না, কিন্তু পদে-পদেই সন্ধি করিতে চায়। মনকে ভুলাইবার মতো একটা কিছু পাইলেই, সন্দেহের প্রবল তরঙ্গের মধ্যে একটু দাঁড়াইবার মতো স্থান দেখিলেই, মানুষ সেইখানে আসিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে চায়, তাহারই মধ্যে বাসা বাঁধিয়া চিরকালের মতো নিরুপদ্রবে বিশ্রাম করিতে চায়। অনেক সময়েই মানুষ যতটা বিশ্বাস করিতে চায়, সন্দেহকে অতিক্রম করিয়া ততদূর যাইতে পারে না। অতর্ক-প্রতিষ্ঠ সত্যকে তর্ক-যুক্তির উপর দাঁড় করাইতে গিয়া ধরিবার ছুঁইবার মতো একটা নিশ্চিত জমি খুঁজিয়া পায় না। অথচ প্রাণের মধ্যে সত্যের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ রহিয়াছে, যে অব্যক্ত শক্তির টানে মানুষের নিরন্তর জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাতে, দৃশ্য হইতে অদৃশ্যের

দিকে উন্মুখ করিয়া তুলিতেছে, তাহাকেও এড়াইবার কোনো উপায় নাই! সেইজন্য মানুষ সন্দেহাতীত সত্যকে না পাইয়া একটা যেমন-তেমন মনগড়া মীমাংসায় তৃপ্ত থাকিতে চাহিয়াছে, তাই মানুষ সত্যকে ছাড়িয়া, জ্ঞানকে ছাড়িয়া, যুক্তি হইতে কল্পনায়, কল্পনা হইতে রূপকে, রূপক হইতে তুচ্ছ ভাবুকতায় অবতরণ করে। কিন্তু সন্দেহের কবল হইতে খঞ্জ বিশ্বাস ও দুর্বল কল্পনাকে কে রক্ষা করিতে পারে? সত্য যখন স্বয়ং প্রাণের দ্বারে আঘাত করিতে থাকে, তখন সে কি বলিতে চায় তাহা না বুঝিলেও, সেই অঘাতকে উপেক্ষা করি কিরূপে? অথচ অপর দিকে আপাত-অজ্ঞাত সত্যের খাতিরে আমাদের চিরাভ্যস্ত সংস্কারের বন্ধনকে অতিক্রম করাও সহজ নহে। সেইজন্য মানুষের চিন্তা ও কার্যে, বিচারবুদ্ধি ও কর্মজীবনে কেমন একটা বিরোধ যেন থাকিয়াই যায়, এবং এই বিরোধ হইতেই প্রশ্ন আবার নূতন করিয়া জাগিয়া ওঠে। একটা আপাত-বিরোধী দ্বন্দ্বকে আশ্রয় করিয়াই প্রশ্ন যুগে-যুগে দেশে-দেশে আপনাকে প্রকাশিত করিয়া থাকে। এক এবং অনেকের দ্বন্দ্ব, নিত্য ও অনিত্যের বিরোধ, ভিতর ও বাহির, জড় ও চেতন, আত্মা ও জগৎ ইত্যাদি ভেদকল্পনার অসামঞ্জস্য, এ সকল একই প্রশ্নের ভিন্ন-ভিন্ন রূপ।

মানুষের চিন্তা যেখানেই বিশ্রাম করিতে চায়, তাহার জিজ্ঞাসা যেখানেই তৃপ্ত ও নিরস্ত হইতে চায়, বিরোধ সেইখানেই প্রবল হইয়া ওঠে, সেইখানেই আবার নূতন সংগ্রাম জাগিয়া ওঠে। মানুষ যতবার বলিয়াছে, "দাস্ ফার এণ্ড নো ফারদার" এইখানেই আমার প্রশ্ন ও উত্তর, চাওয়া এবং পাওয়ার শেষ, ততবারই সে ঠকিয়াছে এবং ঠেকিয়া শিখিয়াছে যে শেষ কোথাও নাই। গোড়ায় গিয়া না পৌঁছিলে শেষকে পাওয়া যায় না। আঘাতের. পর আঘাত আসিয়া মানুষকে বারবার এই শিক্ষাই দেয়, "বিশ্রাম তোমার জন্য নয়, সত্যকে যে সাক্ষাৎভাবে, জীবন্তভাবে, সমগ্রভাবে পায় সেই কেবল বিশ্রাম করিতে জানে, "তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং।" মানুষ একদিকে আপস করিতে যায়, সন্ধির প্রাচীর তুলিয়া সন্দেহের তরঙ্গাঘাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে চায়, আর একদিক দিয়া নূতনতর সন্দেহের বন্যা আসিয়া তাহার বাঁধ ভাঙিয়া তাহার কল্পনার ঘর-বাড়িকে একেবারে ডুবাইয়া ভূমিসাৎ করিয়া দেয়। মানুষের সমগ্র জীবন ও চিন্তার ইতিহাস এইরূপ সন্ধি ও বিদ্রোহ পরম্পরারই ইতিহাস।

আজকাল এইপ্রকার একটা বিরোধকে শিল্পজগতে আমরা বিশেষভাবে দেখিতে পাই। "শিল্পের মূল উৎস কোথায়?" "শিল্পের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও সার্থকতা কিসে?" এইরূপ একটা প্রশ্ন মানুষের শিল্পসাধনার সঙ্গে চিরকালই জড়িত আছে। যেখানে মানুষ সৌন্দর্যবোধকেই শিল্পের উৎস বলিয়া বুঝিয়াছে, সেইখানেই সৌন্দর্যের সন্ধান পড়িয়া গিয়াছে, সৌন্দর্য-পিপাসু মানুষ শিল্পরচনার জন্য প্রকৃতির রাজ্যে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া সৌন্দর্য চয়ন করিয়া বেড়াইয়াছে। সৌন্দর্যের আলোচনা, সৌন্দর্যের সাধনা, সৌন্দর্যের ধ্যান, আলোকের মহিমায় সৌন্দর্য, ছায়ার রহস্যে সৌন্দর্য, দেহের গঠনে সৌন্দর্য, বর্ণের বৈচিত্র্যে সৌন্দর্য, প্রকৃতির নির্বাত গাম্ভীর্যে সৌন্দর্য, গতির মৃদুচঞ্চল ছন্দের মধ্যে সৌন্দর্য! এমনি করিয়া মানুষ বাহিরের সৌন্দর্যকে তন্ন-তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়াছে, সাধনের ভিতর দিয়া, অনুভূতির ভিতর দিয়া, গভীর যোগের ভিতর দিয়া, সৌন্দর্যের পরিচয় গ্রহণ করিয়াছে, কখনো বিরাটভাবে তাহার সমগ্রতাকে, কখনো খণ্ড-খণ্ড করিয়া তাহার বিশেষ-বিশেষ প্রকাশকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু সৌন্দর্যকেও মানুষ নির্বিচারে গ্রহণ করিতে পারে নাই। যাহাকে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে অনুভূতির দ্বারা পায়, তাহাকেও বুঝিতে গিয়া মানুষ তর্ক-বিচারের মারামারির মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে আবার প্রশ্ন উঠিয়াছে, সৌন্দর্যকে এরূপ বাহিরে অন্বেষণ কর কেন? সৌন্দর্য কি বাহিরের

জিনিস? "সৌন্দর্য" বলিয়া একটা স্বতন্ত্র জিনিস কি এই সকল দৃশ্য পদার্থের গায়ে মাখানো থাকে যে তাহাকে খুঁটিয়া-খুঁটিয়া বাহির করিতে হইবে? তোমার অন্তরে যে সৌন্দর্যের আদর্শ রহিয়াছে, তাহাকেই বাহিরে প্রতিফলিত দেখিতেছ। অতএব প্রকৃতির বাহিরের চেহারা দেখিয়া ভুলিও না। তাহার রূপের দাস হইও না। অন্তরের মধ্যে যে সৌন্দর্যের ছাপ রহিয়াছে তাহাকেই চিনিতে শেখ, এবং তোমার শিল্পের মধ্যে দিয়া তাহাকেই পরিস্ফুট করিয়া তোল।

আপাতত মনে হইতে পারে বুঝি একটা ভালো মীমাংসা পাওয়া গেল, কিন্তু ইহার মধ্যে সমন্বয়বাদী আসিয়া নূতন সুর ধরিলেন, "ভিতরই বা কি আর বাহিরই বা কি? যাহাকে ভিতর বল, আর যাহাকে বাহির বল, তাহাদের মধ্যে বিরোধই বা কোথায়? ভিতর হইতে বাহির, বাহির হইতে ভিতর, মানুষের সকল সাধনাই তো এই ভাবেই চলিয়া থাকে। বাহিরে যে সৌন্দর্য দেখ, অন্তরের আদর্শের সহিত তাহাকে মিলাইয়া লও, আমার অন্তরে যে অব্যক্ত সৌন্দর্য আছে বাহিরের রূপের মধ্যে তাহাকেই অন্বেষণ কর। বাহিরের রূপকে অন্তরের ভাবের দ্বারা বুঝিয়া, বুঝাইয়া দাও এবং অন্তরের ভাবকে বাহিরের রূপের মধ্য দিয়া জগতের কাছে প্রকাশ কর। অন্তর ও বাহিরের মধ্যে এই পরিচয়কে নিগূঢ় যোগে পরিণত করাই শিল্পীর সাধনা এবং সে যোগপ্রসূত আনন্দ হইতেই তাহার শিল্পের উৎপত্তি।" মীমাংসাটা শুনিতে বেশ তৃপ্তিকর বোধ হয়, মানুষের মন সহজেই ইহাতে সায় দিতে চায়। কিন্তু কার্যত সর্বত্রই দেখা যায়, কেবল বিচারলব্ধ কোনো সিদ্ধান্তের দ্বারা জীবনের কোনো প্রশ্ন, কোনো সমস্যারই মীমাংসা হয় না। মীমাংসাকে জীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা আবার নূতন করিয়া আর্জন করিতে হয়, জ্ঞানের সিদ্ধান্তকে হাতে-কলমে পরীক্ষা করিয়া আয়ত্ত করিতে হয়।

মানুষ যতক্ষণ তাহার অভিজ্ঞতার মধ্যে হাতড়াইয়া সাধনার উৎসকে ধরিতে না পায়, যতক্ষণ সে আপনার শিল্পীরূপকে ঠিকমতো চিনিতে না পারে, ততক্ষণ তাহার সাধনাকে নিরাপদ মনে করা চলে না। ততক্ষণ সে হয় উৎকট উৎকেন্দ্র স্বেচ্ছাচারিতার দাস হইয়া পড়ে, না হয় বিশেষত্ব-বর্জিত গতানুগতিকতার মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলে। একবার কোনো বিশেষ শিল্প বিশেষ ফ্যাশান, বিশেষ প্রথাতন্ত্রতার পশ্চাতে ছুটিয়া যায়, আবার বিদ্রোহী হইয়া প্রথা, সংস্কার, ট্র্যাডিশন্ মাত্রকেই বন্ধন জ্ঞানে ভাঙিতে চায়। একবার শিশুর মতো, অন্ধের মতো নির্বিচারে বহিঃপ্রকৃতির অনুসরণ করে, আবার মুখ ফিরাইয়া প্রকৃতি-চর্চাকেই উচ্চশিল্পের অন্তরায় জ্ঞানে খড়্গহস্ত হইয়া ওঠে। শিল্প আজ হয়তো সাক্ষ্য দিতেছে, "সত্যকে রেখাবর্ণাদি দ্বারা তর্জমা করিলেই সত্যকে ব্যক্ত করা হয় না, রূপক ও অলঙ্কারের দ্বারা কন্‌ভেনশন্ ও সিম্বলিজম্-এর ইঙ্গিতে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হয়। শিল্পের সত্য বাহিরের রূপে নয়—রূপের মধ্যে নিহিত অর্থগৌরবেই সত্য।" কিন্তু আজ সে যত জোরের সঙ্গেই কথা বলুক না কেন, কাল না হউক দুদিন বাদে তাহাকে এ সুর একবার বদলাইতেই হইবে, একবার তাহাকে বলিতেই হইবে, "সত্য আপনার মহিমায় আপনি প্রতিষ্ঠিত, তাহার জন্য অলঙ্কার আড়ম্বরের প্রয়োজন কি? তাহাকে যেমন সাক্ষাৎভাবে গ্রহণ করি তেমনি সহজ সুন্দর স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ করিতে হয়। আমরা যে সেরূপ করিতে পারি না, ক্রমাগতই অলঙ্কার ও উপমার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হই, তাহা আমাদেরই অক্ষমতা—প্রকাশের অক্ষমতা, ধারণার অক্ষমতা, ভাষার অক্ষমতা। উপমা খঞ্জশিল্পের যষ্টি, শিল্পের একটা আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র। সে যখন শিল্পে কাব্যে ও চিন্তারাজ্যে সর্বেসর্বা হইয়া সত্যের আসনে বসিতে চায়, তখন তাহাকে ঘাড় ধরিয়া একেবারে নামাইয়া দেওয়া উচিত। যাহাকে 'রূপ' বলি, 'বাহিরের সত্য' বলি, শিল্পের চক্ষেও সে সত্য

এবং আদরণীয়, আপনার মহিমাতেই সত্য, কেবল শিল্পীর ব্যাখ্যার খাতিরে সত্য নয়। তাহাকে জানা, তাহার সাধনা করা, শিল্পীর পক্ষে সর্বতোভাবে কর্তব্য।"

এইরূপ দুইটা বিভিন্ন সুর শিল্পজগতে, শুধু শিল্পে কেন, সর্বত্রই থাকিয়া যায়, এবং এইরূপ থাকাই প্রয়োজন। কারণ এ উভয়ই সত্য, ঠিক সত্যকে ধরিতে পারিলে, তাহার মধ্যে এই দুই মীমাংসারই যথার্থ স্থান পাওয়া যায়। বর্তমান সময়ে কিউবিস্ট্, ফিউচারিস্ট প্রভৃতি কয়েকটি বিপ্লববাদীদল এইসকল খণ্ডতত্ত্বকে ভাঙিতে গিয়া আপনাদের অজ্ঞাতসারে একেবারে ঠিক সত্যটাকে, মূল প্রশ্নটাকে, বাহির করিয়া ফেলিয়াছেন। ইঁহারা বলেন, "সুন্দর, অসুন্দর আবার কি? শিল্পের রাজ্যে আবার আইন কানুন কি? অসত্য, অসুন্দর ইত্যাদি কল্পনা শুধু নিরর্থক কল্পনা মাত্র। মানুষ যখনই একটা কিছু বাহিরের জিনিসের অনুসরণ করিতে চায়— তা সে প্রথাতন্ত্রতাই হোক বা রূপের সাধনাই হোক, আচার্যের উপদেশই হোক আর সৌন্দর্যনামধারী কুসংস্কারই হোক, তাহার উপর সর্ববাদীসম্মতির ছাপ থাকুক আর নাই থাকুক, এই অনুসরণই দাসত্ব, এই অনুসরণই বন্ধন। অতএব, সর্বপ্রথমে সাধনের মূলগত এই বন্ধনকে ভাঙ, সর্বপ্রকার সংস্কারের অনুসরণকে বর্জন কর। তোমার শিল্পের নিয়ম, তোমার ক্যাননস্ অফ আর্ট, তোমার সৌন্দর্যের সংস্কার, তোমার ট্র্যাডিশনের নজীর, তোমার ইচ্ছা অনিচ্ছা, যেখানে তুমি দাসখত লিখিয়াছ, সব ভাঙিয়া কেবল বিদ্রোহের পতাকা তুলিয়া রাখ। দেখিবে এই নির্মমতার মধ্য হইতেই পরমতত্ত্ব প্রকাশিত হইবে। কাহাকে অসুন্দর বলিয়া শিল্পরাজ্য হইতে নির্বাসিত করিতে চাও? ওই অসুন্দরেরই তপস্যা করিয়া দেখ—'উই শ্যাল রেভ্‌ল ইন আগ্‌লিনেস, উই শ্যাল ট্র্যাম্প্‌ল্ অন দি বনডেজ অফ ফর্‌মস অ্যাণ্ড দি টিরানি অফ আইডিয়াস', রূপের বন্ধন ও ভাবের অত্যাচার উভয়কেই পদদলিত করিয়া অসুন্দরেই মত্ত হও। চিত্তকে সর্বসংস্কার বিমুক্ত করিয়া একেবারে নিরঙ্কুশভাবে ছাড়িয়া দাও, সে আপনাকে যথেচ্ছা প্রকাশ করুক।" শিল্পীর এই যে বিদ্রোহীমূর্তি, ইহার বিদ্রোহের আবরণ খসিলেই ইহার প্রকৃত চেহারা প্রকাশ পাইবে। বিপ্লবালোড়িত পঙ্কিলতা যখন কালক্রমে সাধনার স্থিরতার মধ্যে তলাইয়া যাইবে তখন এই বিপুল মন্থন ব্যাপারের মধ্য হইতে এই পরমতত্ত্ব আবির্ভূত হইবে, "আপনাকে প্রকাশ কর আপনাকে প্রকাশিত হইতে দাও।" আপনাকে যে পরিমাণে পাইবে, আপনাকে যে পরিমাণে বিলাইয়া দিবে, তোমার শিল্পসাধনা, তোমার যে কোনো সাধনা, সেই পরিমাণে সার্থক হইবে। বাহিরের আশ্রয় আশ্রয়ই নহে, বাহিরের উপদেশের উপর বাহিরের উদ্দীপনার উপর তোমার শেষ নির্ভর রাখিও না, অন্তরের প্রেরণাই তোমার নির্ভর। তোমার বিচিত্র অপূর্ণতার মধ্যেই তোমার পূর্ণরূপ সার্থকরূপ নিহিত রহিয়াছে, তাহাকে বিকশিত হইতে দাও, তোমার সমস্ত লক্ষ্যহীন ব্যথতার মধ্যে "আদর্শরূপী" তুমি ছায়ার মতো ঘুরিতেছ, সেই আদর্শকে তোমার মধ্যে প্রকাশিত হইতে দাও।

শিল্পরাজ্যে যেরূপ দেখা যায়, সেইরূপ মানুষের সকল প্রকার সাধনা ক্ষেত্রেই তাহার অন্বেষণের সকল প্রকার খুঁটিনাটির মধ্যে কতকগুলি বিপরীতমুখী অথচ পরস্পর সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থাভেদে ইহাদের মধ্যে কখনো একটি কখনো অপরটি প্রবল হইয়া উঠিতে চায় এবং সেই সঙ্গে মানুষের জিজ্ঞাসাও মূল প্রশ্নের একমাথা হইতে আরেক মাথায় ঘুরিয়া বেড়ায়। বাতাস গ্রহণ ও বাতাস মোচন এই দুই ব্যাপারের মিলনে যেমন শ্বাসকার্য সম্পূর্ণ হয়, সেইরূপ মানুষের অন্বেষণের সাফল্যের জন্য তাহার সকল জিজ্ঞাসার মধ্যে একটা অন্তর্মুখী ও একটা বহির্মুখী ঝোঁক থাকা প্রয়োজন।

একবার মানুষ জগৎ ব্যাপারের দিকে চাহিয়া বলে, "জগৎটা একরকম বোঝা গেল, কিন্তু যে বুঝিল সে কে? ইহার মধ্যে 'আমি' লোকটা দাঁড়ায় কোথায়?" আবার যখন নিজের দিকেই তাহার দৃষ্টি পড়ে তখন সে বলে, "আমি যে সব জানিতেছি, তাহা না হয় বুঝিলাম কিন্তু যাহাকে জানিতেছি সেটা কি এবং এই জানার অর্থই বা কি?"

বিজ্ঞানের চক্ষে প্রশ্নটা এইরূপ একটা জটিলতার মধ্য দিয়া দেখা দিতেছে। বিজ্ঞানের অন্বেষণ এতকাল আত্মাকে ছাড়িয়া চৈতন্যকে ছাড়িয়া জগৎ-ব্যাপারের সন্ধানে জড়প্রবাহের পশ্চাতেই ছুটিয়াছে। তাহার মধ্যে আত্মাকে কোথায় স্থান দিবে বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত তাহার কোনো রূপ কিনারা করিয়া উঠিতে পারে নাই। বিজ্ঞান কেবল জগতের সাক্ষ্যকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছে, "অতীতে এই পথে আসিয়াছি, বর্তমানে এই পথে চলিতেছি, এইভাবে জড়জগৎ আপনাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, এইরূপ বিচিত্র নিয়ম বন্ধনের ভিতর দিয়া সৃষ্টিপ্রবাহ মুহূর্তে-মুহূর্তে আপনার ভবিতব্যকে গড়িয়া তুলিতেছে।" একের বিচিত্রলীলাকে বিচিত্ররূপে খণ্ডিত করিয়া দেখা এবং সেই বিচিত্র খণ্ডতাকে আবার জোড়া দিয়া অখণ্ড নিয়মের একত্বকে প্রতিষ্ঠিত করাই বিজ্ঞানের সাধনা। কিন্তু এই সাধনার একটি সূত্রকে বিজ্ঞান আপনার সংগ্রামের দ্বারা কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছে না। বিজ্ঞান আপনার আত্মশিবির ছাড়িয়া যুক্তিবিচারের অকাট্য অস্ত্রে ক্রমাগতই জগৎ-শৃঙ্খলার ব্যূহ ভেদ করিয়া তাহার ভিতরকার নিয়ম বন্ধনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং দেশ-কাল, একত্ব-বহুত্ব, সত্তা শক্তি ও চৈতন্য, এই সপ্তরথীর সহিত নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া পদে-পদেই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে। আর সকলকে একরকম এড়ানো যায় কিন্তু ঐ যে ব্যূহের মুখে, ভিতর বাহিরের সন্ধিস্থলে চৈতন্যরূপী জয়দ্রথ বসিয়া আছেন, বিজ্ঞানের অস্ত্রে তো তাহার গায়ে কোনো দাগ পড়ে না। বিজ্ঞান নিজ বলে আত্মার শিবিরে ফিরিবে কোন পথে?

যে দেশকালাশ্রিত পরিবর্তন-পরম্পরাকে আমরা সংসাররূপে জানিতেছি, বিজ্ঞান এই অবিরাম গতির পূর্বাপর কিছুই দেখিতে পায় না, তাহার মূলে একটা স্থিতিরূপ কেন্দ্রেরও কোনো সন্ধান পায় নাই। অথচ এই পরিবর্তন-স্রোতের মধ্যে নিত্য, আপনাতে-আপনি-স্থিত, একটা কিছু না থাকিলে সমস্ত গতিটাই একটা নিরর্থক ব্যাপার হইয়া পড়ে। বিজ্ঞান এক সময়ে জড়পরমাণুর স্থায়িত্বের উপর নিত্যকার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল। বিজ্ঞান বলিয়াছিল, " এই শক্তির বিচিত্র লীলার মধ্যে শক্তির কেন্দ্ররূপে, অনন্ত গতির অন্তর্নিহিত স্থিতিরূপে এই অজ্ঞাতজন্ম শাশ্বত পরমাণু বর্তমান। এই প্রবহমান নিত্য পরমাণুর বিচিত্র সংযোগ বিয়োগকেই আমরা জগৎ-ব্যাপাররূপে জানিতেছি।" কিন্তু বিজ্ঞান যে আপাতস্থায়িত্বকে নিত্য নামে অভিহিত করিয়াছিল, তাহার মধ্যে আমরা গতি শক্তির কোনোরূপ মীমাংসা পাই নাই। বিশেষত আজকাল পরমাণু সম্বন্ধে সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাহার মধ্যে একান্ত অনিত্যতার যে সকল প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহার ফলে বিজ্ঞান তাহার পূর্বতন নিশ্চিন্ত ভরসা হারাইয়া, এখনো কোনো কিছুকেই নিত্য বলিতে সাহস পায় না। গতির কেন্দ্রে পরমাণু, পরমাণুর মধ্যে সূক্ষ্মতর গতি—বিজ্ঞানের অন্বেষণ এইরূপ চক্রের মধ্যেই ঘুরিতেছে। একটা অন্ধ আবর্তের মধ্যে পড়িয়া বিজ্ঞান মূল প্রশ্নের আশেপাশেই ঘুরপাক খাইতেছে অথচ কোথাও প্রশ্নে আসিয়া ঠেকিতেছে না। সুতরাং প্রশ্ন থাকিয়াই যাইতেছে, "শক্তির মূলে কে?" শক্তি-ব্যাপারটা গতিরই নামান্তর মাত্র, এই মুহূর্তে যাহা এখানে পর মুহূর্তে তাহা ওখানে—এইরূপ কালভেদে জড়ের দেশভেদের নামই গতি। সুতরাং অনেকের মতে শক্তি তেমন একটা প্রশ্নের বিষয় নয়, জড়পদার্থের স্বরূপ লইয়াই আসল সমস্যা। কেহ বা বলেন, দেখা দরকার, শক্তি এবং জড় ইহাদের মধ্যে কাহার মূলে কে? অথবা ইহারা কি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু, না ইহাদের উভয়ের মূলে ইথার বা ইলেক্‌ট্রন্ বা অপর কোনো সমন্বয়তত্ত্ব নিহিত আছে?

আবার কেহ-কেহ প্রশ্নটাকে একেবারেই বাদ দিতে চান। তাঁহাদের মতে, একেবারে গোড়ায় গিয়া ঠেকিলে কোন জিনিস স্বরূপত কিরূপ দাঁড়ায় সে আলোচনা নিষ্ফল এবং অন্তত বিজ্ঞানের তরফ হইতে, সে বিষয়ে মাথা ঘামাইবার কোনো আবশ্যকতা দেখা যায় না।

কিন্তু প্রশ্ন যখন একবার উঠিয়াছে, তখন এরূপ উত্তরে মন প্রবোধ মানিবে কেন? যে শক্তির প্রেরণায় সৃষ্টিপ্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছি, যে শক্তির নিরন্তর আঘাতে জীবন গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাকে যতক্ষণ লক্ষ্যহীন অন্ধপ্রবাহরূপে জানিতেছি ততক্ষণ তাহার সঙ্গে কোনোরূপ আদানপ্রদানের সম্বন্ধ কল্পনা করা চলে না। বলিতে হয়, প্রবহমান শক্তির মধ্যে এই অন্ধ সংঘাতের ফলে আমার জ্ঞান-শক্তিটুকু লইয়া আমি ভাসিয়া উঠিয়াছি, সে শক্তি জানিত না আমার মধ্যে সে কি অমূল্য সম্পদরূপে বিকশিত হইতেছে। সৃষ্টিবিকাশের আলোচনা করিতে গিয়া মানুষ যখন ক্রমোন্নতির কথা বলিতেছিল, বিজ্ঞান তাহাকে ধমক দিয়া বলিয়াছিল, "উন্নতি নয়, পরিণতি।" অন্ধশক্তি আপনার মধ্যেই আপনাকে সংযত করিবার জন্য, আপনার বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার চেষ্টায় অন্ধ সংগ্রামের দ্বারা আপনার সংঘাতে আপনি গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাকে "অন্ধ" বলিতে না চাও আত্মপ্রণোদিত বল কিন্তু জ্ঞানপ্রসূত বা চৈতন্যময় বল কেন? সে আপনার ঝুঁকিতে, আপনার অনিবার্য গতির প্রেরণায় অনিবার্য অজ্ঞাত পরিণতির দিকে ছুটিয়াছে, তুমি কেন তাহার উপর তোমার জ্ঞান, তোমার চিন্তা, তোমার অতৃপ্তি, তোমার ভবিষ্যতের আশাকে আরোপ করিতেছ? জগৎ-ব্যাপার কেবল বর্তমানকেই জানে, বর্তমানকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। সে অতীতের সোপান বাহিয়া আসিয়াছে এবং অতীতের ছাপ নিজ দেহে ধারণ করিতেছে সত্য, কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই সে অতীতকে ছাড়িয়া অতীতের বোঝাকে, অতীতের সঞ্চয়কে, নূতন হইতে নূতনতর বর্তমানতার মধ্যে বহন করিয়া আনিতেছে। সুদূর পরিণতির কোনো সংবাদ সে রাখে না, প্রতিমুহূর্তের পরিণতিই তাহাকে পরমুহূর্তের পথ দেখাইয়া দিতেছে।

সৃষ্টিপ্রবাহের মধ্যে যে একটা নিরবচ্ছিন্নতা দেখা যায়, যাহা সমস্ত জগৎকে দেশে এবং কালে খণ্ডিত করিয়াও, সংযোগসূত্ররূপে সমগ্র খণ্ডতাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, এখন প্রতি মুহূর্তে এই প্রবাহের নিত্যতাকে রক্ষা করিতেছে, বিজ্ঞান এখনো জিজ্ঞাসু হইয়া তাহার দ্বারে আঘাত করিয়া দেখে নাই। অথচ ইহারই মধ্যে বিজ্ঞানের সকল সাধনা সকল অন্বেষণের সমন্বয়তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং পরোক্ষভাবে জ্ঞানলক্ষণ-সম্পন্ন একটা অকাট্য প্রেরণা শক্তিকে প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াও বিজ্ঞান এই জ্ঞান বস্তুটাকে কোথাও ধরিতে চেষ্টা করে নাই। কারণ, বিজ্ঞান তো চৈতন্যকে খুঁজিতে আসে নাই, সে শক্তির নিয়মকেই খুঁজিয়াছে, এবং সেই জন্যই পদে-পদেই জীবন্তজ্ঞানের সাক্ষ্য পাইয়াও সে তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছে।

আপনার মধ্যে যখন জ্ঞানকে অন্বেষণ করি, আপনার জ্ঞানের মধ্যে আপনার অন্বেষণের মধ্যে আপনার সত্ত্বারহস্যের মধ্যে যখন খুঁজিয়া দেখি, তখন তো জ্ঞানরূপী অখণ্ডতাকে দেখিতে পাই-ই, যে দেখিতে জানে সে বাহিরের দিক দিয়া, নিয়মের অন্বেষণ ও খণ্ডতার সাধনের মধ্য দিয়াও তাহাকে প্রচুর পরিমাণেই পায়। মানুষ বর্তমানের সঙ্গে খানিকটা অতীত ও খানিকটা ভবিষ্যৎকে সর্বদাই জুড়িয়া রাখিয়াছে। একদিকে সে আপনার অভিজ্ঞতা, স্মৃতি ও সংস্কারের দ্বারা তাহার প্রতিমুহূর্তের জীবনকে একটা ব্যাপকতা প্রদান করিতেছে, অপর দিকে তাহারই সঙ্গে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সাক্ষ্য জুড়িয়া দিয়া সে আপনার জ্ঞান ও চিন্তাকে আরো সুদূর অতীতের আভাস ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিতের মধ্যে ছড়াইয়া দিতেছে। বিলুপ্ত অতীত ও অনাগত ভবিষ্যৎকে সে আপনার জ্ঞানের ভিতর দিয়া এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় বাঁধিয়া রাখিতেছে। শুধু কালের দিক দিয়া নয়, দেশের দিক দিয়াও দেখা যায় যে, কার্যত সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে দেহাত্মবাদী হইলেও পদে-পদেই

আমরা এই শরীরকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছি, আমাদের চেতনা আমাদের প্রাণস্ফূর্তি আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের ভিতর দিয়া আমরা প্রতিমুহূর্তেই দেহের গণ্ডীকে লঙ্ঘন করিয়া বহির্জগতে ছড়াইয়া পড়িতেছি। বাহিরে যেমন আহার-নিশ্বাসাদির মধ্যে দিয়া জগতের সঙ্গে আদান-প্রদান চলিয়াছে তেমনি চেতনার ভিতর দিয়াও নিরন্তর একটা বোঝাপড়া চলিয়াছে। শুধু যদি চোখটুকুকে আমার দর্শনেন্দ্রিয় মনে করি, তাহার সঙ্গে আদ্যোপান্তযোগযুক্ত "ইথার"-সমুদ্র ও জগৎব্যাপী আলোকতরঙ্গকে না দেখি, তবে ইন্দ্রিয় জিনিসটা একটা নিরর্থক ব্যাপার হইয়া পড়ে। টেলিগ্রাফের যন্ত্র হিসাবে শুধু সংবাদ গ্রাহক কলটুকু একটা কলই নহে, বিদ্যুৎপ্রবাহ ও সুদূরপ্রসারিত তার অথবা ইথার-বন্ধনকে ছাড়িয়া তাহার কোনো সার্থকতাই নাই। আলোকতরঙ্গ আমার চক্ষে আঘাত করিবামাত্র, চেতনা উদ্বুদ্ধ হইয়া, সেই আলোককে আশ্রয় করিয়াই, দেহকে অতিক্রম করিয়া যায়—-এই আলোক, এই বাহির, এই জগৎ, এই বৃক্ষলতা, এই সুদূর আকাশ, এইরূপ করিয়া প্রতি অনুভূতি প্রতি ইন্দ্রিয়বোধের ভিতর দিয়া, চেতনা ছুটিয়া গিয়া জগতের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আপনার মধ্যে টানিয়া আনে। এইরূপভাবে চিন্তা করিতে গেলে দেখা যায়, এই একটা হস্তপদবিশিষ্ট জড় পিণ্ডই আমার শরীর নহে—ইহা আমার দেহের কেন্দ্রমাত্র, আসলে সমস্ত জগৎ নিখিলবিশ্ব আমারই বিরাট শরীর।

বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি ও সূক্ষ্ম জটিলতার মধ্যে মন যখন আপনার সম্যক্ দৃষ্টিকে হারাইয়া ফেলে বাহিরের খণ্ডতার মধ্যে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া যখন সে আর পথ খুঁজিয়া পায় না, তখন পরিশ্রান্ত মানুষ তাহার চিরন্তন প্রশ্নের বোঝাকে আপনার মধ্যে অন্তরের দ্বারে ফিরাইয়া আনে। এই যাওয়া এবং আসা যখন সম্পূর্ণ হয়, তখন মানুষ আপনার মধ্যে প্রশ্নকে ও প্রশ্নের অন্তর্নিহিত সাম্যকে আবার যথার্থভাবে দেখিতে পায়। তখন মানুষ বুঝিতে পারে বাহিরের সাধনা দ্বারা যে "আমি"-কে আমরা অন্বেষণ করি, সে আমাদের প্রকৃত স্বরূপ নয়। বিবর্তনবাদের ভিতর দিয়া, জগতের সম্বন্ধের ভিতর দিয়া, মানব-ইতিহাসের ভিতর দিয়া আমার যে চেহারাকে দেখিতে পাই, সে কেবল আমার একটা বাহিরের ছায়া মাত্র। এই ভ্রান্ত আমিত্বের সংস্কারকে আবার জ্ঞানের আঘাতে ভাঙিয়া দেখিতে হয়। আমি এই দেহ নই, এই দেহের মধ্যে আবদ্ধ শক্তিবিশেষ নই, আমি এই প্রবহমান পরিবর্তন-পরম্পরা নই—

মানুষ-আকারে বদ্ধ যে-জন ঘরে
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে
যাহারে কাঁপায় স্তুতি নিন্দার জ্বরে—

কেবল সেই আমিই আমি নই। এই সকল যাহার ছায়া আমি সেই সত্যবস্তু, আমার জীবনস্রোতের অনিত্যতার মধ্যে নিত্যরূপে আমিই বর্তমান, আমার অন্তর্নিহিত পূর্ণতার আদর্শের মধ্যে আমি, আমার জীবনের মূলগত সুখ-দুঃখাতীত আনন্দের মধ্যে আমি—

যে আমি স্বপনমূরতি গোপনচারী
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি—

সেই আমিই প্রকৃত আমি। তাহাকে জানাই জীবনের প্রশ্ন, তাহাকে প্রকাশিত হইতে দেওয়াই জীবনের সাধনা, তাহার প্রকাশেই জীবনের সার্থকতা। জীবন যে-পথেই চলুক না কেন, যাহার সাধনা আপাতত যে-রূপই হউক না কেন—কি ব্যক্তিগতভাবে কি জাতিগতভাবে, সকলকেই কোনো-না-কোনো দিক হইতে এই প্রশ্নে আসিয়া ঠেকিতেই হইবে।

প্রশ্ন কি আমাদের জীবনে উপস্থিত হয় নাই? সে কি আমাদের দেশে আমাদের কাছে একটা উত্তরের দাবি করিতেছে না? কতবার, কতদিক হইতে, কত বিচিত্র রকমে, এই প্রশ্নের অন্বেষণ

হইয়াছে, কত যুগে কতজন জীবনের অভিজ্ঞতা ও সাধনা দ্বারা তাহার মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে আমাদের জীবনের সমস্যা কোথায় মিটিয়াছে? অদম্য প্রশ্নের মীমাংসাকে সহজ করিবার জন্য, একটা পাকাপাকি মীমাংসা দ্বারা প্রশ্নের অস্থির তাড়নাকে নিরস্ত করিয়া মীমাংসাকে সমাজের অস্থিমজ্জাগত করিয়া দিবার জন্য, মানুষ কত আচার, কত শাসন, কত নিয়মবন্ধনের মধ্যে মানুষকে বাঁধিয়াছে—কত স্থানে কত উপায়ে তাহাকে ঘাড়ে ধরিয়া দাসকত লিখাইয়া লইয়াছে—দাসত্বের নিশ্চিন্ততার মধ্যে তাহার চরম ব্যবস্থা নির্ণয় করিয়াছে—মীমাংসার তাড়নায় প্রশ্নকে নির্বাপিতপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে। এত বন্ধনে বাঁধিয়াছিল, খণ্ডতার এত প্রাচীর তুলিয়াছিল, তাই আজ প্রশ্নকে এত নির্দয় এত হিংস্ররূপে জাগিতে দেখিতেছি, তাই এত আঘাতের পর আঘাত আসিয়া এমন নিরুপায় করিয়া আমাদের বাঁধ ভাঙিতেছে। কিন্তু এই আঘাতই চরম সত্য নয়, এই বিদ্রোহই শেষ মীমাংসা নয়, ইহারই মধ্যে চিরন্তন প্রশ্নের শাশ্বত উত্তর প্রতিধ্বনিত হইতেছে, "আপনাকে অন্বেষণ কর, আপনাকে প্রকাশিত কর।" বাহিরের নিয়ম-সংস্কারের আকর্ষণ সমাজের কষাঘাতে অনেক চলিয়াছে; একবার অন্তরের আলোককে অন্বেষণ করিয়া দেখ, একবার তাহারই দ্বারা চালিত হইয়া দেখ। ধর্মকে সহজ করিবার, লোকপ্রিয় করিবার চেষ্টা অনেক হইয়াছে, একবার ধর্মকে জীবন্ত করিয়া দেখ। আমরা ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া ধর্মকেই আশ্রয় দিতে চাই, ধর্মে প্রতিষ্ঠিত না হইয়াই মনে করি ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিব। তাই আমাদের বিরোধ আর মিটিতে চায় না, আমাদের প্রশ্ন দ্বন্দ্বের পর দ্বন্দ্বের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়ায়।

অতীত গৌরবের জীর্ণ স্মৃতিকে রোমন্থন করিয়া মানুষ আর কতকাল তৃপ্ত থাকিতে পারে? কালের রথচক্র-নিষ্পেষণকে আর কতকাল উপেক্ষা করিতে পারে? আমরা চাই আর নাই চাই, ইচ্ছা করি আর নাই করি, অমোঘ প্রশ্ন যখন জাগ্রত হইয়াছে, সে যখন একবার এ পতিত জাতিকে এমনভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, "কে তুমি? কোথায় চলিয়াছ? কি তোমার করিবার ছিল? আর কি-ই-বা করিতেছ?" তখন সে আমাদের ঘাড়ে ধরিয়া, আমাদের জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতাকে নিংড়াইয়া তাহার জবাব আদায় না করিয়া ছাড়িবে না।

জীবনের হিসাব

জীর্ণপ্রায় বৎসরের আয়ু ফুরাইতে না-ফুরাইতে যখন মাসিক পত্রিকার কবিমহলে নববর্ষের কবিতা লিখিবার তাড়া পড়িয়া যায়, তখন সেই একই কালধর্মের প্রেরণায় কতগুলি মামুলি ভাবুকতা, বৎসরের পর বৎসর মাথা জাগাইয়া বাহির হয়। এই সকল জল্পনার মধ্যে একটি অতি পরিচিত প্রস্তাবনা এই যে, অতীত বৎসরের হিসাব-নিকাশ করিয়া নূতন হালখাতার সূচনা কর। পাপ-পুণ্যের লাভ-লোকসান খতিয়া, সার্থক-চেষ্টা ও ব্যর্থ-সংগ্রামের দেনা-পাওনা মিটাইয়া দেখ, নূতন বৎসরের জন্য জীবনের ভাণ্ডারে তোমার কতটুকু সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকে।

জানি না, যথার্থই কেহ জীবনটাকে এইভাবে যাচাই করিয়া দেখেন কিনা, অথবা দেখিবার জন্য ঔৎসুক্য বোধ করেন কিনা। কিন্তু এই এক আশ্চর্য দেখি যে, সংসারে সকলেই নানারকম মাপকাঠি লইয়া নিজের ও দশের জীবনের মূল্য ও মর্যাদা বিচার করিয়া ফিরি।

সাংসারিক তৈজস হিসাবে যে-সকল মানযন্ত্রাদির ব্যবহার চলে, তাহাদের প্রত্যেকের এক একটা আদর্শ প্রমাণ বা 'standard' আছে। তাহাতে অসংখ্য জড় ব্যাপারের শক্তি সময় গুরুত্ব

আয়তন প্রভৃতির নানা সম্বন্ধ ও পরিচয়ের ওজন ও অনুপাত নির্দিষ্ট আছে। বিরাট কলকব্জা সমন্বিত জটিল এঞ্জিন, তাহারা কি পরিমাণ কয়লা খাইয়া কি পরিমাণ কাজ দেয়, তাহার স্পষ্টরকম হিসাব আদায় হইতেছে। এইসকল হিসাব কাহারও মনগড়া অনির্দিষ্ট খামখেয়ালির ব্যাপার নহে। কারণ ইহারা প্রমাণসিদ্ধ। যাহার ওজন সাত সের তাহা রামের কাছেও সাত সের, শ্যামের কাছেও সাত সের। রেলওয়ে লগেজের কেরাণীর কৃপায় তাহার ওজনের অঙ্ক নড়িলেও তাহার যথার্থ গুরুত্বের হিসাব ক্ষুণ্ণ হয় না।

কিন্তু জীবনের মর্যাদা মাপিবার এমন কোন সরকারী মাপকাঠি নাই। থাকিলেও, তাহার প্রয়োগ-কালে সকল সময়েই প্রত্যেকের রুচি ও সংস্কারমত কিছু না-কিছু তফাৎ হইয়া পড়িবেই। পুরাদস্তুর ভাবে কোন মানুষ কোন মানুষকে জানিতে পারে না। একেবারে পক্ষপাতশূন্য হইয়া কেহ কাহারও বিচার করিতে পারে না। প্রাণে যাহার সম্বন্ধে দরদ আছে বিচারের সময় তাহার জমার হিসাবে বিচারকের মমতার অঙ্কগুলাও অলক্ষিতে যুক্ত হইয়া পড়ে। যেখানে সে দরদ নাই, বিচারপদ্ধতি সেখানে নির্মম ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিতে কোনই দ্বিধা বোধ করে না। কিন্তু এত অসম্ভব বাধা সত্ত্বেও দেখি মানুষ আপন আপন ঘরোয়া মাপকাঠি লইয়া পরম নিশ্চিন্তভাবে যে-কোন জীবনের উচ্চতা ও গভীরতার বিষয়ে বিচার কোলাহলে প্রবৃত্ত হয়। মহর্ষির আত্মজীবনী পাঠ করিয়া ইংরেজ সমালোচক তাঁহার খৃষ্টানী মাপকাঠির দোহাই দিয়া বলিলেন—"ইহার মধ্যে গভীরতার অভাব—কেননা, এখানে পাপবোধ ও অনুতাপের কোন চিত্র বা পরিচয় নাই।" হিন্দু-নামধারী পণ্ডিত তাঁহার সন্ন্যাসাভিমানের মামুলি মাপকাঠি উঁচাইয়া বলিলেন—"উচ্চতায় কিছু খাটো দেখিতেছি, কেননা, লোকটা সংসারী।"

এইরূপে আপন-আপন খাস বিচারপদ্ধতি অনুসারে সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে যাচাই করিয়া ফিরি। একই জীবনের হিসাব দশজনের বিচারে দশ রকম হইয়া দাঁড়ায়, তাহাতে কাহারও স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার বড় একটা ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু সহস্র বিচার অবিচার সত্ত্বেও প্রত্যেক জীবনের যথার্থ মূল্য ও গৌরব আসলে যেমন তেমনই থাকে। যাচকভেদে ও জহুরীভেদে তাহার বাজারদরের তারতম্য হয় বটে, কিন্তু তাহার নিজস্ব প্রাণগত মর্যাদা তাহাতে বাড়েও না, কমেও না। বাহির হইতে জীবনটাকে নানারূপ মতামতের সূত্রে গাঁথিয়া, তাহাকে নানা থিওরি'র নির্দিষ্ট স্তর ও পর্যায়ে ফেলিয়া, নানা নামধারী বিশেষ বিশেষ খোপের মধ্যে পুরিয়া, তাহার সম্বন্ধে নানারকম সহজ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি; কিন্তু ভুলিয়া যাই যে, যাহাকে লইয়া নাড়িচাড়ি, লেবেল মারি তাহা জীবন নয়, জীবনের কতগুলি খণ্ড পরিচয় মাত্র, জীবনস্রোতের ফেনোচ্ছ্বাস মাত্র। আসলে যাহা জীবনের যথার্থ পরিপূর্ণ হিসাব, তাহা তর্কাতীত সত্যের, জীবনের রহস্যের মধ্যে নিহিত থাকিয়া যায়।

স্বাস্থ্যতত্ত্বের বিচারকালে স্বাস্থ্য ব্যাপারটাকে ভাঙিয়া তাহার কলকব্জা বাহির করিয়া দেখিতে হয়। প্রশান্ত সুনিদ্রা ও কর্মের উৎসাহ, পরিপাক শক্তির অক্ষুণ্ণতা ও রক্তপ্রবাহের স্বচ্ছন্দ চলাচল, সকল ইন্দ্রিয়ের নিরাময় প্রসন্নতা ও সমস্ত শরীরক্রিয়ার স্বাভাবিক স্ফূর্তি, এইরূপ অসংখ্য জটিলতার সমষ্টিরূপেই তাহাকে আয়ত্ত করিতে হয়। তত্ত্বের এই জটিল সন্ধান সেই পরিমাণেই সার্থক, যে পরিমাণে তাহাতে স্বাস্থ্য নামক পরিপূর্ণ তথ্যটির যথার্থ মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করিবার সহায়তা করে। ভিতরের ও বাহিরের যে-সকল অবস্থাচক্রের মধ্যে মানুষ জীবনযাপন করিতে বাধ্য হয়, তাহাদের প্রভাব কাহার পক্ষে কি পরিমাণে স্বাস্থ্যপ্রদ বা অস্বাস্থ্যজনক বাহির হইতে মানুষে নানা তর্ক গবেষণা করিয়া সে বিষয়ে নানা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক স্বাস্থ্যজীবনের বোঝাপড়ার মধ্যে তাহার সাক্ষাৎ ফলাফল অকাট্য নির্ভুলরূপে লিপিবিদ্ধ হইয়া থাকিতেছে। দূষিত বায়ু সেবন করি, কদর্য্য আহার করি, অপরিমিত আলস্যের প্রশ্রয় দেই, অথবা যে-কোন অভ্যাস

ও প্রভাবের মধ্যে জীবনযাপন করি, কাগজে-কলমে তাহার হিসাব মিলুক আর নাই মিলুক, হাতে-কলমে যে জীবন্ত স্বাস্থ্যকে লইয়া কারবার করি, তাহার মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোন হিসাবের গলদ থাকে না। ভিতরের ও বাহিরের ভালমন্দ ছোটবড় ঘাত-প্রতিঘাত সমস্তই সেখানে যথাযথরূপে সমন্বিত হইয়া আপন-আপন গুরুত্বের হিসাবে অঙ্কিত থাকিয়া যায়।

সেইরূপ, কেহ দেখি আর না দেখি, হিসাব লই আর না লই, পরিপূর্ণ জীবনের গ্রহণ-বর্জনের হিসাব এই জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই সন্দেহাতীত নির্ভুলরূপে আবহমান কাল আপনার জের টানিয়া চলিতেছে। জন্মগত ও জাতিগত শ্রুতি ও সংস্কার, শিক্ষা ও দীক্ষালব্ধ রুচি ও মতামত, ভিতরের ও বাহিরের শারীরিক ও মানসিক আবেষ্টন ও প্রভাব, যাহা দেখি যাহা শুনি যাহা পাঠ করি ও যাহা চিন্তা করি, এবং জ্ঞাত ও অজ্ঞাত যে-কোন শক্তি জীবনের উপর আপনার ছাপ রাখিয়া যায়, সমস্তই মানুষের অখণ্ড ব্যক্তিত্বের মধ্যে সমন্বিত হইয়া সাক্ষাৎ জীবনরূপে গড়িয়া উঠে। জ্ঞানের আলোকে ও অজ্ঞতার মোহে, মনের উন্মুখতায় ও বিমুখতায় সাময়িক নানা অবস্থার অবসাদ ও উত্তেজনায়, জীবনযন্ত্রের কত বিকার কত ব্যতিক্রম ঘটিতেছে, তাহাদেরও হিসাব জীবনের মানদণ্ডে অব্যর্থরূপে নিরূপিত হইয়া থাকিতেছে। কত অসংখ্য দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে কত বিরুদ্ধশক্তির আকর্ষণের মধ্যে তোমার জীবনপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তুমি নিজেই তাহার মূল্য ও সংবাদ জান না, কিন্তু তোমার জীবনের মগ্নচৈতন্যের মধ্যে তাহাদের প্রত্যেকের প্রভাব অঙ্কিত ও সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। মানুষ যাহাকে ভুলিয়া থাকে, হিসাবের মধ্যে যাহাকে ধরে না, সেও জীবনের বিরাট সৃষ্টির মধ্যে থাকিয়া "প্রাণের নিশ্বাসবায়ু করে সুমধুর, ভুলের শূন্যতা মাঝে ভরি দেয় সুর।"

শুধু মানুষের জীবনে নয়, এই বিশ্বজীবনের প্রত্যেক অণুতে-পরমাণুতে বিশ্বপ্রবাহের সংহত ইতিহাস জীবন্ত অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। বিজ্ঞান তাহারই খণ্ডখণ্ড জুড়িয়া কত তত্ত্ব কত law কত সিদ্ধান্তের কাঠাম গড়িয়া তুলিল। প্রত্যেক জড়কণার মধ্যে সমগ্র বিশ্বের আকর্ষণ-বিকর্ষণের প্রাণস্পন্দ অনুভব করিয়া বলিল, এই জড়কণার এই বর্তমানের মধ্যেই তাহার জাগ্রত অতীতের সমস্ত কাহিনী ও অনাগত ভবিষ্যতের সকল সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে। বিজ্ঞানের পুঁথিতে দেখ জড়কণার গতিস্থিতির কত হিসাব কত গণিতচিত্র, কিন্তু এক একটি জীবন্ত জড়কণা সমগ্র বিশ্বশক্তির অমোঘ সঙ্কেতে কাহারও গণিত-প্রমাণের অপেক্ষা না রাখিয়া যে অলঙ্ঘ্য বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া চলিয়াছে, বিজ্ঞানের সাধ্য নাই সে জটিলতার জট ছাড়াইয়া দেখে। বিজ্ঞান তখন থই পায় না, সে কেবল অকূল বিশ্বপ্রাণেরই দোহাই দিয়া বলে, এই প্রত্যক্ষ যাহা ঘটিতেছে তাহাই আমার যথার্থ হিসাব, তাহাই আমার চূড়ান্ত বাণী—আমার পুঁথির বিদ্যা তার প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি মাত্র। ইহারই জীবন্ত আদর্শে আমার সিদ্ধান্ত গড়ি, আমার মাপকাঠির পরিমাণ করি, এবং যতক্ষণ সে সাক্ষাৎ তথ্যের সঙ্গে সায় দিয়া চলে ততক্ষণ তাহার সমাদর করি। যখন সে প্রত্যক্ষের মর্যাদা রাখে না, তখন আপন মাপকাঠি আপন আপন হাতে ভাঙিয়া ফেলি।

তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তের তল্পি বহিতে বহিতে মানুষ কেমন করিয়া জীবন্ত সত্যের মর্যাদা ভুলিয়া বসে, আমাদের দেশের আধুনিক পঞ্জিকা রচনায় তাহার চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। জ্যোতিষবিদ্যা যখন এদেশে জীবন্ত বিজ্ঞান ছিল, তখন আচার্যগণ চোখে দেখিয়া বেধযন্ত্রে পরীক্ষা করিয়া গ্রহগণনা করিতেন। সেই গণনার সূত্র ধরিয়াই প্রত্যক্ষ চন্দ্র-সূর্যের সাক্ষ্য লইয়া অসংখ্য জ্যোতিষগ্রন্থের উৎপত্তি। কিন্তু হায়! অভাগার দেশে বুঝি আজ চোখে দেখিবার উদ্যম ও আত্মবিশ্বাসও জোটে না। তাই দেখি, আকাশের গ্রহচন্দ্র আকাশেই থাকে, আর পঞ্জিকার আবদ্ধ প্রাঙ্গণে গর্গ ভাস্কর বরাহাদির প্রামাণ্য বিচার চলিতে থাকে। "আমার পঞ্জিকা বড় বিশুদ্ধ, কেননা আমি সূর্যসিদ্ধান্তের অনুসরণ করি"—"আমার পঞ্জিকা আরও প্রামাণ্য, আমি বীজসংস্কৃত ভাস্বতীর

দোহাই দেই।" জিজ্ঞাসা করিতে পার—তবে ভাই, তোমার পঞ্জিকা-গগনের সূর্যদেব যখন রাহুগ্রাস কবলিত হইবার উপক্রম করিয়াছেন, আকাশের পরিচিত সূর্যের প্রসন্ন মুখে তখনও ম্লানতার চিহ্ন দেখি না কেন? পঞ্জিকার বৃহস্পতি যখন দণ্ড পল অনুসারে সূক্ষ্ম হিসাব ধরিয়া বক্রভাব ত্যাগ করিতেছেন, আকাশপথের প্রত্যক্ষ বৃহস্পতি তখনও বঙ্কিমতার ঝোঁক ছাড়েন না কেন? কিন্তু সে প্রশ্ন-বিচারের অবকাশ কাহারও নাই। এই মিথ্যাগণনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নির্দেশ মতেই শতসহস্র লোকের ধর্মকর্মের আচারতন্ত্র অবাধে নিয়ন্ত্রিত হইয়া চলিতেছে।

এইরূপে পুঁথির হিসাবে আর জীবনের হিসাবে ফারাক যখন বাড়িয়াই চলে, তখন এমন দিন আসে যখন মানুষের জাগ্রত সংশয়কে আর ঠেকাইয়া রাখা চলে না। তখন মানুষ প্রত্যক্ষ দেখিবার দাবী করে, যুগ-যুগান্তরের অতর্কিত সিদ্ধান্তকে তথ্যের সঙ্গে মিলাইয়া জীবনের হিসাব আদায় করিতে চায়। 'গুণকর্মবিভাগশঃ' বলিয়া ব্রাহ্মণ সমাজের চূড়ায় বসিবার দাবী করে, কিন্তু গুণকর্মের প্রমাণ চাহিলে সে তাহার পৈতা তুলিয়া দেখায়। সমাজ তাহাতে আপত্তি নাও করিতে পারে, কিন্তু জীবনের তলে-তলে তাহার অকাট্য প্রতিবাদ সঞ্চিত হইতে আর বাকী নাই। আজও যদিও সমাজের ঠাট বজায়ের ত্রুটি নাই, তবু কে জানে কালের ভাঙন ধরার শেষ কোথায়? জাগ্রতকালের জীবন্ত বাণী ঘোষণা করিতেছে, বিশ্বমানবের বিপুল দৃষ্টি বিরাট জীবন; আর, আচারতন্ত্রের জীর্ণ আয়ু গণনা করিতেছে, অতীতের মাহাত্ম্য ও কলির দুর্গতি। সংগ্রামকাতর অন্ধ মানুষ প্রাণপণ শক্তিতে কল্পনা করিতেছে, "যাহা কিছু হিসাব হইতে বাদ দিলাম, জীবন তাহার কোন হিসাব রাখিবে না!" কিন্তু জীবন আমার পছন্দ-অপছন্দের দাস নয়, তাই কল্পনার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে স্বপ্নের সঞ্চয় জমিয়া জমিয়া, আবার জীবনপ্রবাহের তরঙ্গমুখেই ভাসিয়া যায়। তখনও যদি মানুষের মোহনিদ্রা না ভাঙে, তখনও যদি সে কল্পনার গগনপটে অস্তমিত গৌরবরবির মূঢ় প্রহসন জাগাইয়া রাখিতে চায়, তবে তাহার জন্য 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং' শাশ্বতকাল জাগ্রত রহিয়াছে।

সুরসিক মার্কিন লেখক মার্ক টোয়েন এক কৃষক দম্পতির গল্প লিখিয়াছেন। তাহারা বিদেশস্থ কোন আত্মীয়ের মৃত্যু-সংবাদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। আত্মীয়ের ধনলাভের প্রত্যাশায় সংসারে তাহারা যন্ত্রবৎ কাজ করিয়া যাইত, কিন্তু সমস্ত মনটি থাকিত ঐ অনাগত শুভ সংবাদের উপর। ধনের স্বপ্ন ধনের কল্পনা তাহাদের বাস্তব জীবনকে ছাপাইয়া উঠিত, কল্পনায় সেই সম্পদ তাহারা নানা ব্যবসায়ে মহাজনীতে নিয়োগ করিত, কল্পনায় তাহার লাভ-লোকসানের হিসাব রাখিত, এবং সঞ্চিত সুদের কাল্পনিক ব্যয়ের ফর্দ লইয়া দাম্পত্য কলহের সম্ভাবনা ঘটাইত। অতি সাবধানে, ব্যবসাভিজ্ঞ বিচক্ষণের দৃষ্টান্ত ও পরামর্শে তাহারা কল্পিত ধনের তদ্বির করিয়া, আশায় ও আকাঙ্ক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া ফিরিত। ক্রমে কল্পনায় উপর্যুপরি দাঁও মারিয়া যখন তাহারা ঐশ্বর্যের চরমসীমায় উঠিল, তখন কল্পনার মোহপ্রভাব তাহাদের বাস্তবজীবনেও সংক্রমিত হইয়া পড়িল। কল্পিত ধনের কল্পিত অভিমানে তাহারা সংসারকে মাপিয়া দেখিল, সংসারে তাহাদের আসন অসম্ভব উচ্চে উঠিয়া গিয়াছে। তখন আত্মমর্যাদার গৌরবে বহুদিনের নগণ্য বন্ধুবান্ধবকে একে একে বিদায় দিয়া, তাহারা বাহিরের তুচ্ছ আবেষ্টন হইতে আপনাদের জীবনকে অল্পে অল্পে গুটাইয়া লইল। এমন সময় একদিন দৈবাৎ সংবাদ পাওয়া গেল যে, প্রবাসী আত্মীয় বহুকাল হইল গতাসু হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ধনের প্রতিপত্তি আপনার প্রমাণ স্বরূপ কপর্দক চিহ্নও রাখিয়া যায় নাই। সত্যের নির্মম আঘাতে কাল্পনিক সাধনার বিরাট সৌধ এক মুহূর্তেই ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

জীবনের দৈন্যের উপর কল্পিত স্বর্গলোকের আবরণ দিয়া মানুষ অপরকে ভুলাইতে পারে, আপনাকেও ভুলাইতে পারে, কিন্তু জীবন তাহাতে প্রতারিত হয় না। যাত্রার শ্রীকৃষ্ণ বক্ষে ভৃগুপদচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া আসরে নামিয়াছিল, পালায় যখন সে-বিষয়ে প্রশ্ন উঠিবে তখন সে বিনাইয়া বিনাইয়া ভৃগুপদচিহ্নের ব্যাখ্যা করিবে। কিন্তু অধিকারী যখন যথার্থই বিকট গম্ভীর বদনে

ভ্রূভঙ্গি জুড়িয়া প্রশ্ন করিবেন—"কৃষ্ণ তোমার বুকে কি?" তখন ভয়বিহ্বল অনভ্যস্ত বালক বলিল, "আজ্ঞে খড়িমাটি"। এইরূপ কাল্পনিক অভিমানের কত ভৃগুপদচিহ্ন ধারণ করিয়া মানুষ সংসার-যাত্রায় বাহির হয় কিন্তু জীবনের অধিকারীর কাছে তাহার খড়িমাটিত্ব কবুল করিয়া ফেলে। মানুষ নিছক পরনিন্দা করে, এবং বলে "কর্তব্যের অনুরোধে অপ্রিয় সত্য বলিতেছি"; সৌখিন মনের খেয়ালে পড়িয়া সহস্র মূঢ়তার দাসত্বে আপনাকে জড়বৎ করিয়া রাখে, আর "বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর", বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করে।

"কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী"—কিন্তু কালের অসীম ধৈর্যেরও সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রান্ত হয়, মানুষ যখন জীবন্ত সত্যকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও দেখিতে চায় না। অনন্ত দেশকালের সাক্ষী এই প্রত্যক্ষ বর্তমান জগৎ। এই বর্তমানের এই বিশ্বজগতের পরিপূর্ণ উন্মুখ সত্য তোমার আমার মধ্যে অনুভূত ও সমন্বিত হইয়া যাহা গড়িয়া উঠে, তাহারই নাম জীবন; এবং এই অনুভূতি ও সমন্বয়ের পরিপূর্ণতাই জীবনের পরিপূর্ণতা। জীবন সংগ্রামে এই পরিপূর্ণতাকে প্রত্যক্ষ করিবার দুরন্ত সংকল্প লইয়া, সহজে মানুষ পরাজয় স্বীকার করে না, কিন্তু পদে পদেই আপোষ করিতে চায়। তাই জীবনের তুমুল মন্থনে যে কোন সম্পদ উদ্ভূত হয়, মানুষ তাহাকেই অমৃত জ্ঞানে চরম নিশ্চিন্তভাবে গ্রহণ করিতে চায়। এই বৈজ্ঞানিক যুগে reason বা বিচার-বিবেককেই মানুষ পুরুষকারের প্রধান সাক্ষী ও নিয়ামকরূপে গ্রহণ করিয়াছে। অনেক লাঞ্ছনা ও অনেক নির্যাতনের কষাঘাতে যুগ যুগব্যাপী দাসত্বের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ারূপে এই reason-এর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কিন্তু যে reason মুক্তিপ্রদ জীবন্ত শক্তিরূপে ইতিহাসে পর্বে পর্বে মানুষকে সহস্র বন্ধন হইতে উদ্ধার করিয়াছে, যে reason এই modern spirit এই বর্তমান যুগধর্মের সাক্ষাৎ প্রতিভূ স্বরূপ, যে reason-এর প্রদীপ্ত আলোকে মানুষ তাহার অন্ধতার আবরণ ভেদ করিয়া জীবনের নব-নব বিকাশের পথ উন্মুখ করিয়াছে, সেই reason সেই বিচারবুদ্ধিই আবার আত্মশক্তির অভিমানে আপনার যথার্থ মর্যাদা ভুলিয়া, আপনাকেই পরিপূর্ণ জীবনরূপে কল্পনা করিয়া, আপনার বিরাট দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। আপনার পরিমিত শক্তির দ্বারা অপরিমেয় জীবনপ্রবাহকে খর্ব করিয়া দেখিতেছে। তাই জাগ্রত বুদ্ধির আলোকে যাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে, যাহা ধরা যায় ছোঁয়া যায় মাপিয়া দেখা যায়, বুদ্ধির হিসাবে তাহাই বিরাট হইয়া উঠিতেছে; আর বিচারের অস্ফুট ছায়ালোকে যাহার সম্যক পরিচয় মিলিতেছে না, তাহাই নগণ্যরূপে হিসাবের অঙ্কে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া জীবনের অঙ্কে বৈষম্য ঘটাইবার সুযোগ খুঁজিতেছে। কিন্তু আবহমান কাল জীবনের সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। তাই বিচারবুদ্ধি যখন অভিমান ভরে জীবনের পরিপূর্ণ দাবীকে অস্বীকার করিয়া তাহার সংক্ষিপ্ত পরিমাপ করিতে থাকে, তখন কালের চাঞ্চল্যে চিরজাগ্রত জীবনের কাছে তাহা দুঃসহ হইয়া ওঠে।

বিংশ শতাব্দীর মানুষ যখন স্বপ্ন দেখিতেছিল যে, সভ্য জগতে যুদ্ধের বর্বরতা লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, তখন বিচারবুদ্ধিই সেই স্বপ্নের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা ছিল। বিচারবুদ্ধিই বলিয়াছিল, যুদ্ধবিদ্যার সাংঘাতিক উন্নতির ফলে অসম্ভব লোকক্ষয়ের আশঙ্কায় মানুষের যুদ্ধোৎসাহ নির্বাপিতপ্রায় হইয়া আসিয়াছে। স্বার্থসূত্রে ও ব্যবসাসূত্রে জাতিতে-জাতিতে যে আদান-প্রদান চলিয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক জাতির জীবন বৈচিত্র্যে ও জটিলতায় অপর প্রত্যেক জাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পড়িতেছে। তাই বিশ্বমানবের জীবন্ত দেহকে একস্থানে আহত করিলে, তাহার বিরাট দেহের সর্বত্র সেই আঘাত অনুভূত হইবে। এক জাতি অপর জাতিকে আঘাত করিতে গিয়া আপনাকেও সাংঘাতিক রূপে আহত করিবে। সুতরাং স্বার্থবুদ্ধিই নাকি মানুষকে এমন দুঃসাহস হইতে নিবৃত্ত করিবে। কিন্তু জীবনের প্রচণ্ড আঘাতে সে দুরাশার স্বপ্ন আজ ভাঙিয়াছে।

যে মানুষ আপনাকে বুদ্ধিজীবী rational জীব বলিয়া অহংকার করে, সেই মানুষের সুসভ্য ছদ্মবেশ ভেদ করিয়া জীবনের ভিতর হইতে তাহার আদিম রক্তলোলুপ বর্বরমূর্তি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের উদ্দাম স্বার্থলালসা ত মরে নাই, উদ্‌ভ্রান্ত বাসনার অসংযম ত দূর হয় নাই, অন্ধ বিদ্বেষের দুরন্ত হিংস্রতা ত ঘুচে নাই। সভ্যতার নানা আবরণের কৃত্রিম মুখোশ পরিয়া জীবনের তলে-তলে বিচারবুদ্ধির অন্তরালে তাহারা নিজ-নিজ প্রভাব সঞ্চিত করিতেছিল। বিচারবুদ্ধি যাহা দেখিয়াও দেখে নাই, আপনার শক্তির অভিমানে আচ্ছন্ন (hypnotized) হইয়া তাহার শক্তিকে ধারণা করিতে পারে নাই। তাই জীবন আজ সভ্য মানবচিত্তকে নিংড়াইয়া আপন তাহার প্রত্যক্ষ হিসাব আদায় করিয়া দেখাইতেছে। এই জীবনমরণ সংগ্রামে মানবচিত্তের কত গোপন পঙ্কিলতা আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে; কত স্বপ্ন, কত কল্পনা, কত যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত জড়স্তূপ, ভাঙিয়া পড়িতেছে। সেই অস্থিরতার ভিতর হইতে মানবের নবজাগ্রত বিচারদৃষ্টি বিরাটতর রূপে আপনাকে প্রত্যক্ষ করিবে, তাহারই প্রতীক্ষায় বিশ্বমানবজীবন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে।

এইরূপে সাধনের বিচিত্র পথে মানুষ পদ-পদেই তাহার জীবনের হিসাব মিলাইতে বাধ্য হয়। জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল সাধন ও সমাধান জীবনের ভিতরে-বাহিরে যে-সকল ভেদরেখা আঁকিয়া চলে, জীবনের স্বতঃস্ফূর্তি (evolution) প্রতিনিয়তই তাহাকে মুছিয়া চলিতেছে। জীবনের প্রবাহে পড়িয়া যখন মানুষের সহজ বিচারের কৃত্রিম গণ্ডি ভাঙিয়া যায়, তখন মানুষ অভিজ্ঞতার তাড়নায় নূতন করিয়া বৃহত্তর গণ্ডি রচনায় প্রবৃত্ত হয়। সহজ বিচার বলিল, "দেশের ও সমাজের কল্যাণ কর।" জীবন প্রশ্ন করিল, "কল্যাণ কি?" সংসারবুদ্ধি আপন মানদণ্ডে হিসাব করিয়া বলিল, "জাতীয় সম্পদ যাহাতে বৃদ্ধি হয়, তাহাই কল্যাণ।" কথাটা সত্য নয়, মিথ্যাও নয়, কারণ 'সম্পদ' বলিতে কি যে বুঝায় তাহাও প্রশ্নের ব্যাপার। জীবনের চিঁড়ে কথার তৃপ্তিতে ভিজে না, জীবন তাহার অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে সম্পদের যথার্থ হিসাব পরখ করিয়া লয়। মানুষের স্থূলবুদ্ধি যখন কৃষিসম্পদ ও বাণিজ্যসম্পদ, ক্রয়শক্তি ও উৎপাদনশক্তির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জটিল হিসাব কষিতে থাকে, অলক্ষিত জীবন তখন অব্যর্থ ইঙ্গিতে দেখাতে থাকে প্রত্যেক জাতির জীবনসম্পদকে। কেবল লোকসংখ্যা নয়, মানুষের শ্রমশীলতা ও জীবনীশক্তি, মিতাচার ও সংযম, আত্মবিশ্বাস ও পরিবর্তন সহিষ্ণুতা জীবনের উত্থান-পতনের মধ্যে জাতীয় সম্পদরূপে সঞ্চিত হইয়া থাকে। জাতীয় সাধন ও অভিজ্ঞতা, জাতীয় tradition ও culture. বন্ধুতাসূত্রে ও বিরোধসূত্রে জাতীয় জীবনের পরিধি বিস্তার মানুষের জীবনতন্ত্রকে গড়িয়া তোলে। সাক্ষাৎভাবে ও পরোক্ষভাবে তাহারাও জাতীয় সম্পদ। মুষ্টিমেয় মানুষের অপ্রতিহত মননশক্তি যখন ফরাসী-জীবনে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বিপ্লবমন্ত্র রূপে অবতীর্ণ হইল, তখন জাতীয় জীবনের হিসাবে কে তাহার শক্তিসম্পদের পরিমাপ করিয়াছিল? সহরের রাস্তা যেমন সঞ্চিত জঞ্জাল রূপে municipality-র কলঙ্কচিহ্ন ধারণ করে, তেমনি জাতীয় জীবনপথের কিনারে কিনারে মানুষের ধর্ম-সমাজ-রাষ্ট্র ব্যবস্থার নানা গলদ জমিয়া থাকে। মানুষ তাহাকে উপেক্ষা করিলেও কালেকালে জীবনের উদ্দাম বর্ষার প্লাবনে তাহার অবসান অনিবার্য। জীবনের এই সকল ক্ষণিক উচ্ছ্বাস ও জাতীয় সম্পদ। আর, বুদ্ধিজীবী মানুষ যাহাকে অকাজের কাজ বলে, যাহাকে সকল প্রয়োজনের নীচে তুচ্ছ কল্পনার আসনে বসাইতে চায়, সেই কবির দৃষ্টির, কবির সার্থক অনুভূতির বিচিত্র প্রকাশের,—জাতি ও সমাজের জীবনসম্পদ হিসাবে মূল্য কে নিরূপণ করিবে? এই প্রবাহিত বিশ্বজগতের রসসৌন্দর্য, নরনারীর প্রেমলীলা ও সুখদুঃখ ছন্দিত জীবনোচ্ছ্বাস কেবল নির্মম শক্তির অন্ধ পরিহাস নহে, ইহারই অব্যক্ত আনন্দের মধ্যে অনন্ত মুক্ত জীবনের স্বাদ ও আশ্বাস নিহিত রহিয়াছে, এই অনুভূতিকে ধারণ করিয়া সার্থক কবিজীবন হইতে যে অভয় মন্ত্র নিঃসারিত হয়, অন্ধ মানুষ কোন্ হিসাবে তাহার পরিমাপ করিয়া দেখিয়াছে?

পৃথিবীটা শূন্যের মধ্যে নিরালম্ব থাকিলেও, পাছে তাহার পতন ও বিনাশ ঘটে, এই আশঙ্কায় মানুষের উর্বর কল্পনা তাহাকে সাপের মাথায় ও অষ্টদিগ্‌গজের স্কন্ধে বসাইয়াছিল। চিন্তা উঠিল যে ইহারাই বা শূন্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে কিরূপে? তাই বিরাট কচ্ছপের অবতারণা হইল। অষ্টদিগ্‌গজ তাহার পিঠের উপর আশ্রয় পাইল, কিন্তু কূর্ম দাঁড়াইবে কিসের ভরসায়? নিছক কল্পনা বলিলেন, "ক্ষীরোদ সমুদ্রে ভাসাইয়া রাখ"—শুনিয়া পৌরাণিকের শঙ্কিত চিত্ত আশ্বস্ত হইল। কিন্তু মানুষ যখন স্পষ্ট দেখিল যে পৃথিবীটা স্থবির নিশ্চলরূপে বসিয়া নাই, সে আপনার অবাধ গতিবেগে অনন্ত আকাশপথে চক্রচিহ্ন আঁকিয়া চলিতেছে, তাহার পক্ষে আধার ও আশ্রয় কল্পনা তখন সম্পূর্ণ নিরর্থক হইল। কল্পনা তাহাকে সাপের মাথায়ই বসাক আর ক্ষীরোদ সমুদ্রেই ভাসাক, পৃথিবীর বাস্তব জীবন এই জীবন্ত জগতের সূর্যচন্দ্রগ্রহ শক্তির মধ্যেই পরিপূর্ণ নিরাপদভাবে বিধৃত হইয়া আছে। সহজ বুদ্ধিও সায় দিয়া বলিল, "চারিদিকেই সমানভাবে অনন্ত প্রসারিত আকাশ, পৃথিবী তাহার মধ্যে কোথায় পড়িবে?" ("সমে সমন্তাৎ ক্বঃ পতত্বিয়ং খে?")

প্রতি জীবনের চারিদিকে আশ্রয় ও আধার রূপে এক অনন্ত বিস্তৃত বিরাট জীবন—জীবন কক্ষভ্রষ্ট হইয়া কোথায় পড়িবে? অনন্ত জীবনের বিচিত্র আহ্বান ও প্রেরণায়, আপনার গতিবেগে আপনি বিধৃত হইয়া জীবন ছুটিয়া চলিতেছে। মানুষ তাহাকে স্থাবর জড়পদার্থের মত নানা আশ্রয়ের মধ্যে বাঁধিয়া কল্পনার নানা হস্ত কূর্মক্ষীরোদ সমুদ্রের আধারে বসাইয়া নানা আচার-বিচার মতামতের কাঁথাকম্বল চাপাইয়া নিরাপদ হইতে চায়। কিন্তু কল্পনা-জীবনের গুটিকাকে মানুষ যে স্বপ্নের রেশমসূত্রে মুড়িয়া রাখিতে চায়, কালে কালে জাগ্রত জীবনের প্রজাপতি সেই রেশমজাল কাটিয়া মুক্ত আকাশের সন্ধানে বাহির হয়। অবাধ উন্মুক্তভাবে জীবন চলিতে চায়, অবাধ উন্মুক্তভাবে বিশ্বপ্রাঙ্গণে তাহাকে চলিতে দাও, একথা বলিবার সাহস মানুষের জোটে না।

বড় বেশি দিনের কথা নয়, একসময়ে জীবন্ত মানবশিশুকে ধরিয়া নানা শাসনের সাহায্যে কতগুলা শব্দ ও অঙ্কের কসরৎ, এবং ইতিহাস-ভূগোল-বিজ্ঞানের কতগুলা তথ্য বা fact, বলপূর্বক মনের মধ্যে গিলাইয়া, মানুষ ভাবিত ইহার নাম 'শিক্ষা'। এই নবজাগ্রত যুগের মানুষের মন সেকথা ভাবিতেও আজ শিহরিয়া উঠিতেছে। আজ মানুষ বলিতেছে মনের মধ্যে কি পরিমাণ স্পষ্ট তথ্য বা শব্দ ঠাসিয়া দিলাম, তাহার দ্বারা শিক্ষার প্রমাণ হয় না। জীবনের অক্ষয় জ্ঞানভাণ্ডার হইতে মন তাহার খোরাক সংগ্রহ করিবে, নানা সংশয় বিচারের মধ্য দিয়া তাহার সত্যাসত্য পরখ করিয়া লইবে, তাহার জন্য অবাধে ও বিনা তাড়নায় মনকে উন্মুখ ও উন্মুক্ত করাই শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ।

শিক্ষার আদর্শ যাহাকে 'মন' বলিল, মানুষের সমগ্র সাধনা তাহাতে আপন আপন সুর মিলাইয়া বৃহত্তর রূপে তাহাকেই বলিল, 'জীবন'। মানুষ যেখানে মানুষকে ধরিয়া ধর্মের নামে নীতির নামে তন্ত্রের বচন ও লোকমতের সংস্কার গিলাইত, আচারের কসরৎ শিখাইত, যেখানে সুস্থ জীবনকে pre-digested অর্ধজীর্ণ পথ্য খাওয়াইয়া কৃত্রিম মানদণ্ডে তাহার হ্রাসবৃদ্ধির পরিমাপ করিত, সেখানে মানুষ বলিতেছে, মান-পরিমাণের ও ভাষা-পরিভাষার মোহ ভাঙিয়া জীবনকে জীবনরূপে দেখ। বিশ্বজীবনের কাছে তোমার জীবনকে উন্মুক্ত ও উন্মুখ করিয়া রাখ।

এই পরিপূর্ণ বিশ্বজীবন, এই যাহা সত্যরূপে প্রতি জীবনের ভিতরে-বাহিরে প্রবাহিত হইয়া চলিতেছে—আত্মবিস্মৃত মানবচিত্তে প্রাণস্পন্দন রূপে চিরন্তন আস্তিক্যবুদ্ধিরূপে, প্রতিনিয়তই যাহা নবনব কলেবর ধারণ করিতেছে—তাহারই আশ্বাসকে রক্ষাকবচ রূপে ধারণ করিয়া মানুষ তাহার অনন্ত জীবনপত্রে যাত্রা করিয়াছে। কেবল ধর্মজগতে নয়, কেবল ধর্মতন্ত্রে নয়, ধর্মের নামে মানুষ জীবনের অখণ্ডতার মধ্যে যে-সকল দ্বৈত ও স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করে, কেবল তাহার মধ্যে নয়; সমগ্র

জীবনের সকল সাধনা ও সকল অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া মানুষ জীবনের সহস্র মোহ নাস্তিকতার আবরণ ভেদ করিয়া এই বিশ্বজীবনব্যাপী 'অস্তি'র সন্ধানে ফিরিতেছে। কত optimism কত আশাশীলতার সফল সাধনের মধ্যে, কত ব্যর্থ জীবন সংগ্রামের মৃত্যুকামী বেদনার মধ্যে, কত নাস্তিকতার অতৃপ্তির মধ্যে, সে বিরাট সন্ধান জন্ম-জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে। কতবার কত বিশেষ আকারে মানুষ বিশ্বজীবনের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, কত বিশেষ নামে তাহার বিশেষ পরিচয়কে অস্বীকার করিয়াছে, আবার অলক্ষিতে হৃদয়ের কত গোপনদ্বার দিয়া তাহার অবাধ যাতায়াতের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। বিধাতৃত্বের লীলারূপে যাহাকে স্বীকার করিল না, অমোঘ নিয়মবন্ধন রূপে তাহাই সমাদর লাভ করিল,—মানুষ বুঝিল না এ কাহার নিয়ম! বিশ্বশক্তির মঙ্গল অভিপ্রায় প্রত্যাখ্যাত হইয়াও আত্মশক্তির সম্মোহন মূর্তিতে জীবনকে অধিকার করিল,—কেহ জানিল না জীবনে জীবনে পুরুষকার রূপে কে আবির্ভূত! শাস্ত্রগুরু অতীতের সাক্ষ্য মহাজনগত মার্গ কতরূপে কতবার আসিল, কতবার ফিরিল, তাহারই ভিতর হইতে নবনব বিচিত্ররূপে বিকশিত হইয়া উঠিল প্রত্যক্ষ জীবনধর্মে অদম্য বিশ্বাস—ব্যক্তিমানবের স্বাধীন জীবনলব্ধ অবাধ প্রসারণে বিশ্বাস, বিশ্বমানবের আগত অনাগত সার্থক পরিণতিতে বিশ্বাস, মানবজীবনের উত্থান-পতনের মধ্যে তাহার চরম কল্যাণে বিশ্বাস, প্রতি মানবের অন্তর্নিহিত বিশ্বজীবনের অব্যক্ত প্রেরণায় বিশ্বাস এবং সর্বোপরি বিশ্বজীবনের সাক্ষী ও প্রতিনিধি প্রত্যেক স্বতন্ত্র আত্মার ব্যক্তিগত বিশিষ্টতার গৌরব ও মর্যাদায় বিশ্বাস।

এ বিশ্বাসের অর্থ যে কি, এ সাধন যে কত বিস্তারিত কত জটিল কত গভীর, মানুষের সাধনা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে আজও তাহা সম্যকরূপে উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। আজও নানাদিক হইতে নানা বিচ্ছিন্ন সূত্র ধরিয়া মানুষ এই সাধন ক্ষেত্রে নানা উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছে। ভবিষ্যৎ বংশ তাহারই উপর কত নবনব আদর্শের পূর্ণতর সৌধ প্রতিষ্ঠান করিবে তাহারই প্রতীক্ষায় আজও মানবচিত্ত উৎসুক হইয়া রহিয়াছে।

এই বিরাট জীবনের আহ্বানে মানবের আদর্শ নানা দ্বন্দ্ব ও আপাত বিরোধের মধ্যে সংগ্রাম করিয়া ফিরিতেছে। দৈব ও পুরুষকার, ব্যক্তি ও সমাজ, জাতীয়তা ও সর্বজাতিকতা, দয়াধর্মের ন্যায়তন্ত্র ও অতিমানবতার নিষ্ঠুর কল্পনা. একই বিরাট জীবন সমস্যাকে নানা দিক হইতে আঘাত করিয়া দেখিতেছে, কেবল তত্ত্বের মধ্যে নয়, কেবল চিন্তাজগতের বিচার-প্রাঙ্গণে নয়, মানুষের কর্মজীবনের নিত্য সচেষ্টতার মধ্যেও মানুষ দ্বন্দ্বের পর দ্বন্দ্ব ভাঙিয়া আদর্শের সমগ্রতাকে হাতে-কলমে অর্জন করিতেছে। সেই একই সার্থক বিপুল জীবনকে লক্ষ্য করিয়া কত ধর্মতত্ত্ব, কত নীতিতন্ত্র, কত সাধনপ্রণালী, কত সামাজিক বিধিব্যবস্থা, কত অসংখ্য বিচিত্র নামধারী কত সম্প্রদায়ের কত সমন্বয় সাধনা গড়িয়া উঠিল। কেহ বিশ্ববিধানের বিধাতাকে দেখিল, কেহ দেখিল না. কেহ তাহাকে শক্তিমাত্র জ্ঞান করিয়া উদাসীন রহিল, কেহ তাহারই উদ্দেশে ব্যাকুল হইয়া জীবনের তীর্থে তীর্থে তাহার সন্ধান করিয়া ফিরিল; কেহ ব্যক্তির জীবনকে সমাজতন্ত্রের নির্দেশমত নিয়ন্ত্রিত করিয়া জন্মগত ও সাংসারিক অবস্থাগত নানা ভেদবৈষম্য দূর করিতে চাহিল, কেহ ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সমাজের নিষ্পেষণ হইতে মুক্ত করিবার জন্য সমাজবন্ধনকে ভাঙিয়া পিটিয়া সহজ করিতে চাহিল। কিন্তু আদর্শের সমগ্রতাকে ধারণ করিল ও প্রকাশ করিল অতি অল্প লোকেই। সহস্র জটিলতার অন্ধ সংগ্রামে পরিশ্রান্ত, সহস্র হিসাবের ব্যর্থতায় বিভ্রান্ত মানুষ বাধাবিমুক্ত হইয়া জীবনের বিশ্বরূপকে প্রত্যক্ষ করিল অতি অল্প স্থানেই। ব্রাহ্মসমাজ এই দৃষ্টিলাভের জন্যই জগতে আসিয়াছিল। কেবল কতগুলি মূঢ় সংস্কারের প্রতিবাদের জন্য নয়, কেবল কতগুলি সামাজিক কুব্যবস্থার মোচনের জন্য নয়, কেবল বাহিরের কতগুলি দ্বন্দ্বের সহজ সমন্বয়ের জন্য নয়, জীবনের এই বিরাট পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে জগৎকে উজ্জ্বল করিয়া দেখিবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজের ডাক পড়িয়াছিল।

এই বিশ্বমানবজীবন আপনাকে দেখিয়া আপনাকে জানিয়া পরিতৃপ্ত হইবে, জড়তার তামসজালে মানুষ যেখানে অন্ধ হইয়া হতবীর্য হইয়া ঘুরিতেছে, সেখানে জ্ঞানের আলোক প্রদীপ্ত হইবে, মানুষ উদ্বুদ্ধ আত্মশক্তির প্রেরণায় জীবনকে অতীত জঞ্জালভার হইতে বিমুক্ত করিবে, "চেতঃ সুনির্ম্মলং তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনকবরম্" সহস্রদ্বার উন্মুখ করিবে, স্বাধীন মানবচিত্তকে আহ্বান করিবে। জীবনের প্রত্যক্ষ প্রবাহে মানুষের সহস্র হিসাব, সহস্র বিচার আচার স্রোতের মুখে তৃণের মত ভাসিয়া যাইবে, জাগ্রত মানুষ তাহাতে বিচলিত হইবে না।

মানবচিত্তের বিস্ময়াতীত বৈচিত্র্য এই বিরাট জীবনের উপর নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া আপন-আপন দেশ-জাতি-সমাজগত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সাধনাকে সেই জীবন্ত আদর্শেরই অঙ্গীভূত করিয়া লইবে। দেশজাতি সমাজ সম্প্রদায় মণ্ডলীর নানা সোপান পরম্পরায় বিশ্বমানবের ও ব্যক্তিমানবের মধ্যগত সকল কৃত্রিম ব্যবধানকে নানা সম্পর্ক সূত্রে বন্ধন করিবে। একদিনে নয়, একযুগে নয়, যুগ-যুগান্তে সমগ্র মানব ইতিহাসের অতীত ও অনাগত সমুদয় জীবনের ব্যর্থতা ও সফলতার মধ্যে এই সাধনায় ডুবিয়া থাকিবে।

সাধকমণ্ডলী চাই, উপাসক সম্প্রদায় চাই, আদর্শ বন্ধনকামী সমাজ চাই, কর্ম্মের নিয়মতন্ত্র বিধিবিধান অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, এ সমস্তই চাই, কিন্তু সর্বোপরি চাই অন্ধ সংস্কারমুক্ত উদারচিত্ত প্রশস্তপ্রাণ ব্যক্তিমানবকে—সত্যের জন্য অকুতোভয় সর্বত্যাগীকে, যে সত্যের জন্য এমন সংস্কার নাই এমন বন্ধন নাই যাহা ছাড়িতে পারে না। চাই বিশ্বমানবের সেই সকল প্রতিনিধিকে, যাহারা এই জীবনকে ক্ষুদ্র বলিয়া জানিবে না, যাহারা জীবনের সার্থকতার জন্য অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে না, যাহাদের জীবনপটে এই জগৎছবির জীবন্তরূপ প্রকাশ লাভ করিবে, এই মুহূর্তকে এই বর্তমানকে এবং প্রতি মুহূর্তকে যাহারা ভগবানের পূর্ণতম সার্থকতম বিধাতৃত্বের নিদর্শনরূপে গ্রহণ করিবে। যাহারা সত্যের জন্য জীবনের সকল সাধনকে সার্থক জ্ঞান করিয়া ভালমন্দের উন্মত্ত বিচারে উদ্‌ভ্রান্ত ভীরু মানবচিত্তকে এই উন্মুক্ত জীবনের আশ্বাসবাণী শুনাইয়া বলিবে—

"মনেরে আজ কহ যে
ভালমন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।"

যুবকের জগৎ

প্রত্যেক স্বতন্ত্র মানুষের এক একটি স্বতন্ত্র জগৎ আছে। সেখানে মানুষ যথার্থতমরূপে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র—আপনার ব্যক্তিগত বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতার অনির্বচনীয় রহস্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত।

এই বাহিরের জগৎ, রূপের জগৎ, শব্দগন্ধময় বিচিত্র জগৎ, যাহাকে মানুষ সাধারণ সম্পত্তিরূপে অহরহই গ্রহণ করিতেছে—তাহাকেই কণায় কণায় সংগ্রহ করিয়া জীবনের কাঠাম রচিত হয়। যাহা দেখি, যাহা শুনি, জীবনের সহস্র সম্বন্ধের সহস্র জটিলতার মধ্যে যাহা কিছু আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করি, জীবনের মধ্যে ও অন্তরালে তাহাই সঞ্চিত হইয়া উঠে। স্মৃতিরূপে আমার অনুভূতির মধ্যে, কল্পনার উৎস ও উপাদানরূপে আমার মননের মধ্যে, জীবনের অব্যক্ত প্রভাবরূপে আমার মগ্নচৈতন্যের মধ্যে, কত বিচিত্ররূপে এই সঞ্চিত জগৎকে ধারণ করিতেছি, কত বিচিত্রতররূপে তাহা দ্বারা বিধৃত হইয়া আছি। অভিজ্ঞতার নিরন্তর আঘাত জগৎকে প্রতি

মুহূর্তেই খণ্ড খণ্ড করিয়া আহরণ করিতেছে এবং প্রতি মুহূর্তেই তাহাকে জীবনের অঙ্গীভূত রূপে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছে।

জীবন আরম্ভই হয় কিছু সঞ্চয় লইয়া। পূর্বপুরুষের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, যাহা বংশের মজ্জাগত হইয়া পুরুষানুক্রমে জীবনের সূক্ষ্ম সূত্ররূপে প্রচ্ছন্ন বা প্রকট থাকে; শৈশবের শিক্ষা বা পিতামাতার প্রভাব, যাহা তরুণ হৃদয়ে মুদ্রিত থাকিয়া সমগ্র জীবনের ভবিষ্যৎ চিত্রকে আপনার বর্ণে রঞ্জিত করিয়া রাখে; সমাজের আদর্শ ও সাধনা, দেশের জীবন মরণের প্রশ্ন ও সংগ্রাম, বিশ্বমানবের অস্ফুট অলক্ষিত ভাববিনিময়, যাহা জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে জীবনের প্রবাহকে স্পন্দিত ও ছন্দিত করিয়া রাখে; জীবনের হিসাব হইতে ইহার কোন কিছুই একেবারে বাদ পড়ে না। আমার জীবনের সমগ্রতার মধ্যে এ সমস্তই মিলিত হইয়া যখন অখণ্ড আকার ধারণ করে, তখন তাহার মধ্যেই আমি সেই দৃষ্টি সেই পরখশক্তি, লাভ করি—যাহা বিশ্বজগতের মধ্য হইতে আমার বিশেষ জগৎটিকে বাছিয়া লইবার সূত্র ধরাইয়া দেয়।

অবিশ্রান্ত পরিবর্তনের মধ্যে জগৎ প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, মুহূর্তে মুহূর্তে সে নূতন হইয়া উঠিতেছে। কাল যে জগৎ দেখিয়াছি, আজ আর ঠিক সে-জগৎ নাই, আজ সে অতীতের মধ্যে বিলুপ্ত; অথচ দ্রষ্টা আমি, জগৎসাক্ষী আমি, সেই জগৎকে আজও আমার জীবনের মধ্যে বহন করিয়া আনিতেছি; আমার অতীত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাকে, আমার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমগ্র পরিচিত জগৎকে আমার জীবনের মধ্যে চুম্বকরূপে ধারণ করিয়া রাখিতেছি। আমারই সঞ্চিত সেই জগতের মধ্য হইতে জীবনের অব্যক্ত প্রেরণায় আমার বর্তমান ও আমার ভবিষ্যৎ উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে। কাল পর্যন্ত জগতের যে চিত্র জীবনের পটে অঙ্কিত করিয়াছি, তাহারই আলোক রশ্মিতে ও তাহারই ছায়ার কালিমায় আজকার এই জগৎকে আমি বিচিত্ররূপে রঞ্জিত করিয়া দেখিতেছি। আমার অতীতের সঞ্চিত সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতা, আমার সকল তৃপ্তির আনন্দ ও অতৃপ্তির অবসাদ, আমার জীবনের বিচিত্র পছন্দ ও অপছন্দ, আজকার এই জগতের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া তাহাকে আমার একান্ত নিজস্ব সুরে বর্ণে ও স্বাদে বিচিত্ররূপে প্রতিভাত করিয়া তুলিতেছে। যে চক্ষে আমি জগৎকে দেখিয়াছি ও দেখিতেছি,—ঠিক সেই চক্ষে আর কেহ জগৎকে দেখে নাই, আর কেহ দেখিবে না। কি দেখিলাম, কতটুকু দেখিলাম, সে প্রশ্ন জাগিবার পূর্বেই যাহা কিছু দেখিয়াছি যাহা কিছু পাইয়াছি তাহাকে জীবনের সহজ আনন্দের মধ্যে 'আমার' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। আমা অপেক্ষা কত জনে কত বেশী দেখিয়াছে, আমি ততদূর দেখি নাই। নাই বা দেখিলাম। আমার চাইতেও কত বিচিত্র ভাবে কত নিবিড় ভাবে কত লোকে জগৎকে জানিয়াছে বুঝিয়াছে, আমি তেমন করিয়া বুঝি নাই—নাই বা বুঝিলাম। আমার জীবন যেটুকু দেখিয়াছে, সেইটুকুই আমার দেখা—একান্তভাবে নিজস্বভাবে বিচিত্রভাবে আপনার বলিয়া দেখা। এই বৈচিত্র্য, এই বিশিষ্টতাই আমার যথার্থ নিজস্ব সম্পদ। যে পরিমাণে আমি বিচিত্র, সে পরিমাণে আমার জীবন অন্য সকল জীবন অপেক্ষা পৃথকভাবে প্রস্ফুটিত, সেই পরিমাণে আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সার্থকতা। প্রত্যেকটি জীবন জগতের এক একটি স্বতন্ত্র নূতন সমস্যা, জীবন-বিধাতা জীবনের অব্যাহত আনন্দের মধ্যে আপনি তাহার নিত্য নূতন সমাধান করিতেছেন। বিশ্বশক্তি প্রতি জীবনের মধ্যে চৈতন্যরূপে জাগ্রত থাকিয়া আপনাকে আপনি অন্বেষণ করিতেছেন; আপনার বিশ্বরূপকে জীবনের বৈচিত্র্যের মধ্যে খণ্ডিত করিয়া দেখিতেছেন। ইহার মধ্যে একটি জীবনও ব্যর্থ নয়, একটি খণ্ডও নিরর্থক নয়। বিশ্ববিধানের মধ্যে প্রত্যেক জীবনের স্বতন্ত্র স্থান আছে।

জগৎ প্রবাহের মধ্যে আমরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, প্রত্যেকেই বিচিত্র—কিন্তুই কেহই বিচ্ছিন্ন নই; নিঃসম্পর্ক ভাবে কেহই জীবন যাপন করি না। মানুষ কেবল যে সাক্ষাৎভাবে নিজের চোখেই দেখে তাহা নয়; বিশ্বমানবের সহস্রায়ত চক্ষুর মধ্যে সে প্রতি নিয়তই পরোক্ষ দৃষ্টি

লাভ করিতেছে। আমার জীবনের সৌরভ আবার দশজনের জীবনে আমোদিত হইয়া উঠিতেছে, আমার জীবনের পূতিগন্ধ অপর দশজনের জীবনকে অপবিত্র করিয়া তুলিতেছে। আমার মতামত আমার সুখ দুঃখ আমার আশা নিরাশা অপর দশ জীবনের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া জীবনের বিচিত্রতাকে বিচিত্রতর করিয়া তুলিতেছে। প্রতি মানবের উত্থান-পতন প্রতি মানবের হাহাকার ও আনন্দ কোলাহল বিশ্বমানবের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। জীবনে জীবনে আদান প্রদান চলিতেছে, জীবনের গোপনসঞ্চিত জগৎ ছবির বিনিময় চলিতেছে, জীবনের হাটে ভাবের, আদর্শের, সাধনার, অবিশ্রাম বেচাকেনা চলিয়াছে। আমার ক্ষুদ্র জগৎ দশ জনের জগতের সংঘর্ষে গড়িয়া উঠিতেছে—দশ জনের জীবন আমার জীবনের উদ্দামতাকে সংহত ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

যে যতটুকু পায়, সে ততটুকুই দেয়। কেহ বেশী পায়, কেহ কম পায়—তাহাতে দুঃখ কি? পাওয়া ত কাহারও ফুরায় নাই। যতটুকু দেখিলাম আরও অনেক দেখিতে বাকী থাকিল, তাহাতেই বা দুঃখ কিসের? দেখিবার তৃষ্ণা ত আমার মিটে নাই। আমার অপ্রাপ্ত সম্পদের আকাঙ্ক্ষা বর্তমানের চাওয়ার আনন্দ ও পাওয়ার আনন্দ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিবে কেন? বৈজ্ঞানিক জগতে সেই অপূর্ব নিয়মশৃঙ্খলা দেখিয়াছেন, যে নিয়মবন্ধনে বিশ্বজগৎ একসূত্রে গ্রথিত। ইহার মধ্যে তিনি যে আনন্দের স্বাদ পাইয়াছেন জগতে তিনি তাহারই সাক্ষ্য বহন করুন। হয়ত তিনি জগতের অন্তঃপ্রবিষ্ট চৈতন্যকে দেখেন নাই—হয়ত পরকালের তত্ত্ব তাঁহার কাছে প্রকাশিত হয় নাই—সে সংবাদ বহন করিবার দায়িত্ব ও অধিকারও তাঁহার নাই।

বিশ্বজীবনে শাশ্বত এক আছেন শাশ্বত বৈচিত্র্যও আছে। কেবল ঐক্যই জগতের নিয়ম নয়, জীবনব্যাপারের মধ্যে বৈচিত্র্যের নিয়ম আরও স্পষ্ট আরও উজ্জ্বল। বৈচিত্র্য সর্বত্রই—সাধনের বৈচিত্র্য, প্রকাশের বৈচিত্র্য, চিন্তার বৈচিত্র্য, অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য। বিচিত্রকর্ম ভগবানের বিচিত্র বিধাতৃত্ব বিচিত্র জীবনকে আশ্রয় করিয়াই পরিপূর্ণ বৈচিত্র্যের মধ্যে আপনাকে ব্যক্ত করিতেছে।

জগৎ ব্যাপারের মধ্যে আমি কেবল দ্রষ্টা নই, কেবল সাক্ষী নই, কেবল গৃহীতা নই—আমি স্রষ্টা। আমি সৃষ্টি করিতেছি, আমার চিন্তাধারা, আমার সাধনার ব্যর্থতার ও সফলতা দ্বারা; আমি সৃষ্টি করিতেছি আপনাকে, সৃষ্টি করিতেছি আপনার আদর্শকে—যে আদর্শ আমায় ভাঙিতেছে গড়িতেছে সেই আদর্শকে। আমার সকল অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে আমারই অভিজ্ঞতার আঘাতে ভাঙিয়া গড়িতেছি—জীবন গড়িতেছি, আপনাকে গড়িতেছি—আপনার সৃষ্ট জীবন ও কল্পনাকে জগতের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া জগৎকেও গড়িতেছি। একদিকে জগতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া আমার জীবনের কষ্টিপাথরে পরখ করিয়া আমারই জীবনের খোরাক সংগ্রহ করিতেছি; অপর দিকে, জীবনকে তাহার সহস্র সম্বন্ধের ভিতর দিয়া জগতের কাছে অজস্র বিতরণ করিয়া সেই ঋণ পরিশোধ করিতেছি। আমি যাহা ধরিতেছি, যাহা গড়িতেছি, যাহা গড়িয়া উঠিতেছি, আমার জীবনই তাহার পরিচয়। আমার জীবনই আমার অন্তর জগতের মূর্ত প্রতিভূস্বরূপ।

ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মানুষ সম্বন্ধে যে কথা, সমষ্টি ভাবে প্রত্যেক মণ্ডলী প্রতি সমাজ প্রতি দেশ ও জাতি সম্বন্ধেও সেই কথা। প্রত্যেকে স্বতন্ত্র, প্রত্যেকে বিচিত্র, বিশ্বমানবের সাধনার মধ্যে প্রত্যেকেই এমন কিছু বহন করিয়া আনে, যাহা সম্পূর্ণ নূতন, যাহা একান্তই তাহার নিজস্ব। যেমন দেশে দেশে তেমনি যুগে যুগেও মানুষ নূতন দৃষ্টি লাভ করিয়াছে, নূতন চক্ষে জগৎকে দেখিয়াছে। একজন দুজন দশজন জগতে এক একটা নূতন কিছু দেখিয়াছে, যাহা তেমন করিয়া আর কেহ দেখে নাই—যাহা সেই যুগের বিশেষ সৃষ্টি। রামমোহনের যুগে দেশে মানুষও ছিল ধর্মও ছিল—ছিল না কেবল রামমোহন রায়ের সেই

দৃষ্টি, যাহা এই যুগের যথার্থ প্রেরণাকে নিজের মধ্যে পরখ করিয়া দেখিতে পারে; যাহা এই যুগের সংগ্রামকে নিজ জীবনের সংগ্রামের মধ্যে অনুভব করিতে পারে।

কিন্তু 'এ যুগ' ত আর চিরকাল এ যুগ থাকে না; দু'দিন বাদে সেও অতীতের মধ্যে অস্তমিত হয়। তখন নবীনতর যুগের নূতন আহ্বানে মানুষ চির নবীনতার উৎসবে আবার নূতন করিয়া অন্বেষণ করে। মানষের আদর্শ ও সাধনা কেমন করিয়া যুগে যুগে আপনাকে নূতনতর বিচিত্রতর রূপে অন্বেষণ করে, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের পত্রে পত্রে তাহার সাক্ষ্য বর্তমান।

আজ মনে হয়, যেন ব্রাহ্ম সমাজের নূতন যুগসন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। মনে হয়, এ যুগ 'সে যুগে' পরিণত হইতে চলিয়াছে, মনে হয় বিদায়োন্মুখ যুগের পশ্চাতে সহস্র প্রশ্ন ভারাক্রান্ত কি এক নূতন যুগ আসন্নপ্রায়। মনে হয়, যে নবীনতার উৎস একদিন ব্রাহ্মসমাজকে সঞ্জীবনসুধাসিক্ত করিয়া রাখিয়াছিল, নবযুগের আবেষ্টনের মধ্যে আবার তাহাকে নূতন করিয়া অন্বেষণ করিতে হইবে। মনে হয়, জীবনের মধ্যে সে উৎসকে খুঁজিয়া পাইতেছি না; মনে হয়, দশজনের জীবনের সংগ্রাম ও শুষ্কতা, দশজনের অতৃপ্তি ও নিরাশা, যদি ব্যাকুল ভাবে তাহার প্রয়াসী হয়, বুঝি সে প্রার্থনার মধ্যে তাহার সন্ধান পাওয়া কঠিন হইবে না।

যে যুবক, যাহার বয়স অপরিণত, জীবন যাহার সম্মুখে—তাহার ধর্ম এক কথায়, এই যুগের ধর্ম, বর্তমানতার ধর্ম। কত মানুষ অতীতের মধ্যে আশ্রয় লইয়া নিশ্চিন্তে থাকিতে চায়; অতীতের জীর্ণ স্মৃতিকে অবলম্বন করিয়া তাহাতেই কত মানুষ ডুবিয়া থাকে। কত মানুষ ভবিষ্যতের উপর তাহার আশা ভরসা নিবদ্ধ রাখে, মনকে সুদূর পরিণতির প্রলোভন দেখাইয়া আশ্বস্ত রাখে। মানুষ এই বিশ্বাস লইয়া সান্ত্বনা লাভ করে, যে আজ জগৎকে যেমনটি দেখিতেছি, এমন সে চিরকাল থাকিবে না। এই যে পাপ তাপ দুঃখ দারিদ্র্য সংগ্রাম কালে ইহা বিলুপ্ত হইয়া জগতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাই মানুষ বর্তমানকে ভাবে না—বর্তমান কেবল অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আশার মধ্যে সূক্ষ্ম সংযোগসূত্র রূপে দোলায়মান থাকে।

বর্তমানের মত এমন স্পষ্ট, এমন পরিপূর্ণ শুভ মুহূর্ত আর কোথায়? এই বর্তমান যাহা সমস্ত অতীতকে বহন করিয়া তাহার সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে আপনার মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে গ্রথিত করিয়া রাখিতেছে; এই বর্তমান, যাহার মধ্যে পূর্ণ পরিণত ভবিষ্যতের সমুদয় সম্ভাবনা ও সার্থকতা নিহিত রহিয়াছে, এই বর্তমানই ত যথার্থ জীবন। 'এখন', 'এই মুহূর্ত' 'এই বর্তমান'—পলকে পলকে এই অনুভূতির প্রেরণাই ত জীবনকে জীবন্ত করিয়া রাখিতেছে।

এই জগৎ, এই বর্তমান সুখ-দুঃখ-সংগ্রামময় জগৎ, যেমন যথার্থরূপে জীবন্ত রূপে সার্থক, বিধাতার বিধাতৃত্ব ইহার মধ্যে যেমন পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত, এমন আর কোথায়? কোন এক অনির্দেশ্য ভবিষ্যতে এ জগৎ একদিন পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিবে, কেবল এই কথাই সত্য নহে—এখনই এই মুহূর্তেই তাহা পরিপূর্ণরূপে বিচিত্রতররূপে আপনার সার্থকতম রূপে প্রতিষ্ঠিত, ইহাও তেমনি সত্য।

আদর্শকে আমরা দূরে রাখিতে চাই। সে যে আমারই মধ্য দিয়া আমার এই বর্তমান জীবনসংগ্রামরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখি না। এই জীবনের মধ্যে আমার এই সংগ্রামের ব্যর্থতার ও সফলতার মধ্যে যদি সাক্ষাৎ জীবন্ত আদর্শকে খুঁজিয়া না পাই, তবে কেবল একটা সুদূর পরিণতির আশ্বাস আমার কোন্ সান্ত্বনায় লগিবে? আদর্শের মধ্যে বাস করিতেছি, আদর্শকে লইয়া কারবার করিতেছি, আমি ইচ্ছা করিলেও আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতে পারি না, কারণ জীবন ও আদর্শ একই বস্তুর দুই পিঠ মাত্র। যাহাকে আদর্শ বলি তাহা আমারই জীবনের অন্তর্নিহিত অব্যক্ত সার্থকতা, যাহাকে জীবন বলি তাহা সেই অব্যক্ত আদর্শেরই বহিস্ফূর্তি মাত্র।

আমার জীবনের উত্থান-পতন লাভ লোকসানের সকল হিসাব ও সকল বিচার কৈফিয়তের সাক্ষী ও নিয়ামক আমার সেই আদর্শ, যাহা জীবনের অন্তর্নিহিত মূলসূত্ররূপে, জীবনের নব নব প্রেরণারূপে আপনার রহস্যকে প্রতি মুহূর্তেই ব্যক্ত করিয়া দিতেছে; আমার জীবনকে গড়িতে গিয়া আপনি গড়িয়া উঠিতেছে; জীবনের বিকাশরূপে আপনাকেই বিকশিত করিয়া তুলিতেছে।

সুতরাং যৌবনের সাক্ষ্য এই—বর্তমানের উপর আস্থা রাখ, বর্তমানের মধ্যেই আদর্শের সন্ধান কর। আপনাতে বিশ্বাস কর, আপনার অন্তর্নিহিত জীবন্ত প্রেরণাশক্তিতে বিশ্বাস কর। তোমার বিচিত্র অপূর্ণতার মধ্যে তোমার পূর্ণরূপ সার্থকরূপ নিহিত আছে—তাহাকে বিকশিত হইতে দাও। তোমার সমস্ত লক্ষ্যহীন ব্যর্থতার মধ্যে আদর্শরূপী তুমি ছায়ার মত ঘুরিতেছ, সেই আদর্শকে তোমার মধ্যে প্রকাশিত হইতে দাও।

অপরাহত বিশ্বশক্তি আমার মধ্যে মূর্তিগ্রহণ করিয়াছে, প্রতি জীবনের মধ্যে নিয়ন্তারূপে জাগ্রত রহিয়াছে। সে শক্তি যদি বিধাতার ইঙ্গিতচালিত হয়, যদি কোথাও সে জয়যুক্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে কাহারও জীবনে সে ব্যর্থ হইতে পারে না, কেন না সে শক্তির আর প্রতিদ্বন্দ্বী নাই—সে পরাজয় জানে না। শুধু এখানে নয়, শুধু ধর্মসমাজে নয়, শুধু উপাসনাশীল সাধু জীবনে নয়, সর্বত্র সে জয়যুক্ত। আমার জীবনে শুধু ভবিষ্যৎ জীবনে নয়, কেবল সেই কল্পিত সর্বপাপমোহমুক্ত জীবনে নয়—এই আমার বর্তমান জীবনে প্রতি মুহূর্তেই সে পরিপূর্ণরূপে জয়যুক্ত। তবে যে মানুষে পাপ করে, তবে যে জগতে এত সংগ্রাম এত ব্যর্থতা এত অভিশাপ এত তপ্ত নিশ্বাস? এ সকল কি বিধাতার বিধাতৃত্বের অধীন নয়? তাঁহার মঙ্গল নিয়মকে জরা দুঃখ মৃত্যুর মধ্যে স্বীকার করিয়া পাপের কাছে মানুষ পরাজয় মানিবে? যুবকের দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখি, আমার আদর্শের মধ্যে এমন অসঙ্গত কল্পনার কোন স্থান দেখি না।

ভগবানের অকাট্য ইচ্ছা পাপের কাছেও পরাজিত নয়। মানুষের জীবনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া যে ভগবান আমার সুখ দুঃখ সংগ্রামের বোঝা বহন করিতেছেন, আমার পাপের বোঝাও সেই ভগবানই অপরাজিত প্রসন্নতার সহিত বহন করিতেছেন।

এ কি ভয়ানক কথা! যখন পাপে লিপ্ত হই তখনও ভগবানের ইচ্ছাকে অতিক্রম করিতে পারি না? মানুষ ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করে, তবে মানুষকে পাপ হইতে রক্ষা করিবে কে? তাহার দায়িত্বজ্ঞান ও তাহার পুরুষকারকে জাগ্রত করিবে কে? যথার্থভাবে এই প্রশ্ন যে করে তাহার মধ্যেই জাগ্রত ভগবানই রক্ষা করিবেন। জগতে শুধু পাপ নাই, পাপবোধ আছে, পাপের সহিত সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষা আছে, পাপের প্রতি ঘৃণা আছে, পুণ্যের সহস্র দৃষ্টান্ত ও স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে—পাপভারাক্রান্ত জীবনের প্রার্থনা ও ব্যাকুলতা আছে। Blessed are the sinners for they shall be saved. পাপকলঙ্কিত জীবনের দুঃখের মূল্য দিয়া সেও পরিত্রাণ পায়। বিচিত্রকর্মা ভগবানের বিচিত্র বিধাতৃত্ব তাহার জীবনেও পরিপূর্ণ বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

সকলে আশান্বিত হই। তুমি ভাই উপাসনাশীল নও—তুমি আশান্বিত হও, তুমিও সার্থকতা লাভে বঞ্চিত থাকিবে না। তুমি ভাই ভগবানকে দূরে দেখিয়াছ—বিশ্বকারণরূপে দেখিয়াছ—নিজ জীবনের নিয়ন্তা ও বিধাতারূপে দর্শন কর নাই? তুমি আশান্বিত হও, নবজীবনের বারতা আসিয়াছে, তুমিও বঞ্চিত থাকিবে না। তুমি ভাই জীবনের কোন আশ্রয় খুঁজিয়া পাও নাই? জীবনযাপনের পাথেয় তুমি সঞ্চয় করিতে পার নাই? তুমিও তোমার জীবনের অব্যক্ত আনন্দকে আশ্রয় করিয়া আশান্বিত হও—তোমার জীবনের কর্ণধার স্বয়ং ভগবান তোমার যাথাতথ্য বিধান করিবেন।

আশান্বিত হও। কত বিচিত্র জীবনে কত বিচিত্র আদর্শে মানুষ নিজ নিজ জগৎ রচনা করিতেছেন, অতীতের ও বর্তমানের কত সাধু জীবনের মধ্যে কত বিচিত্র আলোক ও অভিজ্ঞতা

সঞ্চিত হইয়া আছে। তাহাদের দ্বারে দ্বারে আঘাত করিয়া দেখ কোথায় সাড়া পাও। কত স্থানে সায় পাইবে না—কত অন্তরে দ্বার রুদ্ধ দেখিবে, কত জীবনের উজ্জ্বল আলোকে তোমার জীবন প্রদীপ জ্বলিবে না। নাই বা জ্বলিল? তবু আপনার উপর বিশ্বাস রাখ তবু আশান্বিত হও।

নিজের জীবন সঞ্চয়ের জন্য দশের জীবনের মধ্যে মানুষ তীর্থযাত্রা করে, দশের নিকট জীবনের রস সংগ্রহ করে—ইহারই নাম শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা তোমার জীবনে নাই? তুমি আশান্বিত হও। আপনাকে যথার্থ রূপে জানিবার জন্য ব্যাকুল হও—শ্রদ্ধায় তোমার জীবন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

দৈবেন দেয়ম্

সত্যিকার বাস্তব খবরের চাইতে অমূলক বাজার-গুজবের প্রতিপত্তি যেমন প্রবল, স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষের তুলনায় অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্টের মোহপ্রভাব তেমনি অনেক বেশি। স্পষ্টভাবে যাহাকে দেখি শুনি ও জানি, তাহাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া দুকথায় তাহার নাড়ীনক্ষত্রের হিসাব ফুরাইয়া যায়, কিন্তু যাহাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, সম্ভব-অসম্ভব নানা ডাল-পালায় পল্লবিত হইয়া সে মনের কল্পনাকে ভরাট করিয়া রাখে। তাই প্রত্যক্ষ আলোকের চাইতে অস্পষ্টতার আবছায়াই মনের মধ্যে অধিক সম্ভ্রমের সঞ্চার করে। স্পষ্ট শাসনের ভয়ে যে শিশু বিব্রত হয় না, সেও দেখি "জুজু" নামক অনির্দেশ্য পদার্থটিকে যথেষ্ট খাতির করিতে জানে।

এই অস্পষ্টতার আবরণ দিয়া মানুষ জীবনের সকল ক্ষেত্রেই নানারকম জুজু পুষিয়া থাকে। কতকগুলি পরিচিত নাম বা দু-দশটা প্রচলিত বচনকে গাম্ভীর্যের মুখোশ পরাইয়া এমন বড়-বড় আসনে বসাইয়া রাখে যে তাহাদের সম্বন্ধে তর্কবিচারের চেষ্টাও বেয়াদবির নামান্তর বলিয়া গণ্য হয়। ব্রহ্মচর্যের অক্ষয়মাহাত্ম্য অস্বীকার করিবার জো নাই। কিন্তু বালবিধবার প্রবোধচ্ছলে সে মাহাত্ম্যের উচ্ছ্বসিত কীর্তন যে অনেক স্থলেই জুজু দেখাইবার আড়ম্বর মাত্র এরূপ সন্দেহ করা অসঙ্গত নয়। ভারতের অধ্যাত্ম-সম্পদ কিছু অবাস্তব কল্পনা নয়, কিন্তু সাত্তিকতা ও আধ্যাত্মিকতার বাহুল্য বর্ণনায় মন যে অকারণ সম্ভ্রমে ভরিয়া ওঠে, তাহা অনেক স্থলেই নিছক জুজুতন্ত্রের নির্দশন মাত্র। মোটকথা, অস্পষ্ট তত্ত্ব ও অনির্দিষ্ট সংস্কারকে যথাসম্ভব স্পষ্ট ও গম্ভীর ভাষায় ব্যক্ত করিলে তাহাতে অল্পায়াসে অনেকখানি ফল পাওয়া যায়। তর্কস্থলে প্রতিপক্ষের মুখ বন্ধ করা যখন আবশ্যক হয়, তখন এইরূপ দু-একটি জুজুকে অকস্মাৎ আসরে নামাইলে, তাহার ফলটি হয় ঠিক চলন্ত রেলগাড়ির মুখে লালবাতি দেখাইবার অনুরূপ।

প্রবল তর্কের উৎসাহমুখে, "দিন আগে না রাত আগে?" বলিয়া সুকৌশলে একটি বিরাট সমস্যার অবতারণা করিলে, বেহিসাবী সাধারণ লোকে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত করিয়া বসে যে, ইহার পরে আর তর্ক চলে না। কিন্তু স্পষ্ট-বুদ্ধির সতর্কতা কোমর বাঁধিয়া বলে যে তর্কবিচার করিতে হয় তো এইখানেই করা দরকার। এইখানেই বিশেষভাবে স্পষ্ট করিয়া বলা প্রয়োজন যে দিবারাত্রির এই আপাতভীষণ দ্বন্দ্বটা একটা নিতান্তই মোটা কৃত্রিম তর্ক মাত্র। দিন এবং রাত, ভিতর ও বাহিরের মতো, উত্তর ও দক্ষিণের মতো, কাগজের এপিঠ-ওপিঠের মতো, শাশ্বতকাল একই বাস্তব আইডিয়ার দুই মাথায় বসিয়া আছে। শাশ্বত কাল হইতে যেখানে-যেখানে সূর্য প্রদীপ্ত হইয়াছে, সেখানে-সেখানেই নানা ছন্দে নানা বিচিত্রতালে দিবারাত্রির যমজলীলার অভিনয় চলিয়াছে। এই পৃথিবীও যখন আপনার স্বতন্ত্রজীবনে প্রথম সূর্যালোক প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তখন হইতেই আলো-

আঁধারের একই চক্রে দিবা-রাত্রি গণনার সূত্রপাত হইয়াছিল। সেইরূপ "বীজ আগে না গাছ আগে" এই প্রশ্নেরও একটা সম্মোহন মূর্তি আছে। শুনিলেই মনে হয় একটা বিরাট নিরুত্তর সমস্যা, তাই মানুষ সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু সতর্ক সহজ বুদ্ধি চোখে আঙুল দিয়া দেখায় যে জড় ও চেতনের সন্ধিমুখে জীবনের আদি উন্মেষ যেখানে, সেখানে বীজও নাই, বৃক্ষও নাই, কেবল আকার বৈচিত্র্যহীন জীবকোষ পরিপুষ্টির আতিশয্যে ফাটিয়া দুখান হয়, "এক" সেখানে সাক্ষাৎভাবে "দুই" হইয়া বংশ বিস্তার করিতে থাকে। ক্রমে জীবন-রহস্যের জটিলতা যখন বাড়িয়া পরিণত ও অপরিণত জীবের প্রভেদ স্পষ্ট হইয়া ওঠে, জীবাবস্থা ও বৃক্ষাবস্থার স্বাতন্ত্র্যকল্পনা যখন সম্ভব হয়, তখন সেই একই সম্ভাবনার যুগলচিত্র বৃক্ষ ও বীজের অবিচ্ছিন্ন দ্বন্দ্বের মধ্যে যুগপৎ প্রকাশিত হয়। দ্বন্দ্বটা যে কি এবং তাহার প্রতিষ্ঠাভূমি কোথায়, এরূপ স্পষ্টভাবে ঘাঁটাইয়া না দেখিলে, তাহা যেকোনো ঝাপসা তর্কের ও নৈয়ায়িক আগাছার উর্বরক্ষেত্র হইয়া উঠিতে পারে। কার্যটা যেভাবে স্থূল ও সূক্ষ্ম কারণের মধ্যে বীজাকারে নিহিত থাকে, বৃক্ষটা ঠিক সেইরূপ সূক্ষ্মভাবে বীজের মধ্যে "একাধারে" "অপ্রকট" থাকে কিনা, এবং বীজটা যদি উপাদান কারণ হয় তবে বৃক্ষের নিমিত্ত কারণটা ঐ বৃক্ষবীজ-সম্বন্ধেরই অঙ্গীভূত কিনা, কার্য ও কারণ এবং বৃক্ষ ও বীজ, কৃতকর্ম ও অকৃতকর্ম এবং বাস্তববৃক্ষ ও বৃক্ষসম্ভাবনা ইহাদের পরস্পর নাম-সম্পর্ক কিরূপ, ইত্যাকার এ্যাবস্ট্রাক্‌শন বা অবস্তুর বিচার তখন সমস্যার চারিদিকে জটিলতার জট পাকাইয়া তাহাকে দুর্বোধ্য করিয়া রাখে।

এইরূপ ঝাপসা কথার ধোঁকা দিয়া মানুষ আপন মনে এক-একটা অস্পষ্টতার মোহ সৃজন করে, এবং সেই মোহকে জীবনের মধ্যে সংক্রামিত করিয়া অকারণ তৃপ্তিবোধ করে। এই দুর্ভাগ্য দেশে, জীর্ণতার পরিত্যক্ত কঙ্কাল যেখানে প্রাণের চাইতে অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়, এই জুজুতন্ত্রের শাসনও এইখানেই মারাত্মকরূপে প্রবল। এ জিনিস যে অন্যদেশে নাই তাহা নয়, বাক্য ও চিন্তার ফেটিশ্‌ সকল দেশে সকল সমাজেই সুলভ। কিন্তু মোহের কবলে এমন নিশ্চেষ্ট নিরাশ্রয়ভাবে মানুষ আর কোথাও পড়িয়া থাকে না। লোকশাসন ও সমাজবিধির অপচার সর্বত্রই আছে কিন্তু তাহার এমন পাকাপাকি প্রতিষ্ঠার আড়ম্বর আর সকলখানেই দুর্লভ।

ইংরেজিতে যাহাকে সুপারস্টিশন্‌ বলে, বাংলায় তাহারই নামান্তর করা হয় "কুসংস্কার"। ঐ জিনিসটার প্রতি কটাক্ষপাত নিবারণের জন্য একশ্রেণীর লোকে একটা বড় গোছের জুজু পুষিয়া থাকেন, তাহার মন্ত্র, "দেয়ার ইজ এ. সুপারস্টিশন্‌ ইন এ্যভয়ডিং সুপারস্টিশন্‌" অর্থাৎ কুসংস্কার বর্জনের প্রয়াসটাও একটা কুসংস্কার। উঠিতে বসিতে চলিতে ফিরিতে, শুভাশুভ লক্ষণ-বিচারে, তিথিনক্ষত্রের নানা-উপদ্রবে, হাঁচি-টিকটিকি আসন-মুদ্রার মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে যে জিনিসটার জাল-বিস্তার হইতে দেখি,. তাহাকে কুসংস্কার বলিলে অনেকে রাগ করেন। বলেন, "তুমি কি এমনই দিগ্‌গজ ত্রিকালজ্ঞ হইয়াছ যে কিসে কি হয় না হয়, সমস্ত জানিয়া শেষ করিয়াছ? বিজ্ঞানের কয়েকটা পুঁথি আওড়াইয়া তুমি কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল তত্ত্ব একেবারে দিব্যদৃষ্টিতে বুঝিয়া ফেলিয়াছ?" ইহার পালটা জবাব দেওয়া যায় যে, "প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে তোমার অন্ধ আচারের কোনো বন্ধন না মানিয়াও সহজ স্বাধীনভাবে কত দেশ কত জাতি সংসারে তরিয়া গেল, আর তোমার জটিল নিয়মের বিরাট প্রশস্তি যুগযুগান্তর জপিয়া-জপিয়াও 'তুমি যেই তিমিরে সেই তিমিরে।' তাই সন্দেহ হয় যে আধ্যাত্মিক জীবন-পুষ্টির খাতিরে তুমি যে সূক্ষ্ম আহারের অভিনয় করিতেছ, তাহা ফাঁকা রোমন্থন মাত্র।" কিন্তু ইহাতেও নূতন তর্ক জুটিবে যে সত্য-সত্যই আর কোনো জাতি অগ্রসর হইতেছে কিনা এবং আমরাও যথার্থই পশ্চাতে পড়িয়া আছি কিনা, আর যাহাকে "তিমির" বলা হয় সেটাও কি যথার্থই তিমির, না স্নিগ্ধ আলোর আশ্চর্য প্রকার বিশেষ। এই প্রকার ধাঁধাচক্রে

নিরুদ্দেশ ভ্রমণ আমাদের এমনই অভ্যাসগত যে, চক্রের ব্যূহভেদ করা যে আবশ্যক, একথাটাই লোকে ভুলিয়া যায়। তাই অন্ধতার গৌরব করিয়া মানুষ বলে, "সকল বিষয়ে অতি জাগ্রত হওয়াটা কিছু ভালো নয়, ওটা সাবধানতার বাড়াবাড়ি মাত্র। দেয়ার ইজ এ সুপারস্টিশন্ ইন এ্যাভয়ডিং সুপারস্টিশন্!" মনের এক-একটা অন্ধ সংস্কার নিশ্চিন্ত নিরীহভাবে জীবনের উৎসরূপে চাপিয়া বসে, সহজ ব্যাপার কথার পাকে জটিল হইয়া ওঠে, গভীর তত্ত্ব নিরর্থক মুখস্থ বুলির মতো বচনমাত্রে পরিণত হয় তাহাকে কাহারো আপত্তিও নাই অতৃপ্তিও নাই।

এইরূপে কতগুলি অস্পষ্ট ও অচিন্তিত সংস্কার যখন কথায় নিবদ্ধ হইয়া জীবনের ঘাড়ে চাপিয়া বসে তখন তাহার প্রভাব কতদূর মারাত্মক হইতে পারে তাহার সব চাইতে বড় দৃষ্টান্ত আমাদের এই অদৃষ্টবাদ। এতবড় সর্বগ্রাসী জুজু এদেশে বা কোনো দেশে আর দ্বিতীয় নাই। আকার ও প্রকারের প্রভাবে ও প্রতিপত্তিতে এই এক সংস্কারের মূঢ়তা এমন আশ্চর্য সম্পূর্ণ ভাবে জীবনের আট-ঘাট জুড়িয়া জীবনের হাড়ে-হাড়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে যে, মনে হয় জীবনের সকল অভ্যাস বন্ধনকে আমূল উপড়াইয়া না ফেলিলে ইহার আর প্রতিষেধ হয় না। এই এক জিনিসের মোহপ্রভাব সমস্ত জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত সজীবতার উপর এমন পাকা করিয়া আপন রঙের ছোপ ধরাইয়া দেয় যে জীবনের প্রবল স্রোতে অবিশ্রান্ত ধুইলেও রঙের ঘোর ছুটিতে চায় না বিচারের প্রখর রৌদ্রে উন্মুক্ত থাকিয়াও মরিতে চায় না। তাই জীবন সংগ্রামের সহস্র তাড়নার মধ্যে নিশ্চেষ্ট মানুষ সুখে হতাশ, দুঃখে হতাশ, বিচার নাই, উদ্যম নাই, হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকে, আর বলে, "দৈবেন দেয়ম্।" দৈবে করায়, দৈবে ঘটায়, অদৃষ্টের ফেরে পাই, অদৃষ্টের ফেরে হারাই। কর্মবন্ধনের আবর্তে পড়িয়া ঘুরিতেছি ফিরিতেছি, বাহির হইবার পথ দেখি না, কারণ বাহির হইবার পথ নাই। যদিবা মুহূর্তের উৎসাহে বলিয়া ফেলি যে, "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী" কিন্তু সেই উদ্যোগী পুরুষটিকে এই উত্তম-পুরুষরূপে দেখিবার আগ্রহ নাই, থাকিলেও তাহার আয়োজন দেখি না। কেবল জীবনের নিরুদ্যম ভীরুতা, "দৈবেন দেয়ম্ ইতি কাপুরুষাঃ বদন্তি" এই কথার সত্যতা প্রমাণ করিতে থাকে।

দৈবেন দেয়ম্। দৈবে যাহা আনিয়া দেয়, ঘাড় পাতিয়া তাহাই লও। সে দৈব যে কে, সে যে কোথা হইতে কিরূপে দেয়, তাহা দৈবই জানে, তোমার আমার কিছু বলিবার নাই, কিছু করিবার নাই। দৈবের অমোঘ চক্রে তুমি আমি কলকব্জার খুঁটিনাটিমাত্র, তোমার আমার সুখ দুঃখে, তোমার আমার ইচ্ছা অনিচ্ছায়, নিয়তির চক্র টলিবে কেন? দৈবে হাসায়, দৈবে কাঁদায়, নতুবা তুমি হাসিতেও জানো না কাঁদিতেও পার না, তুমি কেবল দ্রষ্টা মাত্র, দৈবকর্মের সাক্ষীমাত্র। দারিদ্র্যে দুর্ভিক্ষে লোক মরে, ব্যাধিতে দুশ্চিকিৎসায় লোক মরে, মানুষ তাহার কি করিবে? যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই, কপালে যদি মরণ থাকে, মরণ তবে আসিবেই। আগুন জ্বলিয়া ঘর যায়, বাড়ি যায়, কি করিব? দৈবের লিখন। আগুনের মধ্যে দু-কলসী জল ঢালিবার চেষ্টাও যেন দৈবের নিষিদ্ধ! আর দশজন যাহারা আমাদেরই মতো দৈবের অধীন, তাহারা দৈবশক্তি লাভ করে আর দৈববলে বলী হয়, দৈবের উপর আস্থা রাখিয়া সংগ্রাম করে, কেবল আমরাই এমন দুর্দৈবের দাস যে দৈবের চাপে আড়ষ্ট হইয়া একবার মাথা তুলিয়াও দেখিতে জানি না?

ইহার চাইতে মানুষ যদি চার্বাকের মতো বেপরোয়া নাস্তিক হইয়া বলিত, "যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ," জীবনের মাশুল যোলো আনা আদায় করিয়া লও, জীবনের পক্ষে তাহাও আশার কারণ হইত, অন্তত বোঝা যাইত যে প্রাণের আশা এখনো সে ছাড়ে নাই।

ফ্রি উইল ও ডেস্টিনীর দ্বন্দ্ব-সমস্যা সকল দেশেই আছে এবং ছিল, কিন্তু তাহাতে আর কোথাও এমন নিষ্ফলতার বিভীষিকা ও অবসাদের সৃষ্টি হয় নাই। তাহার কারণ এই যে দৈবের

বিচার-তত্ত্বকে পাকা কথায় গাঁথিয়া সিস্টেম বা তন্ত্রে পরিণত করিয়া জীবনের ভিত্তিমূলে বসাইয়া দিবার এমন অর্গানাইজড্ ব্যূহবদ্ধ আয়োজন আর কোথাও দেখা যায় না।

যে মোহ ভাঙিবার জন্য মোহমুদ্গরের সৃষ্টি, সে মোহ মানুষের ভাঙে নাই, কিন্তু আনাড়ির হাতে মুদ্গরের প্রয়োগ এখনো মারাত্মক। শাস্ত্রের অভিপ্রায় ও ভগবান শঙ্করাচার্যের শিক্ষা, আসলে যাহাই হউক, তাহার সংস্কারগত সহজমন্ত্র এই যে, "সংসারটা কিছুই নয়।" যাহা দেখি মিথ্যা দেখি, যাহা শুনি, তাহা মিথ্যা শুনি; তুমি আমি, জগৎসংসার এই ঘটনার পর ঘটনা, সব মিথ্যা সব মায়া। সুতরাং সুখই বা কি আর দুঃখই বা কি? "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ" ইত্যাদি। আসল কথা, সংসারটাকে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেল। যে কর্মজীবন চায় সে সংসারের হাটে কোলাহল করিয়া ফিরুক, যে মানুষের সঙ্গ চায় সে সংসারের হাহাকার বহন করিয়া মরুক; তুমি এসবের শৃঙ্খল ভাঙিয়া, চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া, জগতের সুখ-দুঃখে উদাসীন হইয়া কর্মের জন্ম-জন্মান্তরবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ কর।

কথাটা বলিলেই কাজটা সহজ হয় না কারণ সংসারটাকে "মায়া" বলিয়া উড়াইতে চাহিলেই সে সরিয়া দাঁড়ায় না বরং মায়াপুরীর যমদূতগুলি ক্ষুধার আকারে ব্যাধির আকারে সংসারের নানা তাড়নার আকারে জীবনের কণ্ঠরোধ করিবার উপক্রম করে কিন্তু কুতর্কের কণ্ঠরোধ করিবে কে?

তাহার উপর আবার কর্মবাদের জগদ্দলপাষাণভার। শাস্ত্রবচনের যথার্থ মীমাংসা শুনিবার উৎসাহ মানুষের নাই, তাই লৌকিক স্থূল-সিদ্ধান্তকেই ঋষিবাক্যের মুখোশ পরাইয়া মানুষ শাস্ত্রানুশাসনের নামে চালাইতে চায়। এই লৌকিক সংস্কার বলে কর্মবন্ধনে হাত পা বাঁধিয়া মানুষ সংসারে আসে। পূর্বজন্মের সুকৃত দুষ্কৃতের নাগপাশ এইজন্মের জীবনযাত্রাকে বেষ্টন করিয়া থাকে। এই জন্মে এখন তুমি দুর্দশাভোগ করিতেছে তাহার মূল কারণ তোমার "পূর্বজন্মকৃতং পাপং।" পূর্বজন্মের কর্মফলবীজ তোমার মধ্যে উপ্ত রহিয়াছে, তাই ইহজন্মের জীবনবৃক্ষে তাহারই অনুরূপে ফল ফলিবে। এ জন্মে কাঁঠাল খাইবার সাধ রাখ, তবে ও-জন্মে কুষ্মাণ্ডবীজ রোপণ করিয়াছিলে কেন? এ জন্মে শূদ্র হইয়াছ অথবা অস্পৃশ্য "পঞ্চম" হইয়া জন্মিয়াছ, সে তোমার কর্মফলের দোষ। তবে আর মাথা তুলিতে চাও কেন? অযথা আর্তনাদ কর কেন? সংসারে কেউ ছোট, কেউ বড়, ইহাই তো স্বাভাবিক নিয়ম, কর্মফল অনুসারে সকলে যথাযোগ্য আসন পাইয়া থাকে। সুতরাং যে যেমন আছ তাহাতেই তৃপ্ত থাকিয়া সুবুদ্ধি মানুষের মতো আপন পথে নির্দ্বন্দ্ব থাক, তাহা হইলে সুকৃত সঞ্চয় করিয়া ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে পরজন্মে হয়তো উচ্চতর পদবী লাভ করিবে। (অবশ্য ব্রাহ্মণের আশীর্বাদটাও তোমার কর্মফল প্রসাদে।) এই ব্যাখ্যার আশ্বাসে মানুষ কি যে সান্ত্বনা পায় জানি না, কিন্তু যে বেচারা সান্ত্বনা মানে না, মানুষ তাহাকে হতভাগ্য বলে, সমাজ তাহাকে চোখ রাঙায়।

তারপর, ইহার সঙ্গে যখন প্রাকৃতজনের অচিন্তিত অদ্বৈতবাদ জুড়িয়া দেওয়া হয় তখন জীবনতরী তাহার ভরাডুবীর আয়োজন সম্পূর্ণ করে। যে অদ্বৈতবাদের শঙ্খনির্ঘোষে জাগ্রত হইয়া মানুষ আপনার মধ্যে বিশ্বপুরুষের বিরাটরূপকে প্রত্যক্ষ করে, যে অদ্বৈত বিবেক মুমূর্ষু মানুষকে আশ্বাস দেয় তুমি ক্ষুদ্র নও; তুমি সুখদুঃখের ও জন্মমৃত্যুর ক্রীড়নক মাত্র নও; তুমি স্বয়ং অমৃত, তুমি স্বরূপত সেই বিরাট, সেই—

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণঃ
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে—

সেই জীবন্ত অদ্বৈতবাদ, লৌকিক বুদ্ধির কবলে পড়িয়া যে জুজুর আকার ধারণ করে, তাহা যথার্থই মারাত্মক। এই শখের অদ্বৈতবাদ বলে, "ভেদ যখন কোথাও নাই, আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সবই

যখন একই আত্মার বহুধা প্রকাশ মাত্র, তুমি আমি বিষয় আশয় ইত্যাদির যখন কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তখন ভালোমন্দের বিচার কেন? পাপপুণ্যের ও পঙ্কচন্দনের সংস্কার কেন? কর্মের কর্তা সেই একই আত্মা; সুতরাং কে কাহার অনিষ্ট করিবে, কে কাহার সম্মান করিবে? কে কাহাকে আশ্রয় দিবে, কে কাহাকে হনন করিবে? দোষগুণের দণ্ডপুরস্কার নিরর্থক, সমাজের শাসনবন্ধন নিরর্থক, মানুষের ধর্মভয় ও দায়িত্ববোধ নিরর্থক। কাজের মালিক যখন একজন, তখন তোমার পাপপুণ্যের ভাগী তুমিও যেমন, আমিও তেমন। আমার লাভও নাই ক্ষতিও নাই, কিছু করিলেও হয়, না করিলেও হয়; দশের ভাবনা ভাবিলেও হয়, না ভাবিলেও হয়; কারণ আমার কাজে ও অকাজে আমার কোনো কৃতিত্ব নাই।"

আশ্চর্য এই যে, এক সময়ে কর্মবন্ধন কাটিবার জন্যই মানুষ জাগ্রত ও সচেষ্ট হইয়া অদ্বৈত প্রতিষ্ঠার আশ্রয় খুঁজিয়াছিল, দৈবের জন্ম-জন্মান্তর শাসন ঘুচাইবার জন্যই সংসারকে মায়ার কবল বলিয়া মনকে উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিল। অথচ কার্যকালে দেখি কেহ কাহারও বন্ধন খোলে না বরং পরস্পরে মিলিয়া পরম-বন্ধুভাবে বন্ধনকেই আঁকড়াইয়া বলে, "সংসারের চক্রে জীবনটা যেমন ভাবে ঘুরিতেছে; ঠিক তেমন ভাবেই ঘুরুক, তাহাকে ঘাঁটাইয়া কাজ নাই।" সাধারণ সংসারবুদ্ধির কাছে দৈববাদ ও কর্মবাদ, মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ মনের কোনে সুস্পষ্টচিন্তিত সিদ্ধান্ত নয়, কতগুলি নির্বিচার অন্ধসংস্কারের জুজু মাত্র। তাই আসলে তাহাদের অর্থ ও অভিপ্রায় কি, একথা ভাবিবার জন্য মানুষ কোনো তাগিদ অনুভব করে না। পরিচিত ব্যাপার সম্বন্ধে অতটা শ্রমস্বীকার অনাবশ্যক বাহুল্য বলিয়াই বোধ হয়। পরিচয়টা যে বস্তুপরিচয় নয়, শব্দের পরিচয় মাত্র, এ বোধটাও মনের কাছে স্পষ্ট হইয়া ওঠে না। মূঢ়তার প্রশ্ন আপন মনের প্রতিধ্বনি শুনিয়া বলে, ইহার নাম শাস্ত্রবাণী, ইহার নাম মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ, ইহার নাম দৈববাদ ও কর্মফলবাদ। অথচ আসলে তাহা অজ্ঞতার স্বগত উক্তিমাত্র। অজ্ঞতার কবলে পড়িয়া মায়াবাদ বলিল, "এখানে কিছু করিবার নাই," কর্মবাদ বলিল, "কিছু করিবার উপায় নাই", আর অদ্বৈতবাদ বলিল, "কিছু করিবার প্রয়োজন নাই, করিয়া কিছু লাভ নাই।" আর তিনের সুর মিলাইয়া দৈববাদ গম্ভীর পরিহাস করিয়া বলিল, "কেহ কিছু করিও না, কারণ না করাটাই বুদ্ধিমানের কর্ম।"

এইখানে কেহ-কেহ তর্ক তোলেন, যে, "ইহার মধ্যে কোনটা কার্য আর কোনটা কারণ? দৈববাদের শাসন-প্রভাবেই কি জীবনের সচেষ্ট সংগ্রাম মরিয়া যায়, না জীবনটা নিস্পৃহ নিরুদ্যম থাকে বলিয়াই সে দৈববাদের দাস হইয়া পড়ে?" বাস্তবিক এ প্রশ্নের মধ্যে কোনো দ্বৈধ নাই। মাতাল যে, মাতাল বলিয়াই সে মদের দাস হয় আর মদের দাস হইলেই সে পাকারকম মাতাল হইয়া পড়ে। মনের মধ্যে ঔদাসীন্যের অবসাদ থাকিলেই দৈববাদের প্রতিষ্ঠাভূমি পাকা হয়; আর, দৈববাদের পাকাপোক্ত প্রতিষ্ঠার উপরেই আশাহীন নির্জীবতার আসর জমে ভালো। চিন্তা ও কর্মের এই ভিশাস্ সার্কল্ অভ্যাসের দুরন্ত চক্রে জীবনকে একবার প্রবিষ্ট করিলে আর নিষ্ক্রমণের পথ থাকে না। টাকায় যেমন টাকা আনে, দুর্বল মন কেবল দুর্বলতাই ডাকিয়া আনে। জীবনীশক্তি যাহার ম্লান হয়, ব্যাধি তাহাকে আক্রমণ করে এবং ব্যাধির আক্রমণে পড়িলে জীবনীশক্তিও ক্ষীণতর হইয়া পড়ে। সুতরাং এই আগে-পরের তর্কটা খুব সমীচীন তর্ক নয়, ইহা দিবারাত্রি ও বৃক্ষবীজের পরিচিত তর্কেরই প্রত্যাভাস মাত্র। একাডেমিক ডিস্‌কাশন্ বা বৈঠকী তর্কের আসরে এ আলোচনার সমাদর ঘটিতে পারে কিন্তু বাস্তব জীবনের প্রয়োজন হিসাবে তর্কটা ফাঁকা তর্ক ছাড়া আর কিছুই নয়। রোগের চিকিৎসা করিতে বসিয়া চিকিৎসক এ ভাবনায় বিচলিত হইতে থাকেন না যে, রোগটাকে আগে মারিব না তাহার কারণগুলিকে আক্রমণ করিব; না রোগের পরিচয়-লক্ষণগুলিকে দাবাইয়া রাখিব। রোগীর ক্ষীণপ্রাণটা ও ব্যাধির প্রকোপ চিকিৎসকের কাছে একই সমস্যার দুই তরফ মাত্র।

"অদৃষ্ট" কথাটার একটা ইতিহাস আছে। কার্য-কারণের কতকটা শৃঙ্খল বেশ দেখা যায়, বোঝা যায়, তাহা দৃষ্ট; আর যাহা স্পষ্ট দেখা যায় না, যাহার হিসাব পাওয়া যায় না, তাহা অদৃষ্ট। সহজ তথ্যের এই সহজ সংস্কৃত পরিভাষা। ইহার সঙ্গে কোনো বাদ-পরিবাদের বা বিভীষিকার সম্পর্কমাত্র নাই। অথচ এই যুগে অদৃষ্ট বলিতেই এমন আতঙ্ককে বুঝি যাহা জীবনের ঘাড়ে ভূতের মতো চাপিয়া থাকে। সে আমাদের মাথার উপর একটা জাগ্রত উভয়সঙ্কটরূপে সর্বদাই উদ্যত হইয়া আছে। দৈবের আজন্ম চাপে জীবনটাই অবসন্ন, কর্মবন্ধন কাটি কিরূপে? আর, কর্মবন্ধনে হাত পা বাঁধা, দৈবের বোঝা নামাই কিরূপে? এই প্যারাডক্স্-এর সৃষ্টি করিয়া কথার চরকী ঘুরাইয়া মানুষ বেশ আশ্চর্য রকম পরিতৃপ্ত থাকে।

এই বর্তমান যুগে দৈববাদের এক নূতন আশ্রয় জুটিয়াছে, তাহার নাম বিজ্ঞান। বিজ্ঞান তাহার বিষয়রাজ্যে যে নিয়মের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পায়, সে নিয়মকে পুরাপুরি একতরফা স্বীকার করিলে, বাস্তবিক একটা দৈবতত্ত্বকেই স্বীকার করা হয়। এই বৈজ্ঞানিক অদৃষ্টবাদ কার্যকারণের সকল সম্বন্ধকে অঙ্কের হিসাবে মিলাইয়া দেখায় যে, প্রত্যেক কার্য, প্রকারে ও পরিমাণে, উপযুক্ত কারণ হইতে প্রসূত। প্রত্যেক কারণ নির্দিষ্ট পরিমাণ ও নির্দিষ্ট প্রকারের কার্যফল প্রসব করে। প্রত্যেক নির্দিষ্ট 'কজ্' হইতে নির্দিষ্ট 'এফেক্ট্' উৎপন্ন হয়, কোথাও তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। এই মুহূর্তে জড়জগতের যেখানে যাহা ঘটিতেছে তাহা পূর্বমুহূর্তে অকাট্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। পূর্বমুহূর্তের কারণসমষ্টি, যাহা এই মুহূর্তের কারণসমষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহাও তৎপূর্ব সময় হইতেই অলঙ্ঘ্যরূপে নির্দিষ্ট ছিল। এইরূপে এই শৃঙ্খলপরম্পরায় সুদূরতম অতীত হইতেই সুদূরতম ভবিষ্যৎ পর্যন্ত এক অমোঘ শাসনে আবদ্ধ রহিয়াছে, কোথাও চুলপ্রমাণ ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। প্রত্যেক জড়কণার প্রত্যেক পরমাণু কখন, কোন পথে, কেমন ভাবে চলিবে, শাশ্বতকাল হইতে তাহা অকাট্য সঙ্কেতে নির্দিষ্ট রহিয়াছে, কোথাও তাহার বিচ্যুতির সম্ভাবনা নাই। বিশ্বসংসারে এই মুহূর্তে যাহা কিছু যেমন ভাবে আছে তাহার পরিপূর্ণ হিসাব যদি পাওয়া যাইত, তবে অতীত ও ভবিষ্যতের সমগ্র ইতিহাসকে অভ্রান্তভাবে তাহারই মধ্যে নিহিত দেখিতাম। দৈববাদ ইহার অতিরিক্ত আর কি বলিবে? অবশ্য বাহিরের জড় ব্যাপার লইয়াই বিজ্ঞানের কারবার। বাহিরের দৃষ্টি অবজেক্টিভ্ ভিশন্ তাহার বিচারের সম্বল। কিন্তু এই বাহিরের দৃষ্টিকে সে জীবনের অন্তররাজ্যেও প্রয়োগ করিতে চায়, জীবনের মধ্যেও তাহার নিয়মচক্রের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পায়। সে পূর্বজন্মের কর্মপ্রভাবকে দেখে না কিন্তু পূর্বপুরুষের সঞ্চিত গ্লানি ও প্রসাদকে দেখে, ইহজন্মের প্রত্যক্ষ আবেষ্টনকে দেখে। জীবনকে সে হেরিডিটি এনভায়রনমেনট্-এর সাক্ষাৎ ফলসমষ্টিরূপে বিচার করে। ইহা বিজ্ঞানের তত্ত্বের দিক, তাহার এক তরফের বাণী। ইহারই সাধন পর্যায়ে দেখি বিজ্ঞানপ্রাণ জাতিমাত্রেরই জাগ্রত পুরুষকার-আবেষ্টনকে অতিক্রম করিবার জন্য মানুষের দুরন্ত সংগ্রাম, শিক্ষা ও সাধনা দ্বারা বাহিরের বিরুদ্ধশক্তিকে জয় করিবার অদম্য উৎসাহ। সুতরাং দৈবকে চূড়ান্তরূপে স্বীকার করিয়াও বিজ্ঞান আপনার সাধন বলে তাহার বিষদাঁত ভাঙিয়া রাখে।

বিজ্ঞানের জুজু যখন টিকিতত্ত্ব ও গঙ্গাজল-মাহাত্ম্যের সমর্থনেও অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তখন দৈববাদ যে বিজ্ঞানের দোহাই দিবে, সেটা কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু বিজ্ঞানের যথার্থ দরদ যেখানে আছে, সাক্ষাৎ জ্ঞানস্পৃহা যেখানে জাগ্রত, জীবন ও সংসার যেখানে কেবল মায়ার পরিহাস নয়, জীবন্ত প্রাণের উত্তাপ সেখানে দৈববাদের বীজকে ভর্জিত করিয়া ফেলে। জীবনের ভূমিতে উপ্ত হইয়া সে বীজ আর তাহার ডালপালা বিস্তার করিতে পারে না, অন্ধতত্ত্বের জটিলজালে জীবনকে অভিভূত করিতে পারে না।

জীবনের যেকোনো দ্বন্দ্ব জীবনের মধ্যেই আপনার সর্বোত্তম সমাধান লাভ করিয়া থাকে।

কারণ, জীবনের একটা স্বতন্ত্র "লজিক" আছে, তাহা তত্ত্বের লজিককে চিরকালই অতিক্রম করিয়া চলে। দৈবের যে তত্ত্বরূপ তাহা ছাড়াও তাহার একটা পরিচিত জীবন্তরূপ আছে, সেই রূপটিকে অহরহ আমাদের চোখের সম্মুখেই দেখি এবং তাহার মধ্যে সকল দ্বন্দ্বের সহজ সমাধান পাই। দৈবের দ্বারাই যে দৈবের খণ্ডন হয়, কর্মের দ্বারাই যে কর্ম-বন্ধনের ছেদন হয় ইহা কেবল শাস্ত্রের বচন নয়, ইহা প্রত্যক্ষ জীবনেরও সাক্ষ্য।

রোগের বীজই রোগের প্রতিষেধক জুটাইয়া দেয়। জীবন্ত দেহের ব্যবস্থা এমন বিচিত্র যে রোগের বিষ শরীরে প্রবেশ করিবামাত্র প্রাণশক্তি তাহার প্রতিষেধক (এ্যান্টিটক্সিন) সৃজন করিতে থাকে। এই ব্যাপারকে চিকিৎসার কাজে লাগাইয়া মানুষ রোগের কাছ হইতেই তাহার সাক্ষাৎ ঔষধ আদায় করিয়া লয়। ঠিক সেইরূপ, তত্ত্বের বাদপ্রতিবাদ ভুলিয়া প্রত্যক্ষ জীবনের দিকে চাহিয়া দেখি, দৈবই দৈবের খণ্ডনসংকেত স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দেয়। তত্ত্বের বিচার যখন জীবনের মধ্যে পুরুষকারের কোনো স্থান দেখে না, কোনো অর্থ খুঁজিয়া পায় না, জীবনের জাগ্রত পুরুষকার তখনো সংসারের তুচ্ছতম সাধনের মধ্যে আপনাকে পরিপূর্ণ সত্যরূপে অনুভব করিতে থাকে। "বাঘ আসিতেছে" শুনিলে অতি-বড় দৈববিৎ পণ্ডিতও পলায়নরূপ ব্যাকুল চেষ্টায় পৌরুষকর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

শাস্ত্রে বলে দৈব আছেন, তত্ত্ব বলে দৈব আছেন, বিজ্ঞান বলে দৈব আছেন, আর সহজ বুদ্ধিও সায় দিয়া বলিল যে "দৈব আছেন।" সমস্তই মানিলাম কিন্তু আমার অনুভূতিকে, আমার আমিত্বকে, আমার জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণাকে আশ্রয় করিয়া যে পুরুষকার আছেন, একথাটা অস্বীকার করি কিসের জোরে? অদৃষ্টের ভাবনা ভাবিতে গিয়া খামখা আমার প্রত্যক্ষ পুরুষকারকে খোয়াইয়া বসি কেন? দৈবও মানিব, পুরুষকারও মানিব—স্থূল বিচার বলে, এ কেমন স্ববিরুদ্ধ কথা! কিন্তু দৈবও আছেন পুরুষকারও আছেন এই তো জীবনের সহজ সাক্ষ্য। বিচার করিয়া দেখিলাম আমি কিছু করি না, আমি কিছু করিতে পারি না, সব করে দৈবে; অথচ জীবনে এই আবার প্রত্যক্ষ দেখি, এই আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা, এই আমার শক্তি ও সংগ্রাম। এই আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া আমার শক্তি ক্ষয় করিয়া বক্তৃতা লিখিলাম, এই এখন মনের শক্তি প্রয়োগ করিয়া সেই বক্তৃতা পাঠ করিতেছে, ইহার সফলতার সুখ আমার, ইহার ব্যর্থতার দুঃখ আমার। যে শক্তি আমাকে ভাবাইয়া আমার দ্বারা কবিতা লিখাইল তাহাকে যে-নামই দেই না কেন যে বস্তুটা "আমি, আমি" বলিতেছে তাহাকে কোন বুদ্ধিতে বলি যে, "তুমি কোথাকার কে? ইহার মধ্যে তুমি কেউ নও?"

তবে কি বলিব যে খানিকটা দৈবে করায়, আর খানিকটা পুরুষকার? জীবনের খানিকটা পৌরুষসিদ্ধ বা সাধনসিদ্ধ আর খানিকটা দৈবসিদ্ধ বা কৃপাসিদ্ধ? তাহাতেই বা সমস্যা মিটিল কই? জড় ও চেতন সমগ্র জগৎ যদি একই অখণ্ড নিয়মসূত্রে গ্রথিত হয়, তবে পুরুষকারকে তাহার শাসন হইতে বিচ্ছিন্ন করি কিরূপে? আর, নিয়মচক্রের অন্ধ নিষ্পেষণ যদি এড়াইতে না পারিলাম, তবে পুরুষকারের সার্থকতা কোথায়? অলঙ্ঘ্য দৈবই যদি সর্বস্ব হয়, তবে জীবনে-জীবনে পুরুষকারের এই অভিনয় কেন? পুরুষকারকে জাগ্রত করিয়া আবার তাহার কর্তৃত্ব লোপ করা হয় কেন?

তত্ত্বের আসন ছাড়িয়া প্রশ্ন যখন জীবনের ক্ষেত্রে জাগ্রত হয়, জীবন যখন আপনার মধ্যে উত্তরের অন্বেষণ করিয়া দেখে, তখনই দেখে দৈবের আত্মসম্বৃত সম্মোহন মূর্তি। আর সে বাহিরের নিষ্ঠুর শক্তিমাত্র নয়, অন্ধশক্তির নির্মম পরিহাস নয়। জীবনে-জীবনে পুরুষকাররূপে, হৃদয়ে-হৃদয়ে অমোঘ প্রেরণারূপে, কালে-কালে জাগ্রতমঙ্গলরূপে, দেশে-দেশে প্রবুদ্ধ আত্মবিশ্বাসরূপে সেই একই

দৈবই আবির্ভূত। কোথাও দ্বন্দ্ব নাই, কোথাও বিরোধ নাই, ভিতরে বাহিরে একশক্তির জীবন্তলীলা প্রতি জীবনের বৈচিত্র্যের মধ্যে আপনার বিরাটরূপকে আপনি প্রকাশ করিতেছে। প্রতি-জীবনের বিচিত্র অনুভূতির মধ্যে আপনাকে আপনি সন্ধান করিতেছে, বিশ্বশক্তিকে আত্মশক্তিরূপে প্রত্যক্ষ করিতেছে।

যেকোনো দিক দিয়াই জীবনের পথকে উন্মুক্ত করি না কেন, জ্ঞানের অন্বেষণই হউক কি প্রেমের চরিতার্থতাই হউক জীবনের জাগ্রতবুদ্ধি যেখানে আপনার জীবন্ত প্রবাহকে স্পর্শ করে, সকল দ্বন্দ্বের সকল সন্দেহের মোহরূপ সেখানেই খসিয়া যায়। স্বভাবশঙ্কিত দুর্বল মন দৈবের স্পষ্টরূপকে না দেখিয়াই আপস করিতে চায়;জীবনকে বিশ্বজীবনের মধ্যে, আত্মশক্তিকে বিশ্বশক্তির মধ্যে বৃহত্তররূপে দর্শন করে না। পুরুষকারকে সে অবতীর্ণ দৈবশক্তিরূপে জানে না তাই দৈব সেই বাহিরের নিষ্ঠুর বিভীষিকাই থাকিয়া যায়। দৈব তাহার জীবনের সুখ-দুঃখ সংগ্রাম আর বহন করিতে চায় না, কেবল দুঃস্বপ্নের মতো নিদ্রিত জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে মাত্র। মিথ্যা ভয়ের মোহকল্পনা বিস্তার করিয়া মানুষ বলে, "আমার স্বাধীন বুদ্ধিকে দৈবশক্তির প্রকাশ বলিলে, আমার কর্তৃত্ববোধ থাকে কোথায়?" আমার দায়িত্বজ্ঞান টিকিবে কিরূপে? অতটা স্বীকার করিলে মানুষ যে নিরঙ্কুশ বেপরোয়া হইয়া পাপ-পুণ্যের বিচার ছাড়িয়া দিবে, বিধাতার উপর আপনার দুষ্কৃতভার চাপাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে!"

এই তো তত্ত্বতন্ত্রের জুজু! এই বিশ্বজীবন যদি এমন নিয়মেই গঠিত হয় যে সত্যকে সত্যরূপে দেখিতে গেলে মানুষের পৌরুষবুদ্ধিকে খোয়াইতে হয়, তবে সে সত্যবঞ্চিত অক্ষম পৌরুষ আমার কোন কর্মে লাগিবে? আর কোন পৌরুষকে আশ্রয় করিয়া মানুষ সত্যের অনশ্বর শাস্ত্রকে বিলুপ্ত করিবে? দৈবকে ফাঁকি দিয়া এড়াইবার কল্পনা পুরুষকারের গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিবারই চেষ্টা মাত্র। দৈবের বিশ্ববিস্তৃত শাসনতন্ত্র জীবনের ভিতরে-বাহিরে জাগ্রত রহিয়াছে, সে আমার অনুমতির অপেক্ষা রাখে নাই। দৈব যদি সহায় না থাকে, তবে দৈবের কবল হইতে কে মানুষকে উদ্ধার করিবে? পুরুষকারকে যখন আশ্রয় করিতে যাই, তখন দৈবের উপরেই আস্থা রাখি, নতুবা পুরুষকার দাঁড়ায় কোথায়? দৈব আমার অদৃষ্ট কল্যাণ, দৈব আমার পুরুষকার, দৈব আমার সাধন-বল, দৈব আমার কৃপাসম্বল। দৈবকে যখন পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারি না তখন পুরুষকারকেও বিশ্বাস করিতে জানি না। মিথ্যাসংস্কার ও অন্ধ অভ্যাসের মোহ ভাঙিয়া দেখি, দৈবের শাসন কি অপূর্ব বিধান। বাহিরের প্রাকৃতিক নিয়মশৃঙ্খলরূপে যে দৈব, সমাজের বিধিবিধানরূপে সেই দৈব, জীবনের সম্পর্কবন্ধনরূপে সেই দৈব। দেশের যুগসঞ্চিত কলঙ্কভার ও অবসাদের মধ্যে যে দৈব, সুপ্তোত্থিত জাতির জীবনপিপাসার মধ্যে সেই দৈব। পরমাণুর তাণ্ডবের মধ্যে সংহত শক্তিরূপে যে দৈব, জীবনের উদ্দাম চাঞ্চল্যের মধ্যে প্রশান্ত সংযমরূপে সেই দৈব। যে দৈব হতভাগ্যের সহস্রকণ্ঠে বলাইতে থাকে, "মানুষের কোনো কর্তৃত্ব নাই, আত্মার কোনো স্বাধীনতা নাই," সেই দৈবই ক্ষুধার তাড়নায়, দারিদ্র্যের তাড়নায়, দয়ার তাড়নায়, প্রেমের তাড়নায় মানুষের পুরুষকারকে ও দায়িত্ববোধকে অজস্রভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া রাখে।

মিথ্যাদৈবের অন্ধসংস্কারে মানুষ ডুবিয়া আছে, আগে তাহার মোহসংস্কার ভাঙিয়া দেখ, আগে জীবনকে এই অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার কর, তারপর জিজ্ঞাসা করিও, কে তাহার আচ্ছন্ন জীবনকে বন্ধন-বিমুক্ত করিবে, বিকৃত দৈবের কবল হইতে কে মানুষের পুরুষকারকে জাগাইয়া তুলিবে?

দৈবের অভয়মূর্তি যে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, দৈব যাহার মধ্যে আত্মশক্তির সার্থক বিরাট-রূপে অনুভূত হইয়াছে, দৈবের জীবন্ত প্রেরণা যাহার পুরুষকারকে জাগ্রতরূপে আশ্রয় করিয়াছে, তাহারই অন্তর্নিহিত দৈবশক্তি মুক্তির মোহনমন্ত্রে তাহার কণ্ঠের বাণী হইতে, তাহার সেবার অক্লান্তি হইতে, তাহার জীবনের পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য হইতে, মুক্তপবনরূপে অবতীর্ণ হইবে। যুগে-যুগে দৈবের আহ্বান

বহন করিয়া দৈবের প্রতিনিধি সেইসব মানুষ আসিয়াছে, সেইসব মানুষ আসিতেছে, আরো আসিবে, যাহারা দৈবকেই পুরুষকারের সাক্ষী করিয়া, দ্বিধাহীন পরিপূর্ণ সাহসের অভয় বাণী শুনাইয়া বলিবে, "দৈবেন দেয়ম্।"

উপেন্দ্রকিশোর রায়

তাঁহার পিতামহ সাধক ও সুপণ্ডিত লোকনাথ রায় অল্প বয়সেই সংসারাসক্তির বন্ধনমুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি একবারমাত্র সকলের অনুরোধে চাকরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনো জমিদার তাঁহাকে উৎকোচ গ্রহণে প্রলুব্ধ করায় তিনি অচিরেই সেই কর্ম ত্যাগ করেন। এরূপ একাগ্রভাবে তিনি তন্ত্রোক্ত শক্তি সাধনায় নিবিষ্ট হ'ন যে তাঁহার পিতা, পুত্রের সংসার ত্যাগের আশঙ্কায়, ডামরগ্রন্থ নরকপাল মহাশঙ্খমালা প্রভৃতি সাধনের উপকরণাদি ব্রহ্মপুত্রে বিসর্জন করেন। এ শোকে লোকনাথ তিনদিনের মধ্যে দেহত্যাগ করেন। তখন তাঁহার বয়স ৩২ বৎসর মাত্র।

লোকনাথের পুত্র উদার তেজস্বী স্বাধীন-চেতা কালীনাথ রায় লোকসমাজে মুন্সী শ্যামসুন্দর নামেই প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সংস্কৃত ও পার্শীভাষায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। প্রাত্যহিক দেবার্চনাদিতে তিনি স্বরচিত স্তোত্রাদি ব্যবহার করিতেন। তাঁহার কাব্যকুশলতার যে-সকল পরিচয় তিনি রাখিয়া গিয়াছিলেন, দৈবদুর্বিপাকে তাহার সমস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কায়স্থ হইয়াও তিনি পাণ্ডিত্যগুণে ব্রাহ্মণের বিচার-সভায় মধ্যস্থের আসন লাভ করিতেন। কথিত আছে, তিনি বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলে শূদ্রের অনধিকারচর্চায় ব্রাহ্মণসমাজ সন্ত্রস্ত হইয়া তাঁহাকে নিষেধ জানাইবার জন্য এক প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। সেই প্রতিনিধি অপদস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিলে আন্দোলনকারীগণ তাহাতেই নিরুৎসাহ হন।

একবার বিধবা বিবাহসম্পর্কে-জাতিচ্যুত কোন দরিদ্রের গৃহে তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও সমাজহিতৈষীগণ কর্তৃক নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি সমাজের বাধা নিষেধ ও শাসন অনুশাসনাদি উপেক্ষা করিয়া নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। বলা বাহুল্য "মুন্সী শ্যামসুন্দর"-কে জাতিচ্যুত করিতে কাহারও সাহসে কুলায় নাই।

শ্যামসুন্দরের প্রথম পুত্র স্বনামখ্যাত সারদারঞ্জন রায় বর্তমানে মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ। দ্বিতীয় পুত্র কামদারঞ্জন পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার খুল্লতাত ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ উকিল ও জমিদার স্বধর্মনিরত আচারনিষ্ঠ হরিকিশোর রায়চৌধুরী কর্তৃক দত্তক পুত্ররূপে গৃহীত হন। তদবধি তিনি উপেন্দ্রকিশোর নামেই পরিচিত।

বালক উপেন্দ্রকিশোর ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে ভর্তি হইয়া প্রতিদিন সুসজ্জিত সমারোহে গাড়ীতে চড়িয়া স্কুলে যাইতেন—কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত তাঁহার বয়স্ক সঙ্গীগণ দেখিতেন যে ক্ষুব্ধ মনের অভিমান সর্বদাই তাঁহার মুখশ্রীতে বিষাদ-রেখায় অংকিত থাকিত। তারপর, ক্রমে তিনি স্কুলের উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন; নানা বন্ধুসংসর্গে, খেলাধূলার উৎসাহে, বাঁশী বাজাইয়া ও ছবি আঁকিয়া তাঁহার মুকুল জীবন নব নব আনন্দে বিকশিত হইতে লাগিল। ক্রমে কোন্ অলক্ষ্য সূত্রাবলম্বনে শিল্প ও সংগীতের আকর্ষণ তাঁহার হৃদয়কে অঙ্গে অঙ্গে একেবারে অধিকার করিয়া বসিল।

অতি অল্প বয়সেই কেবল নিজের আগ্রহে বিনাশিক্ষা ও বিনাসাহায্যে, তিনি শিল্পসাধনায়

কৃতিত্বলাভ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন। একবার সার এস্‌লি ইডেন স্কুল পরিদর্শনকালে তাঁহার খাতায় দৈবাৎ আপনার প্রতিকৃতি দেখিয়া তরুণ শিল্পীকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়া বলেন, "তুমি ইহারই চর্চায় আপনাকে নিযুক্ত রাখিও।"

শিক্ষকগণ বলিতেন, উপেন্দ্রকিশোর প্রতিদিন ক্লাসে অত্যুচ্চ স্থান লাভ করেন, তিনি অনন্যসাধারণ মেধা ও প্রতিভার অধিকারী, কিন্তু জ্ঞানলিপ্সা সত্ত্বেও স্কুলপাঠ্য বিষয়ে তাঁহার মন নাই। রাত্রে তিনি আদৌ পড়েন না, জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "শরৎকাকা পাশের ঘরে পাঠাভ্যাস করেন, তাহাতেই আমার পড়া হয়। দুইজনে পড়িতে গেলে অনর্থক গণ্ডগোল বাড়ে।" ইহার মধ্যে একদিন তিনি বাসায় আসিয়াই বলিলেন, "গুপীদা, এখনই আমার জন্য একটা বেহালা কিনিয়া আন। একটা গৎ শুনিয়াছি, দেরি করিলে ভুলিয়া যাইব।" সেই উৎসাহে সেই দিনই বেহালা বাদনের সূত্রপাত হইল।

সহৃদয় ছাত্রবৎসল শরৎচন্দ্র রায় তখন ময়মনসিংহের একজন উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁহার স্নেহদৃষ্টি এই প্রতিভাবান বালকের উপর পড়িল। তিনি বলিলেন, "এই উপেন্দ্রকিশোর কালে একজন মানুষের মত মানুষ হইবে। শিল্প ও সংগীতের ঝোঁক তাহার যতই প্রবল হউক, সে পরীক্ষায় কৃতিত্ব লাভ করিবেই। পিতা হরিকিশোর রায় হিন্দুসমাজের নেতা হউন, হিন্দুধর্মজ্ঞানপ্রদায়িণী সভার সভাপতি হউন, উপেন্দ্রকিশোরকে ব্রাহ্মসমাজে আনিতেই হইবে।"

তখন ব্রাহ্মভীতির যুগ। ব্রাহ্মসমাজ কখন কাহার সন্তানকে গ্রাস করিয়া বসেন, এই আশঙ্কায় বঙ্গের অভিভাবকগণ সন্ত্রস্ত। শরৎচন্দ্র নামজাদা ব্রাহ্ম—হিন্দুসন্তান মাত্রেই তাঁহার সংসর্গবর্জনে বিশেষভাবে উপদিষ্ট—তাঁহার সংকল্পকে কার্যে পরিণত করিবার সুযোগ ও সম্ভাবনা কোথায়? তিনি ব্রাহ্ম ছাত্রগণকে এবং বিশেষভাবে উপেন্দ্রকিশোরের সহাধ্যায়ী সুহৃদ্ ও আত্মীয় গগনচন্দ্র হোমকে উৎসাহ দিয়া এই কার্যে ব্রতী করিলেন। তাঁহাদের সংস্পর্শে বালকের মনে ব্রাহ্মসমাজের বিষয়ে যে জিজ্ঞাসার উদ্রেক হইল তাহা সন্ত্রস্ত অভিভাবকগণের শত বাধা নিষেধ শাসন নির্যাতন সত্ত্বেও ক্রমে ঐকান্তিক আগ্রহ ও ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইতে চলিল।

এদিকে প্রবেশিকা পরীক্ষা আসন্নপ্রায়। শরৎবাবু ব্যাকুল হইয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক রত্নমণি গুপ্তের শরণাপন্ন হইলেন—কই, তাঁহার প্রিয় ছাত্র যে এখনও বেহালা ও তুলিকার মোহ ত্যাগ করিল না; এখনও যে সে পড়ায় মন দিল না! শিক্ষক মহাশয় ছাত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার উপর আমরা অনেক আশা রাখিয়াছি; দেখিও, তুমি যেন আমাদের নিরাশ করিও না।" অনুতপ্ত বালক সেই দিনই গৃহে আসিয়া আপনার সাধের বেহালাটি ভাঙিয়া ফেলিলেন। যথাসময়ে পরীক্ষান্তে ১৫্ টাকা বৃত্তি পাইয়া তিনি মহা সমারোহে "ব্রাহ্ম দোকানে" এক ভোজ দিলেন।

কলকাতায় আসিয়া তিনি প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মদলে মিশিয়া ব্রাহ্ম ছাত্রাবাসে বাস করিয়া এবং ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিয়া বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট আত্মীয়স্বজনকে আরও শঙ্কিত করিয়া তুলিলেন।

১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে, তাঁহার সতের বৎসর বয়সে তিনি যে ডায়েরি রাখিতেন তাহাতে তাঁহার সেই সময়কার জীবন সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। তাহাতে দেখা যায় অনেক সময় সংগীতচর্চায় ও চিত্রানুশীলনে তাঁহার অবসর সময় এবং অনবসর কালও কাটিয়া যাইত। নানা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র লইয়া নানা শ্রেণীর শিক্ষার্থী তাঁহার পরামর্শ ও সাহায্য লইতে আসিত। যন্ত্রের জীর্ণসংস্কার আবশ্যক হইলে লোকে তাঁহার শরণাপন্ন হইত।

সেই সময় হইতেই শিশুপাঠ্য গ্রন্থাদি রচনার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে জাগ্রত হইয়াছিল; শিশুদিগের জন্য একখানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রণয়নের পূর্বাভাষ তাঁহার ডায়েরির মধ্যে স্পষ্টই দেখা যায়। আর দেখা যায়, তাঁহার অদম্য জ্ঞানস্পৃহা। কলাবিদ্যার অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার

বিজ্ঞানমুখী প্রতিভা তাঁহাকে নানা সুযোগে নানা বিজ্ঞানের চর্চায় নিযুক্ত রাখিত। এই জ্ঞানানুরাগ উত্তরকালে তাঁহাকে বিশেষভাবে নানাক্ষেত্রে সাফল্য লাভে সক্ষম করিয়াছিল।

বিশ বৎসর বয়সে, তাঁহার পিতা হরিকিশোর রায়ের লোকান্তর প্রাপ্তিতে তাঁহার জীবনে এক বিষম পরীক্ষাসঙ্কট উপস্থিত হইল। নিষ্ঠাবান ও প্রতিষ্ঠাবান হিন্দুসমাজ নেতার শ্রাদ্ধে যত প্রকার সমারোহ দান দক্ষিণাদির ব্যবস্থা হওয়া স্বাভাবিক তাহার আয়োজন হইয়াছে, নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সমাগম আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময় স্বাধীনচেতা অকুতোভয় যুবক উপেন্দ্রকিশোর বলিয়া বসিলেন, "আমি প্রচলিত দেশাচার মতে পিতৃশ্রাদ্ধ করিব না।" ক্ষুব্ধ রুষ্ট আত্মীয়স্বজন ঘোর বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন, সমাজ তাঁহার নিন্দাবাদে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল, কিন্তু সেই একনিষ্ঠ আত্মস্থ মহাপুরুষ সকল নির্যাতন ও ভ্রূকুটি-ভঙ্গিকে উপেক্ষা করিয়া ঘোর অশান্তির মধ্যে অবিচলিত প্রশান্তভাবে আপন বিশ্বাসনির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করিয়া স্বপক্ষ বিপক্ষ সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিলেন এবং সামাজিক উৎপীড়নের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পূর্ণ মাত্রায় ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলেন।

ইহার অনতিকাল পরেই দেশবিশ্রুত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ সংকল্পের সংবাদ দেশে গিয়া পৌঁছিল। এরূপ অশ্রুতপূর্ব অনাচার হইতে তাঁহাকে বিরত করিবার জন্য সমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। কিন্তু প্রতিবাদের তপ্ত নিঃশ্বাস কোন দিনই তাঁহার চিত্তের অটল স্থৈর্যকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। কোনরূপ বাদবিতণ্ডায় প্রবৃত্ত না হইয়াও তাঁহার চিরপ্রসন্ন স্বভাবের অনিন্দ্যসুন্দর মাধুর্যে তিনি এমন অক্লেশে বিরুদ্ধাচারীর হৃদয়ে আসন লাভ করিলেন যে, প্রতিবাদের কোলাহল আপনা হইতেই সসম্ভ্রমে থামিয়া গেল। এই সময় হইতেই, অথবা ইহার পূর্বেই, তিনি শিশু-সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হ'ন। যে সময়ে মানুষ অসম্ভব রকমের উচ্চকথার আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিয়া শিশুদের অস্তিত্ব পর্যন্ত একরূপ ভুলিতে বসিয়াছিলেন, সেই সময়ে প্রমদাচরণ সেন প্রভৃতির সহযোগে তিনি শিশুসাহিত্যে যুগান্তর আনয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শিশুচিত্ত বিনোদনের এই ঐকান্তিক আগ্রহের উৎসকে যখন অন্বেষণ করি, তখন দেখি যে শিশুজীবনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, তাহার সহিত আনন্দের আদানপ্রদানে তাঁহার হৃদয়ের প্রেম যে কি অপূর্ব স্নিগ্ধতায় উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিত, এমন ভাষা পাই না যাহাতে তাহার সম্যক বর্ণনা দিতে পারি। শিশুর শিশুত্বের মধ্যে তিনি অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাহার আনন্দযজ্ঞে আপনাকে এমন যথার্থভাবে বিলাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন।

তাঁহার প্রথম শিশুপাঠ্য গ্রন্থ "ছেলেদের রামায়ণ" মুদ্রণকালে তাঁহার স্বহস্তাংকিত চিত্রগুলি উড্‌এন্‌গ্রেভারের হস্তে যেরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হয়, তাহারই ফলে এদেশে বিজ্ঞানসম্মত চিত্রশিল্পের প্রবর্তনের জন্য তিনি উৎসুক হইয়া পড়েন। লঘুভাবে কোন কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল,—যখন যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন তাহারই সাধনায় একেবারে নিমগ্ন থাকিতেন। এক্ষেত্রেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। এই বিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য তিনি শক্তি অর্থ স্বাস্থ্য ও সময় অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন এবং গুরুতর মানসিক শ্রমের ফলে অকালে আয়ুক্ষয়কর রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। "হাফটোন" শিল্প তখন সবেমাত্র প্রতিপত্তি লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে—তখনও তাহার মূলসূত্রাদি সুনির্দিষ্ট হয় নাই; মতসঙ্কুল অস্থিরতার মধ্যে তাহার কার্যপ্রণালীর সংকেতাদি তখনও সুসঙ্গতরূপে নির্ণীত হয় নাই। তিনি স্বাধীনভাবে এই—সকল প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া তাহার যে প্রকার সমাধান করেন, তাহাই বর্তমানে সর্ববাদীসম্মতরূপে গৃহীত হইয়াছে। হাফটোনের যে-সকল প্রণালী পাশ্চাত্য দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে তাহাতে বহুল পরিমাণে তাঁহার নির্দিষ্ট পন্থাই অনুসৃত হইয়াছে। এক্ষেত্রে তিনি কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার কৃতিত্ব নানা দেশে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে।

আজ বলিতে ইচ্ছা হয়, যাঁহারা উপেন্দ্রকিশোর রায় বলিতে কেবল কৃতী শিল্পীকেই দেখিলেন, সাহিত্য-কলাকুশল সঙ্গীত-রসজ্ঞকে দেখিলেন, তাঁহারা জানেন না কোন্ মনস্বী আত্মা আপনাকে এই-সকল পরিচয়ের অন্তরালে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা জানেন না, যে, সেই কীর্তিমান পুরুষ যতই কীর্তি লাভ করিয়া থাকুন না কেন, কিছুতেই তাঁহার নিরহঙ্কার বিনয়নম্রতাকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হয় নাই।

সংসারে স্বার্থব্যবসায়ী প্রবঞ্চক তিনি কম দেখেন নাই, নিজে ব্যবসায় সম্পর্কে ও সংসারের নানা ক্ষেত্রে শতবার প্রতারিত হইয়াছেন—কিন্তু তবু মানুষের উপর তাঁহার কি গভীর বিশ্বাস! মানুষের স্বভাবসিদ্ধ মনুষ্যত্বের প্রতি কি আশ্চর্য শ্রদ্ধা! অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সাংসারিক ক্ষতি অকুণ্ঠিত চিত্তে বহন করিয়াছেন, কিন্তু একদিনের জন্যও অকারণ সন্দেহকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া মনের প্রসন্নতা নষ্ট করিতে সম্মত হয়েন নাই।

তাঁহার অন্তরের সংস্পর্শে যে আসে নাই, সে জানে না তাঁহার জীবনের প্রত্যেক সাধনার মধ্যে তিনি কি আনন্দরস সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। যখন যাহাতে হাত দিতেন তদার্পিতপ্রাণ হইয়া তাহাতেই ডুবিয়া যাইতেন। শিশুদের জন্য লিখিতে বসিয়াছেন, চিত্ররচনার জন্য হস্তে তুলিকা লইয়াছেন—মনে হইত সংসারে তাঁহার অন্য কোনো চিন্তা নাই, ক্ষোভ নাই, দুঃখ নাই; উপস্থিত কর্তব্যের আনন্দে তিনি আর-সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। রোগযন্ত্রণা ও সাংসারিক সকল দুর্ভাবনার মধ্যে যেমন বেহালাখানি হাতে লইয়াছেন—অমনি তন্ময়! আর কোথায় দুঃখ, কোথায় বিপদ—মনে হয় এমন শান্তি এমন সান্ত্বনা বুঝি আর কিছুতে মিলে না। সত্যকে যিনি পরিপূর্ণ আনন্দরূপে দেখিতে পান, কর্তব্য তাঁহার কাছে শুষ্ক কর্তব্যমাত্র থাকিতে পারে না—মনে হয় জীবনের সামান্যতম কর্তব্যের মধ্যেও তিনি আনন্দরস লাভে বঞ্চিত হয়েন নাই।

দুরন্ত রোগ-নির্যাতনের মধ্যে আপনার চিত্তের স্থৈর্যকে রক্ষা করিয়া চিকিৎসকের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিয়া আসিতেছিলেন। মৃত্যুর প্রায় ছয় সপ্তাহ পূর্বে রোগ যখন সহসা নূতন মূর্তি ধারণ করিয়া দেহকে অভিভূত করিয়া ফেলিল, তিনি চিকিৎসকদিগের শত আশ্বাস সত্ত্বেও তাহার মধ্যে কালের আহ্বান শুনিয়া অটল বিশ্বাসে, প্রশান্ত চিত্তে, পরম আনন্দে লোকান্তরপ্রয়াণের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কি পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত তিনি পরকালের কথা বলিয়া গেলেন ঃ মৃত্যুর বিভীষিকা কি অপরূপ আনন্দময় মূর্তিতে তাঁহার নিকট দেখা দিয়াছিল! "আমার জন্য তোমরা শোক করিও না—আমি আনন্দে আছি, আনন্দেই থাকিব"—একি আশ্চর্য সান্ত্বনার কথা। যেমন আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে শিশু এই সংসারে জন্মগ্রহণ করে, তেমনি আনন্দের আহ্বানে অমর আত্মা লোকান্তর প্রাপ্ত হয়, এই সাক্ষ্য তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

গিরিডি থাকিতে দুই দিন রোগাচ্ছন্ন দেহে তন্দ্রাগতবৎ পড়িয়া ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে সেই সময়ের কথা বিশেষভাবে বলিয়া গিয়াছেন। "এই সময়ে সকল যন্ত্রণাবিমুক্ত হইয়া আমি কি আনন্দে বাস করিয়াছি, কি অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছি—তোমরা তাহা জান না। তোমরা আমাকে ঔষধ পথ্যাদি যাহা দিয়াছ তাহার কি অপূর্ব স্বাদ—আমি অমৃত জ্ঞানে তাহা পান করিয়াছি। আমার সকল ভয় ভাবনা দূর হইয়াছে—আমি সেই জ্যোতির রেখা দেখিয়াছি। আমি দেখিলাম, আমি এ দেহ নই, কিন্তু আমার এই দেহের জন্য তোমাদের কত যত্ন, তোমরা ঔষধ পথ্যাদি দ্বারা কতরূপে তাহার সেবা করিতেছ। দেহবিমুক্ত হইয়া মৃত্যুর অতীতলোকে মানুষ কিভাবে অবস্থান করে, দয়াময়ের কৃপায় আমি তাহা স্পষ্ট দেখিলাম। দয়াল আমায় বুঝাইয়া দিলেন, তোমাকে এইরূপ বিদেহী অবস্থায় থাকিতে হইবে।" দয়া কি জিনিষ! দয়া যে কল্পনা নয়, দয়াময় নাম

যে শুধু আপাত তৃপ্তিপ্রদ নামমাত্র নয়, জীবন্ত জাগ্রত করুণা যে জীবনবেদের ছত্রে ছত্রে আপনার পরিচয় দিয়া যাইতেছে, অন্তিম সময়ে তাহার সাক্ষ্য এমন করিয়া কয়জনে দেয়?

গিরিডিতে যে গৃহে বাস করিতেন, তাহার সুব্যবস্থার কথা বারবার বলিতেন, "আমি রোগযন্ত্রণার সময়ে যাহাতে সুখসাচ্ছন্দ্যে থাকি, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই যেন এই গৃহ নির্মিত হইয়াছিল।" গিরিডির দারুণ শীতের উপশমজন্য গরম কাপড় আনান হল। কিন্তু দরজি কই? সেই উদ্বেগ ও ব্যস্ততার মধ্যে জামা প্রস্তুত করে কে? গুরুতর কর্মের তাড়নায় কাহারও অবসর আর ঘটিয়া উঠে না। এমন সময় অযাচিতভাবে কোথা হইতে দরজি আসিয়া উপস্থিত! তখন ভক্তের আনন্দ দেখে কে! "দেখ ভগবানের দয়া!" ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবানের চিরজাগ্রত ইচ্ছা সৃষ্টি তোলপাড় করিয়া অঘটন ঘটাইতে পারে, একথা আজ বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়।

কলিকাতায় গিয়া চিকিৎসা করাইলে তিনি সুস্থতা লাভ করিবেন, এরূপ কথা তিনি বলিতে দিতেন না। বলিতেন—"ওরূপ ভাবিতে নাই। ভগবান যেরূপ বিধান করেন তাহার জন্যই প্রস্তুত থাকিতে পার।"

মৃত্যুর দুই দিন পূর্বে ভক্তিভাজন দাদামহাশয় নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়কে তিনি প্রার্থনা করিতে বলেন। দাদামহাশয় প্রার্থনার সময়ে বলেন, "তুমি ইঁহার জীবনের সমুদয় অপরাধ মার্জনা কর।" এ প্রার্থনায় তৃপ্ত হইলেন না। আবার তিনি নিজেই আকুলভাবে প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন, "আমার অপরাধ মার্জনা কর, এ প্রার্থনা আমি করি না। যদি দণ্ডদান আবশ্যক হয়, দণ্ডই দাও। কিন্তু আমায় পরিত্যাগ করিও না।"

মৃত্যুর পূর্বদিন, রবিবার উষার প্রাক্কালে পাখির কাকলী শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "পাখিরা এমন করিয়া ডাকে কেন?" বলা হইল এখন সকাল হইয়া আসিতেছে। ইহাতে অত্যন্ত মৃদুভাবে যেন আপনমনে তিনি কি বলিলেন, ভাল বোঝা গেল না; কেবল শোনা গেল, "পাখিরা কি জানে? তারা বুঝতে পারে?" দুটি ছোট পাখি জানালার কাছে আসিয়া কিচিরমিচির করিয়া উড়িয়া গেল। তিনি বিস্মিতভাবে তাকাইয়া বলিলেন, "ও কী পাখি? ও কী বলিয়া গেল, শুনিলে না? পাখি বলিল, 'পথ পা', 'পথ পা'।" রবিবার দিবাবসানের সঙ্গে যখন সকলের আশারও অবসান হইয়া আসিল, আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আত্মীয়স্বজন সকলে সমবেত হইলেন। চিকিৎসকেরা আশঙ্কা করিতেছিলেন, হয়ত অন্তিমে তাঁহাকে ক্ষয়রোগের যন্ত্রণা ভুগিতে হইবে। কিন্তু তিনি অজাতশত্রু, মৃত্যুও তাঁহার পরম মিত্ররূপে অবতীর্ণ হইল। মৃত্যুর প্রশান্ত গাম্ভীর্যের মধ্যে দয়ালের শেষ দয়ার স্বাক্ষ্য রাখিয়া তিনি পরম শান্তিতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত চিরশান্তিময় সুখের দেশে প্রস্থান করিলেন।

কি শান্তি! কি শান্তি! ভয়াবহ মৃত্যুর কি অপূর্ব সুন্দর মূর্তি! তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমরা আমার রোগক্লিষ্ট দেহকে দেখিতেছ; আমার অন্তরে কি আরাম, কি শান্তি, তাহা যদি দেখিতে, তোমাদের আর দুঃখ থাকিত না। আমার জন্য তোমরা শোক করিও না—আমি আনন্দে আছি আনন্দেই থাকিব। মৃত্যুর সময়ে ক্রন্দন করিয়া আমায় অস্থির করিও না। আমার কাছে বসিয়া সকলে ভগবানের নাম গান করিও।" প্রয়াণকালে উষালোকে সংগীত হইতেছিল—যখন গান আরম্ভ হইল "জানিহে যবে প্রভাত হবে তোমার কৃপা-তরণী লইবে মোরে ভবনগর-কিনারে" তখনও তাঁহার মৃদুকম্পিত ওষ্ঠ যেন এই সংগীতের সঙ্গে যোগরক্ষা করিয়াছিল। তারপর আপনা হইতেই মুহূর্তের মধ্যে নিঃশ্বাস থামিয়া গেল—অস্তমিত জীবনসূর্য কোন্ নূতন লোকে নূতন প্রভাতের নব আনন্দে উদিত হইল জানি না।

মৃত্যুর অতীত লোকের পাথেয়রূপে জীবনের সঞ্চিত পুণ্য আজ তাঁহার সম্বল রহিয়াছে। কায়মনোবাক্যে যিনি কোন দিন সত্যকে লঙ্ঘন করেন নাই, শাশ্বত চিরজাগ্রত সত্য আজ তাঁহাকে

রক্ষা করিতেছে। যে দয়ার সাক্ষ্য তিনি আজীবন বহন করিয়া গেলেন, সে দয়া আজও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। যে আনন্দের আস্বাদনে বিভোর হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি আনন্দে আছি আনন্দেই থাকিব"—সেই আনন্দ তাঁহার অনন্ত জীবনপথের শাশ্বত সঙ্গী হইয়া চলিয়াছে।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ান্ত্যভিসংবিশন্তি।

মুলুর নিজস্ব রূপ

মানুষের ভিড়ের মধ্যেও এক একটি মুখ যেন চোখে পড়িবামাত্র সহজেই দৃষ্টিকে অধিকার করিয়া বসে। সংসারের অভ্যস্ত দৃষ্টিতে মানুষকে বারবার সেইরূপেই দেখি, যাহা দশজন মানুষের সাধারণ এবং পরিচিত রূপমাত্র—কচিৎ পরিস্ফুট তাহার নিজস্ব রূপটি—যে রূপ তাহার ব্যক্তিত্বগৌরবে সহজ ও স্বতন্ত্র। বাহিরের এই মানুষের অন্তরালে নিঃসঙ্গ যে মানুষ আপনি আপনার আনন্দের সাক্ষী হইয়া চলে, সেই মানুষের নিত্য চঞ্চল রহস্য এক একটি জীবনের মধ্যে যেন মূর্তিগ্রহণ করিতে চায়।

মুলুর কথা বলিতে গেলে সকলের চাইতে স্পষ্ট করিয়া এই কথাটিই মনে হয় যে তাহার দেহমনপ্রকৃতির সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে জীবনের সেই রূপটি ফুটিয়াছিল, যাহা তাহার নিজস্ব রূপ এবং সহজ রূপ। মনের চালচলনে, চিন্তার গতি ও ভঙ্গীতে, স্বভাবের রুচি ও খেয়ালে, তাহার অন্তরপ্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যাইত। বাহিরের স্বভাবটি তাহার অন্তরের সহজ রঙে রঞ্জিত ছিল বলিয়াই, সামান্য পরিচয়েই তাহা চিত্তকে আকর্ষণ করিত।

মানুষের জটিল মন যে-সমস্ত অদৃশ্য নিয়ম সংকেতের অনুসরণ করিয়া চলে, বাহিরের দৃষ্টিতে তাহা অনেক সময়েই দুর্বোধ্য। তাহা সহজ হয় সেইখানে, যেখানে মন আপনার পরিপূর্ণ শিশুত্বকে পরিহার করে নাই, ভিতর-বাহিরের মধ্যে সংসারের ছাঁচে-গড়া কৃত্রিমতার ব্যবধান গড়ে নাই। মনের কল্পনা কৌতূহল আপনি সেখানে উদ্দীপ্ত হয়, আর স্বাভাবিকভাবে তাহা হইতেই চিন্তা জাগ্রত হয়, সাধনার উদ্বোধন হয়, সৃষ্টির ব্যাকুল আনন্দ বিচিত্র আয়োজনে আপনাকে আপনি অন্বেষণ করিতে থাকে। মুলুর মধ্যে জীবনের সেই উৎসমুখটি উন্মুক্ত ছিল। সেই জন্য তাহার বিস্ময়কৌতূহল, তাহার নিত্য সচেষ্টতার ভিতর দিয়া, নানাদিকে সার্থকতার সন্ধান করিয়া ফিরিত। দেখিতাম, মন তাহার সর্বদাই কিছু করিতে চায়, সর্বদাই যেন নূতন কিছু ধরিবার অবকাশ খুঁজিতেছে। কে করিবে, কিরূপ ভাবে করিবে, অজস্র উৎসাহে তাহারই চিত্র মনের মধ্যে কতবার আঁকিয়া দেখিতেছে।

নানা সংকল্প ও উদ্যমে, গল্পরচনা ও কৌতুক-প্রসঙ্গে, অভিনয়াদির আয়োজনে, Boy's Club বালক-সমিতি প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায়, তাহার প্রতিভার সহজ-সুন্দর রূপ ফুটিয়া উঠিত। কাজের কল্পনা ও প্রণালীর মধ্যেও তাহার এমন একটু নিজস্ব ধরণ ছিল, যাহা তাহার প্রকৃতিগত। কোনো কার্যের সংকল্প স্থির হইতেই সে যেরূপ প্রবল উদ্যমে তাহাতে ব্রতী হইত, এবং যেরূপ অক্ষুণ্ণ ভরসার সহিত বাধা বিঘ্নকে উপেক্ষা করিয়া চলিত, তাহা বাস্তবিকই উপভোগ্য। তাহার প্রতিভার যে-সমস্ত পরিচয় সে রাখিয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে একটি তাহার অভিনয়কুশলতা।

এ ক্ষেত্রে তাহার স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল। সেজন্য অপরের বিস্তারিত উপদেশ বা নিরন্তর পরিচালনার কোন প্রয়োজনই ঘটিত না; তাহার স্বাভাবিক রসানুভূতি ও কল্পনাশক্তির প্রাচুর্যই তাহাকে সহজ পথ ধরাইয়া দিত। "ডাকঘর" নাটকের মধ্যে ঠাকুর্দার রসকৌতুকের অন্তরালে যে একটি প্রচ্ছন্ন গভীরতা আছে, কেবল সেই ইঙ্গিতটুকু ধরিয়াই, ঠাকুর্দার রূপটি তাহার অভিনয়ের ভিতরে সরল স্বাভাবিক মূর্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। অভিনয়কালে, বিশেষত হাস্যরসের অবতারণায়, সহজ সার্থকতার আনন্দ তাহার দেহভঙ্গী মুখশ্রী ও চোখের দীপ্তিতে অজস্রচ্ছন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

অপরদিকে, যেখানে তাহার মনের সুরে সুর মিলিত না, সেখানে তাহার অতৃপ্তিকে ফাঁকি দিয়া এড়াইবার কোন উপায় থাকিত না। "এরূপ কেন হইবে, ওরূপ কেন হইবে না", এই সন্দেহ উপস্থিত হইলে, তাহার জাগ্রত মনের সুসঙ্গতিবোধকে তৃপ্ত না করিয়া, কেবলমাত্র বিধিনিষেধের নির্দেশমত তাহাকে চালাইয়া লওয়া অসম্ভব হইত।

আর একটি স্বাভাবিক গুণ তাহার মধ্যে অতি পরিস্ফুট আকার লাভ করিয়াছিল। সেটি তাহার সহজ নেতৃত্বশক্তি। যাহাদের সংস্পর্শে ও অলক্ষিত প্রভাবে দশ জনের সংকল্প রূপ গ্রহণ করিবার সুযোগ পায়, যাহাদের মনের আবেগ দশজনের চিন্তা ও উদ্যমকে একমুখী করিবার সহায়তা করে, যথার্থ নেতৃত্বের পদবী তাহাদেরই প্রাপ্য। মুলুর মনের সাধারণ গতির মধ্যেও এমন একটি সতেজ স্পষ্টতা ছিল যে সাংসারিক কৃত্রিমতার সংস্কার ও অভ্যাস তাহার মনের সহজ উন্মুক্ত দৃষ্টিকে রুদ্ধ করিতে পারিত না।

সমবয়সী কয়েকজনের সহিত মিলিয়া সে একটি সমিতি গড়িতে চাহিয়াছিল। সেটি তাহাদের আশানুরূপ গড়িয়া উঠে নাই। একবার উৎসবের সময়ে সেই সমিতিরই একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। সেখানে মুলু একটি অতি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে, অতি সরল সুন্দরভাবে, তাহার স্বাভাবিক অনাড়ম্বর ঔৎসুক্যের সহিত সমিতির আশা ভরসার আলোচনা করিয়া বলিয়াছিল যে, "নিজেদের অভিমানটুকু ছাড়িতে পারিলেই হয়, তাহা হইলেই আমাদের সমিতি গড়িয়া উঠিবে।" বোধ হয় তিন বৎসরের অধিক কাল গিয়াছে, সেখানে আর কি হইয়াছিল তাহা স্মরণ নাই, কিন্তু তরুণ প্রাণের ঐ ভরসাটুকুর কথা আর ভুলিতে পারি নাই।

জীবনের সার্থকতাকে কীর্তি ও কৃতিত্বের পরিমাপে মাপিয়া দেখিবার প্রথা সংসারে প্রচলিত আছে। সে দিকের পরিচয় আজ মৃত্যুর দ্বারা খণ্ডিত। কিন্তু চিরজীবন্ত প্রাণের যে প্রত্যক্ষ পরিচয় জীবনের গোপনতম রহস্যের গভীরতম চিহ্নে অঙ্কিত থাকিয়া গেল, তাহার সেই সাক্ষ্য আর মুছিবার নয়।—

"জয়ী প্রাণ, চির প্রাণ, জয়ীরে আনন্দ গান"।

শিল্পে অত্যুক্তি

আমাদের চোখ যাহা দেখে, আর মন যাহা দেখে, এই দুইটার মধ্যে অনেক প্রভেদ। মন যখন ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যকে আপনার খাতায় জমা করে, তখন তাহার উপর যথেচ্ছা কলম চালাইতে সে কিছুমাত্র ইতস্তত করে না। তাহার নিজের ভালোলাগা-না-লাগার খাতিরে সে কত অবান্তর জিনিসকে বড় করিয়া তোলে, কত বড় জিনিসকে বিনা বিচারে হয়তো অজ্ঞাতসারে বাদ দিয়া বসে। এই গ্রহণ বর্জনের মধ্যে কোনো নিয়মসূত্র খুঁজিয়া পাওয়া অনেক স্থলেই দুষ্কর।

আমাদের ভিন্ন-ভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি প্রত্যেক ঘটনা সম্বন্ধে ভিন্ন-ভিন্ন রকমের সংবাদ দেয়। বাহির

হইতে আলোচনা করিয়া দেখিলে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ এগুলি সমস্তই স্বতন্ত্র ব্যাপার বলিয়া ঠেকে, কিন্তু মনের মধ্যে এই সমস্ত মিলিয়া যখন একটা অখণ্ড 'রসমূর্তি'তে পরিণত হয়, তখন তাহার মধ্যে কতখানি চাক্ষুষ, কতটা শ্রুত, আর কতটা অন্য কিছুর প্রতিধ্বনি, তাহা বিচ্ছিন্ন করিয়া বাহির করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। কথাটা কাহারো নিকট হঠাৎ অদ্ভুত শুনাইতে পারে, তাই একটা সামান্য উদাহরণ লওয়া যাউক। মনে করুন সূর্যাস্তের কথা। সূর্যাস্ত যে দেখিতেছে, অনেকগুলি খণ্ড-খণ্ড ছবি মিলিয়া তবে তাহার মনে সূর্যাস্তের একটা পরিপূর্ণ ছবি অঙ্কিত হইতেছে। যেমন, একটা অগ্নিগোলক ক্রমে রক্তবর্ণ হইয়া দিগন্তরেখার তলে ডুবিয়া গেল, তাহার আভায় আকাশের নীলিমা হইতে নগরের ধূলিধূসর কুয়াশা পর্যন্ত সোনার সিঁদুরে অপরূপ বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল, রৌদ্রাবসানের সঙ্গে-সঙ্গে গাছের দিগন্তোন্মুখ ছায়াগুলি ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আলো ও ছায়ার দ্বন্দ্বকে লুপ্তপ্রায় করিয়া তুলিল, এবং সকলের শেষে রজনীর অন্ধকার নামিয়া সারাদিনের রৌদ্রক্ষত পৃথিবীর শেষ রক্তরেখাটুকু পর্যন্ত মুছিয়া দিল। ইহার মধ্যে রাখাল কখন যে তাহার গোরুর পালকে ঘরে ফিরাইয়া আনিল বা পাখি কুলায়লাভের জন্য যে-যার পথে চলিয়া গেল, সেদিকে হয়তো বিশেষভাবে চোখ নাও পড়িতে পারে, কিন্তু তথাপি মনে হয় বিশ্রামলাভের আকাঙ্ক্ষাটা যেন প্রকৃতির মনকেও ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে, অন্ধকারের অবসাদ যেন বৃক্ষপত্রে বাতাসে চারিদিকে সংক্রামিত হইয়া একটা অলস ঔদাস্যের সৃষ্টি করিয়াছে। মনের মধ্যে যে স্ফুট-অস্ফুট এতগুলি ছবি জাগিয়া ওঠে, তাহার মধ্যে কতটা যে দেখিয়াছি, আর কতটা যে শুনিয়াছি, আর কতটা দেখি নাই শুনি নাই অথচ স্বীকার করিয়া লইয়াছি, তাহা বলা শক্ত, অথচ ইহার কোনোটাকে যদি বাদ দিতে যাই তবেই হয়তো আমার মনের ছবিটিতে অনেকটা ফাঁক পড়িয়া যায়। যদি পাখির গৃহপ্রয়াণের সঙ্গীতটুকু না থাকে, যদি জীবজগতের অস্ফুট শব্দোন্মেষের স্থলে একেবারে জনতার কোলাহল বা মরুপর্বতের নিস্তব্ধতা কল্পনা করি, তবেই আমার মনের ছবি আর সে-ছবি থাকে না।

প্রকৃতির কোনো একটা চাক্ষুষ পরিচয়মাত্রকে শিল্পে ব্যক্ত করিয়াই যদি শিল্পী মনে করেন "যথেষ্ট হইল" তবে অনেকস্থলেই তাঁহার বলাটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। শিল্পী এটি বেশ অনুভব করেন যে, তাঁহার চোখ তাঁহাকে যেটুকু দেখায়, কেবল সেইটুকুই ঠিক তদ্বৎ করিয়া আঁকিলেই তাঁহার মনের কথাটাকে ঠিক বলা হয় না। আবার শিল্পীর মাত্রাজ্ঞান যখন মুখ্যগৌণ বিচারে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে "চার কড়ায় একগণ্ডা" "বারো ইঞ্চিতে এককুট" এরূপ হিসাব ধরিয়া চলে না। সুতরাং জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক, শিল্পীর মন তাহার ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যগুলিকে একটা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট "আদর্শের" অনুযায়ী করিয়া গড়িয়া লয়। এইখানেই শিল্পঘটিত প্রায় সকল প্রকার সত্য ও মিথ্যা অত্যুক্তির মূল বলা যাইতে পারে।

"সূর্যাস্ত জিনিসটা একটা রঙের খেলা মাত্র" কোনো শিল্পী এইকথা বলায়, ইংরেজ শিল্পী ব্লেক আশ্চর্য হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি স্পষ্টই দেখিতে পাই, আকাশের পশ্চিমপ্রান্তে স্বর্গের জয়-জয় সংগীত উত্থিত হইয়া চতুর্দিক ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে।" ব্লেক অনেকের নিকট অক্ষম শিল্পী বলিয়াই পরিচিত, কিন্তু সেই "অক্ষমতার" মধ্যেই তিনি তাঁহার সরল প্রাণটির এমন পরিচয় দিয়াছেন যে সেই জিনিসটিকে পাইবার জন্য অনেক শক্তিমান্ শিল্পী শক্তির বিনিময়ে তাঁহার অক্ষমতাকে বরণ করিতে প্রস্তুত আছেন। ব্লেক যদি তাঁহার সান্ধ্যচিত্রে একটা অপার্থিব জয়োচ্ছ্বাসের ছবি আঁকিতেন সেটা তাঁহার পক্ষে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইত না। কিন্তু আমিও যদি দেখাদেখি আবার লাল-নীল আকাশের মধ্যে বীণাশুদ্ধ গুটি দু-চার পরীর অবতারণা করি, তবেই সমঝদার লোকে আমায় কান ধরিয়া শিল্পের আসর হইতে নামাইয়া দিবে।

আর একজন প্রসিদ্ধ চিত্রকর একই দৃশ্যের মধ্যে রৌদ্র, বৃষ্টি, কুয়াশা প্রভৃতি অবস্থা-বিপর্যয়ের কয়েকটি ধারাবাহিক চিত্র দেখাইয়াছেন। তাহার মধ্যে সন্ধ্যার একটি চিত্র আছে, হঠাৎ দেখিলে সেটিকে অন্য কোনো দৃশ্যের ছবি বলিয়া ভ্রম হয়। আসলে দৃশ্য সেই একই, কিন্তু এখানে সম্মুখের গাছগুলিকে খাটো করিয়া আকাশের আলো হইতে নিচের অন্ধকারে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যেন চিত্রকর গাছগুলিকে একটা অসম্ভব রকম উচ্চস্থান হইতে দেখিতেছেন। কোনো সমালোচক ইহার ব্যাখ্যা করেন এই যে, চিত্র বলিতেছে মানুষের মনটা যেন পার্থিব তুচ্ছতার উপরে উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক এক্ষেত্রে এরূপ "অত্যুক্তির" আরো গূঢ় কারণ দেখা যায়। আকাশের দিগন্তশায়ী মেঘস্তরের আলম্বিত শান্তভাব ও নিম্নে পাহাড় ও উপত্যকার সহজ সুন্দর গড়ানে টানগুলি মিলিয়া চিত্রে এমন একটা মৃদু দোলায়মান রেখাছন্দের সৃষ্টি করিয়াছে যে, সন্ধ্যার বিশ্রামোন্মুখ ভাবটি আপনা ইহতেই মনে জাগিয়া ওঠে। মনে হয় সংগ্রাম কলুষিত দিবসের পঙ্কিলতা যেন এমনি করিয়াই সন্ধ্যার নিস্তব্ধতার মধ্যে স্তরে-স্তরে নামিয়া যায়। ইহার মধ্যে হইতে গাছগুলি যদি সঙ্গীনের মতো অতিমাত্রায় খাড়া হইয়া উঠিত, তবে সেই উদ্ধত রেখাসঙ্ঘাতে সমস্ত ছন্দটিকে একেবারে মাটি করিয়া দিত। সুতরাং এস্থলে শিল্পীর মনের ভাবটিকে রক্ষা করিতে হইলে এরূপ একটা "মিথ্যা"র আশ্রয় লওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর ছিল না। শিল্পের হিসাবে অত্যুক্তিটা যথার্থ ভাবসঙ্গত সুতরাং এক্ষেত্রে সত্য-সঙ্গত।

অজ্ঞতাবশত আনাড়ি শিল্পী প্রাকৃতিক সত্যের যে-সকল অপলাপ করিয়া থাকেন, বা ব্যঙ্গ চিত্রে ইচ্ছাপূর্বক যে-সকল অত্যুক্তির অবতারণা করা হয় সেগুলি বর্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত নহে। কিন্তু বাস্তবিকতার একটা বিকৃত আদর্শের কল্যাণে মাঝে-মাঝে শিল্প-বাজারে যে এক শ্রেণীর নাটকীয় অত্যুক্তির আমদানী হইয়া থাকে, তাহার সহিত আমরা সকলেই অল্পাধিক পরিচিত। নিজের অন্তর্দৃষ্টির উপর যে শিল্পীর বড় একটা আস্থা নাই, পাছে তাহার বক্তব্যটি সর্বজনসুবোধ্য না হয়, এই আশঙ্কায় সে তাহার কথাগুলিকে অতিমাত্রায় স্পষ্টোচ্চারিত করিয়া অজস্র ইঙ্গিত ও ভঙ্গীবাহুল্যের আটঘাট এমন করিয়া দেয় যে, শিল্পরঙ্গভূমির প্রশংসাবাদীগণের মনে আর অণুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ইহার দু-একটি পরিচিত নমুনা দিলে ভালো হইত, কিন্তু অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া সে দুঃসাহসিক কার্যে বিরত থাকিলাম। আমাদের দেশে এই জাতীয় অত্যুক্তির প্রসারের জন্য পাশ্চাত্যশিল্পকে দায়ী করাটা ঠিক ন্যায়সঙ্গত হয় না। কারণ ইহার দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্য জগতে বিরল না হইলেও, পাশ্চাত্য বাস্তব শিল্পের দোহাই দিয়া আমাদের দেশে সাধারণত যে জিনিসটার চর্চা হইয়া থাকে, সেটা পাশ্চাত্যও নয় বাস্তবও নয় এবং অধিকাংশ স্থলে শিল্প নামেরও যোগ্য নয়। অতিরিক্ত কথা বলাটাও এক প্রকারের অত্যুক্তি এবং কাব্যের ন্যায় শিল্পেও তাহা নিন্দনীয়। কিন্তু তাই বলিয়া, অত্যুক্তি বলিতেই কিছু বাক্যের অসঙ্গত বাহুল্য বুঝায় না। অত্যুক্তি জিনিসটাও যে শিল্পসঙ্গত হইতে পারে, এ কথাটা আর কয়েক বৎসর পূর্বেও এদেশের মাসিক পত্রের পাঠকগণকে বুঝাইয়া বলা আবশ্যক হইত। কেন হইত তাহা জানি না, কারণ কাব্যে সাহিত্যে অত্যুক্তির ছড়াছড়িতে আমরা তো বেশ অভ্যস্ত আছি।

শিল্পের প্রচলিত পদ্ধতিগুলি যখন নিতান্ত অভ্যস্ত ও "মামুলী" হইয়া আসে, তখন তাহারই প্রতিক্রিয়ারূপে যে সকল নব্যতন্ত্রের আবির্ভাব হয়, তাহাদের মধ্যে প্রায়ই একটা অত্যুক্তির ধুয়া দেখিতে পাওয়া যায়। অত্যুক্তির বাড়াবাড়িটা কতদূর গড়াইলে তবে তাহাকে অসঙ্গত বলা চলে এ প্রশ্নের খুব একটা সোজাসুজি মীমাংসা হয় না। কিন্তু অনেক প্রকার অনাবশ্যক অপ্রাসঙ্গিক বা অতিস্পষ্ট অত্যুক্তির মূলে প্রায়ই একটা আদর্শ-বিপর্যয় লক্ষিত হয়। শিল্পী তাঁহার মনের ভাবকেই

যথাসঙ্গত ভাষায় ব্যক্ত করিবেন, এই অত্যন্ত সহজ কথাটিকেই টানিয়া ফেনাইয়া অতিরিক্ত ব্যাপক করিয়া তুলিলে কথাটা নিতান্তই উদ্ভট হইয়া পড়ে। ভাব জিনিসটা যখন বস্তুনিরপেক্ষ প্রকাশের উৎকট চেষ্টায় প্রকৃতির সহিত একটা অর্থহীন কলহ বাধাইয়া বসে, তখনই তাহাকে কিছুকালের জন্য শিল্প-রাজ্য হইতে নির্বাসন দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। যে অত্যুক্তি-মূলক ভাবব্যঞ্জনা-পদ্ধতিকে আমরা প্রাচ্যশিল্পের মধ্যে বিশেষভাবে দেখিতে পাই, সেই জিনিসটার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ঘটিলে তাহা কতদূর উৎকট ও অসঙ্গত হইতে পারে, তাহারই নমুনা স্বরূপ ব্রাঞ্চুসি নামক রুমানীয়ার শিল্পীর রচিত একটি মূর্তির ছবি দেওয়া গেল। (১ নম্বর চিত্র দ্রষ্টব্য)। এই রমণীমূর্তির ভীষণায়ত দৃষ্টির কল্পনায় নাকি বিশেষভাবে অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা ও স্পষ্টতা সূচিত হইয়াছে। বিভিন্ন শিল্পের ইতিহাস বিশেষত আজকালকার পাশ্চাত্য "অত্যুক্তিমূলক" শিল্পের ইতিহাস, আলোচনা করিলে আমরা এই একটা তত্ত্ব লাভ করি যে, অত্যুক্তি জিনিসটা যে কোনো সূত্র অবলম্বন করিয়াই শিল্পে প্রশ্রয়লাভ করুক না কেন, সে অনেক সময়ে ছুঁচটি হইয়া প্রবেশ করে বটে কিন্তু পরিণামে প্রায়ই ফালটি হইয়া বাহির হয়।

ক্লড্ টার্নার প্রভৃতি শিল্পীগণ নিষ্ঠার সহিত আলোকরহস্যের চর্চা করিয়া শিল্পে একটা নতুন রসের সঞ্চার করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে ইঁহারা নানাপ্রকার অত্যুক্তির আশ্রয় লইয়াছেন এবং রাস্কিন্ সেই সূক্ষ্ম অত্যুক্তির আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে টার্নারের "অত্যুক্তি" গুলিই সর্বাপেক্ষা সত্যসঙ্গত এবং সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচায়ক। এই আলোকসৌন্দর্যের কুহকে পড়িয়া পরবর্তীকালে বর্ণোপাসকগণ, "কেবল মাত্র আলোক ও বর্ণবৈচিত্র্যের সাধনাতেই উচ্চতম শিল্পপ্রতিভা সার্থকতা লাভ করিতে পারে" এইরূপ একটা ধুয়া তুলিয়া বস্তুনিরপেক্ষ আলোকতত্ত্বের সন্ধানে আপনাদের শক্তি ও সময় ব্যয় করিয়াছেন। ইঁহাদের চক্ষে প্রাকৃতিক ঘটনামাত্রই কতগুলি অপরূপ বর্ণের বিচিত্র সমাবেশ মাত্র। নীলিমার গম্ভীর সুর কেমন করিয়া অবাধে ও অলক্ষিতে রক্তিমতায় আরোহণ করে এবং খণ্ড আলোকের ছন্দ কেমন করিয়া তাহার নিরবচ্ছিন্নতাকে ভাঙিয়াও ভাঙে না—প্রতিদিন সূর্যের উদয়ে ও অস্তগমনে ইঁহারা এই শিক্ষাই লাভ করেন। শিল্প চিরকাল এই শিক্ষাই দিয়াছে যে, কোনো বস্তুর "রূপ' বলিতে তাহার বর্ণের চাইতে তাহার আকৃতিটাকেই বেশি বুঝায়, কারণ আকৃতিটাই বিশেষভাবে তাহার প্রকৃতির পরিচায়ক। সুতরাং বর্ণ জিনিসটা বহুকাল ধরিয়া কেবলমাত্র আকৃতি প্রকাশের সহায়তার জন্যই ব্যবহৃত হওয়ায় তাহার যে একটা নিজস্ব মূল্য ও বিশেষত্ব আছে একথা লোকে প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল। সুতরাং বর্ণের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া শিল্পী যে বস্তুর আকারগত রূপটাকে উড়াইয়া বসিবেন, ইহাতে বিশেষ আশ্চর্য হইবার কোনো কারণ নাই, প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়মই এই। বর্ণগত অত্যুক্তির মাত্রা বাড়িতে-বাড়িতে শেষটায় এই সিদ্ধান্তে আসিয়া ঠেকিল যে, "যেহেতু বিজ্ঞান বলেন যে, চোখের মধ্যে কয়েকটা মৌলিকবর্ণের পাশাপাশি সমাবেশকেই আমরা আলোকরূপে প্রত্যক্ষ করি, অতএব আলোককে সম্যকরূপে ব্যক্ত করিতে হইলে উক্ত কয়েকটি মৌলিকবর্ণের বিন্দু-বিন্দু প্রয়োগ ভিন্ন সত্যসঙ্গত আর কোনো উপায় নাই।" কথাটা ঠিক বৈজ্ঞানিক সত্য না হইলেও একদল শিল্পী এই "আদর্শ" অনুসারে, লাল, নীল, হলুদের ছোট-বড় ফুটকির মধ্যে সাদা কালো মিশাইয়া শিল্প রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। একটা উৎকট মতানুবর্তিতার খাতিরে অকারণ শক্তিক্ষয়ের এমন আশ্চর্য দৃষ্টান্ত আর বড় দেখা যায় না।

ফটোগ্রাফ জিনিসটাকে সত্যনিষ্ঠার চূড়ান্ত নিদর্শন জ্ঞানে অনেকে তাহাকে খুব একটা সম্ভ্রমের চক্ষে দেখেন। কিন্তু বাস্তবিক অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায় যে সত্যের বিকৃতিসাধনে ফটোগ্রাফ বড় কম পটু নহে। তা ছাড়া, তাহার ছোট-বড়-জ্ঞানশূন্য নির্বিচার দৃষ্টিতে "মুড়ি মুড়কি একদর" হইয়া যে অসংগতি ঘটায়, সেটিও বড় সামান্য নহে। ফটোগ্রাফ-বর্ণিত কোনো ব্যাপারের

ছবিতে তাহার একটা সাময়িক অবস্থামাত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। যে জিনিস স্থির থাকে না, যাহা মুহূর্তে-মুহূর্তে পরিবর্তমান, তাহাকে ব্যক্ত করিতে হইলে রীতিমতো সিনেম্যাটোগ্রাফের প্রয়োজন। এস্থলে শিল্পীর কর্তব্য কি? তিনিও কি ফটোগ্রাফের অনুকরণে গতির ছন্দকে একটা ক্ষণিক আড়ষ্ট সংহত ভঙ্গীর দ্বারা প্রকাশ করিবেন? দ্রুত পরিবর্তনশীল ঘটনার পরিবর্তন পর্যায়গুলিকে তো আমরা স্বতন্ত্র করিয়া দেখি না, মোটের উপর একটা গতিপ্রবাহ উপলব্ধি করি মাত্র। যে উপায়ে এই গতির প্রবাহ ও ছন্দকে সম্যকরূপে ব্যক্ত করা যায় তাহাই গতি সূচনার প্রকৃষ্টতম উপায়। ইহা অতি পুরাতন সর্ববাদীসম্মত কথা, কিন্তু কথাটাকে সকলে ঠিক একভাবে বা এক অর্থে গ্রহণ করে না। একটা ঘোড়া ছুটিতেছে, আমি দর্শক, তাহার চার-পায়ের ওঠা-নামা, সঙ্কোচন-প্রসারণ এবং সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত দেহের সম্মুখীনগতিরূপ একটা প্রকাণ্ড জটিল ব্যাপারকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। কিন্তু ঠিক কোন মুহূর্তে কোন কার্যটি কতদূর অগ্রসর হইতেছে তাহার একটা চাক্ষুষ হিসাব রাখা অসম্ভব, আর সে হিসাব পাইলেও কোনো বিশেষ মুহূর্তের দেহাবস্থানের দ্বারা গতির জটিল ছন্দটি সম্যক সূচিত না হওয়াই সম্ভব। নৃত্য, গীত, বাদ্য, আহার, বিহার, প্রহার, বক্তৃতা, পলায়ন প্রভৃতি প্রত্যেক কার্যের এক-একটা নিজস্ব ছন্দ ও রূপ আছে। সাধারণভাবে আমরা ইহাই বুঝি যে, যে প্রকার দেহভঙ্গী বা অঙ্গবিন্যাসের দ্বারা এই ছন্দটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয় চিত্রে তাহাই প্রযোজ্য। আধুনিক অত্যুক্তিবাদী ইহার উপর নিজের এই টিপ্পনী যোগ করিয়াছেন যে, "গতির ছন্দকে ব্যক্ত করিতে হইলে যদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির অসম্ভব বিক্ষেপ বা দেহবিচ্যুতি পর্যন্ত ঘটানো আবশ্যক হয়, তবে তাহাও শিল্প-সঙ্গত বলিতে হইবে। আর, দুই-চারিটা অতিরিক্ত হস্তপদ যোজনা করিলে যদি কথাটা আরো সুব্যক্ত হয়, তবে তাহাতেই বা বিরত থাকিব কেন?"

এই সকল কথা কেবল সম্প্রদায় বিশেষের "মত" মাত্র নহে। "ফিউচারিস্ট" নামধারী শিল্পীগণ হাতে কলমে ইহার সমস্তই করিয়া দেখাইতেছেন। এই ফিউচারিস্‌ম্‌ বা ভবিষ্যবাদ একটা প্রকাণ্ড বিপ্লবতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভবিষ্যদ্বাদীগণ শিল্পের সকল প্রকার নিয়মকানুন ও বাঁধাবুলিকে এবং অতীতের সকল প্রকার সংস্কার ও বন্ধনকে আবর্জনা জ্ঞান করিয়া থাকেন। সৌন্দর্য বল, শৃঙ্খলা বল, সুরুচি বল, এ সমস্তেরই মধ্যে একটা নিকৃষ্ট উদ্দেশ্যের আনুগত্য দেখা যায়। এ উপদ্রব নাই কেবল জীবনসংগ্রামে এবং জীবনের মূলগত অকাট্য সত্যের নির্ভীক অনুসরণে, কারণ প্রাণশক্তি সেখানে কৃত্রিমতার বন্ধন ছাড়িয়া আপনার প্রেরণায় আপনার অতীতকে অতিক্রম করিয়া আসিতেছে! ভবিষ্যদ্বাদী যাহাকে "জীবন-সংগ্রাম" বলেন তাহা কেবল জীবনের অন্তর্নিহিত একটি গূঢ় শক্তির উচ্ছ্বাস মাত্র নহে, তাঁহার মতে বাহিরের বিরোধ, যুদ্ধ বিদ্রোহ, বাণিজ্যের স্বার্থ সংঘাত, শক্তির উদ্ধত অভিমান, লৌহকঙ্কাল সভ্যতার স্পর্ধা ইহারাই বর্তমান যুগে জীবন প্রসারের শ্রেষ্ঠতম মূর্ত পরিচয়! সুতরাং পুরাতন সংস্কারের চর্বিতচর্বণ ও মামুলী ভাবরসিকতার পুনরুক্তি করিয়া আর অরুচির মাত্রা বাড়াইও না। অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, বিজ্ঞান বাণিজ্যের উদ্দাম ধূমোদ্‌গার ও সমাজ সংগ্রামের নির্মম গদ্যকে তোমার শিল্পেও কাব্যেও বরণ করিয়া তাহাতে চিরনূতনত্বের সঞ্চার কর। কৃত্রিমতা আমাদের হাড়ে-হাড়ে, নতুবা শিল্পী তাঁহার ভাবপ্রকাশের জন্য আবার একটা "ব্যাকরণ" গড়িবেন কেন? তাঁহার মন যাহা দেখিল তাহাকে আবার চোখের দেখার সহিত মিলাইয়া সংযত করিয়া লইবেন কেন? আমাদের সকল কার্যের অর্থাৎ সকল প্রকার আত্মপ্রকাশের এক-একটা অব্যক্ত রূপ আছে। মনের কথাগুলি যতক্ষণ মনেই থাকে; ততক্ষণ অনর্থক ভাষায় তর্জমা করিয়া বা কর্তা কর্ম ক্রিয়াপদের পারম্পর্য রক্ষা করিয়া কেহ তাহাকে চিন্তা করে না। আমি তুমি, এখান সেখান, যাওয়া করা, ইত্যাদি মোটা-মোটা "আইডিয়া" গুলিই অবিচ্ছেদে মনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট

হইয়া অব্যক্ত চিন্তায় পরিণত হয়। যদি "ফিউচারিস্ট" হইতে চাও তবে ঘটনামাত্রেই মনের মধ্যে যে সকল অস্ফুট ছাপ রাখিয়া যায়, তাহারই কয়েকটার খিচুড়ী বানাইয়া চিত্রপটে ছড়াইয়া দাও। সুতরাং আদর্শ, মত, বিষয় নির্বাচন ও রচনাপদ্ধতি সকল বিষয়ই ফিউচারিস্টের মৌলিকতা স্বীকার্য।

ফিউচারিস্ট অঙ্কিত নৃত্যামোদের চিত্রটিতে নৃত্য ব্যাপারটা একটা উদ্দম-বিক্ষিপ্ত বর্ণচ্ছন্দে পরিণত হইয়াছে বটে কিন্তু কতকগুলি অর্থসংলগ্ন হস্তপদমুখাকৃতি অবয়বের ছড়াছড়িতে সমবেত নৃত্যভঙ্গীর রূপটি ফুটিয়াছে মন্দ নয় (২ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। কোথাও বিশেষ কিছু নাই অথচ মনে হয়, হাত পা উঠিতেছে পড়িতেছে এবং সেই গতির হিল্লোল যেন সমস্ত চিত্রটিকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। "গ্যালীর শ্মশানযাত্রা"র (৩ নং চিত্র দ্রষ্টব্য) বিষয়টি ফিউচারিস্ট শিল্পীর ঠিক মনের মতো হইয়াছে। সূর্যাস্তের অগ্নিগর্ভ রক্তচক্ষু যেমন সূর্যদেবের বিদায়-কালেও তাঁহার বিদ্রোহের পতাকা তুলিয়া রাখে এবং পৃথিবীকে শাসাইয়া যায় যে, রৌদ্রের কশাঘাতে সকলকে উত্তক্ত করিবার জন্য কাল আবার আসিব, সেইরূপ বিপ্লববাদীর অন্তিমপ্রয়াণে একটা "মরিয়া না মরে রাম" গোছের ভাব দেখানো হইয়াছে। বিরুদ্ধ রেখাবর্ণের উদ্ধত সংঘাত এবং ঘূর্ণায়মান আলোকচক্রে ছায়ামূর্তিগুলির উল্লসিত তাণ্ডব নৃত্যে মৃত্যুর বিভীষিকাকে একটা বিজয়দৃপ্ত ঝঞ্ঝনার মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছে। এখানে আমরা যাহা দেখিতেছি ইহা ভবিষ্য শিল্পের একটা অপেক্ষাকৃত সংযত রূপ। ইহার "পরিপূর্ণ" রূপের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়া অনর্থক পুঁথি বাড়াইবার কোনো প্রয়োজন দেখি না। একই চিত্রের মধ্যে মানুষের চোখ, খানার টেবিল, তাসের আড্ডা, অন্ধকার পথ, মোটর গাড়ি প্রভৃতি অসংলগ্ন জিনিসের জট পাকাইয়া, তাহাকে, "গত রজনীর স্মৃতি" (৪ নং চিত্র দ্রষ্টব্য) বলিতে ইঁহারা একটুকু ইতস্তত করেন না। কেহ আবার আপনার ভাবকে লইয়াই সন্তুষ্ট নহেন, "নাগর-দোলায় আরূঢ় ব্যক্তির মনোভাব," "আক্রান্ত যোদ্ধার ভয়তুমুল ভাব," "দাঙ্গাকারী ভিড়ের সমষ্টিভূত ভাব," ইত্যাদি অনেক বিচিত্র "মনোভাবের" চর্চা ইঁহারা করিয়া থাকেন। এখন বাকি আছে "কটাহ-বিক্ষিপ্ত কইমৎস্যের মনোভাব" ও "অর্ধ-পক্ক পাঁউরুটির মনোভাব।" অনেকে সন্দেহ করেন যে, কোনো-কোনো "ভবিষ্যৎ-শিল্পী" হয়তো এই ফাঁকে জগতের সঙ্গে বুজরুকী করিয়া একটা মস্ত রসিকতার চেষ্টায় আছেন।

কিন্তু অত্যুক্তি জিনিসটার চরম পরিণতি দেখিতে হইলে তথাকথিত কিউবিস্ট বা "চতুষ্কোণবাদীর" সংবাদ লওয়া উচিত। ইঁহাদের মতে অধমতম বাস্তব শিল্পী ও ভবিষ্যদ্বাদীর মধ্যে বড় বেশি তফাৎ নাই! ভবিষ্যদ্বাদী চাক্ষুষদৃশ্যের অনুকরণ না করিয়া একটা মানসরূপের অনুকরণ করেন, এইটুকুমাত্র তাঁহার মৌলিকতা। তাঁহার শিল্পসাধনায় এই "অব্যক্তরূপের" একান্ত বশ্যতা ও রেখা বর্ণাদির ঐকতানমূলক একটা সংস্কার তো স্পষ্টই দেখা যায়। যদি সত্যই সংস্কারবিমুক্ত হইতে হয়, তবে দৃষ্ট বা কল্পিত বস্তুর রূপকে এমন কিছু দ্বারা ব্যক্ত করা আবশ্যক, যাহার সহিত সেই বস্তুর আকৃতিগত বা প্রকৃতিগত কোনোপ্রকার সাদৃশ্য নাই।

এইজন্য জীবদেহের সুগোল বর্তুলতাকে "কিউবিস্ট" কতগুলি সোজা রেখার আঁচড় ও একটানা বর্ণপ্রলেপে পরিণত করেন। রেখার উপর রেখা চাপাইয়া এক-একটি "কিউবিস্ট" চিত্রে ত্রিকোণ চতুষ্কোণাদির যে জঙ্গল রচিত হয়, তাহাকে হঠাৎ দেখিলে কোথাকার মানচিত্র বা ক্ষেত্রতত্ত্বের কোনো সিদ্ধান্ত বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। অসঙ্গত ঋজুতার টানে সকল ছন্দকে এবং রেখা ও গঠনের সৌন্দর্যজাত সকল সংস্কারকে একেবারে নির্মূল করিতে না পারিলে কিউবিস্ট নিশ্চিন্ত হন না। কারণ তিনি তো সভ্যতাসঙ্গত শিল্পমাত্রেরই কৃত্রিম জটিলতাকে ভাঙিয়া শৈশবের সহজ রেখার অনাবিলতাকে আবার শিল্পের মধ্যে ফিরাইয়া আনিতে চান। কথাগুলি শুনিতে যাহার কাছে যেমন লাগুক, কার্যত ইহার ফল কিরূপ দাঁড়ায় তাহার একটা নমুনা দেওয়া গেল

১ এই মূর্তিটি একটি জীবন্ত সুন্দরীর। শিল্পী ব্রাঙ্কুসি এই মূর্তিতে সুন্দরীর আঁখির গভীর দৃষ্টি প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন।
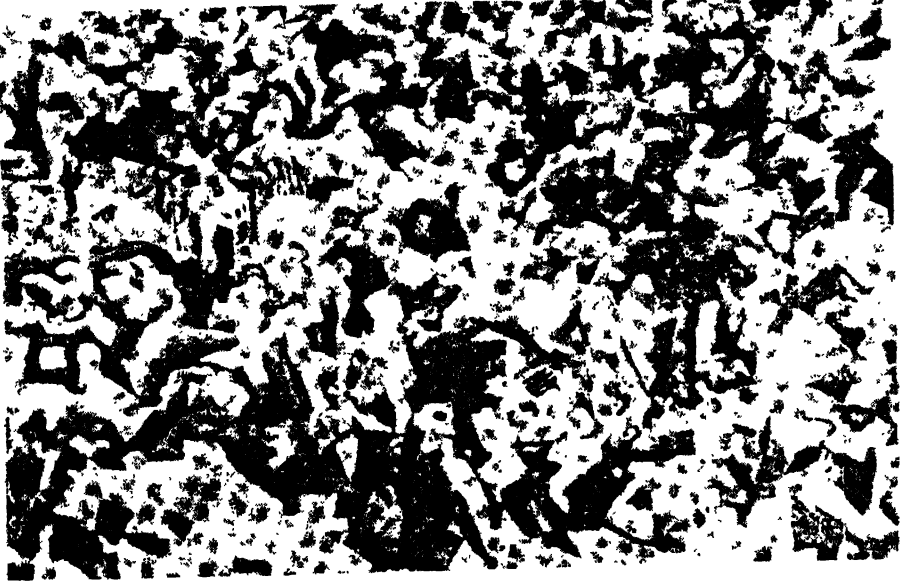
২ নৃত্যসভা (উপরে)। এই চিত্রে শিল্পী গিনো সেভেরমি একটি নাচের মজলিসে বহু নরনারীর লাস্যগতির চঞ্চলতা ও সদাপরিবর্তমান অবস্থান পরম্পরা প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন।

৩ বিপ্লববাদী গ্যালির শ্মশানযাত্রা (নীচে)। এই চিত্রে শিল্পী কার্লো কারা ভীষণ রমণীয় মহিমান্বিত কল্পনায় এক বিপ্লববাদীর মৃত্যুর পরও যে বিপ্লবের জড় মরে না তাহাই প্রকাশ করিবার ইঙ্গিত করিয়াছেন।

৪ গত রজনীর স্মৃতি শিল্পী রুসোলা এই চিত্রে গত রজনীতে পথ চলিতে-চলিতে মানুষের চকিত-দৃষ্ট দৃশ্যপরম্পরার যে মিশ্র চিত্র মনের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া মাঝে-মাঝে উঁকি মারে তাহা প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন— একখানি রমণী-মুখ, একটা ছ্যাকড়া গাড়ির বেতো ঘোড়া, একটা মোটরগাড়ির দ্রুত ঘূর্ণিত চক্র, একটি রমণীর কৃশ কটি, একখানি হাত, একটা শ্রান্ত শীর্ণ নগ্ন ভিক্ষুক, প্রভৃতি।

৫ বেহালাবাদক কুবেলিকের প্রতিকৃতি। শিল্পী পাবলো পিকাসোর চোখে যেমন লাগিয়াছে।

(৫ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। চিত্রের ব্যাখ্যা দেওয়া কিউবিস্টশাস্ত্রে নিষিদ্ধ, সুতরাং চিত্র পরিচয়ের বৃথা চেষ্টা হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম।

শেষ কথা এই যে, অত্যুক্তি জিনিসটা কোনো-না-কোনো আকারে শিল্পের মধ্যে থাকিবেই। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে মাথায় চড়িতে দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়। অবশ্য প্রত্যেকটি উক্তি সুসঙ্গত হইতেছে কিনা, তাহা দেখিবার জন্য মনের ভাবগুলিকে অহরহ অণুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করিতে হইবে, এরূপ উপদেশ কেহ দেয় না, কিন্তু অত্যুক্তি জিনিসটা অত্যাচারে পরিণত না হউক, শিল্পীর মনে যদি এরূপ কোনো অভিপ্রায় থাকে, তবে ভাবের সঙ্গে বস্তুজ্ঞানের একটা পরিচয় ঘটানো আবশ্যক। আর, সর্বোপরি আবশ্যক আত্মনিষ্ঠা। শিল্পীর অন্য দোষগুণ যাহাই থাকুক, এই জিনিসটি যদি থাকে, এবং যদি লোকে হাসিবে বা পাগল বলিবে এই ভয়ে তিনি আত্মগোপন না করেন, তবে তিনি আর কিছু লাভ করুন আর নাই করুন, আত্মপ্রকাশের স্বাভাবিক আনন্দ ও সার্থকতা হইতে বঞ্চিত হইবেন না।

ফটোগ্রাফি

কিছুদিন হইল বিলাতের ফটোগ্রাফি মহলে একটা তর্ক চলিতেছিল। তর্কের বিষয়—ফটোগ্রাফি আদৌ 'আর্ট' বলিয়া গণ্য হইতে পারে কিনা। প্রশ্নের কোনো মীমাংসা হইল না, হওয়া সম্ভবও বোধ হয় না। চিত্ররচনার কোনো প্রক্রিয়াবিশেষ 'আর্ট'-পদবাচ্য কিনা, এ বিষয়ে আন্দোলন করা পণ্ডশ্রম মাত্র। তুলিকার সাহায্যে কাগজে রঙ লেপিয়া চিত্রাঙ্কন করা যায় কিন্তু এই রঙ লাগানো ব্যাপারটার মধ্যে 'আর্ট' আছে কিনা সেটা কেবল 'ফলেন পরিচীয়তে।' 'আর্ট' জিনিসটা তুলি কাগজ রঙ বা ফটোগ্রাফিক ক্যামেরার মধ্যে থাকে না, শিল্পীর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যবোধ ও ভাবসম্পদেই তাহার জন্ম। শিল্পীর নিকট তুলি, পেন্সিল বা ফটোগ্রাফির সরঞ্জাম শিল্পরচনার অর্থাৎ ভাবকে শিল্পরূপে প্রকাশ করিবার, যন্ত্র বা উপায় মাত্র। ভাব যতক্ষণ মৌন থাকে, যতক্ষণ তাহা রেখাবর্ণাদি দ্বারা ব্যক্ত না হইয়া ভাবরূপেই অন্তরে সঞ্চিত থাকে ততক্ষণ তাহাকে শিল্প বলা যায় না।

এখানে একটা আপত্তি উঠিতে পারে। তুলি পেন্সিল বা কলম শিল্পীর আয়ত্তাধীন, এগুলিকে শিল্পী রেখাঙ্কন ও বর্ণপ্রয়োগার্থ যথারুচি ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু ফটোগ্রাফির লেন্স্ বা প্লেট তো তাঁহার ইচ্ছা-অনিচ্ছার অনুগত নহে। অকাট্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মধ্যে শিল্পীর ব্যক্তিগত কেরামতির স্থান কোথায়? আপত্তিটার মূলে যুক্তিযুক্ততা রহিয়াছে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক 'আর্ট' হিসাবে ফটোগ্রাফির ক্ষেত্র নিতান্ত সঙ্কীর্ণ বলিতে হইবে।

'ফটোগ্রাফি' বলিতে সাধারণত দৃষ্টবস্তুর 'চেহারা তোলা' বোঝায়। ইহাই ফটোগ্রাফির মূল কথা, অনেকের পক্ষে এখানেই তাহার চরম পরিণতি। ফটোগ্রাফির প্রথম সোপানে উঠিয়াই আমরা নিরীহ আত্মীয়স্বজনের মুখশ্রীকে অনায়ত্ত বিদ্যার পরীক্ষাক্ষেত্রে পরিণত করি এবং মনে করি ফটোগ্রাফির চূড়ান্ত করিতেছি। দুঃখের বিষয় এই আদিম অবস্থার উপরে ওঠা অনেকের ভাগ্যেই ঘটিয়া ওঠে না। কিন্তু যাঁহারা ইহার মধ্যে উচ্চতর আদর্শের অনুসরণ করেন, তাঁহারা জানেন যে ফটোগ্রাফি বিদ্যার অনুশীলনে সৌন্দর্য চর্চার যথেষ্ট অবকাশ পাওয়া যায়। 'সুন্দর' বস্তু বা

দৃশ্যের যথাযথ ফটোগ্রাফ লইলেই তাহা 'সুন্দর' ফটোগ্রাফ হয় না। কারণ, আমাদের চোখের দেখা ও ফটোগ্রাফির দেখায় অনেক প্রভেদ। জিনিসের গঠন ও আকৃতি ফটোগ্রাফে চাক্ষুষ প্রতিবিম্বেরই অনুরূপ হইলেও প্রাকৃতিক বর্ণবৈচিত্র্য ফটোগ্রাফে কেবল ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য মাত্রে অনূদিত হইয়া অনেক সময় ভিন্ন মূর্তি ধারণ করে। অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, সাধারণত হরিত পীতাদি উজ্জ্বল বর্ণ ফটোগ্রাফে অত্যন্ত ম্লান দেখা যায় এবং নীল ও নীলাভ বর্ণগুলি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইয়া পড়ে। সুতরাং আকাশের নীলিমা ও মেঘের শুভ্রতা সাধারণত একই রূপ ধারণ করায় সাদা কাগজ হইতে তাহাদের পার্থক্য করা কঠিন হইয়া পড়ে। শ্যামল প্রান্তরের মধ্যে প্রকৃতির স্নিগ্ধোজ্জ্বল কারুকার্য সাধারণ ফটোগ্রাফে একঘেয়ে কালির টানের মতো মিলাইয়া যায়। অবশ্য ফটোগ্রাফির বর্তমান উন্নত অবস্থায় এ সকল দোষের সংশোধন অসম্ভব নহে এবং বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ফটোগ্রাফে যথাযথভাবে প্রকাশ করিবারও উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কিন্তু শিল্পের দিক দিয়া আর একটি গুরুতর সমস্যা ও অন্তরায় রহিয়াছে। শিল্পী যখন প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য চয়নে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি অনেক অবান্তর বিষয়কে উপেক্ষা করিয়া চলেন, অনেক আনুষঙ্গিক অন্তরায়কে ত্যাগ করিয়া কেবল সৌন্দর্যটুকু আস্বাদ করেন। কিন্তু ফটোগ্রাফির নির্বিচার দৃষ্টিতে সুন্দরও নাই, অসুন্দরও নাই, আমার মন কতটুকু চায় বা না চায় তাহার সহিত কোনো সম্পর্কই রাখে না সুতরাং তাহার পক্ষে নীর ত্যাগ করিয়া ক্ষীর গ্রহণ একেবারেই অসম্ভব। এইজন্য ফটোগ্রাফের বিষয় নির্বাচনে বিশেষ সতর্কতা ও বিচার আবশ্যক এবং ফটোগ্রাফির চক্ষে বিষয়টাকে কিরূপ দেখাইবে তাহাও জানা প্রয়োজন। অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের আড়ম্বরে যদি শিল্পীর আসল বক্তব্যটাই চাপা পড়িয়া যায় তবে শিল্পের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইল বলিতে হইবে। সুতরাং চিত্রে মূল বিষয়গুলিকে যাহাতে যথাযথ প্রাধান্য দেওয়া হয় তদ্বিষয়ে সর্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিরূপ ভাবে কোন্ স্থান হইতে ছবি তুলিলে দৃশ্যের প্রধান উপাদানগুলি সুসংস্থিত হয় অর্থাৎ তাহারা পরস্পর বিরোধের দ্বারা চিত্রকে খণ্ডিত না করিয়া একটা শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের ভাব আনয়নের সহায়তা করে, কোন সময়ে, কিরূপ আলোকে ও অবস্থায় ফটো লইলে মূল বিষয়টি পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হইবার সম্ভাবনা, কিরূপে অনাবশ্যক বিষয়ের আতিশয্যকে দমন করা যায়, সেগুলিকে বর্জন করিয়া, ছায়ায় ফেলিয়া বা ফোকাস করিবার সময় স্পষ্টতার ইতর বিশেষ করিয়া অথবা অন্য কোনো উপায়ে কিরূপে তাহাদের প্রাধান্যকে সংযত করা যায় ইত্যাদি নানা বিষয়ে সম্যক বিচারশক্তি লাভ করা অনেক অভ্যাস ও অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ।

আমরা হাল্কাভাবে শিল্পচর্চা করি বলিয়াই শিল্প আমাদের আয়ত্ত হয় না। কেবল শিল্পের কথাই বা বলি কেন? বিজ্ঞান শতমুখে ফটোগ্রাফির ঋণ স্বীকার করিতেছে। বিজ্ঞানের এমন ক্ষেত্র নাই ফটোগ্রাফি যেখানে নূতন আলোক বিস্তার করে নাই, মানুষের জ্ঞানকে দৃঢ়তর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার সহায়তা করে নাই। ইহা কেবল অক্লান্ত উৎসাহ ও অনুরাগের ফল।

বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে অনেকেই ফটোগ্রাফীর চর্চা করিতেছেন। আশা করা যায় তাঁহাদের মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা বিরল নহে, যাঁহারা এই আশ্চর্য বিজ্ঞান-শিল্পকে কেবল কৌতূহলের ব্যাপার মাত্র মনে করেন না। তাঁহারা যদি তাহাদের ফটোগ্রাফী সাধনার কিছু কিছু নিদর্শন "প্রবাসী"-তে প্রেরণ করেন তবে তাহা বাছিয়া প্রতি মাসে দু একটি ছবি "প্রবাসী"-তে প্রকাশিত হইবে। "প্রবাসী"র পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা ফটোগ্রাফীর অনুশীলন করেন, এ বিষয়ে তাহাদের উৎসাহ দেখিতে পাইব, এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

ভারতীয় চিত্রশিল্প

ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে অনেক আলোচনাদি হইয়া গিয়াছে। আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে কিছু লিখিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, এত চেষ্টা-চরিত্র সত্ত্বেও আমাদের ন্যায় স্থূলবুদ্ধি লোকের কাছে ব্যাপারটা আদৌ পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে না। বিশেষত, ভারত-শিল্প প্রসঙ্গে গ্রীক ও অন্যান্য শিল্প প্রভৃতি নানাবিষয়ের অবতারণা ও সমালোচনা করায় অবস্থাটা নিতান্তই জটিল হইয়া উঠিয়াছে। অর্দ্ধেন্দ্রবাবু বা অপর কোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি যদি অনুগ্রহ করিয়া সহজ গদ্যে আমাদের আপত্তি ও সন্দেহাদির মীমাংসা করিয়া দেন তবে অনুগৃহীত হইব।

বোঝা গেল, ভারত শিল্পক্ষেত্রে বাস্তবিকতার কোনো সমাদর নাই। মক্ষিকাম্ন মসীজীবিবৎ দৃষ্টবস্তুর হুবহু অনুকরণ করিয়া যাওয়া ভারতীয় শিল্পের (শুধু ভারতীয় কেন, কোনো শিল্পেরই) উদ্দেশ্য নহে। ভারতীয় চিত্রশিল্পী প্রাকৃত ব্যাপারের কোনো ধার ধারেন না। তিনি "এনাটমি," "পার্সপেকটিভ" প্রভৃতি গ্রীক-শিল্পের "ঠুলি চোখে দিয়া শিল্পসাধনা করেন না। চিত্রাঙ্কনকালে, চিত্রের উপাখ্যান-বস্তুর বাস্তবিক আকৃতি কিরূপ, তাহার বর্ণ লাল, নীল, কি সবুজ, এ সকল বিষয়ে বিন্দুমাত্রও মনোযোগ দেওয়া তিনি আবশ্যক বোধ করেন না। তিনি চিত্র-বর্ণিত বিষয়ের চিন্তায় ধ্যানস্থ হইয়া মনশ্চক্ষে তাহার যেরূপ চেহারা দেখেন ঠিক তেমনটি করিয়া তাহাকে চিত্রিত করেন। প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সেটা তাঁহার কাছে যেরূপ বোধ হয় অথবা তাহার যে লোকপ্রসিদ্ধ আকৃতি তাঁহার চর্মচক্ষে প্রতিভাত হয় সে সকল বাস্তব ব্যাপার—ফ্যাক্ট্স্ অফ নেচার—সুতরাং সেগুলির সহিত তাঁহার কোনো সম্পর্ক নাই। মনোময় পুষ্পকরথে চড়িয়া কল্পনার মুক্ত আকাশে বিচরণ করাই তাহার বিশেষত্ব। জড়জগতে কি ঘটে না ঘটে, কোনটা সম্ভব কোনটা অসম্ভব, এ সকল আদৌ ভারতশিল্পের আলোচ্য বিষয় নহে। শিল্পক্ষেত্রে নেচারকে লইয়া টানা-হ্যাঁচড়া করা ও বিজ্ঞানসর্বস্ব জড়বুদ্ধি প্রধান পাশ্চাত্য জগতেই সাজে ইত্যাদি। তবে কি আমরা ইহাই বুঝিয়া লইব যে ভারতীয় চিত্রশিল্পে চিত্রবিজ্ঞানের কোনও স্থান নাই?

ভারতশিল্প অন্যান্য শিল্প অপেক্ষা "শ্রেষ্ঠ" কিসে? আদর্শের উচ্চতা-বশত? না এই পদ্ধতি অনুযায়ী চিত্রগুলির সৌন্দর্যাধিক্য-বশত? শ্রেষ্ঠ অশ্রেষ্ঠ বিচারের প্রণালী কি? কোন বিশেষ সৌন্দর্য ভারতশিল্পের একচেটিয়া সামগ্রী? শুনিতে পাই "আধ্যাত্মিকতা"ই ভারতশিল্পের প্রাণ ও তাহার শ্রেষ্ঠতার কারণ। এই তথাকথিত "আধ্যাত্মিকতা" কিরূপ বস্তু? চিত্রের নায়ক-নায়িকার চোখে মুখে যদি একটু তন্দ্রার ভাব দেখা গেল অথবা চারদিকে কুহেলিকার সৃষ্টি করিয়া শিল্পী যদি তন্মধ্যে একটু আলোকের আভাস দিলেন তবেই কি আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত হইল? তদুপরি যদি চিত্রে ভাবের অস্পষ্টতা লক্ষিত হয় এবং নায়ক বা নায়িকা যদি এনাটমি শাস্ত্রকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া তাঁহাদের অস্থিহীন অঙ্গভঙ্গীর কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি করিয়া বসেন তবে তো সোনায় সোহাগা! প্রায়ই তো দেখা যায় শিল্পের মধ্যে জাতীয় ভাব ও প্রকৃতির একটা ছাপ রহিয়াছে। ভারত শিল্পের উপরে যে ভারতীয় ধর্মভাবের একটা ছায়া পড়িবে তাহাতে বিচিত্র কি? কিন্তু ইহাতেই কি শিল্পের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইল, এবং শিল্প একেবারে "ঐশ্বরিকতার অভিব্যক্তি" হইয়া দাঁড়াইল?

কিন্তু "ভারতীয় শিল্পের সৌন্দর্য বাহিরে নয় ভিতরে।" চিত্রের যেটুকু বহিরংশ, যাহা শুধু চোখে দেখা যায়, সেটুকুই তাহার যথাসর্বস্ব নহে। তাহার প্রাণটি, অর্থাৎ শিল্পী তাঁহার হৃদয়ের যে ভাবের দ্বারা তাহাকে অনুরঞ্জিত করিয়াছেন সেই ভাবটিই তাহার আসল সৌন্দর্য (যদি ভাবটি

চিত্রে বোধগম্য হইয়া থাকে)। শিল্পমাত্রই রেখা বর্ণাদি দ্বারা মনের ভাবকে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা। ইহা ভারতশিল্পের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে, সকল শিল্পেরই ইহা একটা সাধারণ লক্ষণ। তবে, কেহ সোজাসুজি বক্তব্য বলিয়া যান, কেহ বা তাহাকে কবিত্ব উপমা অলঙ্কারাদি যোগ করিয়া দেন। কেহ প্রকৃতির দৃশ্য-বৈচিত্র্যের মধ্যে, কেহ নরনারীর মুখশ্রীতে বর্ণনীয় বিষয় দেখিতে পান, আবার কেহবা কল্পনার স্বপ্নরাজ্য হইতে চিত্রের উপাদান সংগ্রহ করেন। কিন্তু তিনি যে পথেই চলুন না কেন, সকলেরই গুরু নেচার। জগতে নিরবচ্ছিন্ন কল্পনার কোনো অস্তিত্ব নাই। বাস্তবজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই, নেচারকে অবলম্বন করিয়াই, কল্পনার উৎপত্তি। যাহাকে কল্পনায় ঘর বলিয়া কল্পনা করি তাহার ইট, সুরকি মালমশলা সবই নেচার হইতে চুরি। এরূপ না হইলে একজনের কল্পনা অপরের বোধগম্য হওয়া সম্ভবপর হইত না।

শিল্পী যে ভাবকে ব্যক্ত করিতে চাহেন, তাহার সহায়তার জন্য তিনি অতিরঞ্জনের আশ্রয় লইতে পারেন এবং নেচার হইতে সংগৃহীত উপাদানগুলি আবশ্যকমতো গ্রহণ বা বর্জন করিতে পারেন, ইহা কেহ অস্বীকার করে না। যে রসের অবতারণা করা শিল্পীর উদ্দেশ্য তাহা যদি চিত্রে পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবেই শিল্পী সাফল্য লাভ করিলেন বলিতে হইবে। কিন্তু নব্য ভারতশিল্পে সময়-সময়ে অপ্রাসঙ্গিক অদ্ভুত রসের যে প্রাচুর্য দেখা যায় সেগুলিও কি ভারতশিল্পের সাফল্যের নিদর্শন? চিত্র ব্যাখ্যাদিতে ইহার সমর্থনে এই যুক্তি দেওয়া হয় যে, কাব্যে আজানুলম্বিত বাহু আকর্ণবিস্তৃত নয়ন, নবদূর্বাদলশ্যাম প্রভৃতি অতিশয়োক্তিতে যখন কেহ আপত্তি করে না তখন চিত্রশিল্পেও এবম্বিধ আতিশয্য কখনোই প্রতিবাদযোগ্য হইতে পারে না। কিন্তু চিত্র ও কাব্যের মধ্যে যে একটা মৌলিক প্রভেদ আছে সেটাকে উড়াইয়া দিলে চলিবে কেন? কাব্যের "ভাষা" নামক জিনিসটা কতকগুলি নির্দিষ্ট শব্দ বা তৎসূচক চিহ্নাদি দ্বারা ভাব বিনিময়ের একটা সাংকেতিক উপায় মাত্র। কিন্তু চিত্রের ভাষায় মূলত এরূপ কোনো কৃত্রিমতা নাই। কবি তাঁহার মানসমূর্তিকে ভাষায় বর্ণনা করেন, কিন্তু চিত্রকার সেই মূর্তিকেই চক্ষের সমক্ষে ধরিয়া দিতে চেষ্টা করেন। কবির পরোক্ষচিত্রে যে অতিশয়োক্তি দূষণীয় বোধ হয় না, শিল্পে "তাহা অক্ষরে অক্ষরে অনূদিত" হইয়া প্রত্যক্ষ মূর্তি পরিগ্রহ করিলে তাহাকে উদ্ভট ছাড়া আর কি বলা যায়?

কাব্যের ন্যায়, শিল্পেও অলঙ্কার ও উপমার স্থান আছে কিন্তু সেই অলঙ্কার ও উপমা ব্যাপারটাই যখন সর্বেসর্বা হইয়া উঠিতে চায় তখনই আশঙ্কার কথা। বিশেষত কাব্যের কৃত্রিম উপমাপদ্ধতিকেই যখন "উচ্চশিল্পের" আদর্শ ধরিয়া লওয়া হয়। আরও ভয়ের কারণ এই যে, ভারত-শিল্পোৎসাহীগণ "আর কোনো সৌন্দর্যের আদর্শ তাহাদের রচনায় স্থান পাইবে না" কেবল এই বলিয়াই ক্ষান্ত নহেন, তাঁহারা দস্তুরমতো কোমর বাঁধিয়া ইউরোপীয় শিল্পের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত। ইঁহাদের মতে "ভারতশিল্প" লেবেল যাহাতে আঁটা নাই, তাহা আমাদের আলোচ্য হইতেই পারে না এবং তাহাতে আমাদের শিক্ষণীয় কিছু থাকা অসম্ভব! যুক্তিস্বরূপ বৈদেশিক ভাষার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলা হয় "বিদেশীয় ভাষায় কাব্য লিখিয়া কে কবে যশস্বী হইয়াছে?" তবে কি এই যুক্তি অনুসারে বিদেশীয় ভাষার চর্চা করাও নিষিদ্ধ হইবে? তাছাড়া দুইটা স্বতন্ত্র ভাষার মধ্যে যে সকল মৌলিক প্রভেদ দেখা যায়, আদর্শ ও উপায়ের আত্যন্তিক অনৈক্য সত্ত্বেও ভিন্ন-ভিন্ন চিত্রশিল্পের মধ্যে এ প্রকার বিভিন্নতা কুত্রাপি লক্ষিত হওয়া সম্ভব নহে। কারণ, চিত্রের ভাষা মূলত এবং স্বভাবত বিশ্বজনীন।

সৌভাগ্যের বিষয় যাঁহারা হাতে কলমে "ভারতশিল্প কী" তাহা দেখাইতেছেন, তাঁহারা অনেক সময়েই কার্যক্ষেত্রে এই সকল বিচিত্র মতের একান্ত বশ্যতা প্রদর্শন করেন নাই। বেশি কথায় কাজ কি, হ্যাবেল সাহেবের মতে "অবনীন্দ্রবাবুর চিত্রাংকন-পদ্ধতি ইউরোপীয় ও ভারতীয় পদ্ধতির সংমিশ্রণ।" ইহাতে অবনীন্দ্রবাবু ও তাঁহার শিষ্যগণের অংকিত চিত্রাদির "ভারতীয়ত্ব" কিছু ক্ষুণ্ণ

হইতে পারে কিন্তু তজ্জন্য ঐ সকল চিত্রাদি "খেলো" হইয়া গিয়াছে, আশা করি এরূপ কথা কেহ বলিবেন না। এই জাতীয় অনেক চিত্রেই যে সৌন্দর্য দেখিতে পাওয়া যায়, চিত্রের "ভারতীয়তাই" তাহার একমাত্র বা সর্বপ্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয় না। শিল্পকে যিনি যে ভাবে দেখিতেছেন তিনি সেইভাবে তাহার সাধনা করিবেন। গ্রীকশিল্প বা রোমীয়শিল্প ঐ পথে গিয়াছে অতএব তোমার আমার ও পথে গতির্নাস্তি—এ কোন-দেশীয় যুক্তি? আমাদের আর অন্য গতি নাই, "এই যে ভারতশিল্প-রূপ কল্পতরু, আইস, আমরা ইহারই সুশীতল ছায়ায় বসিয়া বর্তমান ইউরোপীয় শিল্পকে মর্তমান দেখাই।" ভারত শিল্প-প্রচারার্থিগণ শিল্পকে যে ভাবে দেখিতেছেন, কেহ যদি ঠিক সে ভাবে না দেখে, তবেই কি তাহাকে "উচ্চশিল্পের" রসগ্রহণে অক্ষম ঠাওরাইতে হইবে? সকল লোকে এক পথে যায় না, সকলের রুচি বা প্রকৃতিও এক নহে। রাফায়েল, রস্কিন, বা শুক্রাচার্যের দোহাই দিয়া মনকে একটা বিশেষ ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন এবং সে চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনাও কম। প্রকৃত শিল্পী অন্তর্নিহিত শিল্পবৃত্তির চরিতার্থতার জন্যই শিল্প-সাধনা করেন। "ভারতীয়" শিল্প "গ্রীক" শিল্প প্রভৃতি নামধারী প্রথা-বিশেষের খাতিরে নহে।

নব্যপন্থী চিত্রকরগণ শিল্পের যে আদর্শ পাইয়াছেন তাঁহারা নিষ্ঠার সহিত তাহার অনুসরণ করিবেন, ইহাতে কাহারও আপত্তির কারণ হইতে পারে না। হয়তো ভাবপ্রধান শিল্পের এরূপ একটা পুনরুত্থান বর্তমান সময়ে এদেশে বিশেষ আবশ্যক হইয়া থাকিবে। প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বাড়াবাড়ির মাত্রাটাও একটু উৎকট হইয়া পড়া কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু ব্যাধি অপেক্ষা চিকিৎসাটা যেন ভয়ঙ্কর হইয়া না ওঠে। নবশিল্পের শাস্ত্রকারগণ যদি অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া, কল্পনার দিব্য চশমাটির উপর অত্যধিক মায়াবশত চিত্রবিজ্ঞানের "ঠুলি"টিকে আবর্জনা জ্ঞানে ফেলিয়া দেন, এবং নিজ শিল্পের মধ্যে একটা বিশেষ অনন্যলভ্য "দৈব" সম্পদ কল্পনা করিয়া, "এই আদর্শই সকলের অবশ্য শিরোধার্য" বলিয়া জেদ ধরেন, ও একাধারে বাদী, উকিল, জজ ও জুরি হইয়া যাবতীয় শিল্পের দোষগুণ মীমাংসায় প্রবৃত্ত হন, তবেই ভয় হয় বুঝি বা "অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বুরের" ন্যায় সব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ায় পরিণত হয়।

২

আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ভারতশিল্প সমস্যার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে তিনি যদি আমার বক্তব্যগুলিকে একটু বুঝিতে চেষ্টা করিতেন তবে কতকটা সুবিধা হইত। কুসংস্কার ও শ্রদ্ধাহীনতা যে সত্যনির্ণয়ের পক্ষে মস্ত বাধা তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু আমার ধারণা এই যে, শিক্ষিত সমাজ কর্তৃক ভারতশিল্পের প্রকৃত মর্মোপলব্ধির পথে অর্ধেন্দ্রবাবু প্রমুখ শিল্পোৎসাহীগণের ব্যাখ্যাদিও একটা কম অন্তরায় নহে। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য সংক্ষেপত এই—

১. ভারতশিল্পের আদর্শ ও বিশেষত্ব বিষয়ে ইঁহারা যাহা বলিতেছেন তাহা খুব সমীচীন বোধ হয় না। যে বস্তুটাকে ইঁহারা "ভারতশিল্প" আখ্যা দিয়াছেন সেটা শিল্পের একটা অসম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র।

২. উক্ত আদর্শের সহিত পাশ্চাত্য বাস্তবশিল্পের যে অহি-নকুল সম্বন্ধ কল্পনা করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অমূলক ও অযৌক্তিক এবং প্রকৃতি ও শিল্পের সম্বন্ধ বিষয়ে ভ্রান্তধারণা সম্ভূত। "শিল্প জগতের সূক্ষ্মতত্ত্ব" সম্বন্ধে সূক্ষ্মতর গবেষণায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে এই সকল বিষয়ে একটা পরিষ্কার বোঝাপড়া হওয়া প্রয়োজন।

শিল্পজগতের বাজারে ভারতশিল্প বা অপর কোনো শিল্পের দর কিরূপ তাহা জানিবার জন্য আমার কিছুমাত্র ব্যস্ততা নাই। রসেটি, বার্ন, জোন্স, স্পেনসার বা বৈষ্ণব কবিদিগের বিরুদ্ধে আমার

কোনো অভিযোগ নাই, সুতরাং বর্তমান আলোচনা ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে সদলে হাজির করিবার কারণ বুঝিলাম না। হিন্দুশাস্ত্র ও পুরাণবিদ্বেষী পৌত্তলিক শিল্পের বিরুদ্ধে উদ্যতমূষল কোনো অজ্ঞাত প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যে প্রচণ্ড কটাক্ষপাত করিয়াছেন, উপস্থিত আলোচনা প্রসঙ্গে তাহার প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। শিল্পের উৎকর্ষ পরিমাপক কোনো আইন বা আদর্শ মাপকাঠি সম্বন্ধে আমি কোথাও কোনো মত জাহির করি নাই। কিন্তু গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ছাড়িবেন কেন? তিনি স্বয়ং কতগুলি "উদ্ভট" মত খাড়া করিয়া আমার স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছেন।

অর্ধেন্দ্রবাবুর মতে পুরাণাদি-বর্ণিত কল্পলোকের বস্তুকল্পনাকে চিত্রে যথাযথভাবে (অর্থাৎ 'অক্ষরে-অক্ষরে') অনুবাদ করাই ভারতশিল্পের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নাই। উক্ত কল্পনাগুলিকে উদ্ভট জ্ঞানে "ছাঁটিয়া ফেলিবার" প্রস্তাব কেহ করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই কিন্তু সত্যসত্যই "পৌরাণিক কল্পলোকে বিচরণ করিবার যাঁহাদের রুচি নাই" সে দুর্ভাগ্যদের অবস্থা কি হইবে? তাঁহাদের পক্ষে কি শিল্পচর্চা নিষিদ্ধ হইবে? বাস্তব জগতে কি "উচ্চশিল্পের" উপযোগী মাল-মশলার কিছু অভাব পড়িয়াছে? প্রকৃতির রাজ্যে যিনি উচ্চ সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছেন, অর্ধেন্দ্রবাবুর ভারতশিল্পে যদি তাঁহার কোনো স্থান না থাকে, তবে সে শিল্পকে নিতান্তই অসম্পূর্ণ বলিতে হইবে।

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেছেন, 'আজানুলম্বিত' বাহু প্রভৃতি বর্ণনার দ্বারা নায়ককে "উচ্চশ্রেণীর মানবত্বে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, যাহার আদর্শ বাস্তবিক জগতের সাধারণ অবয়বী মানুষের আদর্শ হইতে সর্বথা ভিন্ন।" এই 'আদর্শ' জিনিসটা কোথা হইতে আসিল? এই সকল অতিশয়োক্তি কি কেবলি নিরঙ্কুশ কল্পনা মাত্র? যেটা 'আছে' সেটার সহিত সম্যক পরিচয় না হইলে, যেটা 'হইতে পারিত' বা 'হইলে ভালো হইত' সেটাকে পরিষ্কাররূপে বোঝা যায় না। অতিপ্রাকৃত ও অবাস্তব আদর্শ বুঝিতে হইলে প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ থাকা প্রয়োজন, বাস্তব জগতের অসম্পূর্ণতার সহিত পরিচয় আবশ্যক। প্রকৃতির অর্থাৎ জড়প্রকৃতির ও মানবপ্রকৃতির অপূর্ণ বৈচিত্র্যের মধ্যেই পূর্ণতার আদর্শ ও আইডিয়া নিহিত রহিয়াছে। রিয়ালিজম্ ও আইডিয়ালিজম্, বাস্তবশিল্প ও ভাবপ্রধান শিল্প, শিল্পের দুইদিক মাত্র। উভয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকা দূরে থাকুক, একটার সহায়তা ব্যতীত আর একটা কখনো সম্যক সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। রিয়ালিজম্ শিল্পের মূল ভিত্তি, আইডিয়ালিজমে তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ, এবং উভয়ের সমন্বয়ে তাহার পূর্ণ সফলতা। অর্ধেন্দ্রবাবুর ভারতশিল্প যদি পাশ্চাত্য বাস্তবশিল্পের সংঘর্ষে আসিলেই আশু শিল্পলীলা সংবরণের আশঙ্কা থাকে, তবে সে শিল্পের রীতিমতো এলোপ্যাথি চিকিৎসা আবশ্যক বুঝিতে হইবে।

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, "রায়মহাশয় চিত্রবিজ্ঞান বলিতে যাহা বুঝিয়াছেন তাহা য়ুরোপীয় শিল্পের...প্রথা বিশেষ মাত্র।" বিলক্ষণ? "প্রথা বিশেষ মাত্র"ই যদি বুঝিব, তবে তাহাকে "বিজ্ঞান" নামে অভিহিত করিব কেন? অর্ধেন্দ্রবাবুর অভিধানে 'বিজ্ঞান' শব্দের অর্থ কি তাহা জানি না, কিন্তু সাধারণ লোকে বিজ্ঞান বলিতে সিস্টেমাটাইজড্ নলেজ বা সুনিয়ন্ত্রিত জ্ঞান বুঝিয়া থাকে। চিত্রবিজ্ঞান অর্থে 'যদ্দৃষ্টংতল্লিখিতং' নীতি নহে। অস্থিবিদ্যায় পাণ্ডিত্যকেও চিত্রবিজ্ঞান বলা যায় না। 'মানবজাতির বহুমুখী শিল্পসাধনার' সীমা বা সমষ্টির নামও চিত্রবিজ্ঞান নহে। আলোকবিজ্ঞান (অপটিকস্) ও তৎসংক্রান্ত শারীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সর্বজনীন সত্যের উপর চিত্রবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। চিত্রবিজ্ঞানকে বুঝিতে হইলে কেবল কতকগুলি 'আইন' করিলে চলিবে না—দৃশ্য সৌন্দর্যের অন্তরালে যে সকল বিচিত্র নিয়ম কার্য করিতেছে—"উহার সহিত সহৃদয় সর্বাঙ্গীণ পরিচয় আবশ্যক", (ভাব প্রকাশের সহায়তার জন্যই আবশ্যক, অনুকরণ বিদ্যা জাহির করিবার

জন্য নহে) অবশ্য বিজ্ঞানই শিল্পরাজ্যের নিয়ন্তা নহে এবং প্রকৃতিকে বিজ্ঞানের ঘানিতে নিংড়াইলেই খাঁটি শিল্পরস নিস্যন্দিত হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া শিল্পের বিজ্ঞানাংশকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। বিজ্ঞানের ফ্যাকটস্ ইংরাজের পক্ষে যেরূপ সত্য, অর্ধেন্দ্রবাবুর পক্ষেও তদ্রূপ। শিল্পে কেবল বাস্তব সৌন্দর্যটাই যে সর্বেসর্বা হওয়া উচিত নয়, এ সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তন্মধ্যে প্রাকৃতিক সত্য বিষয়ে অজ্ঞতা বা তৎপ্রকাশে অক্ষমতা একটা খুব উঁচুদরের কৈফিয়ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। শিল্প ও প্রকৃতির মধ্যে যখন একটা কৃত্রিম বিরোধ জাগিয়া ওঠে তখনই শিল্প উৎকেন্দ্র হইয়া কতকগুলি ফ্যাশান, রচনাভঙ্গী ও ভড়ং (ম্যানারিজম্) মাত্রে পর্যবসিত হইতে থাকে। শিল্পের সর্বজনিনতার কথা উঠিলেই এক্ শ্রেণীর লোকে ভারতশিল্পের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব লোপের অমূলক আশংকায় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন, এবং "ভারতের শিল্পসাধনার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রাখা কত বড় ধর্ম, কত বড় দায়িত্ব" তাহা বুঝাইবার জন্য অনর্থক আকাশ-পাতাল তোলপাড় করিয়া তোলেন।

কোনো বস্তু বা ভাব ও তৎসূচক ভাষাগত সংকেতের মধ্যে কোনো সম্পর্ক বা সৌসাদৃশ্য দেখা যায় না। 'পা' এই লিপি বা শব্দটির সহিত শরীরের অবয়ব বিশেষের কোনো সাক্ষাৎ যোগ নাই, একজন বিদেশীর পক্ষে শব্দটা শব্দ মাত্র। লিপিটা আঁচড় মাত্র সুতরাং নিরর্থক। "কিন্তু চিত্রের ভাষায় মূলত এরূপ কোনো কৃত্রিমতা নাই।" 'পা' বুঝাইতে হইলে 'পা' আঁকিয়া দেখাইতে হইবে। জগতে হাজার-হাজার পা দেখিতে পাই, তাহার কোনো দুটিই একরকম নহে, অথচ সবগুলির মধ্যেই একটা মৌলিক সাদৃশ্য রহিয়াছে অর্থাৎ সবগুলিই একটা আদর্শ প্যাটার্ন বা ছাঁচের রূপান্তর (ভেরিয়েশন) মাত্র। সকল বস্তুরই প্যাটার্নটিকে বজায় রাখিয়া ভিন্ন-ভিন্ন লোকে ভিন্ন-ভিন্ন ধরনের আদর্শের কল্পনা করিয়া থাকে। কিন্তু "আদর্শ ও উপায়ের আত্যন্তিক অনৈক্য সত্ত্বেও" এক শিল্পী 'মানুষ' বুঝাইতে চাহিলে অপর শিল্পীর তৎস্থানে 'হস্তী' বা 'ঢেঁকি' বুঝিবার.কোনো সম্ভাবনা থাকে না। ইহা অবশ্য নিতান্ত স্থূল বিষয়ের কথা হইল কিন্তু মানসিক ভাব বর্ণনের সময়ে কি হইবে? মানসিক অবস্থাকে আমরা সাক্ষাৎভাবে দেখিতে পাই না। মানুষের মনে দুঃখ, ক্রোধ, হিংসা, ভয় প্রভৃতি ভাবের উদয় হইলে তাহার মুখশ্রী ও শরীরভঙ্গীর যেসকল বিকার লক্ষিত হয়, মানসিক ভাবের ঐ সকল বহিঃপ্রকাশ হইতেই চিত্রে সেই ভাবগুলি ব্যক্ত করিবার সঙ্কেত পাওয়া যায়। অবাস্তব কল্পনা সম্বন্ধেও সেই কথা। অবাস্তবকে কতগুলি জ্ঞানত বাস্তবের রূপান্তর বা নূতন রকম সমাবেশ রূপেই ('ইন্ টার্মস্ অফ নোন রিয়ালিটিজ') আমরা কল্পনা করিয়া থাকি। সুতরাং "অলৌকিক রসের অবতারণা" করিতে হইলে লৌকিকের জ্ঞানটা একটু বিশেষ মাত্রায়ই আবশ্যক। একই বস্তুর অসংখ্য বিচিত্র রূপের মধ্যে হইতে তাহার আদর্শ চেহারা বা মূল ভাবটিকে ধরিবার চেষ্টা হইতেই কন্‌ভেনশন্-এর উৎপত্তি। এই কন্‌ভেনশন্-এর অর্থ কৃত্রিমতা নহে। কিন্তু অর্ধেন্দ্রবাবু আশ্বাস দিয়াছেন যে "ইংরেজি চিত্রবিজ্ঞানের পাতা উলটাইলেই" দেখিতে পাইব যে "কৃত্রিমতা চিত্রবিজ্ঞানের প্রাণ বা প্রধান সম্পত্তি।" সেই অপরূপ চিত্রবিজ্ঞানের সন্ধান কোথায় পাওয়া যায় জানাইলে বাধিত হইব। চিত্রের ভাষার যেখানে উৎপত্তি, যেটা তাহার মূল ভিত্তি, অর্ধেন্দ্রবাবু ভারতশিল্প তাহার সহিত পরিচয় স্থাপন দূরে থাকুক তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেও নারাজ। অথচ এদিকে খুব একটা "বিশিষ্ট ভাষায়" আত্মপ্রকাশ করিবার উৎকট চেষ্টাও রহিয়াছে। "ঢাল নাই তলোয়ার নাই খামচা মারেঙ্গে।"

শিল্পে ব্যক্তি এবং জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্বের স্থান আছে কিন্তু সেটা "মৌলিক ভাষাগত অনৈক্য" নহে—"অলঙ্কার।" রচনাভঙ্গী, আদর্শ ও বক্তব্য বিষয়ের পার্থক্য মাত্র। এই পার্থক্য খুব গুরুতর হইতে পারে সন্দেহ নাই কিন্তু তথাপি ইউরোপীয় প্রি-র‍্যাফেলাইটগণ যে ভাষার

ব্যবহার করেন ইম্প্রেশনিস্টগণও সেই ভাষাই ব্যবহার করেন, প্রকৃতির নিখুঁত নকলনবিশের যে ভাষা নব্য ভারতশিল্পের উদ্ভটতম কল্পনানবিশেরও সেই ভাষা। অবশ্য শিল্পকে উপলব্ধি করিতে হইলে শিল্পের আখ্যানবস্তুর সহিত সম্যক পরিচয় আবশ্যক। শিল্পী আলো ও ছায়ার বৈচিত্র্যমূলক কোনো সৌন্দর্যকে চিত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন কিন্তু আমার উক্ত বিষয়ক বিদ্যার দৌড় হয়তো "গাছের পাতা সবুজ" "আকাশের রঙ নীল" ইত্যাদিবৎ কতকগুলি স্থূল সংস্কার পর্যন্ত। সুতরাং চিত্রবর্ণিত নিতান্ত স্বাভাবিক সত্যটিও আমার নিকট অদ্ভুত প্রতীয়মান হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু অর্ধেন্দ্রবাবু এই ব্যাপার হইতে এই তত্ত্বোদ্‌ঘাটন করিয়াছে যে চিত্রের লাইট্ এণ্ড শেড, আলো ও ছায়া জিনিসটাও একটা কনভেনশন, বা "বিশিষ্ট ভাষা।" এই মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কারের বাহাদুরিটা কাহার জানিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

'ব্রাহ্ম ও হিন্দু' প্রবন্ধের প্রতিবাদ

আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের তত্ত্ববোধিনীতে 'ব্রাহ্ম ও হিন্দু' শীর্ষক আলোচনায় অজিতবাবু ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে যে সকল মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন, সে বিষয়ে কয়েকটি আপত্তি জানান আবশ্যক বোধ করিতেছি। ব্রাহ্মগণ হিন্দু কিনা, অথবা কি অর্থে এবং কি পরিমাণে হিন্দু বা অহিন্দু এবং আপনাকে হিন্দু বলা না বলায় কাহারও মঙ্গলামঙ্গলের কোন তারতম্য ঘটে কিনা, ইত্যাদি তর্কের বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ না করিয়া আমি সংক্ষেপে দু'একটি কথা নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি।

ব্রাহ্মসমাজের হিন্দুত্ব বা অহিন্দুত্ব বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ কোথাও কোন মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন, বা করা আবশ্যক বোধ করিয়াছেন বলিয়া স্মরণ হয় না। ১৮৭২-এর ৩ আইনে ব্রাহ্ম বিবাহার্থীকে 'হিন্দু নহি' বলিতে হয় বটে—কিন্তু সেস্থলে 'হিন্দু' বলিতে কোন ঐতিহাসিক লক্ষণাক্রান্ত মহাজাতি বা সভ্যতার ধারা বুঝায় না—আইন স্বয়ং সেখানে হিন্দুত্বের একটা বর্তমান সঙ্গত সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন মাত্র। ইহাও সর্বজনবিদিত যে, ব্রাহ্মসমাজ উক্ত অহিন্দুত্বমূলক পবিচয়কে আপত্তিজনক বিবেচনা করায়, আইন সংশোধনার্থ ব্রাহ্মসমাজের তরফ হইতে একাধিকবার চেষ্টা করা হইয়াছে। 'হিন্দু' ও 'ব্রাহ্ম' শব্দের নানারূপ সংজ্ঞা ও তাৎপর্য অবলম্বন করিয়া কোন কোন ব্রাহ্ম 'হিন্দু' 'অহিন্দু' 'ব্রাহ্মহিন্দু' 'হিন্দুব্রাহ্ম' প্রভৃতি পরিচয়ের পক্ষপাতী হইয়াছেন সত্য, কিন্তু এই সকল মত-বিভিন্নতায় কেবল ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, এ বিষয়ে 'ব্রাহ্মসমাজের মত' বলিয়া কোন একটা বিশেষ মত ব্যক্ত করা সম্ভব নহে। ব্রাহ্ম সমাজ আপনাকে হিন্দু বলেন না, অহিন্দুও বলেন না—সুতরাং "হিন্দু নামেই ব্রাহ্মগণের বিশেষ আপত্তি আছে"—কথাটার কোন রূপ অর্থ হয় না। অবশ্য ব্রাহ্মসমাজ প্রাচীন সমাজের সহিত আদ্যোপান্ত সদালাপে প্রবৃত্ত থাকেন নাই এবং আপোষে হিন্দুনামরূপ সূত্রকে আশ্রয় করিয়া থাকাকে হিন্দুসমাজের সহিত আন্তরিক যোগরক্ষার খুব একটা প্রকৃষ্ট উপায় বিবেচনা করেন নাই। কিন্তু এই অপরাধে ব্রাহ্মসমাজকে "পূর্বাপর বিচ্ছিন্ন স্বদেশবিচ্ছিন্ন জাতীয়তার বন্ধনবিচ্ছিন্ন একটা স্বপ্নপদার্থ" বলিলে অত্যুক্তির কিছু বাড়াবাড়ি হয় না কি? এবং ইহাও কি বুঝাইয়া বলা আবশ্যক যে, "নিজেকে স্বতন্ত্র করিয়া, অহিন্দু বলিয়া, দেশের সাধনার সহিত যোগবিচ্ছিন্ন হইয়া" দেশের ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তুলিবার উৎকটপন্থাকেও ব্রাহ্মসমাজ অবলম্বন করেন নাই?

অজিতবাবুর মতে, আদিসমাজ—অর্থাৎ আদিসমাজভুক্ত পরিবার বিশেষের প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ—যে সাফল্যের নিদর্শন দেখাইতে পারিয়াছেন, তাহার কারণ 'আদি সমাজ আপনাকে হিন্দু বলিয়াছে'! কথাটা নিতান্তই প্রমাণসাপেক্ষ নহে কি? অপরদিকে আপনাকে হিন্দু না বলায় 'অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজের' কি শোচনীয় পরিণাম হইয়াছে, অজিতবাবুর প্রবন্ধে সে কথাটাও চাপা পড়ে নাই। অজিতবাবু 'অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজ'কে কি পরিমাণ জানেন বা বুঝিয়াছেন, সে প্রশ্ন তুলিব না; কিন্তু অজিতবাবুকে আমরা বিনীতভাবে অনুরোধ করি, তিনি একবার সমালোচকের আসন হইতে নামিয়া আসুন—এবং ব্যক্তি বিশেষে বা পত্রিকা বিশেষে কোথায় কি মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন, সেকথা ভুলিয়া গিয়া, যেখানে ব্রাহ্ম সমাজের প্রাণশক্তি আপনাকে জানিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে, তাহারই মধ্যে একবার প্রবেশ করিয়া দেখুন। নিয়মচক্রে তৈল প্রদান করা, এখনও ব্রাহ্মসমাজে মনুষ্যত্বের চরম ব্যবসায় হইয়া দাঁড়ায় নাই। "দেশের ইতিহাস, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব" তাহার দ্বার হইতে হতাশ হইয়া ফিরিবার কোন কারণ দেখে নাই। বলিতে কি মতের ও সম্প্রদায়ের বন্ধন ও বাক্যের আড়ম্বর ব্যতীতও সেখানে দেখিবার এবং শিখিবার জিনিস যথেষ্ট আছে; এবং অজিতবাবু সহসা বিশ্বাস করিবেন কিনা জানি না—সৌন্দর্যজ্ঞান বা রসবোধ জিনিসটাও সেখানে একেবারেই অপরিচিত নহে।

অজিতবাবু যাহাকে মাঙ্গলিক 'শিল্পচিহ্ন' বলিতে চাহেন, অনুষ্ঠানাদিতে তাহার প্রচুর ব্যবহারই যে শিল্পবোধের পরিচায়ক, একথা আমি আদৌ বিশ্বাস করি না; এবং যাঁহারা অনুষ্ঠান আড়ম্বরাদির বাহুল্য মাত্রেই আপত্তি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের আপত্তিগুলি সমীচীন হউক আর নাই হউক, কেবল এই কারণে তাঁহাদিগকে একেবারে শুচিবায়ুগ্রস্ত, রসজ্ঞান বর্জিত শুষ্কনীতিপরায়ণ পিউরিটান মনে করিবার কোন সমুচিত কারণ দেখি না। এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক বোধ করি যে, যথেষ্ট মাত্রায় প্রতিবাদের সংস্রব থাকিলেই কোন ব্যাপার 'প্রতিবাদমূলক' হইয়া দাঁড়ায় না। মানুষ যখন জাতীয় জীবনের সুস্থতাকে আপনার মধ্যে অনুভব করে, তখন সে অনুভূতি তাহার শিল্প ও সাহিত্যে সংক্রামিত হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু শিল্পবোধ জিনিসটাকে যে সকল ক্ষেত্রেই জাতীয়তামূলক হইতে হইবে এবং জাতীয়তার গন্ধ মাখিয়া কোন জাতীয় উপাধিরূপ বৃন্তকে আশ্রয় করিয়াই যে তাহাকে ফুটিতে হইবে, কোন্ দেশের কোন্ শিল্পের ইতিহাস এরূপ শিক্ষা দেয় তাহা জানি না। জাতীয়তাবোধের প্রশ্রয় দিলে বিশ্বজনীনতার মর্যাদা রক্ষিত হয় না, এরূপ একটা অদ্ভুত যুক্তিকে ব্রাহ্মসমাজের স্কন্ধে চাপাইবার কোন ন্যায়সঙ্গত হেতু ঘটে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সকল জিনিসকে "হিন্দু সাধনার ছাঁচে ঢালাই করিয়া—হিন্দুসাধনার রূপই তাহাদিগকে রূপান্তরিত" করিয়া লইতে হইবে—এত বড় আবদার মানিয়া লওয়াও বড় সহজ নহে;— এবং কথাটা শুনিতে যতটা পরিষ্কার ও মোলায়েম, কার্যকালে একেবারেই সেরূপ সুস্পষ্ট বা সহজসাধ্য বোধ হয় না।

মানুষ আপনার আত্মরূপকে জানুক, ইহাই তাহার সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ শিক্ষা। তাহার হিন্দুরূপ বা ব্রাহ্মরূপ, জাতীয় ও সামাজিক রূপ, অথবা বাহ্য আচরণ ও সংস্কারগত রূপকে প্রাধান্য দিবার জন্য এক শ্রেণীর মানুষের খুব ব্যস্ততা দেখা যায়। পাছে সমন্বয়ের আতিশয্যে মানুষের দেশকালগত বিশেষত্ব লোপ পাইয়া একটা বর্ণবৈচিত্র্যহীন কিম্ভূতকিমাকার পদার্থ গড়িয়া উঠে, এই ভয়ে ইঁহাদিগকে অনেক সময়ে অকারণ উৎকণ্ঠিত থাকিতে হয়। বাহিরের উপাদানকে আয়ত্ত করিতে হইলে, মানুষ স্বভাবতই তাহাকে নিজ প্রকৃতির ছাঁচেই ঢালাই করিয়া লয়, এবং

আপনার রুচি ও সংস্কারের খাতিরেই ইচ্ছামত গ্রহণ ও বর্জন করে, তাহাতে হিন্দুত্বের ছাঁচ ক্ষুণ্ণ হয় কিনা, সে চিন্তায় অযথা মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি? যদি বা স্থলবিশেষে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য উৎকেন্দ্র হইয়া তাহার জাতিগত বিশেষত্বকে গ্রাস করিয়া বসে, তাহাতেই বা মর্মাহত হই কেন? আর অজিতবাবু যাহাকে 'হিন্দুত্ব' বলেন, সেই অজ্ঞাতলক্ষণ পরিচয় তত্ত্বটিকে অমন ব্যাকুলভাবে লেপকাঁথা চাপা দিয়া পুষিবারও ত কোন আবশ্যকতা দেখি না। এবং ব্রাহ্মসমাজের ঝুঁকি যে হিন্দুসমাজ হইতে উত্তরোত্তর বিচ্যুতির দিকেই চলিয়াছে, একথাও আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। ব্রাহ্মসমাজের আপাত ব্যর্থতার অসংখ্য নিদর্শন উল্লেখ করা যায়, কিন্তু আপনাকে হিন্দু বলিলে বা গোড়া হইতেই হিন্দুনাম রূপ পরিচয় লক্ষণকে স্বীকার করিয়া লইলে কি যে সাফল্যের সম্ভাবনা ঘটে, তাহা ত বুঝিতে পারি না। বাহিরের অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তারিত গবেষণা করিয়া তবে আপনাকে চিনিব, এরূপ একটা পরোক্ষ পরিচয়ে কোন কালেই যথার্থ আত্মপ্রত্যয় লাভ হয় না। ব্রাহ্মসমাজ আগে তাহার নিজ স্বরূপকে চিনিতে শিখুক, নিজের চিন্তা ও জ্ঞান, সাধনা ও অনুভূতির দ্বারা আপনাকে উপলব্ধি করুক। সে হিন্দু, কি অহিন্দু, বাহিরে জগতের কাছে তাহার পরিচয় লক্ষণ কি, ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধানের জন্য ব্যস্ত না হইলেও তাহার কোন ক্ষতি নাই। আসলে যাহা মানুষের একান্ত নিজস্ব পরিচয়, তাহার ব্যাখ্যা বা নামকরণ চলে না—তাহাকে পরিচিতের পর্যায়ভুক্ত করাতেও বিশেষ কোন লাভ নাই। সুতরাং ব্রাহ্মই বলি আর হিন্দুই বলি, পরিণামে কোন নামেরই বড় একটা সার্থকতা থাকে না। ব্রাহ্মসমাজ আপনার 'ক্ষুদ্র সমাজ'কে যথেষ্ট জরুরী মনে করিতেছেন, ইহাতে অজিতবাবু রাগ করিলে চলিবে কেন? এবং ইহাকে নিকৃষ্ট সংকীর্ণ বুদ্ধির পরিচায়ক মনে করিবারই বা কারণ কি? 'হিন্দু সমাজের জঞ্জাল সাফ' করার সংকল্পটা অতি উত্তম সন্দেহ নাই, কিন্তু আপনার জঞ্জালকে সাফ করা ছাড়া এ ব্রত উদ্‌যাপনের আর কি পন্থা আছে, তাহাও জানি না।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, "জীবনের লক্ষণ সংশ্লেষণ ও মৃত্যুর লক্ষণ বিশ্লেষণ" বলিলে কথাটাকে ঠিক ব্যক্ত করা হয় না। সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ এ উভয়ই জীবনের লক্ষণ এবং উভয়ের সমন্বয়ের নামই সুস্থতা। সুতরাং বিশ্লেষণ মাত্রেই মৃত্যুর বিভীষিকা কল্পনার কোন আবশ্যকতা নাই, এবং যাহাকে বিশ্লেষণ বা খণ্ডতার প্রসারণ বলিয়া মনে করি তাহাও অনেক স্থলেই একটা অন্তর্নিহিত অখণ্ড তত্ত্বের বহিস্ফূর্তি মাত্র। অজিতবাবু জগতের সর্বত্রই সৃষ্টি ও প্রলয়কে একই ব্যাপারের বিপরীত প্রকাশরূপে দেখিতেছেন, কেবল ব্রাহ্মসমাজের বেলায় সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল কেন? আমার মনে হয়, অজিতবাবুর যুক্তিগুলি এস্থলে তাঁহার উপমাজালের মধ্যে কতক পরিমাণে আটকাইয়া গিয়াছে। নতুবা তিনি ভাঙা ও গড়া ব্যাপারটাকে গতি ও স্থিতি তত্ত্বের নিদর্শন মনে করিবেন কেন? ভাঙিতেও চাহি না, গড়িতেও প্রস্তুত নহি—এরূপ অবস্থাকে অজিতবাবু স্থিতিশীলতা বলিতে চাহেন কেন, তাহাও ত বুঝিতে পারি না; কারণ জীবনের একটা স্বাভাবিক গতি আছে, এবং কালপ্রবাহের সঙ্গে এই অব্যাহত গতির নামই স্থিতি। প্রাচীন সমাজ কালধর্মকে অস্বীকার করিয়া আত্মতৃপ্তির নিশ্চিন্ততার মধ্যে ডুবিয়া আছে বলিয়া সে স্থিতিশীল নহে—তাহার প্রাণশক্তি যে এত বন্ধন এত নিশ্চেষ্টতার মধ্যেও যেমন করিয়া হউক তাহাকে রক্ষা করিয়াছে, ইহাই তাহার স্থিতিশীলতার পরিচায়ক।

"আমরা বিচ্ছিন্ন নহি, আমরা বিচ্ছিন্ন হইব না,—দিবানিশি এই মন্ত্র জপে" যাঁহাদের রুচি ও আস্থা আছে, তাঁহারা প্রাণপণে মন্ত্র জপিতে থাকুন, ইহাতে কে আপত্তি করিবে? আমরা কেবল চাই যে, ব্রাহ্মসমাজের গতিপ্রাচুর্য অক্ষুণ্ণ থাকুক, 'আদর্শকে পাইয়াছি' মনে

করিয়া সে আপনার সহিত সংগ্রামে বিরত না হউক, এবং যে শক্তিবলে সে একদিন দেশের মধ্যে বিদ্রোহের পতাকা তুলিয়াছিল, সেই শক্তিই তাহার আত্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহাকে তথাকথিত স্থিতিশীলতার মোহ হইতে রক্ষা করুক।

ব্রাহ্মহিন্দু সমস্যা : ১

অজিতবাবু ব্রাহ্মহিন্দু সমস্যার যে প্রকার একতরফা মীমাংসা করেন, এবং তাহার সমর্থনার্থ যে সকল নজীর দেখাইয়া থাকেন, তাহা আমার নিকট সমীচীন বা সুসঙ্গত বোধ না হওয়ায় আমি ভাদ্রের তত্ত্ববোধিনীতে কিছু আপত্তি করিয়াছি। আমার বক্তব্য শ্রবণমাত্র অজিতবাবু পূর্বসংস্কারবিমুক্ত হইবেন, এরূপ দুরাশা আমি একেবারেই করি না। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার উদ্ভাবিত বা যে-সে ব্রাহ্মের কল্পিত মতের বোঝা নিজস্কন্ধে বহন করিতে আমি প্রস্তুত নহি।

"ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন" অথচ "আদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজের সহিত যোগরক্ষা করিয়াছে", এইরূপ বলায় অজিতবাবুই কি 'ব্রাহ্ম' শব্দটাকে আদি 'ব্রাহ্মসমাজাতিরিক্ত ব্রাহ্ম' অর্থে ব্যবহার করেন নাই? তবে আমার বেলা ঐ অপরাধই আমার (!) ব্রাহ্মসমাজ হইতে কাহাকেও বাদ দেওয়ারূপ দুরভিসন্ধি প্রসূত মনে করা হইল কেন? এবং আদিসমাজ বা তাহার সর্বজননমস্য প্রতিষ্ঠাতাগণের প্রতি আমার যে কোন প্রকার অশ্রদ্ধা বা অনাস্থা নাই, একথাটা আমার বিশেষভাবে বলা আবশ্যক হইল কেন?

আমরা ব্রাহ্মরা যে হিন্দু—অর্থাৎ আমাদের 'জাতি পরিচয়' যে হিন্দু, ব্রাহ্মসমাজ যে হিন্দু সমাজেরই অভিব্যক্ত প্রকাশ, এবং ব্রাহ্ম আদর্শ যে মূলত হিন্দু আদর্শেরই পূর্বপরিকল্পিত রূপ—এই সকল অত্যন্ত মামুলী সত্যকে আমি যেন অস্বীকার করিয়াছি, আমার উপর কেন জানি না, এইরূপ একটা নির্বুদ্ধিতার আরোপ করা হইয়াছে। অজিতবাবুর অভ্যুদয়ের পূর্বেও এ সকল তত্ত্ব 'ধামাচাপা' ছিল না, কারণ বাল্যকাল হইতেই আমরা ইহাদের পরিচয় লাভ করিতেছি, এবং ইহার স্বপক্ষে বিপক্ষে সঙ্গত অসঙ্গত যত প্রকার যুক্তি আছে, বা হইতে পারে, তাহারও কোনটা শুনিতে বাকী নাই। আমরা কি অর্থে হিন্দু এবং কি অর্থে হিন্দু নহি, এ বিষয়ে এত প্রয়োজনাতিরিক্ত আলোচনা হইয়া গিয়াছে যে, বিষয়টাকে আরও ফেনাইতে গেলে অনেকেরই ধৈর্যচ্যুতি ঘটিতে পারে। যাঁহারা আপনাদিগকে হিন্দু বলেন এবং যাঁহারা বলেন না, এ দুয়ের মধ্যেও যে অনেক স্থলেই আসলে খুব একটা মতগত পার্থক্য আছে, আমি এরূপ মনে করি না। আর তাছাড়া এই নামসমস্যাই যে ব্রাহ্মসমাজের একটা মস্ত সমস্যা, অথবা নামের দ্বন্দ্ব মিটিলেই যে সমাজদ্বন্দ্বের কোন প্রকার সমাধান হইবে. এরূপ মনে করিবার কোন হেতু দেখি না।

১৮৭২-এর ৩ আইনে একটা অহিন্দুসূচক পরিচয়কে স্বীকার করা সমীচীন হইয়াছে কিনা, এ তর্ক আমি পূর্বেও করি নাই, এবং এখনও করিব না। কিন্তু ইহা কি ঠিক নয় যে, 'ব্রাহ্ম' নামগত পরিচয়ে আদিসমাজের আপত্তিই আইনকে উক্ত আকার গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিল? ইহাকে আদিসমাজের অগৌরবের কথা বলিতেছি না—কেবল ব্রাহ্মগণ যে সখ করিয়া বা গায়ে পড়িয়া ঐরূপ একটা আইন গড়াইতে চাহেন নাই, এইটুকু বলাই

আমার উদ্দেশ্য। আর ৩ আইন মানিয়াও ত লোকে অজিতবাবুর অর্থে আপনাকে হিন্দু বলিতে পারে এবং অহরহই বলিতেছে। 'হিন্দু বিবাহ' বলিতে আইন কি বোঝেন অথবা আদৌ কিছু বোঝেন কিনা, তাহা আইনই জানেন।

"সেই কল্পিত স্বর্গলোকবাসী সার্বজনীন ব্রাহ্মদিগের" বিবেচনাশক্তির উপর অজিতবাবুর বেশি শ্রদ্ধা না থাকিবারই কথা, কারণ তাঁহার বিচারে ইঁহাদের ব্রাহ্মসমাজ একটা "পূর্বাপর বিচ্ছিন্ন স্বদেশবিচ্ছিন্ন জাতীয়তার বন্ধনবিচ্ছিন্ন স্বপ্নপদার্থ" মাত্র—এবং 'আমি হিন্দু নই' আমরা স্বতন্ত্র এক শ্রেণীর জীব' ইত্যাদি অন্ধ অভিমান 'ব্রাহ্ম' এই নামের ঘোষণার দ্বারাই প্রমাণিত! আর ব্রাহ্ম সমাজও এদিকে দেশকাল ইতিহাসকে লঙ্ঘন করিয়া 'ভাবোচ্ছ্বাসের বাষ্প' যোগে 'হঠাৎ ব্রহ্মনামের বেলুনে চড়িয়া সার্বভৌমিক' হইবার উৎকট চেষ্টায় কালক্ষয় করিতেছেন! অথচ এগুলিকে অত্যুক্তি বলিবারও যো নাই; কারণ অজিতবাবু সন্দেহ করেন যে, আমার অভিধানে হয়ত 'অপ্রিয় সত্য মাত্রকেই' অত্যুক্তি বলা হয়!!

ব্রাহ্ম সমাজের আত্মবিস্মৃতি ঘুচান আবশ্যক একথা সর্বতোভাবে স্বীকার করি, কিন্তু হিন্দু সমাজের সহিত 'বিচ্ছেদ'ই যে এই বিস্মৃতির মূল কারণ একথা একেবারেই বিশ্বাস করি না, কারণ এ বিস্মৃতি হিন্দু সমাজেরও অস্থিমজ্জাগত। জাতীয়তা বোধ বা হিন্দুত্ব বোধ, আর হিন্দু নামে বা হিন্দুত্বের কোন বিশেষ পরিচয়ে গৌরব বোধ, এই দুইটাকে আমি অনেকটা স্বতন্ত্র জিনিস বলিয়াই মনে করি। ব্রাহ্ম সমাজের হিন্দুত্ব 'বোধ'টা উজ্জ্বল না হইলেও, হিন্দু সমাজের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ এবং উভয়ের মধ্যে যোগ রক্ষা করা যে আবশ্যক, এ 'জ্ঞান'টা তাহার বিলক্ষণ আছে, এবং জাতীয়তার আটঘাটও সে একেবারে বন্ধ করিয়া বসে নাই। আপনাকে হিন্দু বলিতে পারিলেই যে হিন্দুত্বের সংস্কারটা প্রকৃত হিন্দুত্ব বোধে পরিণত হয় না, হিন্দু সমাজই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। হিন্দু সমাজ পদে পদেই যে হিন্দুত্বের দোহাই দিয়া থাকেন, সে 'হিন্দুত্ব' জিনিসটা যে কি, তাহা অজিতবাবুর অবিদিত নহে।

আমাদের দেশে বলে যে তত্ত্বকে লাভ করিতে হইলে গোড়ায় একেবারে সর্বসংস্কার বিমুক্ত হইতে হয়; সেইরূপ আপনাকে এবং আপনার যথার্থ পরিচয় তত্ত্বকে লাভ করিবার জন্যই ব্রাহ্ম সমাজকে একবার একটা আপাত বিরুদ্ধভাব মধ্য দিয়া তাহার হিন্দুত্বের সংস্কারকে ভাঙিতে হইয়াছিল। একথা সত্য যে মাঝে মাঝে এক একটি উৎসাহী ব্রাহ্মের প্রচার তৎপরতায় ব্রাহ্ম সমাজের অত্যন্ত নিরীহ কথাগুলিও উৎকট ও ভয়াবহ হইয়া উঠে। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের দোহাই দিয়া যিনি যাহা বলেন তাহাই কিছু ব্রাহ্ম সমাজের মত হইয়া দাঁড়ায় না। ব্রাহ্ম সমাজ এই নামকরণের প্রশ্নটাকে খুব গুরুতর বিবেচনা করেন নাই—কারণ, আপনাকে হিন্দু বলিলেই, ('হিন্দু নামরূপ সূত্রকে আশ্রয়' করিলেই) হিন্দু সমাজের সহিত যথাযথ 'যোগ রক্ষা' হয় (আর না বলিলে হয় না), ব্রাহ্ম সমাজ এরূপ মনে করেন না। তাই ব্রাহ্ম সমাজ আপনাকে 'হিন্দু' বা 'অহিন্দু' বলেন না। একথাটার মধ্যে 'স্ববিরোধ' কোথায়!

আদি সমাজের কয়েকজন প্রতিভাবান ব্যক্তি শিল্পে সাহিত্যে যে অসাধারণ সাফল্য দেখাইয়াছেন, তাহা সর্বজনবিদিত। এক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধের আয়োজনটাও যে 'উজ্জ্বল ও মূর্তিমান' একথা আমি কোথাও অস্বীকার করি নাই। তবে আপনাকে 'হিন্দু বলা'ই যে উক্ত আয়োজনের পরিচায়ক বা উক্ত সাফল্যের মূল কারণ এই প্রকার সিদ্ধান্তের উদ্দেশে 'সন্দিগ্ধভাবে' একটু আধটু মাথা নাড়িবার অনুমতি প্রার্থনা করি। হিন্দুত্বের ধ্বজা ত অনেকেই তুলিয়াছে, কিন্তু চারিদিকে অমন দশবিশটা রবীন্দ্রনাথ বা অবনীন্দ্রনাথের ছড়াছড়ি ত দেখিতেছি না। নৈসর্গিকী প্রতিভা আপনার আবহাওয়াকে আপনি গড়িয়া লয়। আদি

সমাজের জাতীয়তাই তাহার প্রতিভাকে জাগাইয়াছে না বলিয়া ওই প্রতিভাই আদি সমাজকে গড়িয়াছে এবং তাহার জাতীয়তাকে এমনভাবে বিকশিত করিয়াছে, বলিলেই বা ক্ষতি কি? জাতীয়তার আবহাওয়া আদিসমাজে ত খুবই ছিল; তবে কেশবচন্দ্রের প্রতিভা সেখান হইতে প্রাণরস লাভ না করিয়া বাহিরে ছুটিয়া গেল কেন? প্রতিভা আপনার চরিতার্থতাকেই অন্বেষণ করে, হিন্দুত্ব বা অপর-কিছুত্বের খাতিরে সে আপনাকে অনর্থক সংহত করে না। দেশের সমস্যা ও সমাজের প্রশ্ন তাহার কাছে আত্মসমস্যারই অঙ্গীভূত।

জাতীয়তাবোধ ব্রাহ্মসমাজে উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে, কিন্তু সমাজ-সমস্যার গুরুত্ব তাহাতে কিছুমাত্র কমিতেছে না। ব্রাহ্মসমাজ যে আপনার সম্বন্ধেই উদাসীন হইয়া বসিয়াছে, ইহাই ব্রাহ্ম সমাজের সমস্যা। আপনাকে জানিবার জন্য সে যথার্থই ব্যাকুল হউক, তবে ত সে আপনার প্রাণশক্তিকে জানিবে ও 'ব্রাহ্মধর্মের মৃতসঞ্জীবনী রস'কে লাভ করিবে। এ ব্যাকুলতা কোথা হইতে আসে, তাহা জানি না; কিন্তু একটা নামের ধূয়াকে ব্রাহ্মসমাজের সমস্যা করিয়া তুলিলে এ জিনিস আসিবার কোন সম্ভাবনা দেখি না। হিন্দু নামে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই—কিন্তু নামটা খুব ব্যাপক বলিয়া ইহাই যে আমার 'বড়' পরিচয়, আর ব্রাহ্ম নামের বিশিষ্টতা যে পরিচয়টাকেও 'ছোট' করিয়া ফেলে, এরূপ মনে করিবার হেতু কি? হইতে পারে যে, ঐতিহাসিক হিসাবে, 'হিন্দু' নামটার একটা বিশেষ দাবী দেখা যায়। দাবী থাকে ত ভালই—সে থাকুক না; এ দাবীকে স্বীকার করা না-করাকে জাতীয়তার পরিমাপক মনে করিতে যাই কেন?

ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও সভ্যতার এক একটা বিশিষ্ট 'রূপ' আছে, একথা কাহাকেও অস্বীকার করিতে শুনি নাই। 'কেন আছে' এ আবদার আমি একেবারেই করি নাই, অজিতবাবু তাহা বেশ জানেন, কিন্তু 'বিশ্বকর্মার সঙ্গে বিবাদ কর' এই প্রকাণ্ড রসিকতার সুযোগটা বোধহয় তিনি ছাড়িতে পারেন নাই। মানুষের আত্মরূপ ও জাতীয়রূপ 'কাগজের এপিঠ ওপিঠের মত' পরস্পর সংযুক্ত বলিয়াই ওপিঠকে জানিবার জন্য এপিঠকে ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ যাত্রার প্রয়োজন হয় না। এপিঠের রহস্যে প্রবেশ করাই ওপিঠকে জানিবার সর্বোত্তম উপায়। হিন্দুত্বের বা অপর যে-কোন তত্ত্বের ঐতিহাসিক বা দার্শনিক স্বরূপ যেরূপই হউক না কেন, আমার মধ্যে তাহার যে মূর্তি নিহিত আছে, তাহাই আমার পক্ষে সে তত্ত্বের একমাত্র পরিচায়ক এবং সেই মূর্তি যতক্ষণ আমার জীবনে ও অভিজ্ঞতার মধ্যে জাগ্রত না হয়, ততক্ষণ সে বিষয়ে সকল প্রকার যুক্তিমূলক বা ভাবমূলক 'রেডিমেড থিওরি' আমার পক্ষে বাক্যজালের বুজরুকী মাত্র। হিন্দু বা মুসলমান সাধনকে আত্মসাৎ করিতে গিয়া যদি আমার নিজের মধ্যেই তাহার সমন্বয়তত্ত্বকে খুঁজিয়া না পাই, তবে হিন্দু সভ্যতার বা ব্রাহ্ম আদর্শের পায়ে মাথা খুঁড়িয়া আমার লাভ কি? আত্মপরিচয় বলিতে আমি কেবল একটা দার্শনিক বা ঐতিহাসিক আত্মতত্ত্বের কথা বলিতেছি না। নিজের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যমূলক বিশিষ্টতাকে জানাই—জীবনের চিন্তা ও সাধনার মধ্যে তাহাকে উপলব্ধি করাই—যথার্থ আত্মপরিচয়। একথা ব্যক্তিগতভাবে অজিতবাবুর বা আমার সম্বন্ধে যেমন সত্য, সমষ্টিভাবে ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষেও তদ্রূপ। ব্রাহ্ম সমাজ ত দু' দশটা লোকের পরামর্শে গড়া একটা যুক্তিকল্পিত হুজুকমাত্র নয়—তাহার বিশিষ্টতাটুকুও কেহ জবরদস্তি করিয়া তাহার ঘাড়ে চাপায় নাই। এ বিশেষত্ববোধ স্থলবিশেষে উগ্র হইয়া অর্থহীন স্বাতন্ত্র্যাভিমানে পরিণত হইলেও, স্বাতন্ত্র্য বা বিশেষত্ব বোধ মাত্রেই কিছু 'সম্প্রদায় গণ্ডীবদ্ধ' সংকীর্ণতার নিদর্শন নহে। এই বিশিষ্টতা ও তাহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও সার্থকতার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধান্বিত না হইয়াও যে কি করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের

প্রাণশক্তিকে জানা সম্ভব, তাহা আমার ক্ষুদ্র ধারণার অতীত। অজিতবাবু ব্রাহ্ম সমাজের ব্যর্থতার যে তালিকা দিয়াছেন তাহার মধ্যে শিল্প সাহিত্য সংগীত দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস ধর্মতত্ত্ব মঙ্গল অনুষ্ঠান প্রভৃতি কিছুই বাদ পড়ে নাই। ইহাও শুধু ব্রাহ্ম সমাজের অক্ষমতারই পরিচায়ক নহে। এ সমাজ সংগীতের 'আর্ট'কে বজায় রাখা 'বাহুল্য মনে করেন'—শুধু অনুষ্ঠানের আড়ম্বর নয় 'সৌন্দর্যের আয়োজন' মাত্রই ইঁহাদের অসহ্য—এ পিউরিটান দল 'শিল্পকে তফাতে তফাতেই রাখিয়াছেন'—ইত্যাদিবৎ অনেক 'যুক্তি'র দ্বারা অজিতবাবু ব্রাহ্ম সমাজের একটা অন্ধ একগুঁয়েমিকে প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন! অতঃপর ইহা বেশ বুঝিতে পারি যে, বিবাহে মঙ্গলঘট দেখিয়া কোন ব্রাহ্ম নিমন্ত্রিত যখন ফিরিয়া গেল তখন অজিতবাবু বেশ সহজেই অনুমান করিলেন যে "এ সমাজে শিল্পবোধ ও রসবোধ বোধ হয় নাই"। আমার বিশ্বাস যে 'যুক্তির কামারশালায়' দু' একবার 'হাতুড়িপেটা' করাইলে অভিযোগের ফর্দটা অনেকটা সংক্ষিপ্ত হইতে পারে।

প্রকৃত হিন্দুত্বকে (শুধু হিন্দুত্ব কেন, যে কোন তত্ত্বকে) জানিবার যত প্রকার পন্থা আছে, তাহার মধ্যে ঐতিহাসিক 'ধারাবাহিকতা'র সূত্রান্বেষণকে খুব একটা উঁচুদরের পন্থা মনে করি না। হিন্দুত্ব ও জাতীয়তার সমস্যাকে ব্রাহ্ম সমাজ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারাই পূরণ করিবেন, আমরা এরূপই আশা করি। ব্রাহ্ম সমাজের প্রাচীর যতই থাকুক দেশের সঙ্গে মিলিবার সুযোগ ও অবকাশেরও কিছুমাত্র অভাব নাই। ব্রাহ্ম ও—এমনকি যাঁহারা মাঙ্গলিক শিল্পচিহ্নাদি ব্যবহার করেন না অথবা জাতীয়তাকে সকল সার্থকতার মূলমন্ত্র জ্ঞান করেন না তাঁহারাও—দেশের অতীততত্ত্ব ও চিরন্তন আদর্শ ও সাধনের মধ্যে শ্রদ্ধার সহিত প্রবেশ করিতে পারেন। ব্রাহ্ম সমাজই অর্থাৎ ব্রাহ্ম সমাজের ত্রিধা বিভক্ত জীবন সংগ্রামই দেশের যাথার্থ্যকে যথার্থভাবে উন্মুক্ত করিয়াছে। হিন্দুত্বের যে অব্যক্ত 'সনাতন' রূপ—যাহাকে হিন্দুত্বের 'ছাঁচ' বলা হইয়াছে—সে জিনিসটা ঠিক বজায় থাকে যদি ব্রাহ্ম সমাজ আগে আপনাকে বজায় রাখেন, কারণ ব্রাহ্ম আদর্শটা কাহারও মনগড়া জিনিস নয়—মূলত সে হিন্দু আদর্শেরই পূর্ণতর প্রকাশ।

"শিল্প সাহিত্য আকাশ হইতে ঝুপ্ করিয়া পড়ে" এ ধারণা আমার কোনকালেই ছিল না। শিল্পের মূলে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব, এবং সেই ব্যক্তিত্বের মূলে তাহার শিক্ষা সাধনা ও অভিজ্ঞতা, দেশকালের প্রভাব, এবং জন্মগত ও জাতিগত রুচি ও সংস্কার এ সমস্তই নিহিত থাকে। কিন্তু শিল্পী তাঁহার রসানুভূতি ও শিল্পৈষণার চরিতার্থতার জন্যই শিল্পসাধনায় প্রবৃত্ত হন। জাতীয়তা জিনিসটা অশেষ গুণসম্পন্ন হইলেও উহা যে 'সর্বত্রই' (বা অধিকাংশ স্থলেই, বা প্রধানত, বা বিশেষভাবে) শিল্পসাহিত্যের বৃন্তস্বরূপ, অজিতবাবুর এই 'অত্যন্ত জানা সত্যটাকে' আমি সর্বতোভাবে অস্বীকার করি। জাতীয়তা শিল্পের একটা আনুষঙ্গিক উপাদান মাত্র, শিল্পের খোরাক সংগ্রহের একটা ভাণ্ডার মাত্র। তাহাকে শিল্পের 'বৃন্ত' করিয়া তুলিলে ও শিল্পীকে জাতীয়তার পরোক্ষ উপলব্ধির মধ্য দিয়া শিল্পের প্রাণরস আহরণে বাধ্য করিলে শিল্পের শিল্পত্বের বড় বেশি কিছু অবশিষ্ট থাকে না। বাহির হইতে ঐতিহাসিক বিচার করিয়া শিল্পকে যে কোন পর্যায়ভুক্ত করি না কেন, শিল্পীর কাছে তাঁহার শিল্পের গ্রীকত্ব বা ইতালিয়ানত্বের মূল্য নিতান্তই সামান্য। ইতালিয়ান শিল্পী "আইস, ইতালিয়ান শিল্পের চর্চা করি" বলিয়া একটা ইতালিয়ান ছাঁচ খাড়া করিয়া তবে শিল্প রচনায় প্রবৃত্ত হন না, তাঁহার ইতালিয়ানত্ব তাঁহার ব্যক্তিত্বের অঙ্গীভূত বলিয়াই শিল্পে তাহার একটা ছাপ অনেক সময়ে থাকিয়া যায়। শিল্পীর মনের ভাবটা বা প্রকাশের পদ্ধতিটা জাতীয়তা সম্মত কিনা, তাহা "নানা লোকের মনে ঘুরিয়া বেড়ায়" কিনা, এ ঐতিহাসিক মারামারি লইয়া শিল্পীর কি লাভ?

আর ইহাও যেন না ভুলি যে, শিল্পসাহিত্যের সাফল্যই জীবনের একমাত্র সাফল্য নয়; সরস্বতীর কমলবনের গন্ধ না থাকিলেও এক একটি পুণ্য জীবনের সৌরভ কিছু কমিয়া যায় না।

ব্রাহ্মসমাজের প্রাণের দৈন্য, তাহার যান্ত্রিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতা এ সমস্তই স্বীকার করি। কিন্তু ইহার মধ্যে কোন্‌টা 'অতিরিক্ত গতিশীলতার পরিচায়ক? ইহার সঙ্গে 'হিন্দু সমাজের স্থিতিশীলতাকে' জুড়িলেই বা কি ছন্দ রচিত হয়? যে 'মরণধর্মী' উদ্দাম গতি কেবলই ভাঙে, তাহার সঙ্গে ততোধিক মরণধর্মী ভাঙাগড়াতীত স্থিতিশীলতাকে মিলাইলে ছন্দের সম্ভাবনা কোথায়? গতি ও স্থিতি মিলিয়া যে ছন্দ রচিত হয়, সেখানে 'স্থিতি' জিনিসটা গতির বিলুপ্তি নয়, একটা সংহত গতি মাত্র; কারণ ছন্দ গতিরই ছন্দ; গতির উদ্দামতাকে নিয়ন্ত্রিত করাই ছন্দ।

ব্রাহ্মসমাজ এককালে যাহাই থাকুক, আজ সে অতিমাত্রায় গতিশীল নহে, স্থিতিশীলতার ব্যাধি তাহার হাড়ে হাড়ে। কোথা হইতে প্রাণের বেগ আসিয়া এ দৈন্যকে ঘুচাইবে, তাহা নির্দেশ করিয়া বলা আমার সাধ্যাতীত। ব্যক্তিগতভাবে নিজ জীবনে ইহার উত্তর অন্বেষণ ছাড়া যথার্থ কার্যকরী আর কোন মীমাংসার কথা আমি জানি না। আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করি; অজিতবাবু এ সকল মতামতের অনুমোদন করেন কি না তাহা জানিবার জন্য আমি বিশেষ উৎকণ্ঠিত নহি। অতঃপর আর এ বিষয়ে লেখালেখি করিয়া সকলের বিরক্তিভাজন হইতে ইচ্ছা করি না।

ব্রাহ্মহিন্দু সমস্যা : ২

অজিতবাবুর সঙ্গে আমার এই বিবাদকে 'ফ্যাক্‌ড়া' মতদ্বৈধ বলিয়া এড়াইবার কোন প্রয়োজন দেখি না। আমি মনে করি অজিতবাবুর ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক উপপত্তিগুলার মূলেই আমার আপত্তির যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। আমি 'গায়ের জোরে' 'প্রমাণ নিরপেক্ষ' 'স্ববিরোধী' অথবা 'কালক্ষয়কর' আলোচনা তুলিয়া, তথ্য জিনিসটাকে এড়াইয়া চলিতেছি—আমার বিরুদ্ধে এটা অজিতবাবুর একটা ধরাবাঁধা অভিযোগ। ইহার উত্তরে পাল্টা অভিযোগের সমারোহ ঘটাইতে চাহি না। কিন্তু জানিতে ইচ্ছা হয় যে, ঐ দৃষ্টিতে নিজের রচনাগুলিকে দেখা সম্ভব হইলে তিনি কি কি বিশেষণ প্রয়োগ করিতেন।

একদল অথবা একাধিক দল—ব্রাহ্ম আছেন যাঁহারা বলেন 'আমরা হিন্দু নই', অথবা 'আমরা হিন্দুত্বের গণ্ডী মানি না', অথবা "এ বিষয়ে হাঁ-না গোছের কোন একটা জবাব দেওয়া আবশ্যক বা সম্ভব নয়।" কেহ হয়ত হিন্দু নামোৎপত্তির মতসমাকীর্ণ ইতিহাসে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক বা অক্ষম; কেহ মনে করেন হিন্দু নামগত পরিচয়টা খুব স্পষ্ট বা যথেষ্ট বা অবশ্য স্বীকার্য নহে; কাহারও মতে জাতীয়তা জিনিসটা হিন্দুনামকে (বা কোন বিশেষ নামকে) একান্তভাবে আশ্রয় না করিয়াও বেশ টিকিতে পারে। 'হিন্দু' শব্দটা যে বাস্তবিক কিসের পরিচায়ক সে বিষয়েও নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন, উহার ঐতিহাসিক বা দার্শনিক ব্যাখ্যা যাহাই হউক, বর্তমানে যেরূপ অর্থবিকৃতি ঘটিয়াছে তাহাতে আর সেই সাবেকী অর্থে উহাকে চালান যায় না; কেহ বা আশঙ্কা করেন যে, পাছে নামটার প্রতি অত্যধিক মায়া জন্মিলে হিন্দু সমাজের তথাকথিত হিন্দুত্ব আমাদের গ্রাস করিয়া বসে; কেহ বা ইতিহাসেরই দোহাই দিয়া আমাদের এ নাম গ্রহণের অধিকার বা

যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত করেন। আবার এমন লোকও আছেন, যাঁহারা হিন্দু শব্দটা দেশকালের পরিচায়ক বলিয়াই তাহার উপর খড়্গহস্ত। অজিতবাবুর কাছে হিন্দু নামগত বিরোধের এই অসংখ্য প্রকারভেদের অর্থ কেবল 'ব্রাহ্ম সাম্প্রদায়িকতা ও হিন্দুবিদ্বেষ'। একজন আপনাকে হিন্দু বলেন, আর একজন বলেন না, অথচ "দুয়ের মধ্যে আসলে খুব একটা মতগত পার্থক্য না থাকিতে পারে", অজিতবাবুর মতে "এ কথাটি কখনই সত্য নয়।" তিনি সমস্ত আপত্তিকারী দলকে একই কাঠগড়ায় পুরিয়া 'প্রতিপন্ন করিতে' চান যে "যে ব্রাহ্মরা আপনাকে হিন্দু বলেন না তাঁহারা জাতীয়তার বোধ বিচ্ছিন্ন।" ইহাকে আমি একতরফা মীমাংসা বলিয়াছি—আরও কয়েকটি বিশেষণের কথা মনে হইয়াছিল, সেগুলি ব্যবহার করি নাই। অজিতবাবু বলেন তাঁহার "মীমাংসা দুই তরফের...বিচার করিয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে।" কিন্তু আমাদের বিশ্বাস সিদ্ধান্ত যথেষ্ট হইয়াছে, কিন্তু বিচারও হয় নাই মীমাংসাও হয় নাই।

অজিতবাবু দেখাইতে চাহেন যে, ব্রাহ্ম সমাজে একদল 'আপনাকে হিন্দু বলায়' তাহার সাফল্যের চূড়ান্ত হইয়াছে এবং অপর দল হিন্দুত্বকে স্বীকার না করায় তাহার ব্যর্থতার আর সীমা পরিসীমা নাই। বলা বাহুল্য, ইহাকেও আমি একতরফা মীমাংসা বলি। অজিতবাবুর মতে, আমাদের বিচার্য এই যে, "মহর্ষির পন্থা ঠিক, না কেশববাবুর পন্থা ঠিক?" বিচারের গোড়াতেই একটা ঠিক আর একটা অঠিক এবং উভয়ের বিরোধ কোথাও সামঞ্জস্যের সম্ভাবনা রাখে নাই—এরূপ মনে করিতে যাই কেন? বিরোধ মাত্রেই ত সত্যি বা মিথ্যার বা ন্যায় ও অন্যায়ের বিরোধ নয়—সত্যের সঙ্গে সত্যের, ন্যায়ের সঙ্গে ন্যায়ের যে বিরোধ, তাহাই আদর্শের পূর্ণতাকে গড়িয়া তোলে। জীবন ব্যাপারের পদে পদে গ্রহণ বর্জন গতি ও সংযমের যথাযথ ওজন রক্ষা করার আদর্শটা আদর্শ হিসাবে খুবই চমৎকার হইতে পারে, কিন্তু সমাজের জীবন ত পূর্ব হইতেই আপনার গন্তব্য পথে সূত্রপাত করিয়া রেখা টানিয়া চলে না—তত্ত্বের সিদ্ধান্তকে তাহার জীবনের বোঝাপড়ার মধ্যে হাতে-কলমে অর্জন করিতে হয়। আদর্শের সমগ্রতাটা কার্যকালে অনেক সময়েই এক কিস্তিতে প্রকাশিত হয় না। ব্রাহ্ম সমাজের সংগ্রাম যেমন একদিকে যথেষ্ট অগ্রসর হয় নাই, তেমনি অপরদিকে তাহা পর্যাপ্তির মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। অজিতবাবু সেকালের ব্রাহ্মদের 'সাহসী' বলিয়াছেন 'বীরের দল' বলিয়াছেন—কিন্তু ঐ পর্যন্তই! তাঁহাদের সুবুদ্ধিতা বা কাণ্ডজ্ঞানকে তিনি কোথাও স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে, এ সমাজের ইতিহাস কেবল ব্যর্থতার ইতিহাস মাত্র অর্থাৎ "এই পথে গেলে এই প্রকার বিপদ ঘটে" এইরূপ অভিজ্ঞতার ইতিহাস মাত্র। অবশ্য অপরদিকে 'উন্নতিশীলতা'র অভিমান অনেককে ইহার বিপরীত কথাও বলায় যে "আমরা বহুকাল হইল আদি সমাজের গণ্ডী ডিঙাইয়া একটা পূর্ণতার আদর্শে উপনীত হইয়াছি।" আমার নিবেদন এই যে, ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শকে বুঝিতে হইলে তাহার সমগ্র ইতিহাসের সাক্ষ্যকে স্বীকার করা আবশ্যক এবং কোনো সমাজের সংগ্রামকেই পণ্ডশ্রম বলিয়া এড়াইয়া চলা সম্ভব নয়।

"হিন্দুত্ব উত্তরকালের ব্রাহ্মদের কাঙ্ক্ষিত বস্তু ছিল" একথা বলা দূরে থাকুক, আমি বলি একালেও উহা আমাদের কাঙ্ক্ষিত বা কাঙ্ক্ষনীয় বস্তু হইয়া দাঁড়ায় নাই। আমরা চাই জীবনের অবাধ প্রসারলব্ধ সার্থকতা। তাহাতে জাতীয় জিনিসটা টিকে কিনা সে প্রশ্ন আমাদের 'জীবনের সমস্যা' ও নয়, 'সর্বপ্রধান সমস্যা'ও নয়—'একমাত্র সমস্যা, ত নয়ই। দেশের সমস্যা বা সমাজের সমস্যা বা অপর যে-কোন সমস্যা আমার কাছে একটা সমস্যাই হয় না, যতক্ষণ তাহাকে আমার মধ্যে আমার ব্যক্তিগত সমস্যার সঙ্গে মিলাইয়া না দেখি। ব্রাহ্ম সমাজ অজিতবাবুর উপদিষ্ট হিন্দুত্ববাদকে মীমাংসা রূপে অবলম্বন করে নাই। কারণ ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুত্বের অন্বেষণ করিতে আসে নাই, সে আপনাকে, আপনার সার্থকতাকে, 'আপনার যথার্থ পরিচয়তত্ত্বকে', লাভ করিতে

চাহিয়াছিল। অজিতবাবু জানিতে চান "সেই যথার্থ পরিচয়তত্ত্বটি কি ব্রাহ্ম সাম্প্রদায়িকতা ও হিন্দু বিদ্বেষ?" আমার বিশ্বাস অজিতবাবু চেষ্টা করিলে নিজেই ইহার একটা কড়া জবাব দিতে পারিবেন। "যে সকল মূল সংস্কারকে আদি সমাজের ভাঙা উচিত ছিল" সেগুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আমি যদি বলি 'এই বুঝি তোমার জাতীয়তা' তবে অজিতবাবু তাহার কি উত্তর দিবেন একটু ভাবিয়া দেখুন না।

অজিতবাবু আরও জানিতে চান "কোন্ ব্রাহ্ম জাতীয়তাকে সকল সার্থকতার মূলমন্ত্র জ্ঞান না করিয়া অর্থাৎ সাদা বাংলায় জাতীয়তা বোধের অভাব থাকা সত্ত্বেও দেশের চিরন্তন আদর্শের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন?" এ অদ্ভুত প্রশ্নের জবাব দিব না, কিন্তু ঐ 'অর্থাৎ' শব্দটার অর্থ কি? অজিতবাবু আমার প্রবন্ধে "যাঁহারা মাঙ্গলিক শিল্প চিহ্নাদি ব্যবহার করেন না" ইত্যাদি কথার অর্থ করিয়াছেন 'যে ব্রাহ্ম জাতীয়তার বোধ বিচ্ছিন্ন'। এইগুলি যদি জাতীয়তার নমুনা হয়, তবে ব্রাহ্মসমাজ 'জাতীয়তার বন্ধন বিচ্ছিন্ন' হইলেও অশ্রুপাত করিবার কোন কারণ দেখি না।

"মহর্ষি ও কেশবচন্দ্র তুচ্ছ নাম সমস্যা লইয়া বিবাদ করিয়াছিলেন" এরূপ ইঙ্গিত করার মত এত বড় বেয়াদবী আমি কোথাও করি নাই। আমার প্রবন্ধে এমন কোন কথা বলি নাই যাহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'হিন্দু নামের শূন্যতা' 'আত্মরূপ ও জাতীয়রূপের অভিন্নতা!' 'একাত্মপ্রত্যয়সারং' ইত্যাদি মতগুলাকে আমার স্কন্ধে চাপান যাইতে পারে। ১৮৮২-এর ৩ আইন সম্বন্ধে আমি ভালমন্দ কিছুই বলি নাই। অজিতবাবু স্বীকার করেন তাঁহার মত হিন্দুকেও 'বাধ্য হইয়া' এ আইন মানিতে হয়—আমিও বলিয়াছি "৩ আইন মানিয়াও লোকে অজিতবাবুর অর্থে আপনাকে হিন্দু বলিতে পারে" (অর্থাৎ আইনের খাতিরে ৩ আইনকে স্বীকার করায় অহিন্দুত্ব প্রতিপন্ন হয় না)। অজিতবাবু "এটা স্ববিরোধী কথা হয়" বলিয়া ৩ আইনের 'জুলুম' সম্বন্ধে আমায় এমনভাবে উপদেশ দিয়াছেন, যেন আমার মতে "এ আইনটা অতি উপাদেয় জিনিস—ইহাকে ঘাড় পাতিয়া স্বীকার করাই সকলের কর্তব্য।" জানি না, আমার অত্যন্ত সহজ কথাগুলিও কেন অজিতবাবুর চক্ষে এরূপ ভয়ানক আকার ধারণ করে। শিল্প ও জাতীয়তার সম্বন্ধ বিষয়ে আর বেশি কিছু বলা উচিত হইবে না, কারণ অজিতবাবু মনে করিয়াছেন সে সকল তত্ত্বের 'কখগ' তাঁহাকে শুনান হইতেছে কেন। কথা উঠিয়াছিল, শিল্পীর মনের ভাবটাই ত শিল্প নয়, শিল্পত্ব লাভ করিতে হইলে তাহার জন্য একটা বাহিরের আশ্রয় ও অবলম্বন আবশ্যক। অজিতবাবু বলেন, 'জাতীয়তাই' সেই আশ্রয় ও অবলম্বন—!? "জাতীয়তা সর্বত্রই শিল্প সাহিত্যের বৃন্তস্বরূপ", কারণ "শিল্পের রূপ জাতীয় হইয়া থাকে" (অর্থাৎ হইতেই হইবে!)—ইহার উপর টিপ্পনী অনাবশ্যক।

ব্রাহ্ম সমাজের খানিকটা ইতিহাস আমাদের জাতীয়তাবাদী বন্ধুগণের রুচিসঙ্গত হয় নাই—না হইবার ন্যায়সঙ্গত কারণও যথেষ্ট আছে। 'রাতারাতি সার্বভৌমিক হইবার' লোভে ব্রাহ্ম সমাজ পথভ্রষ্ট হইয়াছিল কিনা এবং তজ্জন্য ভবিষ্যৎ ইতিহাস চোখ রাঙাইবেন কিনা, সে বিষয়ে অজিতবাবুর সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে আমি প্রস্তুত নহি। দেশাত্মবোধের অভাবটাই ব্রাহ্ম সমাজের ব্যাধি নয়, ব্যাধির কারণও নয়, ব্যাধির একটা আনুষঙ্গিক লক্ষণ মাত্র। এ লক্ষণের গুরুত্ব আমি অস্বীকার করি না। অজিতবাবু সমাজ-সংগঠন পদ্ধতির যে ক্রমনির্দেশ করিয়াছেন তাহার আলোচনায় মাসিক পত্রের আসর জমিতে পারে, কিন্তু তাহাতে ব্রাহ্ম সমাজের প্রাণশক্তি জাগিবার কোন সম্ভাবনা ঘটে কি? ব্রাহ্ম সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে তাহাকে নানাদিক দিয়া আঘাত করা আবশ্যক, একথা স্বীকার করি। কিন্তু তাহার অভিপ্রায় ও বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়ে অযথা সন্দেহ তুলিয়া যেখানে সেখানে অন্যায় কটাক্ষপাত করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না।

The Spirit of Rabindranath Tagore

I should like to make it clear from the beginning that I do not propose to attempt a comprehensive survey of the life and works of this illustrious poet; nor shall I be guilty of the presumption of attempting totally superfluous advertisement of his genius or personality. I shall content myself simply with reproducing, however imperfectly, what I consider to be the right background of thought and environment, for a fruitful study of Rabindranath's poetical works, and with indicating briefly their high value not merely as an efective analysis of present-day problems in India and elsewhere, but as an exposition of the root-problems of life itself.

In the midst of all our work and all our pleasures, we are often unconscious that we are ever carrying with us the burden of an eternal question. Very few of us indeed have anything more than a vague consciousness of its existence, and most of us are satisfied with an occasional mild intellectual interest in the problem. But in some lives—and these lives alone are truly great—the question has assumed an imperative form; and wherever the demand for an answer has been thus insistent, we have had one of those contributions to human thought that leave a definite impression on the ever-changing ideals of humanity. In this paper we shall deal with some of the forms of which the mystery has revealed itself today to a poetic soul who has in his own way sought an answer to the riddle of life.

The present epoch is admittedly a critical period in human history. World-forces, and world currents of thought have been roused to activity and are working away, openly or insidiously, for good or for evil, on a scale hitherto unknown. The commerce of ideas, no less than the commerce of wealth and industry, is fast weaving the many-coloured threads of human endeavour into one organic whole. Problems of state and politics, problems of society and of religions, are rapidly becoming the common problems of humanity itself. The apparent contradictions of the many-sidedness of humanity, which have for ages provoked the fiercest conflicts between man and man, are slowly subsiding into a truer unity and a more comprehensive harmony, which are all the more profound because of this ruthless disturbance of equilibria and the passionate struggle for a more comprehensive readjustment of life. Humanity, living apart in its own sequestered grooves, armed with the prejudice of conventions and external forms, finds itself called upon to respond to the stimulus of a wider appeal and express itself in terms of a wider sympathy.

We are not concerned here with the final outcome of this struggle, if indeed there can be any finality in its solution. But, seldom, in the self-expression of an individual life, has this ideal of a world-wide rapprochement been sung with such never ending freshness and perfection of harmony as in the poetry and writings of Rabindranath Tagore. The inner growth of the poet's ideal, as clearly reflected in the evolution of his poetry, is so typical of the fundamental laws of the emancipation of thought and of realisation through conflict, that it may almost be taken as a summarised history of the world-wide thought-adjustment through which we are passing at the present moment. The reconciliation of contradictory ideals, the re-construction of apparently anomalous fragments of philosophy, the reconvergence of the priori idealistic and the objective evolutionary trends of thought, have all

been foreshadowed and their battles fought over in the inspired outpourings of the poet's soul.

But first let us take a rapid survey of the various formative influences of tradition and environment that have led up to the production of his masterpieces—of those literary and intellectual activities that preceded him and paved the way for the advent of his genius.

One of the most fundamental characteristics of the Hindu temperament, in theory at least, is the essential catholicity of its attitude towards the problems of life. In fact, so elastic has it been in its interpretation of religious beliefs and so comprehensive in the diversity of its aims and ideals, that a superficial observer may very easily be induced to believe that Hinduism itself is a mere conglomeration of heterogeneous creeds—and so it is, in fact, when divorced, and considered apart, from its central ideas and the prime sources of its inspiration. Pervading and spiritualising all its aims and ideals is an intense consciousness of the absolute and fundamental unity at the root of all things. From the earliest recognition of the essential oneness of the forces of nature—of the powers that drive the clouds or kindle the fire, of the powers that inspire our thoughts and actions, of the powers that deal with life and death—from the first inspiring glimpse of the one life and one consciousness that pervades the universe—life or matter, body or soul—the whole history of Hindu thought has been a series of onslaughts on everything that has stood in the way of a perfect realisation of this idea. And the whole history of Rabindranath Tagore's poetical career has been, consciously or unconsciously, a crusade against the ever-recurring bondage and tyranny of forms and conventions and sophisticated creeds that hamper the growth of the spirit and deny the self its proper fulfilment in the unfettered attainment of truth.

The Hindu's conception of religion and his logical attitude towards 'religions' should therefore be essentially catholic. To him Dharma, or the Law, is one and eternal, and all the different 'religions' with all their apparent diversities of ideals and practices are but different marga's, or paths, for the ultimate attainment of the same goal. For, it is Dharma itself, inherent in man, that makes the triumph of Dharma irresistible; it is Dharma itself that drives, lures and guides the soul to inevitable salvation. Mukti, or freedom (which is the Hindu's equivalent for salvation), is the fulfilment of the purpose of existence, and that fulfilment is perfect self-realisation. For therein lies the final solution of all spurious conflict between life and death, between mind and matter, between the soul within and the world without, between 'this', 'that' and 'I'—all merged in one all-pervading, all-inclusive soul in whom each soul discovers its true untrammelled self.

What is this self? How is it to realise itself? What is it that prevents the realisation now? These are the questions we have to face. And yet, somehow, before we seek an answer to them, we require an assurance that we are not following a mere phantom that leads us to nothing. Men have tried all the world over to do without such speculations; men have grown impatient of waiting for an answer to their own inner questionings. So they have proposed to solve the problem of life without any reference to ultimate realities. Thus we have had such conceptions as the 'welfare of society', the 'progress of humanity', the 'greatest good of the greatest

number'—which we are invited to accept as the guiding principles of our life and conduct. And yet, when we try to translate such ideas into practice, when we look for some unerring guidance amidst the doubts and trials of our daily lives, we find ourselves asking : What is good? what is progress? what is welfare? And deep down at the bottom of all such queries we find the haunting shadow of the questions we have always tried to suppress : Who am I? what is this life? what is the purpose of my existence?

This Samsara, or procession of phenomena, as the Hindu calls the world, is but the outward expression of the mysterious self-seeking of the soul—a thought-episode of the birthless soul mapped out in time and space. And all this misery, all this blind helpless groping about, is simply because the soul, having started in its career of self-realisation, forgets its true eternal self and attaches itself to the fleeting things of the world with wihch it identifies itself. But why is it, it may be asked, that we fail to see all this? Why has the One and Eternal, the Perfect Soul of all souls, in setting free this stream of consciousness that expresses itself through my life, allowed it to lose sight of its true meaning? In asking this question we are really asking why there should be any creation or limited existence at all; why the Perfect should want this elaborate make-believe of imperfections, this incessant striving after a perfection that is already there, this mysterious evolution from the Alone unto the Alone. This is the transcendent mystery of creation, the 'unknowable' of the agnostics, the one missing link in the unending chain of causation; for herein lie the root-problems of thought, of time and space, of consciousness and reality. All that philosophy can do is to give us analogies and supply symbolic conceptions to express rather than explain the nature of the mystery. Self-emancipation is the conquest of maya, the false illusion of self, which gives the semblance of independent reality to all things, and which makes the one indivisible Reality appear as a duality, as subject and object, as mind and matter, as this, that and I. The idea of a fleeting world, the very notion of this life built up of incessant changes, nay, the very act and process of creation itself as we understand it, is a figment of maya. This soul that we worldly-men speak of, this spurious self that finds itself at variance with the world around, this 'I' that toils and suffers and is eternally at the mercy of death, all this is gross maya. And yet, as we are emphatically reminded over and over again, by our illustrious poet, whatever it may or may not be, this maya is, so far as we are concerned, as much a fact, as substantial a reality, as any fact or reality that we deal with in our lives; it is, in fact, the reality of our life and existence, of our daily round of pleasures and sorrows.

One phase of the Hindu's spiritual endeavour, therefore, is the conquest of maya, which resolves itself into a rigorous process of disabusing the mind of all its preconceived notions of things imbibed from its contact with its environments. "Not this, not this!" I am not this body; I am not this that suffers and dies; I am not this that is rent by passions and blinded by ignorance; I am not this fleeting stream of ceaseless changes. I am the reality of which all this is a shadow; I am the one, the unchanging amidst the changeful many; I am the perfection within myself, beyond sorrows, beyond doubts, beyond death. Such is the way of knowledge,

of knowledge through perfection and of perfection through knowledge.

Against the sombre background of this relentless monism which is a direct legacy of premediaeval Vedantic thought, stands the inspiring form of bhakti, or supreme attachment to God. The tendency of this school of love is essentially dualistic, for its whole concern is with the personal aspect of God—God manifest, who expresses himself through the world-process and in the life and struggles of each individual. The general attitude of these two schools of religious though towards each other is one of mutual distrust and even contempt. But though it is so common to find the advocates of the paths of knowledge and love opposing, and even denouncing, instead of supplementing, each other, it has been pointed out over and over again that there is in reality no inherent conflict between the two. Just as there can be no true knowledge without a supreme passion for it, so there can be no ture love, no selfless devotion for anything, without knowledge, without a compelling consciousness that what we love is truly lovable. This conflict of thought, however, has served to emphasise the two-fold nature of the problem, and by insisting on our recognising the immediate as having as important a claim to our attentions as the ultimate, it has helped to keep in view the practical problems of salvation as distinct (though logically inseparable) from a ture conception of it.

Volumes might be written on the Vaishnava cult of love, its mystic traditions, its profound symbolisms, its absorbing ecstasies. The ideal of the Bhakta is love of God for love's sake, without desires, without motives, without any purpose whatever—the mystery of love that he seeks without finding, the compelling love that comes to him unsought. During the 14th century, and for a long time afterwards, the phrase 'Bengali literature' was practically synonymous with Vaishnava poetry, which is all centred round the divine love-story of Radha and Krishna. The story begins with the coming of Krishna into the life and thoughts of Radha. Radha is absorbed in the contemplation of her lover; she lives in the midst of an intense dream in which the personality of her lover is mysteriously woven into all the physical realities surrounding her life. Sometimes he comes across her path and, though he passes away in silence, he always seems to leave a mysterious message behind. And when, at last, the passionate music of his flute is heard calling to her from beyond the river, between joys and fears, between hopes and doubts, Radha knows not what to do. Again and again the music is heard, till, finally, yielding to its insistent call, she leaves all and braves all and goes forth to meet her mysterious lover in the secret bower. This is the story which with various elaborations and embellishment has found widespread acceptance as truly allegorical of the dawning of divine love in the soul.

Such are the twin streams of love and knowledge that have been so exquisitely harmonised and have found such perfect expression in the genius of Rabindranath Tagore. He has been claimed by many of his admirers as a true successor of the Vaishnava poets. His poetry has even been described as an inspired restatement of Vaishnava thought in the light of his own experience. But that is true only in a strictly limited sense. If we consider, not merely the poetry of a particular period of his life, but the whole of his literary activity, we are driven to the conclusion that Rabindranath is not the slave of any particular school of thought, that he is

not the exponent of any particular system or 'ism' and that he is, first and foremost, an exponent of the mystery of life and only incidentally a Vaishnavist or Vedantist, an idealist or realist. In fact, the unfettered evolution of his poetry was possible only through a constant shaking off of the limiting influences of mere tradition and sophisticated life. His temperamental kinship with the early Vaishnava writers, and their lasting formative influence at the early impressionable stage of his poetry, are amply evidenced in the genuinely Vaishnavic inspiration and motif of many of his poems; but he has, nevertheless, succeeded in breaking away most effectively from the tyranny of Vaishnavist literary traditions, and the bulk of his poetry is Vaishnava only in the sense that it is intensely humanistic and deals with the glory and joy of life. Otherwise he is almost as much a Vedantist as a Vaishnavist, for his outlook on the broader questions of life and existence is characterised by an element of rigid and subjective self-analysis that is almost foreign to the vaishnava writers. This is traceable very largely to the influence of his father, the Maharshi, whose remarkable religious life had been very largely inspired by Vedantic teachings.

The advent of Rabindranath Tagore's poetry happened at that critical moment when Bengali literature, having just recovered from the prolongd depression of a decadent period, was discovering its own potential greatness. For more than two centuries, before the rise of modern Bengali literature about seventy years ago, the whole literature of Bengal had, with rare exceptions, been showing pronounced symptoms of having lost touch with nature. This marked stagnation of thought was reflected everywhere in the sordid pettiness of literature, in the senseless tyranny of social conventions, in the shallowness of the practical interpretation of religion and philosophy. The noblest birthright of the nation, the priceless legacy of Hindu thought, seemed to have been completely smothered under a virulent growth of morbid parasitic forms and accretions, and all channels of freedom of thought and endeavour were silted up by the choking obstructions of a stagnent, form-ridden, tyrannised and tyrannising society. It was one of those periods in a nation's life when its faculties are dulled by a false feeling of self-satisfaction, when its life is divorced from the ideal, when indolence of thought displaces the genuine toleration of true understanding, when morbid sentimentalism masquerades under the garb of religious devotion, and a tawdry diffusiveness of thought poses as spiritual mysticism. The dormant Hindu intellect, ruminating on the remnants of an ancient and forgotten glory, was in urgent need of an external shock to rouse it and bring it face to face with the demands of an insistent present. And that shock did come at last with the introduction of English education which followed the advent of Rajah Rammohan Ray, the greatest figure in modern Indian history.

The immediate consequence of this English education was the disastrous uprising of a group of reactionaries, violently anti-Hindu and anti-national in attitude. Their openly expressed contempt for the literature and culture, the manners and traditions of their country, acted as a great setback to all literary activities, until the great Vidyasagar and his illustrious colleagues took up the cause and ushered in that memorable period of literary upheaval (from Vidyasagar to Bankimchandra), which came immediately before the present period–the epoch of Rabindranath. One of the longest standing problems in Bengali literature had been the conflict between

the academic and the dialectic forms of the language. Vidyasagar found the language in immediate danger of degenerating into vulgar colloquialism; but his scholarly adherence to its sanskritic form was only a phase in that cycle of movements and countermovements that culminated in the beautiful prose of Bankimchandra and the exquistite language of Rabindranath. Vidyasagar's language was undoubtedly the foundation on which the subsequent literature was based; but the superstructure was radically different in spirit and conception from the formal and prosaic design contemplated in the original plan. The advent of Rabindranath Tagore, with his bold departure from current traditions and originality of invention, was somewhat of a mild shock to the literary orthodoxy of bengal.

When the foamy and diffusive fancy of an imaginative childhood began to subside and condense into poetcial creations, Rabindranath was a mere boy who had barely entered his teens. As was natural, he gave full play to his extravagant imagination, which completely overshadowed all the objective realities surrounding his life. From within his phantasy was evolved a world of dreams coloured with the sombre light of his own restless moods. Leaving aside the very earliest of his poems, which are for the most part merely fanciful, and are noted chiefly for their delightful metrical inventions, we find the whole of his earlier poetry characterised by an intensely self-centred egosim, which is not the comprehensive subjectivity of true self-knowledge, but a mere negation of objective interest in the problems of life. The poet was exploring the intricate mazes of his own restless imagination:

There is a forest called the heart;
Endless, it extends on all sides.
Within its mazes I lost my way,
Where the trees with branches entwined
Nurse the darkness in its bosom.

This aimless wandering and vague hankering after something undefined was in a way characteristic of the literature of the period. In their study of Western literature, says Rabindranath, the writers of that period had found more intoxicant than food. Shakespeare, Milton and Byron had stirred their imagination and disturbed the tranquil flow of literature with a passionateness that aimed, not at the revelation of beauty, but at the sheer luxury of rousing the latent fury of emotional unrest. The essential importance of restraint and of genuine trueness-to-self had no chance of recognition in that turbulent and rebellious atmosphere which is clearly reflected in the defiantly fanciful tone of many of our poet's earlier pieces. This was, however, only a prelude to what was yet to come, and the poet at this stage seems oppressed by a vague, almost morbid, sense of the appalling inadequacy of such a partial outlook on life. This pessimism, however, is not the pessimism of futility, for the singer seems almost to revel in this atmosphere of sadness, as if he were vaguely conscious of being on the threshold of emancipation from the tyranny of this limited self. We venture here to attempt a translation of his poem called 'The Heart's Monody', which is in many ways fairly typical of his muse at this stage; but no translation can, of course, convey any idea of the wonderful

fascination of the style of the original :

What tune is that, my heart, thou singest alone to thyself ?
In summer or winter, autumn or spring, day or night,
Restless, persistent,
What tune is that, my heart, thou singest alone to thyself ?
Round thee fall the faded leaves and flowers shed their petals,
The dewdrops sparkle on the grass and vanish, the sunlight plays with shadows,
The rains patter on leaves.
And there in the midst of all, thy wasted weary soul
Sings the same, the same, the same unchanging tune.
I wake up from sleep at night
And listen through my heart-beats—
The same voice whispering low,
That knows no rest or pause.
A spirit, sad and weary, sits silent at my doors,
A constant dweller in my heart;
I feel the rhythmic murmur of its breath.
In the hush of mid-day, in my heart's desolate shadow,
A lonely dove sits cooing, making the lone hours mournful,
O my heart ! Hast thou learnt naught else
But only one note ?
Then cease, cease my heart !
I am weary of the same, the same unchanging cry.

The general trend of these earlier poems will be apparent even from a cursory glance at some of their titles : 'The Suicide of a Star,' 'The Despair of Hope,' 'The Lament of Happiness,' 'Deserted', 'The Invocation to Sorrow', 'The Wail of Defeat', and so on.

The next important stage of evolution is to be seen in the 'Songs of Sunrise', where the poet, now past his teens, seems suddenly to have discovered himself. The unfloding of the alluring vision of life, the sheer joy of its colours and forms and music, give a definitely positive turn to his verse; and henceforth there is a notable absence of that vagueness and lack of objectivity that characterised his earlier poetry.

I translate here a few lines from one of his poems, 'The Fountain's Awakening', belonging to this transition stage, which is really allegorical of this inner awakening of the poet's soul, and his intense longing for a greater measure of the fullness of life.

Out of the morning-songs of birds
One stray note, I know not how, has found its way into my secret cave today.
A trackless ray of the morning sun, I know not how,

Has come to seek its home here within my heart–
And my agelong sleep is over now.
The music of the world has sent its message to me.
Then strike, my heart, strike at the stony prison walls,
Break the bonds of darkness around,
And flood the world with joy.
I hear the call–the call of the distant sea.
The world within its bosom held,
The sea murmurs alone unto itself its own eternal thoughts.
I long to hear the chant that breaks out from the unknown deep,
Amid the silence of the listening sky.

The positive impetus of this new-found joy in life is apparent in the immediate change in the trend of the poet's composition. No longer do we hear him sing of mere sorrow and despair and futility, of the dreams and fancies of his fitful moods. But the same directness of an elemental style, the same delightful music of a simple diction, still pervade his poetry. Never before has pure lyrical Bengali expressed itself in poetry more melodious, never before has its feeble pomp or insipid trivialities been resolved into music more refreshing or snorous. Henceforth begins that long process of emancipation through which the message of the poet and his interpretation of life rapidly transcend the limits of their own intense individualism, and the singer's inborn sense of kinship with nature asserts itself through the widening range of his poetry and his deeper appreciation of, and keener insight into, the fulness of life. From craftsmanship we see him rising to the heights of true art, and from art, and through art, to that realisation which is the consummation of all art. The gradual evolution through which each trend of thought leads him to the Infinite, the culmination of all the phases of his ideals and inspirations in the breaking down of the barriers of self before the consciousness of one supreme Unity, is all distinctly traceable in the development of his poetry. Over and over again he triumphs over that tendency towards mere abstraction and one-sidedness of thought which has always been a real danger in the portrayal of the Hindu ideal.

The conflicting claims of faith and knowledge, of love and renunciation, of action and detachment, melt away before the supreme assurance of his poetry and the beautiful directness with which he carries us straight to the harmony that sings at the heart of life. What could be nobler or simpler, what more supremely comprehensive than his ideal of nationality, as expressed in his own English prose-rendering (in the Gitanjali) ?

Where the mind is without fear and the head is held high :
Where knowledge is free :
Where the world has not been broken up into fragments by
narrow domestic walls :
Where words come out of the depth of truth :
Where tireless striving stretches its arms towards Perfection :
Where the clear stream of reason has not lost its way into
the dreary sand of dead habit :

Where the mind is led forward by Thee, into ever-widening
thought and action :
Into that heaven of freedom, my Father, let my country
awake !

The keen sense of the Infinite which characterises so much of his verse, may be seen in his poem called 'The Beyond', of which I attempt the following version.

I am restless,
I am athirst for the great Beyond.
Sitting at my window,
I listen for its tread upon the air, as the day wears on.
My life goes out in longing
For the thrill of its touch.
I am athirst for the great Beyond.
O Beyond ! Vast Beyond !
How passionate comes thy clarion call.
I forget, alas ! that my hapless self,
Is self confined, with no wings to fly.
I am eager, wistful,
O Beyond, I am a stranger here.
Like hopeless hope never attained
Comes the whisper of thy unceasing call.
In thy message my listening heart
Has found its own, its inmost tongue.
O Beyond, I am a stranger here.
O Beyond, Vast Beyond !
How passionate comes thy clarion call.
I forget, alas ! that my hapless self
Has no winged horse on a path unknown
I am distraught,
O Beyond, I am forlorn.
In the languid sunlit hours
In the murmur of leaves, in the dancing shadows,
What vision unfolds before my eyes
Of thee—in the wide blue sky ?
O Beyond ! Vast Beyond !
How passionate comes thy clarion call.
I forget, alas ! that my hapless self
Lives in a house whose gates are closed.

Rabindranath's poems on Death, 'the last fulfilment of life', written at all stages of his career, are among the most remarkable of his contributions. Here is one taken from the Gitanjali :

On the day when Death will knock at thy door, what wilt thou offer to him ?
Oh, I will set before my guest the full vessel of my life—I will never let him go with empty hands.

All the sweet vintage of all my autumn days and summer nights, all the earnings, and the gleanings of my busy life will I place before him at the close of my days, when death will knock at my door.

The supreme assurance of the poet, that 'because I love this life I will love Death also', is characteristic of the tone of his later work. Contrast with this the opposite note struck by the singer in depicting the fear and distrust that is the common attitude of huminity towards death :

'Mother, mother', we call out to thee, in our terror, if perchance the helpless voice should recall the mother in thee and soothe thy fury. The crushing fear of thy relentless wrath still hopes and pleads with thee.

Where poetry is coextensive with life itself, where art ceases to be the mere expression of an imaginative impulse, it is futile to attempt a comprehensive analysis. Rabindranath's poetry is an echo of the infinite variety of life, of the triumph of love, of the supreme unity of existence, of the joy that abides at the heart of all things. The whole development of his poetry is a sustained glorification of love. His philosophy of love is an interpretation of the mystery of existence itself. Love, in the form or intrinsic joy, is at once the stability and the dynamic impulse that make up the realities of life–the truest expression of all the forces and all the mainifestations of nature. The inner impetus to the world-process is the eternal love waiting to be discovered, and existence itself is the melody of love sustained by the rhythm of its own self-surrendering renunciation. The objective of love is a constantly readjusted incentive–now of self-centred vanity, now of the youthful visions of life, of 'half a woman half a dream' now the sheer passion of living, now the supreme joy of renunciation, of selfless service. And all this is a natural inborn process of emancipation, the outflowing of life pursuing the shodow of its own perfection and realising itself in the pursuit :

The incense seeks to melt away in fragrance,
The fragrance clings about the incense;
Melody surrenders itself in the rhythm,
Rhythm strives to lead back to the melody.
The Idea seeks expression in the form,
The form seeks its meaning in the idea ;
The limitless abides in the close touch of limits,
The limits lose themselves in the limitless.
In life and death what mysterious purpose this–
This ceaseless coming and going from the formless to the form !
Bondage struggles seeking for its freedom ;
Freedom longs for a home in the bondage of Love.

The Burden of the Common Man

The history of humanity has its written pages and its unwritten volumes, its flashes of vision and faith and its unending voids of darkness and despair. Trailing vaguely behind the stately procession of its saints and sages, its captains and kings, come the confused masses of straggling humanity, bereft of light and bereft of glory while moments overflow with great realizations, with vision and with idealisms, the epochs proclaim the repeated discovery of the common man–the common man with his colourless life and his aimless gropings, the common man with his unchanging habits and his primitive passions, the common man with his ignoble ambitions and his sordid futilities.

Impatient for the never approaching Millenium, the despairing faith of man cries out from age to age for the vision of heaven on earth and from age to age the echoes ring back the insistent message "Behold the common man !" All protrayals of the Spirit of Humanity in the glorious raiments of its ideas and ideals recall the essential background of common-place realism, of the blank stretches of life filled in with the fresh and blood of Humanity.

Man in his thirst for light and his haunting passion for the life of Faith, breaks away from his fellowmen in impatience and in disgust, and seeks seclusion for his soul away from the world and its distracting riddles. But the cry of the common man is too insistent to be denied. It breaks through the barriers of apathy and blind contempt, it bites into the stone walls of self-contented seclusion, and calls back the wandering Mind of man from the monastery and the wilderness. For, the Common Man is the one outstanding and universal problem in all ages and in all phases of human progress–at once the hope and the despair of the prophet and the pioneer. Ever since man's discovery of the glory of his own existence, ever since the first Man wove his dreams into ideas and his ideas into forms, the common man has been there–a living negation of his visions and his dreams. It is this Common Man, this bleakness within Humanity that stamps out the living colours of life from the fairest dreams of Man, and poisons the world with its brute hunger and primitive passions, his feeble pleasures and ignoble sorrows, unrelieved by glimpses beyond. He is the torpid flesh that clothes and smothers the quickened nerves of sentient humanity–the irresponsive deadweight that burdens the progress of evolutions and baffles the soundest logic of the wiseman and the lawgiver. He is the elusive octopus that sucks out the life-blood of living faiths and drags down to itself the noblest inspirations of man. He is the great Unredeemed, the living antithesis of the Millenium–the perpetual cross of humanity, the perpetual symbol of human futility.

All unconscious of his destiny, out of tune and out of measure with himself, he halts and lags behind the marching vanguard of humanity. The dignity of labour and of life–the abiding harmony of all things–the joy that sings at the heart of creation–have no meanings, no messages for him. He is lost to the sublimest visions of the spirit, lost to the supremest creations of poetry and of Art ; to the joyous overflowings of Life pursuing the image of its own perfection and realising itself in the pursuit.

He feels no voiceless anguish within himself seeking for expression. Never hearkens and never responds to the mystic call of the spirit, never feels the restless thirst that calls out for something beyond himself. And the floodgates of inspiration are never opened out to him in living tides of joy. He imposes the weary burden of his contemptible struggles on the freshening hopes nad buoyant optimisms of humanity. He confronts the radiant faith of man in the fulfilment of life with the dull spectre of his own degradations. Every harmony of life strikes within him some discordant note and the very colours of creation are stained with the drabness of his failures. And from age to age he carries on the despondent gospel of his miserable life.

Men have tried, in all ages and all the world over, to do without this Common Man. They have grown impatient of his feeble response and his feeble faith; his complacent acceptance of the wretched unblushing Phillistine within him. They have proposed to sponge out this brute in Man from their calculations, and solve the problems of life, of Reality and of salvation, irrespective of his existence. They have fled away from his polluting presence as the embodiment of Maya, they have spurned him and scorned him and held him up to contempt as the apostle of the flesh. They have ruled him out of their lives and thoughts and their dreams of *mukti* or salvation as a regrettable accident of creation and a libellous blot on the fair fame of the creator. The Brahmin and the puritan, the pedant and the ascetic, they have all combined to cry down the common man and protect their respective faiths and their personal salvations from the grasps of this pariah. "Who is the Common Man," they ask, "that we should carry the burden of his failures and cripple ourselves for his sake ? Why should the primitive unrest of the 'mob' mind be allowed to disturb the rightful tranquility of the righteous ? Away with the Common Man : Away with his distracting presence and his pessimisms of futility." But the everpresent common man is not shaken off by refusal; for, as we strive to avoid his contamination, he seems to grow in bulk and power, co-extensive with humanity itself, menacing the world with his overshadowing presence. And his exclusion from our environments of life and thought becomes a constant and unending process of eliminations. And the belief grows into conviction that the Common Man–the average sinful ignoble unregenerated man is a pestilence of creation.

This rigorous weeding out of the world of self, this deliberate denial of the great mass of its human associations, serves to prepetuate the most fruitless of all dualisms, between man and man ; between the sinner and the saint, the church and the laity, the temporal and the spiritual–the life within and the life without. Religion divorced from life and the arrogant of its isolation, finds itself in needless conflict with the facts of experience, broad-based on unfettered sympathy. It acquires the morbid forms and obsessions of esoteric mysticism or ceremonial purism. It degenerates into the abnormal sin-consciousness of the unhealthy puritan and the scrupulous "don't-touch-ism" of the overconscious Brahmin, it seeks and finds itself in the privileged self-interests of priest-crafts and poperies, and in the shameless exploitation of the unbounded credulity of the common man–"the dumb driven cattle"of Humanity.

And meanwhile, the common man goes along in his heedless way, unconscious

of his destiny–unconscious of the glory of existence,–unconscious of the everpresent Reality, of the

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্

The One unchanges amidst the changeful Many, the One sentient amongst all sentient beings. He roams about in his unconscious misery, staining the fair face of humanity with the joyless and passionless gloom of his existence, ever carrying in his person the root problems of life; blindly accepting and blindly rejecting the ministrations of philanthropy and of religion—hankering and clamouring all the time for the gross material satisfactions of life. And ever and again the proud man in his isolated glory awakes to find himself besieged on all sides by the world he had reckoned without, by the spectre of the Common Man grown aggressive in virulence and in power. He finds the common man around him within the prison walls of the monastery, and the sanctuary of the wilderness—he finds in common man, the brute in man, within himself—unmasked and unashamed! The monasticisms and monopolies of religion, creed bound and scripture bound—the doctrines of spiritual isolation, of the exclusive salvation of the favoured few—are shaken to the core by the onslaughts of the common man. The proud man in his superior wisdom is aroused to the appalling inadequacy of his self-infatuated isolation and finds himself called upon to respond to the stimulus of a wider appeal and express himself in terms of a wider sympathy. He is torn away from his abstractions and his dreams, to face the solemn and relentless realities of life. No longer is the problem of sin a mere abstraction of Theology—it is the living personal problem of the sinful man—a problem that demands a solution. It recalls the sentient man to the immediate problems, as distinct though logically inseparable from the ultimate realities of life.

And the man of visions and ideals comes down in righteous pride or in condescending pity to rediscover the common man—no longer as a pestilence, no longer as a living figment of misdirected creation, but as the human instrument of perfection, as the indispensable "creature of politics, aggregates, rulers and priests." He creates and uncreates his codes of life for him. He feeds him with little fragments of his own ethics and philosophy. He provides him with creeds and with commandments, with the fears of hell and the allurements of heaven. He clothes his own visions of light with clouded obscurites that it may not dazzle the feeble eyesight of the common man. In superior arrogance and in genuine solicitude he brings down the whole atmosphere of his ideas and his ideals shorn of its halos and its glories to the supposed level of the common man's mind. In his anxiety to safeguard him from his doubts and foibles, he surrounds him in advence with the minutest details of life from baptism to burial, his sankara's and his *dasakarma* his *mantra's* and his catechisms, and sophistries and his compromise. And the man of faith and virtues retires confident and satisfied to sleep the contented sleep of the righteous—the common man within him lulled by the assurance of his virtuous labours. Now if all this labour is to be lost, if all this anxious concern and exhaustive care be baffled by the perversity of the common man, if the mere sparks and fragments of faltering light within him

should demand a greater allegiance than the reflected diffusions of surer lights, who is to blame for all this? If the uncoiling bondage of the common man is never uncoiled in reality, if crawling eternities are the measures of his march of progress, if perfection be the distant dream of some never attained future, where can salvation be found for the common man !—the living message of despair ?

The ages have squandered the richness of its traditions upon him, the noblest birthrights of humanity, and the most priceless legacies of thought are stifled to stagnation by the virulence of his parasitic growth. Olympus comes down to him with its blessings and he drags down Olympus to the depths of his degradation. For him the world is shorn of its light and glory and tainted with the servile shallowness of his indolent thoughts. For him the saints have lived and martyrs died and slaked his thirst in vain with the human blood of sacrifice. For him the Christ Jesus has undergone the sublimest agonies of his Passion. For him the great Bodhisattva sits silent in compassion eternally denying to himself the blessing of salvation, till Heaven has redeemed and reclaimed the last life and soul, the last straggling remnant of the common man. And he goes about unrepenting from age to age—the callous bulk of humanity, ungrateful unreasoning and ever blind.

Such is the common man, the man of sinful sorrows and futile pleasure. And such he remains till the awakening message of some compassionate understanding unfolds in him the image of his perfection, of the divinity within him. Then the veil of blindness is lifted from his sight, and the common man shakes off the tattered garments of his commonness. In the ecstacy of self discovery the awakened man cries out the gladness of its long silent soul, "Not this! Not this!" I am not this body; I am not this that suffers and dies; I am not this fleeting stream of ceaseless changes. I am the reality of which all this is a shadow; I am the One, the unchanging amidst the changeful Many; I am the perfection within myself beyond sorrow, beyond doubts, beyond death.

The path of evolution is nowhere a straight line of Progress. It is a ceaseless branching-out of the eternal flux of life seeking and finding its appropriate forms and expressions, or perishing in the attempt. And this is as true of the evolution of ideas and thoughts as of the biological laws of progress. The problems of life admit no static finality in their solutions, but demand a constant and active readjustment of ideas and relations. One simple vision, one simple germ of an inspiring idea, works out its age-long evolution in a whole world of struggle and adjustments. Moments expand to eternities, generations come and generations go, experience fades into memory and memories crumble away in the dead bones of history while man struggles with his self evolution and the vision of his real self "as he is in himself in his own rights." Critics and exponents arise and fight about experiences and their interpretations, about words and their meanings, about principles and their applications. Thoughts arise to refute thoughts, lives to challenge lives, and ever and again amidst the revolving strifes the common man loses his gospel of salvation, his sublime vision of liberty—and drifts back to his haunted life of oblivious habits. Habits good and bad, habits of indolence and of passion, habits vicious and pious, but all mere habits and bondage none the

less. Reason and Democracy, Liberty, Equality and Fraternity—the words remain only to shed their meanings, the struggles go on without their significance and the very impulses of life are left to stagnate in the "dreary desert sand of dead habit." And the cycle goes on from life to life. In his recurring blindness the common man loses the consciousness and looks about for some external stimulus to rekindle the life of faith within him. Stupendous indeed is the burden of the Common Man—the crushing burden of sins and sorrows that he carries in the world. The man of faith has the strength of his inner light, the solace of his visions and his ideals. To him is revealed the life that sustains and the glories that light up his struggles and his aspirations. But the common man is bereft of the light divine and the blessed visions of beatitude. He is the Simon of Cyrene who bears the cross of the eternal Christ. He carries within him the agonies of atonement—blind mute and unquestioning. History raises its monuments of glory to her illustrious sons but he the common man, the true image of suffering humanity is the dust and the earth of which monuments are made. He is the pain spot in man that fills the life of man with its aching throbs.

Blessed is the Common Man for in him is the image of perfection—the perfection that waits not for the dim distant future but is eternally realized in his divinity. Not merely the ultimate triumph of dharma that drives, lures and guides the soul to inevitable salvation, but of the ever-present triumph of all things, of the meanest of God's creations. As immortal Whitman sings "Illustrious everyone! Illustrious what we name space, spheres of unnumbered spirits. Illustrious the mystery of motion in all beings. Illustrious the senses, the body. Illustrious the passing light. Illustrious whatever I see or hear or touch to the last Good in all, even the last particle. O amazement of things! O spirituality of things! I sing to the last equalities modern or old. I say Nature continues, glory continues. For I do not see one imperfection in the Universe. Nor one cause or result lamentable at last. Of life immense in passion pulse and power cheerful, for freest action formed under the laws divine. The Modern Man I sing"—The common man. The world was never more perfect than it is today and never will be so. Life proceeds from perfection to perfection, from reality to reality—each moment each phase of life, perfect in its palce, perfect in its relation to all things,perfect in its promise and its fulfilment. The Millenium may never arrive, Utopia may lose itself in the mazes of its conception, but the fulfilment of man is eternally written. The image of that perfect fulfilment he carries within and spreads without—the image of the divinity in the common man.

But why then, all this misery, all this blind helpless groping about, this incessant and aimless striving after a perfection that is already there? This eleborate make belief of imperfection. Philosophy is hushed into silence but the vision of faith sings out in eloquent joy. Today the common man has found himself, the common man has found his gospel. He may lose it again in the blinding conflicts of passion—in the false clashings of spurious cause. But the great fact is that he has "Positively appeared—that is enough." He has found himself not merely in fragments of the faltering present, not merely in the vague memories of his personal past but in the flashes of comprehensive vision of the advancing future calling out to the perfection within him to bear witness into itself.

Come leaders of lost causes! Come Messengers of forlorn hopes! Come torch-bearers of flickering faiths! For the common man is awake today—awake in all his glory and all his Divinity—half a brute and half a man, but all divine. He is awake and thirsting for a living faith for himself, a living faith in himself. Through the ages of darkness and despair he has been awaking in the majesty of consciousness and the fullness of power. And now he is awake with his hopes and his aspirations, his passions and his promises of peace. All the messages of man, all the agelong gospels of hope and of liberty have reached down to the living depths within the common man—through endless tortures and denials, through the agonies of cataclysms. The common man is at your doors working away for good or for evil, for life or for death the problems of his own salvation. Still blind, still groping, still helpless but in deadliest earnestness, creating and discovering he knows not what. With blind faith he clings to his monstrous 'isms' and his impossible creeds, all unconscious of the unfolding future. He is out for the quest of the Holy grail, of his Heaven in earth.

And in the midst of all this is the silent and eternal God of creation in the transcendent glory of his Love, waiting to be discovered. That unfolding love, that intrinsic joy, is at once the stability and the dynamic impulse that make up the realities of life—the final expression of all the forces and all the manifestations of nature. The inner impetus to the world process is the melody of this joy of love sustained by the rhythm of its own self surrendering renunciation. The objective of the common man's life may be a shifting and constantly adjusted incentive—now of self-centred vanity, now of the youthful visions of love, of "half a woman half a dream," now the sheer passion of living, now the supreme joy of renunciation, of selfless service. But all this is a natural inborn process of emancipation, the outflowing of life pursuing the shadow of its perfection and realizing itself in this pursuit.